প্রমীলা প্রকৃতি

প্রমীলা প্রকৃতি

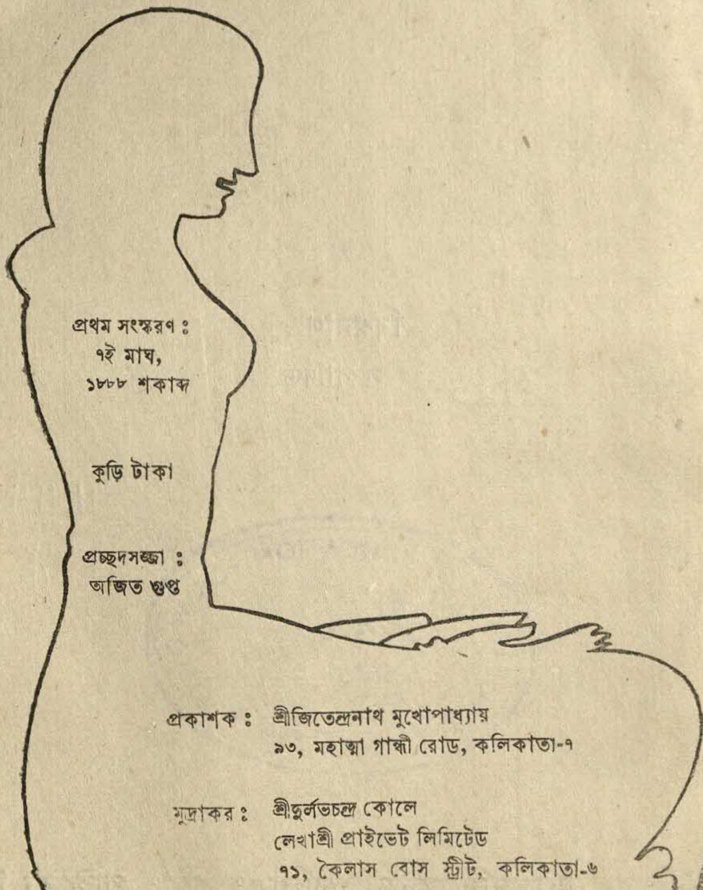
প্রমীলা প্রকৃতি

প্রমীলা প্রকৃতি

প্রমীলা প্রকৃতি

বিশ্বনাথ দে
সম্পাদিত

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭



প্রথম সংস্করণ ঃ
৭ই মাঘ,
১৮৮৮ শকাব্দ

কুড়ি টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা ঃ
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীদুর্লভচন্দ্র কোলে
লেখাশ্রী প্রাইভেট লিমিটেড
৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

এই প্রসঙ্গে

'প্রমীলা প্রকৃতি' বাংলার চিরন্তন নারী-প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি।

নারী-হৃদয়ের হিংসা-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা, কামনা-বাসনা, সর্বোপরি নারী-মনের গহন-গভীর অভ্যন্তরের চিরকালীন রহস্যময়তা এই সঙ্কলনের প্রতিটি গল্পের মধ্য দিয়েই উন্মোচিত হয়েছে। নারী-হৃদয়ের যা কিছু মহান এবং যা কিছু পঙ্কিল—তা সবই 'প্রমীলা প্রকৃতি'র গল্পগুলির মধ্যে অঙ্কিত থাকতে দেখা যাবে।

সুবৃহৎ এই সঙ্কলনের এইটিই অভিনবত্ব। 'প্রমীলা প্রকৃতি'র বিষয়বস্তু নিয়ে বাংলা ভাষায় আর কোনও গল্প-সঙ্কলন-গ্রন্থ যে এর আগে প্রকাশিত হয়নি, এ-কথা বললে অযৌক্তিক কিছু বলা হবে না।

আধুনিক ছোটোগল্পের জনক রবীন্দ্রনাথ। সেজন্য তাঁর লেখা 'মধ্যবর্তিনী' গল্প দিয়েই এই সঙ্কলন-গ্রন্থ শুরু করা হয়েছে। 'প্রমীলা প্রকৃতি' গল্প-সঙ্কলনের এই বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁর পূর্ববর্তী কালের কোনো লেখকের লেখা তাই এই সঙ্কলনে দেওয়া গেল না। কিন্তু একালীন কোনো কথা-সাহিত্যিকের লেখা যদি 'প্রমীলা প্রকৃতি'তে অনুপস্থিত থাকে, তবে তা আমার একটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি বলেই ধরে নিতে হবে। পরবর্তী সংস্করণে যে এই ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের প্রয়াসী হবো, তা বলে রাখা উচিত মনে করছি।

এই সঙ্কলন-গ্রন্থ সম্পাদনার কাজে আমার কয়েকজন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে সাহিত্য-রসিক বন্ধু শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ঘোষের কথা ভোলা যায় না। লেখার মিল-মিছিল, সাজানো-গোছানো, সর্বোপরি এই সুবৃহৎ গ্রন্থ মুদ্রণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীযুক্ত সুবোধ রায় ও শ্রীমতী পারমিতা সেন প্রচুর গ্রন্থ দিয়ে লেখা সংগ্রহের কাজে সহযোগিতা করেছেন। সাংবাদিক বন্ধু শ্রীযুক্ত শ্যামল দত্তর কাছেও আমি অনেক মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছি। এঁদের প্রত্যেককেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আর কৃতজ্ঞতা জানাই এই সঙ্কলনের লেখক ও লেখার সত্ত্বাধিকারীদের, যাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে 'প্রমীলা প্রকৃতি' প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর গল্প দুটি প্রকাশ করার অনুমতি দান করেছেন

বিশ্বভারতী—গ্রন্থন বিভাগ এবং শরৎচন্দ্রের লেখাটি পাওয়া গেছে শ্রীযুক্ত অমলকুমা
চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

পরিশেষে আর একটি কথা, যা আমার চির দুঃখের। 'প্রমীলা প্রকৃতি'
সঙ্কলনে স্বরচিত গল্প প্রকাশ করার অনুমতি দিয়ে সঙ্কলনটি সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহ
ছিলেন, এমন কয়েকজন শক্তিমান কথা-সাহিত্যিককে, এই সঙ্কলন প্রকাশিত হওয়া
আগেই আমরা হারিয়েছি। 'প্রমীলা প্রকৃতি' তাঁদের হাতে তুলে দিতে পারলে
আনন্দিত হতাম।

—বিশ্বনাথ দে

সূচীপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ মধ্যবর্তিনী ১ ॥
[১৮৬১—১৯৪১]

প্রমথ চৌধুরী ॥ আহুতি ১৬ ॥
[১৮৬৮—১৯৪৬]

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ কাশীবাসিনী ৩৪ ॥
[১৮৭৩—১৯৩২]

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ সতী ৫৩ ॥
[১৮৭৬—১৯৩৮]

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সতীন ৭২ ॥
[১৮৭৭—১৯৩৮]

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ রাতজাগা ৯২ ॥
[১৮৮১—১৯৬০]

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ॥ ঠানদিদি ১০৩ ॥
[৮৮২—১৯৬৪]

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ॥ ঝড় ১২২ ॥
[১৮৮৪—১৯৬৬]

জগদীশ গুপ্ত ॥ আঁধার বৃন্দাবন ১৩৭ ॥
[১৮৮৬—১৯৫৭]

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ অন্ধকারের অভিসার ১৫১ ॥
[১৮৮৮—১৯২৯]

হেমেন্দ্রকুমার রায় ॥ শিউলি ১৬৯ ॥
[১৮৮৮—১৯৬৩]

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ॥ মুসাফির ১৭৫ ॥
[১৮৯০—১৯৬৪]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সুলোচনা ১৯৩ ॥
[১৮৯৪—১৯৫০]

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ॥ জালিয়াত ২১৬ ॥
[১৮৯৪—]

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র ॥ প্রত্যর্পণ ২৩৩ ॥
[১৮৯৬—১৯৩২]

শ্রীবাসব ॥ প্রত্যাবর্তন ২৪৫ ॥
[১৮৯৬—১৯৬৬]

মণীন্দ্রলাল বসু ॥ সুচিত্রার কথা ২৫৫ ॥
[১৮৯৭—]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ময়দান ২৭৬ ॥
[১৮৯৮—]

কাজী নজরুল ইসলাম ॥ পদ্ম গোখ্‌রো ২৯৬ ॥
[১৮৯৯—]

বনফুল ॥ স্ত্রী-চরিত্র ৩১৬ ॥
[১৮৯৯—]

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ স্ত্রী-ভাগ্য ৩২০ ॥
[১৮৯৯—]

মনোজ বসু ॥ উলু ৩৩৫ ॥
[১৯০১—]

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ বদলি মঞ্জুর ৩৬০ ॥
[১৯০১ —]

প্রমথনাথ বিশী ॥ মাধবী মাসী ৩৮৪ ॥
[১৯০২—]

যুবনাশ্ব ॥ স্বাহা ৩৯৩ ॥
[১৯০২—]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ॥ শাঁখা ৪১৮ ॥
[১৯০৩—]

সরোজকুমার রায়চৌধুরী ॥ অকাল বসন্ত ৪৩১ ॥
[১৯০৩—]

অন্নদাশঙ্কর রায় ॥ যৌবন জ্বালা ৪৩৯ ॥
[১৯০৪—]

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ মল্লিকা ৪৬৬ ॥
[১৯০৪—]

শিবরাম চক্রবর্তী ॥ বৌয়ের জন্মদিন ৪৭৯ ॥
[১৯০৪—]

সৈয়দ মুজতবা আলী ॥ বিষের বিষ ৪৮৯ ॥
[১৯০৪—]

সতীনাথ ভাদুড়ী ॥ অলোক দৃষ্টি ৪৯৭ ॥
[১৯০৬—১৯৬৫]

প্রবোধকুমার সান্যাল ॥ আচাযিদের বউ ৫০৯ ॥
[১৯০৭—]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বৃহত্তর-মহত্তর ৫৩৪ ॥
[১৯০৮—১৯৫৬]

আশাপূর্ণা দেবী ॥ বন্দিনী ৫৩৪ ॥
[১৯০৯—]

গজেন্দ্রকুমার মিত্র ॥ গৃহিণী ৫৬৫ ॥
[১৯০৯—]

সুবোধ ঘোষ ॥ থির বিজুরি ৫৭৭ ॥
[১৯০৯—]

ভবানী মুখোপাধ্যায় ॥ নতুন নায়িকা ৬০০ ॥
[১৯১০—]

লীলা মজুমদার ॥ রেলগাড়িতে ৬১১ ॥
[১৯১০—]

জ্যোতির্ময় রায় ॥ পাথেয় ৬১৯ ॥
[১৯১১—১৯৬১]

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ॥ পাশের ফ্লাটের মেয়েটা ৬৩৪ ॥
[১৯১২—]

বিমল মিত্র ॥ অসতী ৬৪৩ ॥
[১৯১২—]

নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ দ্বিচারিণী ৬৬৬ ॥
[১৯১৬—]

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ॥ ভুল ৬৮৯ ॥
[১৯১৬—]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ দুর্ঘটনা ৭১০ ॥
[১৯১৮—]

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ॥ দাহ ৭২৫ ॥
[১৯১৯—]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ॥ সেলিম চিশ্‌তির কবর ৭৩৬ ॥
[১৯২০—]

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ॥ অনমনীয় ৭৫৮ ॥
[১৯২০—]

সন্তোষকুমার ঘোষ ॥ ছাপ ৭৬৭ ॥
[১৯২০—]

বিমল কর ॥ দুই বোন ৭৮১ ॥
[১৯২১—]

রমাপদ চৌধুরী ॥ নষ্টনারী ৭৯৩
[১৯২২—]

গৌরকিশোর ঘোষ ॥ বড়ুয়া মাসী ৮১৮ ॥
[১৯২৩—]

সমরেশ বসু ॥ উত্তাপ ৮২৬ ॥
[১৯২৩—]

মধ্যবর্তিনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিবারণের সংসার নিতান্তই সচরাচর রকমের, তাহাতে কাব্যরসের কোনো নামগন্ধ ছিলো না। জীবনে উক্ত রসের যে কোনো আবশ্যক আছে এমন কথা তাহার মনে কখনো উদয় হয় নাই। যেমন পরিচিত পুরাতন চটি-জোড়াটার মধ্যে পা দুটি দিব্য নিশ্চিন্তভাবে প্রবেশ করে, এই পুরাতন পৃথিবীটার মধ্যে নিবারণ সেইরূপ আপনার চিরাভ্যস্ত স্থানটি অধিকার করিয়া থাকে, সে সম্বন্ধে ভ্রমেও কোনোরূপ চিন্তা, তর্ক বা তত্ত্বালোচনা করে না।

নিবারণ প্রাতঃকালে উঠিয়া গলির ধারে গৃহদ্বারে খোলা গায়ে বসিয়া অত্যন্ত নিরুদ্‌বিগ্নভাবে হুঁকাটি লইয়া তামাক খাইতে থাকে। পথ দিয়া লোকজন যাতায়াত করে, গাড়িঘোড়া চলে, বৈষ্ণব-ভিখারি গান গাহে, পুরাতন-বোতল-সংগ্রহকারী হাঁকিয়া চলিয়া যায়; এই-সমস্ত চঞ্চল দৃশ্য মনকে লঘুভাবে ব্যাপৃত রাখে এবং যেদিন কাঁচা আম অথবা তপ্‌সি-মাছওয়ালা আসে, সেদিন অনেক দরদাম করিয়া কিঞ্চিৎ বিশেষরূপ রন্ধনের আয়োজন হয়। তাহার পর যথাসময়ে তেল মাখিয়া স্নান করিয়া আহারান্তে দড়িতে ঝুলানো চাপকানটি পরিয়া, এক-ছিলিম তামাক পানের সহিত নিঃশেষ-পূর্বক আর-একটি পান মুখে পুরিয়া আপিসে যাত্রা করে। আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যাবেলাটা প্রতিবেশী রামলোচন ঘোষের বাড়িতে প্রশান্ত গম্ভীরভাবে সন্ধ্যা যাপন করিয়া আহারান্তে রাত্রে শয়নগৃহে স্ত্রী হরসুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ হয়।

সেখানে মিত্রদের ছেলের বিবাহে আইবড়-ভাত পাঠানো, নবনিযুক্ত ঝির অবাধ্যতা, ছেঁচকিবিশেষে ফোড়নবিশেষের উপযোগিতা সম্বন্ধে যে সমস্ত

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা চলে তাহা এ-পর্যন্ত কোনো কবি ছন্দোবদ্ধ করেন নাই এবং সেজন্য নিবারণের মনে কখনো ক্ষোভের উদয় হয় নাই।

ইতিমধ্যে ফাল্গুন মাসে হরসুন্দরীর সংকট পীড়া উপস্থিত হইলো। জ্ব আর কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। ডাক্তার যতই কুইনাইন দেয় বাধাপ্রা প্রবল স্রোতের ন্যায় জ্বরও ততো ঊর্ধ্বে চড়িতে থাকে। এমনি বিশ দিন বাইশ দিন, চল্লিশ দিন পর্যন্ত ব্যাধি চলিলো।

নিবারণের আপিস বন্ধ; রামলোচনের বৈকালিক সভায় বহুকাল আর সে যায় না; কী যে করে তাহার ঠিক নাই। একবার শয়নগৃহে গিয় রোগীর অবস্থা জানিয়া আসে, একবার বাহিরের বারান্দায় বসিয়া চিন্তিত মুখে তামাক টানিতে থাকে। দুই বেলা ডাক্তার-বৈদ্য পরিবর্তন করে এবং যে যাহা বলে সেই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহে।

ভালোবাসার এইরূপ অব্যবস্থিত শুশ্রূষা সত্ত্বেও চল্লিশ দিনে হরসুন্দরী ব্যাধিমুক্ত হইলো। কিন্তু, এমনি দুর্বল এবং শীর্ণ হইয়া গেল যে, শরীরটি যেন বহুদূর হইতে অতি ক্ষীণস্বরে 'আছি' বলিয়া সাড়া দিতেছে মাত্র।

তখন বসন্তকালে দক্ষিণের হাওয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং উষ্ণ নিশীথের চন্দ্রালোকও সীমন্তিনীদের উন্মুক্ত শয়নকক্ষে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে।

হরসুন্দরীর ঘরের নীচেই প্রতিবেশীদের খিড়কির বাগান। সেটা যে বিশেষ কিছু সুদৃশ্য রমণীয় স্থান তাহা বলিতে পারি না। এক সময় কে একজন শখ করিয়া গোটাকতক ক্রোটন রোপণ করিয়াছিলো, তাহার পর আর সেদিকে বড়ো-একটা কেউ দৃক্‌পাত করে নাই। শুষ্ক ডালের মাচার উপর কুষ্মাণ্ডলতা উঠিয়াছে; বৃদ্ধ কুলগাছের তলায় বিষম জঙ্গল; রান্নাঘরের পাশে প্রাচীর ভাঙিয়া কতকগুলি ইঁট জড়ো হইয়া আছে এবং তাহারই সহিত দগ্ধাবশিষ্ট পাথুরে-কয়লা এবং ছাই দিন-দিন রাশীকৃত হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু বাতায়নতলে শয়ন করিয়া এই বাগানের দিকে চাহিয়া হরসুন্দরী প্রতি মুহূর্তে যে একটি আনন্দরস পান করিতে লাগিলো, তাহার অকিঞ্চিৎকর জীবনে এমন সে আর কখনো করে নাই। গ্রীষ্মকালে স্রোতোবেগ মন্দ হইয়া ক্ষুদ্র গ্রাম্যনদীটি যখন বালু-শয্যার উপরে শীর্ণ হইয়া আসে তখন সে

যমন অত্যন্ত স্বচ্ছতা লাভ করে, যেমন প্রভাতের সূর্যালোকে তাহার তলদেশ র্যন্ত কম্পিত হইতে থাকে, বায়ুস্পর্শ তাহার সর্বাঙ্গ পুলকিত করিয়া তোলে, এবং আকাশের তারা তাহার স্ফটিকদর্পণের উপর সুখস্মৃতির ন্যায় অতি সুস্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি হরসুন্দরীর ক্ষীণ জীবনতন্তুর উপর আনন্দময়ী প্রকৃতির প্রত্যেক অঙ্গুলি যেন স্পর্শ করিতে লাগিলো এবং অন্তরের ধ্যে যে একটি সংগীত উঠিতে লাগিলো তাহার ঠিক ভাবটি সে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিলো না।

এমন সময় তাহার স্বামী যখন পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিতো 'কেমন আছো' তখন তাহার চোখে যেন জল উছলিয়া উঠিতো। রোগশীর্ণ মুখে তাহার চোখ দুটি অত্যন্ত বড়ো দেখায়, সেই বড়ো-বড়ো প্রেমার্দ্র সকৃতজ্ঞ চোখ স্বামীর মুখের দিকে তুলিয়া শীর্ণহস্তে স্বামীর হস্ত ধরিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিতো, স্বামীর অন্তরেও যেন কোথা হইতে নূতন অপরিচিত আনন্দরশ্মি প্রবেশ লাভ করিতো।

এইভাবে কিছুদিন যায়। একদিন রাত্রে ভাঙা প্রাচীরের উপরিবর্তী র্ব অশথগাছের কম্পমান শাখান্তরাল হইতে একখানি বৃহৎ চাঁদ উঠিতেছে বং সন্ধ্যাবেলাকার গুমট ভাঙিয়া হঠাৎ একটা নিশাচর বাতাস জাগ্রত হইয়া ঠিয়াছে, এমন সময় নিবারণের চুলের মধ্যে অঙ্গুলি বুলাইতে বুলাইতে রসুন্দরী কহিলো, 'আমাদের তো ছেলেপুলে কিছুই হইলো না, তুমি আর কটি বিবাহ করো।'

হরসুন্দরী কিছুদিন হইতে এই কথা ভাবিতেছিলো। মনে যখন একটা বল আনন্দ, একটা বৃহৎ প্রেমের সঞ্চার হয় তখন মানুষ মনে করে, 'আমি সব রিতে পারি।' তখন হঠাৎ একটা আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা বলবতী হইয়া ঠে। স্রোতের উচ্ছ্বাস যেমন কঠিন তটের উপর আপনাকে সবেগে মূর্ছিত রে তেমনি প্রেমের আবেগ, আনন্দের উচ্ছ্বাস, একটা মহৎ ত্যাগ, একটা হৎ দুঃখের উপর আপনাকে যেন নিক্ষেপ করিতে চাহে।

সেইরূপ অবস্থায় অত্যন্ত পুলকিত চিত্তে একদিন হরসুন্দরী স্থির করিলো, আমার স্বামীর জন্য আমি খুব বড়ো একটা কিছু করিবো। কিন্তু হায়, তখানি সাধ ততখানি সাধ্য কাহার আছে। হাতের কাছে কী আছে, কী

দেওয়া যায়। ঐশ্বর্য নাই, বুদ্ধি নাই, ক্ষমতা নাই, শুধু একটা প্রাণ আছে, সেটাও যদি কোথাও দিবার থাকে এখনই দিয়া ফেলি, কিন্তু তাহারই বা মূল্য কী।

'আর, স্বামীকে যদি দুগ্ধফেনের মতো শুভ্র, নবনীর মতো কোমল, শিশু-কন্দর্পের মতো সুন্দর একটি স্নেহের পুত্তলি সন্তান দিতে পারিতাম! কিন্তু প্রাণপণে ইচ্ছা করিয়া মরিয়া গেলেও তো সে হইবে না।' তখন মনে হইলো, স্বামীর একটি বিবাহ দিতে হইবে। ভাবিলো, স্ত্রীরা ইহাতে এতো কাতর হয় কেন, এ কাজ তো কিছুই কঠিন নহে। স্বামীকে যে ভালোবাসে, সপত্নীকে ভালোবাসা তাহার পক্ষে কী এমন অসাধ্য। মনে করিয়া হরসুন্দরীর বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিলো।

প্রস্তাবটা প্রথম যখন শুনিলো নিবারণ হাসিয়া উড়াইয়া দিলো, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও কর্ণপাত করিলো না। স্বামীর এই অসম্মতি, এই অনিচ্ছা দেখিয়া হরসুন্দরীর বিশ্বাস এবং সুখ যতই বাড়িয়া উঠিলো তাহার প্রতিজ্ঞাও ততই দৃঢ় হইতে লাগিলো।

এদিকে নিবারণ যতো বারম্বার এই অনুরোধ শুনিলো ততই ইহার অসম্ভাব্যতা তাহার মন হইতে দূর হইলো এবং গৃহদ্বারে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে সন্তান-পরিবৃত গৃহের সুখময় চিত্র তাহার মনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিলো।

একদিন নিজেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কহিলো, 'বুড়া-বয়সে একটি কচি খুকীকে বিবাহ করিয়া আমি মানুষ করিতে পারিবো না।'

হরসুন্দরী কহিলো, 'সেজন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না। মানুষ করিবার ভার আমার উপর রহিলো।' বলিতে বলিতে এই সন্তানহীনা রমণীর মনে একটি কিশোরবয়স্কা, সুকুমারী, লজ্জাশীলা, মাতৃক্রোড় হইতে সদ্যোবিচ্যুতা, নববধূর মুখচ্ছবি উদয় হইলো এবং হৃদয় স্নেহে বিগলিত হইয়া গেল।

নিবারণ কহিলো, 'আমার আপিস আছে, কাজ আছে, তুমি আছো, কচি মেয়ের আবদার শুনিবার অবসর আমি পাইবো না।'

হরসুন্দরী বারবার করিয়া কহিলো, 'তাহার জন্য কিছুমাত্র সময় নষ্ট করিতে হইবে না।' এবং অবশেষে পরিহাস করিয়া কহিলো, 'আচ্ছা গো, তখন

দেখিবো কোথায় বা তোমার কাজ থাকে, কোথায় বা আমি থাকি, আর কোথায় বা তুমি থাকো।'

নিবারণ সে কথার উত্তরমাত্র দেওয়া আবশ্যক মনে করিলো না, শাস্তির স্বরূপ হরসুন্দরীর কপোলে হাসিয়া তর্জনী-আঘাত করিলো। এই তো গেল ভূমিকা।

২

একটি নোলক-পরা অশ্রুভরা ছোটোখাটো মেয়ের সহিত নিবারণের বিবাহ হইলো, তাহার নাম শৈলবালা।

নিবারণ ভাবিলো, নামটি বড়ো মিষ্টি এবং মুখখানিও বেশ ঢলো-ঢলো। তাহার ভাবখানা, তাহার চেহারাখানি, তাহার চলাফেরা একটু বিশেষ মনোযোগ করিয়া চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সে আর কিছুতেই হইয়া উঠে না। উল্‌টিয়া এমন ভাব দেখাইতে হয় যে, 'ওই তো একফোঁটা মেয়ে, উহাকে লইয়া তো বিষম বিপদে পড়িলাম, কোনোমতে পাশ কাটাইয়া আমার বয়সোচিত কর্তব্যক্ষেত্রের মধ্যে গিয়া পড়িলে যেন পরিত্রাণ পাওয়া যায়।'

হরসুন্দরী নিবারণের এই বিষম বিপদগ্রস্ত ভাব দেখিয়া মনে-মনে বড়ো আমোদ বোধ করিতো। এক-একদিন হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিতো, 'আহা, পলাও কোথায়। ওইটুকু মেয়ে, ও তো আর তোমাকে খাইয়া ফেলিবে না।'

নিবারণ শশব্যস্ত ভাব ধারণ করিয়া বলিতো, 'আরে, রোসো রোসো, আমার বিশেষ কাজ আছে।' বলিয়া যেন পলাইবার পথ পাইতো না।

হরসুন্দরী হাসিয়া দ্বার আটক করিয়া বলিতো, 'আজ ফাঁকি দিতে পারিবে না।'

অবশেষে নিবারণ নিতান্তই নিরুপায় হইয়া বসিয়া পড়িতো।

হরসুন্দরী তাহার কানের কাছে বলিতো, 'আহা, পরের মেয়েকে ঘরে আনিয়া অমন হতশ্রদ্ধা করিতে নাই।'

এই বলিয়া শৈলবালাকে ধরিয়া নিবারণের বাম পাশে বসাইয়া দিতো এবং জোর করিয়া ঘোমটা খুলিয়া ও চিবুক ধরিয়া তাহার আনত মুখ তুলিয়া নিবারণকে বলিতো, 'আহা, কেমন চাঁদের মতো মুখখানি দেখো দেখি।'

কোনোদিন বা উভয়কে বসাইয়া কাজ আছে বলিয়া উঠিয়া যাইতো এবং বাহির হইতে ঝনাৎ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিতো।

নিবারণ নিশ্চয় জানিতো, দুটি কৌতূহলী চক্ষু কোনো-না-কোনো ছিদ্রে সংলগ্ন হইয়া আছে; অতিশয় উদাসীনভাবে পাশ ফিরিয়া সে নিদ্রার উপক্রম করিতো, শৈলবালা ঘোমটা টানিয়া গুটিসুটি মারিয়া মুখ ফিরাইয়া একটা কোণের মধ্যে মিলাইয়া থাকিতো।

অবশেষে হরসুন্দরী নিতান্ত না পারিয়া হাল ছাড়িয়া দিলো, কিন্তু খুব বেশি দুঃখিত হইলো না।

হরসুন্দরী যখন হাল ছাড়িলো তখন স্বয়ং নিবারণ হাল ধরিলো। এ বড়ো কৌতূহল, এ বড়ো রহস্য। এক টুকরা হীরক পাইলে তাহাকে যেমন নানাভাবে নানাদিকে ফিরাইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, আর এ-একটি ক্ষুদ্র সুন্দর মানুষের মন—বড়ো অপূর্ব। ইহাকে কতো রকম করিয়া স্পর্শ করিয়া, সোহাগ করিয়া, অন্তরাল হইতে, সম্মুখ হইতে, পার্শ্ব হইতে দেখিতে হয়। কখনো একবার কানের দুলে দোল দিয়া, কখনো ঘোমটা একটুখানি টানিয়া তুলিয়া, কখনো বিদ্যুতের মতো সহসা সচকিতে, কখনো নক্ষত্রের মতো দীর্ঘকাল একদৃষ্টে, নব-নব সৌন্দর্যের সীমা আবিষ্কার করিতে হয়।

ম্যাক্‌মোরান কোম্পানির আপিসের হেড্‌বাবু শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্রের অদৃষ্টে এমন অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে হয় নাই। সে যখন প্রথম বিবাহ করিয়াছিলো তখন বালক ছিলো; যখন যৌবন লাভ করিলো তখন স্ত্রী তাহার নিকট চিরপরিচিত, বিবাহিত জীবনে চিরাভ্যস্ত। হরসুন্দরীকে সে ভালো-বাসিতো, কিন্তু কখনোই তাহার মনে ক্রমে ক্রমে প্রেমের সচেতন সঞ্চার হয় নাই।

একেবারে পাকা আম্রের মধ্যেই যে পতঙ্গ জন্মলাভ করিয়াছে, যাহাকে কোনো কালে রস অন্বেষণ করিতে হয় নাই, অল্পে অল্পে রসাস্বাদ করিতে হয় নাই, তাহাকে একবার বসন্তকালের বিকশিত পুষ্পবনের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হউক দেখি—বিকচোন্মুখ গোলাপের আধখোলা মুখটির কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার কী আগ্রহ। একটুকু যে সৌরভ পায়, একটুকু যে মধুর আস্বাদ লাভ করে, তাহাতে তাহার কী নেশা।

নিবারণ প্রথমটা কখনো বা একটা গাউন-পরা কাঁচের পুতুল, কখনো বা একশিশি এসেন্স্, কখনো বা কিছু মিষ্টদ্রব্য কিনিয়া আনিয়া শৈলবালাকে গোপনে দিয়া যাইতো। এমনি করিয়া একটুখানি ঘনিষ্টতার সূত্রপাত হয়। অবশেষে কখন একদিন হরসুন্দরী গৃহকার্যের অবকাশে আসিয়া দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিলো, নিবারণ এবং শৈলবালা বসিয়া কড়ি লইয়া দশ-পঁচিশ খেলিতেছে।

বুড়া বয়সের এই খেলা বটে! নিবারণ সকালে আহারাদি করিয়া যেন আপিসে বাহির হইলো, কিন্তু আপিসে না গিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে। এ প্রবঞ্চনার কী আবশ্যক ছিলো। হঠাৎ একটা জ্বলন্ত বজ্রশলাকা দিয়া কে যেন হরসুন্দরীর চোখ খুলিয়া দিলো, সেই তীব্র তাপে চোখের জল বাষ্প হইয়া শুকাইয়া গেল।

হরসুন্দরী মনে-মনে কহিলো, 'আমিই তো উহাকে ঘরে আনিলাম, আমিই তো মিলন করাইয়া দিলাম, আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন—যেন আমি উহাদের সুখের কাঁটা।'

হরসুন্দরী শৈলবালাকে গৃহকার্য শিখাইতো। একদিন নিবারণ মুখ ফুটিয়া বলিলো, 'ছেলেমানুষ, উহাকে তুমি বড়ো বেশি পরিশ্রম করাইতেছো, উহার শরীর তেমন সবল নহে।'

বড়ো একটা তীব্র উত্তর হরসুন্দরীর মুখের কাছে আসিয়াছিলো ; কিন্তু কিছু বলিলো না, চুপ করিয়া গেল।

সেই অবধি বউকে কোনো গৃহকার্যে হাত দিতে দিতো না ; রাঁধাবাড়া দেখাশুনা সমস্ত কাজ নিজে করিতো। ক্রমে এমন হইলো, শৈলবালা আর নড়িতে বসিতে পারে না, হরসুন্দরী দাসীর মতো তাহার সেবা করে এবং স্বামী বিদূষকের মতো তাহার মনোরঞ্জন করে। সংসারের কাজ করা, পরের দিকে তাকানো যে জীবনের কর্তব্য এ শিক্ষাই তাহার হইলো না।

হরসুন্দরী যে নীরবে দাসীর মতো কাজ করিতে লাগিলো তাহার মধ্যে ভারি একটা গর্ব আছে। তাহার মধ্যে ন্যূনতা এবং দীনতা নাই। সে কহিলো, 'তোমরা দুই শিশুতে মিলিয়া খেলা করো, সংসারের সমস্ত ভার আমি লইলাম।'

হায়, আজ কোথায় সে বল যে বলে হরসুন্দরী মনে করিয়াছিলো স্বামীর জন্য চিরজীবনকাল সে আপনার প্রেমের দাবির অর্ধেক অংশ অকাতরে ছাড়িয়া দিতে পারিবে। হঠাৎ একদিন পূর্ণিমার রাত্রে জীবনে যখন জোয়ার আসে দুই কূল প্লাবিত করিয়া, মানুষ মনে করে, 'আমার কোথাও সীমা নাই।' তখন যে একটা বৃহৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে জীবনের সুদীর্ঘ ভাঁটার সময় সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে তাহার সমস্ত প্রাণে টান পড়ে। হঠাৎ ঐশ্বর্যের দিনে লেখনীর এক আঁচড়ে যে দানপত্র লিখিয়া দেয়, চিরদারিদ্র্যের দিনে পলে পলে তিল তিল করিয়া তাহা শোধ করিতে হয়। তখন বুঝা যায়, মানুষ বড়ো দুর্বল, তাহার ক্ষমতা যৎসামান্য।

দীর্ঘ রোগাবসানে ক্ষীণ রক্তহীন পাণ্ডু কলেবরে হরসুন্দরী সেদিন শুক্ল দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো একটি শীর্ণ রেখামাত্র ছিলো, সংসারে নিতান্ত লঘু হইয়া ভাসিতেছিলো। মনে হইয়াছিলো, 'আমার যেন কিছুই না হইলেও চলে।' ক্রমে শরীর বলী হইয়া উঠিলো, রক্তের তেজ বাড়িতে লাগিলো, তখন হরসুন্দরীর মনে কোথা হইতে একদল শরিক আসিয়া উপস্থিত হইলো, তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিলো, 'তুমি তো ত্যাগপত্র লিখিয়া বসিয়া আছো, কিন্তু আমাদের দাবি আমরা ছাড়িবো না।'

হরসুন্দরী যেদিন প্রথম পরিষ্কাররূপে আপন অবস্থা বুঝিতে পারিলো সেদিন নিবারণ ও শৈলবালাকে আপন শয়নগৃহ ছাড়িয়া দিয়া ভিন্ন গৃহে একাকিনী গিয়া শয়ন করিলো।

আট বৎসর বয়সে বাসররাত্রে যে শয্যায় প্রথম শয়ন করিয়াছিলো, আজ সাতাশ বৎসর পরে, সেই শয্যা ত্যাগ করিলো। প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া এই সধবা রমণী যখন অসহ্য হৃদয়ভার লইয়া তাহার নূতন বৈধব্যশয্যার উপরে আসিয়া পড়িলো তখন গলির অপর প্রান্তে একজন শৌখিন যুবা বেহাগ রাগিণীতে মালিনীর গান গাহিতেছিলো ; আর-একজন বাঁয়া-তবলায় সংগত করিতেছিলো এবং শ্রোতৃবন্ধুগণ সমের কাছে হা-হাঃ করিয়া উঠিতেছিলো।

তাহার সেই গান সেই নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নারাত্রে পার্শ্বের ঘরে মন্দ শুনাইতেছিলো না। তখন বালিকা শৈলবালার ঘুমে চোখ ঢুলিয়া পড়িতেছিলো, আর

নিবারণ তাহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া ধীরে ধীরে ডাকিতেছিলো, 'সই!'

লোকটি ইতিমধ্যে বঙ্কিমবাবুর চন্দ্রশেখর পড়িয়া ফেলিয়াছে এবং দুই-একজন আধুনিক কবির কাব্যও শৈলবালাকে পড়িয়া শুনাইয়াছে।

নিবারণের জীবনের নিম্নস্তরে যে একটি যৌবন-উৎস বরাবর চাপা পড়িয়া ছিলো আঘাত পাইয়া হঠাৎ বড়ো অসময়ে তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলো। কেহই সেজন্য প্রস্তুত ছিলো না, এই হেতু অকস্মাৎ তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি এবং সংসারের সমস্ত বন্দোবস্ত উল্টাপাল্টা হইয়া গেল। সে বেচারা কোনোকালে জানিতো না, মানুষের ভিতরে এমন-সকল উপদ্রবজনক পদার্থ থাকে, এমন-সকল দুর্দাম দুরন্ত শক্তি যাহা সমস্ত হিসাব-কিতাব শৃঙ্খলা-সামঞ্জস্য একেবারে নয়-ছয় করিয়া দেয়।

কেবল নিবারণ নহে, হরসুন্দরীও একটা নূতন বেদনার পরিচয় পাইলো। এ কিসের আকাঙ্ক্ষা, এ কিসের দুঃসহ যন্ত্রণা। মন এখন যাহা চায় কখনো তো তাহা চাহেও নাই, কখনো তো তাহা পায়ও নাই। যখন ভদ্রভাবে নিবারণ নিয়মিত আপিসে যাইতো, যখন নিদ্রার পূর্বে কিয়ৎকালের জন্য গয়লার হিসাব, দ্রব্যের মহার্ঘতা এবং লৌকিকতার কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা চলিতো, তখন তো এই অন্তরবিপ্লবের সূত্রপাতমাত্র ছিলো না। ভালোবাসিতো বটে, কিন্তু তাহার কোনো উজ্জ্বলতা, কোনো উত্তাপ ছিলো না। সে ভালো-বাসা অপ্রজ্বলিত ইন্ধনের মতো ছিলো মাত্র।

আজ তাহার মনে হইলো, জীবনের সফলতা হইতে যেন চিরকাল কে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে। তাহার হৃদয় যেন চিরদিনই উপবাসী হইয়া আছে। তাহার এই নারী-জীবন বড়ো দারিদ্র্যেই কাটিয়াছে। সে কেবল হাটবাজার পানমসলা তরিতরকারির ঝঞ্ঝাট লইয়াই সাতাশটা অমূল্য বৎসর দাসীবৃত্তি করিয়া কাটাইলো, আর আজ জীবনের মধ্যপথে আসিয়া দেখিলো তাহারই শয়নকক্ষের পার্শ্বে এক গোপন মহামহৈশ্বর্যভাণ্ডারের কুলুপ খুলিয়া একটি ক্ষুদ্র বালিকা একেবারে রাজ-রাজেশ্বরী হইয়া বসিলো। নারী দাসী বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে নারী রানীও বটে; কিন্তু, ভাগাভাগি করিয়া একজন নারী হইলো দাসী, আর-একজন নারী হইলো রানী, তাহাতে দাসীর গৌরব গেল, রানীর সুখ রহিলো না।

কারণ, শৈলবালাও নারী-জীবনের যথার্থ সুখের স্বাদ পাইলো না। এতো অবিশ্রাম আদর পাইলো যে, ভালোবাসিবার আর মুহূর্ত অবসর রহিলো না। সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হইয়া, সমুদ্রের মধ্যে আত্মবিসর্জন করিয়া, বোধ-করি নদীর একটি মহৎ চরিতার্থতা আছে; কিন্তু সমুদ্র যদি জোয়ারের টানে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমাগতই নদীর উন্মুখীন হইয়া রহে, তবে নদী কেবল নিজের মধ্যেই নিজে স্ফীত হইতে থাকে। সংসার তাহার সমস্ত আদর-সোহাগ লইয়া দিবারাত্রি শৈলবালার দিকে অগ্রসর হইয়া রহিলো, তাহাতে শৈলবালার আত্মাদর অতিশয় উত্তুঙ্গ হইয়া উঠিতে লাগিলো, সংসারের প্রতি তাহার ভালোবাসা পড়িতে পাইলো না। সে জানিলো, 'আমার জন্যই সমস্ত এবং আমি কাহার জন্যও নহি।' এ অবস্থায় যথেষ্ট অহংকার আছে, কিন্তু পরিতৃপ্তি কিছুই নাই।

৪

একদিন ঘনঘোর মেঘ করিয়া আসিয়াছে। এমনি অন্ধকার করিয়াছে যে, ঘরের মধ্যে কাজকর্ম করা অসাধ্য। বাহিরে ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। কুলগাছের তলায় লতাগুল্মের জঙ্গল জলে প্রায় নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং প্রাচীরের পার্শ্ববর্তী নালা দিয়া ঘোলা জলস্রোত কল্‌কল্ শব্দে বহিয়া চলিয়াছে। হরসুন্দরী আপনার নূতন শয়নগৃহের নির্জন অন্ধকারে জানলার কাছে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

এমন সময় নিবারণ চোরের মতো ধীরে ধীরে দ্বারের কাছে প্রবেশ করিলো, ফিরিয়া যাইবে কি অগ্রসর হইবে ভাবিয়া পাইলো না। হরসুন্দরী তাহা লক্ষ্য করিলো কিন্তু একটি কথাও কহিলো না।

তখন নিবারণ হঠাৎ একেবারে তীরের মতো হরসুন্দরীর পার্শ্বে গিয়া এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিলো, 'গোটাকয় গহনার আবশ্যক হইয়াছে। জানো তো, অনেক দেনা হইয়া পড়িয়াছে, পাওনাদার বড়োই অপমান করিতেছে—কিছু বন্ধক রাখিতে হইবে—শীঘ্রই ছাড়াইয়া লইতে পারিবো।'

হরসুন্দরী কোনো উত্তর দিলো না, নিবারণ চোরের মতো দাঁড়াইয়া রহিলো! অবশেষে পুনশ্চ কহিলো, 'তবে কি আজ হইবে না।'

হরসুন্দী কহিলো, 'না।'

ঘরে প্রবেশ করাও যেমন শক্ত ঘর হইতে অবিলম্বে বাহির হওয়াও তেমনি কঠিন। নিবারণ একটু এ-দিকে ও-দিকে চাহিয়া ইতস্তত করিয়া বলিলো, 'তবে অন্যত্র চেষ্টা দেখি গে, যাই।'

ঋণ কোথায় এবং কোথায় গহনা বন্ধক দিতে হইবে হরসুন্দরী তাহা সমস্তই বুঝিলো। বুঝিলো, নববধূ পূর্বরাত্রে তাহার এই হতবুদ্ধি-পোষা পুরুষটিকে অত্যন্ত ঝংকার দিয়া বলিয়াছিলো, 'দিদির সিন্দুকভরা গহনা, আর আমি বুঝি একখানি পরিতে পাই না।'

নিবারণ চলিয়া গেলে ধীরে ধীরে উঠিয়া লোহার সিন্দুক খুলিয়া হরসুন্দরী সমস্ত গহনা বাহির করিলো। শৈলবালাকে ডাকিয়া প্রথমে আপনার বিবাহের বেনারশি শাড়িখানি পরাইলো, তাহার পর তাহার আপাদমস্তক এক একখানি করিয়া গহনায় ভরাইয়া দিলো। ভালো করিয়া চুল বাঁধিয়া দিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দেখিলো, বালিকার মুখখানি বড়ো সুমিষ্ট, একটি সদ্য পক্ব সুগন্ধ ফলের মতো নিটোল রসপূর্ণ। শৈলবালা যখন ঝম্ ঝম্ শব্দ করিয়া চলিয়া গেল সেই শব্দ বহুক্ষণ ধরিয়া হরসুন্দরীর শিরার রক্তের মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করিয়া বাজিতে লাগিলো। মনে মনে কহিলো, 'আজ আর কী লইয়া তোতে আমাতে তুলনা হইবে। কিন্তু এক সময়ে আমারও তো ওই বয়স ছিলো, আমিও তো অমনি যৌবনের শেষ রেখা পর্যন্ত ভরিয়া উঠিয়াছিলাম, তবে আমাকে সে-কথা কেহ জানায় নাই কেন। কখন সেদিন আসিলো এবং কখন সেদিন গেল তাহা একবার সংবাদও পাইলাম না।' কিন্তু কী গর্বে, কী গৌরবে, কী তরঙ্গ তুলিয়াই শৈলবালা চলিয়াছে।

হরসুন্দরী যখন কেবলমাত্র ঘরকন্নাই জানিতো তখন এই গহনাগুলি তাহার কাছে কতো দামী ছিলো। তখন কি নির্বোধের মতো এ-সমস্ত এমনি করিয়া এক মুহূর্তে হাতছাড়া করিতে পারিতো। এখন ঘরকন্না ছাড়া আর-একটা বড়ো কিসের পরিচয় পাইয়াছে; এখন গহনার দাম, ভবিষ্যতের হিসাব, সমস্ত তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে।

আর, শৈলবালা সোনামানিক ঝক্‌মক্ করিয়া শয়নগৃহে চলিয়া গেলো, একবার মুহূর্তের তরে ভাবিলও না হরসুন্দরী তাহাকে কতখানি দিলো। সে

জানিলো, চতুর্দিক হইতে সমস্ত সেবা, সমস্ত সম্পদ, সমস্ত সৌভাগ্য স্বাভাবিক নিয়মে তাহার মধ্যে আসিয়া পরিসমাপ্ত হইবে ; কারণ সে হইলো শৈলবালা, সে হইলো সই।

৫

এক-একজন লোক স্বপ্নাবস্থায় নির্ভীকভাবে অত্যন্ত সংকটের পথ দিয়া চলিয়া যায়, মুহূর্তমাত্র চিন্তা করে না। অনেক জাগ্রত মানুষেরও তেমনি চিরস্বপ্নাবস্থা উপস্থিত হয় ; কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না, বিপদের সংকীর্ণ পথ দিয়া নিশ্চিন্তমনে অগ্রসর হইতে থাকে, অবশেষে নিদারুণ সর্বনাশের মধ্যে গিয়া জাগ্রত হইয়া উঠে।

আমাদের ম্যাক্‌মোরান কোম্পানির হেড্‌বাবুটিরও সেই দশা। শৈলবালা তাহার জীবনের মাঝখানে একটা প্রবল আবর্তের মতো ঘুরিতে লাগিলো এবং বহুদূর হইতে বিবিধ মহার্ঘ পদার্থে আকৃষ্ট হইয়া তাহার মধ্যে বিলুপ্ত হইতে লাগিলো। কেবল যে নিবারণের মনুষ্যত্ব এবং মাসিক বেতন, হরসুন্দরীর সুখ-সৌভাগ্য এবং বসনভূষণ তাহা নহে ; সঙ্গে সঙ্গে ম্যাক্‌মোরান কোম্পানির ক্যাশ্‌ তহবিলেও গোপনে টান পড়িলো। তাহার মধ্য হইতেও দুটি-একটি করিয়া তোড়া অদৃশ্য হইতে লাগিলো। নিবারণ স্থির করিতো, 'আগামী মাসের বেতন হইতে আস্তে আস্তে শোধ করিয়া রাখিবো।' কিন্তু আগামী মাসের বেতনটি হাতে আসিবামাত্র সেই আবর্ত হইতে টান পড়ে এবং শেষ দু-আনিটি পর্যন্ত চকিতের মতো চিক্‌মিক্‌ করিয়া বিদ্যুৎবেগে অন্তর্হিত হয়।

শেষে একদিন ধরা পড়িলো। পুরুষানুক্রমের চাকুরি। সাহেব বড়ো ভালোবাসে—তহবিল পূরণ করিয়া দিবার জন্য দুইদিন মাত্র সময় দিলো।

কেমন করিয়া সে ক্রমে ক্রমে আড়াই হাজার টাকার তহবিল ভাঙিয়াছে তাহা নিবারণ নিজেই বুঝিতে পারিলো না। একেবারে পাগলের মতো হইয়া হরসুন্দরীর কাছে গেল, বলিলো, 'সর্বনাশ হইয়াছে।'

হরসুন্দরী সমস্ত শুনিয়া একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

নিবারণ কহিলো, 'শীঘ্র গহনাগুলি বাহির করো।'

হরসুন্দরী কহিলো, 'সে তো আমি সমস্ত ছোটোবউকে দিয়াছি।'

নিবারণ নিতান্ত শিশুর মতো অধীর হইয়া বলিতে লাগিলো, 'কেন দিলে ছোটোবউকে। কেন দিলে। কে তোমাকে দিতে বলিলো।'

হরসুন্দরী তাহার প্রকৃত উত্তর না দিয়া কহিলো, 'তাহাতে ক্ষতি কী হইয়াছে। সে তো আর জলে পড়ে নাই।'

ভীরু নিবারণ কাতর স্বরে কহিলো, 'তবে যদি তুমি কোনো ছুতা করিয়া তাহার কাছ হইতে বাহির করিতেপারো, দেখো। কিন্তু আমার মাথা খাও, বলিয়ো না যে, আমি চাহিতেছি কিংবা কী জন্য চাহিতেছি।'

তখন হরসুন্দরী মর্মান্তিক বিরক্তি ও ঘৃণা-ভরে বলিয়া উঠিলো, 'এই কি তোমার ছলছুতা করিবার, সোহাগ দেখাইবার সময়। চলো।' বলিয়া স্বামীকে লইয়া ছোটোবউয়ের ঘরে প্রবেশ করিলো।

ছোটোবউ কিছু বুঝিলো না। সে সকল কথাতেই বলিলো, 'সে আমি কী জানি।'

সংসারের কোনো চিন্তা যে তাহাকে কখনো ভাবিতে হইবে এমন কথা কি তাহার সহিত ছিলো। সকলে আপনার ভাবনা ভাবিবে এবং সকলে মিলিয়া শৈলবালার আরাম চিন্তা করিবে, অকস্মাৎ ইহার ব্যতিক্রম হয়, এ কী ভয়ানক অন্যায়।

তখন নিবারণ শৈলবালার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িলো। শৈলবালা কেবলই বলিলো, 'সে আমি জানি না। আমার জিনিস আমি কেন দিবো।'

নিবারণ দেখিলো, ওই দুর্বল ক্ষুদ্র সুন্দর সুকুমারী বালিকাটি লোহার সিন্দুকের অপেক্ষাও কঠিন। হরসুন্দরী সংকটের সময় স্বামীর এই দুর্বলতা দেখিয়া ঘৃণায় জর্জরিত হইয়া উঠিলো। শৈলবালার চাবি বলপূর্বক কাড়িয়া লইতে গেল। শৈলবালা তৎক্ষণাৎ চাবির গোছা প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পুষ্করিণীর মধ্যে ফেলিয়া দিলো।

হরসুন্দরী হতবুদ্ধি স্বামীকে কহিলো, 'তালা ভাঙিয়া ফেলো-না।'

শৈলবালা প্রশান্তমুখে বলিলো, 'তাহা হইলে আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিবো।'

নিবারণ কহিলো, 'আমি আর-একটা চেষ্টা দেখিতেছি।' বলিয়া এলোথেলো বেশে বাহির হইয়া গেল।

নিবারণ ছুই ঘণ্টার মধ্যেই পৈতৃক বাড়ি আড়াই হাজার টাকায় বিক্রয় করিয়া আসিলো।

বহু কষ্টে হাতে বেড়িটা বাঁচিলো, কিন্তু চাকরি গেল। স্থাবর-জঙ্গমের মধ্যে রহিলো কেবল দুটিমাত্র স্ত্রী। তাহার মধ্যে ক্লেশকাতর বালিকা স্ত্রীটি গর্ভবতী হইয়া নিতান্ত স্থাবর হইয়াই পড়িলো। গলির মধ্যে একটি ছোটো স্যাঁৎসেঁতে বাড়িতে এই ক্ষুদ্র পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করিলো।

৬

ছোটোবউয়ের অসন্তোষ এবং অসুখের আর শেষ নাই! সে কিছুতেই বুঝিতে চায় না যে, তাহার স্বামীর ক্ষমতা নাই। ক্ষমতা নাই যদি তো বিবাহ করিলো কেন।

উপরের তলায় কেবল দুটিমাত্র ঘর। একটি ঘরে নিবারণ ও শৈলবালার শয়নগৃহ। আর-একটি ঘরে হরসুন্দরী থাকে। শৈলবালা খুঁৎখুঁৎ করিয়া বলে, 'আমি দিনরাত্রি শোবার ঘরে কাটাইতে পারি না।'

নিবারণ মিথ্যা আশ্বাস দিয়া বলিতো, 'আমি আর-একটা ভালো বাড়ির সন্ধানে আছি, শীঘ্র বাড়ি বদল করিবো।'

শৈলবালা বলিতো, 'কেন, ওই তো পাশে আর-একটা ঘর আছে।'

শৈলবালা তাহার পূর্ব-প্রতিবেশিনীদের দিকে কখনো মুখ তুলিয়া চাহে নাই। নিবারণের বর্তমান দুরবস্থায় ব্যথিত হইয়া তাহারা একদিন দেখা করিতে আসিলো ; শৈলবালা ঘরে খিল দিয়া বসিয়া রহিলো, কিছুতেই দ্বার খুলিলো না। তাহারা চলিয়া গেলে রাগিয়া, কাঁদিয়া, উপবাসী থাকিয়া, হিস্‌টিরিয়া করিয়া পাড়া মাথায় করিলো। এমনতরো উৎপাত প্রায়ই ঘটিতে লাগিলো।

অবশেষে শৈলবালার শারীরিক সংকটের অবস্থায় গুরুতর পীড়া হইলো, এমনকি গর্ভপাত হইবার উপক্রম হইলো।

নিবারণ হরসুন্দরীর দুই হাত ধরিয়া বলিলো, 'তুমি শৈলকে বাঁচাও।'

হরসুন্দরী দিন-রাত্রি শৈলবালার সেবা করিতে লাগিলো। তিলমাত্র ত্রুটি হইলে শৈল তাহাকে দুর্বাক্য বলিতো, সে একটি উত্তরমাত্র করিতো না।

শৈল কিছুতেই সাগু খাইতে চাহিতো না, বাটিসুদ্ধ ছুঁড়িয়া ফেলিতো, জ্বরের সময় কাঁচা অম্বল দিয়া ভাত খাইতে চাহিতো। না পাইলে রাগিয়া, কাঁদিয়া, অনর্থপাত করিতো। হরসুন্দরী তাহাকে 'লক্ষ্মী আমার' 'বোন আমার' 'দিদি আমার' বলিয়া শিশুর মতো ভুলাইতে চেষ্টা করিতো।

কিন্তু শৈলবালা বাঁচিলো না। সংসারের সমস্ত সোহাগ আদর লইয়া পরম অসুখ ও অসন্তোষে বালিকার ক্ষুদ্র জীবন অকালে নষ্ট হইয়া গেল।

৭

নিবারণের প্রথমে খুব একটা আঘাত লাগিলো ; পরক্ষণেই দেখিলো তাহার একটা মস্ত বাঁধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে। শোকের মধ্যেও হঠাৎ তাহার একটা মুক্তির আনন্দ বোধ হইলো। হঠাৎ মনে হইলো এতদিন তাহার বুকের উপর একটা দুঃস্বপ্ন চাপিয়া ছিলো। চৈতন্য হইয়া মুহূর্তের মধ্যে জীবন নিরতিশয় লঘু হইয়া গেল। মাধবীলতাটির মতো এই-যে কোমল জীবনপাশ ছিঁড়িয়া গেল এই কি তাহার আদরের শৈলবালা। হঠাৎ নিশ্বাস টানিয়া দেখিলো, না, সে তাহার উদ্‌বন্ধনরজ্জু।

আর, তাহার চিরজীবনের সঙ্গিনী হরসুন্দরী? দেখিলো, সেই তো তাহার সমস্ত সংসার একাকিনী অধিকার করিয়া, জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখের স্মৃতি-মন্দিরের মাঝখানে বসিয়া আছে—কিন্তু তবু মধ্যে একটা বিচ্ছেদ। যেন একটি ক্ষুদ্র উজ্জ্বল সুন্দর নিষ্ঠুর ছুরি আসিয়া একটি হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ এবং বাম অংশের মাঝখানে বেদনাপূর্ণ বিদারণরেখা টানিয়া দিয়া গেছে।

একদিন গভীর রাত্রে সমস্ত শহর যখন নিদ্রিত, নিবারণ ধীরে ধীরে হরসুন্দরীর নিভৃত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলো। নীরবে সেই পুরাতন নিয়ম-মতো সেই পুরাতন শয্যার দক্ষিণ অংশ গ্রহণ করিয়া শয়ন করিলো। কিন্তু, এবার তাহার সেই চির অধিকারের মধ্যে চোরের মতো প্রবেশ করিলো।

হরসুন্দরীও একটি কথা বলিলো না, নিবারণও একটি কথা বলিলো না। উহারা পূর্বে যেরূপ পাশাপাশি শয়ন করিতো এখনও সেইরূপ পাশাপাশি শুইলো ; কিন্তু ঠিক মাঝখানে একটি মৃত বালিকা শুইয়া রহিলো, তাহাকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিলো না।

আহুতি

প্রমথ চৌধুরী

ইউরোপীয় সভ্যতা আজ পর্যন্ত আমাদের গ্রামের বুকের ভিতর তার শিং ঢুকিয়ে দেয়নি ; অর্থাৎ রেলের রাস্তা সে গ্রামকে দূর থেকে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। কাজেই কলকাতা থেকে বাড়ি যেতে অভ্যাবধি কতক পথ আমাদের সেকেলে যানবাহনের সাহায্যেই যেতে হয় ; বর্ষাকালে নৌকা, আর শীত-গ্রীষ্মে পাল্কিই হচ্ছে আমাদের প্রধান অবলম্বন।

এই স্থলপথ আর জলপথ ঠিক উল্টো উল্টো দিকে। আমি বরাবর নৌকাযোগেই বাড়ি যাতায়াত করতুম, তাই এই স্থলপথের সঙ্গে বহুদিন যাবৎ আমার কোনই পরিচয় ছিলো না। তারপর যে বৎসর আমি বি. এ. পাশ করি, সে বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে কোনও বিশেষ কার্যোপলক্ষে আমাকে একবার দেশে যেতে হয় ; অবশ্য স্থলপথে। এই যাত্রায় যে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিলো, তোমাদের কাছে আজ তারই পরিচয় দেবো।

আমি সকাল ছ'টায় ট্রেন থেকে নেমে দেখি, আমার জন্য স্টেশনে পাল্কি-বেহারা হাজির রয়েছে। পাল্কি দেখে তার অন্তরে প্রবেশ করবার যে বিশেষ লোভ হয়েছিলো, তা বলতে পারিনে। কেননা চোখের আন্দাজে বুঝলুম যে, সেখানি প্রস্থে দেড় হাত আর দৈর্ঘ্যে তিন হাতের চাইতেও কম। তারপর বেহারাদের চেহারা দেখে আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। এমন অস্থিচর্মসার মানুষ, অন্য কোনও দেশে বোধহয় হাঁসপাতালের বাইরে দেখা যায় না। প্রায় সকলেরি পাঁজরার হাড় ঠেলে বেরিয়েছে, হাত-পায়ের মাংস সব দড়ি পাকিয়ে গিয়েছে। প্রথমেই চোখে পড়ে যে, এদের শরীরের একটিমাত্র অঙ্গ—উদর—অস্বাভাবিক-রকম স্ফীতি ও চাকচিক্য লাভ করেছে। আমি ডাক্তার না হলেও, অনুমানে বুঝলুম যে, তার অভ্যন্তরে পীলে ও যকৃত

পরস্পর পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে। মনে পড়ে গেল বৃহদারণ্যক উপনিষদে পড়েছিলুম যে, অশ্বমেধের অশ্বের "যকৃচ্চ ক্লোমানশ্চ পর্বতা"। পীলে ও যকৃত নামক মাংসপিণ্ড দুটিকে পর্বতের সঙ্গে তুলনা করা যে অসঙ্গত নয়, এই প্রথম আমি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলুম। মানুষের দেহ যে কতদূর শ্রীহীন, শক্তিহীন হতে পারে, তার চাক্ষুষ পরিচয় পেয়ে আমি মনে মনে লজ্জিত হয়ে পড়লুম; এরকম দেহ মনুষ্যত্বকে প্রকাশ্যে অপমান করে। অথচ আমাদের গ্রামের হিন্দুর বীরত্ব এই সব দেহ আশ্রয় করেই টিঁকে আছে। এরা জাতিতে অস্পৃশ্য হলেও হিন্দু—শরীরে অশক্ত হলেও বীর। কেননা শিকার এদের জাত ব্যবসা। এরা বর্শা দিয়ে শুয়োর মারে, বনে ঢুকে জঙ্গল ঠেঙিয়ে বাঘ বার করে; অবশ্য উদরান্নের জন্য। এদের তুলনায়, মাথায় লাল পাগড়ি ও গায়ে সাদা চাপকান পরা—আমার দর্শনধারী সঙ্গী ভোজপুরী দরওয়ানটিকে রাজপুত্রের মতো দেখাচ্ছিলো।

এই সব কৃষ্ণের জীবদের কাঁধে চড়ে, বিশ মাইল পথ যেতে প্রথমে আমার নিতান্ত অপ্রবৃত্তি হয়েছিলো। মনে হলো এই সব জীর্ণ-শীর্ণ জীবন্মৃত হতভাগ্যদের স্কন্ধে আমার দেহের ভার চাপানোটা নিতান্ত নিষ্ঠুরতার কাজ হবে। আমি পাল্কিতে চড়তে ইতস্তত করছি দেখে, বাড়ি থেকে যে মুসলমান সর্দারটি এসেছিলো, সে হেসে বললে, 'হুজুর, উঠে পড়ুন, কিছু কষ্ট হবে না। আর দেরি করলে বেলা চারটের মধ্যে বাড়ি পৌঁছতে পারবেন না।'

দশ ক্রোশ পথ যেতে দশ ঘণ্টা লাগবে, এ কথা শুনে আমার পাল্কি চড়বার উৎসাহ যে বেড়ে গেল, অবশ্য তা নয়। তবুও আমি 'দুর্গা' বলে হামাগুড়ি দিয়ে সেই প্যাকবাক্সের মধ্যে ঢুকে পড়লুম, কেননা তা ছাড়া উপায়ান্তর ছিলো না। বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যে মনকে বুঝিয়ে দিয়েছিলুম যে, মানুষের স্কন্ধে আরোহণ করে যাত্রা করায় পাপ নেই। আমরা, ধনী-লোকেরা পৃথিবীর দরিদ্র লোকদের কাঁধে চড়েই তো জীবনযাত্রা নির্বাহ করছি। আর পৃথিবীতে যে স্বল্পসংখ্যক ধনী এবং অসংখ্য দরিদ্র ছিলো, আছে, থাকবে এবং থাকা উচিত, এইতো 'পলিটিকাল ইকনমির' শেষ কথা। Conscienceকে ঘুম পাড়াবার কতো-না মন্ত্রই আমরা শিখেছি!

অতঃপর পাল্কি চলতে শুরু করলো।

সর্দারজী আশা দিয়েছিলেন যে, হুজুরের কোনই কষ্ট হবে না। কিন্তু সে আশা যে 'দিলাশা' মাত্র, তা বুঝতে আমার বেশিক্ষণ লাগেনি। কেননা, হুজুরের সুস্থ শরীর ইতিপূর্বে কখনও এতটা ব্যতিব্যস্ত হয়নি। পাল্কির আয়তনের মধ্যে দেহায়তন খাপ খাওয়াবার বৃথা চেষ্টায় আমার শরীরের যে ব্যস্তসমস্ত অবস্থা হয়েছিলো, তাকে শোয়াও বলা চলে না, বসাও বলা চলে না। শালগ্রামের শোওয়া-বসা দুই এক হলেও মানুষের অবশ্য তো নয়। কাজেই এ দুয়ের ভিতর যেটি হোক একটি আসন গ্রহণ করবার জন্য আমাকে অবিশ্রাম কসরৎ করতে হচ্ছিলো। কুচিমোড়া না ভেঙে বীরাসন ত্যাগ করে পদ্মাসন গ্রহণ করবার জো ছিলো না, অথচ আমাকে বাধ্য হয়ে মিনিটে মিনিটে আসন পরিবর্তন করতে হচ্ছিলো। আমার বিশ্বাস, এ অবস্থায় হঠযোগীরাও একস্থানে বহুক্ষণ স্থায়ী হতে পারতেন না, কেননা পৃষ্ঠদণ্ড ঋজু করবামাত্র, পাল্কির ছাদ সজোরে মস্তকে চপেটাঘাত করছিলো। ফলে, গুরুজনের সুমুখে কুলবধুর মতো, আমাকে কুব্জপৃষ্ঠে নতশিরে অবস্থিতি করতে হয়েছিলো। নাভিপদ্মে মনঃসংযোগ করবার এমন সুযোগ আমি পূর্বে কখনও পাইনি; কিন্তু অভ্যাসদোষে আমার বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তিকে সংক্ষিপ্ত করে নাভি-বিবরে সুনিবিষ্ট করতে পারলুম না।

শরীরের এই বিপর্যস্ত অবস্থাতে আমি অবশ্য কাতর হয়ে পড়িনি। তখন আমার নবযৌবন। দেহ তার স্থিতিস্থাপকতা-ধর্ম তখনও হারিয়ে বসেনি। বরং সত্য কথা বলতে গেলে, নিজ দেহের এই সব অনিচ্ছাকৃত অঙ্গভঙ্গী দেখে আমার শুধু হাসি পাচ্ছিলো। এই যাত্রার মুখে পূর্বদিক থেকে যে আলো ও বাতাস ধীরে ধীরে বয়ে আসছিলো, তার দর্শনে ও স্পর্শনে আমার মন উৎফুল্ল উল্লসিত হয়ে উঠেছিলো; সে বাতাস যেমন সুখস্পর্শ, সে আলো তেমনি প্রিয়দর্শন। দিনের এই নব-জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে আমার নয়ন মন সব জেগে উঠেছিলো। আমি একদৃষ্টে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলুম। চারিদিকে শুধু মাঠ ধূ-ধূ করছে, ঘর নেই দোর নেই, গাছ নেই পালা নেই, শুধু মাঠ—অফুরন্ত মাঠ—আগাগোড়া সমতল ও সমরূপ, আকাশের মতো বাধাহীন এবং ফাঁকা। কলকাতার ইট-কাঠের পায়রার খোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃতির এই অসীম উদারতার মধ্যে আমার অন্তরাত্মা মুক্তির আনন্দ অনুভব

করতে লাগলো। আমার মন থেকে সব ভাবনা-চিন্তা ঝরে গিয়ে সে মন ঐ আকাশের মতো নির্বিকার ও প্রসন্নরূপ ধারণ করলে—তার মধ্যে যা ছিলো, সে হচ্ছে আনন্দের ঈষৎ রক্তিম আভা। কিন্তু এ আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না, কেননা দিনের সঙ্গে রোদ, প্রকৃতির গায়ের জ্বরের মতো বেড়ে উঠতে লাগলো, আকাশ বাতাসের উত্তাপ, দেখতে দেখতে একশো পাঁচ ডিগ্রীতে চড়ে গেল। যখন বেলা প্রায় ন'টা বাজে, তখন দেখি বাইরের দিকে আর চাওয়া যায় না; আলোয় চোখ ঝলসে যাচ্ছে। আমার চোখ একটা কিছু সবুজ পদার্থের জন্য লালায়িত হয়ে দিগদিগন্তে তার অন্বেষণ করে এখানে-ওখানে দুটি-একটি বাবলা গাছের সাক্ষাৎ লাভ করলে। বলা বাহুল্য, এতে চোখের পিপাসা মিটলো না, কেননা এ গাছের আর যে গুণই থাক, এর গায়ে শ্যামল-শ্রী নেই, পায়ের নীচে নীল ছায়া নেই। এই তরুহীন, পত্রহীন, ছায়াহীন পৃথিবী আর মেঘমুক্ত রৌদ্রপীড়িত আকাশের মধ্যে ক্রমে একটি বিরাট অবসাদের মূর্তি ফুটে উঠলো। প্রকৃতির এই একঘেয়ে চেহারা আমার চোখে আর সহ্য হলো না। আমি একখানি বই খুলে পড়বার চেষ্টা করলুম। সঙ্গে Meredith-এর Egoist এনেছিলুম, তার শেষ চ্যাপ্টার পড়তে বাকী ছিলো। একটানা দু'চার পাতা পড়ে দেখি তার শেষ চ্যাপ্টার তার প্রথম চ্যাপ্টার হয়ে উঠেছে—অর্থাৎ তার একবর্ণও আমার মাথায় ঢুকলো না। বুঝলুম, পাল্কির অবিশ্রাম ঝাঁকুনিতে আমার মস্তিষ্ক বেবাক ঘুলিয়ে গেছে। আমি বই বন্ধ করে পাল্কি-বেহারাদের একটু চাল বাড়াতে অনুরোধ করলুম, এবং সেই সঙ্গে বকশিষের লোভ দেখালুম। এতে ফল হলো। অর্ধেক পথে যে গ্রামটিতে আমাদের বিশ্রাম করবার কথা ছিলো, সেখানে বেলা সাড়ে দশটায়, অর্থাৎ মেয়াদের আধঘণ্টা আগে গিয়ে পৌঁছলুম।

এই মরুভূমির ভিতর এই গ্রামটি যে ওয়েসিসের একটা খুব নয়নাভিরাম এবং মনোরম উদাহরণ, তা বলতে পারিনে। মধ্যে একটি ডোবা, আর তার তিন পাশে একতলা সমান উঁচু পাড়ের উপর খান দশ-বারো খড়ো ঘর, আর এক পাশে একটি অশত্থ গাছ। সেই গাছের নীচে পাল্কি নামিয়ে, বেহারারা ছুটে গিয়ে সেই ডোবায় ডুব দিয়ে উঠে, ভিজে কাপড়েই চিড়ে-দইয়ের ফলার করতে বসলো। পাল্কি দেখে গ্রাম-বধূরা সব পাড়ের উপরে

আহুতি

এসে কাতার দিয়ে দাঁড়ালো। এই পল্লী-বধূদের সম্বন্ধে কবিতা লেখা কঠিন, কেননা এদের আর যাই থাক—রূপও নেই, যৌবনও নেই। যদি, বা কারও রূপ থাকে তো, তা কৃষ্ণবর্ণে ঢাকা পড়েছে, যদি, বা কারও যৌবন থাকে তো, তা মলিন বসনে চাপা পড়েছে। এদের পরনের কাপড় এতো ময়লা যে, তাতে চিমটি কাটলে একতাল মাটি উঠে আসে। যা বিশেষ করে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো, সে হচ্ছে তাদের হাতের পায়ের রূপোর গহনা। একযোড়া চুড় আমার চোখে পড়লো, যার তুল্য সুশ্রী গড়ন একালের গহনায় দেখতে পাওয়া যায় না। এই থেকে প্রমাণ পেলুম যে, বাঙলার নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের দেহে সৌন্দর্য না থাক, সেই শ্রেণীর পুরুষের হাতে আর্ট আছে।

ঘণ্টা আধেক বাদে আমরা আবার রওনা হলুম্। পাল্কি অতি ধীরে সুস্থে চলতে লাগলো, কেননা ভূরিভোজনের ফলে আমার বাহকদের গতি আপন্নসত্বা স্ত্রীলোকের তুল্য মৃদুমন্থর হয়ে এসেছিলো। ইতিমধ্যে আমার শরীর মন ইন্দ্রিয় পঞ্চপ্রাণ প্রভৃতি এতটা ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিলো যে, আমি চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করলুম। ক্রমে জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর রোদ্দুর এবং পাল্কির দোলার প্রসাদে আমার তন্দ্রা এলো ; সে তন্দ্রা কিন্তু নিদ্রা নয়। আমার শরীর যেমন শোওয়া-বসা এ দুয়ের মাঝামাঝি একটা অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলো, আমার মনও তেমনি সুপ্তি ও জাগরণের মাঝামাঝি একটা অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলো। এই অবস্থায় ঘণ্টা দুয়েক কেটে গেল। তারপর পাল্কির একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় আমি জেগে উঠলুম, সে ধাক্কার বেগ এতই বেশি যে, তা আমার দেহের ষট্‌চক্র ভেদ করে একেবারে সহস্রারে গিয়ে উপনীত হয়েছিলো! জেগে দেখি ব্যাপার আর কিছুই নয়—বেহারারা একটি প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় সোয়ারি সজোরে নিক্ষেপ করে একদম অদৃশ্য হয়েছে। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সর্দারজী বললেন, 'ওরা একটু তামাক খেতে গিয়েছে।' যাত্রা করে অবধি, এই প্রথম একটি জায়গা আমার চোখে পড়লো, যা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। সে বট একাই একশো ; চারিদিকে সারি সারি বোয়া নেমেছে, আর তার উপরে পাতাগুলো এতো ঘনবিন্যস্ত যে, সূর্যরশ্মি তা ভেদ করে আসতে পারছে না। মনে হয়, প্রকৃতি তাপক্লিষ্ট পথশ্রান্ত পথিকদের জন্য একটি হাজার থামের পান্থশালা সস্নেহে

স্বহস্তে রচনা করে রেখেছেন। সেখানে ছায়া এতো নিবিড় যে, সন্ধ্যা হয়েছে বলে আমার ভুল হলো, কিন্তু ঘড়ি খুলে দেখি বেলা তখন সবে একটা।

আমি এই অবসরে বহুকষ্টে পাল্কি থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে হাত-পা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলুম। দেহটিকে সোজা করে খাড়া করতে প্রায় মিনিট পনেরো লাগলো; কেননা ইতিমধ্যে আমার সর্বাঙ্গে খিল ধরে এসেছিলো, তার উপর আবার কোনও অঙ্গ অসাড় হয়ে গিয়েছিলো; কোনও অঙ্গে ঝিন্‌ঝিনি ধরেছিলো, কোনও অঙ্গে পক্ষাঘাত, কোনও অঙ্গে ধনুষ্টঙ্কার হয়েছিলো। যখন শরীরটি সহজ অবস্থায় ফিরে এলো, তখন মনে ভাবলুম, গাছটি একবার প্রদক্ষিণ করে আসি। খানিকটা দূর এগিয়ে দেখি, বেহারাগুলো সব পাঁড়েজীকে ঘিরে বসে আছে, আর সকলে মিলে একটা মহা-জটলা পাকিয়ে তুলেছে। প্রথমে আমার ভয় হলো যে, এরা হয়তো আমার বিরুদ্ধে ধর্মঘট করবার চক্রান্ত করেছে; কেননা সকলে একসঙ্গে মহা-উৎসাহে বক্তৃতা করছিলো। কিন্তু তারপরেই বুঝলুম যে, এই বকাবকি চেঁচামেচির অন্য কারণ আছে। এরা যে বস্তুর ধূমপান করছিলো, তা যে তামাক নয়—'বড়ো তামাক', তার পরিচয় ঘ্রাণেই পাওয়া গেল। এদের স্ফূর্তি, এদের আনন্দ, এদের লম্ফঝম্প দেখে, গঞ্জিকার ত্বরিতানন্দ নামের সার্থকতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলুম। এক-একজন কল্কেয় এক এক টান দিচ্ছে, আর 'ব্যোম কালী কলকাত্তাওয়ালি' বলে হুঙ্কার ছাড়ছে! গাঁজার কল্কের গড়ন যে এতো সুডৌল, তা আমি পূর্বে জানতুম না—গড়নে কল্কে ফুলও এর কাছে হার মানে। মাদকতার আধার যে সুন্দর হওয়া দরকার, এ জ্ঞান দেখলুম এদেরও আছে।

প্রথমে এদের এই ধূমপানোৎসব দেখতে আমার আমোদ বোধ হচ্ছিলো, কিন্তু ক্রমে বিরক্তি ধরতে লাগলো। ছিলেমের পর ছিলেম পুড়ে যাচ্ছে, অথচ দেখি কারও উঠবার অভিপ্রায় নেই। এদের গাঁজা খাওয়া কখন শেষ হবে জিজ্ঞাসা করাতে সর্দারজী উত্তর করলেন, 'হুজুর, এদের টেনে না তুললে এরা উঠবে না, সুমুখে ভয় আছে তাই এরা গাঁজায় দম দিয়ে মনে সাহস করে নিচ্ছে।'

আমি বললুম, 'কি ভয় ?'

সে জবাব দিলে, 'হুজুর, সে ভয়ের নাম করতে নেই। একটু পরে সব নিজে চোখেই দেখতে পাবেন।'

এ-কথা শুনে ব্যাপার কি দেখবার জন্য আমার মনে এতটা কৌতূহল জন্মালো যে, বেহারাগুলোকে টেনে তুলবার জন্য স্বয়ং তাদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলুম। দেখি, যে-সব চোখ ইতিপূর্বে যকৃতের প্রভাবে হলুদের মতো হলদে ছিলো, এখন সে-সব চোখ গঞ্জিকার প্রসাদে চূণ-হলুদের মতো লাল হয়ে উঠেছে। প্রতি লোকটিকে নিজের হাতে টেনে খাড়া করতে হলো, তার ফলে বাধ্য হয়ে কতকটা গাঁজার ধোঁয়া আমাকে উদরস্থ করতে হলো ; সে ধোঁয়া নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে আমার মাথায় গিয়ে চড়ে বসলো। অমনি গা পাক দিয়ে উঠলো, হাত পা ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে লাগলো, চোখ টেনে আসতে লাগলো, তাড়াতাড়ি পাল্কিতে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। পাল্কি আবার চলতে শুরু করলো। এবার পাল্কি চড়বার কষ্ট কিছুমাত্র অনুভব করলুম না, কেননা আমার মনে হলো যে, শরীরটা যেন আমার নয়, অপর কারো।

খানিকক্ষণ পর—কতক্ষণ পর তা বলতে পারিনে, বেহারাগুলো সব সমস্বরে ও তারস্বরে চীৎকার করতে আরম্ভ করলে। এদের গায়ের জোরের চাইতে গলার জোর যে বেশি, তার প্রমাণ পূর্বেই পেয়েছিলুম, কিন্তু সে জোর যে এতো অধিক, তার পরিচয় এই প্রথম পেলুম। এই কোলাহলের ভিতর থেকে একটা কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিলো—সে হচ্ছে রাম-নাম। ক্রমে আমার সর্দারজীটিও বেহারাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে 'রাম-নাম সৎ হ্যয়' 'রাম-নাম সৎ হ্যয়' এই মন্ত্র অবিরাম আউড়ে যেতে লাগলেন। তাই শুনে মনে হলো যে, আমার মৃত্যু হয়েছে, আর ভূতেরা সব পাল্কিতে চড়িয়ে আমাকে প্রেত-পুরীতে নিয়ে যাচ্ছে! এ ধারণার মূলে আমার অন্তরস্থ গঞ্জিকাধূমের কোনও প্রভাব ছিলো কিনা জানিনে। এরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে জানবার জন্য আমার মহা-কৌতূহল হলো। আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি, গ্রামে আগুন লাগলে যে রকম হয়, আকাশের চেহারা সেই রকম হয়েছে, অথচ আগুন লাগবার অপর লক্ষণ—আকাশ-যোড়া হৈ-হৈ রৈ-রৈ শব্দ শুনতে পেলুম না। চারিদিক এমন নির্জন, এমন নিস্তব্ধ যে,

মনে হলো, মৃত্যুর অটল শান্তি যেন বিশ্বচরাচরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তারপর পাল্কি আর একটু অগ্রসর হলে দেখলুম যে, সুমুখে যা পড়ে আছে, তা একটি মরুভূমি—বালির নয়, পোড়া-মাটির, সে মাটি পাতখোলার মতো, তার গায়ে একটি তৃণ পর্যন্ত নেই। এই পোড়া-মাটির উপরে মানুষের এখন বসবাস নেই, কিন্তু পূর্বে যে ছিলো, তার অসংখ্য এবং অপর্যাপ্ত চিহ্ন চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে। এ যেন ইঁটের রাজ্য। যতদূর চোখ যায়, দেখি শুধু ইঁট আর ইঁট, কোথায়ও বা তা গাদা হয়ে রয়েছে, কোথায়ও বা হাজারে হাজারে মাটির উপর বিছানো রয়েছে ; আর সে ইঁট এতো লাল যে, দেখতে মনে হয় টাটকা রক্ত যেন চাপ বেঁধে গেছে, এই ভূতলশায়ী জনপদের ভিতর থেকে যা আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে, সে হচ্ছে গাছ ; কিন্তু তার একটিতেও পাতা নেই, সব নেড়া, সব শুকনো, সব মরা। এই গাছের কঙ্কালগুলি কোথাও বা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও বা দু'একটি একধারে আলগোছ হয়ে রয়েছে। আর এই ইঁট, কাঠ, মাটি, আকাশের সর্বাঙ্গে যেন রক্তবর্ণ আগুন জড়িয়ে রয়েছে। এ দৃশ্য দেখে বেহারাদের প্রকৃতির লোকের ভয় পাওয়াটা কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়, কেননা আমারই গা ছম্‌-ছম্‌ করতে লাগলো। খানিকক্ষণ পরে এই নিস্তব্ধতার বুকের ভিতর থেকে একটি অতি ক্ষীণ ক্রন্দনধ্বনি আমার কানে এলো। সে স্বর এতো মৃদু, এতো করুণ যে, মনে হলো সে সুরের মধ্যে যেন মানুষের যুগযুগান্তের বেদনা সঞ্চিত, ঘনীভূত হয়ে রয়েছে। এ কান্নার সুরে আমার সমগ্র অন্তর অসীম করুণায় ভরে গেল। আমি মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বমানবের ব্যথার ব্যথী হয়ে উঠলুম। এমন সময়ে হঠাৎ ঝড় উঠলো, চারিদিক থেকে এলোমেলোভাবে বাতাস বইতে লাগলো। সেই বাতাসের তাড়নায় আকাশের আগুন যেন পাগল হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলো। আকাশের রক্তগঙ্গায় যেন তুফান উঠলো, চারিদিকে আগুনের ঢেউ বইতে লাগলো। তারপর দেখি সেই অগ্নি-প্লাবনের মধ্যে অসংখ্য নর-নারীর ছায়া কিল্‌বিল্‌ করছে, ছট্‌ফট্‌ করছে। এই ব্যাপার দেখে ঊনপঞ্চাশ রায় মহানন্দে করতালি দিতে লাগলো, হা-হা হো-হো শব্দে চীৎকার করতে লাগলো। ক্রমে এই সব শব্দ মিলেমিশে অট্টহাস্যে রূপান্তরিত হলো—সে হাসির নির্মম বিকট ধ্বনি দিগদিগন্তে ঢেউ

খেলিয়ে গেল। সে হাসি ক্রমে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে, আবার সেই মৃদু করুণ ও কাতর ক্রন্দনধ্বনিতে পরিণত হলো। এই বিকট হাসি আর এই করুণ ক্রন্দনের দ্বন্দ্বে মনের ভিতর এই ধ্বংসপুরীর পূর্বস্মৃতি সব জাগিয়ে তুললে—সে স্মৃতি ইহজন্মের কি পূর্বজন্মের তা আমি বলতে পারিনে। আমার ভিতর থেকে কে যেন আমাকে বলে দিলে যে, সে গ্রামের ইতিহাস এই—

২

এই ইট-কাঠের মরুভূমি রুদ্রপুরের ধ্বংসাবশেষ। রুদ্রপুরের রায়বাবুরা এ অঞ্চলের সর্বপ্রধান জমিদার ছিলেন। রায় বংশের আদি পুরুষ রুদ্রনারায়ণ, নবাব-সরকারের চাকরি করে রায়রাইয়ান খেতাব পান, এবং সেই সঙ্গে তিন পরগণার মালিকী স্বত্ব লাভ করেন। লোকে বলে এঁদের ঘরে দিল্লীর বাদশার স্বহস্তে স্বাক্ষরিত সনদ ছিলো, এবং সেই সনদে তাঁদের কোতল কচ্ছলের ক্ষমতা দেওয়া ছিলো। সনদের বলে হোক আর নাই হোক, এঁরা যে কোতল কচ্ছল করতেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কিম্বদন্তী এই যে, এমন দুর্দান্ত জমিদার এ দেশে পূর্বাপর কখনও হয়নি। এঁদের প্রবল প্রতাপে বাঘে-ছাগলে একঘাটে জল খেতো। কেননা, যার উপর এঁরা নারাজ হতেন, তাকে ধনে-প্রাণে বিনাশ করতেন। এঁরা কতো লোকের ভিটামাটি যে উচ্ছন্নে দিয়েছেন, তার আর ইয়ত্তা নেই। রায়বাবুদের দোহাই অমান্য করে, এতবড়ো বুকের পাটা বিশ ক্রোশের মধ্যে কোনও লোকেরই ছিলো না। তাঁদের কড়া শাসনে পরগণার মধ্যে চুরি ডাকাতি দাঙ্গাহাঙ্গামার নামগন্ধও ছিলো না। তার একটি কারণ, ও-অঞ্চলের লাঠিয়াল সড়কিয়াল তীরন্দাজ প্রভৃতি যতো ক্রূরকর্মা লোক, সব তাঁদের সরকারে পাইক-সর্দারের দলে ভর্তি হতো। একদিকে যেমন মানুষের প্রতি তাঁদের নিগ্রহের সীমা ছিলো না, অপরদিকে তেমনি অনুগ্রহেরও সীমা ছিলো না। দরিদ্রকে অন্ন-বস্ত্র, আতুরকে ঔষধ-পথ্য দান এঁদের নিত্যকর্মের মধ্যে ছিলো। এঁদের অনুগত আশ্রিত লোকের লেখাজোখা ছিলো না। এঁদের প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তরের প্রসাদে দেশের গুরু-পুরোহিতের দল সব জোতদার হয়ে উঠেছিলেন। পূজা-আর্চা, দোল-দুর্গোৎসবে অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন। রুদ্রপুরে

দোলের সময় আকাশ আবীরে, ও পূজার সময় পৃথিবী রুধিরে লাল হয়ে উঠতো। রুদ্রপুরের অতিথিশালায় নিত্য একশত অতিথি-ভোজনের আয়োজন থাকতো। পিতৃদায়, মাতৃদায়, কন্যাদায়গ্রস্ত কোনও ব্রাহ্মণ রুদ্রপুরের বাবুদের দ্বারস্থ হয়ে কখনও রিক্তহস্তে ফিরে যায়নি। এঁরা বলতেন, ব্রাহ্মণের ধন বাঁধবার জন্য নয়—সৎকার্যে ব্যয় করবার জন্য। সুতরাং সৎকার্যে ব্যয় করবার টাকার যদি কখনও অভাব হতো, তাহলে বাবুরা সে টাকা সা-মহাজনদের ঘর লুঠে নিয়ে আসতেও কুণ্ঠিত হতেন না। এক কথায়, এঁরা ভালো কাজ মন্দ কাজ, সব নিজেদের খেয়াল ও মর্জি অনুসারে করতেন; কেননা নবাবের আমলে তাঁদের কোনও শাসনকর্তা ছিলো না। ফলে, জনসাধারণে তাঁদের যেমন ভয় করতো, তেমনি ভক্তিও করতো, তার কারণ তাঁরা জনসাধারণকে ভক্তিও করতেন না, ভয়ও করতেন না। এই অবাধ যথেচ্ছাচারের ফলে তাঁদের মনে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ধারণা উত্তরোত্তর অসাধারণ বৃদ্ধিলাভ করেছিলো। তাঁদের মনে যা ছিলো, সে হচ্ছে জাতির অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, বলের অহঙ্কার, রূপের অহঙ্কার। রায় পরিবারের পুরুষেরা সকলেই গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি ও বলিষ্ঠ ছিলেন, এবং তাঁদের ঘরের মেয়েদের রূপের খ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিলো। এই সব কারণে মানুষকে মানুষ জ্ঞান করা এঁদের পক্ষে একরকম অসম্ভব হয়ে উঠেছিলো।

এ দেশে ইংরাজ আসার পূর্বেই এ পরিবারের ভগ্নদশা উপস্থিত হয়েছিলো, তারপর কোম্পানির আমলে এঁদের সর্বনাশ হয়। এঁদের বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সম্পত্তি ভাগ হওয়ার দরুণ যে-সকল সরিক নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলো, ক্রমে তাদের বংশ লোপ পেতে আরম্ভ হলো; কেননা নিজের চেষ্টায়, নিজের পরিশ্রমে অর্থোপার্জন করাটা এঁদের মতে অতি হেয় কার্য বলে গণ্য ছিলো। তারপর সরিকানা বিবাদ। রায় পরিবার ছিলো শাক্ত—এতো ঘোর শাক্ত যে, রুদ্রপুরের ছেলে-বুড়োতে মদ্যপান করতো। এমন কি, এ বংশের মেয়েরাও তাতে কোনো আপত্তি করতো না, কেননা তাদের বিশ্বাস ছিলো, মদ্যপান করা পুরুষালি কাজ। সন্ধ্যার সময় কুলদেবতা সিংহবাহিনীর দর্শনের পর বাবুরা যখন বৈঠকখানায় বসে মদ্যপানে রত হতেন, তখন সেই সকল গৌরবর্ণ প্রকাণ্ড পুরুষদের কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা আর জবাফুলের মতো

দুই চোখ, এই তিনে মিলে সাক্ষাৎ মহাদেবের রোষকষায়িত ত্রি-নেত্রের মতো দেখাতো। এই সময়ে পৃথিবীতে এমন দুঃসাহসের কার্য নেই, যা তাঁদের দ্বারা না হতো। তাঁরা লাঠিয়ালদের এ-সরিকের ধানের গোলা লুঠে আনতে, ও-সরিকের প্রজার বৌ-ঝিকে বে-ইজ্জৎ করতে হুকুম দিতেন। ফলে রক্তারক্তি কাণ্ড হতো। এই জ্ঞাতি-শত্রুতার দরুণ তাঁরা উৎসন্নের পথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। তারপর এঁদের বিষয়সম্পত্তি যা অবশিষ্ট ছিলো, তা দশশালা বন্দোবস্তের প্রসাদে হস্তান্তরিত হয়ে গেল। কিস্তির শেষ তারিখে সদর খাজনা কোম্পানির মালখানায় দাখিল না করলে লক্ষ্মী যে চিরদিনের মতো গৃহত্যাগ করবেন, এ জ্ঞান এঁদের মনে কখনও জন্মায়নি। পূর্ব আমলে নবাব-সরকারে নিয়মিত শালিয়ানা মালখাজনা দাখিল করবার অভ্যাস তাঁদের ছিলো না। এই অনভ্যাসবশত কোম্পানির প্রাপ্য রাজস্ব এঁরা সময়মতো দিয়ে উঠতে পারতেন না। কাজেই এঁদের অধিকাংশ সম্পত্তি খাজনার দায়ে গিয়েছিলো। সেই সঙ্গে রায়বংশ প্রায় লোপ পেয়ে এসেছিলো। যে গ্রামে এঁরা প্রায় একশো ঘর ছিলেন, সেই গ্রামে আজ একশো বৎসর পূর্বে ছ'ঘর মাত্র জমিদার ছিলো।

এই ছ'ঘরের বিষয়সম্পত্তিও ক্রমে ধনঞ্জয় সরকারের হস্তগত হলো। এর কারণ ধনঞ্জয় সরকার ইংরেজের আইন যেমন জানতেন, তেমনি মানতেন। ইংরেজের আইনের সাহায্যে, এবং সে আইন বাঁচিয়ে, কি করে অর্থোপার্জন করতে হয়, তার অন্ধি-সন্ধি ফিকির-ফন্দি সব তাঁর নখাগ্রে ছিলো। তিনি জিলার কাছারিতে মোক্তারি করে দু'চার বৎসরের মধ্যেই অগাধ টাকা রোজগার করেন। তারপর তেজারতিতে সেই সেই টাকা সুদের সুদ, তস্য সুদে হু-হু করে বেড়ে যায়। জনরব যে, তিনি বছর দশেকের মধ্যে দশ লক্ষ টাকা উপায় করেন। এতো না হোক, তিনি যে দু'চার লক্ষ টাকার মালিক হয়েছিলেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। এই টাকা করবার পর তাঁর জমিদার হবার সাধ গেল, এবং সেই সাধ মেটাবার জন্য তিনি একে একে রায়বাবুদের সম্পত্তিসকল খরিদ করতে আরম্ভ করলেন ; কেননা এ জমিদারির প্রতি কাঠা জমি তাঁর নখদর্পণে ছিলো। রায়বংশের চাকরি করেই তাঁর চৌদ্দপুরুষ মানুষ হয়, এবং তিনিও অল্প বয়সে রুদ্রপুরের বড়ো সরিক

ত্রিলোকনারায়ণের জমাসেরেস্তায় পাঁচ-সাত বৎসর মুহুরির কাজ করেছিলেন। সকল সরিকের সমস্ত সম্পত্তি মায় বসতবাটি খরিদ করলেও, বহুকাল যাবৎ তাঁর রুদ্রপুরে যাবার সাহস ছিলো না, কেননা তাঁর মনিবপুত্র উগ্রনারায়ণ হাতে পৈতা জড়িয়ে সিংহবাহিনীর পা ছুঁয়ে শপথ করেছিলেন যে, তিনি বেঁচে থাকতে ধনঞ্জয় যদি রুদ্রপুরের ত্রিসীমানার ভিতর পদার্পণ করে, তাহলে সে সশরীরে আর ফিরে যাবে না। তিনি যে তাঁর প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন, সে বিষয়ে ধনঞ্জয়ের মনে কোনও সন্দেহ ছিলো না। কেননা তিনি জানতেন যে, উগ্রনারায়ণের মতো দুর্ধর্ষ ও অসমসাহসী পুরুষ রায়বংশেও কখনো জন্মগ্রহণ করেনি।

উগ্রনারায়ণের মৃত্যুর কিছুদিন পরে, ধনঞ্জয় রুদ্রপুরে এসে রায়বাবুদের পৈতৃকভিটা দখল করে বসলেন। তখন সে গ্রামে রায়বংশের একটি পুরুষও বর্তমান ছিলো না, স্থতরাং তিনি ইচ্ছা করলে সকল সরিকের বাড়ি নিজ-দখলে আনতে পারতেন, তবুও তিনি উগ্রনারায়ণের একমাত্র বিধবা কন্যা রত্নময়ীকে তাঁর পৈতৃক বাটি থেকে বহিষ্কৃত করে দেবার কোনও চেষ্টা করেননি। তার প্রথম কারণ, রুদ্রপুরের সংলগ্ন পাঠান-পাড়ার প্রজারা উগ্রনারায়ণের বাটিতে রত্নময়ীর স্বত্বস্বামিত্ব রক্ষা করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলো। এরা গ্রামসুদ্ধ লোক পুরুষানুক্রমে লাঠিয়ালের ব্যবসা করে এসেছে ; স্থতরাং ধনঞ্জয় জানতেন যে, রত্নময়ীকে উচ্ছেদ করতে চেষ্টা করলে, খুন-জখম হওয়া অনিবার্য। তাতে অবশ্য তিনি নিতান্ত নারাজ ছিলেন, কেননা তাঁর মতো নিরীহ ব্যক্তি বাঙলা দেশে তখন দ্বিতীয় ছিলো না। আর দ্বিতীয় কারণ, যার অন্নে চৌদ্দপুরুষ প্রতিপালিত হয়েছে, ধনঞ্জয়ের মনে তার প্রতি পূর্বসংস্কারবশত কিঞ্চিৎ ভয় এবং ভক্তিও ছিলো। এই সব কারণে, ধনঞ্জয় উগ্রনারায়ণের অংশটি বাদ দিয়ে, রায়বংশের আদ্‌বাড়ির বাদবাকি অংশ অধিকার করে বসলেন, সেও নাম মাত্র। কেননা, ধনঞ্জয়ের পরিবারের মধ্যে ছিলো তাঁর একমাত্র কন্যা রঙ্গিণী দাসী, আর তাঁর গৃহ-জামাতা— রঙ্গিণীর স্বামী রতিলাল দে। এই বাড়িতে এসে ধনঞ্জয়ের মনের একটা বিশেষ পরিবর্তন ঘটলো। অর্থ উপার্জন করবার সঙ্গে সঙ্গে ধনঞ্জয়ের অর্থলোভ এতদূর বেড়ে গিয়েছিলো যে, তাঁর অন্তরে সেই লোভ ব্যতীত অপর কোনও

ভাবের স্থান ছিলো না। সেই লোভের ঝোঁকেই তিনি এতদিন অন্ধভাবে যেন-তেন-উপায়েন টাকা সংগ্রহ করতে ব্যস্ত ছিলেন। কিসের জন্য, কার জন্য টাকা জমাচ্ছি, এ প্রশ্ন ধনঞ্জয়ের মনে কখনও উদয় হয়নি।

কিন্তু রুদ্রপুরে এসে জমিদার হয়ে বসবার পর ধনঞ্জয়ের জ্ঞান হলো যে, তিনি শুধু টাকা করবার জন্যই টাকা করেছেন, আর কোনও কারণে নয়, আর কারও জন্য নয়। কেননা তাঁর স্মরণ হলো যে, যখন তাঁর একটির পর একটি সাতটি ছেলে মারা যায়, তখনও তিনি একদিনের জন্যও বিচলিত হননি, একদিনের জন্যও অর্থোপার্জনে অবহেলা করেননি। তাঁর চিরজীবনের অর্থের আত্যন্তিক লোভ, এই বৃদ্ধবয়সে অর্থের আত্যন্তিক মায়ায় পরিণত হলো। তাঁর সংগৃহীত ধন কি করে চিরদিনের জন্য রক্ষা করা যেতে পারে, এই ভাবনায় তাঁর রাত্তিরে ঘুম হতো না। অতুল ঐশ্বর্যও যে কালক্রমে নষ্ট হয়ে যায়, এই রুদ্রপুরই তো তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ক্রমে তাঁর এই ধারণা বদ্ধমূল হলো যে, মানুষে নিজ চেষ্টায় ধনলাভ করতে পারে, কিন্তু দেবতার সাহায্য ব্যতীত সে ধন রক্ষা করা যায় না। ইংরেজের আইন কণ্ঠস্থ থাকলেও, ধনঞ্জয় একজন নিতান্ত অশিক্ষিত ছিলেন। তাঁর প্রকৃতিগত বর্বরতা কোনোরূপ শিক্ষা দীক্ষার দ্বারা পরাভূত কিংবা নিয়মিত হয়নি। তাঁর সমস্ত মন সেকালের শূদ্রবুদ্ধিজাত সকলপ্রকার কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিলো। তিনি ছেলেবেলায় শুনেছিলেন যে, একটি ব্রাহ্মণ শিশুকে যদি টাকার সঙ্গে একটি ঘরে বন্ধ করে রাখা যায়, তাহলে সেই শিশুটি সেই ঘরে অনাহারে প্রাণত্যাগ করে যক্ষ হয়ে সেই টাকাটা চিরকাল রক্ষা করে। ধনঞ্জয়ের মনে এই উপায়ে তাঁর সঞ্চিত ধন রক্ষা করবার প্রবৃত্তি এতো অদম্য হয়ে উঠলো যে, যখ্ দেওয়াটা যে তাঁর পক্ষে একান্ত কর্তব্য, তিনি সে বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হলেন। যেখানে ধনঞ্জয়ের কোনো মায়ামমতা ছিলো না, সেখানে তিনি সকল বাধা অতিক্রম করে নিজের কার্য উদ্ধার করবার কৌশলে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে এক বিষম বাধা উপস্থিত হলো। ধনঞ্জয় একটি ব্রাহ্মণ-শিশুকে যখ্ দিতে মনস্থ করেছেন শুনে, রঙ্গিণী আহার নিদ্রা ত্যাগ করলে। ফলে, ধনঞ্জয়ের পক্ষে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে পড়লো। ধনঞ্জয় এ পৃথিবীতে টাকা ছাড়া আর কিছু যদি

ভালোবাসতেন তো, সে হচ্ছে তাঁর কন্যা। চূণ-সুরকির গাঁথনির ভিতর এক একটি গাছ যেমন শিকড় গাড়ে, ধনঞ্জয়ের কঠিন হৃদয়ের কোনো একটি ফাটলের ভিতর এই কন্যাবাৎসল্য তেমনিভাবে শিকড় গেড়েছিলো। ধনঞ্জয় এ বিষয়ে উদ্যোগী না হলেও, ঘটনাচক্রে তাঁর জীবনের শেষ সাধ পূর্ণ হলো।

রত্নময়ীর একটি তিন বৎসরের ছেলে ছিলো। তার নাম কিরীটচন্দ্র। তিনি সেই ছেলেটিকে নিয়ে দিবারাত্র ঐ বাড়িতে একা বাস করতেন, জন-মানবের সঙ্গে দেখা করতেন না, তাঁর অন্তঃপুরে কারও প্রবেশাধিকার ছিলো না। রুদ্রপুরের লোকে তাঁর অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলে যেতো, যদি না তিনি প্রতিদিন স্নানান্তে ঠিক দুপুরবেলায় সিংহবাহিনীর মন্দিরে ঠাকুর দর্শন করতে যেতেন। সে সময়ে তাঁর আগে-পিছে পাঠান-পাড়ার দুজন লাঠিয়াল রক্ষক হিসাবে থাকতো। রত্নময়ীর বয়স তখন বিশ কিংবা একুশ। তাঁর মতো অপূর্বসুন্দরী স্ত্রীলোক আমাদের দেশে লাখে একটি দেখা যায়। তাঁর মূর্তি সিংহবাহিনীর প্রতিমার মতো ছিলো, এবং সেই প্রতিমার মতই উপরের দিকে কোণতোলা তাঁর চোখ দুটি, দেবতার চোখের মতই স্থির ও নিশ্চল ছিলো। লোকে বলতো ঐ চোখে কখনও পলক পড়েনি। ঐ চোখের ভিতরে যা জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছিলো, সে হচ্ছে চারপাশের নর-নারীর উপর তাঁর অগাধ অবজ্ঞা। রত্নময়ী তাঁর পূর্বপুরুষদের তিনশো বৎসরের সঞ্চিত অহঙ্কার উত্তরাধিকারী স্বত্বে লাভ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, রত্নময়ীর অন্তরেও রূপের অসাধারণ অহংকার ছিলো। কেননা তাঁর কাছে সে রূপ ছিলো তাঁর আভিজাত্যের প্রত্যক্ষ নিদর্শন। রত্নময়ীর মতে রূপের উদ্দেশ্যে মানুষকে আকর্ষণ করা নয়—তিরস্কার করা। তিনি যখন মন্দিরে যেতেন, তখন পথের লোকজন সব দূরে সরে দাঁড়াতো, কেননা তাঁর সকল অঙ্গ, তাঁর বর্ণ ও রেখার নীরব ভাষায় সকলকে বলতো, 'দূর হ! ছায়া মাড়ালে নাইতে হবে।' বলা বহুল্য, তিনি কোনও দিকে দৃকপাত করতেন না, মাটির দিকে চেয়ে সকল পথ রূপে আলো করে সোজা মন্দিরে যেতেন, আবার ঠিক সেইভাবে বাড়ি ফিরে আসতেন। রঙ্গিণী জানলার ফাঁক দিয়ে রত্নময়ীকে নিত্য দেখতো, এবং তার সকল দেহ হিংসার বিষে জর্জরিত হয়ে উঠতো, যেহেতু রঙ্গিণীর আর যাই থাক,

রূপ ছিলো না। আর রূপের অভাব তার মনকে অতিশয় ব্যথা দিতো, কেননা, তার স্বামী রতিলাল ছিলো অতি সুপুরুষ।

ধনঞ্জয় যেমন টাকা ভালোবাসতেন, রঙ্গিণী তেমনি তার স্বামীকে ভালবাসতো, অর্থাৎ এ ভালোবাসা একটি প্রচণ্ড ক্ষুধা ব্যতীত আর কিছুই নয়, এবং সে ক্ষুধা শারীরিক ক্ষুধার মতই অন্ধ ও নির্মম। এ ভালোবাসার সঙ্গে মনের কতটা সম্পর্ক ছিলো বলা কঠিন, কেননা ধনঞ্জয় ও রঙ্গিণীর মতো জীবদের মন দেহের অতিরিক্ত নয়, অন্তর্ভূত বস্তু। ধনঞ্জয় যেভাবে টাকা ভালোবাসতেন, রঙ্গিণী ঠিক সেভাবে তার স্বামীকে ভালোবাসতো—নিজের সম্পত্তি হিসাবে। সেই সম্পত্তির উপর কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে, এ কথা মনে হলে সে একেবারে মায়া-মমতাশূন্য হয়ে পড়তো, এবং সে সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্য পৃথিবীতে এমন নিষ্ঠুর কাজ নেই, যা রঙ্গিণী না করতে পারতো। রঙ্গিণীর মনে সম্পূর্ণ অকারণে এই সন্দেহ জন্মেছিলো যে, রতিলাল রত্নময়ীর রূপে মুগ্ধ হয়েছে; ক্রমে সেই সন্দেহ তার কাছে নিশ্চয়তায় পরিণত হলো। রঙ্গিণী হঠাৎ আবিষ্কার করলো যে, রতিলাল লুকিয়ে লুকিয়ে উগ্রনারায়ণের বাড়ি যায়, এবং যতক্ষণ পারে ততক্ষণ সেইখানেই কাটায়। এর যথার্থ কারণ এই যে, রতিলাল রত্নময়ীর বাড়িতে আশ্রিত যে ব্রাহ্মণটি ছিলো, তার কাছে ভাঙ খেতে যেতো। তারপর রত্নময়ীর ছেলেটির উপর নিঃসন্তান রতিলালের এতদূর মায়া পড়ে গিয়েছিলো যে, সে কিরীটচন্দ্রকে না দেখে একদিনও থাকতে পারতো না। বলা বাহুল্য, রত্নময়ীর সঙ্গে রতিলালের কখনও চার-চক্ষুর মিলন হয়নি, কেননা পাঠান-পাড়ার প্রজারা তাঁর অন্তঃপুরের দ্বার রক্ষা করতো। কিন্তু রঙ্গিণীর মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, রত্নময়ী তার স্বামীকে সুপুরুষ দেখে তার কাছে থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। এর প্রতিশোধ নেবার জন্য, তার মজ্জাগত হিংসাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য, রঙ্গিণী রত্নময়ীর ছেলেটিকে যখ দেবার জন্য কৃতসংকল্প হলো। রঙ্গিণী একদিন ধনঞ্জয়কে জানিয়ে দিলে যে, যখ দেওয়া সম্বন্ধে তার আর কোনও আপত্তি নেই, শুধু তাই নয়, ছেলের সন্ধান সে নিজেই করবে।

এ কাজ অবশ্য অতি গোপনে উদ্ধার করতে হয়। তাই বাপে মেয়েতে

পরামর্শ করে স্থির হলো যে, রঙ্গিণীর শোবার পাশের ঘরটিতে যখ দেওয়া হবে। দু'চার দিনের ভিতর সে ঘরটির সব দুয়ার জানলা ইঁট দিয়ে গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া হলো। তারপর অতি গোপনে ধনঞ্জয়ের সঞ্চিত যতো সোনা রূপোর টাকা ছিলো সব বড়ো বড়ো তামার ঘড়াতে পুরে সেই ঘরে সারি সারি সাজিয়ে রাখা হলো। যখন ধনঞ্জয়ের সকল ধন সেই কুঠরীজাত হলো, তখন রঙ্গিণী একদিন রতিলালকে বললে—রত্নময়ীর ছেলেটি এতো সুন্দর যে, তার সেই ছেলেটিকে একবার কোলে করতে নিতান্ত ইচ্ছে যায়, সুতরাং যে উপায়েই হোক তাকে একদিন রঙ্গিণীর কাছে আনতেই হবে। রতিলাল উত্তর করলে, সে অসম্ভব, রত্নময়ীর লাঠিয়ালরা টের পেলে তার মাথা নেবে। কিন্তু রঙ্গিণী এতো নাছোড় হয়ে ধরে বসলো যে, রতিলাল অগত্যা একদিন সন্ধ্যাবেলা কিরীটচন্দ্রকে ভুলিয়ে সঙ্গে করে রঙ্গিণীর কাছে নিয়ে এলো। কিরীটচন্দ্র আসবামাত্র রঙ্গিণী ছুটে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিলে, চুমো খেলে, কতো আদর করলে, কতো মিষ্টি কথা বললে। তারপর কিরীটচন্দ্রের গায়ে লাল চেলির যোড়, তার গলায় ফুলের মালা, তার কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, আর তার হাতে দু'গাছি সোনার বালা পরিয়ে দিলে। কিরীটচন্দ্রের এই সাজ দেখে রতিলালের চোখ-মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। তারপর রঙ্গিণী হঠাৎ তার হাত ধরে টেনে নিয়ে, সেই ব্রাহ্মণ শিশুকে সেই অন্ধকূপের ভিতর পুরে দিয়ে, বাইরে থেকে দরজার গা-চাবি বন্ধ করে চলে গেল। রতিলাল এ-দুয়ার ও-দুয়ার ঠেলে দেখে বুঝলে যে, রঙ্গিণী তাকেও তার শোবার ঘরে বন্দী করে গিয়েছে। রতিলাল ঠেলে, ঘুষো মেরে, লাথি মেরে সেই অন্ধকূপের কপাট ভাঙবার চেষ্টা করে দেখলে, সে চেষ্টা বৃথা। সে কপাট এতো ভারি আর এতো শক্ত যে, কুড়োল দিয়েও তা কাটা কঠিন। কিরীটচন্দ্র সেই অন্ধকার ঘরে বন্ধ হয়ে প্রথমে ককিয়ে কাঁদতে লাগলো, তারপর রতিলালকে দাদা বলে ডাকতে লাগলো। দু'তিন ঘণ্টার পর তার কান্নার আওয়াজ আর শুনতে পাওয়া গেল না। রতিলাল বুঝলে, সে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। তারপর তিনদিন তিন-রাত নিজের ঘরে বন্দী হয়ে রতিলাল কখনও শোনে যে, কিরীটচন্দ্র দুয়ারে মাথা ঠুকছে, কখনও শোনে সে কাঁদছে, আবার কখনও বা চুপচাপ। রতিলাল এই তিনদিন

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দিনের মধ্যে হাজার বার পাগলের মতো ছুটে গিয়ে সেই কপাট ভাঙতে চেষ্টা করেছে অথচ সে দরজা এক-চুলও নড়াতে পারেনি। যখন কান্নার আওয়াজ কানে আসতো, তখন রতিলাল দুয়ারের কাছে ছুটে গিয়ে বলতো, 'দাদা, অমন করে কেঁদো না, কোনও ভয় নেই, আমি এখানে আছি।' রতিলালের গলা শুনে সে ছেলে আরও জোরে কেঁদে উঠতো, ঘন ঘন কপাটে মাথা ঠুকতো। রতিলাল তখন দুই কানে হাত দিয়ে ঘরের অন্য কোণে পালিয়ে যেতো, ও চীৎকার করে কখনও রঙ্গিণীকে কখনও ধনঞ্জয়কে ডাকতো, যা মুখে আসে তাই বলে গালি দিতো। এই পৈশাচিক ব্যাপারে সে এতটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলো যে, কিরীটচন্দ্রের উদ্ধারের যে অপর কোনও উপায় হতে পারে, এ কথা মুহূর্তের জন্যও তার মনে উদয় হয়নি, তার মন ঐ কান্নার টানে সেই অন্ধকূপের মধ্যেই বন্দী হয়ে ছিলো। তিনদিনের পর সেই শিশুর ক্রন্দনধ্বনি ক্রমে অতি মৃদু, অতি ক্ষীণ হয়ে এসে, পঞ্চম দিনে একেবারে থেমে গেল। রতিলাল বুঝলে, কিরীটচন্দ্রের ক্ষুদ্র প্রাণের শেষ হয়ে গিয়েছে। তখন সে তার ঘরের জানলার লোহার গরাদ দু'হাতে ফাঁক করে, নীচে লাফিয়ে পড়ে এক-দৌড়ে রত্নময়ীর বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলো। সেদিন দেখলে অন্তঃপুরের দরজায় প্রহরী নেই, পাঠান-পাড়ার প্রজারা সব ছেলে খোঁজবার জন্য নানা দিকে বেরিয়ে পড়েছিলো। এই সুযোগে রতিলাল রত্নময়ীর নিকট উপস্থিত হয়ে সকল ঘটনা তার কাছে এক নিঃশ্বাসে জানালো। আজ তিন বৎসরের মধ্যে রত্নময়ীর মুখে কেউ হাসি দেখেনি। তার ছেলের এই নিষ্ঠুর হত্যার কথা শুনে তার মুখ চোখ সব উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, দেখতে দেখতে মনে হলো সে যেন হেসে উঠলো। এ দৃশ্য রতিলালের কাছে এতই অদ্ভুত যে, সে রত্নময়ীর কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

তারপর, সেইদিন দুপুর রাত্তিরে—যখন সকলে শুতে গিয়েছে—রত্নময়ী নিজের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে। সকল সরিকের বাড়ি সব গায়ে গায়ে। তাই ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে সে আগুন দেবতার রোষাগ্নির মতো ব্যাপ্ত হয়ে ধনঞ্জয়ের বাড়ি আক্রমণ করলে। ধনঞ্জয় ও রঙ্গিণী ঘর থেকে বেরিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিলো, সদর ফটকে এসে দেখে রত্নময়ীকে ঘিরে পাঠান-

পাড়ার প্রায় একশো প্রজা ঢাল সড়কি ও তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রত্নময়ীর আদেশে তারা ধনঞ্জয় ও রঙ্গিণীকে সড়কির পর সড়কির ঘায়ে আপাদমস্তক ক্ষতবিক্ষত করে সেই জ্বলন্ত আগুনের ভিতর ফেলে দিলে। রত্নময়ী অমনি অট্টহাস্য করে উঠলো। তার সঙ্গীরা বুঝলো যে, সে পাগল হয়ে গিয়েছে। তারপর সেই পাঠান-পাড়ার প্রজাদের মাথায় খুন চড়ে গেল, তারা ধনঞ্জয়ের চাকর-দাসী, আমলা-ফয়লা, দারোয়ান-বরকন্দাজ যাকে সুমুখে পেলে তার উপরেই সড়কি ও তলোয়ার চালালে, রায়বংশের পৈতৃক ভিটার উপরে আগুনের ও নীচে রক্তের নদী বইতে লাগলো। তারপর ঝড় উঠলো, ভূমিকম্প হতে লাগলো। যখন সব পুড়ে ছারখার হয়ে গেল, তখন রত্নময়ী সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করলো।

রুদ্রপুরের সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। শুধু কিরীটচন্দ্রের কান্না ও রত্নময়ীর উন্মত্ত হাসি আজও তার আকাশ বাতাস পূর্ণ করে রেখেছে।

কাশীবাসিনী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

দানাপুর ষ্টেশন হইতে দানাপুর শহর পাঁচ মাইল দূরে, ষ্টেশনটি যে স্থানে অবস্থিত, তাহার নাম খগোল।

খগোলের বাজার হইতে কিয়দ্দূরে ষ্টেশনের মালগুদামের ছোটোবাবু গিরীন্দ্রনাথের বাসাবাড়ি। মৃণ্ময় গৃহখানি, খোলার চাল। রাস্তা হইতে তিনটি সিঁড়ি উঠিয়া একটু বারান্দা মতো। তার পরই অন্তঃপুর। দু'খানি শয়ন ঘর, একটি রসুই ঘর, একটি কাঠ রাখিবার ঘর (কপাট নাই);— উঠানটি টালি বিছানো; মধ্যস্থানে উচ্চ আলিসাযুক্ত কূপ; মাসিক ভাড়া সাড়ে তিন টাকা।

গিরীন্দ্র চাকরিতে প্রবেশ করিয়া সঙ্গদোষে চরিত্র নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলো। প্রায় দশ বৎসর কাল মদ্যপানাদি যথেচ্ছাচারে কাটাইয়া বৎসর-দুই কিঞ্চিৎ ভদ্র হইয়াছে—সম্প্রতি বিবাহও করিয়াছে। স্ত্রীটি একটু বড়ো-সড়ো;—বড়ো-সড়ো দেখিয়াই বিবাহ করিয়াছিলো। নাম মালতী। মুখখানি বেশ লালিত্যমাখা। রংটি ততো ফর্সা নহে। এই বয়সেই বেচারি বিদেশে একাকী স্বামী ঘর করিতে আসিয়াছে। শাশুড়ী নাই—ননদ নাই, দেখিবার, যত্ন করিবার কেহ নাই। স্বামী আপিস চলিয়া গেলে এমন কেহ নাই যাহার সঙ্গে বসিয়া মালতী দুই দণ্ড গল্প করে। সম্বলের মধ্যে এক বুড়ী দাই, ভজুয়ার মা। দিন-রাত্রি বাড়িতে থাকিয়া বধূকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, এইজন্য বেতন এক টাকা বেশি। খগোলে অনেকদিন স্থায়ী একটি বাঙালী পরিবার এই দাইটিকে পুরাতন ও বিশ্বাসী বলিয়া সুপারিশ করিয়া দিয়াছেন। সে যে পুরাতন তদ্বিষয়ে কাহারও কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাহার মস্তকের শুভ্র কেশ, দেহের স্থৌল্য, চর্মের লোলতা এ বিষয়ে সাক্ষ্যদান

করিতেছে। এবং বিশ্বাসীও বটে, কারণ বাজার করিতে যাইতে তাহার অত্যন্ত অনিচ্ছা দেখা যায়। গিরীন্দ্র বেচারী অত্যন্ত ভালো মানুষ ; নিজেই হাটবাজার করিয়া কুলির মাথায় দিয়া লইয়া আসে। ভজুয়ার মা ততক্ষণে বারান্দার কোণে শুইয়া নিদ্রা উপভোগ করে।

শীতকাল, তিনটা বাজিয়া গিয়াছে, আর বেলা নাই। মালতী শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলো। যথাস্থানে চট বিছাইয়া, কালো কম্বল মুড়ি দিয়া ভজুয়ার মা নাসিকাধ্বনিপূর্বক মালতীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। মালতী তাহার পানে চাহিয়া অনুচ্চস্বরে বলিলো—'আঃ, হতভাগী কি ঘুমের বোঝা নিয়েই পৃথিবীতে এসেছিলো।'

এমন সময় বাহিরে একটা পরুষকণ্ঠ 'বাবু' 'বাবু' শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিলো। মালতী ছুটিয়া সদর দরজার কাছে গেল। অজস্র ছিদ্রসঙ্কুল দরজাটি বন্ধ, একটি ছিদ্রে চক্ষু লগ্ন করিয়া দেখিলো, একজন রেলওয়ে কুলি, মাথায় একটা তোরঙ্গ, হাতে একটা পুঁটুলি, দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে, তাহার পশ্চাতে একজন বিধবাবেশিনী প্রৌঢ়া বাঙালী স্ত্রীলোক।

চকিতের মধ্যে মালতী ফিরিয়া দাইকে ডাকাকাকি আরম্ভ করিলো। কিছুতেই দাইয়ের নিদ্রাভঙ্গ হয় না দেখিয়া সে অবশেষে তাহার গায়ে হাত দিয়া—'আরে ভজুয়াকে মা' বলিয়া খুব জোরে নাড়া দিতে লাগিলো। দাই তখন উঠিলো, শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া দরজা খুলিয়া দিলো।

এক মিনিট পরে স্ত্রীলোকটি আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন। মালতীর মুখপানে শান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। মালতী ভাবিলো, স্বামীর কোনও আত্মীয়া হইবেন—কিন্তু কাহারও আসিবার কথা তো ছিলো না ; প্রণাম করিবে কি না ভাবিতে লাগিলো।

নবাগতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই কি গিরীন্দ্রবাবুর বাড়ি ?

মালতী বলিলো, 'হ্যাঁ।'

'তুমি তাঁর বউ ?'

মালতী অন্যদিকে চাহিয়া, মাথা হেলাইয়া জানাইলো, তাহাই। তাহার পর সাহস সংগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলো, 'আপনাকে যে চিনতেই পারলাম না—কোথা থেকে আসছেন ?'

'আমি আসছি কাশী থেকে। গাড়িতে যাচ্ছিলাম, টিকিট হারিয়ে গিয়েছিলো তাই নামিয়ে দিলে। শুনলাম আবার সেই রাত একটায় গাড়ি। একলা মেয়েমানুষ কোথায় যাই—তাই একজন ভদ্রলোকের বাড়ি খুঁজে এখানে এলাম।'

মালতী বলিলো, 'তা বেশ করেছেন। হাত-পা ধুয়ে ফেলুন।'

দাই জল দিলো। তিনি হস্তপদাদি ধৌত করিলেন। মালতী ততক্ষণে একটি শতরঞ্জ আনিয়া বারান্দায় বিছাইলো। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলো, 'কখন গাড়িতে উঠেছিলেন? খাওয়া-দাওয়া হয়নি বোধহয়?'

তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'কৈ আর হয়েছে?'

মালতী দাইকে বলিলো, 'শীঘ্র করে, উনানটা জ্বেলে দে। দিয়ে বাজার যা, আলোচাল কিনে নিয়ে আয়।'

ইহা শুনিয়া নবাগতা সুমিষ্ট স্বরে বলিলেন, 'না মা, আলোচাল কিনতে দিতে হবে না। আলোচাল আমার পুঁটুলিতে বাঁধা আছে, তুমি ব্যস্ত হয়ো না।'

তিনি আসিয়া বারান্দায় বসিলেন। মালতীকেও কাছে বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নাম কি, বাছা?'

'আমার নাম মালতী।'

'বাপের বাড়ি?'

'উত্তরপাড়া।'

'তোমার মা, বাপ সবাই আছেন?'

মালতী মুখখানি অন্ধকার করিয়া বলিলো, 'বাবা তো মারা গেছেন, তখন আমি এক বছরের।'—বলিয়া মালতী উঠিয়া গেল—উনান জ্বালিতে দেরী হইতেছে বলিয়া দাইকে বকিলো, নিজে উনান ধরাইতে বসিয়া গেল।

কাশীবাসিনী উঠিয়া রান্নাঘরে আসিলেন। মালতী ধৌত বস্ত্র পরিয়া রান্না চড়াইলো। সেইখানে বসিয়াই আবার গল্প আরম্ভ হইলো।

কাশীবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কদ্দিন তোমার বিয়ে হয়েছে?'

'এই বোশেখ মাসে।'

'তবে তো অল্প দিনই হলো। এখানে এসেছো কি মাসে?'

'এই ছ'মাস।'

'তোমার স্বামী কখন আপিসে যান ?'

স্বামীর প্রসঙ্গে মালতীর লজ্জা হইলো। মুখখানি নত করিয়া শতরঞ্জ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিলো, 'ন'টার সময়।'

'কখন আসেন ?'

'কোনও দিন ছ'টার সময় আসেন, কোনও দিন সাতটা বেজে যায়।'

'কতো মাইনে পান ?'

'ত্রিশ টাকা।'

'তা ছাড়া উপরি আছে ?'

মালতী লজ্জিত হইয়া বলিলো, 'কি জানি।'

২

আজ প্রদীপ জ্বালিতে জ্বালিতে গিরীন্দ্র বাড়ি আসিলো। মালতী জিজ্ঞাসা করিলো, 'আজ ভারি সকাল-সকাল যে ?'

গিরীন্দ্র একটু হাসিলো। বলিলো, 'তুমি একলাটি থাকো, তাই এলাম আজ সকাল-সকাল।'

মালতী বলিলো, 'আজ আমি তো একলা নই। আজ বাড়িতে কে এসেছেন, বলো দেখি ?'

গিরীন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলো, 'কে ?'

'একটি বিধবা, তিনটের প্যাসেঞ্জারে কাশী থেকে দেশে যাচ্ছিলেন ; টিকিট হারিয়ে যাওয়াতে নামিয়ে দিয়েছে।'

'কাশী থেকে ? সঙ্গে কেউ ছিলো না ? কতো বয়স ?'

'সঙ্গে কেউ ছিলো না, বয়স ত্রিশ-চল্লিশ।'

গিরীন্দ্র মালতীর অনুমান শুনিয়া হাসিলো। বলিলো, 'ত্রিশ আর চল্লিশে কতো তফাৎ, নিজের ত্রিশ বছর বয়স না হলে তা তুমি বুঝতে পারবে না।'

এ কৌতুক ভাব কিন্তু বেশিক্ষণ রহিলো না। গিরীন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলো, 'এতো লোক থাকতে আমাদের বাড়িতেই বা কেন এলো ?'

মালতী একটু থমকিয়া গেল। স্বামী বিরক্ত হইবেন, তাহা তো সে

একবারও ভাবে নাই, সে তো খুব আমোদ করিয়াই সংবাদটা দিতে আসিয়াছিলো।

গিরীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলো, 'দেখতে কেমন?'

মালতী বলিলো, 'ও-সব জিজ্ঞাসা করছো কেন?'

গিরীন্দ্র ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া বলিলো, 'কাশী থেকে—একলা মেয়ে-মানুষ—কি রকম বিধবা, তাই ভাবছি।'

ইঙ্গিতটি মালতী বুঝিলো। বলিলো, 'না না—যা ভাবছো তা নয়। ভালো লোক।'

গিরীন্দ্র বলিলো, 'ভারি জানো! যেমন বুদ্ধি! কখন যাবে বলেছে?'

'তা তো কিছু বলেন নি। রাত একটার সময় আবার গাড়ি।'

'অতো রাতে কি করে একলা ষ্টেশনে যাবেন? কে পৌঁছে দেবে?'

গিরীন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলো, 'আমি পৌঁছে দেবো। এ পাপ যতো শীঘ্র বিদায় হয়, ততই ভালো। আমি যাবো—সঙ্গে করে পৌঁছে দেবো।'

মালতী মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া বসিয়া রহিলো। গিরীন্দ্র বাহিরে গিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া আসিলো।

তখনও মালতী সেই রকম করিয়া বসিয়া আছে। গিরীন্দ্র বলিলো, 'ব্যাপারখানা কি?'

মালতী বলিলো, 'বাড়িতে মানুষ এসেছে, তাড়িয়ে দেবে কি করে? উনি নিজে থেকে বলেন নি, কি করে বলবে তুমি 'যাও—রাত একটার গাড়িতেই?'

গিরীন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলো, 'ওগো, সেজন্যে তোমার ভাবনার দরকার কি? সে ভার আমার।'

ইহার পর গিরীন্দ্র তোরঙ্গ খুলিয়া একটি বোতল ও গেলাস বাহির করিয়া, একটা সোডা ভাঙিয়া কয়েকবার পান করিলো।

মদ্যের প্রভাবে তাহার মুখের বিরক্তির ভাব শীঘ্র অপনোদিত হইতে লাগিলো। মালতীর সঙ্গে প্রফুল্লভাবে গল্প আরম্ভ করিলো।

কিয়ৎক্ষণ কাটিলে, কাশীবাসিনী আসিয়া বাহিরের বারান্দায় দণ্ডায়মান

হইলেন। গিরীন্দ্র হঠাৎ বাহিরে আসিয়া বলিলো, 'আপনার আসাতে বড়োই আনন্দিত হলাম।'—বলিয়া প্রণাম করিলো। 'দিল' তখন তার 'দরিয়া'।

তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

গিরীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলো, 'আপনার নিবাস?'

'আপাততঃ কাশীবাস করছি, বাবা।'

'কোথায় যাওয়া হচ্ছিলো?'

'একবার দেশে যাবো ভেবেছিলাম—তা টিকিট হারিয়ে গেল—নামিয়ে দিলে। তাই মনে করলাম—'

গিরীন্দ্র বাধা দিয়া বলিলো, 'তা বেশ করেছেন, উত্তম করেছেন। আজ এখানে থাকুন, কাল বেলা তিনটের গাড়িতে যাবেন এখন।'

'আজ রাত একটার গাড়িতে—'

'পাগল! অতো শীতে, বুড়ো মানুষ মারা পড়বেন যে! কিছু বিশেষ প্রয়োজন তো নেই?'

'তা নেই যদিচ।'

অতঃপর শাল গায়ে দিয়া, ছড়ি লইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বেড়াইতে বাহির হইলো গিরীন্দ্র।

রাত্রি দশটার সময় ফিরিলো। কাশীবাসিনী তখন শয়ন করিয়াছেন। দাই নিদ্রিত, মালতীও ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলো, ডাকাডাকিতে সে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলো।

দরজা খুলিবামাত্র গিরীন্দ্র মালতীকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিলো। মুখে মদের গন্ধ, কিন্তু মালতীর সেটা সহিয়া গিয়াছিলো।

মালতী বলিলো, 'এত রাত!'

'একটা ভালো খবর আছে।'

'বদলি হয়েছি, তাড়িঘাটে।'

'মাইনে বেড়েছে?'

'পাঁচ টাকা?'

কথা কহিতে কহিতে দুইজনে শয়নগৃহে আসিয়া পৌঁছিলো। গিরীন্দ্র হাসিয়া বলিলো, 'তা দিক না দিক, সেখানে দু' পয়সা আছে।'

'কবে যেতে হবে?'

'তিন-চার দিন পরে।'

গিরীন্দ্র বলিলো বাহিরে সে অনেক খাইয়া আসিয়াছে—আহার করিবে না। মালতী আহার করিয়া আসিয়া দেখিলো, স্বামী নিদ্রিত।

পরদিন প্রভাতে সাতটার সময় গিরীন্দ্র গাত্রোত্থান করিলো। স্নানাদি করিতে আটটা বাজিলো। কাশীবাসিনীকে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া মালতীকে জিজ্ঞাসা করিলো, 'মাগী কাল যায় নি?'

মালতী বলিলো, 'বেশ! নিজে কাল মানা করলে ওঁকে যেতে। উনি তো একটার গাড়িতে যেতে চেয়েছিলেন।'

গিরীন্দ্র বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রহিলো। বলিলো, 'আজ তিনটের প্যাসেঞ্জারের আগে কুলি পাঠিয়ে দেবো। পাপ বিদেয় করে দিও। যাবার সময় সাবধানে থেকো, কিছু নিয়েটিয়ে না যায়।'

মালতী ডাগর বিষণ্ণ চোখ দুটিতে স্বামীর পানে চাহিয়া রহিলো।

গিরীন্দ্র আপিসে বাহির হইয়া গেলে মালতী কাশীবাসিনীকে বলিলো, 'আসুন, আমরা স্নান করে ফেলি।'

স্নান করিতে করিতে দুইজনে অনেক গল্প হইলো। বিদেশে আসিয়া অবধি মালতী একদিনও এমন করিয়া গল্প করিতে পায় নাই। ভজুয়ার মাতার সঙ্গে হিন্দী কহিয়া কহিয়া তাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছিলো।

স্নানান্তে কাশীবাসিনী আহ্নিক করিতে বসিলেন। গঙ্গাজল নাই—কূপজলেই 'ইদং গঙ্গোদকং' বলিয়া সারিতে হইলো।

আহারান্তে উঠানে কূপের আলিসায় বসিয়া কিয়ৎক্ষণ চুল শুকানো এবং বিশ্রাম করা হইলে, মালতী চুল বাঁধিবার সমস্ত সরঞ্জাম বাহির করিয়া আনিলো। এতদিন সে নিজে নিজে চুল বাঁধিয়াছে। নিজে কি ভালো করিয়া চুল বাঁধা যায়? তাহার চুলের অবস্থা দেখিয়া কাশীবাসিনী অনেক দুঃখ করিলেন। একটি ঘণ্টা ধরিয়া, অতি পরিপাটী করিয়া চুল বাঁধিয়া দিলেন।

ক্রমে দুইটা বাজিলো। এইবার কুলি আসিবে। কাশীবাসিনী প্রস্তুত হইলেন। বলিলেন, 'মা, এক দিনেই তোমার ওপর মায়া জন্মে গেছে। যেতে কষ্ট হচ্ছে।'

মালতীরও সেইরূপ বোধ হইতেছিলো। বিদেশে কতদিন পরে একজন রমণীর স্নেহ-ব্যবহার পাইয়া তার যেন পরমাত্মীয় লাভ হইয়াছে মনে হইতেছিলো। ইনি চলিয়া গেলে আবার সেই সারাদিন ধরিয়া একাকী নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে হইবে। এই কথা ভাবিয়া তাহারও বড়ো কষ্ট হইতে লাগিলো।

মালতী বলিলো, 'আজ নাই বা গেলেন! দু'দিন থাকুন না। এ ক'দিন আপনার সঙ্গে কথা কয়ে বেঁচেছি। একলাটি প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। এক এক সময় কান্না পায়।'

কাশীবাসিনী বলিলেন, 'আমি থেকে যেতে পারি, কিন্তু বাছা, তোমার স্বামী কিছু ভাবেন যদি?'

মালতী মুখে বলিলো, 'ভাববেন আবার কি?'—কিন্তু মনটি তাহার সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলো। সত্যই তো, স্বামী যে ইহার উপর প্রসন্ন নহেন। কুলিটা আসিলে অবশ্য তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্বামী যদি বেশি রাগ করেন?

তাহার পর ভাবিলো, তা করেন, করিবেন। এমন গর্হিত কিছু কার্য করা হইতেছে না। আর একলাটি এই সংসার ঘাড়ে করিয়া মরিতেছি, কেহ আহা বলিবার নাই, কথা কহিবার একটা মানুষ নাই—আমি একজন লোককে দুইদিন রাখিতে পারি না?—স্বামী আসিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিলে মালতী কি কি বলিবে, কি রকম করিয়া রাগ করিবে, সব মনে মনে গড়িয়া রাখিতে লাগিলো।

দুইটা বাজিলো, কুলি আসিলো না। তিনটা বাজিয়া গেল, তথাপি কুলির দেখা নাই। মালতী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলো—তখন আবার মনের সুখে কাশীবাসিনীর সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিয়া দিলো।

বৈকালে মালতী জলখাবার কিনিতে দাইকে বাজারে পাঠাইতেছিলো, কাশীবাসিনী বলিলেন, 'ছাইপাঁশ বাজারের জলখাবারগুলো কেন খাও, তোমরা? ঘরে খাবার তৈরি করতে জানো না?'

মালতী বলিলো, 'কে অতো হাঙ্গামা করে, বাপু!'

'হাঙ্গামা আবার কি? আমি তোমায় আজ দেখিয়ে দিচ্ছি।'—বলিয়া

তিনি দাইকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। নিজের বাক্স হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া সুজি, চিনি, ময়দা প্রভৃতি কিছু কিছু আনিবার আদেশ করিলেন।

মালতী বলিলো, 'ও কি কথা! আপনি টাকা দিচ্ছেন কেন? আমি টাকা দিই।' দাইকে বলিলো, 'টাকা ফিরিয়ে দে, দাই।'

দাই টাকাটি কাশীবাসিনীর হাতে দিতে গেল, তিনি কিছুতেই লইবেন না। বলিলেন, 'আমি তোমাদের জন্যে একটা টাকা খরচ করলামই বা; তোমরা আমার কতো যত্ন আদর করছো!'

মালতী বলিলো, 'ভারি আদর, ভারি যত্ন করেছি আপনাকে কি না। আদর-যত্ন করতে আমি জানি কি না! নিন, টাকাটা রাখুন।'

তিনি বলিলেন, 'দেখো বাছা, তাহলে কিন্তু আজই রাত্তির একটার গাড়িতে চলে যাবো।'

তখন মালতী ক্ষান্ত হইলো। বলিলো, 'করো বাছা, তোমার যা ইচ্ছে তাই। কিন্তু অন্যায় হলো বলে রাখছি।'

৩

আজ গিরীন্দ্র বাড়ি আসিলো অনেক বিলম্বে; রাত্রি প্রায় তখন আটটা। আসিয়া কাশীবাসিনীকে দেখিয়াই বলিলো, 'আমার বড়ো অপরাধ হয়ে গেছে। আপিসে কাজের ভিড়ে আপনাকে নিতে কুলি পাঠাতে একেবারেই মনে ছিলো না। দু'দিন যখন কষ্ট পেলেন, আর একটা দিন তখন কষ্ট করুন। কাল আর আমার আপিস নেই, কাল নিজে গিয়ে আমি আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসবো।'

মালতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে সে তাহার মুখে মদ্যগন্ধ পাইলো। বলিলো, 'তোমার গতিক ভালো নয়। তাড়িঘাটে গেলে হাতে বেশি পয়সা পেলে তুমি আরও বিগড়ে যাবে।'

গিরীন্দ্র বলিলো, 'আরে রামঃ, সে ছোটো ষ্টেশন, অজ্ পাড়াগাঁ, সেখানে কি কেল্‌নার কোম্পানি আছে? সেখানে গিয়ে, গঙ্গাস্নান করে সব ছেড়ে দেবো—ব্যস্ একদম।'

'তুমি কাল আপিসে যাবে না?'

'না, আমার এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেছে। বাবুরা ধরেছে পরশু ভোজ দিতে হবে। কাল সব যোগাড়-যন্ত্র করে রাখতে হবে।'

গিরীন্দ্র হস্তপদাদি ধৌত করিয়া আসিয়া বলিলো, 'আজ আর জল-খাবার খাবো না, কোথাও বেরুবো না;—রুটি দাও, একেবারে খাই।'

মালতী লুচি, মোহনভোগ, মাছের তরকারী প্রভৃতি বিবিধ উপকরণ যাহা কাশীবাসিনী প্রস্তুত করিয়াছিলেন—সমস্ত আনিয়া দিলো—গিরীন্দ্র আহার করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলো। বলিলো, 'দেখো, উনি মাংস রাঁধতে জানেন কিনা জিজ্ঞাসা করো দিকিনি।'

'মালতী জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া বলিলো, 'জানেন কিছু কিছু।'

'দেখো, আমি একটা কথা ভাবছি। ওঁকে যদি দু'একদিন থাকতে বলা যায়, উনি থাকবেন না? তাহলে পরশু ভোজ পর্যন্ত ওঁকে রাখা যাক। একবার জিজ্ঞাসা করো দেখি।'

মালতী মনে মনে অত্যন্ত খুশি হইয়া বলিলো, 'তুমি জিজ্ঞাসা করো না।'

গিরীন্দ্র জিভ কাটিয়া বলিলো, 'এ অবস্থায় কি ওঁর সঙ্গে কথা কইতে পারি?'

মালতী বলিলো, 'আহা, মরে যাই! আজ বাড়ি এসেই ওঁর সঙ্গে কথা কইলে না?'—বলিয়া কাশীবাসিনীর কাছে গিয়া প্রস্তাবটা করিলো।

তিনি সম্মত হইলেন।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া গিরীন্দ্র ভোজের জিনিসের ফর্দ করিলো। কাশীবাসিনী তাহা শুনিয়া যে সকল মন্তব্য ও পরিবর্তনাদি প্রস্তাব করিলেন, তাহা গিরিন্দ্রের নিকট অত্যন্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হইলো। আড়ালে মালতীকে বলিলো, 'দেখো, ইনি একজন খলিফা লোক! কাশীতে শুধু ধর্মকর্ম নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন মনে কোরো না।'

মালতী রাগ করিয়া বলিলো, 'কি বলো! তোমার মন ভারি অশুদ্ধ।'

দুই ক্রোশ দূরে গুরগাঁও নামক পল্লীতে দেবী আছেন। পরদিন প্রভাতে সেইখানে ছাগ-বলি পাঠানো হইলো।

রাত্রিকালে ভোজের ব্যাপার—নির্বিঘ্নে বলিতে পারি না—সম্পন্ন হইয়া

গেল রন্ধনাদি চমৎকার হইয়াছিলো। যদি ভোক্তারা সকলে সচেতন থাকিতো, তবে সমস্বরে ধন্য ধন্য করিতে পারিতো।

৪

আজ রবিবার। আজই রাত্রের গাড়িতে গিরীন্দ্র তাড়িঘাট যাত্রা করিবে।

কাশীবাসিনী বলিলেন, 'আমি আর দেশে যাবো না—আমিও কাশীতেই ফিরে যাই।'

মালতী বলিলো, 'বেশ তো, আপনিও আমাদের সঙ্গেই চলুন। তাড়িঘাট থেকে চার-পাঁচটা ষ্টেশন বৈত নয়।'

আহারান্তে গিরীন্দ্র মালতীকে বলিলো, 'গোটা-ত্রিশ টাকা বের করে দাও—বাজার-দেনাগুলো মিটিয়ে আসি।'

মালতী বলিলো, 'অবাক কথা! আমার কাছে আর টাকা আছে না কি?'

'কেন, সেদিন যে আশি টাকা এনে দিলাম।'

'পরশু বাজারে যাবার সময় তো তুমি ত্রিশ টাকা নিলে, বাকী যা ছিলো কাল সন্ধ্যে থেকে কয়েকবারে সবই তো প্রায় দিলাম। আর টাকা কোথায়?'—বলিয়া মালতী বাক্স খুলিয়া দেখিলো, দুই টাকা চৌদ্দ আনা মাত্র রহিয়াছে।

গিরীন্দ্র বলিলো, 'এখন উপায়? আমার কাছে তো কিছু নেই!'

মালতী চুপ করিয়া রহিলো। খানিক পরে বলিলো, 'আমি কি করবো? মদেই তোমার সর্বনাশ করলে। সে সময় তো জ্ঞান থাকে না, তখন কেবল 'দাও টাকা দাও টাকা' বলো।'

গিরীন্দ্র একটু বিরক্ত হইয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলো, 'দেখি, কারু কাছ থেকে ধার নিই গে।'

কাশীবাসিনী বাহিরে বসিয়া সব কথা শুনিয়াছিলেন। মালতীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ওঁকে বারণ করো মা, আমার কাছে টাকা রয়েছে, আমার তো এখন দেশে যাওয়া হলো না।'

মালতী গিয়া স্বামীকে বলিলো। গিরীন্দ্র বলিলো, 'সে কি কাজের কথা? ওঁর কাছে টাকা নেবো, আলাপ নেই পরিচয় নেই।'

কাশীবাসিনী এ কথা শুনিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, 'তাতে আর ক্ষতি কি, বাবা? তোমরা তাড়িঘাটে গিয়ে থিতু হয়ে বসো; আমি কিছুদিন পরে আবার আসবোখন তোমাদের কাছে; দেখাশুনোও হবে, টাকাও নিয়ে যাবো।'

গিরীন্দ্র কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলো, 'তাহলে আপনি অনুগ্রহ করে কাশী না গিয়ে আপাততঃ তাড়িঘাটেই চলুন, আমাদের সঙ্গে। পাঁচ-ছ'দিনেই আপনার টাকা ক'টি ফিরিয়ে দিতে পারবো।'

'আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে। কতো চাই? তিরিশ? যদি বেশি দরকার থাকে তাও আমার কাছে আছে, যা লাগে বলো, বাবা।'

গিরীন্দ্র বলিলো, 'না মা, বেশি চাইনে, ত্রিশ টাকা দিলেই হবে।'

কাশীবাসিনী বাক্স খুলিয়া দশ টাকার তিনখানি নোট বাহির করিয়া দিলেন।

সেইদিন রাত্রি এগারটার গাড়িতে গিরীন্দ্রনাথ স্ত্রী ও কাশীবাসিনীকে লইয়া যাত্রা করিলো। ভজুয়ার মা কাঁদিতে লাগিলো। গিরীন্দ্র তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলো, কিন্তু সে স্বীকার করিলো না।

ষ্টেশনের পথে কাশীবাসিনী মালতীকে বলিলেন, 'বাছা, বাবাকে বলো যেন আমার কাশীর টিকিটই করেন। ওখানে আমার বিশেষ দরকার আছে।'

গিরীন্দ্র ইহাকে তাড়িঘাটে লইয়া যাইবার জন্য জেদ করিলো, কিন্তু ফল হইলো না।

তাড়িঘাটে যাইতে দিলদারনগরে গাড়ি পরিবর্তন করিতে হয়। গিরীন্দ্র ভোর-রাত্রে স্ত্রীকে লইয়া দিলদারনগরে নামিয়া গেল;—কাশীবাসিনী চলিয়া গেলেন।

৫

বেলা সাতটার সময় গিরীন্দ্রনাথ নূতন কর্মস্থান তাড়িঘাট ষ্টেশনে পৌঁছিলো। সরকারী বাসা নির্দিষ্ট আছে, সেইখানে গিয়া উঠিলো। জিনিসপত্রগুলি কতক গুছাইয়া ষ্টেশনে বাবুদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল।

মালতী স্নান করিবে বলিয়া কাপড় বাহির করিবার জন্য একটা তোরঙ্গ

খুলিলো। সচরাচর তাহার গহনার বাক্সটি এই তোরঙ্গের মধ্যেই থাকিতো। কাপড় বাহির করিতে গিয়া দেখে, সর্বনাশ হইয়াছে, গহনার বাক্স নাই।

তখন মালতী ভাবিলো, নিশ্চয়ই অন্য কোনো বাক্সে আছে। যতগুলি বাক্স আছে একে একে সমস্ত খুলিয়া খুঁজিলো, কোথাও নাই।

মন বোঝে না, দুইবার—তিনবার করিয়া প্রত্যেক বাক্সটির প্রত্যেক জিনিস আলাদা আলাদা করিয়া খুঁজিলো, তথাপি পাইলো না। তখন সে হতাশ হইয়া ধূলায় বসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলো।

ফুলিয়া ফুলিয়া অনেক কাঁদিলো। ষ্টেশন মাষ্টারের মেয়ে চম্পকলতা তাহার ছোটো ভাইটিকে নিয়া 'বউ দেখিতে' আসিয়াছিলো, সে মালতীকে রোরুদ্যমানা দেখিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে চম্পট দিলো।

শেষে গিরীন্দ্র আসিলো। সে দেখিয়া বলিলো, 'এ কি!'

মালতী কাঁদিতে কাঁদিতে সব বলিলো।

শুনিয়া গিরীন্দ্র মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলো। কিয়ৎক্ষণ পরে মৃদুস্বরে বলিলো, 'বেশ করে সব খুঁজেছো?'

'কিছু বাকী রাখিনি।'

'শেষ তাকে কখন দেখেছো?'

'কাল খগোলে গুছিয়ে একখানি শালুর টুক্‌রোতে বেঁধে ঐ কালো তোরঙ্গের মধ্যে রেখেছি, বেশ মনে পড়ছে।'

'গাড়ীতে কালো তোরঙ্গ খুলেছিলে? কোনো জিনিস বের করতে?'

'হ্যাঁ, খুলেছিলাম একবার। শীত করতে লাগলো, তাই শালটা বের করেছিলাম।'

'সে সময় গয়নার বাক্স বের করে ফেলে রাখো নি তো?'

মালতী বলিলো, 'কখ্‌খনো না। ওপরে শালখানা ছিলো—শুধু তয়ে-তয়ে তুলে নিয়েছি।'

'চাবি কোথায় রেখেছিলে?'

'কোমরে ছিলো।'

'তারপর ঘুমিয়েছিলে?'

'তা ঘুমোলাম বৈকি।'

গিরীন্দ্র নিশ্চিন্ত স্বরে বলিলো, 'তবে কাশীর সেই মাগী নিয়েছে।'

মালতী চুপ করিয়া রহিলো।

গিরীন্দ্র বলিতে লাগিলো, 'যখন ঘুমিয়েছিলে, তখন আস্তে আস্তে কোমর থেকে চাবিটি খুলে নিয়ে, বাক্সটি বের করে নিয়েছে। তার নাম জানো?'

'না। বুড়ো মাগীর নাম জিগ্যেস করতে পারি কখনও?'

'কাশীতে কোথায় থাকে, জানো?'

'কি একটা মঠে।'

গিরীন্দ্র রাগিয়া বলিলো, কাশীতে তো দুশো ছাপ্পান্নটা মঠ আছে, কোন্ মঠে—কোন্‌খানে সে মঠ; কিছু শুনেছো?'

'না।'

'সেই কালেই বলেছিলাম, ওসব লোককে বিশ্বাস কোরো না। ওরা সর্বনেশে লোক—কাশীর ঘাগী বেশ্যা। ত্রিশ টাকার চার ফেলে যথাসর্বস্বটা নিয়ে গেল!'

মালতী বলিলো, 'তিনি কখখনো নেন নি। তিনি নেবেন কেন? আমি বোধহয় খগোলের বাসায় ফেলে এসেছি।'

গিরীন্দ্র কিন্তু তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিলো না। বলিলো, 'ওসব কথা রেখে দাও—জানো না তো পৃথিবীর গতিক! আচ্ছা, সে মাগী কোনওদিন তোমার গয়না দেখতে চেয়েছিলো?'

মালতী ভয়ে ভয়ে বলিলো, 'তা চেয়েছিলেন; সেই ভোজের দিন। বললেন, 'মা, তোমার কি কি গয়না আছে, দেখি?' আমি বের করে সব দেখলাম।'

গিরীন্দ্র বলিলো, 'তবে আর কোনো সন্দেহ নেই। আমি চললাম পুলিশে, টেলিগ্রাফ করতে।'—বলিয়া গিরীন্দ্র ষ্টেশনে গেল।

মালতী আবার একা বসিয়া কাঁদিতে লাগিলো।

৬

দুই সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। এই দুই সপ্তাহে এই দম্পতী গহনার শোক প্রায় বিস্মৃত হইয়াছে। তাহারা পূর্বমতো হাসে, গল্প করে, আমোদ করে।

নূতন কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া অবধি গিরীন্দ্র বিলক্ষণ উপার্জন করিতে লাগিলো। তাহাতেই বোধহয় গহনা লোকসানের কষ্ট অনেকটা চাপা পড়িয়া গেল।

যেদিন পুলিশে টেলিগ্রাফ করা হইয়াছিলো, সেই দিনই দিলদারনগর হইতে হেড কনেষ্টবল আসিয়া গহনাগুলির ফর্দ ও বিবরণ গিরীন্দ্রনাথের জবানবন্দীসহ লিখিয়া লইয়া গিয়াছিলো। কিন্তু তাহার পর হইতে পুলিশের তরফ হইতে আর কোনও সংবাদ নাই।

বেলা সাড়ে এগারোটা ; গিরীন্দ্রনাথ আপিসে গিয়াছে। মালতী খাইতে বসিয়াছে। এমন সময় দিলদারনগর হইতে গাড়ি, আসিলো। গিরীন্দ্রনাথের বাসা প্ল্যাটফর্মের নীচেই, দুয়ারে দাঁড়াইলে প্ল্যাটফর্ম, গাড়ি, লোকজন সব কিছুই দেখা যায়। যতবার গাড়ি আসিতো, ততবার মালতী দেখিতে ছুটিতো ; প্রতি গাড়িটি না দেখিলে যেন তাহার কর্তব্যের হানি হইবে! গাড়ির শব্দ শুনিবামাত্র মালতী থালা ফেলিয়া এঁটো হাতে, এঁটো মুখে গাড়ি দেখিতে গেল। বদ্ধ দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া ফুটা দিয়া দেখিলো, প্ল্যাটফর্মের উপর কাশীবাসিনী নামিয়াছেন, একটা কুলি তাঁহার জিনিস নামাইতেছে ; তিনি কুলিকে কি জিজ্ঞাসা করিলেন, কুলিটা গিরীন্দ্রনাথের বাসার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিলো।

মালতী ছুটিয়া উঠানে গিয়া আচমন করিলো। কম্পিত বক্ষে কাশী-বাসিনীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলো। কতো কি যে তাহার মনে হইলো! কতো আহ্লাদ হইলো, আর কতবার মনে মনে বলিলো, ঠাকুর —স্বামী যে তাঁহাকে গহনাচুরির অপবাদ দিয়াছেন, সে কথা যেন উঁহার কর্ণগোচর না হয়।—তিনি যে গহনা লন নাই এই বিশ্বাস মালতীর ছিলো। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সে বিশ্বাস দৃঢ় হইলো। নহিলে কখনও তিনি স্বেচ্ছাক্রমে আসিয়া উপস্থিত হন?

কয়েক মিনিট পরে কাশীবাসিনী মালতীর নিকটে পৌঁছিলেন।

'মা এসেছেন?'—বলিয়া মালতী প্রণাম করিলো। তিনি মালতীকে মাথায় হাত দিয়া সস্নেহে আশীর্বাদ করিলেন।

মালতী বলিলো, 'আপনি স্নান করে ফেলুন, আমি ভাত চড়িয়ে দিই।'

কাশীবাসিনী 'বলিলেন, স্নান করেছি—আজ একাদশী।'

মালতী লক্ষ্য করিলো, কাশীবাসিনীর মুখখানি যেন বড়ো গম্ভীর—বিষণ্ণ। কথা কহিতে কহিতে তাঁহার চক্ষু দুইটি যেন ছল ছল করিয়া উঠিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলো, 'আপনার মনটা এতো ভার ভার কেন?'

তিনি বলিলেন, 'জানো না?'

মালতী ভয়ে ও বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলো, 'কি?'

'তোমাদের সন্দেহ, আমি তোমার গয়নার বাক্স নিয়ে গেছি, পুলিশ পাঠিয়েছো, জানো না?'

মালতী লজ্জায় মৌন হইয়া রহিলো। পরে বলিলো, 'আমি যদি বলি, আমার মনে একদিনও এ সন্দেহ হয় নি, তবে আপনার বিশ্বাস হবে কি?'

কাশীবাসিনী ম্লান মুখে বলিলেন, 'কিন্তু তোমার স্বামীর তো বিশ্বাস হয়েছিলো!'

মালতী বলিলো, 'পুলিশ আপনার সন্ধান পাবে, তা উনি ভাবেন নি। উনি তো আজও বলছিলেন, কাশীতে কতো লক্ষ-লক্ষ মঠ, কোটি-কোটি সেবাধারী, কে কার সন্ধান পায়?'

'বের তো করেছিলো আমায়! আমার ওপর জুলুমটা কি করেছে কম? দুটি-শো টাকা নগদ ঘুষ গুনে দিয়ে নিষ্কৃতি পেয়েছি।'

মালতী বলিলো, 'আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে গিয়ে আপনার খুব শিক্ষা হলো!'

কাশীবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গিরীন কখন আসবে?'

'সন্ধ্যেবেলা।'

উঠানের রৌদ্র নিবিয়া গেল। মেঘ করিয়া উঠিলো। কাশীবাসিনী বাহিরের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'জল না হলে বাঁচি!'

মাতলী জিজ্ঞাসা করিলো, 'কেন?'

'আজই যাবো।'

'আজই যাবেন?'

কাশীবাসিনী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'তুমি ভারি ছেলেমানুষ। তোমার স্বামী আমাকে চোর বলে সন্দেহ করে, আর তোমার ইচ্ছে যে, আমি

থাকি ! আমি আড়াইটের গাড়িতে ফিরবো। আমাদের আরও অনেক লোক শ্রীক্ষেত্র যাচ্ছে। কাল আমরা সবাই রওনা হবো।'

মালতী জিজ্ঞাসা করিলো, 'কতদিনে ফিরবেন ?'

'কেন, ফিরলে কি দেখা হবে ?—বলিতে বলিতে কাশীবাসিনীর চক্ষু দুইটি ছল ছল করিয়া উঠিলো। পরে বলিলেন, 'একটি কাজ করবে ?'

মালতী সাগ্রহে বলিলো, 'কি ?'

'আমার কতকগুলো গয়না আছে, সেগুলো তুমি পরো দিকিন।'—বলিতে বলিতে কাশীবাসিনী তাঁহার সঙ্গের তোরঙ্গটি খুলিয়া একটি হাত-বাক্স বাহির করিলেন। মালতী বিস্মিত হইয়া দেখিলো, তাহার ভিতর বিস্তর গহনা, ভালো ভালো জড়োয়া গহনা।

কাশীবাসিনী বলিলেন, 'এগুলো সব তুমি নাও।'

সোনা, রূপা, হীরা, মোতি, চুনী পান্নার চাকচিক্যে মালতীর চক্ষু ঝলসিত, তবু সে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলো, 'সে আমি পারবো না।'

'কেন ?'

'আপনার এই রাশিকৃত গয়না আমি কেন নেবো ?'

'আমি দিচ্ছি।'

'আপনি দিচ্ছেন, কিন্তু কোন্ অধিকারে নেবো ? সে আমি পারবো না।'

আকাশে মেঘ বাড়িলো। ঝড় উঠিলো। দিবালোক কমিয়া গেল।

কাশীবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অধিকার যদি থাকে ?'

মালতী বলিলো, 'অধিকার ? কি অধিকার ?'

কাশীবাসিনী মুখখানি নীচু করিয়া বলিলেন, তা বলবো, তা বলতেই তো আজ এসেছি।'

মালতীর বুক গুর্‌গুর্ করিয়া উঠিলো। অবাক হইয়া সে কাশীবাসিনীর মুখপানে চাহিলো।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার মা কি সত্যি মরেছে ?'

মালতী থতমত খাইয়া বলিলো, 'কেন ?'

'তাই জিজ্ঞাসা করি।'

'সবাই তো বলে।'

'তাহলে তুমি জানো—আমিই তোমার পোড়ারমুখী মা।'—বলিতেই কাশীবাসিনীর চক্ষু দিয়া আবার দরদর ধারায় অশ্রু বহিলো।

মালতী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলো। নিস্তব্ধ হইয়া রহিলো।

অল্পদিনের একটি ঘটনা সে ভাবিতে লাগিলো। মোক্ষদা ঠানদি তীর্থ করিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বাড়িতে রাত্রে শুইয়া শুইয়া তার জ্যেঠাইমার সঙ্গে অনেক কথা বলাবলি করিতছেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, মালতী ঘুমাইয়া আছে। কিন্তু মালতী ঘুমায় নাই, সব শুনিতে পাইয়াছে। যাহা শুনিলো, তাহাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও কেন্দ্রচ্যুত হইয়া যেন তার চক্ষের সম্মুখে ঘুরিতে লাগিলো। যে মাকে এতদিন স্বর্গগতা জানিতো, শুনিলো তিনি বাস্তবিক জীবিতা, তাঁহার সহিত ঠানদির কোন্ তীর্থে হঠাৎ দেখা হইয়াছে। জানিলো, যে মা'র স্মৃতি সে পবিত্রতম বলিয়া পরম ভক্তিভরে আশৈশব বক্ষে ধারণ করিয়া আছে—সে মা'র স্মৃতি সংসারে ঘৃণিত, মা তার কলঙ্কিনী। তাহার সে রাত্রের কষ্ট অবর্ণনীয়। এই সেই মা? আবার সেই রাত্রের তীব্র অনুভূতি হৃদয়ে ফিরিয়া আসিলো।

মালতী শিহরিয়া উঠিলো, অজ্ঞাতসারে বলিলো, 'যা শুনেছিলাম, সত্যি!' বলিয়া একটু দূরে সরিয়া বসিলো।

কাশীবাসিনী তখনও কাঁদিতেছিলেন। একটু আত্মস্থা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জামাই জানে?'

'না।'

'তুমি কতদিন হলো শুনেছো?'

'বিয়ের পর।'

'মোক্ষদা পিসীর কাছে?'

'হ্যাঁ।'

'মোক্ষদা পিসীর মুখে শুনলাম, তোমার বিয়ে হয়েছে, দানাপুরে মালঘরে জামাই কাজ করে, পূজোর সময় তুমি দানাপুরে আসবে, তাও ঠিক হয়েছে।'

মালতী বলিলো, 'তাহলে দানাপুরে তুমি হঠাৎ এসে পড়ো নি, জেনেশুনে এসেছিলে? কেন?'

মালতীর স্বর এখন কঠোর।

কাশীবাসিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'আপনার সন্তানকে কেউ ভুলতে পারে ?'

মালতীর এইবার একটু একটু কান্না আসিতে লাগিলো। আপনার মা না জানিয়াও ইঁহার প্রতি যে মাতৃবৎ আকর্ষণ হইয়াছিলো, তাহাই মনে পড়িলো। কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিলো, 'কেন তুমি জানালে, তুমি কে ?'

'কি জানি। থাকতে পারলাম না।'

মালতী আবেগভরে একবার বলিতে যাইতেছিলো—জানিয়েছো, ভালোই করেছো। নইলে মা তো কখনো চক্ষে দেখতে পেতাম না!

কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হইলো—এ মা! নাই দেখতাম!

এই দ্বিধায় সে কিছুই বলিলো না, চুপ করিয়া রহিলো।

গাড়ির সময় হইলো। কাশীবাসিনী কুলিকে বলিয়া দিয়াছিলেন, সে জিনিস লইতে আসিলো।

মালতী বলিলো, 'গয়না নিয়ে যাও। আমি পরবো না।'

কাশীবাসিনী কন্যার মুখপানে চাহিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিলেন। বলিলেন, 'যা ভেবেছো তা নয়। এ তুমি স্বচ্ছন্দে পোরো, নইলে আমিই তোমায় দিতাম না। জীবনে একবার যে পাপ করেছি, আজ চৌদ্দ বছর ধরে তার প্রায়শ্চিত্ত করলাম। আর, এর একখানিও পাপের অর্জন নয়। আমি মস্ত বড়ো-মানুষের মেয়ে ছিলাম—শোনো নি ?'

মালতী বলিলো, 'তবুও আমার স্বামীকে সব না জানিয়ে, তাঁর মত না নিয়ে, আমি নিতে পারিনে।'

'তাই কোরো। যদি তিনি তোমায় পরতে না দেন, তবে এগুলো দেবসেবায় দিও।'

তিনি যাইবার জন্য উঠিলেন।

মালতী আর থাকিতে পারিলো না। 'মা, আবার দেখা দিও'—বলিয়া কাঁদিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিলো, প্রণাম করিলো।

'সাবিত্রী হও, রাজরাণী হও'—বলিয়া মা কন্যাকে আশীর্বাদ করিয়া দ্রুত গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সতী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হরিশ পাবনার একজন সম্ভ্রান্ত ভালো উকিল। কেবল ওকালতি হিসাবেই নয়, মানুষ হিসাবেও বটে। দেশের সর্বপ্রকার সদনুষ্ঠানের সহিতই সে অল্প-বিস্তর সংশ্লিষ্ট। শহরের কোনো কাজই তাহাকে বাদ দিয়া হয় না। সকালে 'দুর্নীতি-দমন' সমিতির কার্যকরী সভার একটা বিশেষ অধিবেশন ছিলো, কাজ সারিয়া বাড়ি ফিরিতে বিলম্ব হইয়া গেছে, এখন কোনোমতে দুটি খাইয়া লইয়া আদালতে পৌঁছিতে পারিলে হয়। বিধবা ছোটো বোন উমা কাছে বসিয়া তত্ত্বাবধান করিতেছিলো পাছে বেলার অজুহাতে খাওয়ার ত্রুটি ঘটে।

স্ত্রী নির্মলা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া অদূরে উপবেশন করিলো, বলিলো, কালকের কাগজে দেখলাম, আমাদের লাবণ্যপ্রভা আসছেন এখানকার মেয়ে-স্কুলের ইন্স্পেকট্রেস হয়ে।

এই সহজ কথা কয়টির ইঙ্গিত অতীব গভীর।

উমা চকিত হইয়া কহিলো, সত্যি নাকি? তা লাবণ্য নাম এমন তো কতো আছে, বৌদি।

নির্মলা বলিলো, তা আছে। ওঁকে জিগ্যেস করছি।

হরিশ মুখ তুলিয়া কটুকণ্ঠে বলিয়া উঠিলো, আমি জানবো কী করে, শুনি? গভর্নমেণ্ট কি আমার সঙ্গে পরামর্শ করে লোক বাহাল করে নাকি?

স্ত্রী স্নিগ্ধস্বরে জবাব দিলো, আহা রাগ করো কেন, রাগের কথা তো বলিনি। তোমার তদবির-তাগাদায় যদি কারও উপকার হয়ে থাকে সে তো আহ্লাদের কথা। এই বলিয়া যেমন আসিয়াছিলো তেমনি মন্থর মৃদুপদে বাহির হইয়া গেল।

উমা শশব্যস্ত হইয়া উঠিলো—আমার মাথা খাও দাদা, উঠো না—উঠো না—

হরিশ বিদ্যুৎবেগে আসন ছাড়িয়া উঠিলো—নাঃ, শান্তিতে এক মুঠো খাবারও জো নেই। উঃ! আত্মঘাতী না হলে আর—বলিতে বলিতে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল। যাবার পথে স্ত্রীর কণ্ঠ কানে গেল—তুমি কোন্ দুঃখে আত্মঘাতী হবে? যে হবে, সে একদিন জগৎ দেখবে।

এখানে হরিশের একটু পূর্ববৃত্তান্ত বলা প্রয়োজন। এখন তাহার বয়স চল্লিশের কম নয়, কিন্তু কম যখন সত্যই ছিলো সেই পাঠ্যাবস্থার একটু ইতিহাস আছে। পিতা রামমোহন তখন বরিশালের সব্-জজ, হরিশ এম-এ পরীক্ষার পড়া তৈরী করিতে কলিকাতার মেস ছাড়িয়া বরিশালে আসিয়া উপস্থিত হইলো। প্রতিবেশী ছিলেন হরকুমার মজুমদার। স্কুল-ইনস্পেক্টর। লোকটি নিরীহ, নিরহংকার এবং অগাধ পণ্ডিত। সরকারী কাজে ফুরসত পাইলে এবং সদরে থাকিলে মাঝে মাঝে আসিয়া সদর-আলা বাহাদুরের বৈঠকখানায় বসিতেন। অনেকেই আসিতেন। টাকওয়ালা মুনসেফ, দাড়ি-ছাঁটা ডেপুটি, মহাস্থবির সরকারি উকিল এবং শহরের অন্যান্য মান্য-গণ্যের দল সন্ধ্যার পর কেহই প্রায় অনুপস্থিত থাকিতেন না। তাহার কারণ ছিলো। সদর-আলা নিজে ছিলেন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। অতএব আলাপ-আলোচনার অধিকাংশই হইতো ধর্ম সম্বন্ধে এবং যেমন সর্বত্র ঘটে এখানেও তেমনি আধ্যাত্ম তত্ত্বকথার শাস্ত্রীয় মীমাংসা হইতো খণ্ডযুদ্ধের অবসানে।

সেদিন এমনি একটা লড়াইয়ের মাঝখানে হরকুমার তাঁহার বাঁশের ছড়িটি হাতে করিয়া আস্তে আস্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ ব্যাপারে কোনোদিন তিনি কোনো অংশ গ্রহণ করিতেন না। নিজে ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত ছিলেন বলিয়াই হোক অথবা শান্ত মৌন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বলিয়াই হোক, চুপ করিয়া শোনা ছাড়া গায়ে পড়িয়া অভিমত প্রকাশ করিবার চঞ্চলতা তাঁহার একটি দিনও প্রকাশ পায় নাই। আজ কিন্তু অন্যরূপ ঘটিলো। তিনি ঘরে ঢুকিতে টাকওয়ালা মুনসেফবাবু তাঁহাকেই মধ্যস্থ মানিয়া বসিলেন। ইহার কারণ, এইবার ছুটিতে কলিকাতায় গিয়া তিনি কোথায় যেন এই লোকটির ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের একটা

জনরব শুনিয়া আসিয়াছিলেন। হরকুমার স্মিতহাস্যে সম্মত হইলেন। অল্পক্ষণেই বুঝা গেল, শাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ মাত্র সম্বল করিয়া ইঁহার সহিত তর্ক চলে না। সবাই খুশি হইলেন, হইলেন না শুধু সব্-জজ বাহাদুর নিজে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি জাতি দিয়াছে তাহার আবার শাস্ত্রজ্ঞান কিসের জন্য ? এবং বলিলেনও ঠিক তাই। সকলে উঠিয়া গেল তাঁহার পরমপ্রিয় সরকারি উকিলবাবুকে চোখের ইঙ্গিতে হাসিয়া কহিলেন, শুনলেন তো ভাদুড়িমশাই, ভূতের মুখে রাম নাম আর কি !

ভাদুড়ি ঠিক সায় দিতে পারিলেন না, কহিলেন, তা বটে। কিন্তু জানে খুব। সমস্ত যেন মুখস্থ। আগে মাস্টারি করতো কিনা।

হাকিম বলিলেন, এরাই হলো জ্ঞানপাপী। এদের আর মুক্তি নেই।

হরিশ সেদিন চুপ করিয়া একধারে বসিয়াছিলো। এই স্বল্পভাষী মেধাবী প্রৌঢ়ের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছিলো। সুতরাং পিতার অভিমত যাহাই হোক, পুত্র তাহার আসন্ন পরীক্ষা-সমুদ্র হইতে মুক্তি পাইবার ভরসায় তাঁহাকে গিয়া ধরিয়া পড়িলো—সাহায্য করিতে হইবে। হরকুমার সম্মত হইলেন।

এইখানে তাঁহার কন্যা লাবণ্যের সহিত হরিশের পরিচয় হইলো। সেও আই-এ পরীক্ষার পড়া তৈরী করিতে কলিকাতার গণ্ডগোল ছাড়িয়া পিতার কাছে আসিয়াছিলো। সেইদিন হইতে প্রতিদিনের আনাগোনায় হরিশ পাঠ্যপুস্তকের দুরূহ অংশের অর্থ ই শুধু জানিলো না, আরও একটা জটিলতর বস্তুর স্বরূপ জানিয়া লইলো, তাহা তত্ত্ব হিসাবে ঢের বড়ো।

কিন্তু সে কথা এখন যাক। ক্রমশ পরীক্ষার দিন কাছ ঘেঁষিয়া আসিতে লাগিলো, হরিশ কলিকাতায় চলিয়া গেল। পরীক্ষা সে ভালোই দিলো এবং ভালো করিয়াই পাস করিলো।

কিছুকাল পরে আবার যখন দেখা হইলো, হরিশ সমবেদনায় মুখ পাংশু করিয়া প্রশ্ন করিলো, আপনি ফেল্ করলেন যে বড়ো ?

লাবণ্য কহিলো, এইটুকুও পারবো না, আমি এতই অক্ষম ?

হরিশ হাসিয়া ফেলিলো, বলিলো, যা হবার হয়েছে, এবার কিন্তু খুব ভালো করে এগ্‌জামিন দেওয়া চাই।

লাবণ্য কিছুমাত্র লজ্জা পাইলো না, বলিলো, খুব ভালো করে দিলেও আমি ফেল হবো। ও আমি পারবো না।

হরিশ অবাক হইলো, জিজ্ঞাসা করিলো, পারবে না কি রকম?

লাবণ্য জবাব দিলো, কি রকম আবার কি? এমনি। এই বলিয়া সে হাসি চাপিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলো।

ক্রমশ কথাটা হরিশের মাতার কানে গেল।

সেদিন সকালে হরিমোহনবাবু মকদ্দমার রায় লিখিতেছিলেন। যে দুর্ভাগা হারিয়াছে, তাহার আর কোনো কুল-কিনারা না থাকে, এই শুভ সংকল্প কার্যে পরিণত করিতে রায়ের মুসাবিদায় বাছিয়া বাছিয়া শব্দ-যোজনা করিতেছিলেন, গৃহিণীর মুখে ছেলের কাণ্ড শুনিয়া তাঁহার মাথায় আগুন ধরিয়া গেল। হরিশ নরহত্যা করিয়াছে শুনিলেও বোধকরি তিনি এতখানি বিচলিত হইতেন না। দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন, কী! এতো বড়ো—! ইহার অধিক কথা তাঁহার মুখে আর জোগাইলো না।

দিনাজপুরে থাকিতে একজন প্রাচীন উকিলের সহিত তাঁহার শিখার গুচ্ছ, গীতার মর্মার্থ ও পেন্সনান্তে ৺কাশীবাসের উপকারিতা লইয়া অত্যন্ত মতের মিল ও হৃদ্যতা জন্মিয়াছিলো। একটা ছুটির দিনে গিয়া তাঁহারই ছোটো মেয়ে নির্মলাকে আর একবার চোখে দেখিয়া ছেলের বিবাহের পাকা কথা দিয়া আসিলেন।

মেয়েটি দেখিতে ভালো। দিনাজপুরে থাকিতে গৃহিণী তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছেন, তথাপি স্বামীর কথা শুনিয়া গালে হাত দিলেন— বলো কি গো, একেবারে পাকা কথা দিয়ে এলে? আজকালকার ছেলে—

কর্তা কহিলেন, কিন্তু আমি তো আজকালকার বাপ নই। আমি আমার সেকেলে নিয়মেই ছেলে মানুষ করতে পারি। হরিশের পছন্দ যদি না হয় তাকে আর কোনো উপায় দেখতে বোলো।

গৃহিণী স্বামীকে চিনিতেন, তিনি নির্বাক হইয়া গেলেন।

কর্তা পুনশ্চ বলিলেন, মেয়ে ডানা-কাটা পরী না হোক, ভদ্রঘরের কন্যা। সে যদি তার মায়ের সতীত্ব আর বাপের হিঁদুয়ানি নিয়ে আমাদের ঘরে আসে, তাই যেন হরিশ ভাগ্য বলে মানে।

খবরটা প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হইলো না। হরিশও শুনিলো। প্রথমে সে মনে করিলো, পলাইয়া কলিকাতায় গিয়া, কিছু না জুটে, টিউশনি করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিবে। পরে ভাবিলো, সন্ন্যাসী হইবে। শেষে পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ—ইত্যাদি স্মরণ করিয়া স্থির হইয়া রহিলো।

কন্যার পিতা ঘটা করিয়া পাত্র দেখিতে আসিলেন এবং আশীর্বাদের কাজটাও এই সঙ্গে সারিয়া লইলেন। সভায় শহরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, নিরীহ হরকুমার কিছু না জানিয়াই আসিয়াছিলেন। তাহাদের সমক্ষে রায়বাহাদুর ভাবী বৈবাহিক মৈত্র মহাশয়ের হিন্দু ধর্মের প্রগাঢ় নিষ্ঠার পরিচয় দিলেন এবং ইংরাজি শিক্ষার সংখ্যাতীত দোষ-কীর্তন করিয়া অনেকটা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহাকে হাজার টাকা মাহিনার চাকুরি দেওয়া ব্যতীত ইংরাজের আর কোনো গুণ নাই। আজকাল দিন-ক্ষণ অন্যরূপ হইয়াছে, ছেলেদের ইংরাজি না পড়াইলে চলে না। কিন্তু যে মূর্খ এই ম্লেচ্ছ-বিদ্যা ও ম্লেচ্ছ-সভ্যতা হিন্দুর শুদ্ধান্তঃপুরে মেয়েদের মধ্যে টানিয়া আনে তাহার ইহকালও নাই পরকালও নাই।

একা হরকুমার ভিন্ন ইহার নিগূঢ় অর্থ কাহারও অবিদিত রহিলো না। সেদিন সভা ভঙ্গ হইবার পূর্বেই বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল এবং যথাকালে শুভকর্ম-সমাধা হইতেও বিঘ্ন ঘটিলো না।

কন্যাকে শ্বশুর-গৃহে পাঠাইবার প্রাক্কালে মৈত্র গৃহিণী, নির্মলার সতী-সাধ্বী মাতাঠাকুরাণী—বধূ-জীবনের চরম তত্ত্বটি মেয়ের কানে দিলেন। বলিলেন, মা, পুরুষ মানুষকে চোখে-চোখে না রাখিলেই সে গেল! সংসার করতে আর যা-ই কেন না ভোলো, কখনো এ কথাটি ভুলো না।

তাঁহার নিজের স্বামী টিকির গোছা ও শ্রীগীতার মর্মার্থ লইয়া মাতিয়া উঠিবার পূর্ব পর্যন্ত তাঁহাকে অনেক জ্বালাইয়াছেন। আজিও তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, মৈত্রবুড়া চিতায় না শুইলে তাঁহার নিশ্চিন্ত হইবার জো নাই।

নির্মলা স্বামীর ঘর করিতে আসিলো এবং সেই ঘর আজ বিশ বর্ষ ধরিয়া করিতেছে। এই সুদীর্ঘকাল কতো পরিবর্তন, কতো কি ঘটিলো। রায়বাহাদুর মরিলেন, স্বধর্মনিষ্ঠ মৈত্র গতায়ু হইলেন, লেখাপড়া সাঙ্গ হইলে লাবণ্যের

অন্যত্র বিবাহ হইলো, জুনিয়র উকিল হরিশ সিনিয়ার হইয়া উঠিলেন, বয়স তখন যৌবন পার হইয়া প্রৌঢ়ত্বে গিয়া পড়িলো, কিন্তু নির্মলা তাহার মাতৃদত্ত মন্ত্র আর এ জীবনে ভুলিলো না।

২

এই সজীব মন্ত্রের ক্রিয়া যে এতো সত্বর শুরু হইবে তাহা কে জানিতো! রায়বাহাদুর তখনও জীবিত, পেন্সান লইয়া পাবনার বাটীতে আসিয়া বসিয়াছেন। হরিশের এক উকিল বন্ধুর পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কলিকাতা হইতে একজন ভালো কীর্তনওয়ালি আসিয়াছিলো, সে দেখিতে সুশ্রী এবং বয়স কম। অনেকেরই ইচ্ছা ছিলো, কাজকর্ম অন্তে একদিন ভালো করিয়া তাহার কীর্তন শুনিবে।

পরদিন হরিশের গান শুনিবার নিমন্ত্রণ হইলো ; শুনিয়া বাড়িতে ফিরিতে একটু অধিক রাত্রি হইয়া গেল।

নির্মলা উপরের খোলা বারান্দায় রাস্তার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিলো; স্বামীকে উপরে উঠিতে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলো, গান লাগলো কেমন ?

হরিশ খুশি হইয়া কহিলো, খাসা গায়।

দেখতে কেমন ?

মন্দ না, ভালোই।

নির্মলা কহিলো, তাহলে রাতটা একেবারে কাটিয়ে এলেই তো পারতে।

এই অপ্রত্যাশিত কুৎসিত মন্তব্যে হরিশ ক্রুদ্ধ হইবে কি, বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইলো, কি রকম ?

নির্মলা সক্রোধে বলিলো, রকম ভালোই। আমি কচি খুকী নয়, জানি সব, বুঝি সব। আমার চোখে ধুলো দেবে তুমি ? আচ্ছা—

উমা পাশের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিলো, সভয়ে কহিলো, তুমি করছো কি বৌদি, বাবা শুনতে পাবেন যে !

নির্মলা জবাব দিলো, পেলেনই বা শুনতে।

এই উত্তরের প্রত্যুত্তরে যে উমা কি বলিবে ভাবিয়া পাইলো না, কিন্তু পাছে তাহার উচ্চস্বরে বৃদ্ধ পিতার ঘুম ভাঙিয়া যায় এই ভয়ে সে পরক্ষণেই

জোড়-হাতে ক্রুদ্ধ চাপা গলায় মিনতি করিয়া বলিলো, রক্ষে করো বৌদি, এতো রাত্রে চেঁচিয়ে আর কেলেঙ্কারি কোরো না।

বধুর কণ্ঠস্বর ইহাতে বাড়িলো বই কমিলো না। কহিলো, কিসের কেলেঙ্কারি ? তুমি বলবে না কেন ঠাকুরঝি, তোমার বুকের ভেতরটা তো আর জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে না ! বলিতে-বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিয়া দ্রুতবেগে ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে দ্বারে খিল বন্ধ করিয়া দিলো।

হরিশ কাঠের পুতুলের মতো নিঃশব্দে নীচে আসিয়া বাকি রাতটুকু মক্কেলদের বসিবার বেঞ্চের উপর শুইয়া কাটাইলো। অতঃপর দিন-দশেকের মতো উভয়ের বাক্যলাপ স্থগিত হইয়া গেল।

কিন্তু হরিশকেও আর সন্ধ্যার পরে বাহিরে পাওয়া যায় না। গেলেও তাহার শঙ্কাকুল ব্যাকুলতা লোকের হাসির বস্তু হইয়া উঠিলো। বন্ধুরা বলিতে লাগিলেন, হরিশ, যতো বুড়ো হচ্ছো, রোগও ততো বেড়ে যাচ্ছে হে !

হরিশ অধিকাংশস্থলেই জবাব দিতো না, কেবল খোঁচা বেশি করিয়া বিঁধিলেই বলিতো, এই ঘেন্নায় আমাকে যদি তোমরা ত্যাগ করিতে পারো তো তোমরাও বাঁচো, আমিও বাঁচি।

বন্ধুরা কহিতেন, বৃথা ! বৃথা ! ওকে লজ্জা দিতে গিয়ে এখন নিজেরাই লজ্জায় মরি।

৩

সেবার বসন্তরোগে লোক মরিতে লাগিলো খুব বেশি। হরিশকেও রোগে ধরিলো। কবিরাজ আসিয়া পরীক্ষা করিয়া মুখ গম্ভীর করিলেন, মারাত্মক— রক্ষা পাওয়া কঠিন।

রায়বাহাদুর তখন পরলোকে। হরিশের বৃদ্ধা মাতা আছাড় খাইয়া পড়িলেন। নির্মলা ঘর হইতে বাহির হইয়া কহিলো, আমি যদি সতী মায়ের সতী কন্যা হই, আমার নোয়া-সিঁদুর ঘোচাবে সাধ্যি কার ? তোমরা ওঁকে দেখো, আমি চললুম। এই বলিয়া সে শীতলার মন্দিরে গিয়া হত্যা দিয়া পড়িলো। কহিলো, উনি বাঁচেন তো আবার বাড়ি ফিরবো, নইলে এইখান থেকে ওঁর সঙ্গে যাবো।

সাত দিনের মধ্যে দেবতার চরণামৃত ভিন্ন কেহ তাহাকে জল পর্যন্ত খাওয়াইতে পারিলো না।

কবিরাজ আসিয়া বলিলেন, মা, তোমার স্বামী আরোগ্য হয়েছেন, এবার তুমি ঘরে চলো।

লোকে ভিড় করিয়া দেখিতে আসিলো। মেয়েরা পায়ের ধূলা লইলো, তাহার মাথায় থাবা-থাবা সিঁদুর ঘষিয়া দিলো; কহিলো, মানুষ তো নয়, যেন সাক্ষাৎ মা—বৃদ্ধরা বলিলেন, সাবিত্রীর উপাখ্যান মিথ্যে; না কলিতে ধর্ম গেছে? যমের মুখ থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে নিয়ে এলো!

বন্ধুরা লাইব্রেরী-ঘরে বলাবলি করিতে লাগিলো, সাধে আর মানুষ স্ত্রীর গোলাম হয় হে! বিয়ে তো আমরাও করেছি। কিন্তু এমন নইলে আর স্ত্রী! এখন বোঝা গেল কেন হরিশ সন্ধ্যের পরে বাইরে থাকতো না।

বীরেন উকিল ভক্ত লোক, গত বৎসর ছুটিতে কাশী গিয়া সে সন্ন্যাসীর কাছে মন্ত্র লইয়া আসিয়াছে, টেবিলে প্রচণ্ড করাঘাত করিয়া কহিলো, আমি জানতাম, হরিশ মরতেই পারে না। সত্যিকারের সতীত্ব জিনিসটা কি সোজা ব্যাপার হে? বাড়ি থেকে বলে গেল, যদি সতী মায়ের সতী কন্যা হই তো—উঃ! শরীর শিউরে ওঠে।

তারিণী চাটুজ্যের বয়স হইয়াছে, আফিংখোর লোক। একধারে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে তামাক খাইতেছিলো, হুঁকাটি বেহারার হাতে দিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলো, শাস্ত্রমতে সহধর্মিণী কথাটা ভারি শক্ত। আমার দেখো না, কেবল মেয়েই সাতটা; বিয়ে দিতে দিতে ফতুর হয়ে গেলাম।

অনেকদিন পরে ভালো হইয়া আবার যখন হরিশ আদালতে উপস্থিত হইলো তখন কতো লোক যে তাহাকে অভিনন্দিত করিলো তাহার সংখ্যা নাই।

ব্রজেন্দ্রবাবু সখেদে কহিলেন, ভাই হরিশ, স্ত্রৈণ বলে তোমাকে অনেক লজ্জা দিয়েছি, মাপ কোরো। লক্ষ কেন, কোটি-কোটির মধ্যেও তোমার মতো ভাগ্যবান নেই, তুমি ধন্য।

ভক্ত বীরেন বলিলো, সীতা-সাবিত্রীর কথা না হয় ছেড়ে দাও, কিন্তু খনা, লীলাবতী, গার্গী আমাদের দেশেই জন্মেছিলেন। ভাই, স্বরাজ-ফরাজ যাই-ই

বলো, কিছুতেই হবে না মেয়েদের যতদিন না আবার তেমনি তৈরী করতে পারবো। আমার তো মনে হয়, শীঘ্রই পাবনায় একটা আদর্শ নারী-শিক্ষা-সমিতি গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং যে আদর্শ-মহিলা তার পার্মানেণ্ট প্রেসিডেণ্ট হবেন তাঁর নাম তো আমরা সবাই জানি।

বৃদ্ধ তারিণী চাটুজ্যে বলিলেন, সেই সঙ্গে একটা পণ-প্রথা-নিবারণী সমিতিও হওয়া আবশ্যক। দেশটা ছারখার হয়ে গেল।

ব্রজেন্দ্র কহিলেন, হরিশ, তোমার তো ছেলেবেলায় খাসা লেখার হাত ছিলো, তোমার উচিত তোমার এই রিকভারি সম্বন্ধে একটা আর্টিকেল লিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় ছাপিয়ে দেওয়া।

হরিশ কোনো কথারই জবাব দিতে পারিলো না, কৃতজ্ঞতায় তাহার দুই চক্ষু ছল্‌ছল্‌ করিতে লাগিলো।

৪

মৃত জমিদার গোঁসাইচরণের বিধবা পুত্রবধূর সহিত অন্যান্য পুত্রদের বিষয়-সংক্রান্ত মামলা বাধিয়াছিলো। হরিশ ছিলো বিধবার উকিল। জমিদারের আমলা কে-যে কোন্ পক্ষে জানা কঠিন বলিয়া গোপনে পরামর্শের জন্য বিধবা নিজেই ইতিপূর্বে দুই-একবার উকিলের বাড়ি আসিয়াছিলেন। আজ সকালেও তাহার গাড়ি আসিয়া হরিশের সদর দরজায় থামিলো। হরিশ সসম্ভ্রমে তাঁহাকে নিজের বসিবার ঘরে আনিয়া বসাইলো। আলোচনা পাছে ওঘরে মুহুরির কানে যায়, এই ভয়ে উভয়েই সাবধানে ধীরে ধীরে কথা কহিতেছিলো।

বিধবার কি একটা অসংলগ্ন প্রশ্নে হরিশ হাসিয়া ফেলিয়া জবাব দিবার চেষ্টা করিতেই পাশের ঘরে পর্দার আড়াল হইতে অকস্মাৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠের শব্দ আসিলো, আমি সব শুনছি।

বিধবা চমকিয়া উঠিলো, হরিশ লজ্জা ও শঙ্কায় কাঠ হইয়া গেল।

একজোড়া অতি সতর্ক চক্ষু-কর্ণ যে তাহাকে অহরহ পাহারা দিয়া আছে, এ-কথা সে মুহূর্তের জন্য ভুলিয়াছিলো।

পর্দা ঠেলিয়া নির্মলা রণমূর্তিতে বাহির হইয়া আসিলো, হাত নাড়িয়া

কণ্ঠস্বরে বিষ ঢালিয়া দিয়া কহিলো, ফুস্‌ফুস্‌ করে কথা কয়ে আমাকে ফাঁকি দেবে ? মনেও কোরো না। কই, আমার সঙ্গে তো কখনো এমন হেসে কথা কইতে দেখিনি !

অভিযোগ নিতান্ত মিথ্যা নয়।

বিধবা সভয়ে কহিলো, এ কী কাণ্ড হরিশবাবু !

হরিশ বিমূঢ়ের মতো ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলো, পাগল।

নির্মলা কহিলো, পাগল ? পাগলই বটে। কিন্তু করলে কে শুনি ? বলিয়া সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া সহসা হাঁটু গাড়িয়া বিধবার পায়ের কাছে ঢিপ ঢিপ করিয়া মাথা খুঁড়িতে লাগিলো। মুহুরি কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলো, একজন জুনিয়র উকিল সেইমাত্র আসিয়াছিলো—সে আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইলো, বোস্‌ কোম্পানির বিল সরকার তাহারই কাঁধের উপর দিয়া উঁকি মারিতে লাগিলো এবং তাহাদেরই চোখের সম্মুখে নির্মলা মাথা খুঁড়িতে লাগিলো—আমি সব জানি, আমি সব বুঝি, থাকো, তোমরাই সুখে থাকো। কিন্তু সতী মায়ের সতী কন্যা যদি হই, যদি মনে-জ্ঞানে এক বই দুই না জেনে থাকি, যদি—

এদিকে বিধবা নিজেও কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিতে লাগিলো, এ কি ব্যাপার, হরিশবাবু ! এ কি দুর্নাম দেওয়া—এ কি আমার—

হরিশ কাহারও কোনো প্রতিবাদ করিলো না। অধোমুখে দাঁড়াইয়া শুধু তাহার মনে হইতে লাগিলো, পৃথিবী দ্বিধা হও না কিসের জন্য ?

লজ্জায়-ঘৃণায়-ক্রোধে সেদিন হরিশ সেই ঘরেই স্তব্ধ হইয়া রহিলো, আদালতে বাহির হইবার কথা ভাবিতেও পারিলো না। মধ্যাহ্নে উমা আসিয়া বহু সাধ্যসাধনা এবং মাথার দিব্য দিয়া কিছু খাওয়াইয়া গেল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে বামুনঠাকুর রূপার বাটিতে করিয়া খানিকটা জল আনিয়া পায়ের কাছে রাখিলো। হরিশের প্রথমে ইচ্ছা হইলো লাথি মারিয়া ফেলিয়া দেয়, কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া আজও পায়ের বুড়া আঙুলটা ডুবাইয়া দিলো। স্বামীর পাদোদক পান না করিয়া নির্মলা কোনোদিন জলস্পর্শ করিতো না।

রাত্রে বাহিরের ঘরে একাকী শয়ন করিয়া হরিশ ভাবিতেছিলো, তাহার

এই দুঃখময় দুর্ভব জীবনের অবসান হইবে কবে? এমনি অনেকদিন অনেক রকমেই ভাবিয়াছে, কিন্তু তাহার এই সতী স্ত্রীর একনিষ্ঠ পতিপ্রেমের সুদুঃসহ নাগপাশের বাঁধন হইতে মুক্তির কোনো পথই তাহার চোখে পড়ে নাই!

৫

বছর দুই গত হইয়াছে। নির্মলা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছে যে, খবরের কাগজের খবর মিথ্যা নয়। লাবণ্য যথার্থই পাবনার মেয়ে-ইস্কুলের পরিদর্শক হইয়া আসিতেছে।

আজ হরিশ একটু সকাল-সকাল আদালত হইতে ফিরিয়া ছোটো বোন উমাকে জানাইলো যে, রাত্রের ট্রেনে তাহাকে বিশেষ জরুরি কাজে কলিকাতায় যাইতে হইবে, ফিরিতে বোধহয় দিন-চারেক বিলম্ব হইবে। বিছানা এবং প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় যেন চাকরকে দিয়া ঠিক করিয়া রাখা হয়।

দিন-পনেরো হইলো স্বামী-স্ত্রীতে বাক্যালাপ বন্ধ ছিলো।

রেলওয়ে স্টেশন দূরে, রাত্রি আটটার মধ্যেই মোটরে বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। সন্ধ্যার পর সে মকদ্দমার দরকারি কাগজপত্র হ্যাণ্ডব্যাগে গুছাইয়া লইতেছিলো, নির্মলা আসিয়া প্রবেশ করিলো।

হরিশ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলো, কিছু বলিলো না।

নির্মলা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিলো, আজ কলকাতায় যাচ্ছো?

হরিশ কহিলো, হুঁ।

কেন?

কেন আবার কি! মক্কেলের কাজ, হাইকোর্টে মকদ্দমা আছে।

চলো না, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

তুমি যাবে? গিয়ে কোথায় থাকবে শুনি?

নির্মলা কহিলো, যেখানে হোক। তোমার সঙ্গে গাছতলায় থাকতেও আমার লজ্জা নেই।

কথাটি ভালো এবং সতী স্ত্রীর উপযুক্ত। কিন্তু হরিশের সর্বাঙ্গে যেন বিছুটি মাখাইয়া দিলো। কহিলো, তোমার লজ্জা না থাক, আমার আছে।

আমি গাছতলার পরিবর্তে আপাতত কোনো এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উঠবো স্থির করেছি।

নির্মলা বলিলো, তাহলে তো ভালোই হলো, তাঁর বাড়িতেও স্ত্রী-আছে, ছেলে-মেয়ে আছে, আমার কোনো অসুবিধে হবে না।

হরিশ কহিলো, না, সে হবে না। বলা নেই, কওয়া নেই, বিনা আহ্বানে পরের বাড়ি তোমাকে নিয়ে আমি উঠতে পারবো না।

নির্মলা বলিলো, পারবে না সে আমি জানি, আমাকে সঙ্গে নিয়ে লাবণ্যের ওখানে ওঠা যায় না।

হরিশ ক্ষেপিয়া গেল, হাত-মুখ নাড়িয়া চীৎকার করিয়া কহিলো, তুমি যেমন নোংরা তেমনি মন্দ। সে বিধবা ভদ্রমহিলা, আমিই বা সেখানে যাবো কেন, সেই বা আমাকে যেতে বলবে কেন? তাছাড়া, আমার সময় বা কই! কলকাতায় গিয়ে পরের কাজে তো নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসত পাবো না।

পাবে গো পাবে, বলিয়া নির্মলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল!

দিন-তিনেক পরে হরিশ কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলে স্ত্রী কহিলো, চার-পাঁচদিন বলে গেলে, তিনদিনেই ফিরে এলে যে বড়ো?

হরিশ কহিলো, কাজ চুকে গেল, চলে এলাম।

নির্মলা জোর করিয়া একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিলো, লাবণ্যের সঙ্গে দেখা হয়নি বুঝি?

হরিশ কহিলো, না।

নির্মলা অতিশয় ভালো মানুষের মতো জিজ্ঞাসা করিলো, কলকাতাতেই যদি গেলে, একবার খবর নিলে না কেন?

হরিশ জবাব দিলো, সময় পাইনি।

অতো কাছাকাছি গেলে, সময় একটুখানি করে নিলেই হতো। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ইহার মাসখানেক পরে, একদিন বাহির হইবার সময়ে হরিশ ভগিনীকে ডাকিয়া কহিলো, আজ আমার ফিরতে বোধকরি রাত হয়ে যাবে, উমা।

কেন দাদা?

উমা কাছেই ছিলো, আস্তে বলিলেই চলিতো, কিন্তু কণ্ঠস্বর উঁচুতে

চড়াইয়া অদৃশ্য কাহাকেও উদ্দেশ্য করিয়া উত্তর দিলো, যোগীনবাবুর বাড়িতে একটা জরুরি পরামর্শ আছে, দেরি হয়ে যেতে পারে।

ফিরিতে দেরিই হইলো। রাত্রি বারোটার কম নয়। হরিশ মোটর হইতে নামিয়া বাহিরের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলো। কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে শুনিতে পাইলো, স্ত্রী উপরের জানালা হইতে সোফারকে ডাকিয়া বলিতেছে, আবদুল, যোগীনবাবুর বাড়ি থেকে এলে বুঝি?

আবদুল কহিলো, নেহি মাঈজী, ষ্টেশন সে আতেহেঁ।

ইষ্টিশান? ইষ্টিশান কেন? গাড়িতে কেউ এলো বুঝি?

আবদুল কহিলো, কলকাত্তাসে এক মাঈজী আউর বাচ্চা আয়া।

কলকাতা থেকে! বাবু গিয়ে তাদের নিয়ে এসে বাসায় পৌঁছে দিলেন?

আবদুল হাঁ বলিয়া জবাব দিয়া গাড়ি আস্তাবলে লইয়া গেল।

ঘরের মধ্যে হরিশ আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলো। এরূপ সম্ভাবনার কথা যে তাহার মনে হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু নিজের চাকরকে মিথ্যা বলিবার জন্য অনুরোধ করিতে সে কিছুতেই পারিয়া উঠে নাই। রাত্রে শোবার ঘরের মধ্যে একটা কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড হইয়া গেল।

পরদিন সকালেই লাবণ্য ছেলেকে লইয়া এ বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলো। হরিশ বাহিরের ঘরে ছিলো, তাহাকে কহিলো, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় নেই, চলুন, আলাপ করিয়ে দেবেন।

হরিশের বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিলো, একবার সে এমনও বলিতে চাহিলো যে, এখন অত্যন্ত কাজের তাড়া, কিন্তু সে অজুহাত খাটিলো না। তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া স্ত্রীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে হইলো।

বছর দশেকের ছেলে এবং লাবণ্য। নির্মলা তাহাদের সমাদরে গ্রহণ করিলো। ছেলেকে খাবার খাইতে দিলো এবং তাহার মাকে আসন পাতিয়া সযত্নে বসাইলো, আমার সৌভাগ্য যে, আপনার দেখা পেলাম।

লাবণ্য উত্তর দিয়া বলিলো, হরিশবাবুর মুখে শুনলাম আপনি ক্রমাগত বার-ব্রত আর উপবাস করে-করে শরীরটাকে নষ্ট করে ফেলছেন। এখনো তো বেশ ভালো দেখাচ্ছে না।

নির্মলা সহাস্যে কহিলো, বাড়ানো কথা। কিন্তু এ আবার উনি কবে বললেন ?

হরিশ তখনও কাছে দাঁড়াইয়াছিলো, সে একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল।

লাবণ্য কহিলো, এবার কলকাতায়, খেতে বসে কেবল আপনারই কথা। ওঁর বন্ধু কুশলবাবুর বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি খুব কাছে কিনা। ছাদের ওপর থেকে চেঁচিয়ে ডাকলে শোনা যায়।

নির্মলা বলিলো, খুব সুবিধে তো।

লাবণ্য হাসিয়া বলিলো, কিন্তু তাতেই শুধু হয়নি, ছেলেকে পাঠিয়ে রীতিমতো ধরে আনতে হতো।

বটে !

লাবণ্য বলিলো, আবার জাতের গোঁড়ামিও কম নেই, ব্রাহ্মণদের ছোঁয়া খান না—আমার পিসিমার হাতে পর্যন্ত না। সমস্তই আমাকে নিজে রেঁধে নিজে পরিবেশন করতে হতো। এই বলিয়া সে হাসিমুখে সকৌতুকে হরিশের প্রতি চাহিয়া বলিলো, আচ্ছা,এর মধ্যে আপনার কি লজিক আছে বলুন তো ? আমি কি ব্রাহ্ম-সমাজ ছাড়া ?

হরিশের সর্বাঙ্গ ঝিম্-ঝিম্ করিতে লাগিলো, তাহার মিথ্যাবাদিতা প্রমাণিত হওয়ায় মনে হইলো, এতদিনে মা বসুমতী দয়া করিয়া বোধহয় জঠরে টানিয়া লইতেছেন। কিন্তু পরমাশ্চর্য এই যে, নির্মলা আজ ভয়ঙ্কর উন্মাদ কাণ্ড কিছু একটা না করিয়া স্থির হইয়া রহিলো। সংশয়ের বস্তু অবিসংবাদী সত্যরূপে দেখা দিয়া বোধহয় তাহাকেও হতচেতন করিয়া ফেলিয়াছিলো।

হরিশ বাহিরে আসিয়া স্তব্ধ পাংশুমুখে বসিয়া রহিলো। এই ভীষণ সম্ভাবনার কথা স্মরণ করিয়া লাবণ্যকে পূর্বাহ্নে সতর্ক করিবার কথা বহুবার তাহার মনে হইয়াছে, কিন্তু আত্ম-অবমাননাকর ও একান্ত মর্যাদাহীন লুকোচুরির প্রস্তাব সে কোনো মতেই এই শিক্ষিত ও ভদ্র মহিলাটির সম্মুখে উচ্চারণ করিতে পারে নাই।

লাবণ্য চলিয়া গেলে নির্মলা ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকিয়া বলিলো, ছিঃ—তুমি এমন মিথ্যেবাদী! এতো মিথ্যে কথা বলো ?

হরিশ চোখ রাঙাইয়া লাফাইয়া উঠিলো—বেশ করি বলি, আমার খুশি।

নির্মলা ক্ষণকাল স্বামীর মুখের প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিলো। কহিলো, বলো যতো ইচ্ছে মিথ্যে বলো, যতো খুশি আমাকে ঠকাও। কিন্তু ধর্ম যদি থাকে, যদি সতী মায়ের মেয়ে হই, যদি কায়মনে সতী হই—আমার জন্যে তোমায় একদিন কাঁদতে হবে, হবে, হবে। বলিয়া সে যেমন আসিয়াছিলো তেমনি দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

বাক্যালাপ পূর্ব হইতেই বন্ধ চলিতেছিলো, এখন সেটা দৃঢ়তর হইলো এইমাত্র। নীচের ঘরে শয়ন ও ভোজন। হরিশ আদালতে যায়, আসে, বাহিরের ঘরে একাকী বসিয়া কাটায়—নূতন কিছুই নয়। আগে সন্ধ্যার সময় একবার করিয়া ক্লাবে গিয়া বসিতো, এখন সেটুকু বন্ধ হইয়াছে। কারণ শহরের সেইদিকে লাবণ্যের বাসা।

তাহার মনে হয় পতিপ্রাণা ভার্যার দুই চক্ষু দশ চক্ষু হইয়া দশ দিক হইতে পতিকে অহরহ নিরীক্ষণ করিতেছে। তাহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় তাহা নিত্য। স্নানের পরে আরশির দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইতো, সতী-সাধ্বীর এই অক্ষয় প্রেমের আগুনে তাহার কলুষিত দেহের নশ্বর মেদ-মজ্জা-মাংস শুষ্ক ও নিষ্পাপ হইয়া অত্যন্ত দ্রুত উচ্চতর লোকের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে।

তাহার আলমারির মধ্যে একখানি কালীসিংহের মহাভারত ছিলো। সময় যখন কাটিতো না তখন তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া সতী নারীর উপাখ্যান পড়িতো। কী তার প্রচণ্ড বিক্রম ও কতই না অদ্ভুত কাহিনী। স্বামী পাপী-তাপী যাহাই হোক, কেবলমাত্র স্ত্রীর সতীত্বের জোরেই সমস্ত পাপ মুক্ত হইয়া অন্তে কল্পকালে তাহারা একত্রে বাস করে। কল্পকাল যে ঠিক কতো হরিশ তাহা জানিতো না; কিন্তু সে যে কম নহে এবং মুনি-ঋষিদের লেখা শাস্ত্রবাক্য যে মিথ্যা নহে, এই কথা মনে করিয়া তাহার সর্বাঙ্গ অবশ হইয়া উঠিতো।

পরলোকের ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া সে বিছানায় শুইয়া মাঝে মাঝে ইহলোকের ভাবনা ভাবিতো। কিন্তু কোনো পথ নাই। সাহেবদের হইলে মামলা-মকদ্দমা খাড়া করিয়া এতদিনে যা হোক একটা ছাড়্-রফা করিয়া

সতী

ফেলিতো; মুসলমানদের হইলে তিন তালাক দিয়া বহু পূর্বেই ঝামেলা চুকাইয়া ফেলিতো; কিন্তু নিরীহ, এক-পত্নীব্রত ভদ্র বাঙালী—না, কোনো উপায় নাই। ইংরাজি শিক্ষায় বহু-বিবাহ ঘুচিয়াছে, বিশেষত নির্মলা—চন্দ্র-সূর্য তাহার মুখ দেখিতে পায় না, অতি-বড়ো শত্রুও যাহার সতীত্বে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক লেপন করিতে পারে না, বস্তুত স্বামী ভিন্ন যাহার ধ্যান-জ্ঞান নাই, তাহাকেই পরিত্যাগ! বাপ্‌রে! তাহা হইলে নির্মল নিষ্কলুষ হিন্দু সমাজের মধ্যে কি আর মুখ দেখাইতে পারিবে সে। দেশের লোক খাই খাই করিয়া হয়তো তাহাকে খাইয়াই ফেলিবে।

ভাবিতে-ভাবিতে চোখ-কান গরম হইয়া উঠিতো। বিছানা ছাড়িয়া মাথায় মুখে জল দিয়া বাকি রাতটুকু সে চেয়ারে বসিয়া কাটাইয়া দিতো।

এমনি করিয়া বোধহয় মাসাধিক কাল গত হইয়া গেছে, হরিশ আদালতে বাহির হইতেছিলো, ঝি আসিয়া একখানা চিঠি তাহার হাতে দিলো। কহিলো, জবাবের জন্যে লোক দাঁড়িয়ে আছে।

খাম ছেঁড়া, উপরে লাবণ্যের হস্তাক্ষর। হরিশ জিজ্ঞাসা করিলো, চিঠি আমার, খুললে কে?

ঝি কহিলো, মা।

হরিশ চিঠি পড়িয়া দেখিলো, লাবণ্য অনেক দুঃখ করিয়া লিখিয়াছে, সেদিন আমার অসুখ চোখে দেখে গিয়েও আর একটিবারও খবর নিলেন না —আমি মরলুম কি বাঁচলুম। অথচ বেশ জানেন, এ বিদেশে আপনি ছাড়া আমার আপনার লোকও কেউ নেই। যাই হোক, এ-যাত্রা আমি মরিনি, বেঁচে আছি। এ চিঠি কিন্তু সে নালিশের জন্যে নয়। আজ আমার ছেলের জন্মতিথি, কোর্টের ফেরৎ একবার এসে তাকে আশীর্বাদ করে যাবেন, এই ভিক্ষা।—লাবণ্য

শেষে পুনশ্চ দিয়া জানাইয়াছে যে, রাত্রির খাওয়াটা আজ এইখানেই সমাধা করিতে হইবে। একটুখানি গান-বাজনার আয়োজনও আছে।

চিঠি পড়িয়া বোধকরি ক্ষণকাল বিমনা হইয়া পড়িয়াছিলো হরিশ। হঠাৎ চোখ তুলিতেই দেখিতে পাইলো যে, ঝি হাসি লুকাইতে মুখ নিচু করিলো—অর্থাৎ বাটীর দাসী-চাকরের কাছেও এ যেন একটা তামাশার

ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। এক মুহূর্তে তাহার শিরার রক্ত আগুন হইয়া উঠিলো—ইহার কি সীমা নাই, যতই সহিতেছি ততই কি পীড়নের মাত্রা বাড়িয়া চলিয়াছে?

জিজ্ঞাসা করিলো, চিঠি কে এনেছে?

তাঁদের বাড়ির ঝি।

হরিশ কহিলো, তাকে বলে দাও আমি কোর্টের ফেরৎ যাবো। এই বলিয়া সে বীরদর্পে মোটরে গিয়া উঠিলো।

সে-রাত্রে বাড়ি ফিরিতে হরিশের বস্তুত অনেক রাত্রিই হইলো। গাড়ি হইতে নামিতেই দেখিলো, তাহার উপরের শোবার ঘরের খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া নির্মলা পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হইয়া আছে।

৬

ডাক্তারের দল অল্পক্ষণ হইলো বিদায় লইয়াছে। পারিবারিক চিকিৎসক বৃদ্ধ জ্ঞানবাবু যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, বোধহয় সমস্ত আফিংটাই বার করে ফেলা গেছে, বৌমার জীবনের আর কোনো শঙ্কা নেই।

হরিশ একটুখানি ঘাড় নাড়িয়া কি ভাব যে প্রকাশ করিলো, বৃদ্ধ তাহাতে মনোযোগ করিলেন না, কহিলেন, যা হবার হয়ে গেছে। এখন কাছে কাছে থেকে দিন-দুই সাবধানে রাখলেই বিপদটা কেটে যাবে।

যে আজ্ঞে, বলিয়া হরিশ স্থির হইয়া বসিয়া পড়িলো।

সেদিন বার-লাইব্রেরি ঘরে আলোচনা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও কঠোর হইয়া উঠিলো। ভক্ত বীরেন কহিলো, আমার গুরুদেব স্বামীজি বলেন, বীরেন—মানুষকে কখনো বিশ্বাস করবে না। সেদিন গোঁসাইবাবুর বিধবা পুত্রবধূর সম্বন্ধে যে স্ক্যাণ্ডালটা প্রকাশ হয়ে পড়েছিলো তোমরা তো বিশ্বাস করলে না, বললে—হরিশ এ কাজ করতেই পারে না। এখন দেখলে? গুরুদেবের কৃপায় আমি এমন অনেক জিনিস জানতে পারি তোমরা যা ড্রীম করো না।

ব্রজেন্দ্র বলিলো, উঃ—হরিশটা কী স্কাউণ্ড্রেল! ও-রকম সতী-সাধ্বী স্ত্রী যার—কিন্তু মজা দেখেছো সংসারে? বদমাইশগুলোর ভাগ্যেই কেবল এ-রকম স্ত্রী জোটে।

বৃদ্ধ তারিণী চাটুজ্যে হুঁকা লইয়া ঝিমাইতেছিলেন, কহিলেন, নিঃসন্দেহ। আমার তো মাথার চুল পেকে গেল কিন্তু ক্যারেক্টারে কেউ কখনো একটা স্পট্ দিতে পারলে না। অথচ আমারই হলো সাত-সাতটা মেয়ে, বিয়ে দিতে দিতে দেউলে হয়ে গেলাম।

যোগীনবাবু কহিলেন, আমাদের মেয়ে-ইস্কুলের পরিদর্শক হিসেবে লাবণ্যপ্রভা মহিলাটি দেখেছি একেবারে আদর্শ! গভর্ণমেণ্টে বোধ-করি মুভ করা উচিত।

ভক্ত বীরেন বলিলো, অ্যাবসোলিউটলি নেসেসরি!

সম্পূর্ণ একটা দিন পার হইলো না, সতী-সাধ্বীর স্বামী হরিশের চরিত্র জানিতে আর কাহারও বাকি রহিলো না। এবং সুহৃদ্‌বর্গের কৃপায় সকল কথাই তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিলো।

উমা আসিয়া চোখ মুছিয়া কহিলো, দাদা, তুমি আবার বিয়ে করো।

হরিশ কহিলো, পাগল।

উমা কহিলো, পাগল কেন? আমাদের দেশে তো পুরুষদের বহুবিবাহ ছিলো।

হরিশ কহিলো, তখন আমরা বর্বর ছিলাম।

উমা জিদ করিয়া বলিলো, বর্বর কিসের? তোমার দুঃখ আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি? সমস্ত জীবনটা কি এমনি ব্যর্থ হয়েই যাবে?

হরিশ বলিলো, উপায় কি বোন? স্ত্রী ত্যাগ করে আবার বিয়ে করার ব্যবস্থা পুরুষের আছে জানি, কিন্তু মেয়েদের তো নেই। তোর বৌদিরও যদি এ-পথ খোলা থাকতো তাহলে রাজী হতাম, উমা।

তুমি কি যে বলো দাদা! এই বলিয়া উমা রাগ করিয়া চলিয়া গেল। হরিশ চুপ করিয়া একাকী ঘরের ভিতর বসিয়া রহিলো। তাহার উপায়হীন অন্ধকার চিত্ততল হইতে কেবল এই কথাই বারংবার উত্থিত হইতে লাগিলো, পথ নাই! পথ নাই! এই আনন্দহীন জীবনে দুঃখই ধ্রুব হইয়া রহিলো!

তাহার বসিবার ঘরে তখন সন্ধ্যার ছায়া গাঢ়তর হইয়া আসিয়াছিলো, হঠাৎ তাহার কানে গেল পাশের বাড়ির দরজায় দাঁড়াইয়া বৈষ্ণব ভিখারীর দল কীর্তনের সুরে দূতীর বিলাপ গাহিতেছে। দূতী মথুরায় আসিয়া

ব্রজনাথের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার কাহিনী বিনাইয়া বিনাইয়া নালিশ করিতেছে। সেকালে এ অভিযোগের কি উত্তর দূতীর মিলিয়াছিলো হরিশ জানিতো না, কিন্তু একালে সে ব্রজনাথের পক্ষে বিনা পয়সায় উকিল দাঁড়াইয়া তর্কের উপর তর্ক জুড়িয়া মনে মনে বলিতে লাগিলো, ওগো দূতি, নারীর একনিষ্ঠ প্রেম খুব ভালো জিনিস, সংসারে তার তুলনা নেই। কিন্তু তুমি তো সব কথা বুঝবে না—বললেও না। কিন্তু আমি জানি, ব্রজনাথ কিসের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং একশো বছরের মধ্যে আর ও-মুখো হননি। বংশ-টংশ সব মিছে কথা। আসল কথা শ্রীরাধার একনিষ্ঠ প্রেম। একটু থামিয়া বলিতে লাগিলো, তবু তো তখনকার কালে ঢের সুবিধা ছিলো—মথুরায় লুকিয়ে থাকা চলতো। কিন্তু একাল ঢের কঠিন! না আছে পালাবার জায়গা, না আছে মুখ দেখাবার স্থান। এখন ভুক্তভোগী ব্রজনাথ দয়া করে অধীনকে একটু পায়ে স্থান দিলেই বাঁচি।

সভীন

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক ঠাকুরের দুয়ার ধরিয়া, হাতে-কোলে পূজা দিবার মানত করিয়া মাদুলি কবচ ধারণ করিয়া, ঔষধ খাইয়া নৃত্যকালীর যখন কিছুতেই একটি ছেলে হইলো না, তখন সে জেদ করিয়া নিজে দেখিয়া-শুনিয়া স্বামীর আর-একটি বিবাহ দিলো। একটি ছেলে না হইলে কি ঘর-সংসার মানায়!

স্ত্রীলোক যখন ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে, তখন সে অসাধ্যসাধন করিতে পারে। আজ বাইশ বৎসর যে স্বামী তাহার ছিলো, যাহার জীবনের সহিত তাহার সুখ-দুঃখ জড়াইয়া গিয়াছিলো, সেই স্বামীকে নৃত্যকালী হাসিমুখে প্রশান্ত মনে তরঙ্গিণীকে দান করিয়া, সেই নবীন দম্পতির সেবা ও যত্নের ভার গ্রহণ করিলো। নৃত্যকালী তরঙ্গিণীকে ছোটো বোনটির মতো যত্ন করে, সখার মতো তরঙ্গিণীকে প্রণয়ের দীক্ষা দেয়, নবযৌবনা তরঙ্গিণীর বৃদ্ধ স্বামীকে লইয়া রঙ্গ-রসিকতা করে, তাহাদের দুজনের নূতন প্রণয়ের ভাবলীলা ও কুণ্ঠিত গোপন মিলন-প্রয়াস দেখিয়া কৌতুক ও আনন্দ অনুভব করে।

তরঙ্গিণীও বাপের বাড়ি হইতে অকস্মাৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া দিদির যত্ন-মমতায় একদিনের তরেও মুখ মলিন করিবার অবসর পায় নাই। সে খাইতে না চাহিলেও নৃত্যকালী তাহাকে 'দিদি আমার, বোন্‌টি আমার, লক্ষ্মী আমার' বলিয়া সাধিয়া সাধিয়া বার বার বিবিধ সামগ্রী খাওয়ায়; সে সাজিতে না চাহিলেও দিদি তাহার নিজের হাতে বিচিত্র বস্ত্র-অলঙ্কারে দিনের মধ্যে তাহাকে পাঁচবার পাঁচ রকম করিয়া সাজায়। নৃত্যকালী নিজের হাতে বিবিধ ছাঁদের চুল বাঁধিয়া, টিপ কাটিয়া, আলতা পরাইয়া, তরঙ্গিণীকে জেদ করিয়া জোর করিয়া দিনের মধ্যে পাঁচবার স্বামীর কাছে পাঠাইয়া দেয়।

সংসারের এতটুকু কাজও তরঙ্গিণীকে করিতে হয় না। সংসারের সমস্ত

সেবা ও কর্মের ভার নৃত্যকালীর ; হাসি আনন্দ ও সম্ভোগের জন্যই যেন তরঙ্গিণীর জীবন।

তাহার পর যখন তরঙ্গিণীর সন্তান-সম্ভাবনা হইলো, তখন নৃত্যকালী যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। তাহার এতদিনের সাধ এবার তরঙ্গিণী হইতে পূর্ণ হইবে। সে একটি সোনার চাঁদ কোলে পাইবে। তাহার ঘর সংসার উহার হাসিতে আলো হইয়া উঠিবে। তরঙ্গিণীকে নৃত্যকালী এখন চোখে হারায়, সদাই তাহাকে সাবধান করিয়া রাখে, অনুক্ষণ তাহার সঙ্গে-সঙ্গে সে টিকটিক করিয়া বেড়ায়, কোনো মতে যেন কিছু অনাচার না হয়, কাহারো ছোঁয়াচ নজর না লাগে ; সু-ভালাভালি দুজন দু-ঠাঁই হইয়া গেলে সে বাঁচে। তরঙ্গিণী সন্ধ্যাবেলা মাথার ঘোমটা খুলিয়া থাকিলে, বা এ-ঘর ও-ঘর করিবার সময় মাথায় একটা খড়কুটা গুঁজিয়া না রাখিলে তাহাও নৃত্যকালীর নজর এড়ায় না, সে তরঙ্গিণীকে বলে—পেটের কাঁটাটা আমার কোলে একবার ফেলে দে, তারপর তোর যা খুশি করিস্, আমি আর তোকে তখন কিচ্ছু বলবো না।

যেদিন তরঙ্গিণী প্রসববেদনায় কাতর হইয়া নৃত্যকালীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলো—দিদি, আর আমি বাঁচবো না।—সেদিন নৃত্যকালীও সুখে ও দুঃখে তাহার সহিত কাঁদিয়া ফেলিলো। এই বেদনার ভিতর দিয়া তাহাদের উভয়ের মাতৃত্ব আজ পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিবে।

তরঙ্গিণীর একটি পুত্রসন্তান হইলো। নৃত্যকালী সেই আঁতুড় ঘরেই এক-রাশ করবীফুলের মতো সাদা ধপধপে খোকাকে কোলে করিয়া লইয়া অশ্রু-সজল হাসিমুখে তরঙ্গিণীকে বলিলো—তরি, দেখ-দেখ, আমার কেমন খোকা হয়েছে!

তরঙ্গিণী সুখের গর্বভরা হাসিমুখে বলিলো—দিদি, খোকা তো তোমারই!

সেইদিন হইতে নৃত্যকালীর কাজ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। এতদিন সে একটি বৃদ্ধ খোকা ও একটি তরুণী খুকিকে পরম যত্ন ও আগ্রহে মানুষ করিতেছিলো, এখন আর-একটি নূতন শিশু খোকার ভার তাহার উপর পড়িলো। খোকাকে তেল মাখানো, সেঁক দেওয়া, নাওয়ানো, ধোয়ানো, দুধ খাওয়ানো, কাজল পরানো সমস্ত তাহারই ভার। খোকা সমস্ত দিন-রাত তাহারই কাছে থাকে, এক-একবার কেবল মাই দিবার জন্য সে খোকাকে

সতীন

তরঙ্গিণীর কোলে দেয়। তখন তরঙ্গিণী হাসিয়া বলে—দিদি, তোমার খোকাকে আমি মাই দেবো কেন?

নৃত্যকালী স্নখের হাসিতে দুঃখ ঢালিয়া দিয়া বলে—কি করবো বোন, বিধাতা আমায় বঞ্চিত করেছেন। নইলে কি আমি তোকে এ কষ্টটুকু দিতাম। আমায় বিধাতা দুধ দেন নি, তাই তোকে আমার খোকার দুধ-মা রেখেছি!

নৃত্যকালীর স্বামী একদিন ঠাট্টা করিয়া তাহাকে বলিলো—খোকাকে পেয়ে যে আমাদের একেবারে ভুলে গেলে? আমাদের দিকেও একটু দেখো!

নৃত্যকালী হাসিয়া বলিলো—তোমায় দেখবার জন্যে তো তরিকে এনে দিয়েছি।

স্বামী লজ্জিত হইয়া প্রস্থান করিলো।

তরঙ্গিণী একদিন হাসিয়া বলিলো—দিদি, খোকা হয়ে অবধি তুমি আর আমার খোঁজও করো না যে, তরি মর্‌লো কি বাঁচলো!

নৃত্যকালী তরঙ্গিণীর চিবুক স্পর্শ করিয়া নিজের হস্তাঙ্গুলি চুম্বন করিয়া বলিলো—ষাট ষাট, অমন কথা মুখে আন্‌তে আছে! তুই আমাদের ঘরের লক্ষ্মী, সংসারের সুখ! তুই আমাকে সোনারচাঁদ খোকা দিয়েছিস, আমাদের এই আঁটকুড়ো নিরানন্দ সংসারে হাসি এনেছিস! তুই যে আমার ছোটো বোন, তরি! তোর ঘর-সংসার তুই এখন চিনে শুনে নে—চিরকাল কি দিদির হাততোলা নিয়ে থাকবি? আমায় ছুটি দে, আমি আর সংসারের কেউ নই। আমি আর খোকা এখন দুজনে মিলে খেলা করবার ছুটি নিয়েছি, কাজ করবার অবসর এখন আর আমার নেই। আমি দেখতে-শুনতে পারিনে, তুই এখন সব দেখ-শোন্‌। নিজের শরীরের যত্ন করিস, আর যে বুড়োটাকে তোর হাতে দিয়েছি, সেটাকেও একটু যত্ন করিস।

তরঙ্গিণী লজ্জিত হইয়া বলিলো—না দিদি, সে আমি পারবো না। তোমার কাজ আমি করতে যাবো কেন? তুমি আমায় না দেখলে আমার বড়ো কষ্ট হয়, আমার কিছু ভালো লাগে না।

তরঙ্গিণীকে আবার চিবুক স্পর্শ কবিয়া চুম্বন করিয়া নৃত্যকালী হাসিয়া বলিলো—তুই এখন বড়োসড়ো হয়েছিস, এখনও দিদির হাততোলা হয়ে

থাকলে লোকে বলবে কি? বলবে, তোর ঘর-সংসার তোকে ঠকিয়ে আমি দখল করে বসে আছি।

তরঙ্গিণী দৃষ্টিতে তিরস্কার ভরিয়া নৃত্যকালীর দিকে তাকাইয়া বলিলো—দিদি, যাও তোমার সঙ্গে আড়ি! ফের ওরকম কথা বললে আমি কেঁদে-কেটে অনর্থ করবো কিন্তু বলে রাখছি।

বলিতে বলিতেই তরঙ্গিণীর চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া অভিমান গলিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিলো।

নৃত্যকালী তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া গালে কপালে চুম্বন করিয়া সজল চোখে হাসিয়া বলিলো—পাগলী, এই তুচ্ছ কথায় কাঁদলি!

তরঙ্গিণী নৃত্যকালীর কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অভিমান-ব্যথিত স্বরে বলিলো—কেন তুমি আমাকে অমন কথা বললে? বলো, আর কখনো বলবে না!

নৃত্যকালী তরঙ্গিণীর পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলো—চুপ কর লক্ষ্মীটি, চুপ কর। আমি আর কখনো বলবো না। কিন্তু কখনো যদি তোর সংসারের ভার হাতে নেবার ইচ্ছে হয়, মুখ ফুটে আমায় বলতে লজ্জা করিস নে। তুই বলবামাত্র তোর ঘরকন্না তোকে ছেড়ে দিয়ে আমি সরে একপাশ হবো। কেবল খোকাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিসনে।

তরঙ্গিণী অশ্রুস্নাত মুখখানি তুলিয়া নৃত্যকালীর দিকে বেদনাভরা কাতর-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলো—দিদি, আবার ঐ কথা! আমি যে তোমার ভালোবাসায় কেনা দাসী! আমাকে ও-সব কী বলছো?

নৃত্যকালী তাহার চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলো—তুই আমার বোন, তুই আমার ঘরের লক্ষ্মী, তুই আমার খোকার দুধ-মা! তোকে আমি মন্দ ভেবে কিছু বলিনি! তবু কথাটা বলে রাখলাম!

এমনিতর সুখের মিলনে হাসি-আনন্দে তাহাদের তিনটি প্রাণীর সংসার একটি শিশুকে ঘিরিয়া স্বচ্ছন্দে চলিতে লাগিলো। খোকা দিনে-দিনে তাহার নব-নব আনন্দলীলা প্রকাশ করিয়া সংসারটিকে আনন্দে-হাসিতে সুখে ভরিয়া তুলিতে লাগিলো।

খোকার যখন বছর-দেড়েক বয়স; যখন সে চারটি ধপধপে শাদা দুধের-

দাঁত বাহির করিয়া নৃত্যকালীকে বলে—জি, এবং তরঙ্গিণীকে তা-তি বলিয়া ডাকে; যখন সে দুধ খাইতে ও কাজল পরিতে বিষম আপত্তি জানাইতে শিখিয়াছে; এবং যখন সে হামাগুড়ি দিয়া ঘরের শিশি-বোতল ভাঙিয়া মধু ও তেল একত্র মিশাইয়া পেটে মাথায় মাখিয়া বাঃ বাঃ বলিয়া উল্লাস প্রকাশ করিতে পারিতেছে; তখন একদিন সন্ধ্যাকালে নৃত্যকালী দালানে বসিয়া খোকার সহিত চাঁদা-মামার পরিচয় করিয়া দিতেছিলো এবং চাঁদা-মামাকে খোকার কপালে একটি টিপ দিয়া যাইবার জন্য ধান ভানিলে কুঁড়ো, মাছ কুটিলে মুড়ো, উড়কি ধানের মুড়কির মোয়া দিবার লোভ দেখাইতেছিলো; খোকা তাহার ক্ষুদে ক্ষুদে হাত দুখানি বিস্তারিত করিয়া কচি কলার ছড়ার মতো আঙুলগুলি ঘন ঘন সঞ্চালিত করিয়া চাঁদকে ডাকিয়া ডাকিয়া নিজের কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিতেছিলো—আ, আ চি! এবং এক একবার মাতা নৃত্যকালীর দিকে ফিরিয়া বলিতেছিলো—তা-তি! চি! এমন সময় উঠান হইতে কে একজন রমণী বলিয়া উঠিলো—গেরস্তরা বাড়ি আছে গো?

নৃত্যকালী বলিলো—কে গা?

আগন্তুক রমণীকণ্ঠে উত্তর হইলো—আমরা কুটুম গো!

নৃত্যকালী তরঙ্গিণীকে বলিলো—তরি, দেখ তো কে?

তরঙ্গিণী উঠিয়া দালানের ধারে গিয়াই বলিয়া উঠিলো—ওমা, বামা যে!

বামা হাসিয়া গালায় আঁচলের খুঁটটা দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিলো—মা-ঠাকরুণের সঙ্গে গঙ্গা নাইতে এইচি।

তরঙ্গিণী বলিলো—মাসিমার সঙ্গে! কৈ, মাসিমা কোথায়?

বামা পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলো—মা-ঠাকরুণ, কৈ গো, এসো না গো।

আর-একটি রমণীমূর্তি অন্ধকার আবছায়া হইতে অগ্রসর হইয়া আসিলো। তরঙ্গিণী তাড়াতাড়ি দালান হইতে উঠানে নামিয়া গিয়া দ্বিতীয় রমণীর পদধূলি লইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলো—দিদি, আমার মাসিমা এসেছেন।

নৃত্যকালী খোকাকে কোলে করিয়া দালানের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলো। সে তরঙ্গিণীর আহ্বানে উঠানে নামিয়া গিয়া তরঙ্গিণীর মাসিমার পদধূলি লইয়া বলিলো—এসো মা, এসো!

মাসিমা নৃত্যকালীকে লক্ষ্য না করিয়াই তরঙ্গিণীকে বলিলো—তরু, এই বুঝি তোর খোকা ?

এই প্রশ্নে তরঙ্গিণীর কেমন লজ্জা বোধ হইলো। খোকা কেবল তাহার, এ-কথা সে নৃত্যকালীর সম্মুখে কেমন করিয়া স্বীকার করিবে ? খোকা যে তাহার দিদিরই বেশি, ইহাও বা সে কেমন করিয়া একজন আগন্তুক বাহিরের লোককে বুঝাইবে ? তাহারা দুই সতীন স্নেহ ও সখিত্বের যে মধুর সম্পর্ক পাতাইয়া নিরুপদ্রবে খোকাকে লইয়া আনন্দে আছে, তাহার মধ্যে একজন অপর লোক আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে তরঙ্গিণীর মনের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হইলো। তরঙ্গিণীর মনে হইলো—তাহারা বেশ ছিলো, তাহাদের এই সুখ-নীড়ের মধ্যে তাহার মাসিমা কেন আসিয়া পড়িলো, তাহার মাসিমা কি তাহাদের ঠিক করিয়া বুঝিতে পারিবে ? তরঙ্গিণী আর মাসিমার দিকে চাহিতে পারিলো না। সে কোনো কথা না বলিয়া লজ্জিত মুখ নত করিয়া রহিলো।

মাসিমা এই সলজ্জ নীরবতা তরঙ্গিণীর নব-মাতৃত্বের লক্ষণ মনে করিয়া হাত বাড়াইয়া খোকাকে বলিলো—এসো দাদাবাবু, এসো !

খোকা দুই হাতে নৃত্যকালীর বুকের ও পিঠের কাপড় মুঠি করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া নৃত্যকালীর বুকের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া লাগিয়া গিয়া বলিলো—জি, ভ !

নৃত্যকালী খোকাকে একটু ঠেলিয়া মাসিমার দিকে আগাইয়া দিয়া বলিলো—যাও লক্ষ্মী মাণিক আমার, যাও ! উনি দিদিমা ! ভয় কি ?

খোকা সে কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলো—ভ !

বামা এক-মুখ হাসিয়া অগ্রসর হইয়া হাত বাড়াইয়া বলিলো—আমার ঠেঞে এসবে খোকাবাবু ?

খোকা তেমনিভাবে নৃত্যকালীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলো—ভ ! ভ !

মাসিমা অপ্রতিভ হইয়া বলিলো—অচেনা লোকের কাছে যায় না বুঝি ? এই নাও দাদামণি, দেখো !

মাসিমা দুটি টাকা বাহির করিয়া খোকার সম্মুখে ধরিলো। খোকা টাকা লইতে কিছুমাত্র উৎসাহ না দেখাইয়া কেবলি বলিতে লাগিলো—ভ ! ভ !

সতীন

তখন নৃত্যকালী তরঙ্গিণীকে বলিলো—তরি, তুই নে তো। তোর কাছে গিয়ে যদি মাসিমার কাছে যায়।

তরঙ্গিণী হাত পাতিলো।

খোকা নৃত্যকালীকে জড়াইয়া থাকিয়াই বলিলো—তা-তি, ভ!

মাসিমা অপ্রভিত হইয়া তরঙ্গিণীকে বলিলো—তরু, তোর ছেলে তো বাছা আমার কাছে আসবে না। এই নে, তোর বেটাকে সন্দেশ কিনে খাওয়াস। মিষ্টিমুখ হলে যদি আমায় মিষ্টি চোখে দেখে।

তরঙ্গিণী একবার নৃত্যকালীর মুখের দিকে তাকাইয়া আবার মাথা নত করিয়া দাঁড়াইলো।

নৃত্যকালী বলিলো—আবার টাকা কেন, মাসিমা! পায়ের ধূলো দিয়ে অমনি আশীর্বাদ করো, আমাদের এই কতো দুঃখের গুঁড়োটুকু বেঁচে থাক! খোকা আমার কোল বাছে না। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছো বাপু, ও মুখই দেখতে পাচ্ছে না। এসো, দালানে এসো! তরি, একখানা কিছু পেতে দে, বসতে।

মাসিমা নৃত্যকালীর কোনো কথায় সাড়া না দিয়া তরঙ্গিণীকে জিজ্ঞাসা করিলো—জামাই কোথায়, ওদিকে জামাই নেই তো?

মাসিমা যে নৃত্যকালীর সহিত কথা কহিতেছে না, ইহা তরঙ্গিণীর মোটেই ভালো লাগিতেছিলো না। কাজেই সেও মাসিমার কোনো কথার জবাব দিতে পারিলো না।

নৃত্যকালী বলিলো—না, উনি বাড়িতে নেই। এসো মাসিমা। তরি, মাসিমার পা ধোবার জল দে, ওঁর গরদখানা দে। মাসিমা কাপড় ছেড়ে জপ করে নিন, আমি খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে জলখাবার করে আনি।

তরঙ্গিণী মাসিমার কাছ হইতে সরিয়া পড়িবার সুযোগ পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেল।

কিন্তু যখন নৃত্যকালী জলখাবার আনিতে গেল, তখন তরঙ্গিণীকে একাকী তাহার মাসিমার কাছে থাকিতে হইলো। ইহাতে সে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলো।

মাসিমা বলিলো—তরু, ঐ তোর সতীন?

'সতীন' শব্দটা তরঙ্গিণীর কানে বাজিলো, সে বলিলো—উনিই দিদি!

—তোকে খুব কষ্ট দেয় দেখছি।

তরঙ্গিণী বিরক্ত হইয়া বলিলো—না মাসিমা, দিদি আমায় ভীষণ ভালোবাসেন।

মাসিমা বিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া বলিলো—আ নেকি, তুই তেমনি নেকিই আছিস এখনো! একটা মিষ্টি কথা বললেই ভুলে যাস! মিছরীর ছুরি মুখে মিষ্টি লাগে বলে মনে করিস যে বুকে যখন বেঁধে, তখনও তেমনি মিষ্টি লাগে? ঐ বুঝি তোর ভালোবাসা। এসে বাড়িতে পা দিতেই তো বুঝতে পারছি, তুই বাড়ির দাসী, আর বাড়ির গিন্নি ঐ ডাইনি মাগী! তরি যা পা ধোবার জল দে, তরি যা কাপড় দে, তরি যা বসতে দে! আর আমি যাই জলখাবার দি! তুই দাসীর খাটনা খেটে মরবি, কিন্তু সংসারটি ওর মুঠোর ভেতর! তোর সংসারে তুই পরের হাত-তোলায় কেমন করে আছিস! আমরা হলে তো একদণ্ড থাকতে পারতাম না!

তরঙ্গিণী বিরক্ত হইয়া বলিলো—এর আর হাততোলা থাকা কি? দিদি যদি অযত্ন করতেন তো কষ্ট হতো! দিদি নিজে না খেয়ে আমায় খাওয়ান, নিজে না পরে উনি আমায় পরান, দিদি আমার ছেলেকে মায়ের বাড়া যত্ন করেন।

মাসিমা হাসিয়া বলিলো—ওরে, তাই তো কথায় বলে—মায়ের চেয়ে যে ভালোবাসে তারে বলে ডা'ন! ঐ ডাইনি মাগী তোকে গুণ করেছে নিয্যস! ছেলেকে অতো ন্যাওটো করচে কেন, তাও বুঝতে পারিসনে, হাবা মেয়ে! ছেলে ওর ন্যাওটো হলে তোকে লাথি-ঝাঁটা-কোস্তা-বাড়ন মারলেও তুই ওর কিছু করতে পারবিনে; ছেলের জন্যে তোকে সব সয়ে থাকতে হবে। দুটো মিষ্টি কথা আর লোক-দেখানো আত্তি, এই দেখেই তুই ভুলেছিস! সতীন সম্পর্ক কি কখনো ভালো হয় রে, নেকি! শক্ত হ, শক্ত হ! এখনো সময় আছে, ছেলেটাকে ডাইনির মায়া থেকে বাঁচা! কথায় না বলে—বাঁঝার আত্তি বাঘিনীর পথ্যি! তাতে এ আবার বাঁঝা সতীন!

তরঙ্গিণী লজ্জায় ঘৃণায় বিরক্ত হইয়া উঠিলো। সে তাহার মাসিমাকে কেমন করিয়া বলিবে যে, যেদিন হইতে সে এ-বাড়িতে আসিয়াছে, সেইদিন

হইতেই স্বামী সম্পূর্ণ তাহার, দিদি তাহার সতীন নয়। তরঙ্গিণী তাড়াতা
উঠিয়া পড়িয়া বলিলো—দেখি, জলখাবার হলো কি না।

মাসিমা খুশি হইয়া বলিলো—হ্যাঁ, নিজের ঘরকন্না নিজে দেখ্‌!

তরঙ্গিণী মনে করিলো সতীন সম্পর্কটা বড়ো খারাপ, সহজেই লো
ভুল বুঝিয়া অবিচার করিয়া বসে। মাসিমা দু'দিন থাকিলেই বুঝিতে পারি
দিদি তাহার কেমন মানুষ।

দু'দিন ছাড়িয়া চারিদিন গেল, মাসিমার ধারণার কোনো পরিবর্তন
বুঝিতে পারিলো না। মাসিমা ও তাঁহার সহচরী বামা নিরন্তর তাহার কা
বিষ উদ্গিরণই করিতেছে।

তরঙ্গিণী অতিষ্ঠ হইয়া একদিন নৃত্যকালীকে বলিলো—দিদি, ওরা ক
যাবে? যোগ-ফোগ তো চুকে-বুকে গেল; আর কতদিন গঙ্গা নাইতে হবে

নৃত্যকালী হাসিয়া বলিলো—কেন তরি, মাসিমা দু'দিন আছেন, তা
তুই ব্যাজার হচ্ছিস কেন?

তরঙ্গিণী নৃত্যকালীর হাসির সঙ্গে হাসিতে পারিলো না। সে গম্ভীরভা
বলিলো—না দিদি, আমরা দুটিতে নিরিবিলি বেশ ছিলাম, কোথা থেকে এ
যোগ নয়তো, গোলযোগ এসে জুটলো! দিদি, পাজি পাঁজিগুলো এ
গোলযোগও বাধাতে জানে?

নৃত্যকালী একটু তিরস্কারের স্বরে বলিলো—ছি, অমন কথা মুখে আন
নেই। মাসিমা শুনতে পেলে কি ভাববেন? তোর বাড়িতে তো আর ওঁ
চিরকাল থাকতে আসেন নি। তুই অতো ব্যস্ত হচ্ছিস কেন?

তরঙ্গিণী কেমন করিয়া বলিবে সে কেন ব্যস্ত হইতেছে। তাহার যে দুঃ
তাহা সহিবারও নয় বলিবারও নয়! তরঙ্গিণী বলিলো—ব্যস্ত হবো না!
খোকা হয়ে অবধি তো তুমি আমায় আগের মতন যত্ন করো না; তার ওপর
মাসিমা এসে তো তোমায় একদণ্ড কাছে পাওয়াই ভার হয়েছে। তুমি আর
কারু বেশি যত্ন করলে আমার বড়ো রাগ হয়?

নৃত্যকালী হাসিয়া তরঙ্গিণীর চিবুক স্পর্শ করিয়া নিজের হস্ত চুম্বন করিয়া
বলিলো—হিংসুটে, ভয় নেই রে, ভয় নেই! তোর দিদিকে তুই না ছাড়লে
কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

ইহার পর তরঙ্গিণী নৃত্যকালীকে আর কিছু বলিতে পারিলো না। সে আস্তে আস্তে গিয়া মাসিমার কাছে বসিয়া বলিলো—মাসিমা, তুমি কবে বাড়ি যাবে ?

—বাড়ি তো শিগগির যাওয়া দরকার। বাড়িতে সব অবিলি করে ফেলে ছড়িয়ে রেখে এসেছি, ইঁদুরে-বাঁদরে কি করেছে তার ঠিক নেই। কিন্তু তোর ঘরকন্নারও তো একটা বিলিবন্দেজ না দেখে আমি নড়তে পারছিনে।

—আমার ঘরকন্নার বিলিবন্দেজ আমি করে নেবো, তার জন্যে তোমার ঘরকন্না অবিলি করে থাকতে হবে না, মাসিমা।

—কেন, আমাকে তুই তাড়াতে পারলে যে বাঁচিস দেখছি !

তরঙ্গিণী অপ্রতিভ হইয়া বলিলো—না, তা কেন। তবে জামাই-বাড়ি এতদিন এসে আছো, আমার ভারি লজ্জা করছে।

—জামাই কি কিছু বলেছে ?

—না।

—তবে ঐ ডাইনি মাগী কিছু বলেছে বুঝি ! যাই দেখি একবার মাগীর ধুদ্ধুড়ে ধুয়ে দিয়ে আসি ! যতো-বড়ো মুখ নয়, ততো-বড়ো কথা ! আমি কি তার বাপের বাড়িতে এসেছি ?—এ আমার আপনার বোনঝির বাড়ি ! খুব করবো আসবো ! একবার কেন, একশোবার আসবো ! কোথায় সে শতেকখোয়ারী হারামজাদী মাগী !

তরঙ্গিণী বিরক্ত হইয়া বলিলো—আঃ, কি করো ? দিদি কিচ্ছু বলেনি।

বামা হাসিয়া পরম বিজ্ঞভাবে বলিলো—মুখে না বলুক মনে মনে বলেছে। গুণ করে নিজের মনের কথাটা অ্যার মনে চালান করে দিইচে।

মাসিমা বলিলো—বামা, আজকে তো শনিবার আছে। আজ সন্ধ্যেবেলা তোর সেই জলপড়াটা তরুকে দিস তো ! গুণ-টুনগুনো কেটে যাবে।

বামা বলিলো—তাই খেয়ো। বড়ো জবর জলপড়া। এ আমাদের গাঁয়ের বিন্দে হাড়ি তুষ্টু গয়লাকে শিখিয়েছিলো ; তার ঠেঞে মোর শিক্ষে। এর ফল পেরতক্ষ হাতে হাতে দেখে নিয়ো। যেমন জলটুকু খাবে অমনি বুক-এস্তক হিম হয়ে যাবে, প্রাণডা যেন জুড়োবে ? আর যে নোক গুণ ওষুধ করেছে তাকে একেবারে বিষ নজরে দেখবে।

দিনের পর দিন অহরহ ও অনুক্ষণ এইরূপ মন্ত্র-জপ শুনিতে শুনিতে ক্রমশ তরঙ্গিণীর মনও ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতে লাগিলো। সত্যই তো, সতীন তাহাকে কেন ভালোবাসিবে, সতীনকে কি কখনো ভালোবাসা যায়? যে স্বামীর ভাগ কাড়িয়া লইয়াছে, তাহাকে ভালোবাসা কি সোজা কথা? আর-একজন মেয়ে যদি নোলক পরিয়া মল বাজাইয়া এখন তাহার স্বামীর হৃদয় জুড়িয়া বসে, তবে কি তরঙ্গিণী তাহাকে একদণ্ডও বরদাস্ত করিতে পারে! সে তাহাকে নখে টিপিয়া মারিয়া তবে নিশ্চিন্ত হয়! নিজের ছেলে হয় নাই বলিয়া নৃত্যকালী তরঙ্গিণীকে ঘরে আনিয়াছিলো; এক্ষণে তাহার ছেলেটি দখল করিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছে। ছেলে হওয়ার পর হইতে নৃত্যকালী তো বাস্তবিকই তাহাকে আর তেমন যত্ন করে না, তাহার খাওয়া-পরা সম্বন্ধে আগের মতো খোঁজ-খবর লয় না। সমস্ত সংসার তাহার মুঠার ভিতর, সে হাত তুলিয়া যাহা দেয়, তাহাই তরঙ্গিণীর। পাছে তরঙ্গিণী নিজের সংসার দেখিয়া-শুনিয়া বুঝিয়া লয়, তাই তাহাকে নৃত্যকালী সংসারের একখানা কুটা ভাঙিয়া দুখানা করিতে দেয় না। তরঙ্গিণীকে একটিও কাজ করিতে না দিয়া নৃত্যকালী যে একাই খাটিয়া মরে, ইহা তো তাহার মমতা নহে, পুরাদস্তর স্বার্থপরতা! তরঙ্গিণীকে সমস্ত হইতে বঞ্চিত করিবার ফন্দি! সমস্তর না হোক, সে অর্ধেকের ভাগী তো? অর্ধেকেরই বা কেন? নৃত্যকালীকে অশ্রদ্ধা করিয়া ত্যাগ করিয়াই না তাহার স্বামী তাহাকে বিবাহ করিয়াছে? তাহার স্বামীর যে পুত্রধনের অভাব নৃত্যকালী হইতে মিটে নাই, তাহা সেই না মিটাইয়াছে? সমস্ত তাহার—স্বামী তাহার, খোকা তাহার, ঘরকন্না তাহার! অথচ তাহার যেন কিছুই নয়—স্বামী যেন নৃত্যকালীর দয়ার দান, খোকা বাজেয়াপ্ত, ঘরকন্না বেদখল? ইহার প্রতিকার তাহাকে করিতেই হইবে।

এতো কথা তরঙ্গিণী নিজে গুছাইয়া মনে ভাবিতে পারে নাই। তাহার মাসিমা ও মাসিমার সহচরী বামা বিনাইয়া বিনাইয়া গুছাইয়া তাহার মনের সম্মুখে এই-সমস্ত কথা দিনের পর দিন সাজাইয়া ধরিতেছিলো।

তরঙ্গিণী এখন মুখ ভার করিয়া থাকে। নৃত্যকালী যদি জিজ্ঞাসা করে—তরি, তোর হলো কি? অমন করে থাকিস কেন?

তরঙ্গিণী বলে—না, কিছু, তো হয়নি। শরীরটা ভালো নেই।

প্রথম-প্রথম নৃত্যকালী মনে করিতো, মাসিমা এতদিন আছে বলিয়া বোধহয় তরঙ্গিণী কুণ্ঠিত ও বিরক্ত হইতেছে। কিন্তু সে অল্প লক্ষ্য করিয়াই বুঝিলো যে, তাহার অনুমান যথার্থ নয়; এখন তরঙ্গিণী সদাসর্বদাই তাহার মাসিমার কাছে-কাছেই থাকে; তিনজনে মিলিয়া সর্বদাই ফিসফিস গুজগুজ হয়, নৃত্যকালী বুঝিলো যে, একটা কিছু ষড়যন্ত্র চলিতেছে। কিন্তু সে তরঙ্গিণীকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলো না।

তরঙ্গিণীর মনে বদ্ধমূল ধারনা হইয়া গেল যে, নৃত্যকালী এতদিন তাহাকে নিছক ঠকাইয়া আসিয়াছে। এখন সংসারের ভার তাহার নিজের হাতে না লইলে নয়। তখন তাহার মনে পড়িলো যে, নৃত্যকালী একদিন তাহাকে বলিয়াছিলো, যেদিন তাহার ইচ্ছা হইবে মুখ ফুটিয়া বলিলেই সে সংসার হইতে সরিয়া যাইবে।

তরঙ্গিণী আস্তে আস্তে গিয়া নৃত্যকালীর কাছে বসিলো। নৃত্যকালী একবার তাহার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলো—তরি, এতদিনে দিদিকে মনে পড়লো? এখন আর দিদির কাছে থাকতে ভালো লাগে না, না?

তরঙ্গিণী বাঁ হাতের বালা ডান হাত দিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিলো—দিদি, ভাঁড়ার-ঘরের আর সিন্দুকের চাবিগুলো আমাকে দাও।

নৃত্যকালী তাহার কথার অর্থ না বুঝিয়া বলিলো—কেন, কি নিবি?

তরঙ্গিণী মাথা নত করিয়া বলিলো—কিছু নেবো না।

—তবে?

—চাবিগুলো আমার কাছেই রাখবো।

—তাহলে সংসার থেকে আমায় এতদিনে ছুটি দিচ্ছিস?

—হ্যাঁ।

নৃত্যকালী হাসিয়া তরঙ্গিণীর মুখ চুম্বন করিয়া বলিলো—আঃ! বাঁচলাম, তরি! তোর ঘরকন্না তোরই তো দেখা উচিত। এই নে, চাবি। কিন্তু খোকাকে কেড়ে নিসনে, লক্ষ্মী বোন আমার!

নৃত্যকালীর চোখ হইতে বড়ো-বড়ো ফোঁটায় দরদর-ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিলো।

তরঙ্গিণী সেখানে আর থাকিতে না পারিয়া উঠিয়া পড়িলো। সে চলিয়া

যাইতেছে দেখিয়া নৃত্যকালী তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলো—তরি, চাবি যে পড়ে রইলো !

তরঙ্গিণী বলিলো—না দিদি, চাবি আমার চাইনে। ও তোমারই থাক।

মাসিমা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া চাবিগুলি হস্তগত করিয়া বলিলো—তরু, বড়ো মেয়ে তোকে চাবি দিচ্ছে, নে। কেমন মেয়ে বাছা, বড়ো মেয়ে চাবি রাখবে না, তুই রাখবি নে, রাখবে কে ? থাক তবে আমারই কাছে।

মাসিমা চাবিগুলি লইয়া তরঙ্গিণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান করিলো। নৃত্যকালী অবাক হইয়া মাসিমার গমনপথের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলো।

মাসিমা গিয়া তরঙ্গিণীকে ভৎ´সনা করিয়া বলিলো—ন্যাকা মেয়ে কোথাকার ; ডাইনির চোখের মায়া-কান্না দেখে অমনি গলে গেলেন! ভাগ্যিস আমি কাছাকাছি ছিলাম !

বামা বলিলো—সব তো লিলে, কিন্তু মাগীর প্যাঁটরাটা তো দেখলে নি। ঐটার মধ্যে ও সব লুকিয়ে রেখে দিইচে।

মাসিমা বলিলো—ভালো বলেছিস্, বামা ! দেখ তরু, মাগীটার প্যাঁটরা একবার খুলে দেখে নিগে যা।

তরঙ্গিণী জোরে ঘাড় নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে বলিলো—সে আমাকে দিয়ে হবে না, মাসিমা।

—তবে আমি বলিগে।

—না মাসিমা, খবরদার—ওরকম করে দিদিকে অপমান করলে আমি মাথায় কাটারী মেরে রক্তগঙ্গা হবো।

মাসিমা অমনি নাকি-কান্নার সুরে বলিয়া উঠিলেন—ওমা, কি সর্বনেশে কথা বলিস, তরু ! যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর ! কি জবর ডাইনি ও মাগী ! তোকে একেবারে বশ করে ভেড়া করে রেখেছে ! তোর যা-খুশি করগে যা ; কালকে আমি বাড়ি চলে যাবো। কেন রে বাপু—নিজের সব বইয়ে-ছইয়ে পরের জন্যে বুকের রক্ত জল করা !

মাসিমা ক্রমশ ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে চক্ষে অঞ্চল আরোপ করিলো। বামাও চোখ মুছিতে লাগিলো। তরঙ্গিণী শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলো ; একটিও সান্ত্বনার কথা বলিলো না।

পরদিন মাসিমার বাড়ি যাইবার কোনো উদ্যোগই দেখা গেল না। বরং উল্টা মাসিমা ভঁাড়ার-ঘরের চাবি হাতে পাইয়া সংসারের বিলিবন্দেজ করিতে মনঃসংযোগ করিলো। রোজ দুধ লওয়া হয় দুই সের—এক সের খোকা খায়, আধ সের খোকার বাবা খায়। বাকি আধ সের নৃত্যকালী ও তরঙ্গিণী খাইতো। মাসিমা আসার পর নৃত্যকালীর দুধের ভাগ মাসিমার বরাদ্দ হইয়াছিলো। সেই বরাদ্দই কায়েমী হইয়া গেল। রাত্রে সকলেই লুচি খাইতো; এখন নৃত্যকালীর জন্য ভাতের বরাদ্ধ হইলো—এয়োস্ত্রী মানুষের দুবেলা ভাত খাওয়াই তো উচিত। মাসিমা বিধবা মানুষ, তাঁহার লুচি তো না খাইলেই নয়! বছরে চারখানা কাপড়ের বেশি কেনা বাজে খরচ, ফোতো নবাবী—নৃত্যকালীর বাক্সভরা কাপড় আছে, পূজার সময় তাহার আর নূতন কাপড় কেনার দরকার নাই। নৃত্যকালী দোক্তা খায় বলিয়া তাহার পানের খরচ বেশি—নেশা-ভাঙ যাহার করিতে হয়, সে নিজের খরচে করুক; সংসার হইতে সে বাজে খরচের জন্য পয়সা কেন পাইবে? বাড়িতে দুজন দাসী ছিলো, একজন সংসারের ঘরকন্নার কাজ করিতো, আর একজন দুই বৌ-এর কাজ করিতো—এখন একজন ঘরকন্নার কাজ করিয়াই ছুটি পায় না, অপরজন তরঙ্গিণীর কাজ করিয়া মাসিমার বাতে তেল মালিশ করিয়া ও মাথার পাকা চুল তুলিয়া সময় পায় না।

নৃত্যকালী কিন্তু হাসিমুখেই এ সমস্ত সহ্য করিতেছিলো। সে একদিনে দোক্তা আর পান খাওয়া ছাড়িয়া দিলো; নিজের কাপড় সে নিজে কাচে; অশ্রদ্ধার দানও সে হাসিমুখে গ্রহণ করে। কেহ তাহাকে কাজ করিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলে—বাড়িতে দুটি বৈ তো ঝি নেই, কুটুম্ব মানুষ বাড়িতে, পাছে তাঁদের কষ্ট হয় তাই ঝিয়েদের ওঁদের কাছে-কাছেই থাকতে বলে দিয়েছি।

এইরূপ বিলিবন্দেজ করিয়া মাসিমা যখন দেখিলো যে, নৃত্যকালী কোনো আপত্তি তুলিলো না, জামাইয়ের কানেও এ-কথা উঠিলো না, তখন সে সাহস পাইয়া তরঙ্গিণীর কানে মন্ত্রজপ করিতে শুরু করিয়া দিলো—দেখ তরু, তুই কি ভাবছিস জানিনে, আমি তোরই ভালোর জন্যে সংসারের খরচ কমিয়ে আনছি —যে দু'পয়সা বাঁচবে সে তোরই, আমার কি বল্ না! কিন্তু মাগী কি শয়তান,

টুঁ শব্দটি করছে না! ও কি তুকতাক করবার মতলবে আছে। তোর সোয়ামীর কাছে তোর যে আদর সে তোর খোকার জন্যেই না? নইলে ও হলো গিয়ে ওর সময়ের বৌ, ওর সোয়ামীর যতখানি টান হবে, ততখানি কিছু আর তোর ওপর হবে না। এখন খোকার কোনো রকম ভালো-মন্দ করতে পারলেই ওর মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। এখন খোকাকে তো ওর ত্রিসীমানায় যেতে দেওয়া ঠিক হবে না। দেখিস্‌নে, খোকাকে সামনে বসিয়ে একদৃষ্টে হাঁ করে কেমন তাকিয়ে থাকে।

তরঙ্গিণীর বুকের মধ্যে ছাঁৎ করিয়া উঠিলো। বাস্তবিক তো সে দেখিয়াছে, নৃত্যকালী খোকাকে সামনে বসাইয়া একদৃষ্টে তাহাকে দেখে। তাই সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলো—অমন করে তাকিয়ে কি হয়?

বামা বলিলো—বুকের রক্ত শুষে লেয় গো, বুকের রক্ত শুষে লেয়! মন্তর পড়ে সাতদিন তাকালেই হাতি মালট খায়, ও তো একরত্তি বাচ্চা! আমাদের গাঁয়ের ইচ্ছে-বুড়ী অমনি করে আমার ভাসুল-পোর পেরাণডা শুষে খেয়েছিলো—না গা মা-ঠাকুরুণ, তুমি তো সব জানো!

মাসিমা মুখ অত্যন্ত ম্লান করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলো—হ্যাঁ মা, জানি বলেই তো ভাবনা! কিন্তু তরু তো কথা শুনবে না। জামাইকে বলে ওকে এক্ষুণি বাড়ি থেকে বিদেয় করে দেওয়া উচিত।

মাসিমার অবিশ্রাম মন্ত্রে-জপে তরঙ্গিণীর মন নৃত্যকালীর উপর বিরূপ হইয়া উঠিলেও সে একবার বাঁকিতেছিলো, এক একবার দিদির প্রাণ-ঢালা স্নেহ স্মরণ করিয়া সমস্ত বিরূপ ভাব মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছিলো; কিন্তু যখন এই বিশ্বাস জন্মিলো যে, তাহার সৌভাগ্যের নিদান বুক-চেরা-ধন খোকাকে প্রাণে মারিবার জন্য নৃত্যকালী চেষ্টায় আছে, তখন তরঙ্গিণীর মন নৃত্যকালীকে একেবারে বিষের মতো বোধ করিতে লাগিলো। তাড়াতাড়ি তরঙ্গিণী স্বামীকে গিয়া বলিলো—ওগো শুনেছো, বড়ো গিন্নি আমার খোকাকে রোজ তুক করে…

নৃত্যকালী কিছু না বলিলেও তাহার স্বামী অনুমানে বুঝিতে পারিতেছিলো যে, মাসিমার ব্যবহার নৃত্যকালীর প্রতি বিশেষ হৃদ্য তো নহেই, নৃত্যকালী যেন কিছু উৎপীড়িত হইতেছে। মাসিমা আড্ডা গাড়িয়া বসিয়া তাহাদের

সুখের সংসারের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটানোতে তরঙ্গিণীর স্বামী তরঙ্গিণীর উপরও একটু বিরক্ত হইয়াই ছিলো, মনে করিতেছিলো সেই বোধহয় মাসিমাকে ধরিয়া বাড়িতে রাখিয়াছে। তাই এখন তরঙ্গিণীকে নৃত্যকালীর নামে লাগাইতে শুনিয়া তাহার কথায় বাধা দিয়া রাগ করিয়া বলিয়া উঠিলো—যাও যাও, ওসব ছোটোলোকের মতন কথা শুনতে চাইনে। ও বুকের রক্ত জল করে তোমার ছেলে মানুষ করছে কি না, তার এই পুরস্কার! কে তোমাকে এ-সব শেখাচ্ছে? আগে তো তুমি এমন খোলো ছিলে না। ফের ও রকম কথা মুখে আনলে ঝাড়ে-মূলে সবাইকে একদিনে একসঙ্গে দূর করে দেবো!

সূত্রপাতেই স্বামীর নিকট তিরস্কৃত হইয়া তরঙ্গিণী কাঁদিয়া গিয়া মাসিমার কাছে পড়িলো। মাসিমা সব শুনিয়া বলিলো—এ-সমস্তই ঐ ডাইনী মাগীর খেলা; ও মন্তর পড়ে তোর ওপরে জামাইয়ের মন চটিয়ে দিচ্ছে। হয়-নয় তুই ভেবে দেখ—জামাই কি কখনো তোকে এমন করে একদিনও বকেছে?

তরঙ্গিণী দেখিলো, সত্যই তো, স্বামী শুধু সোহাগই করিয়াছে; তিরস্কার আজ এই প্রথম এবং অতি অকস্মাৎ! তখন তরঙ্গিণী ব্যস্ত হইয়া বলিলো—তাইতো মাসিমা, তবে কি হবে?

মাসিমা গম্ভীরভাবে বলিলো—আমি তো বাছা কবে থেকে পয়-পয় করে বলেছি যে, বিষ-দাঁত চেপে বসাবার আগে সাবধান হও। এখন ও কামড়ে ধরেছে—তোর কপাল ভাঙতে আর দেরি নেই। সোয়ামীর মন কেড়ে নিলে, ছেলে কেড়ে নিলে, তোর আর থাকলো কি! আহা, ছেলে নয় যেন রাজপুত্তুর! রোগে-ভোগে মরে, সহ্য হয়; এ আলটপকা গিলে খাবে গো!

সর্বনাশের সম্ভাবনায় শিহরিয়া উঠিয়া তরঙ্গিণী কাঁদিয়া মাসিমার পায়ে পড়িয়া বলিলো—মাসিমা, আমার খোকাকে তুমি বাঁচাও!

মাসিমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলো—বাঁচাই আর কেমন করে, মা—খোকাকে মাগীর চোখের আড়াল না করলে শিবের সাধ্য নেই যে, বাঁচায়। একেবারে মক্‌খম কামড় কামড়েছে। ছেলে দিনকের-দিন একেবারে নীল-মূর্তি হয়ে উঠছে, দেখছিস নে?

তরঙ্গিণী ব্যস্ত হইয়া বলিলো—তবে মাসিমা আমি খোকাকে নিয়ে তোমার সঙ্গে পালিয়ে যাই, চলো।

সতীন

মাসিমা হতাশভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলো—না মা, তাতেই কি নিস্তার আছে! খোকার নাড়ী পোঁতা যে এখানে? নাড়ীর টানে ঐ প্রাণপুরুষকে টেনে বার করে আনবে।

তরঙ্গিণী ভয়ে মূর্ছিতপ্রায় হইয়া বলিলো—মাসিমা, তবে উপায়?

—উপায় এক-মাত্তর ঐ মাগীকে সরানো।

—কেমন করে সরাবো? ওঁকে বল্‌তে গেলাম····

বামা বলিয়া উঠিলো—না না, অমন করে নয়। ডাইনিকে কি অমন করে সরায়? তুক-তরিবৎ করে সরাতে হয়।

তরঙ্গিণী ব্যস্ত হইয়া বলিলো—তুই কিছু জানিস, বামা?

বামা ঘাড় কাত করিয়া আতার বীচির মতো মিশি দেওয়া কালো কালো দাঁত বাহির করিয়া বলিলো—হিঁ। তেরোস্পর্শ দিনে তে-মাথা পথের ওপর ঘেঁটকল আর নিব্বিষষী নিয়ে ঘেঁটুঠাক্‌রুণের পূজো করতে হবে; উপোষ করে ভরসন্ধ্যেবেলা ঠিক যেই একটি তারা উঠেছে, অমনি একটা অফলা শিমুল গাছের কাছে এক পায়ে দাঁড়িয়ে সাতটা পাতা তুলতে হবে, আর মন্তর বলতে হবে—

শিমুল, শিমুল, শিমুল!
শত শত্তুর নির্মূল!
আঠায় কাঁটায় ভরা গা,
শত শত্তুরের মাথা খা।
আঠায় আঁটো
কাঁটায় বেঁধো,
যে আমার সঙ্গে শত্তুরতাই সাধে
তার সঙ্গে শত্তুরতাই সেধো!

তারপর সেই সাতটি পত্তর মাথায় করে নিয়ে উলুঙ্গু হয়ে জলে যমের দুয়োর দক্ষিণমুখো হয়ে একটা ডুব দিতে হবে। পাতা সাতটি ভেসে উঠলেই বুঝবে যে, নিব্বিষষী হয়েছে; আর একটি পাতাও যদি মাথায় লেগে থাকে তবে বুঝবে যে, কামড় তখনো ছাড়েনি।

মাসিমা তাড়াতাড়ি বলিলো—তোর সেই পাগলা-কালীর গুঁড়োটা তরুকে

দিস না? যতো-বড়ো ডাইনি হোক, মা-কালীর কাছে আর বড়াই খাটবে না।

বামা বলিলো—হ্যা, দেখো! ডাকনী যোগিনী হলো গে মা-কালীর দাসী, মা-কালীর কাছে তাদের আবার বড়াই কি? বড্ডি মনে করেছো মা-ঠাকরুণ! সেই গুঁড়োর একরত্তি দিলেই যতো-বড়ো ডাইনি হোক চোক উল্টে পড়তেই হবে। সে গুঁড়ো কি আমি কম কষ্টে যোগাড় করেছিনু? গয়েসপুরের কালীর মোহন্তকে এক বোতল মদ দিয়ে ছিদাম মোড়ল এনেছিলো—বললে না পেত্যয় যাবে, অমাবস্তের রাত্রে চাঁড়ালের মাথার খুলিতে চিতার আগুনে দিয়ে ঐ ওষুধ তৈরী। ওর কি কম মাহাত্তির!

এই বলিয়া বামা করজোড়ে উদ্দেশে কি জানি কাহাকে প্রণাম করিলো। দেখা-দেখি মাসিমাও প্রণাম করিলো। ভয়ে ভয়ে তরঙ্গিণীও করিলো।

তরঙ্গিণী বলিলো—সে কি গুঁড়ো? বিষ-টিষ নয় তো?

বামা বলিলো—আরে রাম রাম! বিষ লয়, বিষ লয়। মা-কালীর পেসাদ, চরণধূলো!

স্থির হইয়া গেল—বামার উপদেশ অনুসারে তরঙ্গিণী নৃত্যকালী-ডাইনীকে ঝাড়াইয়া ভিটাছাড়া করিবে।

একাদশীর দিন সমস্ত তুক্‌তাক করিয়া তরঙ্গিণী এক বাটি দুধের সঙ্গে একটা শাদা গুঁড়া মিশাইয়া রাখিলো, রাত্রে নৃত্যকালীকে খাইতে দিবে, সকালে সে চক্ষু উল্টাইয়া পড়িয়া থাকিবে। তরঙ্গিণী বার বার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলো—হ্যাঁ বামা, ও বিষ-টিষ নয় তো?

বামা বলিলো—বিষ কেন হবেক গো? আমরা কি মানুষ খুন করি?

তরঙ্গিণী ভয়ে বিবর্ণ শুষ্ক মুখে বলিলো—দেখিস বামা, হিত করতে যেন বিপরীত না হয়।

বামা জোর দিয়া বলিলো—না গো না, তোমার কিচ্ছু ভয় নেই।

সন্ধ্যার পর নৃত্যকালী রান্নাঘরে খোকার দুধ আনিতে গেল। তাহাকে রান্নাঘরে যাইতে দেখিয়াই তরঙ্গিণী জিজ্ঞাসা করিলো—দিদি, কি নেবে?

—খোকার দুধ।

—খোকার দুধ ঐ ক্ষিত্তুরে বাটিতে আছে। ঐ সরফুলে বাটির দুধ নিয়ো না যেন, ও দুধ তোমার জন্যে আছে।

নৃত্যকালী বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া বলিলো—আমি কি দুধ খাই ?

তরঙ্গিণী থতমত খাইয়া বলিলো—মাসিমার আজ একাদশী কিনা, তাই একটু রেখেছি।

নৃত্যকালী আর কিছু না বলিয়া রান্নাঘরে গিয়া দু-বাটির দুধ এক করিয়া খোকাকে খাওয়াইতে লইয়া গেল।

তরঙ্গিণী দেখিলো যে, নৃত্যকালী জগন্নাথী-বাটিতেই দুধ লইয়া গেল। কিন্তু তাহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলো। সেই শাদা গুঁড়া মা-কালীর চরণ-রেণু বলিয়া এতক্ষণ মনকে বোকা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও, ভুলক্রমে খোকার তাহা খাওয়ার সম্ভাবনা মনে করিয়া তরঙ্গিণী ব্যস্ত ও চঞ্চল হইয়া উঠিলো। সেই শাদা গুঁড়া যে বিষ, ইহা এখন সে নিজের মনের কাছে কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিলো না। সে ভাবিতে লাগিলো শাদা গুঁড়া মিশাইয়াছিলো সরফুলে বাটিতেই তো ঠিক ? শ্রীক্ষেত্রের বাটিতে তো নয় ? ভাবিতে ভাবিতে তাহার সমস্ত গোলমাল ঠেকিতে লাগিলো—একবার মনে হয়, শ্রীক্ষেত্রের বাটিতে গুঁড়া মিশাইয়াছে, একবার মনে হয় সরফুলে বাটিতে। সে ব্যস্ত হইয়া রান্নাঘরে যে বাটি আছে তাহাতে আঙুল দিয়া দেখিতে গেল, তলায় গুঁড়া থিতাইয়া আছে কি না। বাটিতে আঙুল দিতেই দেখিলো বাটিতে দুধ নাই, বাটির তলায় গুঁড়া চিক্‌চিক করিতেছে! তরঙ্গিণী একেবারে পাগলের মতো হইয়া ঝড়ের বেগে ঘর হইতে ছুটিয়া যাইতে যাইতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলো—দিদি, ও দুধ খোকাকে খাইয়ো না, খোকাকে ও দুধ খাইয়ো না।

তরঙ্গিণী ছুটিয়া আসিয়া দালানে উঠিয়া দেখিলো, নৃত্যকালী খোকাকে ঝিনুকে করিয়া দুধ খাওয়াইতেছে। তরঙ্গিণী বাঘিনীর মতো ঝাঁপাইয়া পড়িয়া এক হাতে নৃত্যকালীর হাত চাপিয়া ধরিয়া অপর হাতে বাটি তুলিয়া এক নিশ্বাসে সমস্ত দুধটা নিজে খাইয়া ফেলিয়া বাটিটা দূরে আছড়াইয়া ফেলিয়া দিলো।

নৃত্যকালী হাসিয়া গড়াইতে গড়াইতে বলিলো—আ মর পোড়ারমুখী, তুই দিনেকের-দিন পাগল হচ্ছিস নাকি, ছেলের দুধটা খেয়ে ফেললি। আমি এখন খোকাকে কি খাওয়াই বল্ তো ?

এতক্ষণে তরঙ্গিণী নিশ্বাস লইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া নৃত্যকালীর পা ধরিয়া বলিলো—দিদি-গো, শয়তানীদের কথা শুনে দুধে আমি বিষ দিয়েছিলাম, তোমায় খাওয়াবো বলে। তার ফল আমি হাতে হাতে পেলাম। দিদি, তোমার খোকাকে তুমি বাঁচাও।

নৃত্যকালী তাড়াতাড়ি খোকার গলায় আঙুল দিতেই খোকা যে দু-ঝিনুক দুধ খাইয়াছিলো তাহা তুলিয়া ফেলিলো। সুস্থ সবল খোকা অল্পক্ষণ একটু অবসন্ন হইয়া থাকিয়া চাঙ্গা হইয়া উঠিলো। কিন্তু ডাক্তারের শত চেষ্টাতেও তরঙ্গিণী বাঁচিলো না। তরঙ্গিণী অজ্ঞান হইয়া পড়িতে-পড়িতেও ক্ষীণকণ্ঠে একবার জিজ্ঞাসা করিলো—দিদি, খোকা বাঁচবে?

নৃত্যকালী তরঙ্গিণীর ভূমিলুণ্ঠিত মস্তক কোলে তুলিয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলো—বাঁচবে তরি, বাঁচবে। তুইও বেঁচে উঠে তোর খোকাকে তুই নে, আমি আর তোর খোকার ভাগ নেবো না।

তরঙ্গিণী আশ্বস্ত হইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলো—আঃ। দিদি, তোমার খোকা, তোমারই রইলো! আমার অপরাধ ক্ষমা কোরো! পায়ের ধুলো দাও, দিদি! একবার ওঁকে ডাকো, পায়ের ধুলো নেবো!

এমন সময় মাসিমা ডুকরাইয়া কাঁদিয়া আসিয়া পড়িলো—ওরে তরু রে, একি সর্বনাশ হলো রে!

তরঙ্গিণী নৃত্যকালীর দিকে বিষাবিষ্ট ম্লান দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলো—আঃ দিদি! ওদের এখান থেকে দূর করে দাও!

রাতজাগা

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৩৩৯ সালের শরৎকাল।

বিবাহের মাস-তিনেক পরে শ্বশুর মহাশয়ের পল্লীনিবাস সোনাইদহে চলিয়াছি। সঙ্গে আছেন তৃতীয় শ্যালক অভয়পদ। আমাকে লইয়া যাইবার জন্য ইনি কলিকাতার গৃহে অপেক্ষা করিয়াছিলেন। বাকি সকলে, মায় সেই ব্যক্তি, যাঁহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সুদীর্ঘ দুর্গম পথ উৎসাহ-ভরে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি, পূর্বেই সোনাইদহে গমন করিয়াছেন।

রেল হইতে নামিতে আর অধিক বিলম্ব ছিলো না। একটা ষ্টেশনের পরেই সোনাইদহর নিকটতম রেল-ষ্টেশন। তথা হইতে তিন মাইল অপ্রশস্ত কাঁচা পথ ভাঙিয়া গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে হইবে।

কথায় কথায় অভয়পদকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমাদের সোনাইদহে আকর্ষণের বস্তু কি আছে, অভয়পদ?'

অভয়পদর মুখে মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিলো; বলিলো, 'সোনাদহে আকর্ষণের বস্তু? তবেই হয়েছে! একমাত্র বনজঙ্গল আর খানাডোবা ছাড়া এমন কোনো বস্তু সেখানে নেই, যা তোমাকে আকর্ষণ করতে পারে।'

মনে মনে বলিলাম, 'ভুল করছো, অভয়পদ। আর কোনো বস্তু না থাকলেও তোমার ভগ্নী নিশ্চয় আছেন, যাঁর আকর্ষণ আমার পক্ষে প্রচুর বলেই মনে করি।'

মুখে বলিলাম, 'কোনো আকর্ষণের বস্তু যদি না-ই থাকে, তাহলে কোন্ সাহসে আমাকে সেখানে টেনে নিয়ে যাচ্ছো?'

আমার কথা শুনিয়া অভয়পদ কিছু না বলিয়া শুধু একটু হাসিলো। বোধকরি সঙ্কোচ বশতঃ বলিতে পারিলো না, ভগ্নীর সাহসে। কিন্তু

অপর যে বস্তুর কথা সে অসঙ্কোচে বলিতে পারিতো, হয় তাহা বলিতে ভুলিয়াই গেল, অথবা সে বস্তুকে সে উল্লেখযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করে না। আমি কিন্তু বর্তমান কাহিনীতে সেই দ্বিতীয় বস্তুর কথাই বলিবো।

ষ্টেশনে নামিয়া দেখিলাম, আমাদের লইয়া যাইবার জন্য লাঠি এবং লণ্ঠন হস্তে দুইজন পাইক, দুইখানা পাল্কী, এবং আসবাবপত্রের জন্য একখানা গোরুর গাড়ি আসিয়াছে।

শুক্ল চতুর্থীর ক্ষীণ চন্দ্রমা বহুক্ষণ অস্তমিত হইয়াছে। তিমিরাবৃত প্রান্তরের বক্ষ ভেদ করিয়া সেই অপ্রশস্ত গ্রাম্য পথের উপর দিয়া বাহিত হইয়া আমরা সোনাইদহ অভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

নিস্তব্ধ পল্লীজননীর নিদ্রালস রাজ্যে পাল্কী-বেহারাদের পথশ্রমনাশক ছড়ার গুঞ্জন শুনিতে শুনিতে এবং পাল্কীর দোলা খাইতে খাইতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম মনে নাই, অভয়পদর ডাকে জাগ্রত হইয়া দেখিলাম, পাল্কী ভূমিতলে অবস্থান করিতেছে।

পাল্কী হইতে বাহির হইতে হইতে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'পৌঁচেছি না-কি, অভয়পদ ?'

অভয়পদ বলিলো, 'প্রায়।'

বাহির হইয়া দেখিলাম আমাদের অগ্রগতির পথ নির্বাধ নহে। সন্ধ্যার পর ঝড় হইয়াছিলো, তাহার ফলে একটা জীর্ণ শিমূল বৃক্ষ পথ জুড়িয়া পড়িয়াছে। রাত্রিকালে সম্পূর্ণরূপে পথ পরিষ্কার করিবার সুবিধা হইয়া উঠে নাই; শুধু একদিকের ডালপালা কিছু কাটিয়া এবং কিছু সরাইয়া কোনো প্রকারে পদব্রজে যাতায়াতের একটু ব্যবস্থা হইয়াছে। শুনিলাম, সেখান হইতে শ্বশুরালয় মাত্র তিন-চার মিনিটের পথ।

চলিতে চলিতে অভয়পদর নিকট অবগত হইলাম, গ্রামের ভিতর দিয়াই যাইতেছি; কিন্তু তাহার কোনো পরিচয় পাইতেছিলাম না! পথের দুই পার্শ্বে গাছপালার সহিত জড়িত হইয়া গৃহস্থের ঘরবাড়ি যাহা আছে, সুনিবিড় অন্ধকার এবং সুগভীর নিদ্রাবেশের মধ্যে তাহা

সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত। কোনো গৃহের সামান্য একটু অন্তরাল ভেদ করিয়াও ক্ষীণতম দীপালোকও দেখা যাইতেছিলো না, অথবা অস্ফুটতম কণ্ঠস্বরও শুনা যাইতেছিলো না। শুধু পদতলস্থিত নিশ্চেতন পথ আমাদের কয়েকজনের পদপীড়নে কাতরোক্তি করিয়া করিয়া চতুর্দিকের প্রগাঢ় স্তব্ধতাকে খণ্ডিত করিতেছিলো।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, অদূরে পথের বাম পার্শ্বে একটা ঘরে আলো জ্বলিতেছে। বলিলাম, 'ঐটে তোমাদের বাড়ি না-কি, অভয়পদ?'

অভয়পদ বলিলো, 'না—ওটা রজনী-বউদিদির বাড়ি। আমাদের বাড়ি ও-বাড়ির আরও গোটা-তিনেক বাড়ি পরে।'

নিকটে আসিয়া দেখিলাম, কক্ষটি একেবারে পথের ধারে অবস্থিত; সম্ভবতঃ গৃহের বৈঠকখানা হইবে। কক্ষের ভিতর জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া একটি ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর বয়স্কা সুন্দরী স্ত্রীলোক; পরিধানে চওড়া লালপাড় শাড়ি; কণ্ঠের সোনার হার এবং দুই হস্তের সোনার চুড়ি কেরোসিন লণ্ঠনের স্তিমিত আলোকেও চিক্‌চিক্ করিতেছে।

রাত্রি এগারোটার সময়ে পথিপার্শ্বে জানালার ধারে একটি স্ত্রীলোককে এমনভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলাম।

স্ত্রীলোকটি বলিলেন, 'কি অভয়, তোমরা এলে না-কি?'

অভয়পদ বলিলো, 'হ্যাঁ বউদি, এলাম।'

'জামাই এসেছেন তো?'

'এসেছেন।'

'এক মিনিট দাঁড়াও তো ভাই, জামাইকে একবার ভালো করে দেখে আসি।' বলিয়া লণ্ঠনটা তুলিয়া লইয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া রাংচিতার বেড়ার মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ গেট খুলিয়া স্ত্রীলোকটি পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর আপাদমস্তক আমাকে একবার দেখিয়া লইয়া প্রসন্নকণ্ঠে বলিলেন, 'খাসা জামাই হয়েছে অভয়পদ, রূপে-গুণে খাসা জামাই হয়েছে। গুণের কথা তো শুনেই ছিলাম, দেখতেও ভারি চমৎকার।'

আমার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া অভয়পদ মৃদুস্বরে বলিলো, 'রজনী-বউদিদি। প্রণাম করো।'

অভয়পদর কথা শুনিয়া আমি নত হইয়া রজনী-বউদিদিকে প্রণাম করিলাম।

ক্ষণিকের জন্য আমার মাথার উপর হাত রাখিয়া রজনী-বউদিদি নিঃশব্দে আমাকে আশীর্বাদ করিলেন। তাহার পর আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্মিতমুখে বলিলেন, 'শিমূলগাছটার জন্যে আজ কিন্তু তোমাকে ভারি কষ্ট পেতে হলো।'

আমি বলিলাম, 'না বউদিদি, এমন কিছু কষ্ট পেতে হয়নি।'

সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া রজনী-বউদিদি সহাস্যমুখে বলিলেন, 'ঐ তোমার শ্বশুরবাড়ি থেকে আলো-টালো নিয়ে অনেকে তোমার জন্যে আসছেন। আচ্ছা, এসো ভাই, রাত অনেক হয়েছে, খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়োগে। কাল সকালবেলা তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাবো অখন।'

'নিশ্চয় আসবেন।' বলিয়া আমরা প্রস্থান করিলাম। কয়েক পদ অগ্রসর হইবার পর পিছন হইতে রজনী-বউদিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁ অভয়পদ, ষ্টেশনে আর কাউকে গাড়ি থেকে নামতে দেখলে কি?'

চলিতে চলিতে অভয়পদ বলিলো, 'না, বউদিদি, আর কেউ নামে নি।'

'তাহলে পরের গাড়িতে হয়তো আসবেন।' বলিয়া রজনী-বউদিদি গেট সরাইয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

জানালার গরাদ ধরিয়া রজনী-বউদিদিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কিছু পূর্বে মনের মধ্যে যে বিস্ময় জাগিয়াছিলো, অভয়পদর সহিত তাঁহার কথোপকথন শুনিয়া তাহা অন্তর্হিত হইলো। বুঝিলাম, ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া রজনী-বউদিদি কোনো আত্মীয় ব্যক্তির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

সে-দিনের মতো রজনী-বউদিদির কথা বিস্মৃত হইলাম।

পরদিন বেলা নয়টার সময়ে আমাকে কেন্দ্র করিয়া একটি সুবৃহৎ বৈঠকের অধিবেশন হইয়াছিলো। বৈঠকে বাড়ির প্রায় সকলে তো ছিলেনই, প্রতিবেশিনীদের মধ্যেও কেহ কেহ যোগ দিয়াছিলেন।

কিছুদিন পূর্বে কোন্-এক জয়গোবিন্দ ঘোষের গৃহে সদ্য বিবাহিত চতুর

রাতজাগা

কলিকাতাবাসী জামাতাকে কেমন করিয়া ঠকাইয়া নাকালের চূড়ান্ত করা হইয়াছিলো, জনৈক রহস্যপ্রিয়া ললনা সাড়ম্বরে সেই কাহিনী বিবৃত করিতেছিলেন, এমন সময়ে কক্ষের দরজার দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলো।

চাহিয়া দেখিলাম, দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক লাবণ্যময়ী রমণী। আমার সহিত চোখাচোখি হইতেই রমণীর মুখে মৃদু হাসি দেখা দিলো। হাসি দেখিয়া উৎকট বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া গেলাম। ঠিক এই হাসিই তো গত রাত্রে রজনী-বৌদিদির মুখে দেখিয়াছিলাম। তবে কি এই রমণীই রজনী-বৌদিদি ?

কিন্তু তাই যদি হয়, তাহা হইলে অকস্মাৎ এ কী অদ্ভুত রূপান্তর! সীমন্তে সিঁদুর নাই, অঙ্গে আবরণ নাই, পরিহিত বস্ত্রে পাড় নাই! এ যে একেবারে পরিপূর্ণ বৈধব্যের শুচিশুভ্র মূর্তি! গত রজনীর প্রসাধনরম্যা রজনীবালা আজ যেন বর্ষা-প্রভাতের রজনীগন্ধা হইয়া দেখা দিয়াছে।

মনে সংশয় হইলো, হয়তো-বা ইনি রজনী-বউদিদির বিধবা ভগ্নী হইবেন। কিন্তু পরক্ষণেই সংশয়ের নিরসন হইলো, যখন আমার এক শ্যালিকা 'রজনী-বউদিদি' বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। সংশয় গেল; কিন্তু সমস্যা ঘনীভূত হইলো!

রজনী-বউদিদি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেই একটি তরুণী তাড়াতাড়ি আসন ত্যাগ করিয়া বসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন তাঁকে। রজনী-বউদিদি বসিলেন না, বাম হস্তের চাপে তরুণীকে তাঁহার পরিত্যক্ত স্থানে বসাইয়া দিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন।

মনে হইলো, সকলেই রজনী-বৌদিদিকে বেশ একটু শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম করে।

কথাবার্তার মধ্যে এক সময়ে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কাল রাত্রে কি তিনি এসেছেন, বৌদিদি ?'

আমার প্রশ্ন শুনিয়া রজনী-বৌদিদির মুখে সুস্পষ্ট বিহ্বলতা দেখা দিলো; সসঙ্কোচে বলিলেন, 'কে ?'

বুঝিলাম, যে কারণেই হউক, এ প্রশ্ন করা আমার উচিত হয় নাই। কিন্তু তখন আর উপায়ন্তর ছিলো না; কুণ্ঠিত স্বরে বলিলাম, 'যাঁর জন্যে আপনি জানলার ধারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন ?'

রজনী-বউদিদির মুখ আরক্ত হইয়া উঠিলো। এক মুহূর্ত নির্বাক থাকিয়া আর্তকণ্ঠে বলিলেন, 'তাই কখনো আসেন, বসন্ত! ও আমার একটা মনের খেয়াল! একটা পাগলামী!'

প্রসঙ্গটা পরিবর্তিত করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ অন্য কথা পাড়িলাম। কিন্তু রজনী-বউদিদি অধিকক্ষণ রহিলেন না, দুই-চার মিনিট কথা কহিয়াই প্রস্থান করিলেন! যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, পুনরায় দেখা হইবে।

উগ্র কৌতূহল সহকারে আমার জ্যেষ্ঠা শ্যালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি ব্যাপার বলুন তো, বড়দি!'

জ্যেষ্ঠা শ্যালিকা হেমনলিনী বলিলেন, 'ও এক অদ্ভুত ব্যাপার। দিনের বেলায় রজনী-বউদিদি পুরোদস্তুর বিধবা, কিন্তু সূর্যাস্তের পর থেকেই তিনি ধীরে ধীরে তাঁর বৈধব্যের কথা অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করেন। রাত্রি আটটা সাড়ে-আটটার মধ্যে তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়, তাঁর স্বামী অর্থাৎ বিভূতিদাদা বেঁচে আছেন। তখন তিনি বিধবার বেশ পরিত্যাগ করে সধবার বেশ ধারণ করতে আরম্ভ করেন। মাথায় সিঁদুর পরেন, পায়ে আলতা পরেন, গায়ে অলঙ্কার পরেন, পাড়ওয়ালা শাড়ি পরেন! তারপর দশটা আন্দাজ খানিকক্ষণ স্থির হয়ে উত্তর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর কলকাতা থেকে প্রথম গাড়িতে লোক আসবার সময় থেকে লণ্ঠন জ্বেলে বাইরের ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিভূতিদাদার অপেক্ষায় সমস্ত রাত কাটিয়ে দেন। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ধীরে ধীরে রাত্রের মোহ কাটতে আরম্ভ করে। তখন আবার সিঁদুর মোছা আর আলতা ধোয়ার পালা আরম্ভ হয়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রজনী-বউদিদি আবার যে বিধবাকে সেই বিধবা।'

রজনী-বউদিদির অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কিন্তু রজনী-বউদিদির স্বামীর আসল খবর কি? তিনি বেঁচে নেই নিশ্চয়ই?'

হেমনলিনী বলিলেন, 'খুব সম্ভবতঃ তিনি বেঁচে নেই। কিন্তু নিশ্চয়ই

বেঁচে নেই, তাও বলা যায় না—কারণ মারা গেছেন, সে কথাও নিশ্চয় করে জানা যায় নি।'

ঔৎসুক্য সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তার মানে ?'

হেমনলিনী বলিতে লাগিলেন, 'বিভূতিদাদা লক্ষ্ণৌয়ে আর্মি অর্ডিন্যান্সে চাকরি করতেন। সেইখানেই রজনী-বউদিদির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর তাঁকে তিনি বিয়ে করেন। দু-বছর বিভূতিদাদার সঙ্গে রজনী-বউদিদি পরম সুখে বাস করেন। তাঁদের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার তুলনা ছিলো না। শুনেছি, লক্ষ্ণৌর বাঙালিরা তাঁদের দুজনকে কপোত-কপোতী নাম দিয়েছিলো। তারপর আরম্ভ হলো সর্বনেশে জার্মান যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে বিভূতিদাদাদের অফিসের একটা অংশ মেসোপোটেমিয়ায় গেল, তার সঙ্গে যেতে হলো বিভূতিদাদাকেও। যাবার আগে বিভূতিদাদা রজনী-বউদিদিকে এখানকার বাড়িতে রেখে যান। তখন রজনী-বউদিদির বৃদ্ধ শ্বশুর আর এক বিধবা পিসশাশুড়ী ছাড়া অন্য কেউ বেঁচে নেই। বিভূতিদাদার মেসোপোটেমিয়া যাবার মাস-দুয়েক পরেই, ছেলের দুঃখেই বোধহয়, বিভূতিদাদার বাবা মারা যান; পিসিমা মারা যান বছর-পাঁচেক পরে। মেসোপোটেমিয়া যাওয়ার মাস-দশেক পরে বিভূতিদাদা রজনী-বউদিদিকে চিঠি লিখে জানান যে, তিনি ছ'মাসের ছুটি পেয়েছেন; আর যে তারিখে রাত্রি এগারোটার সময়ে তিনি সোনাইদহে পোঁছবেন, তাও সেই চিঠিতে ঠিক করে লিখে পাঠান। কাল রাত্রে তুমি রজনী-বউদিদিকে যেমনভাবে জানলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছো, পনেরো-ষোলো বছর আগে বিভূতিদাদার আসবার দিনে তিনি ঠিক তেমনি করেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু সেদিন তো বিভূতিদাদা এলেনই না; তারপরও এ পর্যন্ত কোনদিনই আসেন নি। অথচ সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত এই পনেরো-ষোলো বছর বিভূতিদাদার প্রত্যাশায় রজনী-বউদিদি প্রত্যেক রাত্রি জেগে কাটিয়েছেন;—তা শীতই বলো, আর গ্রীষ্মই বলো, বর্ষাই বলো, আর বাদলই বলো। সেই জন্যে এ তল্লাটে ওঁর নামই হয়ে গেছে রাত-জাগা রজনী।'

বলিলাম, 'কিন্তু, বিভূতিবাবু মারা গেছেন, কি বেঁচে আছেন, সেটা

তো বেশিদিন অজানা থাকবার কথা নয়। আর্মি অফিস সে-কথা নিশ্চয় জানিয়ে দেবে। তাছাড়া, বিভূতিবাবু যদি মারা গিয়ে থাকেন, তাহলে রজনী-বউদিদির কম্‌পেন্‌সেশন পাওয়ার কথাও এতে জড়িত আছে।'

হেমনলিনী বলিলেন, 'এ সমস্ত কথা ঠিকই বলছো, তুমি; কিন্তু রজনী-বৌদির সঙ্গে এ-সব কথার আলোচনা করবার সাহসই বা কার আছে, আর গরজই বা কার, বলো? বিভূতিদাদার নিখোঁজ হওয়ার পর রজনী-বউদিদির এক কাকা কয়েকবার এখানে যাতায়াত করেছিলেন। বিভূতি-দাদা যে অফিসে কাজ করতেন সেই অফিসের তিনি একজন বড়ো কর্মচারী। প্রথমবার তিনি রজনী-বউদিদিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে-ছিলেন, কিন্তু পাথর হয়ে রজনী-বউদিদি এক পা-ও তাঁর বাড়ি ছেড়ে নড়তে চাইলেন না। শোনা যায়, তারপর রজনী-বউদিদির কাকা কি-সব কাগজপত্রে রজনী-বউদিদিকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে যান। কেউ কেউ বলে, সেই সব কাগজপত্রই কম্‌পেন্‌সেশন পাওয়ার কাগজপত্র। টাকাটা বার করে হয় তিনি রজনী-বউদিদির নামে জমা করে দিয়েছেন, নয় আত্মসাৎ করেছেন।'

আমি বলিলাম, 'সে যা হয় হোক্, কিন্তু রজনী-বউদিদি যদি তাঁর স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ সঠিক না পেলেন তাহলে দিনেরবেলাই বা তিনি বৈধব্য অবলম্বন করেন কেন?'

হেমনলিনী বলিলেন, 'বারো বৎসর পর্যন্ত তিনি একেবারেই বৈধব্য অবলম্বন করেন নি। বারো বৎসর উত্তীর্ণ হলে স্বামীরই কল্যাণের জন্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি শাস্ত্রের বিধান অনুসারে বিভূতিদাদার কুশ-পুত্তলী দাহ আর শ্রাদ্ধ করিয়ে বিধবা হন, কিন্তু শ্রাদ্ধের দিনের রাত্রেও তিনি বিধবার সজ্জা পরিত্যাগ করে সধবার বেশ ধারণ করেছিলেন। বিভূতিদাদার শ্রাদ্ধের দিন থেকে আজ পর্যন্ত তিনি দিনেরবেলা আটটা সাড়ে-আটটা থেকে চারটে পর্যন্ত দেহে মনে ষোলো আনা বিধবা, আবার রাত্রি আটটা সাড়ে-আটটা থেকে শেষ রাত্রি চারটে সাড়ে-চারটে পর্যন্ত দেহে মনে ষোলো আনা সধবা।'

ক্ষণকাল গভীর বিস্ময়ের সহিত রজনী-বউদিদির কাহিনী মনে মনে

আলোচনা করিয়া বলিলাম, 'আচ্ছা, আপনি যে বললেন, প্রত্যহ রাত্রি দশটার সময়ে রজনী-বউদিদি উত্তরমুখে খানিকক্ষণ স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকেন, সে-ব্যাপারটা কি ?'

হেমনলিনী বলিলেন, 'সে-কথা কেউ বলতে পারে না। বোষ্টম পাড়ার সরলাদিদির সঙ্গে রজনী-বউদিদির সকলের চেয়ে বেশি অন্তরঙ্গতা। তাঁকে পর্যন্ত রজনী-বউদিদি ও-কথা বলেন নি। সরলাদিদি পীড়াপীড়ি করলে, খেয়াল—পাগলামী বলে কথাটা উড়িয়ে দেন।'

মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের পূর্বে রহস্য ভেদ করিতেই হইবে।

দুই-তিন দিনের মধ্যেই রজনী-বউদিদির সঙ্গে একটা হৃদ্যতা স্থাপন করিতে সমর্থ হইলাম। চার-পাঁচদিনের মধ্যে সেই হৃদ্যতা অন্তরঙ্গতায় পরিণত হইলো। রজনী-বউদিদির গৃহ হইলো আমার পক্ষে অবারিতদ্বার। মনে কেমন বিশ্বাস হইলো, বোষ্টম পাড়ার সরলাদিদিকে পিছনে ফেলিয়া আগাইয়া গিয়াছি।

পূজার কয়েকদিনই বিকালের দিকে রজনী-বউদিদির গৃহে আমার চা-পানের নিমন্ত্রণ থাকিতেছিলো। দশমীর দিন সন্ধ্যার পর প্রণাম করিতে গিয়া রজনী-বউদিদির নিকট হইতে পরদিন রাত্রে আহারের নিমন্ত্রণ আদায় করিয়া আসিলাম। রজনী-বউদিদির ইচ্ছা ছিলো, দ্বাদশীর দিন দ্বিপ্রহরে আমাকে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু আমি বলিয়া-কহিয়া নিমন্ত্রণটা একক এবং একাদশীর দিন রাত্রে করাইলাম।

রজনী-বউদিদি স্বীকৃত হইলেন ; কিন্তু বলিলেন, 'তাহলে তুমি সকাল-সকাল এসো—বসন্ত, ন'টার মধ্যেই তোমাকে খাইয়ে দেবো। পাড়াগাঁয়ে রাত বেশি হলে তোমার অসুবিধে হবে।'

পরদিন সকাল-সকালই গেলাম। কিন্তু রজনী-বউদিদি যখন খাবারের কথা বলিলেন, আপত্তি করিলাম ; বলিলাম, 'তাই কখনো হয়, বউদিদি? সমস্ত দিন অভুক্ত থেকে সঙ্কল্প করে তীর্থভূমিতে এসেছি—'

আমাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া বিস্মিত কণ্ঠে রজনী-বউদিদি বলিলেন, 'সমস্ত দিন তুমি অভুক্ত আছো, বসন্ত?'

সহাস্য মুখে বলিলাম, 'আছি।'

'কেন?'

বলিলাম, 'ষোলো আনা পুণ্য অর্জন করতে হলে অভুক্ত থেকেই দেবতা-দর্শন করতে হয়।'

বিস্ফারিত নেত্রে রজনী-বঁউদিদি বলিলেন, 'কিন্তু দেবতা কে?'

বলিলাম, 'স্বর্গীয় প্রেমের এই তীর্থভূমির যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী—যিনি আর কিছুক্ষণ পরে উত্তরমুখী হয়ে অরুন্ধতী দর্শন করবেন।'

আমার কথা শুনিয়া রজনী-বউদিদি উগ্র বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিলেন; বলিলেন, 'এ-কথা তোমাকে কে বললে, বসন্ত?' পরমুহূর্তেই নিজেকে সংশোধিত করিয়া লইয়া বলিলেন, 'কেউ তো বলতে পারে না। এ-কথা তুমি কেমন করে জানলে?'

কৌতুক করিয়া বলিলাম, 'নিদিধ্যাসনের দ্বারা, মানুষ যখন অনন্য-মনে প্রগাঢ় ধ্যানের সাহায্যে কোনো বিষয়ে নিরন্তর চিন্তা করে, তখন সে দুর্জ্ঞেয় রহস্যভেদ করতে সমর্থ হয়। আচ্ছা, আপনার মতো সতী স্ত্রীলোক একমাত্র অরুন্ধতী ছাড়া উত্তর আকাশে আর কী দেখতে পারেন, বলুন তো?'

'কিন্তু, ও তো পাগলামী, ভাই!'

বলিলাম, 'তাহলে সমস্ত দিন অভুক্ত থেকে অরুন্ধতী দর্শনকালে আপনাকে দর্শন করবার এই সঙ্কল্পও আমার পাগলামী।'

রজনী-বউদিদি চুপ করিয়া রহিলেন। সহানুভূতির বেদনায় মানুষের মন যখন একবার উন্মুক্ত হইতে আরম্ভ করে, তখন আর তাহা সহজে সঙ্কুচিত না হইয়া ক্রমশঃ প্রসারিত হইতেই থাকে।

সেদিন যথাসময়ে রজনী-বৌদিদির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমি অরুন্ধতী দর্শন কারলাম।

মেসোপোটেমিয়া যাইবার সময়ে বিভূতিদাদা মেসোপোটেমিয়া এবং বঙ্গদেশের সময় মিলাইয়া প্রত্যহ রাত্রি পৌনে দশটার সময়ে রজনী-

বউদিদিকে অরুন্ধতীর উপর দৃষ্টিপাত করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, তিনিও সেই সময়ে মেসোপোটেমিয়া হইতে অরুন্ধতীর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রতিদিন রজনী-বউদিদির সহিত মিলিত হইবেন। গত ষোলো বৎসর ধরিয়া রজনী-বউদিদি একান্ত নিষ্ঠার সহিত সেই ব্যবস্থা পালন করিয়া আসিতেছেন।

রজনী-বৌদিদির নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম যে, তাঁহার জীবদ্দশায় এ সকল কথা কাহারো নিকট প্রকাশ করিবো না। সেইজন্য কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বে হেমনলিনীকে বলিয়া আসিতে পারি নাই যে, বোষ্টম পাড়ার সরলাদিদিকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছি।

ঠানদিদি

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

সকলে তাঁহাকে বলিতো ঠানদিদি। এছাড়া তাঁহার যে অন্য নাম ছিলো, তাহা কেহ জানিতো কি না সন্দেহ। ঠানদিদি বলিয়া তিনি বুড়ী ছিলেন না। বয়স তাঁহার বছর-চল্লিশ, কিন্তু তাঁহার সমস্ত শরীরে এক নিটোল সৌষ্ঠব ছিলো—যাহা দিন-রাত বয়সকে টিট্‌কারী দিতো। মাথা হইতে পা পর্যন্ত এক অপূর্ব-লাবণ্য ঢলঢল করিতো, চক্ষে তাঁহার বিজলী খেলিতো, অলঙ্কারহীন সহজ স্থির যৌবন তাঁহাকে যেন আগাগোড়া ছাইয়া শোভা-মণ্ডিত করিয়াছিলো। তাঁহার সৌন্দর্য থিনথিনে ধরনের নয়, বেশ লম্বা-চওড়া, আগাগোড়া স্পষ্ট ও বৃহৎ, যেন গ্রেট অক্ষরে ছাপা একখানি অপূর্ব কাব্যগ্রন্থ।

ঠানদিদি বিধবা, তাই তাঁহার গহনা নাই। তিনি মাছও খান না, সাদা কাপড়ও প্রায় পরেন। ইহা ছাড়া বৈধব্যের অপর লক্ষণ তাঁহার ভিতর নাই। অধরে যে তাম্বুলরাগ মাঝে মাঝে তাঁহার না দেখা যাইতো, এমন নহে। একাদশীতে ভাত খাইতেন না, কিন্তু ভোজের যে আয়োজন হইতো, তাহাতে অতৃপ্তির কোনও কারণ ছিলো না। আর সদাসর্বদা তিনি যেমন হাসিয়া গাহিয়া রঙ্গরসে মাতিয়া বেড়াইতেন, তাহা বৈধব্যের সনাতন আদর্শের সঙ্গে মোটেই খাপ খাইতো না।

ঠানদিদির নিন্দার অন্ত ছিলো না। সতী-সাধ্বীরা তাঁহার নাম করিলে আচমন করিতেন। অসতী বলিয়া তাঁহার অপবাদ ছিলো—সে তো তুচ্ছ কথা। দু'একজন সেকেলে বুড়ী ইহাও রটাইয়াছিলেন যে, তিনি আপন হাতে বিষ দিয়া স্বামীকে মারিয়াছেন। সে সম্বন্ধে ঠিক খবরটা কেহ বলিতে পারিতো না, কেন না, সে বিশ বছরের কথা—আর তাঁহার স্বামীর

ঠানদিদি

মৃত্যু হইয়াছিলো দূরদেশে, তাঁর কর্মস্থলে। এখন ঠানদিদি থাকেন পাড়াগাঁয়ে।

এতবড়ো পাপিষ্ঠাকে কিন্তু গাঁয়ের লোক যে ঘৃণা করে, সে-কথা তাহাদের ব্যবহার দেখিয়া কেহ বুঝিতে পারিতো না। ঠাকুর-ঘরের দুয়ারের কাছে তিনি আসিলে সবাই কোনও না কোনও অছিলায় তাঁহাকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিতো, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কেহ বলিতো না—তুমি এখানে আসিও না। কোনও বাড়িতে নিমন্ত্রণের রান্না রাঁধিতে কেহ তাঁহাকে ডাকিতো না, কিন্তু মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে হইলে তাঁহার সব বাড়িতেই ডাক পড়িতো ; কারণ, এই নিভৃত পল্লীতে কেহ তাঁহার মতো নানা রকমের খাবার তৈয়ার করিতে জানিতো না। আর ঠাকুরাণী যাহাতে হাত দিতেন, তাহাই শোভন সুন্দর অমৃততুল্য হইয়া উঠিতো। সকল রকম শিল্পে তাঁহার বিশেষ দখল ছিলো বলিয়া বালিকা হইতে বৃদ্ধা পর্যন্ত সকলে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলো। রোগে তাঁহার মতো সেবিকা গ্রামে কেন, দেশে কোথাও ছিলো না। পাশ-করা শুশ্রূষাকারিণী তাঁহার কাছে লাগে না।

ঠানদিদি মিষ্টভাষিণী, পরপোকারিণী। তিনি বিশ বছর আগে যেদিন বিধবা হইয়া মীরপুর গ্রামে পা দিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে তাঁহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত কেবল দশজনের কাজে ব্যয় হইয়াছে। নিজের তাঁহার কিছু করিবার ছিলো না, তবে সকলের সব কাজ সারিয়াও রোজ নিজের আহারের পারিপাট্যের দিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। ব্রত উপবাস নিয়ম তিনি করিতেন না। কোনও দিন কোনও ঠাকুরের কাছে তাঁহাকে কেউ গড় হইতে দেখে নাই, নিজেও দীক্ষা লন নাই।

এমন একটি অদ্ভুত মেয়েমানুষ যখন প্রথম গাঁয়ে আসিয়া বসিলো, তখন গ্রামের আবালবৃদ্ধ-বনিতা তাঁহার উপর মহা ক্ষিপ্ত। কিন্তু আশ্চর্য এই স্ত্রীলোকটির ক্ষমতা। বৎসর না ফিরিতে সে সকলকে বশ করিয়া ফেলিলো। বৃদ্ধ সুদর্শন ভট্টাচার্য একদিন তাঁহাকে যা-নহে তাহা বলিয়া গালি দিলো, ঠাকুর-দালান হইতে বিদায় করিয়া দিলো। ঠানদিদি হাসিয়া বামাদাসীকে বলিলেন, 'ঠাকুর বলেছেন ঠিক ; দেবতাদের সঙ্গে যে আমার আদা-কাঁচকলা সম্পর্ক, তাতে ওঁদের ওদিকে আমার না ঘেঁষাই ভালো।'

চক্রবর্তী মহাশয়ের পত্নী প্রথম সাক্ষাতে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন, ঠানদিদি হাসিয়া বলিলেন, 'দিদি, শেয়াল-কুকুরকে কি চোখ দিয়েও দেখতে নেই ; নেহাৎ দু'ঘা মারতেও তো দেখতে হয়।'

মোটের উপর, কড়া কথা বা কটু ব্যবহার ধূলার মতো ঝাড়িয়া ফেলিয়া ঠানদিদি তাঁহার হাসিভরা মুখ, বুকভরা সেবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া যখন তিনি তাঁহাদের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন কেহ তাঁহাকে আর ঠেলিয়া রাখিতে পারিলো না।

আমার বিবাহ হইবার পর ঠানদিদি হইলেন আমার প্রধান সখী। তিনি আমার মায়ের বয়সী, তাঁর সঙ্গে সমানভাবে মিশিয়া হাস্য-পরিহাস করিতে আমার কোনও দিন একটুও দ্বিধা হয় নাই, বরং শ্বশুরবাড়ির সঙ্কোচটা তাঁহার সহৃদয়-স্পর্শেই আমার কাটিয়াছিলো। তিনি আমার সহিত রহস্য করিতেন, কিন্তু ঠানদিদি সম্পর্কের আর দশজনের মতো ছেবলামী করা তাঁহার অভ্যাস ছিলো না। তাঁহার কথাবার্তার লঘুত্বের ভিতর এমন এক শান্ত মাধুরী ছিলো যে, সে কথায় মন পাতলা হইতো, কিন্তু তাহাতে ময়লা লাগিতো না, ক্লান্তি আসিতো না।

কালে কালে আমি ঠানদিদির একেবারে অন্ধ উপাসক হইয়া পড়িলাম। তিনি আমার সখী ও সহচরী, আর আমার সব বিষয়ের গুরুও বটে। এমন কোনও কথা ছিলো না—যাহাতে তাঁহার কথা বেদবাক্যের মতো না মানিতাম। তাঁহার চরিত্রের সঙ্গে বিধবার অযোগ্য অনাচার আমি কিছুতেই মিলাইতে পারিতাম না। একদিন পান সাজিতে বসিয়াছি, তাঁহাকে একটি দিলাম, বলিলাম, 'ঠানদি, তুমি পান খাও কেন ?'

'মর্ পোড়ারমুখী, একটা পান যদি বা দিলি, তার আবার খোঁটা দিচ্ছিস্ ?' বলিয়া স্নিগ্ধ হাস্যময় সুন্দর চক্ষু আমার মুখের উপর রাখিলেন।

আমি বলিলাম, 'রঙ্গ রাখো ঠানদি, আজ তোমায় আমি ছাড়ছি না। তোমায় বলতেই হবে, তুমি এ-সব অনাচার করো কেন ?'

'যা করতে নেই, তা করলে কি হয় ?'

'পাপ হয়।'

'পাপ করলে কি হয় ?'

'কে জানে কি হয় ; পাপ করতে নেই, তাই জানি।'

'আমি জানি, পাপ করলে নরকে যায়, সেখানে খুব শাস্তি পায়।'

'এ-কথা তুমি মানো ?'

'হ্যাঁ, আরও মানি যে, বিধবা যদি আচার-নিয়ম মেনে, দেব-দ্বিজে ভক্তি রেখে, সমস্ত জীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য করে, তবে তার পুণ্য হয়, সে স্বর্গে যায়, অনন্তকাল স্বামীর সহবাস করে।'

ঠানদিদির মুখের হাসিটা যেন একটু ঘোর হইয়া উঠিলো।

আমি অবাক হইলাম, বলিলাম, 'এতো যদি মানো, তবে নিষ্ঠা আচার-নিয়ম করো না কেন ?'

'আমি স্বর্গে যেতে চাইনে বলে, স্বামীর ঘাড়ে আর চাপতে চাইনে বলে, নরকে পড়তে চাই বলে—বুঝলি ?' ঠানদিদি আবার হাসিলেন।

আমি বলিলাম, 'আবার ঠাট্টা ? আজ তোমায় সত্যিকথা বলতেই হবে।'

'ঠাট্টা নয়, খাঁটি সত্যি।'—ঠানদিদির চোখ দুটি জলে ভরিয়া উঠিলো।

এমন সময় আমার ছয় মাসের খোকাটি আসিয়া কখন পানের থালাটি ধরিয়া টান মারিয়াছে, আমি দেখিতে পাই নাই। দেখিতে দেখিতে সব ক'টি পান মাটিতে পড়িয়া গেল। আমি খোকার পিঠে এক চড় মারিয়া বলিলাম, 'মরণ হয়না, মুখপোড়া !'

ঠানদিনি অমনি 'ষাট্ ষাট্' বলিয়া খোকাকে কোলে তুলিয়া লইলেন ! মহাব্যস্ত হইয়া তাহার মাথা হইতে পা পর্যন্ত হাত বুলাইতে লাগিলেন। আমাকে বলিলেন, 'দেখ্ বিমলা, অমন কাজটি আর করিস্ না, ভুলেও—স্বপ্নেও যেন এমন অলক্ষণে কথা মনেও আনিস্ না, মুখেও আনিস না।'

আমার প্রাণে তখন বড়ো অনুশোচনা হইতেছিলো, কিন্তু বলিলাম, 'সাধে কি বলি ঠানদি, দেখো দিকিন্—পানগুলো কি করে দিলো !'

'হ্যাঁরে পোড়ারমুখী, তুই তো কথাটা বলে দিয়েই খালাস, কথাটা গিয়ে কোন্ দেবতার কানে উঠে, মনে গাঁথা রইলো, সে খবর তো রাখিস্ না। ষাট্ ষাট্ বাছা, ষাট্ ষাট্।' ঠানদিদির চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িলো।

আমি কিছুক্ষণ কথা কহিলাম না, মনে মনে ঠাকুরদেবতার কাছে মাথা কুটিলাম, আমার বাছার যেন অকল্যাণ না হয়। অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করিয়া রহিলাম, আকাশ-পাতাল কতো কি ভাবিলাম, শেষে আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ ঠানদিদি, দেবতারা কি মানুষের কথা শোনেন ? তবে মানুষ যে দিন-রাত এতো মানত করছে, কই, কার কি হচ্ছে ?'

ঠানদিদি চোখের জল মুছিতে মুছিতে গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'হ্যাঁ, তাঁরা মানুষের কথা শোনেন, রাখেনও ; কিন্তু সে কেবল তাদের শাস্তি দেবার জন্যে। আমার মনের একটা বড়ো গোপন কথা শুনে তাঁরা আমায় কি শাস্তিই দিয়েছেন !'

ঠানদিদি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, 'দেখ্‌ বিমলা, তুই আমাকে জিগ্যেস করেছিলি, আমি অনাচারী কেন ? সে-কথা তোকে খুলে বল্‌বো। সে-কথা শুনলেই বুঝতে পারবি, কেমন করে ঠাকুরদেবতারা আমাদের কথা রাখেন।'

ঠানদিদি তাঁহার জীবন-কাহিনী বলিতে শুরু করিলেন।

'আমি যৌবনে বড়ো সুন্দরী ছিলাম। আমার স্বামীও পরম সুপুরুষ ছিলেন। স্বামী মজঃফরপুরে বড়ো চাকরী করতেন। তাঁর বিদ্যে-বুদ্ধির বিশেষ খ্যাতি ছিলো, মেয়ে-মহলে আমার খ্যাতিও তাঁর চেয়ে কম ছিলো না।

'স্বামী আমাকে যেমন ভালোবাসতেন, সে-রকম বুঝি কোনও স্বামী কখনও কোনও স্ত্রীকে বাসেনি। আমিও তাঁকে খুব ভালোবাসতাম। সারা দিন-রাত্রি আমারসব কাজ, সব চিন্তা কেবল আমার স্বামীকে ঘিরে থাকতো। তিনি সে-কথা জানতেন, আর আমার ছোটো ছোটো সেবা ও ছোটো ছোটো কথায় যে চরিতার্থতা তাঁর মুখে ফুটে উঠতো, তাতে আমার হৃদয়ও গর্বে ফুলে উঠতো। ভাবতাম, আমার মতো ভাগ্যবতী পৃথিবীতে আর আছে কে ?

'আমার বয়েস যখন উনিশ, তখন স্বামীর বয়স পঁচিশ। সেই সময় তাঁর একটা পদোন্নতি হলো। কাজও অনেক বেড়ে গেল। আগে যেমন দিন-রাত তাঁকে আমার কাছে পেতাম, এখন আর তাঁকে তেমন পাই না।

ঠানদিদি

বাড়িতেও তিনি সদা-সর্বদা কাজে এতো ব্যস্ত থাকতেন যে, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা ঘটে উঠতো না।

'এই সময় একদিন আমি জানলার ধারে বসে আছি, দূরে রাস্তা দিয়ে একটা নীলকর সাহেব যাচ্ছে। এমন সময় স্বামী পেছন দিক দিয়ে এসে বললেন, কিগো সতি, অমনি করে বুঝি বিরহ যাপন করছো ?

'আমি হেসে বললাম, কি রকম। অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁকে পেয়ে আমার সমস্ত শিরায় শিরায় নাচন উঠেছিলো, সে-কথা তাঁর কাছে গোপন রাখতে পারলাম না।

'তিনি বললেন, বলি, ডেভিড সাহেবের সঙ্গে কি প্রেমালাপ হচ্ছিলো। বলে তিনি আমার চিবুক টিপে ধরলেন।

'যাও, বলে আমি মহারাগ করে সরে গেলাম।

'তিনি গলবস্ত্র হয়ে বললেন, মাফ কিজিয়ে মেম-সাব, গোস্তাকী কিয়া।

'আমি হেসে বললাম, মাফ করা গেল, কিন্তু এমন গোস্তাকী যেন আর না হয়।

'কিন্তু এমন গোস্তাকী তাঁর প্রায়ই হতো।

'এমন সময় আমার পিসতুতো দেবর শচীকান্ত আমাদের বাড়িতে এসে উঠলো। সে তখন এম-এ পড়ছে, শরীর কিছু খারাপ হওয়ায় সে মজঃফরপুরে হাওয়া খেতে এসেছে।

'শচীকান্তের বয়েস তখন একুশ-বাইশ। সুন্দর না হলেও তার শরীরে সৌষ্ঠব ছিলো। আর চোখ দুটি তার এক অপূর্ব প্রতিভার আলোকে উজ্জ্বল ছিলো। কথাবার্তায় সে অদ্বিতীয়। তার কথায় ও ভাবভঙ্গীতে এমন একটা মিষ্টি মোহের সৃষ্টি করতো যে, একবার বসলে আর তার কথা ফেলে কেউ উঠতে পারতো না।

'শচীকান্ত হলো আমার অবসরের সঙ্গী, কাজে সহচর। দিন-রাত সে কাছে কাছে থাকতো, দিন-রাত তার মধুময় কথা শুনতাম, শুনে শুনে তৃপ্তি হতো না।

'একদিন দুপুরবেলায় আমাদের বাংলোর বারান্দায় বসে আমি জামা সেলাই করছি, শচীকান্ত একখানা বই নিয়ে এসে বসেছে। বই ফেলে রেখে

শচী গল্প করতে লাগলো। আমিও সেলাই ফেলে রেখে শুনতে ও মাঝে মাঝে সায় দিতে লাগলাম। বেলা তিনটে বেজে গেল, তারও পড়া অগ্রসর হলো না, আমার সেলাইও যেমন তেমন রইলো।

'এমন সময় আমার স্বামী হঠাৎ অফিস থেকে চলে এলেন। আমি অন্য-মনস্কভাবে তাঁর দিকে চেয়ে বললাম, কি গো, এতো শিগগির ফিরে এলে?

'বড্ড মাথা ধরেছে—বলে তিনি ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লেন। সেদিকে আমার মোটেই মন ছিলো না বলে সে-কথা আমার কানেই গেল না। আমি শচীকান্তের কথা শুনতে লাগলাম। খানিক পরে তার কথাটা শেষ হলে ঘরে গিয়ে দেখলাম, আমার স্বামী মাথার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছেন।

'আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, বড্ড মাথা ধরেছে কি? ঘরে এসেই আমি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিলাম; বুঝেছিলাম যে, আমার বড়ো ত্রুটি হয়েছে—তাঁর পেছু পেছু ঘরে না আসায়। তাঁর মাথার যন্ত্রণা আমার সেবার মতো অন্য কোনও উপায়ে আরাম হতো না।

'স্বামী গম্ভীরভাবে বললেন, না—যাও।

'আমার বুকের ভেতরে হুড়্-হুড়্ করে উঠলো। আমি আর কথা বলতে পারলাম না। এক গ্লাস জলে ওডিকোলন ঢেলে এনে বললাম, এসো, মাথাটা ধুইয়ে দিয়ে বাতাস করি।

'তিনি কিছু না বলে, আমার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে মাথা ধুয়ে ফেলে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আমি নিতান্ত অপরাধীর মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার বুক ঠেলে কি যেন একটা উঠতে লাগলো। খানিক বাদে আমি নিঃশব্দে পাখা নিয়ে স্বামীর শিয়রে বসে বাতাস করতে লাগলাম। স্বামী কিছু বললেন না।

'শচীকান্ত এসে জিগ্যেস করলো, দাদা, তোমার কি অসুখ করেছে?

'স্বামীর মুখে একটা বিরক্তির চিহ্ন দেখতে পেলাম, কিন্তু তিনি চুপ করে চোখ বুজে পড়ে রইলেন।

'আমি শচীকান্তকে ইঙ্গিতে কথা কইতে বারণ করে সরে যেতে বললাম। তার মুখ থেকে মুখ ফিরিয়ে আমি দেখলাম, স্বামী আমার

ঠানদিদি

মুখের দিকে চেয়ে রয়েছেন। আমি চাইতেই চোখ দুটি বন্ধ করলেন। আমি বুঝলাম, আমার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠলো, বুকের ভেতর কাঁপতে লাগলো।

'স্বামী ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি পাখা রেখে আস্তে আস্তে বারান্দায় উঠে গেলাম। সেখানে শচীকান্ত একখানা তক্তপোষের ওপর ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে কি যেন ভাবছে।

'আমি গিয়ে বসতেই তার মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠলো। তাইতে আমার বুকের ভেতরও যেন কেমন করে উঠলো। আমি যেন একটু কাঁপতে লাগলাম। আস্তে আস্তে গিয়ে সেই তক্তপোষের ওপরে বসে পড়লাম।

'তারপর ক্রমে একথা-ওকথা হতে হতে আমার সঙ্কুচিত ভাবটা কেটে গেল, শচীকান্ত তার সেই প্রাণস্পর্শিভাবে কথা কইতে আরম্ভ করলো, আমি আগ্রহের সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে লাগলাম। কথাটা অতি তুচ্ছ, তাদের কলেজের কোন্ প্রফেসারের কেমন হাস্যকর বিশেষত্ব আছে, তাই সে বর্ণনা করছিলো। কিন্তু কথাগুলো সে এমন সরস করে বলতো, আর তার গলার আওয়াজ এতো আশ্চর্য মিষ্টি ছিলো যে, যতো তুচ্ছ কথাই হোক না কেন, কান পেতে শোনা ছাড়া উপায় ছিলো না।

'এমনি করে কতক্ষণ গেল, বুঝতে পারলাম না। যখন প্রায় সূর্যাস্ত হচ্ছে, এমন সময় শচীকান্ত বললো, বৌদি, খালি কি কথা খাইয়েই আমায় রাখবে না-কি? খাবার দাও?

'আমি লজ্জিত হয়ে একটু হেসে উঠলাম। দেখলাম, শচী একাগ্রচিত্তে আমার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। আমার কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠলো, লজ্জিত নববধূর মতো ঈষৎ হেসে চলে গেলাম।

'মিথ্যে কথা বলবো না। শচীর চোখের ভাষা আমি বুঝেছিলাম। তাতে আমার রাগ করাই উচিত ছিলো; কিন্তু আমি পোড়ারমুখী—তার ওপর রাগ হলো না, লজ্জা পেয়ে আমি তার হৃদয়ের তৃষ্ণা বাড়িয়ে দিলাম, হয়তো বা আশাও দিলাম?

'ঘরের ভেতর আসতেই দারুণ বেদনা অনুভব করলাম। আমার চরিত্রের দুর্বলতা দেখে নিজেকে শত শত ধিক্কার দিতে লাগলাম।

আমার কান্না পেতে লাগলো। কেবলি মনে হতে লাগলো, শচী আমাদের এখানে এলো কেন ?

'আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে খাবারেব থালা নিয়ে শচীকান্তকে দিতে গেলাম ; এবার আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হয়েই গেলাম আর তাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। আমি গম্ভীরভাবে খাবারের থালাটা রেখে যাবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় সে বললো, ওরে বাপ রে, এ যে গন্ধমাদন পর্বত; এতগুলো আমি খাবো কি করে ?

'বললাম, তার মানে আমি হনুমান। বলি, এমন কতো গন্ধমাদন তোমার পেটে রোজ কতটা যায়, খবর রাখো কি ?

'হায়, কোথায় গেল আমার গাম্ভীর্য, কোথায় গেল আমার আত্মরক্ষার আয়োজন !

'সে বললো, কিছুতেই সে এতগুলো খেতে পারবে না, এবং ধরে বসলো আমাকে তার সঙ্গে খেতেই হবে। আমি তার পীড়াপীড়ি এড়াতে পারলাম না। আমার এমন একটা অবস্থা হয়েছিলো যে, সে কিছু জোর করে ধরলে আমি না বলতে পারতাম না ! একটা মিষ্টি তুলে খেলাম। সে বললো, ওতে হবে না, এই পানতুয়াটা নিতে হবে। আমি অস্বীকার করায় সে আমার হাত চেপে ধরে পানতুয়াটা মুখে গুঁজে দিলো। আমার শিরার ভেতর রক্ত হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো।

'ঠিক সেই সময় স্বামী এসে সামনে দিয়ে বারান্দায় ঢুকলেন। আমার সমস্ত শরীর একবার যেন কেঁপে উঠলো। তাঁর মুখের দিকে চাইতে সাহস হলো না।

'তিনি যে কখন বিছানা থেকে উঠে ভেতরের দিক দিয়ে বাগানে বার হয়ে গিয়েছিলেন এবং কতক্ষণ যে সেখানে পায়চারী করে এসেছেন—তার আমি কোনো খবর রাখিনি। খাবার আনবার সময় ঘরে গিয়েছিলাম বটে ; কিন্তু তখন আমি এতো তন্ময় হয়েছিলাম যে, তাঁর কথা মনেই হয়নি, এবং তিনি বিছানায় আছেন কি না লক্ষ্য করিনি।

'আমি অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে ভাঙা গলায় বহু কষ্টে বুকের কাঁপুনি চেপে বললাম, কখন উঠলে তুমি ?

'স্বামী হেসে বললেন, সে খবর নেবার তো অবসর হয়নি, দেওরটিকে নিয়েই ব্যস্ত আছো! তাঁর মুখ প্রশান্ত, কিন্তু যেন একটা ক্ষীণ বিপদের ছায়ায় আবৃত।

'এ কথায় আমি অসম্ভব লাল হয়ে উঠলাম, পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভেতরে ভেতরে কাঁপতে লাগলো, সর্বাঙ্গ যেন ঘেমে উঠলো। ডেভিড সাহেবের কথায় তো কখনও এমন হয়নি!

'শচীকান্তও যেন কেমন একটু অপ্রস্তুতভাবে খাবার খেতে লাগলো।

'কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে, আমি আত্মসংবরণ করে বললাম, মাথাটা ছেড়েছে কি?

'স্বামী বললেন, হ্যাঁ, অনেকটা।

'আমি বললাম, খাবার দেবো কি?

'স্বামী হেসে উত্তর করলেন, আমার কি আর খাবার দরকার আছে? তোমাদের তো হয়ে গেল দেখছি। আমার তো একবার খবরও করলে না?

'তাঁর কথার ভাবে আমার মনের সঙ্কোচ অনেকটা কেটে গেল। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর খাবার এনে দিলাম এবং চা করে দিলাম। তারপর কথায়-বার্তায় সন্ধ্যে হয়ে এলো। আমার মনও অনেকটা পাতলা হয়ে এলো।

'রাত্রে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলাম। আজকের ঘটনায় আমার স্পষ্ট জ্ঞান হলো যে, আমি একটা প্রবল স্রোতে ভেসে ছুটেছি—শচীকান্তের দিকে। আমার হৃদয় যে কতদূর চঞ্চল হয়েছে, কি এক বিষম নেশায় আমাকে পাগল করে তুলেছে, তা নিজের মনের কাছে গোপন করতে পারলাম না। মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু মনের ভেতর সে তিরস্কার পৌঁছলো না, শচীকান্তের কথামাত্রে প্রাণে এমন একটা পুলকের ঢেউ উঠতো, তার সামনে সব যেন ভাসিয়ে নিয়ে চলতো। ভগবানকে ডেকে বললাম, আমাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করো কিন্তু সে-কথা মুখেই রইলো, প্রাণের ভেতর যে প্রাণ, সে বললো, এ সুখের

নেশা যেন ভাঙে না! নিজের ভেতর এ বিরোধ নিয়ে আমি পর পর সুখ ও দুঃখের বেদনায় একেবারে চূরমার হবার মতো হলাম। শেষে আমার সুপ্ত স্বামীর পা দু'খানি জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলাম, কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লাম। কাঁদলাম দুঃখে—নিজের ভেতরকার এই যুদ্ধের অসহনীয় বেদনায়! কাঁদলাম—আমি ভালো হতে চাইতে পারলাম না বলে! আর কাঁদলাম সত্যি দুঃখে—আমার স্বামীর হৃদয়ের জ্বালা অনুভব করে। বেচারা সমস্ত জীবন আমার হাতে সমর্পণ করেছেন, আমা-বই কিছু জানেন না, তাঁর প্রাণে এ সন্দেহের বেদনা কি নিদারুণ, তাই ভেবে কাঁদলাম। আমার পোড়ার মুখ, আমি তাঁর এ বেদনার কেন সৃষ্টি করলাম।

'কতক্ষণ এমন করে শুয়েছিলাম, জানি না। জেগে দেখলাম, স্বামী আমার মাথা বুকের কাছে টেনে নিয়েছেন, তাঁর বুক প্রবলভাবে আন্দোলিত হচ্ছে। আমি জাগতেই তিনি বললেন, তোমার ওপরে আমি বড়ো অবিচার করেছি। তোমার ভালোবাসায় এক মুহূর্তের জন্যেও সন্দেহ করেছি, এটা বড়ো নিষ্ঠুরের কাজ হয়েছে। তুমি আমায় ক্ষমা করো।

'আমি আমার কালো-মুখ তাঁর বুকের ভেতর লুকোলাম।

'পরদিন সকালে উঠে আবার সেই সব কথা ভাবতে লাগলাম। আমার উঠতে কিছু দেরী হয়েছিলো, স্বামী তখন শয্যা ত্যাগ করে গেছেন। আমি বিছানায় বসে ভাবতে লাগলাম।

'আগের রাতের সে অনুশোচনার তীব্রতা তখন যেন আশ্চর্য রকম কেটে গেল; বরং আমার মনশ্চাঞ্চল্যের স্বপক্ষে নানা ওজর খুঁজতে লাগলাম। স্বামীর সন্দেহটা দূর হয়েছে, তাতে অপূর্ব আত্মপ্রসাদ লাভ করলাম। মনটা কেমন ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠলো।

'বিছনা থেকে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে খাবার করতে গেলাম; চা করলাম—সব অন্যমনস্কভাবে! আমার মনে কেবল এক অপূর্ব মধুর সুর বাজছিলো। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিলো, এটা অন্যায়। কিন্তু তখনই সে চিন্তাকে সরিয়ে দিয়ে আবার মনের আবেগ আপন পথে ছুটে চলতে লাগলো। সম্পূর্ণভাবে আত্মহারা হলাম। ক্রমে শচীকান্ত কাছে এসে জুটলো। আমি সকল চিন্তা, সকল দুঃখ ভুলে তার প্রীতি-সাগরে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। আমাদের

ঠানদিদি

কথাবার্তা সবই অত্যন্ত তুচ্ছ বিষয়। কিন্তু আমি বুঝলাম, তার মনের মধ্যে কিসের ঢেউ খেলে এই সব তুচ্ছ কথার ভেতর দিয়ে আপনার রসের ধারা মিলোচ্ছে। সেও যে আমার মনের কথা বুঝলো, তাতেও আমার কোনও সন্দেহ ছিলো না। কিন্তু তবু আমাদের ভেতর শুধু একটা চোখের পর্দার অন্তরাল রয়ে গেল।

'স্বামীর কাছ থেকে আমার মন যে কখন অলক্ষিতে সরে গেল, তা আমি বুঝতে পারলাম না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখলাম, স্বামীর সঙ্গ আমার কাছে প্রীতিকর হওয়া দূরে থাকুক, যতক্ষণ তাঁর কাছে থাকতে হতো, ততক্ষণ যেন একটা বোঝা ঘাড়ে চেপে থাকতো। তাঁর কাছ থেকে মুক্তি পেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতাম। এমন কি, মাঝে-মাঝে তাঁকে একটা আপদ বলে মনে হতো। যখন আমরা দুজন—আমি আর শচীকান্ত বসে বেশ গল্প জমিয়ে নিয়েছি, সে সময় যদি তিনি এসে বসতেন বা আমাকে ডাকতেন, তখন আমার মনটা যেন বিষ হয়ে উঠতো, মনে হতো, আপদ গেলে বাঁচি। কথাটা মনে হলেই কর্তব্যবুদ্ধি বাধা দিতো, মনে মনে বলতাম, বড়ো অন্যায় করছি! কিন্তু কর্তব্যবুদ্ধির উপদ্রবটা ক্রমশই বেশ গা-সওয়া হয়ে উঠছিলো।

'এর পর থেকে আমার স্বামীর মাথা-ধরাটা ক্রমেই বেড়ে উঠলো। প্রায়ই তিনি অফিস থেকে অসময়ে মাথা ধরিয়ে বাড়ি ফিরতে লাগলেন। আমি মনে মনে স্থির বুঝলাম যে, এ কেবল আমাকে জব্দ করবার ফন্দী, অসময়ে হঠাৎ এসে দেখতে চান, আমি ও শচীকান্ত কি করছি। এ-কথা ভাবতে আমার বড়ো রাগ হতো! এতো অবিশ্বাস! আমি করেছি কি? শচীকান্তের সঙ্গে আমার সম্বন্ধে যে কিছুমাত্র অন্যায় আছে, এ সময় আমি তা কিছুতেই মনের কাছে স্বীকার করতে চাইতাম না, কেবল দিন-রাত নিজের কাছে নিজের সাফাই গাইতাম, আর মনকে বোঝাতাম যে, আমি কোনও দোষ করিনি, আমার স্বামীরই অন্যায় সন্দেহ!

'দোষ আমার শরীর স্পর্শ করেনি, কিন্তু আমার অন্তর যে স্বামীর কাছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী এবং শচীকান্তের ওপর অনুরক্ত, এ-কথা তখন ভালো করে স্বীকার করতে চাইতাম না।

'আরও রাগ হতো আমার, অদৃষ্টের ওপর। আমি কোনও দোষ করিনি, কিন্তু এমনি অদৃষ্টের ফের যে, যখনি হঠাৎ আমার স্বামী এসে পড়তেন, ঠিক সেই সময়ই তিনি আমাদেরকে এমন একটা অবস্থায় দেখতেন —যাতে হঠাৎ লোকে সন্দেহ করতে পারে। একদিন আমরা বাগানে বেড়াচ্ছি, শচী আমার পেছনে পেছনে কপি খেতের আল দিয়ে হেঁটে আসছে। হঠাৎ আমি পা হড়কে পড়বার মতো হলে শচী পেছন থেকে দৃঢ়ভাবে ধরে ফেললো, আমার চুল খুলে তার পিঠের ওপরে পড়লো। আমি সামলে উঠে দেখলাম, আমার স্বামী ঠিক তখনই অফিস থেকে ফিরে এলেন। আমার সঙ্গে দেখাদেখি হতেই মুখ ফিরিয়ে গম্ভীরভাবে চলে গেলেন। আর একদিন আমরা পাশাপাশি দু'খানা চেয়ারে বসে কথা বলছি, একটা মশা এসে আমার চোখের পাশে বসলো, শচী যেই মশাটা মারবার জন্যে একটা থাপ্পড় দিয়েছে, অমনি স্বামী এসে উপস্থিত। আমরা দুজনেই মহা অপ্রস্তুত হয়ে ভেবাচেকা খেয়ে গেলাম। শচী বললো, পারলাম না, মশাটা উড়ে গেল। কথাটা সত্যি হলেও কেমন ফাঁকা-ফাঁকা শোনালো, যেন একটা বাজে গুজব। এমনি প্রায় রোজ একটা না একটা কিছু হতো —যা বাস্তবিক কিছু দোষের নয়, কিন্তু যা দেখে স্বামী নিশ্চয় একটা ভয়ানক অন্যায় কিছু মনে করতেন। আর তাতে আমরা দুজনেই সাহায্য করতাম—আমাদের ব্যবহার দ্বারা। এই রকম অবস্থায় স্বামী আমাদের দেখলেই দুজনেই যেন কেমনতর হয়ে যেতাম—মুখ, চোখ, কান লাল হয়ে উঠতো, হয়তো এমন একটা কথা, এমন একটা অযাচিত ব্যাখ্যা দিতাম, যাতে সন্দেহ বাড়তো বই কমতো না।

'আসল কথা এই যে, আমরা তিনজনেই পরস্পরের মনের ভাব খুব স্পষ্ট করে বুঝেছিলাম, কিন্তু যেন বুঝিনি, এমনি ভাণ করে সবাই সবার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছিলাম—তাই আমাদের এ বিপত্তি।

'আমার যে অনুশোচনা না হতো, এমন নয়; কখনও কখনও নিরিবিলিতে কেঁদে চোখ ভাসাতাম; কিন্তু এই রকম সব সময়ে যখন স্বামীর অভিযোগ-পূর্ণ দৃষ্টি দেখতাম, তখন যেন আমার হৃদয় বিদ্রোহী হয়ে উঠতো। মনকে কেবলি বোঝাতাম, তিনি আমাকে অন্যায়ভাবে সন্দেহ করছেন।

হৃদয় তাঁর ওপর বিষাক্ত হয়ে উঠতো; এক এক সময় মনে হতো, যে আমার ওপর এমন অন্যায় সন্দেহ করে, এক মুহূর্তও আর তার সঙ্গে যেন বাস করতে না হয়।

'একদিন আমি বাড়ির ভেতর কাজ সেরে বারান্দায় আসছি, দরজার কাছে এসে শুনতে পেলাম, দুই ভাইয়ে কি কথা হচ্ছে। আমি অগ্রসর না হয়ে কান পেতে রইলাম। কথা হচ্ছিলো—শচীকান্তের পড়াশোনা সম্বন্ধে। স্বামী বলছেন, তোর আর এবার এগজামিন দেওয়া হবে না। এখানে থেকে যা পড়ছিস, তাতে তো থার্ড-ক্লাসও হওয়া সম্ভব নয়।

'শচীকান্ত যেন কতকটা বিব্রত আর কতকটা উত্তপ্ত হয়ে উত্তর করলো, এ পর্যন্ত তো কোনও এগজামিনে ফার্স্ট-ক্লাসের নীচে হইনি, একটু দেখোই না এবার কি হয়, তারপর বলো।

'স্বামী বিরক্ত হয়ে বললেন, আচ্ছা দেখা যাক, তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, একটু কেশে বললেন, আমি বলি—এই সময় একটু চেষ্টা চরিত্র কর্, কলকাতায় গিয়ে এ দু'মাস পড়ে যাতে ভালো হতে পারিস্, দেখ।

'কথাটা শুনে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠলো। আমি বুঝলাম, শচীকান্তকে কলকাতায় পাঠাবার গরজের কারণ কেবল আমি। পড়াশোনায় শচী খারাপ হতে পারে, এ কল্পনাও আমার কখনও আসেনি, কাজেই সেটা সম্পূর্ণ বাজে কথা বলে উড়িয়ে দিলাম। এ-সব যে কেবল শচীকান্তকে আমার কাছ থেকে দূরে সরাবার ফিকির, সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ মাত্র রইলো না। আমি অক্ষম রোষে পুড়তে লাগলাম। বারান্দায় না গিয়ে ঘরের ভেতর বিছানার ওপর বসে পড়লাম।

'এখন ভাবতে আশ্চর্য বোধ হয়, তখন আমার বোধ হচ্ছিলো—যেন স্বামী আমার জন্ম-জন্মান্তরের শত্রু। অপমানে হৃদয় জর্জরিত হচ্ছিলো। ভাবছিলাম, হায়! এ অপমানের হাত থেকে উদ্ধার হবার কোনও উপায় কি নেই?—কতো অসম্ভব কল্পনা আমার মাথায় আসতে লাগলো। স্বামীগৃহ ত্যাগ করে স্বাধীন হওয়া একটা কল্পনা-প্রিয় দুরাশার মতো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। বৈধব্যের কল্পনাও প্রীতিকর মনে হলো। সঙ্গে সঙ্গে, লজ্জার কথা বলবো কি—শচীকান্ত আমার সেই পতিবিহীন জীবনের সঙ্গে

বিজড়িত হয়ে গেল। বিধবা-বিবাহ, দেবরের সঙ্গে পরিণয় প্রভৃতি কতো কল্পনা যেন আমার সম্পূর্ণ-অজ্ঞাতসারে মনের ওপর দিয়ে ছবির মতো ভেসে গেল—সে কল্পনায় আমি একটা অমানুষিক আনন্দের কাঁপন শরীরের ভেতর অনুভব করলাম।

'পরক্ষণেই মনকে সংযত করলাম; কল্পনার মূঢ়তা ও নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি করে নিজেকে একটু তিরস্কার করলাম। কিন্তু আমার এই তুচ্ছ মুহূর্তের অসাবধান প্রচ্ছন্ন কামনা দেবতার হৃদয়ে ছাপ মেরে দিলো; তিনি আমার এই দুর্দান্ত কামনা পূর্ণ করে আমার চরম শাস্তির বিধান করলেন।

'আমার স্বামীর মাথা-ধরাটা একটু বেশি হচ্ছিলো। মনে করেছিলাম, সেটা শুধু আমাদের জব্দ করবার একটা অছিলামাত্র। কিন্তু শিগগিরই দেখলাম, আমার অভিযোগ মিথ্যে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শরীর আশ্চর্য রকম রোগা হয়ে যাচ্ছিলো, কিন্তু আমার অন্ধ নয়নে তখন সেটা পড়েনি। একদিন তিনি অফিস থেকে খুব বেশি মাথা-ধরা নিয়ে ফিরলেন। কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পর তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে উঠে গেলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা পর এসে দেখি, তিনি তেমনি পড়ে আছেন, গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, ভায়নক জ্বর। আমি থারমোমিটার এনে সাবধানে তা লাগালাম। জ্বর ১০৬ ডিগ্রীরও ওপর। দেখে পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন মুহূর্তের জন্যে অসাড় হয়ে গেল, ছুটে গিয়ে শচীকে ডাক্তার ডাকতে বললাম।

'ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে দেখলেন, তাঁর ঘুম হয়নি, মস্তিষ্কের জড়তা উপস্থিত হয়েছে। ওষুধ আনতে দিয়ে তিনি শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। তারপর ওষুধ আসতে একদাগ খেয়ে তিনি বললেন, একবার ডাক্তার সাহেবকে ডাকাও, অবস্থা গুরুতর বোধ হচ্ছে।

'আমার তখন বুক ফেটে যেতে লাগলো, অবসন্ন হয়ে বসে পড়লাম, গত দু'মাসের সমস্ত ঘটনা অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে মনের ভেতর ঘুরে-ফিরে উঠতে লাগলো। তাঁর ওপর যতো অবিচার অত্যাচার করেছি, তা মনে হয় আমাকে কশাঘাত করতে লাগলো। আর সর্বোপরি তাঁর সমস্ত হৃদয়ভরা স্বার্থ-বিসর্জিত ভালোবাসার যে অপমান করেছি, তাঁকে যে মিথ্যে স্নেহ দেখিয়ে বঞ্চনা করেছি, সেই সব কথা মনে ভাবতে যেন আমার মাথার

শিরাগুলো ফেটে পড়তে লাগলো। ভাবলাম, এমন বানরীর কণ্ঠে ভগবান কেন এ মুক্তোহার ঝুলিয়েছিলেন!

'ডাক্তারবাবু আমার স্বামীর বন্ধু। তিনি বললেন—স্থির হন, মা। এ সময় আপনি অস্থির হলে কে কি করবে, বলুন?

'কথাটা শুনে আমার চমক ভাঙলো। এক মুহূর্তে যেন আমার ভাবপ্রবাহ জমাট বেঁধে গেল। স্থির হয়ে বসে স্বামীর শুশ্রূষা করতে লাগলাম। ডাক্তার সাহেব এলেন, আরও দু'জন ডাক্তার এলেন, তাঁরা কলকাতায় ওষুধপত্রের জন্যে টেলিগ্রাম করে যথাসাধ্য যত্ন করতে লাগলেন। একজন ডাক্তার সর্বদাই বাড়িতে থাকতেন।

'কিছুতেই কিছু হলো না। স্বামী আর চোখ মেললেন না। তৃতীয় দিনে তিনি এই কৃতঘ্ন পাপিষ্ঠাকে ত্যাগ করে গেলেন, আমি মূর্ছিত হয়ে শচীকান্তের পায়ের তলায় পড়ে গেলাম।

'মূর্ছিত হয়ে আমি ছ'দিন ছিলাম। ক্রমে শচীকান্তের অক্লান্ত যত্ন ও পরিশ্রমে সুস্থ হয়ে উঠলাম। ক্রমে আবার সব কথা ভাববার শক্তি হলো আমার।

'স্বামীর মৃত্যুর পর ছ'মাস আমি মজঃফরপুরে ছিলাম। শচীকান্ত সঙ্গে ছিলো; সে তার সমস্ত জীবন আমার সেবায় উৎসর্গ করেছিলো। আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে, যে প্রেমের বীজ আমি তার হৃদয়ে নিজের হাতে বপন করেছিলাম, তা পত্রে-পুষ্পে সুন্দর হয়ে তার সমস্ত জীবনকে ওতপ্রোতভাবে আচ্ছন্ন করেছে।

'আমি এতবড়ো পাপিষ্ঠা যে, তখনো আমার হৃদয় থেকে তার লালসা দূর হয়নি। আমি তখনও তার কথায় তৃপ্ত, তার দর্শনে পুলকিত এবং তার কদাচিৎ স্পর্শে মুগ্ধ হতাম। চাবুক মেরে আমি মনকে ফেরাতাম, কিন্তু ফেরাতে বেদনায় প্রাণ ফেটে যেতো।

'আমি নিজেকে কষ্টে সংযত করতাম, কিন্তু তার হৃদয়ে কোনও আঘাত দিতে পারতাম না। সে যদিও কোনদিন একটি কথাও বলেনি, তবু তার হৃদয় পরতে-পরতে আমার কাছে খোলা হয়ে গিয়েছিলো। তাই কিসে তার আকাঙ্খা, কোথায় তার বেদনা, তা সে না বললেও বুঝতে পারতাম। তাই

আমি তাকে নিরাশ করতে—তার হৃদয়ে ব্যথা দিতে পারতাম না। সে যখন আমার কাছে এসে বসতো, তাকে ফেরাতে পারতাম না ; আমার মুখের কথা শুনে সে কৃতার্থ হতো, তাতে আমি তাকে বঞ্চিত করতে পারতাম না ; আমার সেবায় সে সুখ পেতো, সেই সেবা থেকে তাকে নিবৃত্ত করা আমার অসাধ্য ছিলো। তাই মনের সঙ্গে যতই কেন যুদ্ধ করি না, তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে পারতাম না।

'ছ'মাস পরে আমার স্বামীর জীবন-বীমার পঞ্চাশ হাজার টাকা এসে পৌঁছলো, শচীকান্তই চেষ্টা করে টাকাটা বের করে দিয়েছিলো ; চেকখানা আসতেই একটু কাঁপতে কাঁপতে সে তা আমার কাছে দিয়ে গেল। আমার বুক ফেটে যেতে লাগলো। চেকখানা হাতে করে আমার যেন সমস্ত শরীর পুড়ে যেতে লাগলো—সে যে আমার স্বামীর রক্ত—আমার বঞ্চনালব্ধ কলঙ্কের যৌতুক! এই কথাটাই বার বার আমার বুকের ভেতর আঘাত করতে লাগলো যে, আমি আমার স্বামীকে আজীবন কি নিষ্ঠুর বঞ্চনা করে এসেছি! আমি তাঁকে ভালোবাসিনি, ভালোবাসার ভাণ করেছি ; আমার ঝুটো-মুক্তো দিয়ে তাঁর হৃদয়ের অমূল্য সম্পদ ঠকিয়ে নিয়েছি। এই পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার সেই জীবনব্যাপী বঞ্চনার শেষ উপার্জন!

'শচীকান্ত আমার কাছে নীরবে দাঁড়িয়েছিলো। তার চোখ দেখে বুঝলাম —তার মনের কথা। তার প্রাণ চাইছিলো আমাকে বুকের ভেতর ঠেলে নিয়ে তার অসীম প্রীতি দিয়ে আমার দুঃখ নিঃশেষ করে মুছিয়ে দিতে। তার বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে সে আমার দুয়ারে এসেছে—আমাকে শুধু দান করে যেতে। মুহূর্তের জন্যে এই চিন্তায় আমার মনে মনে একটা চরিতার্থতার ছায়া পড়লো! কিন্তু সেই চেকখানার দিকে দৃষ্টি পড়লো। হঠাৎ আমার কর্তব্য স্পষ্ট হয়ে চোখের ওপর ফুটে উঠলো। কে যেন আমার ভেতরে বলে উঠলো, ছি, আবার ঠকামি! আমার স্বামীকে আমি যে নিদারুণ প্রবঞ্চনা করেছি, আমার মনে হলো যেন, এই যুবককেও আমার সেই পৈশাচিক বঞ্চনার আবর্তে ফেলতে বসেছি। আমি বললাম, আর না, আজ এ বঞ্চনা শেষ করে দিতে হবে।

'আমি মুখ তুলে বললাম, শচীকান্ত! তুমি আমাকে ভালোবাসো?

ঠানদিদি

শচীকান্তের সমস্ত শরীর হঠাৎ একবার কেঁপে উঠলো, সে একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল, পরমুহূর্তে তার মুখ লাল হয়ে উঠলো, সে মাটির দিকে চেয়ে চুপ করে রইলো।

'আমি বললাম, আমি জানি, তুমি আমায় ভালোবাসো। এমন কি, আমারও মনে হয়েছে যে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও আমি যেন তোমাকে সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে ভালো না বেসে, আমার সমস্ত জীবন দিয়ে তোমাকে আকাঙ্খা না করে পারিনি। কিন্তু আজ সে ভুল ভেঙেছে। আমি জেনেছি যে, নিজেকে ঠকিয়েছি, তোমাকে নিষ্ঠুরভাবে ঠকিয়েছি; তোমার দাদাকে আজীবন ঠকিয়ে এসেছি। যখন তাঁর চোখ ফুটলো, তিনি দেখতে পেলেন যে, কি নিষ্ঠুরভাবে তাঁর সর্বস্ব আমি ঠকিয়ে নিয়েছি, তখন আর তাঁর শরীর তাঁকে বহন করতে পারলো না; সর্বত্যাগী মহাপুরুষ তিনি, এই পাপিষ্ঠাকে সর্বস্ব দান করে স্বর্গে গেলেন। এতবড়ো মহাপুরুষকে খেয়েও যদি আমার ক্ষিদে না মেটে, আবার তোমাকে যদি আমার বঞ্চনার আবর্তে ডোবাই, তবে বলতে হবে যে, আমি দুনিয়ার সেরা পিশাচী। আমি তা পারবো না। তুমি আমাকে ত্যাগ করো। তোমাকে দেখলে আমার লোভ হয়, তুমি আমার কাছে আর এসো না। আমাকে ভুলে যাও। আমার গা ছুঁয়ে শপথ করো, আমার কথা রাখবে?

'শচীকান্ত দাঁতে নখ কাটছিলো; তার মুখের প্রত্যেক শিরা-উপশিরা ফুলে উঠেছিলো, সে নিপুণ ভাস্করের খোদাই করা বেদনার একখানি মূর্তির মতো নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।

'আমি একবার মুগ্ধ-নেত্রে তাকে দেখলাম। তারপর উঠে তার গায়ে হাত দিয়ে বললাম, বলো, আমার কথা রাখবে?

'এইবার সে কেঁদে ফেললো। চোখ মুছতে মুছতে বললো—আচ্ছা, তোমার কথাই থাকবে।

'সে চলে গেল। আমি সেইখানে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগলাম। বুক ফেটে যেতে লাগলো। সে দুঃখ আমি কাকে জানাবো? দুঃখীর আশ্রয়, চিরদিনের শান্তিদাতা ভগবান, তাঁর কাছে আমি আমার এ দুঃখ কোন্ লজ্জায় জানাবো? তাই বুক চেপে মাটিতে গড়াতে লাগলাম।

'তারপর আর তাকে দেখিনি। সে কেবল একখানা চিঠি লিখেছিলো; তাতে বলেছিলো যে, আমার চোখের সামনে সে দেখা দেবে না, কিন্তু এতদিন সে যেমন নীরবে প্রত্যক্ষ প্রেম-প্রতিমার গোপন পূজো করে এসেছে, চিরদিন সে তেমনি করবে। এ বিষয়ে আমার অনুরোধ সে রাখতে পারবে না।

'সে চিঠির উত্তর আমি দিইনি, কিন্তু অনেকদিন সে চিঠিখানা বুকে করে রেখেছিলাম। শেষে ভাবলাম, চিঠিখানা রেখে, যে রত্নে আমার অধিকার নেই, তা চুরি করছি। তাই তা ভস্মসাৎ করেছি।

'আজ পর্যন্ত আমি শচীকান্তকে ভুলতে পারিনি। আজও তার স্মৃতি আমার বৃদ্ধ হৃদয়কে সরস করে তোলে। অনেক চেষ্টা করেও এখন পর্যন্ত স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী হয়ে রয়েছি।

'প্রথম কিছুদিন কঠোর ব্রহ্মচর্য করেছিলাম। দেখলাম, তাতে আমার কোনও ক্লেশ হয় না। পরে ভাবলাম, হৃদয়ে স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী হয়ে, বাইরে একটা মিথ্যে ক্লেশহীন কষ্টের আড়ম্বর রেখে লোকের প্রশংসা বা সম্মান ঠকিয়ে নেওয়ার আমার কোনও অধিকার নেই। তাছাড়া ব্রহ্মচর্য করে আমার পাপের বোঝা কমিয়ে, আমার শাস্তি থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবো কেন? যে পাপিষ্ঠা আমি, তাতে অনন্ত নরক আমার যোগ্য। ব্রহ্মচর্যে সে যন্ত্রণা তিলমাত্র কমে, এমন ইচ্ছা আমি করতে পারি না।'

ঠানদিদি থামিলেন। দেখিলেন, আমার চোখে জল। বলিলেন, 'চোখের জলের এমন অপব্যয় করিস্ না, বোন! আমার মতো পাপিষ্ঠাকে ঘৃণা করতে শেখ্। লোকে যদি আমায় ঘৃণা করে, আমি তাতে তৃপ্তি লাভ করি। লোকের সম্মানে বা স্নেহে আমার আতঙ্ক হয়, মনে হয়, সারা জীবন কি কেবল ঠকামিই করবো? আমার যা প্রাপ্য নয়, তা কি আমি কেবলি লোকের কাছে ঠকিয়ে নেবো?'

ঝড়

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বেশ মনে পড়ে—সে-ও এমনি ঝড়ের রাত! চারিধারে বাতাসের এমনি গর্জন, আকাশে মেঘের এমনি ছুটোছুটি! পনেরো বছরের কথা—তবু মনে হয়, যেন সে কালকের ঘটনা! সেই রাতটিকে যদি আমার সর্বস্ব নিয়েও আজ ফেরাতে পারতুম!

বাবা আমার মস্ত জমিদার। মান-সম্ভ্রম, আদব-কায়দার দিকে পুরোদস্তুর তাঁর নজর ছিলো—আমি তাঁর একটিমাত্র মেয়ে। সকলে বলতো, হ্যাঁ, বাপকা বেটী। মা বলতেন, বাপের অহংকারটুকুও কি পূর্ণমাত্রায় পেতে হয়। মেয়েমানুষের পক্ষে ও জিনিসটা যে ভারী সর্বনেশে!

তখন বুঝিনি, আজ বুঝি, আমার স্নেহময়ী মা'র সে কথাটুকু কতো খাঁটি। মাগো, চিরদিন নিজেকে সবার আড়ালে সবার পিছনে রেখে সকলকে তৃপ্তি দিয়ে অতো তাড়াতাড়ি তুমি চলে গেলে! যাবার বেলায় কেন মা তোমার এই দুর্দান্ত মেয়েটিকে তার সব অহঙ্কার, সব গর্ব চূর্ণ করবার মন্ত্রটুকু শিখিয়ে দিয়ে গেলে না? তাহলে যে আজ তার বুকের মধ্যে এমন বেদনা নিয়ে····

সেই কথাই বলতে বসেছি। কোনখানে এতটুকু গোপনতা রাখবো না। মানুষের কাছে আমি বিচার চাইতে আসিনি—এ যে আমার নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া। রাখা-ঢাকার ফাঁকি তো আর নিজের মনের সঙ্গে চলে না।

আমার বয়স তখন দশ বৎসর—আমার লক্ষ্মী মা হঠাৎ একদিন বাড়িটায় কান্নার রোল তুলে বিদায় নিলেন! বাবা ছিলেন পুরুষ। তিনি সংসারী জীবের এই মৃত্যুকে চিরন্তন সত্য জেনে মিথ্যা শোকের ধোঁয়ায় নিজেকে আচ্ছন্ন করে ফেললেন না। তিনি তাঁর জমিদারির কাজকর্ম—পথ-ঘাট তৈরি, খাজনা আদায়, বাকি-বকেয়া উশুলের জন্য বেয়াদপ প্রজাকে শায়েস্তা

করা প্রভৃতি বেশ যথানিয়মেই করতে লাগলেন। দেখে সকলে বললে, মা'র মৃত্যুর পূর্বে যেমন, পরেও তেমনি তাঁর কাজকর্মের ধারাটি বেশ অবিচ্ছিন্ন বয়ে চলেছে। আচার-ব্যবহার বা ভাব-ভঙ্গিতে কোথাও এমন একটু ফাঁক দেখা গেল না, যা থেকে বাইরের লোকে কোনরকম বিচ্ছেদ বা অমঙ্গলের আভাস পেতে পারে। বাড়ির গুরু-পুরোহিত শাস্ত্র আউড়ে মাথা নেড়ে বলেছিলেন, এই তো স্থিতধী মুনির লক্ষণ। আর একদল লোক আড়ালে বলাবলি করছিলো, মানুষটাকে কি ভগবান একফোঁটা প্রাণও দেননি। এ-কথাটা খুব অস্ফুটে অস্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হলেও আমার কানে পৌঁছতে কিছুমাত্র বাধা পায়নি।

এমন বাপের মেয়ে আমি—মা-মরা মেয়ে। বোধহয় নিজের সম্বন্ধে এর বেশি আর কোনো কথা না বললেও চলে।

লেখা-পড়া গান-বাজনা—এই সব নিয়ে বেশ একটা স্বপ্নের রাজ্য গড়ে তুলেছিলুম। বাইরে, বিশ্বের পানে চেয়ে দেখবার অবসর ছিলো না। কিন্তু হঠাৎ পাঁচজনে এই স্বপ্নের রাজ্যে একটা খবর নিয়ে এলো যে, বয়স আমার পনেরো পার হতে চলেছে। বাড়িতে এক বিধবা পিসি ছিলেন। তিনি বাবাকে শুনিয়ে বললেন, এ বয়সে হিন্দুর ঘরের মেয়েকে আইবুড়ো রাখা কিছুতেই চলে না। ইহলোকে লোকলজ্জা তো আছেই, তাছাড়া পরলোকেও নাকি বিস্তর লাঞ্ছনা জমা হচ্ছে।

বাবা হেসে বললেন, নীরু এখনও ছেলেমানুষ। ওর যখন জমিদারি চালাবার মতো বুদ্ধি হবে, তখন বিয়ে দেবো।

পিসি বললেন, মেয়েমানুষ আবার জমিদারি চালাবে কি? তার চেয়ে লেখাপড়া-জানা শান্ত-শিষ্ট সুন্দর একটি ছেলে দেখে বিয়ে দাও। সেও তোমার বশে তোমারই ঘরে থাকবে—জমিদারিও বজায় রাখবে।

বাবা বললেন, বেশি নিরীহ লোক নীরুর সঙ্গে খাপ খেয়ে চলতে পারবে না।

পিসি বললেন, তা ঠিক। যে ধিঙ্গি মেয়ে!

পিসির মুখ গম্ভীর হলো, বাবা চুপ করলেন, আমিও পাশের ঘরে বসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

বিয়ে !

এক-গা গহনা পরে আধ হাত ঘোমটা টেনে মুখ ঢেকে মাটির পুতুলের মতো জড়-ভরতটি হয়ে ঘরের কোণে বসে থাকা তো ! পরের ইশারায় নড়াচড়া, খাওয়া-বসা, শোওয়া-দাঁড়ানো—সুখে হাসতে পাবো না, তুঃখে বুক ভেঙে গেলেও একফোঁটা চোখের জল ফেলবার অধিকার নেই—এই তো বাঙালীর বৌয়ের সুখের ছবি। কাজ নেই আমার অমন সোনার চাঁদ বরের আদরে ডুবে সংসার করে। যেমন আছি, আমি যেন এমনি থাকি—এই গান-গল্প, খেলাধুলো, হাসিখুশি নিয়ে। কোনো নতুন লোকের নতুন সঙ্গ-সুখের স্বাদ আমি চাই না !

মনের যখন এমন অবস্থা, তখন একদিন বাবা বললেন, চল্ নীরু, একবার পশ্চিমে ঘুরে আসি।

আমি বললুম, চলো !

দিল্লী, আগ্রা, লখ্নৌ, প্রয়াগ নানান দেশ ঘুরে আমরা একদিন এসে কাশীতে আস্তানা পাতলুম। তীর্থ বলে যে কাশীর উপর টান পড়লো, সে-কথা বললে মিথ্যা বলা হবে। জানি না, বাবা কোনদিন বিশ্বনাথ দর্শনে গেছলেন কিনা—তবে আমি গেছলুম—কিন্তু সে একদিন। দেবতাকে প্রণাম করতে যাবো বলে যাইনি, এ-কথা স্পষ্টই স্বীকার করি। এতে যদি কেউ নাস্তিক বলে ঘৃণায় নাক সিঁটকে মুখ ফেরায় তাহলে নিরুপায়। আমি কিন্তু সত্য কথা বলছি। আর বলেছি তো, কারো বিচারের প্রত্যাশী হয়ে আমি নিজের এ কাহিনী আজ বলতে বসিনি। আমি গেছলুম মন্দির দেখতে —শুধু সেই প্রাচীনতার কথা শুনে, তা দেখবার কৌতূহল নিয়ে।

আর এই যে কাশীতে আটকে পড়লুম—সে পরকালে স্বর্গ বা শিবত্ব-প্রাপ্তির লোভে নয়।

এখানে বাবার এক বন্ধু জুটে গেলেন, ছেলেবেলায় কবে নাকি তুজনে একসঙ্গে কলকাতার কোন্ স্কুলে পড়েছিলেন; ভাব ছিলো, আজ প্রায় চল্লিশ বছর পরে তুজনের এই কাশীতে দেখা। তাঁরই বন্ধুত্বের খাতিরে পড়ে বাবা বললেন, নীরু মা, এখানে আর কিছুদিন থেকে যাই।

ঘুরে-ঘুরে আমিও একটু শ্রান্ত হয়েছিলুম, বললুম, বেশ।

বাবার সে বন্ধুটির নাম বিশুবাবু। বিশুবাবু লোকটি ভারী অদ্ভুত ধরনের। আর্যামির গর্বে তিনি এমনই আত্মহারা যে, পৃথিবীর অপর সমস্ত জাতকে কুকুর-বিড়ালের সামিল বলেই মনে করতেন।

বাবার সঙ্গে তাঁর তর্ক চলতো। বাবা যখন সাংসারিক স্বচ্ছলতা বা নানাবিধ আধি-ভৌতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা পাড়তেন, তখন বিশুবাবুর তর্কে আধ্যাত্মিক আগুন এমনি তীব্র তেজে জ্বলে উঠতো যে, তাঁর দিকে বেশি এগিয়ে যাওয়া কোনো বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিলো না। কারণ, বিশুবাবুর তর্কে আগুন যতখানি জ্বলতো, গালাগালের ধোঁয়া তার-চেয়ে ঢের বেশি উঠতো। সে ধোঁয়ায় তাঁর প্রতিপক্ষের চোখের জল বার করিয়ে তবে তিনি স্থির হতেন। আমি এক-আধদিন আড়াল থেকে তাঁর তর্ক-যুক্তি শুনতুম—কিন্তু কোনদিন সে তর্কে আঘাত দিতে আমার প্রবৃত্তি হয়নি। বিশুবাবুর যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি খাড়া করতে মন আমার অশ্রদ্ধায় ভরে উঠতো।

এই তর্কে এক-আধদিন আবার বিশুবাবুর ভাগ্নে তিনকড়ি খুব মৃদু-মন্দ ছন্দে সুর মেলাতো। তবে তিনকড়ির বয়স ছিলো কাঁচা, কাজেই আর্যবংশাবতংস এমন মাতুলের যুক্তিধারা সে বেচারা তেমন পরমানন্দে পান করতে পারতো না। ফলে অনেক সময়েই ঘটতো এই যে, তর্কের গোড়ায় মাতুলকে অনুসরণ করতে গিয়ে শেষ বরাবর তিনকড়ি বাবার যুক্তির স্রোতে ভেসে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে এসেই থই নিতো। তার সে আচরণ দেখে মাতুলের অবস্থা বাতুলের মতো হয়ে উঠতো। আমি নেপথ্যে বসে এদের কাণ্ড দেখে হেসে সারা হতুম।

একদিন এই তর্কের মুখে ভাগ্নের উপর চটে মাতুল বিশ্বনাথ বলে উঠলেন, দেখো তিনকড়ি, তোমার মাথায় যদি এমন সব ম্লেচ্ছ ভাব তাল পাকাতে থাকে, তাহলে তোমায় আমার কাছে বাস করতে দেওয়া তো নিরাপদ নয়, বাবা।

এই আকস্মিক রসভঙ্গে তিনকড়ি একেবারে অবাক হয়ে গেল। বাবা কোনোমতে গোল থামিয়ে সেদিন মাতুল-ভাগিনেয়ের সম্পর্কের বাঁধনটুকু অটুট রাখলেন।

এরপর কথায় কথায় বাবা একদিন বললেন, বুঝলি নীরু, এই বিশুটা পাগল। এদিকে তো আমাদের চালচলন পছন্দ হয় না—তবু বলে কি জানিস্—বলে, ঐ তিনকড়ির সঙ্গে যদি তোমার মেয়েটির বিয়ে দাও তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হই। তিনকড়িরও একটা হিল্লে হয়, তাছাড়া—

আমার কান দুটো গরম হয়ে উঠলো। কী আশ্চর্য আর আজগুবি সাধ! স্পর্ধাও কম নয়! চোখে কঠিন দৃষ্টি নিয়ে বাবার পানে চাইলুম।

বাবা আমার ভাব বুঝতে পেরে ঘাড় নেড়ে বললেন, তা হয় না। তবে এটুকু বুঝেছি, তিনকড়িকে বাড়িতে রাখতে বিশুর আর তেমন ইচ্ছা নেই। ছেলেটির লেখাপড়ার দিকে চাড় আছে—বিশু বলে, যা হোক কোনো উপায় করতে লেগে যা।

বাবা যেন বাতাসকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলে গেলেন। আমিও তাতে কোনরকম সায় বা সাড়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করলুম না।

তিনকড়ির দোষ এমন কিছু দেখি না। লোকটা নেহাৎ মন্দ নয়। বাইরের চেহারা প্রভৃতি ভদ্র সমাজে চলবার মতো—কিন্তু বড়ো গরিব সে। যাক, কাজ কি আমার মিছে তিনকড়ির কথা ভেবে।

এরপর একদিন এক মজার ঘটনা ঘটলো।

চৈত্র মাস। আকাশে সেদিন দুপুর থেকেই মেঘের একটু সাড়া পাওয়া যাচ্ছিলো। আমি তা গ্রাহ্য না করে চির-প্রথামতো বেড়াতে বেরুলুম।

কাশীতে স্ত্রী-জাতির মস্ত একটা স্বাধীনতা আছে—এ-জন্য হে তীর্থ, নমো নমো! তোমার কল্যাণে বাঙালীর মেয়ে এখানে তবু গায়ে একটু হাওয়া লাগিয়ে তাদের নারী-জন্ম কতক সার্থক করতে পায়।

সেদিন বরাবর গঙ্গার ধার দিয়ে চলে অনেকগুলো গলি-ঘুঁজি পার হয়ে বেণীমাধবের ধ্বজায় এসে উঠলুম। তখন জোর বাতাস বইতে শুরু হয়েছে। ধ্বজার উপর থেকে ওপারে রামনগরের পানে চেয়ে দেখলুম। রামনগর থেকে কাশী অবধি গঙ্গার উপর দিয়ে এপার-ওপার জুড়ে কে যেন মস্ত একটা স্বচ্ছ বালির দেওয়াল তুলে দিয়েছে। আমার হাতে একখানা রুমাল ছিলো

—দমকা বাতাসে সেখানা উড়ে চকিতে কোথায় চলে গেল, বুঝতেও পারলুম না। হু-হু করে বাতাসের বেগ বাড়তে লাগলো। তখন ভাবলুম, না, বাড়ি যাই। বেণীমাধব থেকে নেমে আবার গলি ভেঙে একেবারে দশাশ্বমেধের কাছে এসে পৌঁছলুম। মাথার উপর আকাশ তখন বেশ কালো হয়ে উঠেছে। দিগ্‌বিদিক কাঁপিয়ে কী রকম একটা সোঁ-সোঁ আওয়াজ হচ্ছে। ঠাণ্ডা জলো-হাওয়ায় ওপার থেকে অদ্ভুত রকমের একটা বুনো গন্ধ ভেসে আসছে। আমি বাড়ির দিকে চলতে লাগলুম। পথে না আছে একখানা এক্কা, না গাড়ি। খানিক আসতে বৃষ্টির বড়ো-বড়ো ফোঁটা ঝরতে শুরু হলো। গায়ে যেন হাজার তীর ফুটছিলো। আমি আরো জোরে চলতে লাগলুম। বৃষ্টির বেগও আরো বেড়ে উঠলো। আমার গা ছমছম করতে লাগলো। এমন সময় পিছন থেকে কে বললে, এই বৃষ্টিতে আপনি পথে বেরিয়েছেন ?

পা কেমন থমকে পড়লো। এই সময় আবার বিদ্যুৎ চমকে গেল। পিছনে চেয়ে দেখি তিনকড়ি, মাথায় তার ছাতা।

কোনো জবাব দিলুম না। দরকার ছিলো না। তিনকড়ি বললে, এই বৃষ্টি-ঝড়ে আর এগুবেন না। ঐ টিনের ছাদটার নীচে দাঁড়াবেন চলুন। জলের বেগ কমলে আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেবো।

তবুও কোনো কথা বললুম না। তিনকড়ি ছাতাটা এগিয়ে এনে আমার মাথায় ধরলো। অমন ভীষণ মুহূর্তেও আমার হাসি পেলো। কী নির্লজ্জ রূপ-যৌবন-লোলুপ পুরুষের যেচে এই সেবা দেবার প্রয়াস। অভদ্র দাসত্বপনা! কেউ তো তার এ সেবা চায় না। হায়রে? এই পুরুষই আবার শাস্ত্র লিখে স্ত্রী-জাতির উপর প্রভুত্ব খাটাতে চায়। জেনো, তোমরা নিতান্ত দুর্বল, দয়ার পাত্র বলেই স্ত্রী-জাতি তোমাদের এ-সব পুঁথির বুলির বিরুদ্ধে কোনদিন কোনো কথাটি কয় না—ঘাড় পেতে সমস্ত সহ্য করে যায়। একবার যদি তারা এর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়, তাহলে তাদের চোখের একটা বক্র ইঙ্গিতে পুড়ে ছাই হয়ে যায় তোমাদের ঐ বহুমূল্য শাস্ত্র আর স্বার্থ-পঙ্কিল প্রাণ।

হঠাৎ একটা খেয়াল হলো। সামনেই দেখি এক বড়ো গাছের নীচে

ঝড়

খুঁটির উপর টিনের ছাদ-দেওয়া একটুখানি ছোট্টো আস্তানা। বোধহয় কোনো সন্ন্যাসী কোনো যোগের সুযোগে ছাউনি ফেলেছিলেন, এখন তাঁর সেই পরিত্যক্ত আস্তানাটুকু ভক্তের স্বর্গে যাবার সোপান হয়ে পড়ে আছে। আমি সেই টিনের ছাদ দেওয়া ছাউনিতে এসে দাঁড়ালুম। যতখানি পারে তিনকড়ি আমায় বৃষ্টির জল আর ঝড়ের দাপট থেকে রক্ষা করবার চেষ্টায় ছাতা ঘিরে আড়াল তুলে দাঁড়ালো। ঝড়ের তখন কী সে প্রচণ্ড বেগ—বৃষ্টিরও কী জোর! মাথার উপর টিনের ছাদ হঠাৎ তার খুঁটির মায়া ত্যাগ করে ভূমিসাৎ হলো। আমায় রক্ষা করতে গিয়ে তিনকড়ি তার দুই হাত তুলে টিনখানা ধরে ফেললো। তার জামা ছিঁড়ে হাত কেটে রক্ত পড়তে লাগলো—তিনকড়ি টিনের ভার রাখতে না পেরে শেষে পড়ে গেল।

ভালো গ্রহ! তাড়াতাড়ি টিনখানা সরিয়ে তিনকড়ির হাত ধরে তাকে ওঠালুম। হাত তার খুব জখম হয়েছে। রক্ত পড়ছে! আমি তাড়াতাড়ি আমার বৃষ্টিতে ভেজা আঁচল ছিঁড়ে তার হাতে বেশ করে পটি জড়িয়ে দিলুম। তিনকড়ি ধুঁকছিলো।

বললুম, আর এখানে নয়। চলুন, আমাদের বাড়ি চলুন। পথে আরো ঢের বিপদ ঘটতে পারে। দেখুন দিকি, আমার জন্য নিজেকে একেবারে এতখানি ক্ষতবিক্ষত করে ফেললেন।

তিনকড়ি আমার পানে চাইলো, বড়ো করুণ সে দৃষ্টি! সে দৃষ্টির অর্থ যে না বুঝলুম তা নয়। সে দৃষ্টি আমার মনের মধ্যে এক দুর্দমনীয় বিজয় স্পৃহা জাগিয়ে তুললে। একটু কৌতুক করবার ইচ্ছা হলো। দৃষ্টিতে করুণা মাখিয়ে তিনকড়ির পানে চেয়ে দেখলুম। একে মেঘের এই চপল লীলা, তার উপর এ কৌতুক। সে এক মারাত্মক ব্যাপার।

তিনকড়ি বোধহয় আমার চোখে সে সময় এমন কিছু দেখেছিলো, যাতে তার সমস্ত সঙ্কোচ চট করে কেটে গেল। সে একেবারে বলে উঠলো, আপনার যে গায়ে এতটুকু আঁচ লাগেনি, এতেই আমি কৃতার্থ। এর জন্য আমার প্রাণটা গেলেও—তিনকড়ির কথাটা আর শেষ হলো না। আদরের প্রত্যাশায় পোষা কুকুর যেমন আকুল চোখে প্রভুর পানে চায়, তেমনি দৃষ্টিতে তিনকড়ি আমার মুখের পানে চেয়ে রইলো।

আমি খুব উচ্চ হাস্য করে বললুম, বটে—কেন বলুন দেখি!

তিনকড়ির হাতের পটিটা তখন আমি চেপে-চেপে আর-একবার ভালো করে জড়িয়ে দিচ্ছিলুম। হঠাৎ সে আমার হাতখানা ধরে ফেলে বললে, আমি আপনাকে ভালোবাসি, বড়ো ভালোবাসি। জানি—পাবার নয়, তবু আমার মনকে কিছুতে আমি ফেরাতে পারি না।

তাড়াতাড়ি আমি হাত টেনে নিয়ে সরে এসে বললুম, বৃষ্টি একটু নরম পড়েছে। চলুন, বাড়ি যাই।

বলেই তাকে আর দ্বিতীয় কথাটি কইবার অবকাশমাত্র না দিয়ে রাস্তায় নেমে চলতে শুরু করলুম। তিনকড়িও আমার পিছু-পিছু আসতে লাগলো।

বাড়ি ফিরে চা খেয়ে গরম কাপড়-চোপড় পরে বিছানায় এসে বসলুম। ধপধপ করছে নরম বিছানা। সামনে টেবিলে বাতি জ্বলছিলো। সেই বাতির আলোয় হঠাৎ আমার কেমন মনে হলো, আজ আমার মতো সুখী কে! আমি মুক্ত, আমি স্বাধীন। এমন ঐশ্বর্য আমার, এমন বয়স, এমন রূপ। মানুষ এর বেশি কিছুই আর কামনা করতে পারে না। ইহলোকে মানুষের কামনা করবার মতো বস্তুই বা আর কি থাকতে পারে? কিছু না। তিনকড়ির কথা মনে পড়লো। মাতুলের ভিক্ষা-অন্নে লালিত, নিতান্তই সে কৃপার পাত্র! নিজের মাথা গোঁজবার আশ্রয় নেই। আজ ঐ মামা বিশ্বনাথ যদি তাকে পথে বার করে দেন, আজ এই রাত্রে—এই ঝড়-বৃষ্টির পরে বাইরের পথ-ঘাট যখন অত্যন্ত কদর্য বিশ্রী হয়ে আছে—তাহলে এই কদর্য পথে-ঘাটেই তাকে বেরিয়ে পড়তে হবে।

সামনে প্রকাণ্ড আয়না ছিলো—তার পানে চেয়ে দেখলুম। হেসে চেঁচিয়ে আপনাকে আপনি বলে উঠলুম, এ মূর্তি দেখে কে চুপ করে থাকতে পারে? বেচারা, বেচারা তিনকড়ি!

মন যখন এমনি গর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, ঠিক সেই সময় কে যেন তার চুলের মুঠি ধরে বলে উঠলো—এই তো রূপ আর তরুণ বয়স নিয়ে বসে আছিস্—কে এলো রে তোর কুঞ্জদ্বারে, কে তার স্তুতিগান শোনাতে এলো। আর এই তিনকড়ি, এ মানুষ!

মন আবার চোখ রাঙিয়ে উঠলো, বললে, কী! আমি রাজার মেয়ে

আর ঐ তিনকড়ি পথের ভিখিরি। সে আমায় পূজো করতে পারে, কিন্তু...

ভাবনার আর অন্ত রইলো না। হু-হু করে যা-তা ভাবনা এসে মনটাকে তোলপাড় করে দিলে।

কিসেরই যে ছাইপাঁশ ভাবনা। হাসি পেলো। শুয়ে পড়লুম। রাত্রে ঘুমের ঘোরে কিন্তু সেই এক সুর কানের কাছে বাজতে লাগলো, ভালোবাসি, ভালোবাসি, ওগো বড়ো ভালোবাসি।

সকালে উঠে মনটা প্রথম কেমন আচ্ছন্ন বোধ হলো। জোর করে চাবুক মেরে তাকে সিধে করলুম। তারপর কারা দু'দলে মিলে মনের মধ্যে এক বিষম লড়াই বাধিয়ে দিলে। অস্থির হয়ে বললুম, না, না, না।

বাবাকে বললুম, কলকাতা যাই চলো, বাবা! এখানে আর ভালো লাগছে না।

বাবা বললেন, কিন্তু একটা কথা আছে, মা।

আমি বাবার মুখের পানে চাইলুম।

বাবা বললেন, এই তিনকড়ি বেচারা! ও আমায় বড্ডো ধরেছে। লেখাপড়া শিখে ও মানুষ হতে চায়, কিন্তু অর্থপিশাচ মামা তার জন্য আর একটা কানাকড়িও খরচ করতে রাজী নয়! সে বলে, কাশী হেন স্থান, যাত্রী ধরে পেট চালা। তিনকড়ি তাতে রাজী নয়। সে বলে, তার মা'র যা গহনাপত্র ছিলো, সেগুলো দাও, তা বিক্রি করে সে লেখাপড়া শিখবে। মামা হাঁকিয়ে দেছে, বলে, গহনা আবার কি! তাই বেচারা আমায় এসে ধরেছে। কি বলিস্ মা?

আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো। আবার সেই তিনকড়ি। যার জন্য মনের সঙ্গে অহরহ এই যুদ্ধ চলছে—যার কাছ থেকে দূরে যেতে চাই, এমনি করে ভূতের মতো সে সঙ্গ নেবে। না, কখনো না। কে তিনকড়ি—সে আমার কে, যে—তার জন্য এতো মাথাব্যথা। না, সে কেউ নয়, কেউ নয়। হতভাগা বেচারা, পথের এক সামান্য পথিক সে।

বাবা আবার বললেন, তাহলে কি বলিস্, মা?

আমি বললুম, তাকে তুমি সঙ্গে রাখতে চাও নাকি?

বাবা বললেন, তুই যা বলিস্, তাই করি—

ইচ্ছা হলো—বাবাকে বলি, আর ফ্যাসাদ জড়িয়ো না, বাবা। কিন্তু গলাটা কে যেন চেপে ধরলো আমার। একটা ঢোঁক গিলে বললুম, বেশ, কিন্তু আমাদের একসঙ্গে থাকা হবে না, তা বলে রাখছি। কোথাকার কে, কেমন লোক—

বাবা বললেন, লোক বোধহয় মন্দ হবে না। ছেলে ভালো, তার মামার মতো নয়। তবে হ্যাঁ, এক বাড়িতে থাকা হয় না—কেননা আমি আজ কোথায় থাকি, কাল কোথায় যাই, ঠিক নেই—তার-চেয়ে ওকে মাসে-মাসে বরং কিছু করে দেবো, ও কলকাতায় গিয়ে মেসে থেকে পড়ুক। কেমন ?

বললুম, বেশ—তাহলে ওকে কালই কলকাতায় পাঠাও, আমরা এদিকে আরো ক-দিন মুঙ্গের-টুঙ্গের ঘুরে তারপর কলকাতায় যাবো'খন।

কোথায় যেন আমার বাধছিলো। গা ছমছম করছিলো। তিনকড়ির সঙ্গে আর যেন না দেখা হয়। একটু ভয়ও হচ্ছিলো। কিন্তু না, কিসের ভয় ?—আমি রাজার মেয়ে, তার উপর এই রূপ, এই বয়স ! কোথাকার কে তিনকড়ি এসে কানের কাছে এক আবদারের সুর তুলবে, আর অমনি আমি—না, না, কখনো না !

তারপর সেই বছর মাঘ মাসেই আমার প্রাণে বসন্ত জেগে উঠলো। আমরা তখন কলকাতার বাড়িতে। অজস্র ফুলের গন্ধে, পাখির গানে আমার প্রাণটাকে ভরিয়ে দিয়ে অত্যন্ত সমারোহ করে আমার হৃদয়-রাজ্যেশ্বর একদিন সন্ধ্যায় এসে উপস্থিত হলেন। মাগন্দীর রায় বাবুদের বংশ-তিলক এক তরুণ যুবার হাতে বাবা আনন্দাশ্রু চোখে আমায় সমর্পণ করলেন। সে রাত্রির সেই আলো, গান-বাজনা আর ফুলের গন্ধে আমার প্রাণ-মন অসহ্য সুখের সম্ভাবনায় বিভোর হয়ে উঠলো। সেই আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে এক সম্পূর্ণ অপরিচিত হাতের উপর হাত রেখে আমার মনে হলো, মস্ত একজন সহায় পেলুম, বন্ধু পেলুম, স্বামী, স্বামী, স্বামী। মনে মনে আমার চিরজীবনের সুখ-দুঃখ এই হাতেই অসীম নির্ভরে সমর্পণ করে আমার প্রাণ কৃতার্থ হলো। বিচিত্র আবেশ এক অপূর্ব মায়াকুঞ্জ আমার চোখের সামনে

ঝড়

ধরা দিলে, প্রাণের মাঝে বহুদিনকার সাধ-আশা ফুলের মতো অজস্রভাবে অপরূপ শোভায় ফুটে উঠলো।

কিন্তু হায়রে, সে কতক্ষণের জন্য!

ফুলশয্যার রাত্রে ফুলের গহনা পরে মনের মধ্যে প্রেমের মণিদীপ জ্বেলে ফুলের বাগান সাজিয়ে বসেছিলুম—এইবার আমার প্রিয়তমকে প্রাণভরে একান্তে দেখবার সুযোগ পাবো। অস্থির পুলকে ক্ষণে ক্ষণে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছিলো—এমন সময় আমার স্বামী-দেবতা দেখা দিলেন। হায়, ফুলের মুকুট মাথায় দিয়ে নয়, শান্তি, আরাম, আশ্বাসভরা প্রেমের ডালি হাতে নিয়ে নয় —চোখ তাঁর জবাফুলের মতো লাল, পা টলমল করছে, মুখে বিশ্রী গন্ধ, মদ খেয়ে মাতাল। নিমেষে যেন কোথা থেকে এক ভীষণ ঝড় উঠলো—তার দাপটে আমার প্রাণের মধ্যে সে দীপের আলো নিভে গেলো—অতো সাধের ফুলের রাশ ছিঁড়ে কোথায় ধুলোয় লুটিয়ে পড়লো। সুন্দর মায়াকুঞ্জ চোখের পলকে শ্মশানের মতো বীভৎস হয়ে উঠলো। অসহ্য জ্বালা সারা দেহ-মনটাকে একেবারে তাতিয়ে তুললে। ঘৃণায় আমি সে ফুলের গহনা ছিঁড়ে ফেললুম, মাথাটা দপদপ করে উঠলো। একেবারে খড়খড়ির ধারে এসে দাঁড়ালুম। খড়খড়ি বন্ধ ছিলো, জোরে খুলে ফেললুম। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় কে যেন অনেকখানি জ্বালা জুড়িয়ে দিলে। দূর থেকে কার বাঁশিতে সাহানার সুর ভেসে আসছিলো, আকাশে একরাশ নক্ষত্র—মনে হলো, সবাই হাসছে; সবার মুখে তীব্র বিদ্রূপ। ভাবলুম, আজ যদি আমার এই তপ্ত প্রাণের তীক্ষ্ণ জ্বালায় সমস্ত আকাশ-বাতাস জ্বালিয়ে দিতে পারতুম, পৃথিবীটা পুড়ে ছাই হতো।

দেবতা এসে হঠাৎ আমার আঁচল টেনে জড়ানো গলায় ডাকলেন, প্রাণেশ্বরী—

এক ঝটকায় অাঁচল টেনে নিয়ে সরে দাঁড়ালুম। মাতাল অবাক হয়ে চেয়ে রইলো—খানিক পরে বললে, বেশ বাবা!

আমার স্বামী-সম্ভাষণ এই প্রথম, এই শেষ! রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলছিলো। বাড়ি এসে বাবাকে বললুম, আমি আর কোথাও যাবো না, বাবা। যদি আর আমায় সেখানে পাঠাও, আত্মহত্যা করবো।

বাবা আমার মুখের পানে চাইলেন। আমার মনের মধ্যে তখন এমন আগুন জ্বলছিলো যে, তার ঝাঁজ অবধি আমার চোখ-মুখ দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছিলো। আমি বললুম, এক পাষণ্ড মাতাল—

কেঁদে ফেললুম। বাবার চোখেও জল এলো। তাড়াতাড়ি আমাকে বুকে টেনে নিলেন। বাবারও মুখে একটিও কথা ফুটলো না।

তারপর আবার সেই পুরোনো জীবনধারায় গা ঢেলে দিলুম। বাপে-মেয়েতে নানান দেশে লক্ষ্যহীন গতিতে আবার সেই ভেসে বেড়ানো।

দেবতার কাছ থেকে এত্তেলা এলো, পাঠাও।

বাবা জবাব দিলেন, না।

তাঁরা চোখ রাঙালেন, ছেলের আবার বিয়ে দেবো।

বাবা লিখলেন, তোমাদের মর্জি হয়—দাও গে।

তাঁরা আবার শাসালেন, আদালত আছে।

বাবা লিখলেন, কেউ পায়ে দড়ি বেঁধে রাখেনি, স্বচ্ছন্দে সেখানে যেতে পারো। তারপর সব চুপচাপ।

কিন্তু এই নানান দেশে ঘুরে-বেড়িয়ে, নর-নারীর এই বিপুল মেলায়—তাদের সুখের ঢেউ মাঝে মাঝে আমার মনটাকে ছুঁয়ে এক বিষম দোল দিয়ে যেতো। পাখির গান, ফুলের গন্ধ, এ-সব তেমনি আছে—তবে আমার প্রাণে তারা আর কোনো সাড়া জাগায় না। বসন্ত তেমনি আসে, চাঁদ তেমনি আলোর ঢেউ তুলে নেচে চলে যায়, কিন্তু সব নির্জীব, সব জড়। কুয়াশায় আগাগোড়া কে যেন তাদের সে প্রাণটুকু ঢেকে দিয়েছে। এক-একবার সে কবেকার ঝড়ের রাত্রির কথা মনে পড়তো। সেই বেচারা তিনকড়ি, আর তার সেই ব্যাকুল বেদনাভরা আবেদন। সে যে একটা স্বপ্ন। মনকে চাবকে বললুম, খবরদার! তোর আপন তেজে তোকে দাঁড়িয়ে থাকতেই হবে। মাথা হেঁট করা কিছুতেই চলবে না তোর। ভেঙে যাস্ যদি যা—কিন্তু মচকে পড়িস্ নে....

এমনি বিপুল দ্বন্দ্বে মনকে নিয়ে যখন অস্থির, তখন কোথা থেকে বুকে

ঝড়

বাজ পড়লো। বাবা হঠাৎ একদিন কোন্ অদৃশ্যলোকে চলে গেলেন। এ বিপুল জগতে আমি আজ একলা!

জোর করে বললুম, না, কিসের ভয়! আমার অগাধ ঐশ্বর্য—রাজার ঐশ্বর্য। দু'দিন পরে আবার এক খবর এলো। আমার স্বামীদেবতা এক গণিকার গৃহে মজলিশ করছিলেন—শেষে এক সময়ে মদের নেশায় ভালোবাসার সীমা দেখাতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে প্রাণ দিয়েছেন। মস্ত একখানা ভারী পাথর বুক থেকে সরে গেল! বাঃ! আমার সব বন্ধন আজ কেটে গেছে—আমি আজ সম্পূর্ণ স্বাধীন, মুক্ত। চমৎকার!

শ্রান্ত মন নিয়ে বারো বৎসর নানা দেশ ঘুরে আবার একদিন বাড়ি ফিরলুম। রাজ্যেশ্বরী রাজ্য-পালনে মন দিলুম। খাতাপত্র থেকে মহল পর্যন্ত নিজে দেখে তদ্‌বির করতে লাগলুম।

এক-এক সময় চোখের সামনে পড়তো—গরিবের সংসার, চাষার সংসার। স্বামী খেতে খেটে সারা হচ্ছে, মাথায় প্রচণ্ড সূর্য আগুন ছড়াচ্ছে, সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপও নেই, শুধু খাটছে, খাটছে, খাটছে! তার স্ত্রী ছোট্টো ছেলে কাঁকালে করে থালায় ভাত বেড়ে স্বামীকে খাওয়াতে এলো। দুজনে গাছের ছায়ায় বসে ছোট্টো ছেলেটিকে একটু নাড়াচাড়া করলে—তারপর স্ত্রী হেসে ছেলে-কোলে বাড়ি ফিরে গেল, স্বামী খেতে খাটতে লাগলো। কোথাও বা স্বামী কাজে বেরুচ্ছে, আর তার তরুণী স্ত্রী লোকচক্ষু বাঁচিয়ে ছাদের আড়ালে দাঁড়িয়ে ম্লান হাসি হেসে তাকে বিদায় দিচ্ছে। অনাদি কালের সংসার তার সরল ধারাতে বয়ে চলেছে।

দেখে মন আমার হু-হু করে উঠতো।

আবার এক চৈত্র মাস। আকাশে বৃষ্টি-বাতাসের ভীষণ যুদ্ধ। ঘরের জানলা বন্ধ করে বিছানায় শুয়েছিলুম—মনের মধ্যে আলো-আঁধারের খেলা চলছিলো। বৃদ্ধ নায়েব মশায় এসে বললেন, উকিলবাবু এসেছেন।

আমি বললুম, কেন?

তিনি বললেন, বাহার গাঁয়ের প্রজারা খাজনা বন্ধ করেছিলো—কাল তাদের নামে নালিশ রুজু না করলে সব তামাদি হয়ে যাবে। তাই আর্জি তৈরি করে আপনার সই নিতে নিজেই তিনি এসেছেন।

আমি বললুম, তাঁকে এখানে নিয়ে এসো।

নায়েব দ্বিরুক্তি না করে চলে গেলেন।

উকিল আমাদের সেই তিনকড়ি। বাবার কৃপার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার সে করেছিলো। আজ পাঁচ বৎসর উকিল হয়ে আমাদের এস্টেটের সমস্ত কাজকর্ম সে-ই দেখছে।

উঠে একটা ইজি চেয়ারে আমি বসলুম। উকিল তিনকড়ি ঘরে এসে দাঁড়ালো। নিষ্ফলতার তীব্র রোষে মন আমার মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠলো। তারপর হাসি মুখে সহজ সুরেই বললুম, কি চাই?

অত্যন্ত বিনীত স্বরে তিনকড়ি, বললে, এই আর্জিগুলো এনেছি—পড়ে সই করতে হবে।

আমি বললুম, পড়ো।

তিনকড়ি পড়তে লাগলো। আমার কানে তার কিছু গেল না। শুধু জাগছিলো এক বিষম ঝড়ের হু-হু গর্জন। আর তারই ফাঁকে-ফাঁকে ভেসে আসছিলো অত্যন্ত কোমল সুরে এক করুণ আবেদন, ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি, আমি ভালোভাসি। কলের মতই কতকগুলো সই করলুম। নায়েব মশায় আর্জিগুলো হাতে নিয়ে বললেন, আমি তাহলে তফসিলগুলো ঠিক করে রাখিগে।

নায়েব মশায় চলে গেলেন।

তিনকড়ি চলে যাচ্ছিলো। বললুম, দাঁড়াও।

তিনকড়ি দাঁড়ালো। ঘরে আর কেউ নেই, শুধু তিনকড়ি আর আমি। বুক আমার দুরদুর করে উঠলো একবার! আমি বললুম, আর কোনো কথা নেই তোমার?

না।

নিজের···কোনো কথা নয়?

তিনকড়ি চুপ করে রইলো। আমি বললুম, এই রাত্রে নিজে তুমি কষ্ট করে এসেছো। এই জল-ঝড়—কোনো কথা নেই?

একটা নিঃশ্বাস কিছুতেই আর চেপে রাখতে পারলুম না। তিনকড়ি তখনও দাঁড়িয়ে, নির্বাক হয়ে—মুখ তার মাটির পানে। খুব সাবধানে ছোটো

ঝড়

একটা নিঃশ্বাস চেপে আমি বললুম, বাড়ির সব খবর ভালো তো? বৌ ভালো আছে?

হ্যাঁ।

যাও।

তিনকড়ি চলে গেল।

এই সেই তিনকড়ি। একটা কদর্য মাংসপিণ্ড—বিয়ে করে পরম সুখে নিশ্চিন্ত মনে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করছে।

আর আমি! শুধু সেই কবেকার এক ঝড়কে বুকের মধ্যে পুষে রেখেছি এ পর্যন্ত।

হারে হতভাগিনী, আজ কোথায় তোর সে তেজ, সে গর্ব! বাতিটা নিবিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে বিছানায় শুয়ে পড়লুম। চোখের জল আর কোনো মতেই চেপে রাখতে পারলুম না।

বাড়ির দোর-জানলাগুলোকে কাঁপিয়ে বাইরে উদ্দাম ঝড় হা-হা করে গর্জে ফিরতে লাগলো।

—

আঁধার বৃন্দাবন

জগদীশ গুপ্ত

রমাপতি তাহার দুটি স্ত্রীর কপাল পুড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু বিলাসিতা করিতে সখ করিয়া সে দুটি বিবাহ করে নাই; তাহার ঠাকুরমা করাইয়াছিলেন। রমাপতি কুলীন নহে, তাহার রুচিও নিন্দনীয় নহে; তাহার ঠাকুরমা তাহার আপত্তির কথার প্রতিবাদ করিতে নিজের জন্য প্রায়োপো-বেশন ব্যবস্থা করিয়া শয্যা গ্রহণ করিতেই রমাপতি একদিকে অধোবদন অন্যদিকে রাজি হইয়া গেল।

রমাপতির মত ছিলো, ছেলে না-ই বা হইলো—

কিন্তু তাহার ঠাকুমা আকুল হইয়া উঠিলেন—বংশধর তাঁহার চাই-ই।

রমাপতির পিতা-মাতা বাঁচিয়া নাই।

যিনি বাঁচিয়া আছেন তিনি ঠাকুরমা, কিন্তু তিনি পরলোকের জন্য এমন তৃষিত অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন যে, তাহাতে তাঁহারও ইহকালের যন্ত্রণা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। পুত্র এবং পুত্রবধূর শোকে তিনি দিবারাত্র অষ্টপ্রহর দগ্ধ হইতেছেন....শোকাতুরার অবোধ ইচ্ছা অসহ্য জিদের আকার ধারণ করিতেই রমাপতি মত দিলো।

তাড়াতাড়ি যাহাতে কাণ্ডটি ঘটাইয়া দিয়া ঠাকুরমা ছুটি পাইতে পারেন সেজন্য অন্য দিক্ হইতেও তাঁহার তাড়া ছিলো।...মালঞ্চের পিসি, মানসীর মা, হরেনের জ্যাঠাই ইত্যাদির সঙ্গে তিনি তীর্থ-যাত্রার পরামর্শ আঁটিয়া রাখিয়াছেন....সংসারের কুণ্ডলীর ভিতর হইতে গা গলাইয়া যো-সো করিয়া একবার বাহির হইতে পারিলেই হয়—শীঘ্র ফিরিবেন না।

কিন্তু রমাপতির ঠাকুরমা আর মোটেই ফিরিলেন না· প্রয়াগে তাঁর গঙ্গালাভ হইলো।

এদিকে, দ্বিতীয়বার আগমনীর ধ্বনির মধ্যেই কি ছিলো কে জানে; সাত বৎসরের পর বন্ধ্যা মানিনী সেই মাসেই গর্ভবতী হইলো; এবং সাত বৎসর অক্লান্ত প্রশ্ন এবং খেদের পর সংসারের লোকে যখন তাহা টের পাইলো তখন বিলম্ব হইয়া গিয়াছে···যে আসিয়াছে তাহাকে ফিরাইয়া দিবার পথ নাই, যাহাকে আনিয়াছে তাহারও ফিরিবার পথ নাই।

সকলের চেয়ে সাংঘাতিক অপ্রস্তুতে পড়িয়া গেল কুঞ্জ—সেই দ্বিতীয়া। সে প্রথম যখন আসিলো তখন সব চুপচাপ—সে জানিয়াই আসিয়াছে, স্বামী সন্তান কামনা করিয়া তাহাকে আনিয়াছেন, যজ্ঞের ফল তাহাকে দিতে হইবে · তাহার বুকে একটা কাঁপন ছিলো, স্বামী নিজেকে বঞ্চিত মনে করিয়া তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে আশা আকাঙ্খা সহ তাহাকে সংগ্রহ করিয়াছেন··· আর কোনো উদ্দেশ্য নাই, প্রয়োজন নাই····কেবল গর্ভে সন্তান ধারণ··· ঐ তৃপ্তিটা দেওয়া—

একটা নিদারুণ দায়িত্বের ভার ও ভাবনা লইয়া সে আসিয়াছিলো—যদি তাহার গর্ভও ব্যর্থ হয়!···তাহা হইলে তাহারই অপরাধের সীমা থাকিবে না।

কিন্তু মানিনীর গর্ভ-সঞ্চারের সংবাদে কুঞ্জ যেন মাটি ছাড়িয়া শূন্যে দুলিতে লাগিলো····মনে হইলো, এ সংসারে সে একেবারে বাহুল্য জিনিস—তাহাকে দিয়া এখনো যদি স্বামীর প্রয়োজন থাকে তবে তাহা নিতান্তই ব্যবহারিক বাহিরের সম্বন্ধেই আবদ্ধ থাকিবে···ছলনার দিকে চোখ বুজিয়া, অতিরিক্ত একটা জিনিসের মতো একটুখানি নেক্ নজরের জন্য মানুষের কেবল খেয়ালের মুখের দিকে তাহাকে চাহিয়া থাকিতে হইবে····লঘু কি গুরু কোনো উদ্দেশ্য সাধনের সাধ লইয়া কেহ তাহার পানে চাহিবে না—

সে একা, তাহার অবলম্বন কেবল সে নিজে····ভয়ঙ্কর শূন্যতায় কুঞ্জের বুক হা-হা করিতে লাগিলো।

কুঞ্জ বলিলো—দিদির খবর তো পেলে।

রমাপতি হাসিতে যাইয়াও পারিলো না····কুঞ্জের অন্তর যে ভাবনা ভাবিয়া ভার হইয়াছে সে ভাবনা সে-ও ভাবিয়াছে। বলিলো—পেলাম।

—আমায় এনে অনর্থক একটা দায় ঘাড়ে নিলে। বলিয়া কুঞ্জ স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলো।

রমাপতি বলিলো—হঠাৎ তোমার তা মনে হতে পারে বটে, কিন্তু বেশিদিন যদি সেটা মনে থাকে তবে আমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে।

কুঞ্জ কথা কহিলো না, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলো। সেই শব্দটা কানে লইয়া রমাপতি তাহাকে বুঝাইতে লাগিলো—কিন্তু আগে যেখানে যে অবস্থায় ছিলে সে অবস্থায় ফিরে গিয়ে তেমনটি হবার উপায় তো আর নেই। এখানেই তোমাকে পুষিয়ে নিতে হবে।

—অর্থাৎ ফিরে যাবার পথ নেই বলে যেমনভাবেই রাখি, পোষ মেনে থাকতে হবে; আর জোর তো তেমন নেই।

কথাটার সুর শুনিয়া রমাপতি চমকিয়া উঠিলো।

কুঞ্জকে সে ছেলেমানুষ মনে করিয়াছিলো; কিন্তু এ তো ছেলেমানুষের কথা নহে…তাহাদের সম্বন্ধে তাহার নিজের মনে এবং পৃথিবীর অন্যত্র যতো কথা আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে এ যেন তাহারই প্রতিধ্বনি…হৃদয়ের গভীরতম কন্দর হইতে উত্থিত হইয়াছে…যেমন তাহাতে ব্যথা তেমনি তাহাতে যেন অমার্জনা।

রমাপতি বিমর্ষ হইয়া উঠিলো। বলিলো—তা বলছিনে। তোমার সুখ আমাদের ওপর যতটা নির্ভর করে তা তুমি পাবে। কিন্তু আমাদের ভুলের দরুণই হোক্ কি যে কারণেই হোক্, যে ঘটনা ঘটে গেছে তার ভেতর তোমার নিজের স্থান করে নিতে হবে তোমাকেই। তুমি কি ভাবছো তা আমি জানি; তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, আমি নির্বোধ নই।

শুনিয়া কুঞ্জ পুলকিত হইতে পারিলো না—একটা মুখোমুখী কিন্তু অসমাপ্ত বোঝাপড়ার মতো মনে হইয়া সে স্বস্তিও পাইলো না….

কিন্তু দিন চলিতে লাগিলো নির্বিবাদেই।

মানিনী ছেলে কোলে করিয়া আসিয়া হাজির হইলো।—দেখিয়া কুঞ্জ নাচিতে লাগিলো।

কুঞ্জের মনে নিদারুণ একটা শঙ্কা ছিলো, না জানি সপুত্র সপত্নীর সঙ্গে মিলনের প্রথম মুহূর্তটা তার কেমন করিয়া কাটিবে ! মন এখন সুস্থির আছে বটে, কিন্তু মনকে বিশ্বাস নাই···তখন যদি হঠাৎ আঁচ লাগিয়া প্রাণে জ্বালা জন্মে তবে তাহা দৃষ্টিকটু হইবে····যতটা অপরাধ হইবে ততোধিক····লুকাইয়া থাকা চলিবে না, বিমনা হইলে চলিবে না, তৃতীয় ব্যক্তির মতো উদাসীন থাকিলেও চলিবে না···

কিন্তু বড়ো বৌ তাহার থক্‌থকে গা নধর পুত্রটিকে কোলে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইতেই কুঞ্জের তখন আর আত্ম-পর কোনো হুঁশ রহিলো না ; ঐ ছেলেই সমস্ত বিঘ্ন সমস্ত দুর্ভাবনা নিঃশ্বাসে উড়াইয়া যেন শূন্যে অদৃশ্য করিয়া দিলো।

বড়ো বৌ কুঞ্জের কোলে ছেলে দিয়া সেইদিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলো ; বলিলো—তোর আর কোনো কাজ থাক্‌বে না, বোন্‌। তুই ছেলে নিয়ে থাক্‌।

বড়ো বৌ মনে মনে বুঝিয়াছিলো, কুঞ্জ অপ্রতিভ হইয়া আছে।

কুঞ্জ তখন ছেলেকে মাটিতে বসাইয়া তাড়াতাড়ি দিদির পায়ের ধূলা লইলো ; এবং তাহার পর ঐ ছেলেকেই কেন্দ্র করিয়া গল্প দানা বাঁধিয়া ঘুরিতে লাগিলো···ছেলের সর্বাঙ্গে কুঞ্জ কতো যে চুম্বন করিলো তাহার ইয়ত্তা রহিলো না····ছেলের প্রত্যেকটি রোম দিয়া যেন অমৃতের ফোয়ারা ছুটিতেছে···তাহার ঘ্রাণটুকু পর্যন্ত যেন সর্বাঙ্গ দিয়া শুষিয়া লইতে ইচ্ছা করে।

বড়ো বৌ মনে মনে বলিলো—বাঁচলাম।

রমাপতি দেখিলো, দুই সতীনে গলায় গলায় ভাব হইয়া গিয়াছে। আড়ালে দাঁড়াইয়া সে শুনিতে লাগিলো, বড়ো বৌ বলিতেছে—বেশ গুছিয়ে নিয়েছিস্‌ তো ! আমার ভাই বড়ো এলোমেলো লাগে ; কিছুই যেন করে উঠতে পারলাম না, সময় মতো কিছুই হলো না। এখন কষ্ট হয় !

কুঞ্জ বলিলো—উনিও তাই একদিন বলছিলেন।

—কি বলছিলেন ?

—বলছিলেন, তোমার দিদি সবই করে, সবই জানে, কিন্তু তার আঁকুবাকু ঘোচে না; কোন্ কাজটা মনের ভুলে বাদ পড়ে গেল, আর তাই নিয়ে আমি বক্‌বো, এই ভয়ে সে সদাই তটস্থ!

—তাই বলছিলেন বুঝি? বলিয়া বড়ো বৌ হাসিতে লাগিলো।

কুঞ্জ বলিলো—আমরা কাজ ভাগ করে নেবো, দিদি; আমিই সব করবো, তুমি কেবল নজর রাখবে কি ভুল-চুক হচ্ছে, সাবধান করে দেবে।

মানিনী তাহার প্রতিবাদ করিলো; বলিলো—তা-ই বৈকি! আমি বুঝি বসে বসে খাবো আর তোর ওপর জমাদারী করবো!

—তোমার যে খোকা আছে! খোকাকে আমায় তুমি দিয়েছো। বলিয়া কুঞ্জ হেঁট হইয়া নিদ্রিত খোকার গণ্ড চুম্বন করিলো। তাহার পর বলিতে লাগিলো—গলা শুকিয়ে গেলে কি দেবো আমি তখন ওকে! তখন ডাকতে হবে তোমাকেই। অতো ঝঞ্জাটে কাজ কি বাপু? তুমি এটা-সেটা খুচরো কাজ করো, আমি রান্নাবান্নার ভারি ভারি কাজগুলো করবো।...

এই সাধারণ কথাগুলিই রমাপতি আড়ালে দাঁড়াইয়া যেন ঢোকে ঢোকে গিলিতে লাগিলো।—আনন্দ তাহার আর ধরিতেছিলো না।...সে ভাবিয়া দেখিয়াছিলো, গার্হস্থ্য শান্তি-অন্বেষণের দুরূহ কাজে বুদ্ধি খরচ করিতে যাওয়া বুদ্ধির অপব্যয়; চতুরতাও টেঁকে না; কলাবিদের কুশলতা লইয়া আবিষ্কারের চেষ্টা সেখানে অচল...কাজেই দুই সতীনের আপসে ভাব হইয়া গিয়াছে দেখিয়া তাহার এমন হালকা আর আরাম বোধ হইতে লাগিলো যে, সেখানে দাঁড়াইয়া থাকাই তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিলো।

কিন্তু মন চলিলেও পা চলিলো না।

যুগপৎ দুজনারই চোখের উপর যাইয়া পড়িতে সে পারিলো না। ...উহারা উভয়ে তো পরস্পরের প্রেমে বিভোর হইয়া গিয়াছে—কিন্তু হঠাৎ তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া উহাদের চমক না লাগুক, কিভাবে উহারা তাহাকে গ্রহণ করিবে তাহা তো অনুমান করিবারও উপায় নাই।...অন্তঃস্রোতে যদি জ্বালা থাকে তবে সেইটাই ভর্ৎসনার আকারে দেখা দেয়!....উভয়েরই

প্রশ্ন করিবার কিছু অবশ্যই আছে, সেই প্রশ্নটাই একজনের সম্মুখে আর একজনের আচরণে যেভাবে ফুটিতে পারে তাহা মর্মান্তিক না হউক, অপদস্থ হইবার জ্বালা সে নিশ্চয়ই দিবে।

রমাপতি নিঃশব্দে ফিরিয়া গেল।

কিন্তু তাহার এ আতঙ্ক একেবারে বৃথা।...রমাপতির পত্নীদ্বয় নিজের কাছে স্বীকার না করিলেও ইহা ঠিকই যে, আপাততঃ স্বামীকে তাহার কর্মক্ষেত্র হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে।....দুজনের মুখের আলোচনায় যেমন, মনের চিন্তার ধারাতেও তেমনি, ছেলেই এখন সর্বপ্রধান, পরে সংসার, তৃতীয় স্থান স্বামীর; কিন্তু তাই বলিয়া অভক্তি নাই।

দুজনার কথার মাঝখানে যাইয়া পড়িলে স্বামীকে উহারা অভ্যর্থনাই করিতো; কিন্তু নিজেকে দুজনার কাছে বণ্টন করিয়া দিয়া সে যে অপরাধ করিয়াছে তাহাতে দুজনার কাছেই পুরা দাবি করিবার পথ চিরদিনের মতো বন্ধ হইয়া গিয়াছে; একটা প্রশ্ন উদ্যত হইয়াই আছে....সে প্রশ্নটি বোধহয় চিরকাল অনুচ্চারিত থাকিয়াই যাইবে, কিন্তু রমাপতির মনে হইতে লাগিলো, অজ্ঞাত নরকের বিভীষিকার মতো মনের জগতে তাহা চিরজীবী হইয়াই বাস করিবে; সে প্রশ্নের পরলোক নাই।

রাত্রে কুঞ্জ বড়ো-বৌকেই জোর করিয়া উপরে পাঠাইয়া দিলো। বড়ো বৌ স্বামীর শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিলো—আমাদের দুজনে ভাব হয়ে গেছে, বুঝলে।

স্বামীকে সংবাদটি দিবার জন্য মানিনী মনে মনে ছট্‌ফট্ করিতেছিলো। ...রমাপতি আহারে বসিলে কেবল সংসারের কথাই হইয়াছে, ছেলের কথাও হয় নাই—অপর কোনো কথাও হয় নাই।....তখনই মানিনী স্বামীর অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করিয়া অসুখ বোধ করিয়াছিলো; এখন সান্ত্বনার ছলে ঐ সুখবরটি দিয়া সে নিজেই গদগদ হইয়া উঠিলো।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দ থাকিয়া রমাপতি নিজেই আগে ফিক্ করিয়া একটু হাসিলো—তাহার পরই পুরাতনের মোহে ফিরিয়া প্রগলভ হইয়া উঠিতে

তাহার বিশেষ দেরী হইলো না···দেখিতে দেখিতে আলাপ জাঁকিয়া উঠিলো। ছেলেটিকে যথেষ্ট আদর করিলো।

তাহাদের হাসি কলরব কানে যাইয়া কুঞ্জের মনের সমস্ত শান্তি মুহূর্তেক নিশ্চেষ্ট থাকিয়া হাওয়ার মুখে হালকা মেঘের মতো কোন্ আকাশের দিগন্তরালে নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল তাহার উদ্দেশ রহিলো না···ছেলেটিকে কেন্দ্র আর অবলম্বন করিয়া যে আনন্দের সম্ভোগে সে ইতিপূর্বে বিহ্বল হইয়া গিয়াছিলো তাহার সে আনন্দের উৎস শুকাইয়া ধূ-ধূ করিতে লাগিলো····সে আনন্দের নিবাস তাহার মাতৃত্বের মধুভাণ্ডে, স্বামী-প্রীতির মন্দিরে নয়····কথাটা মনে হইতেই কুঞ্জ শিহরিয়া উঠিলো।

নিজের মনের সঙ্গে মুখোমুখী হইয়া প্রায় সারা রাত্র কুঞ্জের জাগিয়া কাটিলো····উপরের ঘর নিঃশব্দ হইয়া গেল····এবং স্বামী-স্ত্রীর মিলনের যে উদ্দমতা, যে উল্লাস উহাদের কণ্ঠে কল্লোলিত হইয়া এতক্ষণ কেবলি তাহার কানে আসিয়াছে, সেই শব্দই যেন ঝিঁঝির ডাকের মতো আঘাত করিয়া তাহার কানের কাছে অবিরাম আবর্তিত হইতে লাগিলো····মাথায় ব্যথা ধরিয়া গেল, চোখ জ্বালা করিতে লাগিলো····এবং সেই ব্যথা আর জ্বালা লইয়া ঘুমে যখন তাহার চোখ বুজিয়া আসিলো তখন ভোরের হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছে।

ঘুম ভাঙিয়া কুঞ্জ দেখিলো, গৃহকার্য প্রায় শেষ হইয়াছে····আর ধিক্কারে তার মন তিক্ত হইয়া আছে, এবং গত রাত্রির অসহিষ্ণু বিকারের জন্য সে নিজেকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহে।

খোকাকে টানিয়া লইয়া কুঞ্জ বলিলো—দিদি, আমাদের সে পরামর্শ টিক্‌লো না।

—কোন্ পরামর্শ ?

—কাজের···ভারি কাজগুলো তুমিই করো ; আমি এটাকে নিয়েই দিন-রাত থাকবো। বলিতে বলিতে তার মনে হইলো, যেন চোখে জল আসিতেছে ; কেবল মনের জোরেই সে জলের গতি বন্ধ করিয়া হাসিয়া মুখ

তুলিলো। মানিনী বুঝিলো না, কুঞ্জের পিপাসু নারী-চিত্ত লুকাইয়া থাকিবার বিবর খুঁজিতেছে; খুশি হইয়া বলিলো—আচ্ছা।···কিন্তু নজর রাখিস্, আমার ভুল হয় বেজায়।

কুঞ্জ বলিলো—আচ্ছা।

দুজনাই স্বামীকে তোয়াজে রাখিতে সমান সচেষ্ট।

কিন্তু দু'জনাই অন্তরালে থাকিতে চাহে—পাছে আর একজন সন্দেহ করে যে, আমাকে অতিক্রম করিয়া ও স্বামীর কাছে অগ্রগণ্যা হইয়া উঠিতে চাহিতেছে! দু'জনাই এটা বোঝে যে, এই পিছাইয়া থাকার উদ্দেশ্যটা আর একজনের কাছে ধরা পড়িয়া গেছে····চেষ্টাটা তবু ভাণ দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে তাহারা ভালোবাসে।

কিন্তু মুস্কিল হইলো রমাপতির।

জল চাহিয়া, পান চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে করিতে সে অপ্রভিত হইয়া উঠে, দুজনার ঠেলাঠেলিতে বিস্তর দেরী হইয়া যায়।

কুঞ্জ বলে—তুমি দিয়ে এসো, দিদি।

দিদি বলে—চোখ নেই? কাজ করছি, দেখছিস নে! বলিয়া কুঞ্জকে ধাক্কা দিয়া তুলিয়া দিতে হাত তোলে; বলে—ওঠ বল্ছি।

উহারা একজন থাকিতে যাহা অবিলম্বে মিলিতো, এখন জনবল বাড়িয়াও কেন তাহা আরো অবিলম্বে মেলে না—ভাবিয়া রমাপতি বিস্মিত হয় যথেষ্ট, কিন্তু প্রশ্ন করিয়া সে জবাব পায় না····মানিনী কেবল একটু হাসে, কুঞ্জ না শুনিবার ভাণ করে।

উপরে যাইবার পালা এবার কুঞ্জের।

কিন্তু কুঞ্জের সেদিকে পা নড়ে না, মন চলে না····সন্তানোপহার লইয়া তাহারই স্বামী-সম্ভাষণে যাইবার কথা, কোহিনুরকিরীটিনী রাজ্ঞীর মতো সগর্বে····কেবল সেই উদ্দেশ্যেই সে আনীতা। সেদিন হয়তো একদিন

আসিতো, আসিতে দেরী হইলেও আসিতে পারিতো···কিন্তু সেই আসিবার দিকে আর কাহারো আগ্রহ নাই—তাহারও নাই····

তবু যাইতেই হইবে, তাহার কর্তব্যই তাহাই····গলগ্রহের অপার কুণ্ঠায় ভারাক্রান্ত মন্থর হইয়া সে চলিতেছিলো···হঠাৎ একবার দাঁড়াইয়া পড়িয়া সে নিজেকে খানিক সুস্থ করিয়া লইলো····

—এলো তোমার গলগ্রহ। বলিয়া কুঞ্জ স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলো···হাসা তাহার কর্তব্য···কিন্তু লক্ষ্য রাখিলো, স্বামীর মুখে তাহার মনের প্রতিবিম্ব ফোটে কিনা সেই দিকে।

কিন্তু রমাপতির মুখে কোনো ভাব-বৈলক্ষণ্যই দেখা গেল না····বলিলো—গললগ্ন না হওয়া পর্যন্ত ঠিক গলগ্রহ কিনা বুঝতে পারছি নে।—বলিয়া হাত বাড়াইলো।

কুঞ্জ বলিলো—আসছি। বলিয়া তাহার পাশে যাইয়া জড়সড়ো হইয়া বসিলো।····কিন্তু রমাপতি অনুভব করিতে লাগিলো, মনে মনে ছেলেটির দোহাই দিয়া মানিনীর বেলায় তাহার কণ্ঠ যেমন উদ্দাম হইয়া উঠিতে চাহিয়াছে ইহাকে লইয়া তেমনটি হওয়া যেন অসম্ভব। ইহাকে লইয়া কৌতুক করা চলে, সন্তর্পণে সম্ভাষণ করা চলে, কিন্তু উচ্চকণ্ঠের অর্থহীন প্রগল্‌ভতা যেন সাজে না····আলাপ অকুণ্ঠ প্রলাপের আকার ধারণ করিয়া হাস্যরোলের ঘূর্ণিতে তার শেষ হওয়া যেন সঙ্গতও নয়, শোভনও নয়।···· ইহাকে অতিশয় গোপনে চোরের মতো লুকাইয়া, পৃথিবীর কাহাকেও ঘুণাক্ষরেও অনুমান করিতে না দিয়া কাছে রাখিতে হইবে।

ইহার চেয়ে মনের পরাজয় আর কি হইতে পারে!

রমাপতির মুখখানি বিষণ্ণ হইয়া উঠিলো। কুঞ্জ জিজ্ঞাসা করিলো—কি ভাবছো?

—ভাবছিনে কিছুই। বলিয়া সে কুঞ্জকে বাহুবেষ্টিত করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলো, এমনি করিয়া যেন সে অসহ্য মাত্রায় সুরা শোষণ করিয়া লইয়া মাতাল হইয়া নিজের পরাজয়-জ্বালাকে পরাজিত করিতে চাহে।

কুঞ্জ এ-পীড়ন নীরবে সহ্য করিলো।

পরে বলিলো—দিদির জন্যে আমার মন কেমন করে।

রমাপতি বলিলো—কেন ?

—দিদিই তো ষোলো আনার মালিক—বলিতে বলিতে কুঞ্জ থামিয়া গেল। কিন্তু রমাপতির কাছে তাহার কথার মর্মার্থ পরিষ্কার হইয়া গেল। বলিলো—দুজনাকেই কি একসঙ্গে সমান ভালোবাসা যায় না ?

—যায়।

কুঞ্জ মুখে সায় দিলো বটে, কিন্তু তাহার অন্তরের অনুভূতি তাহা নহে, এবং স্বামী আহত হইবে বলিয়াই সে বলিলো না যে, হয়তো তাহা সত্যই, তবু সন্দেহের স্থান কি নাই ? মানুষের মন তো ঢিল নহে যে, যেদিকে ইচ্ছা গড়াইয়া দিলেই সে সেইদিকেই ছুটিতে থাকিবে!···চারিদিককার ডাকেই সে সাড়া দিতে পারে, কিন্তু কোন্‌দিকে সে বেশি করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিবে তাহার ঠিকানা, তাহার কারণ কি সে নিজেই চূড়ান্ত করিয়া জানে! তাহার ইচ্ছাই কি তাহার চরম সোপান আর শেষ প্রশ্ন!···জানা-অজানা কতো পথ দিয়া মন ছোটে····হঠাৎ সে চমকিয়া জাগিয়া উঠে····ভাবে, এ-পথে সে কেমন করিয়া আসিলো!

স্বামীর ক্ষুব্ধ বিমূঢ় মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে পরক্ষণেই কুঞ্জ সব কথা ভুলিয়া যাইয়া অবাধ উন্মুক্ত অম্লানচিত্তে স্বামীর কাছে ধরা দিলো।

মানিনী নীচে শুইয়াছিলো।

শুইয়া থাকিতে থাকিতে শয্যা তাহার অসহ্য হইয়া উঠিলো····সে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলো।

রাত্রি নিস্তব্ধ, যেন ধ্যানস্থ। আকাশে নক্ষত্র গায়ে গায়ে বসাইয়া গাঁথা··স্থানে স্থানে স্তূপ বাঁধিয়া আছে। সম্মুখে অনন্ত-বিস্তৃত অন্ধকার··· উপরে অনন্ত জ্যোতির্মঞ্চ—কিন্তু উভয়েই যেন অসাড়·· চিরবিচ্ছেদের বেদনায় তাহাদের মুখের বাণী অনন্ত কালের জন্য স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে····

মানিনী ঐ নিস্তব্ধতার দিকেই চোখ মেলিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলো···· তাহারপর ঐ নিস্তব্ধতার একটা অর্থ বেদনায় অন্তহীন হইয়া উঠিয়া তাহাকে বেড়িয়া ধরিতে লাগিলো—

কে যেন নিস্তব্ধতার সিংহাসনে বসিয়া তাহার জীবনের অর্থ আর আনন্দ অকাতর, অকৃপণ হস্তে টানিয়া লইয়া প্রবাহিত করিয়া দিতেছে—আর

একজনকে আগ্রহে হৃদয় প্রসারিত করিয়া দিয়া বুক ভরিয়া তাহা গ্রহণ করিতেছে···তাহার পাথেয়, তাহার সম্বল, তাহার গৌরব দেখিতে দেখিতে নিঃশেষিত হইয়া গেল····এক বিন্দুও তাহার জন্য রহিলো না।

কিন্তু মানিনী কাঁদিতে পারিলো না।

অপার শূন্যতার হাহাকারের মাঝে তাহার কান্নার পথও হারাইয়া গেল।

মানিনী যখন শয্যায় ফিরিয়া গেল তখন ভোর হয়-হয়।

কিন্তু এই আসল কথাটিই দিবালোকে অবাস্তব হইয়া উঠে····পাপহর দিবালোক যেন উহাদের বুকের সুদূরতম প্রকোষ্ঠেও প্রবেশ করে!

সেখানে তখন ছেলে কাঁদে···সংসার ব্যস্ত হইয়া শব্দ করিতে থাকে··· দশরথ যেন সেই পথে দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছেন—সেখানে তখন এমনি আড়ম্বর আর একাগ্রতা।

ঘর গোছানর কাজ তো আছেই—

রান্নাবান্না, হেঁসেল, গোয়াল····ইহারাও নগণ্য নহে।

প্রতিবেশিনীরা আসে····মিষ্টমুখে তাহাদের আপ্যায়ন করিতে হয়—

ভিখারিণী আসে···তাহাকেও দাঁড় করাইয়া রাখা চলে না—

রমাপতি শাক ভালোবাসে; শাক খুঁটিয়া না বেড়াইলে চলেই না; এক টুকরী শাক বাছিয়া তোলা তিন দণ্ডের কাজ···ছেলেটার যদি একটু বিবেচনা থাকে···মরা আরশোলাটা তার মুখে তোলা যেন চাই-ই।

কুঞ্জ বলে—দিদি, তুমি চরকীর মতো ঘুরো না কেবল; ছেলেটা বুকে হেঁটে-হেঁটে কি করছে, দেখো। তুমি একটু ওকে নিয়ে বসো।

মানিনী বলে—বসছি, এই হাতের কাজটা সেরে নিই। তুই একটুখানি ওকে সামলা ততক্ষণ।····ছেলেও বাপু তোমার আহ্লাদে···গায়ে ধূলো লেগেছে তো হয়েছে কি?

—ধূলো নয়, ধূলো নয়; ও এখন আরশোলা খাবে।

—আরশোলাটা ফেলে দিলেই তো হয়, সামনে থেকে।

—তা দিয়েছি।

—তবে আর আমি উঠে এখন করবো কি? তুই বরং ওকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আয়। আমি ততক্ষণ—

কুঞ্জ বলে—তুমি ততক্ষণে কিছুই পেরে উঠবে না; এ কি একলা-হাতের কাজ! ওঁকে বলে ছেলে রাখবার একটা লোক রাখো দিদি, বাচ্চা দেখে।

—একজনের কাজ দুজনে করছি, তার ওপর আবার বাচ্চা! বলিয়া মানিনী হাসিতে থাকে; কুঞ্জও হাসে।

আরো দশটা ইহলৌকিক কর্তব্যের—এবং ষষ্ঠী, শীতলা, লক্ষ্মী প্রভৃতির নৈমিত্তিক পূজা আর ব্রত উপবাসাদির মতো নানান কল্যাণকর অনুষ্ঠানের ভিড়ের মধ্যে রমাপতি একাকার হইয়া গেছে!···তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কেবল এইটুকু যে, এইগুলি যাহাদের জন্য করা হয়, সে তাহাদেরই একজন। সে যে সেবা লাভ করে, সেই সেবা করিবার আগ্রহের মধ্যেই সে প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে···স্ত্রী দুইটির সঙ্গে সম্পর্ক কেবল কর্তব্যের!

রমাপতি ভাবে, এই ভালো, বেশ আছি।

রমপতি মারা গেল। তখন মানিনীর একটি ছেলে একটি মেয়ে; কুঞ্জরও একটি ছেলে হইয়াছে।

রমপতি বাঁচিয়া থাকিতে যেখানে তাহার স্থান হয় নাই, মারা যাইতেই সে যেন সংসারের সেই সর্বোচ্চ চূড়াটি অধিকার করিয়া একেবারে সম্মুখে, সর্বাগ্রে আসিয়া বসিলো!

চক্ষের আড়ালে সে যায় না।

তাহাকে না দেখিয়া কোনো দিকেই যেন চোখ ফিরানো যায় না···কাজে যে রস ছিলো, তাহা শুকাইয়া উঠিলো····ত্রুটিগুলি শত-পথে ছুটিয়া আসিয়া শত-মুখ সূঁচের মতো বিঁধিতে লাগিলো···

সে যন্ত্রণা, সে অভাবকেও একদিন একপাশে সরাইয়া রাখিতে হইলো।

দুজনারই মনে হয়, তিনি যাহা চাহিতেন, যাহা তাঁহার প্রাপ্য, তাহা তাঁহাকে বুঝি সম্পূর্ণ দেওয়া হয় নাই · নিজেকে বিভক্ত করিয়া দিয়া তিনি বড়ো কুণ্ঠিত ছিলেন····এই কথা মনে হইলেই দুজনেরই বুক টাটাইয়া

উঠে ; মনে হয়, তাহারা বোধহয় তাঁহার সে কুণ্ঠাটুকু ইচ্ছা করিলেই দূর করিতে পারিতো···

দুজনে মুখোমুখী হইয়া বসে—

কেবল স্বামীর কথাই বলে····সপত্নী-ঈর্ষা যদি কোনদিন ঘুণাক্ষরে, একেবারে অজ্ঞাতে, ইঙ্গিতে প্রকাশ পাইতো তাহা হইলে তিনি কেমন ব্যথিত হইতেন, তাহাও তাহারা এই সময়ে অতিশয় অকপটে প্রকাশ করে।

তবু বুক ভরিয়া আছে···ভাবে, কোনো অপরাধের····কোনো কলঙ্কের স্মৃতিই তিনি রাখিয়া যান নাই।

কিন্তু এ পরম দুঃখও দিনে-দিনে ক্ষয় হইয়া একদিন মুখে হাসি দেখা দিলো···সন্তান তিনটি বড়ো হইয়া উঠিতেছে ; ষোলো আনা মন এখন তাহারাই চাহে।

সুখ-দুঃখ আর স্মৃতি লইয়া দিন চলে।

কিন্তু হঠাৎ একদিন এমন একটি ঘটনা ঘটিয়া গেল, যাহাতে মনের স্থিতি, জ্ঞানের শৃঙ্খলা, সম্বিতের আরাম এক নিমিষেই বিপর্যস্ত হইয়া একজনের দৈন্য-বেদনার আর কূল-কিনারা রহিলো না।

প্রতিবেশিনী নির্মলা আসিয়া বসিয়াছে—

কুঞ্জ ঘুমাইতেছিলো ; মানিনী নির্মলাকে আসন দিয়া বসাইয়াছে···· কথায় কথায় রমাপতির কথা উঠিলো। নির্মলার বহুদিন হইতেই সংবাদটি জানিবার দুর্জয় আকাঙ্খা ছিলো···প্রশ্ন করিয়া বসিলো সে ; বলিলো—ছোটো বৌ কোথায় ?

—ঘুমুচ্চে।

—একটা কথা শুধোই তোকে, বড়ো বৌ····কাকে ভালোবাসতো বেশি ?

—তা কি করে জানবো, বলো—তাঁর মনের কথা তিনিই জানতেন।

—তবু আভাসে-ইসারায় কিছু টের পাসনি, কোনদিন ?

মানিনী হাসিতে লাগিলো ; বলিলো—পেয়েছি।

নির্মলা হাঁ করিয়া রহিলো···

কিন্তু মানিনী পরের কথাটা না বলিলেই ভালো করিতো····কুঞ্জ ঘুম ভাঙিয়া কখন দরজায় আসিয়া বসিয়া আলস্য ভাঙিতেছে তাহা মানিনী জানে না ; জানিলে বলিতো না ।

নির্মলার দিকে চাহিয়া বলিলো—তখনো ছোটো বৌয়ের পালা । একদিন দুপুর-রেতে উঠে এসে আমায় ডেকে তুলে···

মানিনী আর কি বলিলো না-বলিলো, তাহা কুঞ্জের কানে গেল না, কিন্তু তাহার মুখের রক্ত সরিয়া তাহার বুকের বায়ুর যাওয়া-আসা বন্ধ হইয়া আসিলো···তাহার স্মৃতির মন্দির কালি মাখিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলো···জীবনের যতো স্বাদ তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলো, নিমিষে তাহা লুপ্ত হইয়া তাহাকে পাষাণ করিয়া রাখিয়া গেল ।

সন্ধ্যার পর কুঞ্জ বলিলো—দিদি, আমি বাপের বাড়ি যাবো ।

মানিনী আঁৎকাইয়া উঠিলো···

বহুদিন চেষ্টা করিয়াও সে কুঞ্জকে তার পিত্রালয়ে পাঠাইতে পারে নাই । ···স্বামীর স্পর্শ এই মৃত্তিকায় অমর হইয়া আছে···সে স্পর্শের মায়া সে ছিন্ন করিতে চাহে নাই···

মানিনী অবাক হইয়া বলিলো—হঠাৎ ?

পরে একটু ঠাট্টা করিতেই যাইতেছিলো ; কিন্তু কুঞ্জের মুখের দিকে চাহিয়া সে ভয় পাইলো ; বলিলো—কেন বল্ দেখি ?

কুঞ্জ বলিলো—আমি যা দিয়েছিলাম তার সদ্গতি হয়নি, দিদি ; সে ভূত হয়ে এই বাড়িতে আছে। আমি এ-বাড়িতে আর থাকতে পারবো না। বলিয়া চলিয়া গেল ।

মানিনী ইহার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নির্বাক মুখে একটা নিঃশ্বাস ফেলিলো মাত্র ।

অন্ধকারের অভিসার

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ঘুঘুডাঙার বস্তিতে সরকারী কলতলায় একদিন সকালে এক মহাকাণ্ড! হাজারির স্ত্রী লছমি কলে জল নিতে এসেছিলো, সেইখানে পাড়ার মেয়ে ফুলিয়ার সঙ্গে তার কি বচসা হয়, কথা থেকে শেষে হাতাহাতি-কামড়কামড়ি, তারপর কখন ফাঁক পেয়ে লছমি মাটি থেকে একটা লোটা তুলে নিয়ে ফুলিয়ার কপালে ছুঁড়ে মারে—একেবারে রক্তে রক্ত-গঙ্গা! ফুলিয়া মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। লোকে ভাবলো বুঝি সে মরে গেছে—তাড়াতাড়ি তারা পুলিশে খবর দেয়; পুলিশের লোক এসে লছমিকে থানায় ধরে নিয়ে যায়।

যখন এই কাণ্ড ঘটে, তখন হাজারি ঘরে ছিলো না, কাজে বেরিয়ে গিয়েছিলো। সে কোন্-এক কারখানায় কাজ করে—রোজ সকাল আটটায় তাকে হাজরে দিতে হয়।

লছমি আর হাজারি এ বস্তিতে আজ চার বছর বাস করছে। তার আগে কোথায় ছিলো, এ বস্তির লোক কেউ জানে না। প্রথম যখন এখানে আসে, ওরা ভারী গরিব ছিলো—অতি জীর্ণ ছেঁড়া ময়লা জামা-কাপড়, না আছে বিছানাপত্র, না আছে একখানা বাসন। একেবারে খালি হাতে এই দুটি প্রাণী বস্তির মধ্যে সবচেয়ে কম-ভাড়ার ঘরে এসে আশ্রয় নেয়। এখন অবস্থার অনেকটা উন্নতি হয়েছে। একটা বিছানা এবং দুখানা বাসন তো হয়েইছে, তার ওপর লছমির হাতে দু'চারখানা রুপোর গয়নাও উঠেছে। হয়তো আরো উন্নতি হতো যদি না হাজারি গত বছর থেকে মদ ধরতো।

লছমি যেমন স্বামীকে ভালোবাসে, হাজারিও তেমনি ভালোবাসতো লছমিকে। দুজনের মধ্যে এতটা প্রণয় ছিলো যে, বস্তির মধ্যে সেটা একটা ঈর্ষাসূচক আলোচনার ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। এরা সুখেই ছিলো।

হাজারি যখন হঠাৎ মদ ধরে, তখন এই ছোট্ট সংসারে যে সামান্য সচ্ছলতা ছিলো, তাতে অনটনের সূত্রপাত হতে আরম্ভ করে; কিন্তু লছমি তা গ্রাহ্য করেনি। মদে যে-পয়সা যাচ্ছে, তাতে তারই গায়ের ভবিষ্যতের আর-একখানি অলংকারের রুপো যে ক্ষয়ে যাচ্ছে, সে-কথা স্পষ্ট বুঝতে পারলেও, তাতে একদিনের জন্যেও কোনো আপত্তি প্রকাশ করেনি সে। কারণ লছমি জানতো, হাজারি সমস্ত দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে-পয়সা আনে, সে তো তারই জন্যে; নিজের জন্যে সে কতটুকু নেয়? কাজেই সে যদি সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর একটু আনন্দের জন্যে ছুটো পয়সা মদে খরচ করে, তাতে বাধা দিতে লছমির মায়া করতো. সে তো বারণ করতই না, বরং স্বামী মদ খেলে তারও আনন্দ হতো। স্বামী যে জিনিসটি খেতে ভালোবাসে, নিজের ভাগের চাল কিংবা আটা অল্পে-অল্পে বাঁচিয়ে সেই উদ্‌বৃত্ত থেকে সেই জিনিস নিজের হাতে তৈরি করে যেদিন স্বামীকে সে দিতে পারতো, সেদিন তার যেমন আনন্দ হতো—স্বামীর মদ খাওয়াতে তার-চেয়ে কম আনন্দ সে উপভোগ করতো না।

এই রকমে লছমির আশ্‌কারায় হাজারি অল্পে-অল্পে বেশ মাতাল হয়ে উঠতে লাগলো।

এতে সংসারে যদিও ক্রমেই অনটন বাড়ছিলো, কিন্তু বিশেষ কোনো অশান্তি ঘটেনি। কারণ হাজারি সত্যিই লছমিকে ভালোবাসতো; এবং সেই ভালোবাসায় লছমির সমস্ত দৈন্য মুছে যেতো।

গত বছর পূজোর সময়ও হাজারি লছমিকে একখানা গয়না দিয়েছিলো এবং তার জন্যে একখানা রঙিন শাড়িও কিনেছিলো, কিন্তু এ-বছর পূজোর সময় সে দেখলে—হাতে এমন পুঁজি নেই যে, গয়না তো দূরের কথা, একখানা মোটা শাড়িও কিনতে পারে। হাজারির মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল—সেই ছুঃখে সে মদ খাওয়া বন্ধ করলো। ইয়াররা তাকে টানাটানি করলে, সে হাত ছাড়িয়ে চলে আসতো। লছমি ছু'দিন দেখে তিনদিনের-দিন জিগ্যেস করলো—'কি গো, মদ খাচ্ছো না যে?'

হাজারি বললো—'মদে বড়ো খরচ হয়ে যায়, লছমি!'

লছমি বললো—'হলই বা, তাতে কি হয়েছে?'

হাজারি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো—'হয়েছে এই যে, এ-বছর পূজোয় তোকে গয়না দিতে পারলুম না!'

লছমি তীব্রস্বরে বলে উঠলো—'কে তোমার কাছে গয়না চায়!'

ছাই গয়নার জন্যে স্বামীর একমাত্র ফুর্তির জিনিস মদ তাকে ছাড়তে হয়েছে শুনে লছমির যেমন দুঃখ হলো, তেমনি রাগও হলো। সে আবার সজোরে বললো—'গয়না আমার চাই না!'

হাজারি আদর করে বললো—'তা কি হয়, লছমি! তুই আমার লক্ষ্মী, তোর দৌলতে আমার সব দুঃখ ঘুচেছে—তোকে সাজাতে হবে বৈকি!'

লছমি রাগ দেখিয়ে বললো—'অমনি যদি করো, তাহলে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবো কিন্তু!' বলে সে মুখ ঘুরিয়ে নিলে।

হাজারি হাসতে লাগলো।

শেষে লছমি একরকম জোর করেই আবার হাজারিকে মদ ধরালো; তাতে ফল হলো এই যে, লছমির গয়না-পাওয়ার সম্ভাবনা একেবারে জন্মের মতো দূর হয়ে গেল। লছমির তাতে এতটুকু দুঃখ হলো না। তার স্বামী যে তাকে আদর করে বলেছিলো—'তুই আমার লক্ষ্মী, তোকে সাজাতে হবে বৈকি!' তাইতেই লছমির মনে হতে লাগলো—তার সমস্ত অঙ্গ গয়নায় ভরে গেছে!

গয়না দিতে পারলো না বটে, কিন্তু হাজারি কোথা থেকে পূজোর সময় লছমির জন্যে একখানা ভালো শাড়ি এনে দিলো। লছমি বিস্মিত হয়ে জিগ্যেস করলো—'এ কি, টাকা কোথায় পেলে!'

হাজারি বললো—'ধার করেছি রে, লছমি।'

লছমি বললো—'শুধু শুধু ধার করা কেন?'

হাজারি ধমক দিয়ে বললো—'থাম্ তো তুই!' বলে কাপড়খানা নিয়ে সর্বাঙ্গে তার জড়িয়ে দিলো। লছমি আনন্দে আর কিছু বলতে পারলো না; সে শুধু স্বামীকে একটা গড় করলো।

দিন এমনি সুখে চলছিলো; কিন্তু এই চলার মধ্যে যে ধীরে-ধীরে একটা পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছে, তা লছমি টের পেয়েও যেন পেতে চাইলো না। সে যতই মনকে বোঝাক, সুরা-রাক্ষসী যে তার সতীনের মতো

সংসারে এসে প্রবেশ করেছে, সে-পরিচয় দিনে-দিনে বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগলো। সে শুধু যে অর্থের ওপর ভাগ বসালে তা নয়, একটু-একটু করে স্বামীর আদরের ওপরেও ভাগ বসাতে শুরু করলো।

তবে হাজারি মদই খাক আর যাই করুক, ঠিক সময়ে বাড়ি আসতে কোনদিন তার কসুর হতো না। সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যেবেলা লছমির জন্যে একটা আকুল তৃষিত দৃষ্টি নিয়ে সে ঘরে ফিরে আসতো। কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেখা গেল নির্দিষ্ট সময়ও উত্তীর্ণ হচ্ছে এবং চোখের সেই রঙেরও বদল শুরু হয়েছে।

লছমি যে এ-সব বুঝতো না তা নয়, এবং এর জন্যে তার মনে কষ্টও হতো; কিন্তু স্বামীকে সে-কথা সে কিছুতে জানতে দিতো না। পাছে জানতে পারলে স্বামী তার নিজের ঐ খুশিটুকু খরচ করতে দ্বিধা করে, এই ভয়ে হাসিমুখেই স্বামীর এই সব অবহেলা সে উপভোগ করতো; নিজেকে পুড়িয়ে সে স্বামীকে আলো দিতে চাইতো।

এমনি যখন অবস্থা, তখন পাড়ায় নতুন বাসিন্দা এলো ফুলিয়া – তার দুরন্ত দেহ এবং দুরন্ত যৌবন নিয়ে—নিঃসঙ্গ, একলা! সে ছিলো সুন্দরী—তাকে দেখবামাত্রই এ-কথা কি পুরুষ, কি নারী—সকলেরই মন আপনা হতেই বলে দেয়। ফুলের পাপড়ির মতো এই ফুলিয়া কোথাকার কোন্ ঝড়ে ছিটকে এই গরিব পঙ্কিল পল্লীর মধ্যে এসে পড়লো, তা কে জানে? কেনই বা এলো, সে রহস্য কে নির্ণয় করে?

ফুলিয়ার ঐ ফুলের মতন সুন্দর কোমল পেলব দেহ এ-পাড়ার পক্ষে একেবারে নতুন এবং সম্পূর্ণ বেমানান ছিলো, সেইজন্যে সকলকার দৃষ্টির আগে সে একটা আশ্চর্যতার দীপ্তি নিয়ে সর্বদা জাগ্রত হয়ে রইলো;—আর-সকলের সঙ্গে মিশে গিয়ে তার অস্তিত্ব খর্ব হয়ে হারিয়ে গেল না। এখানে যারা থাকে, হয় অনবরত দুঃখের নিষ্পেষণে তাদের অঙ্গ-সৌষ্ঠবের রেখা বক্র-কুৎসিত হয়ে গেছে, নয় ক্রমাগত পরিশ্রমে একান্ত কঠিন হয়ে উঠেছে। এদের মধ্যে ফুলিয়া যখন তার সেই শুভ্র চঞ্চল হাল্কা দেহখানা নিয়ে চলে-ফিরে বেড়াতো, তখন মনে হতো যেন সে বিচিত্র লীলায় উড়ে-উড়ে চলেছে। তার গলার স্বরের মধ্যে এমন একটা মোহিনী ছিলো যে, অনেক দূর থেকে

আওয়াজ এলেও কান আপনি সজাগ হয়ে উঠতো ; এবং কারণে-অকারণে যখন-তখন বিদ্যুৎ-লীলার মতো তার মুখে ফুটে উঠতো যে তরল হাসিটি, যা একবার দেখে আশ মেটে না, তা বারবার দেখবার পিপাসা নিবৃত্ত করা কঠিন হয়ে উঠেছিলো। মন-ভোলানিয়া ফুলিয়া পড়ার কড়ি-কোমল সব রকমের মনই ভুলিয়ে বেড়াতে লাগলো।

রূপ দুর্লভ, কাজেই রূপ মানুষের সম্ভ্রম দাবি করে। ফুলিয়া যদিও পাড়ার আর-পাঁচজনের মতো খুবই গরিব, তবু তাকে সকলে দেখতে লাগলো যেন রাজরানীর মতো। সে অতি সামান্য হলেও, তার চারদিকে এমন একটা দুর্লভতা তাকে বেষ্টন করে ছিলো যে, যে-কোনো পুরুষ তাকে খুব কাছে পাবার আশা করতে পারতো না। সেইজন্যে বিশেষ করে সে সকলেরই লোভনীয় হয়ে উঠেছিলো। সে যেদিন যাকে দয়া করে কাছে ডাকতো, মাত্র সে-ই কাছে আসতে পেতো ; তার সেই করুণায় সে কৃতার্থ বোধ করতো, বাকি লোক সেই সৌভাগ্যের ঈর্ষায় দগ্ধ হতো। এবং এই ঈর্ষার আগুনের আভায় ফুলিয়ার রূপের মোহ লোকের চোখে আরো মধুর, আরো দুর্দমনীয় হয়ে উঠতে লাগলো।

ফুলিয়া একপক্ষে যেমন দুর্লভ, অন্যদিকে তেমনি আবার সুলভও ছিলো। তাকে ধরবার কারো সাহস হতো না বটে, কিন্তু ফাঁদ পেতে সে ধরতে জানতো এবং যাকে খুশি তার ধরতে বাধতো না। কাজেই ধরা-দেবার আকাঙ্ক্ষা এবং ধরা-পড়বার আশা—এই দুই নেশায় পাড়ার বিবাহিত এবং অবিবাহিত দুই শ্রেণীর ছোকরাই টলমল করতে লাগলো। মেয়েরা ভীত হয়ে উঠলো—এ আবার কী আপদ!

ক্রমে ক্রমে দেখা গেল—আজ এ, কাল ও, ফুলিয়ার কবলে পড়তে আরম্ভ করেছে। প্রথমে অপ্রকাশ্যে, পরে প্রকাশ্যে এই নিয়ে পাড়ার মেয়ে-মহলে আলোচনা চলতে লাগলো ; ঘরে-ঘরে মান-অভিমান, কোঁদল ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগলো ; কিন্তু তাতে বিজয়িনী ফুলিয়ার বিজয়-নিশান এতটুকু হেঁট হলো না।

হাজারি কিন্তু এ-সব আপদের মধ্যে ছিলো না। মদ এবং লছমি তার হৃদয়কে এতটা বেশি অধিকার করে রেখেছিলো যে, ফুলিয়ার সেখানে

আমল পাওয়া শক্ত হয়ে উঠলো। ফুলিয়া আসে-যায়, হাসে, হাজারিকে বাঁকা-চোখে দেখে, কিন্তু তার নয়ন-শর তাকে বেঁধে না এবং তার ফাঁদও তাকে বাঁধে না। যে-পাখি সহজে ফাঁদে পড়ে না, তাকে ফাঁদে ফেলবার আগ্রহ শিকারীর ততো বেশি হয়। হাজারিকে ফুলিয়া অনায়াসে অগ্রাহ্য করতে পারতো—কারণ সে এমন কি মহামূল্য সামগ্রী! কিন্তু সে ধরা পড়লো না বলেই তাকে ধরবার আমোদ ফুলিয়ার কাছে দুর্দমনীয় হয়ে উঠলো। আর পাঁচজনের চেয়ে অনেকখানি বেশি মন তার দিকে আগ্রহ-ভরে ঝুঁকে পড়লো। এতে ফল হলো এই যে, পাড়ার সকলকারই দৃষ্টি এই দুটো শিকার-শিকারীর খেলার নানা ভঙ্গি ও বিচিত্র লীলার দিকে বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট হলো। লছমি একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো।

একদিন সন্ধ্যের পর হাজারি ঘরে ফিরছে—সেদিন তার নেশাটা বেশ একটু বেশি হয়েছিলো, একটা উদ্দাম ফুর্তি তার সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়ে উছ্‌লে পড়ছিলো, পৃথিবীটাকে তার ফুলের মতন নরম সুন্দর এবং জীবনটাকে খুব হাল্‌কা মেঘের মতো উড়ন্ত মনে হচ্ছিলো; থেকে-থেকে বোধ হচ্ছিলো, তার খুশির বাঁধ যেন ভেঙে পড়ছে—আজ যা-খুশি-তাই করা যায়! এমনি অবস্থায় সে বাড়ির দিকে ফিরছে; কিন্তু তার মনের মধ্যে তখন বাড়িও নেই, লছমিও নেই—এমন কি কিছুই নেই; আছে কেবল এমন একটা অনুভূতি—যাতে যা দেখে, যা শোনে, ভালো লাগে, তাই মনে হয় মধুময়! ঠিক এই সময় বস্তির মোড়ে সন্ধ্যে এবং নেশার আবছায়ায় ফুলিয়ার সঙ্গে হাজারির দেখা। আরো কতদিন এখানে, এই সময় ফুলিয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছে, কিন্তু সে দেখার সঙ্গে আজকের দেখার তুলনাই হয় না। আজ যেন এ সে জায়গা নয়, সে ফুলিয়া নয়, সে হাজারিও নয়। হাজারি আশ্চর্য, অবাক হয়ে নেশা-ভরা চোখে দেখতে লাগলো—ফুলিয়ার সেই রূপ! তার আঁট-সাঁট বাঁধা দেহের ভেতর থেকে উচ্ছ্বসিত-হিল্লোলিত যৌবন, হাওয়ার ওপর একটা লালসার মাদকতা ছড়িয়ে দিতে লাগলো—সে কী উগ্র, কী তীব্র! সে-নেশা হাজারির চোখে এসে লাগা-মাত্রই তার পিপাসা চতুর্গুণ বেড়ে উঠলো। হাজারির আজ খুশির মন—খুশির খেয়ালে সে আজ ভেসে চলেছে—কোথায় বাধা, কোথায় বন্ধ! সে ছুটে হাত বাড়িয়ে ফুলিয়াকে

ধরতে গেল—কিংবা ফুলিয়ার রূপ-যৌবনের দুরন্ত আবেগই হাজারির হাত দুটোকে নিজের দিকে টেনে আনতে গেলো। যাই হোক, হাজারি তার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু ফুলিয়া ধরা দিলো না;—সে নিজের শরীরটাকে ঢেউয়ের ছাঁদে বাঁকিয়ে, হাত দিয়ে হাজারির প্রসারিত হাতকে বাধা দিয়ে, ধরা দিতে-দিতে ধরা না দিয়ে, প্রায় বিদ্যুৎ-চমকের মতো সরে গেল। এ ফুলিয়ার পালানো নয়, এ নিজের দিকে আরো টেনে আনা, ধরা না-দিয়ে যে ধরতে আসছে তার ব্যাকুলতা বাড়িয়ে তোলা। এর মধ্যে নিবারণের চেয়ে আহ্বানই বেশি। বুঝতে হাজারির কিছুমাত্র বিলম্ব হলো না। সে উৎসাহে আবার এগিয়ে গেল। এবার ফুলিয়া ধরা দিলো বটে, কিন্তু সে এক নিমেষের জন্যে! কোমল দেহের নরম পরশটি মাত্র ছুঁইয়ে তার রেশটুকু রেখে সে আবার চকিতের মধ্যে সরে গেল। সেই ছোঁয়ার বিষ তখন-তখনি হাজারির দেহের শিরায়-শিরায় সঞ্চারিত হয়ে তাকে পাগল করে তুললো—সে দ্বিগুণ বেগে ফুলিয়াকে ধরতে গেল। সাপুড়ে যেমন বাঁশির সুরে সাপকে টেনে আনে, ফুলিয়া তেমনি করে হাজারিকে এঁকে-বেঁকে টেনে নিয়ে চলতে লাগলো। হাজারির খেয়াল ছিলো না, সে লোভের মোহে এগিয়ে এগিয়ে চলেছিলো, এবং হয়তো সে অনন্তকাল এমনি করে চলতে পারতো—কিন্তু হাজারির ঘরের সামনে আসতেই হঠাৎ বাধা পড়ে গেল। প্রতিদিন এইখানে এসে থামবার অভ্যাসেই হোক কিংবা দরজার সামনে লছমিকে দেখেই হোক, হাজারির গতি একেবারে রোধ হয়ে গেল—সে আর অগ্রসর হলো না, মুহূর্তের মধ্যে তার ফুলিয়ার নেশাও বোধহয় কেটে গেল, সে আস্তে আস্তে নিজের ঘরে ঢুকে পড়লো।

লছমি এতক্ষণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ফুলিয়া আর হাজারির এই লীলাখেলা দেখছিলো। রাক্ষসী যে তার স্বামীকে গ্রাস করবার চেষ্টায় আছে—এ-কথা সে আগেই জানতো, কিন্তু স্বামী যে তার গ্রাসের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করতে যাবে, এ সন্দেহ তার কখনো হয়নি। কারণ স্বামী তাকে এমন ভালো-বাসতো যে, তাতে বিশ্বাস আপনিই হয়। আজ সেই সহজ বিশ্বাসের মূল শিথিল হয়ে যাওয়াতে লছমির সমস্ত বুকের ভেতরটা কেমন আল্‌গা হয়ে গেল—মনে হলো, তার সমস্ত জীবনটা যেন চোখের সামনে ধ্বসে পড়ে

যাচ্ছে। স্বামীর ওপর রাগ হলো না—শয়তানী ফুলিয়ার ওপর একটা আক্রোশে তার সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগলো।

লছমি অতি সহজে মদের হাতে স্বামীকে ছেড়ে দিয়েছিলো—নিজের সমস্ত স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়েও শুধু স্বামীর তৃপ্তির জন্যে; কিন্তু ফুলিয়ার বেলায় সে তা পারলো না। তার নারীচিত্ত ভীষণ বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। হাজারির কাছে সে অনেক ঋণে ঋণী। তার গরিব বাপ-মা তাকে নিঃসহায় রেখে যখন প্রায় একই সঙ্গে মারা যায়, সে সময় হাজারি যদি তাকে বিবাহ করে আশ্রয় না দিতো, তাহলে তার অবস্থা পথের ভিখারির চেয়ে দীন-হীন হতো, সে সময়ে হাজারি নিজে না খেয়ে তাকে খাইয়েছে, নিজের ছোট্ট শোবার জায়গাটি লছমির জন্যে ছেড়ে দিয়ে, নিজে সারারাত বসে ঘুমিয়েছে। লছমি সে-কথা ভোলেনি। স্বামী তার জন্যে অনেক সয়েছে, সেইজন্যে সে যখন মদে মত্ত হলো, তখন তাতে সর্বনাশ আছে জেনেও লছমি খুশি-মনে তাকে সমর্থন করেছিলো। কিন্তু ফুলিয়ার বেলায় এ-সব কোনো যুক্তি, কোনো তর্ক আমল পেলো না। স্বামীর জন্যে তার মরতেও দুঃখ ছিলো না, কিন্তু ফুলিয়াকে সে স্বামী দিতে পারবে না কিছুতেই! এ-কথা কোনো যুক্তি-তর্কের কথা নয়—এ-কথা তার সর্ব দেহ-মন থেকে কান্নার মতো উৎসারিত হয়ে উঠতে লাগলো। ফুলিয়া সারা অঙ্গে এই ক্রন্দন বহন করে সে-রাত্রে স্বামীর ঘরে এসে হাজির হলো।

হাজারি এ ব্যাপারে লজ্জিত হয়েছিলো, অনুতপ্তও হয়েছিলো। কেমন করে এ ঘটনা ঘটলো, নিজেই আশ্চর্য হচ্ছিলো। সে তো ভালো রকমই জানে, ফুলিয়ার দিকে তার কোনো টানই নেই—কেন এমন হলো? সে কি মায়াবিনী? মায়ায় ভুলিয়ে তাকে বশ করে নিয়ে যাচ্ছিলো? নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু এ-কথা সে লছমিকে কোন্ সুযোগে বোঝাবে, সে ভেবে ঠিক করতে পারলো না।

লছমির দিকে চোখ তুলে চাইতেই তার সঙ্কোচ হতে লাগলো, কথা কওয়া তো দূরের কথা। লছমিও স্বামীর সঙ্গে কোনো কথা কইলো না—অভিমানে তার বাক্য হারিয়ে গিয়েছিলো! এমনি করে রাত কাটলো, স্বামী-স্ত্রীতে কোনো বোঝাপড়ার অবকাশ হলো না।

পরদিন সকালে যে কাণ্ড ঘটে, তার বিবরণ এই গল্পের প্রথমেই বলা হয়েছে। লছমি আর ফুলিয়া গিয়েছিলো জল আনতে কলতলায়, ফুলিয়ার ওপর লছমির কালকের সেই আক্রোশটা তখনো কিছুমাত্র শান্ত হয়নি; বরং সারারাত্রের অনিদ্রায় এবং রাগের উত্তপ্ততায় জীর্ণ স্নায়ু-জাল ভেদ করে সেই আক্রোশ কামানের গোলার মতো ফেটে ছড়িয়ে পড়বার জন্যে উন্মুখ হয়ে ছিলো। এ সময়ে ফুলিয়ার সঙ্গে তার দেখা, বারুদের ওপর আগুন পড়ার মতো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো।

ফুলিয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লছমিকে ভালো করে দেখছিলো। সে অনেকবার তাকে দেখেছে, তবু দেখছিলো। দেখছিলো—এই লছমি, এর মধ্যে এমন কি আছে, যার জন্যে ওর কাছে আমায় নতশিরে পরাজয় মানতে হলো! সে যতই দেখছিলো, ততই আশ্চর্য হচ্ছিলো—কই, কিছুই তো নেই, তবে কেন? কেন? অতি-যে-সামান্য, তার কাছে পরাভবের লজ্জায় ফুলিয়ার মনে ধিক্কার আসতে লাগলো; দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তার মনে হতে লাগলো—যে চিরদিনের ভিখারিণী, সে আজ বিজয়িনী লছমি! তার পায়ের তলায় সে যেন আজ ক্রীতদাসী! লজ্জায়, ক্ষোভে তার শরীর জ্বলতে লাগলো। লছমির দৃষ্টি, তার নীরবতা, তার কাছে তাচ্ছিল্য বলেই মনে হতে লাগলো। সে ফুলে-ফুলে উঠতে লাগলো।… তারপর কোথা থেকে একটা স্ফুলিঙ্গ এসে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দিলো।

সে-সময় কলতলায় আরো অনেক মেয়ে ছিলো, তারা ইচ্ছা করলে অনায়াসে এই কলহে বাধা দিতে পারতো—তাহলে ব্যাপার এতদূর গড়াতো না; কিন্তু তাদের মনের মধ্যেও ফুলিয়ার ওপর যে রাগ সঞ্চিত ছিলো, তার শোধ লছমিকে দিয়েই মিটিয়ে নেবার এই সুযোগ তারা অবহেলা করতে পারলো না। লছমি ছিলো জোয়ান, ফুলিয়া পল্‌কা—কাজেই ফুলিয়ার নির্যাতন যে রীতিমতই হবে, তাতে তাদের সন্দেহ ছিলো না এবং তারই আমোদে তারা লছমিকে আরো উস্কে দিতে লাগলো।

লছমি শান্ত মেয়ে, কখনো সে কারো সঙ্গে ঝগড়া করে না, হঠাৎ সে এতটা রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করবে তা বোঝা যায়নি, শেষে তার হাতের আঘাতে ফুলিয়া যখন রক্তাক্ত দেহে মাটিতে মূর্ছিত হয়ে পড়লো, তখন মেয়েরা

সকলে বিশেষ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। লছমিরও যেন চট্‌কা ভেঙে গেল—ভেতরে-ভেতরে সে কাঁপতে লাগলো।

হাজারি সন্ধ্যের পর কাজ থেকে ফিরে লছমিকে না দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। প্রতিবেশির মুখে যখন সব ব্যাপার শুনলো, এবং শুনলো যে, লছমিকে পুলিশে নিয়ে গেছে, তখন লজ্জায়-ঘৃণায়-চিন্তায় সে একেবারে অবসন্ন হয়ে মাটিতে বসে পড়লো। কি করবে অনেকক্ষণ ঠিক করতে পারলো না। ক্রমেই তার মন আরো দমে যেতে লাগলো—এ পৃথিবী, এ জীবন, এ ঘর-দুয়ার, লছমি, লছমির ভালোবাসা—সবই অত্যন্ত বিস্বাদ বোধ হতে লাগলো। সে খুবই মদ খেয়ে এসেছিলো, ছুটে গিয়ে আর-এক বোতল মদ নিয়ে এলো। ঘন-ঘন মদ ঢালতে লাগলো। খেতে-খেতে লছমির ওপর ভারী রাগ হলো—সে পোড়ারমুখী এমন কাণ্ড কেন করলো! তারপরেই মনে হলো—আহা, কাল রাত্রে সে লছমির সঙ্গে কথা কয়নি! ভেতর থেকে একটা গোমরানো কান্নার ঝোঁকে তার ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগলো। কিন্তু তারপরেই আরেক ঢোঁক মুখে ঢেলে সে ফুৎকার দিয়ে বলে উঠলো—যাক্ গে! মরুকগে সে! তারপর হঠাৎ ফুলিয়ার কথা মনে এসে পড়লো—সে শুনেছিলো, ফুলিয়ার কপালে চোট খুব বেশিই লেগেছে। ফুলিয়ার জন্যে তার দুঃখ হতে লাগলো—আহা বেচারা! সে হয়তো একলা পড়ে আছে—কেউ তাকে দেখবারও নেই।

সে টলতে-টলতে ফুলিয়াকে দেখতে চললো, মদের বোতলটা হাতে নিয়ে। তার দরজা ঠেলে হাজারি যখন ঘরে ঢুকলো, তখন ফুলিয়া অর্ধনগ্ন অবস্থায় একা শুয়ে আছে। সে হাজারিকে দেখে আশ্চর্যে চমকে উঠলো বটে, কিন্তু কোনো আওয়াজ দিলো না; একটু নড়লও না, গায়ের কাপড়ও টেনে দিলো না। যেমন ছিলো, তেমনি পড়ে রইলো—চোখ বুজে। হাজারি পা টিপে-টিপে অতি সন্তর্পণে তার শিয়রে গিয়ে বসলো।

হাজারিকে নিজের ঘরে বিনা আহ্বানে আসতে দেখে ফুলিয়া মনে-মনে খুশি হলো। লছমির হাতে অপমানের গ্লানি তার মন থেকে মুহূর্তের মধ্যে মুছে গেল। তার মন বলে উঠলো—সে-ই বিজয়িনী। ছার লছমি! তুচ্ছ লছমি। লছমির প্রতি এখন আর হিংসা নয়—একটা করুণা সে

অনুভব করতে লাগলো। তার কপালে যে আঘাতের বেদনা ছিলো, তার অর্ধেক এতেই জুড়িয়ে গেল। বিজয়-গর্বের উচ্চাসনে বসে লছমিকে সে মনে-মনে ক্ষমা করলে, কিন্তু শাস্তি দিলো হাজারিকে। কাল তার আহ্বান অপমান করে যে ত্রুটি করেছে, তার শাস্তিভোগ শেষ হলে, তবে সে তাকে গ্রহণ করবে—মনে-মনে এই স্থির করে সে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইলো; হাজারির দিকে ফিরেও চাইলো না। যে-পাখি ফাঁদে পা দিয়েছে, তাকে আর তখন ভোলাবার প্রয়োজন কি? সে তো বন্দী, তখন তাকে মারা, রাখা শিকারীর খুশি। দুষ্টু পশুকে বশ মানাতে হলে তাকে আহার না দিয়ে মানুষ যেমন জব্দ করে, হাজারিকে তেমনি তার হৃদয়ের কোনো খোরাক না দিয়ে ফুলিয়া তাকে জব্দ করতে লাগলো। সে তাকে তাড়িয়েও দিলো না, গ্রহণও করলো না—তাকে অবহেলা করে শুয়ে রইলো।

ফুলিয়ার এই ভাবগতিক দেখে হাজারি অতো নেশার মধ্যেও একটু থতমত খেয়ে গেল। সে বসবে, কি চলে যাবে—কিছুই ঠিক করতে পারলো না। যতই সময় যেতে লাগলো, চলে যাওয়া তার পক্ষে শক্ত হয়ে উঠলো।—নির্জন ঘরে সুন্দরী ফুলিয়ার সেই যৌবন উচ্ছ্বসিত অর্ধনগ্ন দেহের একটা প্রচ্ছন্ন আহ্বান তাকে অন্তরে-অন্তরে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো। আর চুপ করে থাকতে না পেরে হাজারি ধীরে-ধীরে ডাকলো—'ফুলিয়া!'

নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে কানের পাশে কাঁপা কণ্ঠের আবেগভরা এই ডাকটা ফুলিয়ার কানে ভারী মিষ্টি লাগলো। এই ডাকের সুরে তার সেই উদ্দাম চঞ্চল যৌবনের যেন ঘুম আসতে লাগলো। মনে হলো, এ ডাক যার, সে যেন অনেক দূরের—সে যেন দুর্লভ।

কোনো জবাব না পেয়ে হাজারির মনে হলো, ফুলিয়া রাগ করেছে। সে আর কিছু উপায় না পেয়ে, ফুলিয়ার কপালের ওপর যেখানে পটি বাঁধা ছিলো, ধীরে ধীরে সেখানটা স্পর্শ করলো—অনেকক্ষণ হাতটা সেখানে রেখে দিলো। ফুলিয়া তবু কোনো সাড়া দিলো না।

হাজারি হতাশ হয়ে উঠে দাঁড়ালো। আজ তার কোথাও শান্তি নেই—ঘরে নেই, বাইরে নেই। আজ তার গৃহও নেই, গৃহিণীও নেই—কেউ নেই! সমস্ত জগৎ-সংসার তার মরুভূমি! সে পাশ থেকে বোতলটা

একটানে তুলে নিয়ে এক গ্রাসে বাকি মদটা নিঃশেষে গিলে ফেললো। তারপর অল্পক্ষণ পরেই একেবারে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো।

ফুলিয়া এতক্ষণ চোখ বুজে চুপ করে শুয়েছিলো, হাজারির পড়ে যাওয়ার শব্দে সে ধড়মড় করে উঠে বসলো। হাজারি পড়েছিলো মুখ-গুঁজড়ে। 'আহা বেচারা!'—বলে তাড়াতাড়ি উঠে ফুলিয়া ধীরে-ধীরে অতি সন্তর্পণে হাজারিকে সোজা করে শুইয়ে দিলো! তারপর তার দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলো। ফুলিয়া দেখতে লাগলো হাজারির সেই মূর্ছিত তরুণ মুখের ওপরে একটি দুঃখের অতি করুণ নিবিড় ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে। দেখতে-দেখতে তারও মন কেমন একটা দুঃখে গলতে থাকলো; তার অনুতাপ হতে লাগলো—হাজারিকে সে যে নিষ্ঠুরের মতো শাস্তি দিয়েছে, তার জন্যে।

হাজারি একেবারে অঘোরে-অচৈতন্যে পড়েছিলো—তার কপালে-মুখে ঘামের সঙ্গে মেঝের ধূলো লেপ্‌টে গিয়েছিলো; ফুলিয়া নিজের আঁচল দিয়ে অতি যত্নে তাই মুছিয়ে দিতে লাগলো। আহা, আজ যত্ন করবার ওর কেউ নেই—এই কথাটা যতই মনে পড়ে, ততই হাজারির প্রতি একটা মমতায় তার সমস্ত চিত্ত অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। আজ কোথা থেকে যেন একটা করুণার বন্যা তার হৃদয়ে প্লাবন এনে দিলো, এই প্লাবনের স্রোতে সে যে কোথায় ভেসে চলেছে, তা সে নিজে ঠাহর করতে পারলো না। মন-ভোলানিয়া ফুলিয়া আজ যে কিসের মোহে ভুললো, তা সে জানলো না। ফাঁদ পাতা যার ব্যবসা, ফাঁদে ফেলবার অতিমাত্র ব্যাকুলতায় সে নিজেই আজ ফাঁদে পড়ে গেল!

ফুলিয়া প্রায় সারারাত হাজারির শিয়রে জেগে বসে রইলো!

হাজারি যখন জেগে উঠলো, তখন ফুলিয়া রান্নাঘরে; সে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে ফুলিয়া তাড়াতাড়ি এসে বললো—'তোমার জন্যে রান্না করেছি। এইখানেই আজ খেয়ে কাজে যেয়ো—বুঝলে!'

হাজারির মাথাটা নেশার তলানিতে তখনো ভার হয়ে আছে, ভালো পরিষ্কার হয়নি। সে ফ্যালফ্যাল করে একবার ফুলিয়ার দিকে চেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নিজের ঘরে ঢুকে হাজারির বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। ঘরে সব আছে, কেবল লছমিই নেই। তবু তার মনে হলো, এতবড়ো শূন্যতা সে জীবনে কখনো দেখেনি! সে সেখানে তিষ্ঠোতে পারলো না—কোনো রকমে একখানা কাপড় আর গামছা নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে, কলতলায় দাঁড়িয়ে কি খানিকটা ভাবলো, তারপর ফুলিয়ার ঘরে গিয়ে খেতে বসলো।

পরের জন্যে সেধে দুঃখ নেওয়া ফুলিয়ার জীবনে এই প্রথম। এর মধ্যে যে এতো সুখ, তা কে জানতো! প্রতিদিন সে নিজের জন্যে রান্না করে—তাতে কেবল বিরক্তিই সে পায়, নিজের ভাগ্যকে মনে-মনে অভিসম্পাত দেয়, কিন্তু আজকের রান্নায় কোথা থেকে এলো এ আনন্দ—এ বিপুল আনন্দ, যার হিল্লোলে সারা অঙ্গ তার নৃত্য করে উঠছে! এ অমৃতের স্বাদ সে জীবনে তো কখনো পায়নি! সে সামনে বসে অতি যত্নের সঙ্গে হাজারিকে খাওয়াতে লগেলো; তারপর হাজারি যখন কাজে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো, ফুলিয়া তাকে রাত্রে খাবার নিমন্ত্রণটাও জানিয়ে দিলো—ভারী একটা ব্যগ্র আর মিষ্টি মিনতির সুরে!

স্নান-আহারের পর হাজারির নেশার আচ্ছন্নতা কেটে গিয়ে মাথা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছিলো—কাল সন্ধ্যে থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত সে যেন একটা অবল্যের মধ্যে ছিলো। লছমির কথা অনেকবার মনে হয়েছে বটে, কিন্তু এই বিপদে কি করা উচিত সে বিচার করবার মতো মনের অবস্থা কাল তার ছিলো না। নেশার ঝোঁকে এবং লছমির ওপরে রাগে তার মনে হয়েছিলো—লছমিটা চিরজন্মের মতই গেছে! পুলিশের হাত থেকে সে যে ছাড়া পেতে পারে এবং তাকে যে ছাড়িয়ে আনা যেতে পারে—এ কথাটা তার মনে আসেনি। এখন সেটা মনে পড়ে তার দুর্ভাবনা হতে লাগলো। কি করা যায়? ভাবতে ভাবতে অদূরে কারখানার কারিগরদের আহ্বানের বাঁশি বেজে উঠলো। অভ্যাসের বশে হাজারি কারখানার দিকে এগিয়ে চললো। ভাবলো, ইয়ারদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা কিছু ঠিক করবে। কারখানার কাজ ঘড়ির কাঁটার মতো অতি সূক্ষ্ম নিয়মে চলে—কোথাও তার ব্যতিক্রম নেই। হাজারি ফটক পার হয়ে

যেমন তার গহ্বরে প্রবেশ করলো, সর্দার এসে তাকে কাজের ঘানিতে জুতে দিলো—তারপর সে জোয়াল খুলে বেরিয়ে আসে কার সাধ্য ! হাজারির হাত দুটো কাজের কারখানায় কলের মতো চলতে লাগলো বটে, কিন্তু থেকে-থেকে লছমির মুখটা মনে পড়ে তাকে ভারী চঞ্চল করে তুলতে লাগলো। সে আর থাকতে না পেরে সর্দারের কাছে গিয়ে ছুটি চাইলো। কিন্তু ছুটি কোথায়? কারণ কাজ বেশি, লোক কম। কাজেরই সেখানে বেশি প্রয়োজন, লছমিকে হাজারির যে প্রয়োজন—তার দিকে দৃষ্টি দেবার কোনো অবসর কারখানার নেই—কাজেই, কাজের কারাগারে হাজারিকে সমস্ত দিন বন্দী হয়ে থাকতে হলো।

বিকেলে ছুটি পেয়েই সে একেবারে ছুট দিলো মদের দোকানে। আজ সে যতটা মদের প্রয়োজন অনুভব করছিলো, এমন আর কখনো করেনি। দুটো দিন, একটা রাত কেটে গেল, তবুও সে লছমির সন্ধান করেনি—এর জন্যে এখন তার ভাবনার চেয়ে লজ্জাটা বেশি হতে লাগলো, এবং নিজেকে অতি হীন, কাপুরুষ মনে হতে লাগলো। এই ঘৃণা, লজ্জা চাপা দেবার জন্যে সে মদের পর মদ ঢালতে শুরু করলো। দু'চার পাত্র পেটে পড়বার পর, তার কোথায় রইলো লজ্জা, কোথায় ভয়—কোথায় লছমি! তখন সারা জগতের মধ্যে জাগ্রত রইলো কেবল সুরার সুরভি !

সেদিন যখন হাজারি বাড়ি ফিরছে, তখন অন্যদিনের চেয়ে রাত একটু বেশি হয়েছে। সে মদের খেয়ালে আপন-আনন্দে ভরপুর হয়ে চলেছিলো —রাস্তার মোড়ের কাছে আসতেই হঠাৎ তার বুকের ওপর যেন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা এসে লাগলো।—সে কোথায় চলেছে? হঠাৎ মনে পড়লো, তার ঘর —তার সেই ভয়ঙ্কর শূন্যতা ভরা ঘর! তার সমস্ত নেশাটা একবার মুহূর্তের জন্যে যেন ঝট্ করে কেটে গেল। যে পথ দিয়ে সে আসছিলো সেই পথে সে ফিরে দাঁড়ালো। কিন্তু কোথায় যাবে? ঠিক এমনি সময় মনে পড়লো ফুলিয়াকে—সেই লীলাময়ী সুন্দরী ফুলিয়াকে—আজ সকালে তার আদর, তার যত্ন, তার নিমন্ত্রণ, আর তার সেই হাসিটি! হাজারি নতুন উৎসাহে আবার এগিয়ে চললো—কিন্তু নিজের ঘরের দিক থেকে মুখটা যথাসম্ভব ফিরিয়ে রেখে। সেদিকে চাইতেও তার বুকটা যেন শুকিয়ে আসছিলো!

নিজের ঘর বরাবর এসে সে পায়ের গতি বেশ একটু বাড়িয়ে দিলো—যতো শিগগির সেখানটা পার হওয়া যায়! বাড়ি ছাড়িয়ে মাত্র একটা পা তুলেছে, এমন সময় হঠাৎ হাজারি চমকে উঠলো কার গলার কঠিন তীব্র তিরস্কারে—'কোথা যাস্।'

হাজারি ফিরে দেখলো দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে লছমি। মুহূর্তের মধ্যে তার ফুলিয়ার স্বপ্ন ভেঙে ঝরে পড়ে গেল। সে বিপুল আনন্দে ছুটে গিয়ে একেবারে লছমির বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আনন্দের আবেগে তাকে এমন আদর করতে লাগলো যে, লছমির এই দু'দিনের সমস্ত রাগ অভিমান তার মধ্যে কোথায় তলিয়ে গেল। সেই আদরে লছমির বুকটা যেন আশ্বস্ত হলো—তার স্বামী তারই আপনার জিনিস! সে হাজারির হাত ধরে ঘরে ঢুকলো।

লছমি আজ দুপুরেই পুলিশ থেকে ছাড়া পেয়েছিলো। তার খুঁটিনাটি আমূল বৃত্তান্তে আমাদের কোনো দরকার নেই।...

ফুলিয়া জানতো না যে, লছমি ফিরে এসেছে। সে আজ সমস্ত দিন ঘর থেকে বেরোয়নি—আজ তার ঘরের কাজ যেন অতিরিক্ত রকমের বেড়ে গিয়েছিলো। ঘরে সাজাবার বিশেষ কিছু নেই, তবু ঘরটাকে সাজাবার জন্যে সে যে কতবার ওলোট-পালোট করতে লাগলো, তার ঠিক নেই—একই জিনিস পাঁচবার ঘুরিয়ে পাঁচ জায়গায় বসাতে লাগলো। সে জীবনে কস্মিনকালে গোছালো ছিলো না—জিনিসপত্তর তার এদিক-ওদিক ছড়ানো থাকতো; আজ বসে-বসে সেগুলোকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে গুছিয়ে রাখলো। ঘর-দুয়ার ঘষে-ঘষে তক্‌তকে পরিষ্কার করলো, বিছানাটাকে পরিপাটি করে বিছিয়ে দিলো। তারপর রাঁধতে গেল! এইতেই সমস্ত দিনটা তার কেটে গেল। তারপর সন্ধ্যের সময় স্নান করে একখানা ধোয়া পরিষ্কার শাড়ি পরলো, গায়ে একটি রঙিন কাঁচলি দিলো, আর কপালে দিলো সিঁদুরের টিপ। অন্যদিন তার সাজ করতে কতো সময় যায়, কিছুতে মনের মতন হয় না! আজ একটুতেই তার যথেষ্ট বোধ হলো, আয়নায় নিজের মুখটা

দেখে তার মন খুশি হয়ে উঠলো। আজ যেন তার খুশির দিন—কোথাও খুশির অভাব নেই।

সাজ শেষে ফুলিয়া একবার বাইরে এসে দাঁড়ালো, আকাশের দিকে চেয়ে বুঝলো, হাজারির আসবার সময় হয়েছে। সে ঘরে গিয়ে বসলো—হাজারি কতক্ষণে আসবে, তারই প্রতীক্ষা করতে লাগলো! বসে-বসে সময় কাটাতে লাগলো—তার মধ্যে কতো চিন্তার স্রোত বয়ে গেল; কিন্তু এ-কথা একবারও মনে এলো না যে, যে-অভিসারের যাত্রা-পথে এসে সে আজ দাঁড়িয়েছে, তার গতি কোন্ নিরুদ্দেশের দিকে! ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ বোধ হলো অনেকটা সময় কেটে গেছে; সে তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে আকাশের দিকে দেখলো—রাত অনেকটা এগিয়েছে। হাজারি এখনো এলো না বলে তার মনটা যেন কেমন নিভে আসতে লাগলো। তবু সে মনটাকে জাগিয়ে নিয়ে আবার ঘরে গিয়ে বসলো। খানিক বাদে আবার বাইরে এসে দাঁড়ালো। পাশ দিয়ে একটা ছোকরা তার দিকে কটাক্ষ করে শিস দিতে-দিতে চলে গেল, ফুলিয়া তার দিকে ভ্রূক্ষেপও করলো না। আপন মনে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো।

আরো অনেকক্ষণ সময় গেল, রাত অনেক হলো, অনেকবার ফুলিয়া ঘর-বার করলো, তবু হাজারি এলো না। সে আজ অনেকখানি আশা নিয়ে হাজারির প্রতীক্ষায় বসেছিলো—সে আশা ভেঙে দিয়ে হাজারি এলো না। ফুলিয়ার বুক ফেটে কান্না আসতে লাগলো। কে যেন তার বুকের ভেতর থেকে বলতে লাগলো, আজ তার সব ব্যর্থ হলো—এতো যত্ন করে যে রান্না, তা ব্যর্থ, এতো কষ্ট করে যে ঘর সাজানো, তা ব্যর্থ, নিজের সাজসজ্জা সব ব্যর্থ! এমন কি মনে হতে লাগলো, তার জীবন-যৌবন সর্বস্ব এক নিমেষে ব্যর্থ হয়ে গেল! তার আর কিছু রইলো না। ফুলিয়া একলা ঘরে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। যতই কান্না বাড়ে, ততই মনে হয়—হাজারিকে তার চাই—হাজারিকে সে কিছুতেই ছাড়তে পারবে না। চোখের জল মুছে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

হাজারির ঘরের দরজা তখন বন্ধ ছিলো।—সেই বন্ধ দরজার গায়ে এসে ফুলিয়া হাঁপাতে-হাঁপাতে দাঁড়ালো। ভেতর থেকে লছমি আর হাজারির

কথার গুঞ্জন তার কানে এসে লাগতে লাগলো। ফুলিয়া তখন টের পেলো লছমি ফিরে এসেছে; এতক্ষণে সে বুঝতে পারলো, হাজারি কেন তার ঘরে যায়নি। হাজারি যদি নিজের খুশিতে তার কাছে না যেতো, তাহলেও তার কষ্ট হতো বটে, কিন্তু এতটা লাগতো না। লছমির জন্যে যে সে তাকে অবহেলা করলো, এতে তার সমস্ত বুকটা আর একটা বিষয় ব্যথায় টনটন করতে লাগলো—তার কপালের সেই কাটা জায়গাটা ঝন্ঝনিয়ে উঠলো। তার সারা দেহের ভেতরে যেন একটা প্রকাণ্ড ঝড় বইতে লাগলো। সমস্ত হৃদয়-মন আরো জোরে চিৎকার করে বলে উঠলো—হাজারিকে চাই—চাই! তারই তাড়নায় তার হাত দুটো কাঁপতে-কাঁপতে বন্ধ দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিয়ে দাবি জানালো—হাজারিকে চাই—চাই!

রুদ্ধ কঠিন দুয়ার একবার কেঁপে খট্খট্ করে উঠলো।

ভেতর থেকে লছমি হাজারিকে বললো, 'ওগো, দেখো তো—মনে হচ্ছে কে দরজা ঠেলছে!'

হাজারি বোধহয় তখন লছমিকে তার হৃদয়ের কোনো প্রিয় কথাটি শোনাচ্ছিলো। এ বাধা তার ভালো লাগলো না, সেদিকে এতটুকু মন না দিয়ে সে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো—'ও কেউ নয়! তুই শোন্।'

ফুলিয়া একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল—ও কেউ নয়! ফুলিয়া বেশ স্পষ্ট শুনলো, হাজারি বললো—ও কেউ নয়! তার ব্যাকুল হৃদয়ের সমস্ত আহ্বান অগ্রাহ্য করে, তার সমস্ত অস্তিত্ব তাচ্ছিল্য করে, সে শুনলো, হাজারি বললে—ও কেউ নয়!

ফুলিয়ার ভেতরে ঘুরে ঘুরে এতক্ষণ যে ঝড় বইছিলো, তা একেবারে এক দমকে ঝট্ করে থেমে গেল—তার সমস্ত দেহ-মন পাথরের মতন নিস্পন্দ হয়ে গেল। ফুলিয়া অচল মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

কেউ নয়। সত্যিই তো, সে কেউ নয়! ফুলিয়ার মন ছিন্নকণ্ঠ পাখির মতো অন্তিম যাতনায় কাঁপতে-কাঁপতে বলতে লাগলো—সত্যিই তো, সে কেউ নয়। সে হাজারির কেউ নয়, লছমির কেউ নয়, এ পল্লীর কেউ নয়—এ সংসারের কেউ নয়! এতদিন জানতো—সে অনেক মনের মালিক—সেটা ভুল, সেটা ভ্রান্তি! সে কারো নয়, কেউ নয়!...

হাজারির আস্তানা ছেড়ে ফুলিয়া আস্তে-আস্তে ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালো। সে চারদিকে চেয়ে দেখলো—আশপাশের কোনো জায়গা থেকে কেউ তাকে কোনো কিছু মমতা দেখালো না। পল্লীর মাটি, ঘর-দুয়ার, গাছপালা, পাখি-পাখালি কেউ কিছু শুধোলে না, কেউ বললো না—ফুলিয়া, তুই আমার! ওপর দিকে চেয়ে দেখলো অসংখ্য নক্ষত্রভরা আকাশ—সেই নক্ষত্রপুঞ্জের কারো কাছ থেকে এতটুকু মমতা এলো না। ··ফুলিয়া একটি বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাসে আকাশের সমস্ত আলো, পৃথিবীর সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে ধীরে-ধীরে পল্লী-পথ ছেড়ে নিজের হাতে জ্বালা সেই ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যে অভিসার করলো।—সে যে কোথায় গেল, কে জানে?—কেউ কোনো খবরও নিলো না ফুলিয়ার!

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

শিউলি

হেমেন্দ্রকুমার রায়

পৃথিবীতে দুইদল বড়ো মানুষের নাম শোনা যায়। 'অমুক' চার পয়সার সম্বল হইতে লক্ষপতি হইয়াছেন, আর 'অমুক' বিড়ালের বিবাহে লক্ষটাকা খরচ করিয়াছিলেন।

বিলাসচন্দ্র দ্বিতীয় শ্রেণীর 'অমুকের' দলে। এবারে পশ্চিমে যাইবার সময়ে শিউলিকে সে সঙ্গে লইয়া গেল।

তীর্থে-তীর্থে ঠাকুর দেখিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা, ভালো-মন্দ সকল নারীর মধ্যেই প্রবল থাকে। পতিতা হইলেও কাশীধামে আসিয়া শিউলির প্রাণ আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিলো। তাহার মনে হইতে লাগিলো, নরক ছাড়িয়া আজ যেন সে সশরীরে স্বর্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

পবিত্র পট্টবস্ত্র পরিয়া সে গঙ্গাস্নানের জন্য বাহির হইলো। শিউলির আগ্রহ বেশি, সে আগে-আগে যাইতে লাগিলো, পিছনে বিলাসচন্দ্র। শিউলির অঙ্গের অলঙ্কার পুষ্পিত যৌবনের চঞ্চল রাগিণীর মতো বড়ো মধুর-মধুর বাহিতেছে। তাহার লঘু গমনভঙ্গী দেখিলে মনে হয়, যেন প্রথম বসন্তের মলয় সমীর আজ এখানে মূর্তি ধরিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে! শিউলির চরণ-তলে বিলাসচন্দ্রের প্রাণ উঠিতে ও নামিতে লাগিলো।

রাস্তার লোকে মোহিত হইয়া শিউলির দিকে তাকাইয়া রহিলো। কেহ-কেহ চোখ নাড়িয়া ইঙ্গিত করিতেও ছাড়িলো না। এ রকম ইঙ্গিত শিউলি আগেও অনেকবার দেখিয়াছে; কিন্তু আজ, এখানে সে ইহার প্রত্যাশা করে নাই; আজ সে চলিয়াছে বিশ্বদেবতার দুয়ারে, নতশিরে, পূজারিণীর বেশে; কাহারও চিত্ত তৃষিত করিবার জন্য সে তো কোনো রকম হাব-ভাবের শরণ লয় নাই!

রাজপথ দিয়া আরো কতো রূপসী কুলকামিনী চলিয়াছেন; এ হতভাগ্যরা তাহাদের দিকে চাহিয়া এমন ইঙ্গিত করিতে ভরসা পাইতেছে না! তবে? বিধাতা তাহার মুখে এমন কি ভয়ানক অভিশাপের ছাপ মারিয়া দিয়াছেন যে, সে লুকাইতে গেলেও ধরা পড়িয়া যায়! শিউলির গতি সঙ্কুচিত হইয়া আসিলো। একবার পিছনপানে চাহিয়া দেখিলো, বিলাসচন্দ্র আসিতেছে কিনা। দেখিলো বিলাসচন্দ্র দেমাকে ডগমগ হইয়া রাস্তার সেই অসভ্য লোকগুলির দিকে চাহিয়া মৃদু-মৃদু হাসিতেছে। শিউলি সে হাসির মর্ম বুঝিলো। সে হাসি যেন সকলকে বলিতে চায়, 'হুঁ-হুঁ; দেখো বাবা, দেখো কি দুর্লভ রত্নের মালিক আমি, দেখো!'

অত্যন্ত আহত হইয়া শিউলি আপন মুখের ঘোমটা টানিয়া দিলো।

গঙ্গাজলে ডুব দিয়া শিউলির মনে হইলো, তাহার সারাজীবনের যাবতীয় ময়লা মাটি একেবারে ধুইয়া মুছিয়া গেল। সাদা জলে একটি গোলাপী পদ্মের মতো শিউলি অনেকক্ষণ আনমনে বসিয়া রহিলো। ছোটো-ছোটো ঢেউ আসিয়া তাহার কটিতটে চুম্বন করিয়া মধুর কলহাস্যে উছলিয়া-উছলিয়া উঠিতে লাগিলো।

ওপারের ঐ ধবল বালুতটে, যেখানে দীপ্ত নীলিমার তলায় ভোরের রৌদ্র ঝিকঝিকে সোনার ফুল ফুটাইতেছে, শিউলির চোখ যেন সেখান হইতে কিছুতেই ফিরিতে চাহিতেছিলো না।

শিউলির মনে হইতেছিলো, ওপারের ঐ বিজন গঙ্গাতটে, সবুজ গাছের শীতল ছায়ায়, একখানি কুঁড়েঘর বাঁধিয়া সব ছাড়িয়া, যদি একলাটি বসিয়া এই পবিত্র কাশীধামের দিকে চাহিয়া চাহিয়া—কেবল চাহিয়া থাকিতে পারা যায়, তাহা হইলে সে কেমন সুখের হয়!

শিউলি বসিয়া-বসিয়া এমনি সব নানান রকম জল্পনা-কল্পনা করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ ঘাটের উপর হইতে বিলাসচন্দ্র ডাকিয়া বলিলো, 'কিগো, ঘাট থেকে উঠবে না নাকি? আজ কি আর বাড়ি ফিরবে না—ব্যাপার কি, বলো দেখি!'

শিউলি চমকিয়া বলিলো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ—এই যাচ্ছি!' বলিয়া, কাপড়খানি তাড়াতাড়ি কাচিয়া লইয়া উপরে উঠিলো।

বিলাসচন্দ্র কাছে আসিয়া একেবারে শিউলির গা-ঘেঁষিয়া দাঁড়াইলো। তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া ঘাটের ছুই-চারিজন লোক অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলো। শিউলি তা লক্ষ্য করিয়া সলজ্জভাবে বিলাসচন্দ্রকে বলিলো, 'রাস্তার মাঝখানে ও কী করো? তুমি পেছন-পেছন আলাদা হয়ে এসো, আমি এখন মন্দিরে যাবো।'

বিলাসচন্দ্র বলিলো, 'এতো বেলায় আবার মন্দিরে! সে এ-বেলা নয়, ও-বেলা হবে-অখন।'

শিউলি বলিলো, 'সে কি হয় গো! গঙ্গা নেয়ে শুদ্ধ হলুম, এখন মন্দিরে যাবো না তো আবার কখন যাবো? চিরকালটা পাপই করে আস্‌ছি, ঠাকুর-দেবতার জন্যে একদিন না হয় একটু কষ্ট স্বীকারই করলুম—তাতে তো আর মরে যাবো না!'

বিলাসচন্দ্র অস্ফুট বিরক্ত স্বরে কহিলো, 'যার যতো পাপ, পুণ্যের দিকে তার টান ততো বেশি!'

শিউলির মুখ প্রথমে বিবর্ণ—তারপর রাগে রাঙা হইয়া উঠিলো। যেখানে ব্যথা সেইখানেই লাগে। খানিকক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ সে উদ্ধতস্বরে বলিলো, 'তোমার যদি অসুবিধে হয়, তুমি না-হয় বাসায় যাও। মন্দির হয়ে আমি পরে যাচ্ছি।'

মন্দিরে ঢুকিবার আগে শিউলি আঁচল ভরিয়া বেলপাতা আর পূজার জন্য ফুল কিনিলো।

তখন ছুর্গাপূজার ছুটি। বিশ্বনাথজী-মন্দিরে যাত্রীর বড়ো ভিড়।

চারিদিক হইতে দেবাদিদেব মহাদেবের চরণোদ্দেশে ভক্তদের গদগদ কণ্ঠের জয়গাথা ধ্বনিয়া উঠিতেছে। কেহ ডাকিতেছে 'জয় বাবা, বিশ্বনাথ।' কেহ বলিতেছে 'কাশীনাথজী কী জয়।' কেহ বা বলিতেছে 'জয়, শিব সম্ভো—'। নানা-জাতি নানা-ভাষায়, নানা-স্বরে, সেই একই দেবতাকে

একপ্রাণে একমনে ডাকিয়া হৃদয়ের গোপন কামনা নিবেদন করিতেছে, কেহ কাহাকেও জানে না, চিনে না, কিন্তু সকলেরই মনের কথা এক—কি পাপী, কি পুণ্যবান!

ঘনঘন ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে গম্ভীর স্তোত্রপাঠ ও পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ শুনিতে শুনিতে শিউলি অভিভূত প্রাণে অঙ্গন পার হইয়া বিশ্বনাথের মূর্তির সম্মুখে গিয়া বসিয়া পড়িলো। তাহার তিক্ত, বিস্বাদ জীবনের মাঝে আচম্বিতে আজ একি অজানা আনন্দের মধুর ফোয়ারা ফুটিয়া উঠিলো—এ অমৃতের অজস্র-ধারায় শিউলির প্রাণ গলিয়া যায় যে, গলিয়া যায়!

তাহার সেই ভক্তিভরা, নতজানু, যুক্তকর-মূর্তি আজ চিত্রের মতো স্থির, সুন্দর, অপূর্ব!

কে এক ভক্ত একতারা বাজাইয়া, অঙ্গনে নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছিলো—

'বাবা ভক্তিতে ভুলে,
যেন, না-যাই ভুলে,
বাবাকে তুষ্‌বো দুটো বিল্বদলে—'

সে গান শিউলির প্রাণকে স্পর্শ করিলো।

সেইখানে দুই চোখ মুদিয়া বসিয়া শিউলি, ঠাকুরের পায়ে আপনার কলঙ্কিত জীবনের কোন্ কামনা জানাইলো, তা বলিতে পারি না; কিন্তু তাহার চোখ ছাপাইয়া, গাল বাহিয়া ঝর-ঝর-ঝর অশ্রু-ধারার সঙ্গে হৃদয়ের সকল কলঙ্ক ধুইয়া বাহির হইয়া আসিলো। ঠাকুরকে এমন করিয়া আর কখনো সে ডাকিতে পারে নাই; আজ এই মহাতীর্থে, অপূর্ব স্থান-মাহাত্ম্যে নিখিল ভক্তের নিখিল যাতনা একত্র হইয়া তাহার চিত্তেও যেন ভক্তির জোয়ার বহাইয়া দিতেছে।

দেবমূর্তির সম্মুখে প্রতিমার মতো ধীর-স্থির অচঞ্চল হইয়া শিউলি যে কতক্ষণ বসিয়া রহিলো, তা সে জানে না, এক সময় হঠাৎ বিলাসচন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া টানিলো।

কিন্তু শিউলির আত্মা তখন অন্যলোকে—সে নিঃসাড়ে বসিয়া রহিলো।

বিলাসচন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া আরো জোরে নাড়া দিয়া অধির স্বরে বলিলো, 'কি, ফিরতে হবে না?'

ধ্যান ভাঙিয়া গেল। শিউলি ফিরিয়া বিলাসচন্দ্রের মুখের দিকে নিদ্রোত্থিতের মতো চাহিয়া দেখিলো। তাহাকে দেখিবামাত্র শিউলির আবার আপনাকে মনে পড়িলো এবং সেই সঙ্গে তাহার দৃষ্টিতে গভীর এক ব্যথার আভাস ফুটিয়া উঠিলো।

কাতরস্বরে থামিয়া-থামিয়া সে বলিলো, 'কি, কি বল্‌চো তুমি?'

বিলাসচন্দ্র ব্যঙ্গের সহিত বলিলো, 'বলি, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ যে! খিদেয় পেট আমর বাপান্ত করছে—এদিকে ওঁর পূজো—না মাথামুণ্ডু শেষ আর হয় না। নাও, ওঠো!'

বিলাসচন্দ্র আবার শিউলির দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করিলো। শিউলির সমস্ত বুক ভরিয়া বিদ্রোহের এক ঝড় বহিয়া গেল। সে কি-একটা শক্ত কথা বলিতে চাহিতেছিলো, কিন্তু সকলে তাহাদের দিকে কৌতূহলী ও বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে দেখিয়া, সে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া নীরবে আবার দেবমূর্তির দিকে ঘুরিয়া বসিলো।

ঠোঁট কামড়াইয়া বিলাসচন্দ্র বলিলো, 'কি, কথা কইলে না যে?'

শিউলি চুপ।

বিলাসচন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া সজোরে এক টান দিয়া বলিলো, 'ওঠো, ওঠো বলছি। বেশ্যার আবার পূজো!'

সাপ যেমন করিয়া ফণা তোলে, বিলাসচন্দ্র এবার তাহার গায়ে হাত দিবামাত্র শিউলি তেমন করিয়া ঘাড় তুলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলো। কঠিন, তীব্রস্বরে বলিলো, 'কে, কে তুমি? চলে যাও এখান থেকে!'

তাহার কণ্ঠস্বরে ঘরসুদ্ধ লোক চমকিয়া উঠিলো। একজন পাণ্ডা এতক্ষণ দূরে বসিয়া তাহাদের দুজনের হাবভাব খর-চোখে লক্ষ্য করিতেছিলো। গোলযোগ দেখিয়া এখন সে আগাইয়া আসিলো। শিউলিকে জিজ্ঞাসা করিলো, 'কি হয়েছে, মায়ী?'

বিলাসচন্দ্র তাহার বলিষ্ঠ দেহের দিকে তাকাইয়া ভয়ে-ভয়ে কহিলো, 'কিছু হয়নি। এ আমার স্ত্রী, সঙ্গে যেতে চাইছে না।'

শিউলি তীক্ষ্মস্বরে বলিলো, 'ও আমার কেউ নয়। আমার গায়ে ও হাত দিয়েছে—আমি ওকে চিনি না।'

পাণ্ডা হুঙ্কার দিয়া উঠিলো। বিশ্বনাথজীর মন্দিরে মহিলার অপমান! একটিও কথা না-কহিয়া বিলাসচন্দ্রের গলা ধরিয়া সে এক ধাক্কা মারিলো। বিলাসচন্দ্র লাট্টুর মতো ঘুরিতে-ঘুরিতে একেবারে আঙিনায় গিয়া ঠিকরাইয়া পড়িলো। তারপর আপনাকে সামলাইতে না সামলাইতে দেখিলো, ক্রুদ্ধ মহিষের মতো পাণ্ডা আবার তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে! পলক না-পালটিতে ঊর্ধ্বশ্বাসে সে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ততক্ষণে শিউলি আবার হাত দুটি জোড় করিয়া, আঁচল-গলায় দিয়া, জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। তাহার নতনেত্রে গভীর আনন্দের পবিত্র আভাস!

মুসাফির

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে আমি সূর্যাস্তের সমারোহ দেখছিলুম। দূর-দিগন্তে সূর্য অস্ত যাচ্ছে—জড়ের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, আর এই ধরণীর বুকের ওপর দাঁড়িয়ে—আমি, মানুষ, বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আমাদের দু'জনের মধ্যে বোঝা-পড়া চলছিলো—কে বড়ো?

আমার পাশে দৃঢ় পাথরের উন্নত দুর্গ স্বদেশের সমস্ত লজ্জা মাথায় নিয়ে বুক ফুলিয়ে অক্ষত শরীরে দাঁড়িয়ে আছে। সূর্যাস্তের সোনার কিরণ তার চূড়োয়-চূড়োয় ঝক্‌ঝক্ করছিলো।

চারদিক স্থির নিস্তব্ধ; কোথাও একটা ঝিঁঝির সাড়া পর্যন্ত নেই, হঠাৎ কোমল নারী-কণ্ঠ আমার চমক ভাঙিয়ে দিলো—'বাবুজী, সেলাম!'

আমি এতদূর তন্মনস্ক ছিলুম যে, সে আমার কাছে কখন এসে দাঁড়িয়েছে, তা টেরও পাইনি। তার দিকে ফিরে চাইতে সে আবার আমায় সেলাম জানালো—'বাবুজী, সেলাম!'

তরুণী সে। চুড়িদার পাজামা তার দেহলতাকে সাপ্‌টে রয়েছে। পায়ে একজোড়া মাঝারি দরের পাঞ্জাবী নাগ্‌রা, গায়ে ঢিলে-হাতা পিরহান, তার ভেতর দিয়ে লাল কাঁচুলীর রক্তাভ আভা ফুটে বেরুচ্ছে, সবার ওপরে পাতলা একটা যোগিয়া রংয়ের চাদর। চাদরখানা গলার কাছে দু'তিনটে ফের দেওয়ায় মাথার খানিকটা ঢাকা পড়েছে, দীর্ঘ বেণী ঝুল্‌ছে। রং তার গৌর নয়, তবে ফরসা, আর চোখ দুটো খুব উজ্জ্বল। তার মুখের আর কিছু আমার মনে নেই।

তরুণীকে সেলাম করে আবার অস্তগামী সূর্যের দিকে চাইলুম। প্রকৃতির সঙ্গে আমার যে নিবিড় আলাপ চলছিলো হঠাৎ তার মাঝে ধূমকেতুর মতন

এই তরুণী এসে সে নিবিড়তাকে শ্লথ করে দেওয়ায় মনটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো। আমি ইচ্ছা করেই তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসলুম।

কিছুক্ষণ ওইভাবে কাটবার পর সে চেঁচিয়ে যেন কাকে বললো—'চলে যেয়ো না, কাছে-কাছেই থেকো।'

কার ওপরে এই হুকুমটা হলো, তা শোনবার জন্যে মুখ ফিরিয়ে দেখলুম যে, আমাদের কিছু দূরে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে।

তরুণী আমায় বললো—'ও আমার চাকর!'

কথার কোনো জবাব দিলুম না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার প্রশ্ন হলো—'বাবুজী, আপনি বাঙালী?'

—'হ্যাঁ।'

আবার কিছুক্ষণ কাটলো। এবার সে তার জায়গাটা ছেড়ে আমার কাছেই একটা জায়গায় এসে বসে বললো—'বাবু সাহেব, আমি স্ত্রীলোক।' তারপর তার পাজামা বেষ্টিত সুঠাম একখানা পা মাটি থেকে একটু তুলে আমাকে দেখিয়ে বললো—'এই পা-জামা পরা রয়েছে বলে আমাকে পুরুষ মনে করো না যেন!'

এ-রকম ব্যবহারে আমি আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকালুম। অস্তগামী সূর্যের ম্লান আভায় দেখতে পেলুম তার চোখ দুটো দিয়ে তীব্র শ্লেষ ফুটে বেরুচ্ছে। বেশ বুঝতে পারা গেল যে, তাকে অবহেলা করায় তার নারীত্বের অভিমানে আঘাত লেগেছে। তাকে খুশি করবার জন্যে তাড়াতাড়ি বললুম—'বলো কি! তুমি স্ত্রীলোক! আরে, এতক্ষণ বলতে হয়। তোমায় এতক্ষণ পালোয়ান বলে ভ্রম হচ্ছিলো যে!'

আমার কথা শুনে সে খিল্-খিল্ করে হেসে উঠলো, তারপরে চাকরটার দিকে ফিরে আবার বললো—'কাছেই থাকিস্।'

সে লোকটা তখন একটা উঁচু পাথরের ওপর উবু হয়ে বসে উজ্বুকের মতো আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিলো। তরুণী বললো, সে দিল্লীতে মজুরা করতে গিয়েছিলো। ভূপালে তাদের বাড়ি, সেইখানেই সে থাকে। ঝাঁসিতে তার মা'র এক বোন থাকে, তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই তাদের সেখানে নামতে হয়েছে। তার কাছে তাদের থাকবার উপায় নেই; একজন

রইস্ তোকে নিকে করায় তার পর্দা পড়ে গিয়েছে। সেই জন্যে তাকে রেখে তার মা আর তার দশ বছর বয়সের বোন মাসীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে, সেই অবসরে সে একটু বেড়িয়ে নিচ্ছে।

আমি জিগ্যেস করলুম—'তোমার নাম কি?'

সে বললো—'নাম সরিফুন্নিসা, তবে লোকে সরিফুন বলে ডাকে।'

জিগ্যেস করলুম—'তুমি নিকে করোনি?'

—'না, এই বেশ! দু'তিনজন রইস্ আমাকে নিকে করতে চেয়েছিলো, কিন্তু নিকে করলেই স্বাধীনতা চলে যায়।'

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলতে লাগলো—'কহিয়ে না বাবু, এই রূপ, এই জোয়ানী—সে কি অন্ধকূপের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকবার জন্যে? হীরের ফুলদানীর চেয়ে ফুল গুলবাগে থাকতেই আনন্দ পায়, কারণ বুলবুলের চুমুতেই যে তার জীবনের সার্থকতা—কি বলো?'

তরুণী কথা শেষ করেই গুণ গুণ করে গান ধরলো—

'গুলসন্ কি চুম্‌চুম্ কহ্‌তে বুল্‌বুল্
রুখ্‌ সারা বে-দরদী বুর্‌খা খুল্—'

সরিফুন্নিসার কথা শুনে মনটা বড়ো খুশি হয়ে উঠলো। বাইজী হোক আর যাই হোক, এমন মেয়েও তাহলে আমাদের দেশে আছে!

গানের দু'চরণ গেয়ে সে আবার বললো—'এই বেশ!'

আমি তাকে জিগ্যেস করলুম—'তোমরা কোন্ সরাইয়ে উঠেছো?'

সরিফুন তার চাকরটাকে ডেকে সরাইয়ের নাম জিগ্যেস করলো। লোকটা বোকার মতন আমার মুখের দিকে চেয়ে বললো, নাম সে জানে না। জিজ্ঞাসাবাদ করে যতটুকু জানতে পারা গেল তাতে মনে হলো, আমি যেখানে আছি তারাও সেইখানে উঠেছে।

চাকরটা আমাদের সঙ্গে কথা বলে আবার তার জায়গায় গিয়ে বসলো। বাইজী আমার সঙ্গে গল্প শুরু করলো, এই কেল্লা কতদিনের, কোন্ বাদশার কেল্লা এ, এর ভেতরে ঢুকতে হলে কোথায় পাশ পাওয়া যায় ইত্যাদি।

অন্ধকার হয়ে আসতে আমি উঠলুম! তরুণীও আমার সঙ্গে উঠলো। চলতে-চলতে সে বললো—'চলো বাবু, আমার ডেরা দেখে আসবে।'

—'চলো !'

কিছুটা এগিয়ে সে বললো—'বাবু সাহেব, চলিয়ে ভূপাল, আচ্ছা মুলক।'

—'ভূপাল! ভূপালে কি আছে?'

—'তালাও! ভূপালের তালাও দেখতে দেশ-বিদেশ থেকে লোক আসে। তামাম দুনিয়ায় অতবড়ো তালাও আর নেই। বলেই সে গৎ আওড়ালো—

'গড়্ তো গড়্ চিতোর কি গড়্
আওর সব গড়াইয়া
তালাও তো তালাও, ভূপাল কি তালাও
আওর সব তালাইয়া
রানী তো রানী কমলাবতী
আওর সব গাধাইয়া!'

আমি বললুম—'এখন আমাকে বোম্বাই যেতে হবে, ভূপালের তালাও আমার দেখা আছে।'

—'বোম্বাইও ভালো দেশ। আমায় তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে?'

আমি বললুম—'তোমার মা তোমাকে ছাড়বে কেন?'

—'না যদি ছাড়ে তাহলে আমি পালিয়ে যাবো। মা'র সাধ্য কি আমায় ধরে রাখে! আর ফিরবই না। তুমি আমায় রাখতে পারবে না?'

ও বাবা! বলে কি! মুখ ফুটে বললুম—'সুন্দরী, ও-রকম মারাত্মক কথা ঠাট্টা হিসেবেও বলো না, বড়ো ভয় করে ও-সব কথা শুনলে!'

আমার কথা শুনে সে হেসে বললো—'ঠিক যাবো, নিশ্চয়ই যাবো।'

গল্প করতে-করতে সরাইয়ে এসে পৌঁছলুম। আমরা একই সরাইয়ের অতিথি; তাদের আর আমার ঘরের মাঝে একটি মাত্র খালি ঘর।

আমরা যখন সরাইয়ে গিয়ে উপস্থিত হলুম তখন সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। প্রায় প্রত্যেক ঘরেই বাতি জ্বলছে। বাইজীদের ঘরটা পার হয়ে আমার ঘরে যেতে হয়, আমি তাদের ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় সরিফুন আমার বাহু আকর্ষণ করলো। তার মা সামনে পানের ডাবর খুলে সরাইয়ের বৃদ্ধ মালিকের সঙ্গে গল্প জমিয়ে বসেছে। সরিফুন তার মাকে বললো—'অম্মা, এই বাবুর সঙ্গে আমি বোম্বাই যাচ্ছি!'

এ-কথা শুনে বৃদ্ধা কঠোর দৃষ্টিতে প্রথমে আমার দিকে এবং পরে তার দিকে তাকালো। সে দৃষ্টিতে আহতা হয়ে সরিফুন সোহাগ করে আমার কাঁধের ওপর দুটো হাত রেখে চোখের ইসারায় কি বললো বুঝতে পারলুম না। তবে ব্যাপারটা যে বিশেষ শোভন হচ্ছে না, এটা বুঝে আমি তার হাত ছাড়িয়ে এগিয়ে পড়লুম।

ঘরের মধ্যে এসে খাটখানাকে বাইরে বের করে শুয়ে পড়া গেল। সমস্ত দিন রোদে ঘুরে-ঘুরে শরীর আমার ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো, সেই অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লুম।

বোধহয় ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়েছিলুম। ঘুম তেমন গাঢ় হয়নি, ঘুমের পাতলা আবরণ ভেদ করে সারেঙ্গীর আওয়াজ কানে এসে লাগতে লাগলো। উঠে দেখি, সরাইয়ের প্রকাণ্ড উঠোনে ফরাসের ওপর জল্‌সা চলেছে, দু'জন লোক সারেঙ্গীকে লহেরা দিচ্ছে, আর সবাই গাল-গল্প করছে।

সরাইখানার এমন দৃশ্য বিরল নয়, পথের মাঝে দু'দিনের বন্ধুরা প্রায়ই এমন আমোদ-প্রমোদ করে আবার যে যার কাজে চলে যায়। সারারাত ধরে সে কী মাতামাতি, সুরার নেশায় বন্ধুত্বের সে কতো রকম-বে-রকমের শপথ—তারপর রাত পোহালে যে যার আপনার ফিকিরে চলে যায়, সারা-জীবনে হয়তো আর দেখা সাক্ষাৎ হয় না।

খানিকক্ষণ খাটের ওপরে বসে আবার শুয়ে পড়লুম। আমার কানের কাছে সারেঙ্গীর সুর কেঁদে-কেঁদে গুম্‌রোতে লাগলো। এরি মধ্যে আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম মনে নেই, হঠাৎ পিঠে একটা খোঁচা লাগতে ধড়-ফড় করে উঠে বসলুম। দেখি, সরিফুন আমার খাটের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। খোঁচাটা যে কে দিয়েছে, তা বুঝতে দেরী হলো না। ঘুমের মধ্যে ও-রকম মিলিটারী-খোঁচা খেয়ে মনটা ভারী বিরক্ত হয়ে উঠলো। আচ্ছা বেহায়া তো এই মেয়েটা!

শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগলুম, কালই এখান থেকে লম্বা দিতে হবে। এক ঘণ্টার আলাপেই সে যে রকম বাড়াবাড়ি শুরু করেছে, দিন-দুয়েক থাকলে তো আমায় পাগল করে ছাড়বে!

আসরে আবার সারেঙ্গী বেজে উঠলো। বেহাগ-সিন্ধু দুল্‌কি চালে আমার

মনের মধ্যে ঠম্‌কে-ঠম্‌কে নাচ শুরু করে দিলো। মনে হতে লাগলো—সরিফুনের সঙ্গে ভূপালে যাবো নাকি? কিন্তু সে আর ক'দিনের জন্যে যাওয়া? ক্ষতি কি! চোখের নেশা যেদিন ছুটে যাবে—সেদিন আবার বেরিয়ে পড়বো নতুনের সন্ধানে। এমনি করে হয়তো বা একদিন আমার মানসীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে!—যাকে কখনো দেখিনি, যার কথা কখনো শুনিনি, সেই সে চির-পরিচিত, তার সঙ্গে। তা যদি না হয়? তাতেই বা ক্ষতি কি! সৌভাগ্য অধিকাংশ মানুষের শুধু কল্পনাতেই থেকে যায়, আমার জীবনেও যদি সে সৌভাগ্য না আসে, তাতেও কোনো ক্ষোভ নেই—। জীবনযাত্রার —এই গোণা-গুন্তি দিন ক'টার হিসেব চুকিয়ে দিয়ে যেদিন আমি অনন্তের পথে দাঁড়াবো, এই এই ধরণীর হাজার-হাজার সুখ-স্মৃতির সঙ্গে আজকের স্মৃতিও আমাকে আনন্দ দেবে।

বাস্তব ও কল্পনার সুখের স্বপ্নে বিভোর আমার মন, উধাও হয়ে উড়ে চলছিলো—এমন সময় গান শুনতে পেলুম—

পরদেশী সঁইয়া
নেহ লাগায়ে মন লে গয়া
সুখ লে গয়া
দুখ দে গয়া

বুঝলুম, বাইজীকে নিয়ে গিয়ে তারা গান গাওয়াচ্ছে। আর শুয়ে থাকা চললো না, গিয়ে আসরে বসলুম।

আমি আসরে যেতেই তারা সবাই সরে-সরে জায়গা দিয়ে আমায় খাতির করে বসালো। বাইজী আসরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে 'ভাও' বাৎলে গান গাইছিলো, আমাকে দেখে মুচকে হেসে ধীরে-ধীরে আমার পাশে এসে বসে গাইতে লাগলো। তার কাণ্ড দেখে আসরের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠলো। এতক্ষণ সবাই উচ্ছ্বসিত হয়ে নানা রকম কথা বলে তার গানের তারিফ করছিলো, কিন্তু সে আমার পাশে এসে বসতেই তাদের আনন্দের সেই উচ্ছৃঙ্খলতাটুকু উবে গেল। শ্রাদ্ধের আসরে গুরুজনদের সামনে বসে বখাটে ছেলেরা যেভাবে সুন্দরী কীর্তনওয়ালীর গান শোনে, তাদের মুখেও অনেকটা সেই রকমের ভাব ফুটে উঠছিলো।

গান থেমে গেল। সরিফুন আমার গায়ে হাত দিয়ে বললো—'তোমায় ডাকলুম তখন, এলে না কেন?'

তার বেহায়াপনা আমার মোটেই ভালো লাগছিলো না। এতো লোকের সামনে যে সে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে শুধু বললুম—'গান গাও।'

এই কঠোরতার প্রতিশোধ নেবার জন্যে যেন সে আমার আরও গা ঘেঁষে বসলো। তারপর হঠাৎ এক হাতে আমার থুত্‌নী ধরে গান শুরু করলো—

'মজা লে লে রসিয়া নই ঝুলনিকা—'

তার কাণ্ড দেখে আসর-সুদ্ধ লোক হো-হো করে হেসে উঠলো। তারপরে শতমুখে বাইজীর তারিফ। আমার তখনকার অবস্থা আর বর্ণনা না করাই ভালো। দু-তিনবার চেষ্টা করেও আসর ছেড়ে উঠে আসতে পারলুম না, মনে হচ্ছিলো আমার দেহ যেন পাথরে পরিণত হয়েছে, নড়বার ক্ষমতা নেই।

আসর যখন ভেঙে গেল তখন রাত্রি প্রায় বারোটা! শুয়ে পড়লুম। শুয়েই প্রথম চিন্তা হলো, কাল যেমন করেই হোক এখান থেকে লম্বা দিতে হবে। বাইজী অনেক দেখেছি, কিন্তু এমনটি আর—

কে যেন দরজায় ধাক্কা দিলো!

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেখি, সরিফুন দাঁড়িয়ে!

—'কি ব্যাপার?'

সে আমাকে ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

আমি বললুম—'তোমার মতলবখানা কি, বলো দিকিন্?'

সে বললো—'আজ এখানে শোবো।'

—'বটে! তাহলে আমি শোবো কোথায়?'

সে আমার মুখের দিকে চেয়ে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো!

আমি বললুম—'দেখো, আজ আসরে যা করেছো, তাইতেই যথেষ্ট হয়েছে, এর ওপরে লোকে যদি এতো রাত্রে তোমাকে আমার ঘরে দেখতে পায়, তাহলে কেলেঙ্কারীর আর সীমা থাকবে না!'

সরিফুন হাসতে হাসতে বললো—'তাহলে সাবধান! আমাকে তাড়াতে চেষ্টা করো না, আমি চেঁচিয়ে সবাইকে জাগিয়ে দেবো।'

আমি অনেকদিন ধরে সরাইয়ে বাস করছি, কিন্তু এমন বিভ্রাটে কখনো পড়িনি। রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলছিলো; কিন্তু নারী সে, কিছু করবার উপায় নেই! কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললুম—'দেখো, তোমার সঙ্গে আমার কখনো দোস্তি হবে না। বলেছিলে যে, তুমি স্ত্রীলোক; কিন্তু তোমার মতো লজ্জাহীনা আমি কখনো দেখিনি। বেরোও, আমার ঘর থেকে—'

একটা তীব্র কটাক্ষ হেনে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সারারাত মনটা বড়ো বিশ্রী হয়ে রইলো, ঘুমোতে পারলুম না কিছুতেই আর। সকালবেলায় কূয়োতলায় স্নান করছি, এমন সময় ঘটি হাতে বাইজী সেখানে হাজির হলো। তার সঙ্গে যে আমার পরিচয় আছে, এমন ভাবই তার মুখে দেখা গেল না। ভাবলুম—বাঁচা গেল! তার কাছে কূয়োর দড়ি ছিলো না; অন্য লোকের কাছ থেকে দড়ি চেয়ে নিয়ে জল তুলে সে মুখ ধুতে লাগলো।

স্নান সেরে এসে আমার যা কিছু সম্বল, সে-সব বেঁধে ঠিক করে রেখে বেরিয়ে পড়লুম। রাত্রি সাড়ে-ন'টায় গাড়ি, এখন সবে সকাল আটটা।

সমস্ত সকালটা রাস্তায় ঘুরে-ঘুরে অনেক বেলায় সরাইয়ে ফিরে এলুম। সকালের গাড়িতে বিস্তর মুশাফির সরাইয়ে এসেছে। আমার ও সরিফুনদের ঘরের মাঝে যে ঘরটা খালি ছিলো, দেখলুম সেটাতেও লোক এসেছে। সরিফুনরা তখনো যায় নি। কিন্তু সেদিকে আর না চেয়ে সোজা আমার ঘরে এসে দিবানিদ্রার আয়োজন করা গেল।

এপাশ-ওপাশ করতে-করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, হঠাৎ কার চীৎকারে চট্‌কা ভেঙে গেল। খাটের ওপর বসে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে পেলুম, আমার পশের ঘর থেকেই সেই যন্ত্রণার শব্দ আসছে। সে কাতরধ্বনি এতো করুণ যে, তা শুনে স্থির হয়ে বসে থাকা অসম্ভব। আমি তাড়াতাড়ি নতুন আগন্তুকের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। দরজা ভেজানো ছিলো, ধাক্কা দিয়ে ঘরের ভেতর গিয়ে দেখলুম—একটা লোক, নেড়া মাথা, ছিপ্‌ছিপে লম্বা কালো চেহারা, খাটের ওপরে পড়ে কাটা ছাগলের মতন ছটফট্ করছে। হঠাৎ সে দৃশ্য দেখে আমার ভ্যাবচ্যাকা লেগে গেল। আমি তাকে জিগ্যেস করলুম—'কি হয়েছে তোমার, অমন করছো কেন?'

লোকটা স্থির হয়ে শূন্য-দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলো। তারপরে আবার সেই-রকম ছটফট করতে আরম্ভ করলো।

আমি তার খাটের দিকে দু'পা এগিয়ে আবার জিগ্যেস করলুম—'কি হয়েছে তোমার, ও-রকম করছো কেন?'

সে আবার সেই রকম শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বিড়বিড় করে কি বললো। সে ভাষা আমি জানি না।

আমি এবার তার খাটের ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। সে চোখ বুজিয়ে মাথায় হাত দিয়ে ইংরেজিতে বললো—'জ্বর, জ্বর ; ওঃ, বড্ড জ্বর।'

তার মাথায় হাত দিয়ে দেখলুম, ভয়ানক গরম, বোধহয় একশো-পাঁচ ডিগ্রি জ্বর হবে। তার পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম, ক্রমে তার সংজ্ঞা লোপ পেতে লাগলো। তারপর বিকারের ঝোঁকে সে সেই দুর্বোধ্য ভাষায় অনর্গল বকতে শুরু করে দিলো।

লোকটাকে নিয়ে যে কি করি, কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারছিলুম না। এদিকে রুগীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। ঘাড় পেতে যখন তার সেবার ভার নিয়েছি তখন তাকে ফেলেও পালাতে পারি না। তাকে সেই অবস্থায় রেখে আমি ষ্টেশন থেকে বরফ কিনে এনে তার মাথায় দিতে লাগলুম।

সে-রাত্রে আমার আর যাওয়া হলো না।

সেদিন আর সরাইয়ে কোনো জল্‌সা নেই, সখের-প্রাণ অতিথি যারা ছিলো, তারা সবাই চলে গেছে। ঘরে-ঘরে লোকে ঘুমোচ্ছে, চারিদি[illegible] নিঝুম ; তারই মাঝে আমি সেই অপরিচিত মূমুর্ষু রুগীর শিয়রে [illegible] নিয়ে একা কি করবো, তাই ভাবছি।

রাত্রি বোধহয় তখন দুটো। বরফ দিতে-দিত লোকটার জ্বর কমে[illegible] বেশ শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে দেখে খাট থেকে একটু দূরে আমি মাটিতে [illegible] যোগাড় করছি—এমন সময় সরিফুন ঝড়ের মতো এসে সেই ঘরে ঢুক[illegible] তার রকম দেখে আমি চমকে উঠলুম। জিগ্যেস করলুম—'কি! কি চাও[illegible]

পাগলের মতন একবার ফিক্‌ফিক্ করে হেসে ছুটে সে ঘর থেকে বেরিয়ে[illegible] নিজের ঘরে ঢুকে গেল।

এই নারীটির ব্যবহার ক্রমেই আমার বিস্ময়ের মাত্রা ছাড়িয়ে উঠছিলো।

এমন অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ আমি আর কখনো দেখি নি। মেঝেতে পড়ে গা-গড়াতে লাগলুম। ঠিক করলুম, আর ঘুমোবো না, বাকি রাতটা জেগে কাটিয়ে দিয়ে কাল সকালেই রুগীর একটা ব্যবস্থা করে তারপর টানা ঘুম লাগানো যাবে।

ঘুমোবো না ঠিক করে শুয়েছিলুম বটে, কিন্তু কখন যে ঘুম চোরের মতো সন্তর্পণে এসে আমার চেতনাটুকু চুরি করে নিয়ে পালিয়েছিলো, তা টেরও পাইনি। যখন ঘুম ভাঙলো তখন সকাল অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে, আমাদের দরজা পর্যন্ত রোদ এসেছে।

জেগে দেখি আমার রুগী বিছানার ওপর উঠে বসেছে। আমি তাকে ইংরেজিতে জিগ্যেস করলুম—'কেমন লাগছে?'

সে বললো—'জ্বর নেই। উঃ, কালকের রাতটা কি কষ্টেই কেটেছে!' নিবিড় কৃতজ্ঞতায় সে আমার হাত চেপে ধরে বললো—'তুমি আমার জন্যে যা করেছো, তা শোধ করবার মতন আমার কিছুই নেই।'

—'কিছু না, পৃথিবীতে বাস করতে হলে ও-রকম করতেই হয়, তুমি এখন শুয়ে পড়ো!'

তাকে শুইয়ে দিয়ে আমি মুখ ধুয়ে এসে আবার তার কাছে বসলুম। সে গড়গড় করে বকে যেতে লাগলো। তার নাম হরকিষণ, সে লাহোরে পুলিশের চাকরী করতো। ভালো কর্মচারী বলে তার বেশ সুনাম ছিলো, কিন্তু বছর-কয়েক চাকরী করার পর কোথা থেকে এই কাল জ্বর এসে তাকে আক্রমণ করলো। হু'দিন ভালো থাকে, আবার হু'দিন জ্বরে পড়ে। দেশ তার বোম্বাই শহরে, সেখানে শুধু আছেন বৃদ্ধা মা, সংসারে আর কেউ নেই। অসুখের খবর পেয়ে মা তাকে চাকরী ছেড়ে দেশে ফিরে যেতে বলেছেন, তাই সে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে যাচ্ছে। লাহোর থেকে বোম্বাই অনেকটা পাড়ি বলে সে ঝাঁসিতে নেমেছে—বিশ্রামের জন্যে।

সে বললো—'এখনো বয়েস কম আছে, অন্য কাজে লেগে যাবো।'

আমিও বোম্বাই যাচ্ছি শুনে সে বললো—'তাহলে এক-সঙ্গেই যাবো, তোমার মতো বন্ধু আমি আর পাইনি।'

আমি একবার তার গায়ে হাত দিয়ে দেখলুম—জ্বর আর নেই। তাকে

বললুম—'চুপ করে শুয়ে থাকো, আজ রাতে যদি জ্বর না আসে তাহলে কাল রাতে আমারা বেরিয়ে পড়বো—বুঝলে !'

সে আমার হাতখানা তার মাথায় ঠেকিয়ে বললো—'আশীর্বাদ করো—তুমি আমার ভাই, বন্ধু—সব।'

কিছুক্ষণ পাখার বাতাস করতেই সে ঘুমিয়ে পড়লো। আমার কাছে উনুন কিংবা রান্নার কোনো সরঞ্জাম ছিলো না। মাসের পর মাস বাজারের খাবার খেয়েই কাটিয়ে দিই, রান্নার হাঙ্গামা করি না। কিন্তু রুগীকে তো আর পুরী, কচুরী খাওয়ানো চলবে না। তাকে একটু সাগু কিংবা বার্লি খাওয়াতে হবে। কোথায় বা সে-সব তৈরী করি ! অনেক ভেবে-চিন্তে শেষকালে সরিফুনের শরণ নিলুম। সব কথা শুনে যেন সে দায়ে পড়ে আমার সঙ্গে কথা বলছে, এই রকম ভাব দেখিয়ে বললো—'সাগু এনে দাও, একটু পরে আমাদের উনুনে আগুন পড়বে—তার আগে কিছু হবে না।'

বাজার থেকে সাগু কিনে এনে তার হাতে দিয়ে বললুম—'তৈরী হয়ে গেলে আমায় ডেকো।'

হরকিষণের সাগু তৈরির ব্যবস্থা করে, আমার নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম। কাল প্রায় সমস্ত রাত্রিই বিনিদ্র অবস্থায় কেটেছে, তার ওপরে দিনেরবেলায় যখন-তখন ঘুম আমার একেবারে সাধা ছিলো।

প্রায় বারোটা অবধি ঘুমিয়ে শরীরটাকে বেশ ঝরঝরে করে নিয়ে রুগীর ঘরের মধ্যে গিয়ে যে দৃশ্য দেখলুম, তাতে আমার দেহের সমস্ত রক্ত এক মুহূর্তে চড়াৎ করে একেবারে মাথায় উঠে গেলো ! দেখলুম—খাটের ওপরে সরিফুন আর হরকিষণ গলা জড়াজড়ি করে বসে রয়েছে। আমাকে দেখে হরকিষণ তাড়াতাড়ি তার হাতখানা নামিয়ে নিলো, সরিফুন যেন আমাকে দেখাবার জন্যে তার গলাটা আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে নানা রকম আদরের কথা বলতে লাগলো। ক্রোধে, ক্ষোভে ও ঘৃণায় দুটোকেই খুন করে ফেলতে ইচ্ছা করছিলো। সেখানে আর দাঁড়াতে পারলুম না। টলতে-টলতে বেরিয়ে এসে আমার ঘরে ঢুকে পড়লুম। অকৃতজ্ঞ ! একেই কাল আমি মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছি ! প্রাণ দিয়ে তার সেবা করেছি ! দু'হাতে তার বমি পরিষ্কার করেছি !

আর তুমি নারী! তোমাকে কি আর বলবো!

কিন্তু তখনি আমার মনে হলো, এ আমি কার ওপরে অভিমান করছি। কে সে আমার! তারা আমার কে? গত রাত্রির সমস্ত ঘটনা দুঃস্বপ্ন বলে মন থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে স্নান করে বেরিয়ে পড়লুম। যাবার সময় হরকিষণের ঘরের মধ্যে উঁকি দিতে দেখতে পেলুম যে, তার বিছানায় সরিফুন লম্বা হয়ে শুয়ে আছে আর সে মেঝেতে বসে নেড়া মাথায় চিরুণী ঘষছে। আমাকে দেখতে পেয়েই সে ডাকলো—'ভেইয়া!'

আমি তার কথার কোনো জবাব না দিয়ে সোজা বেরিয়ে গেলুম।

সেদিন দোকানে খাওয়া-দাওয়া সেরে প্রায় সমস্ত দিনটাই ষ্টেশনে বসে কাটিয়ে দিলুম। বিকেলে কেল্লার পাহাড়ে কাটিয়ে সন্ধ্যে উৎরে যাবার পর সরাইয়ে ফিরে এলুম। সেই রাতের গাড়িতেই চলে যাবো স্থির-সঙ্কল্প হয়ে বসে আছি, এমন সময় হরকিষণ আমার ঘরে এসে উপস্থিত হলো। সে একেবারে আমার পাছটো জড়িয়ে ধরে বললো—'তুমি কেন আমার ওপর রাগ করেছো ভেইয়া, আমার ওখানে গিয়ে বসবে চলো।'

কেন রাগ করেছি! রুদ্ধ অভিমানে তার কথার কোনো জবাব দিতে পারলুম না। সে এক রকম টেনেই আমাকে তার ঘরে নিয়ে গেল।

তার মুখ দিয়ে একটু-একটু সুরার গন্ধ বেরুচ্ছিলো, কথাও কেমন যেন জড়ানো-জড়ানো।

আমি তার একখানা হাত চেপে ধরে ভর্ৎসনার স্বরে বললুম—'কাল রাতে তুমি মরতে বসেছিলে আর আজ মদ খেয়েছো?'

সে আমাকে তার খাটে বসিয়ে বললো—'ও কিছু নয়, আমার খাওয়া অভ্যেস আছে, না খেলে তবিয়ত ঘাবড়ায়।'

বললুম—'আজ রাতের গাড়িতেই আমি যাচ্ছি, তুমি কবে যাচ্ছো?'

নেশার ঘোরের বকবকানি ক্রমে আমাকে অতিষ্ঠ করে তুললো। মদের গন্ধে পেটের মধ্যে যেন পাক দিতে লাগলো। তার কবল থেকে পালিয়ে বাইরে গিয়ে একটু হাঁপ ছাড়বার জন্যে আমার বুকের ভেতরে ধড়ফড় করছিলো, উঠে বললুম—'তুমি বসো, আমি একটু ঘুরে আসছি!'

সে খপ্ করে আমার হাত ধরে বললো—'ভেইয়া, তুমি পালিয়ে যাবে!'

—'আর পালাবো কোথায়? রাত দশটা বেজে গেছে, এখন তো আর পালাবার ট্রেন নেই।'

আমার কথায় বিশ্বাস হলো না, তাই সে আমার জামাটা খুলে নিয়ে নিজের জিম্মায় রেখে দিলো।

ছুটে বেরিয়ে আমি বড়ো-রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালুম। তারপরে বুক ভরে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে আস্তে-আস্তে পায়চারী করতে আরম্ভ করা গেল। হরকিষণের মুখের গন্ধ যেন আমার নাকে বাসা বেঁধে বসেছিলো, প্রত্যেক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে সেই তীব্র গন্ধ পাচ্ছিলুম।

রাস্তায় বেড়াতে-বেড়াতে মনে হতে লাগলো, কাল সকালেই পুলিশে গিয়ে বাইজীর নামে নালিশ করে আসবো। সরাইয়ে মুশাফিরদের সঙ্গে সে এই রকম হুল্লোড় করছে জানতে পারলে নিশ্চয় তারা তাকে জব্দ করে দেবে। কিন্তু কার জন্যে আমি তা করবো? হরকিষণ! কে সে আমার? তার যদি বাইজীকে ভালো লেগে থাকে, তবে সে তার সঙ্গে আলাপ করবে তাতে আমার কি? আমি তাতে বাধা দেবার কে? কোথায় তার বাড়ি সুদূর বোম্বাই শহরে, আর আমার বাড়ি কোথায় ভারতের অন্য এক প্রান্তে, বাংলায়—ত্ব'দিন পরে আজকের ঘটনা স্বপ্নের মতন মনে হবে!

প্রায় ত্ব'ঘণ্টা ধরে রাস্তায় ঘুরে সরাইয়ে ফিরে এলুম। কিছু খেতে আর প্রবৃত্তি হচ্ছিলো না। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বার আগে একবার হরকিষণের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলুম যে, সে ঘরে নেই, লণ্ঠনটা এক কোণে জ্বলছে। কাছেই কোথাও গিয়েছে মনে করে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম। প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরও সে ফিরলো না দেখে আমার মনে হলো, নিশ্চয় সে সরাইয়ের বাইরে মদ কিনতে গিয়েছে। বিরক্ত হয়ে সেখান থেকে উঠে আমার ঘরের কাছে গিয়ে দেখি, ভেতর দিক থেকে দরজা বন্ধ! দরজায় জোরে ধাক্কা দিতে ভেতর থেকেই হরকিষণ বলে উঠলো—'কৌন্ হ্যায়?'

আমি বললুম—'দরজা খোলো, খিল দিয়েছো কেন?'

ভেতর থেকে সরিফুন খিল্-খিল্ করে হেসে উঠলো। তার সেই হাসি

বিষ-মাখানো ছুরির মতন সোজা এসে আমার বুকে আঘাত করলো। আমার ইচ্ছা করছিলো, দরজা ভেঙে ছুটোকেই খুন করে ফেলি। জোরে দরজায় লাথি মারলুম। জীর্ণ দরজা ঝন্-ঝন্ শব্দে কেঁপে উঠলো। দূরে একটা লোক বাইরে খাটিয়া পেতে শুয়ে ছিলো, সে পাশ ফিরতে-ফিরতে বললো —'এতনা রাতমে ক্যা ঝামেলা লগায়া—'

ভেতর থেকে আর কারুর সাড়া পাওয়া গেল না। নিষ্ফল আক্রোশে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে-ছিঁড়তে বাইরে এসে দাঁড়ালুম। তারপর হরকিষণের চৌকাঠে গিয়ে বসলুম। সে সময় যদি তারা বেরুতো, তাহলে সেই রাত্রে ঝাঁসির সেই সরাইখানায় নিশ্চয় ছুটো খুন হয়ে যেতো।

সারারাত তাদের অপেক্ষায় সেই চৌকাঠের ওপর বসে রইলুম। সকাল হবার একটু আগে দরজায় মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, হঠাৎ কানে আওয়াজ এলো—'ভেইয়া!'

চোখ চেয়েই দেখি, আমার সামনে হরকিষণ দাঁড়িয়ে। তখনো সরাইয়ের কেউ জাগেনি, দিনের আলো একটু দেখা দিয়েছে মাত্র। সেই আলোতে দেখলুম, তার মুখখানা একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে, চোখ ছুটো যেন মরা মানুষের চোখের মতো! কাঁপতে-কাঁপতে সে আমার ওপর টলে পড়ে গেল। আমি কোনো-রকমে তাকে সেখান থেকে টেনে খাটের ওপরে নিয়ে ফেললুম! সে সেই অবস্থায় মড়ার মতন নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইলো।

তাকে শুইয়ে তখনি ছুটে আমার ঘরে গিয়ে দেখি যে, ঘর খালি! বাইজী আগেই পালিয়েছে।

ঘর থেকে আমার দড়ি ও ঘটি বের করে স্নান সেরে সেই ভোরবেলাতেই বেরিয়ে পড়লুম।

রাস্তায় বেশিক্ষণ ঘুরে বেড়ানো সম্ভব হলো না। সারা রাত্রি জাগরণ, তার ওপরে সেই উত্তেজনায় আমার মাথার মধ্যে ঝিঁ-ঝিঁ বাজছিলো। রোদ উঠতেই সরাইয়ে ফিরে একেবারে সোজা হরকিষণের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলুম। আমাকে না জানিয়ে কেন তারা আমার ঘরে ঢুকে সারারাত কাটালো, তার হিসেব-নিকেশ না করে কিছুতেই শান্ত হতে পারছিলুম না।

ঘরে গিয়ে দেখলুম যে, হরকিষণ চিৎ হয়ে মড়ার মতন পড়ে রয়েছে।

হঠাৎ তাকে দেখলে জীবিত কি মৃত, তা বোঝা যায় না। আমি তার খাটের কাছে গিয়ে ডাক দিলুম—'হরকিষণ!'

কোনো সাড়া নেই।

এবার সে চোখ চাইলো। চোখ দুটো তার একেবারে ঘোলা। সে বললো—'ভেইয়া।'

তারপরে অসহায়ের মতন একখানা হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলো। তার সে অবস্থা দেখে আমার দয়া হলো। আমি তার হাতখানা ধরলুম—বেশ গরম! আমার হাত পুড়ে যেতে লাগলো।

সে ইসারায় আমায় বুঝিয়ে দিলো, তার খিদে পেয়েছে।

কালকের রাতের প্রসঙ্গ এই অবস্থায় আর খুঁচিয়ে তুলতে ইচ্ছা হচ্ছিলো না। তবু বললুম—'ঐরকম অসুখের পর তুমি কি বলে—'

আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে সে সরিফুনদের ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতে লাগলো—'সয়তানী—রাক্ষসী! ভেইয়া, তুমি আমায় মা'র কাছে নিয়ে চলো।'

তার কথা শুনে আমার মনে হলো, সে বোধহয় ভুল বকছে। কিন্তু সে আবার বললো—'আমি ঝাঁসী অবধি টিকিট কিনেছিলুম, রাস্তায় একদিন বিশ্রাম করবো বলে। তুমি আজই আমার টিকিট কিনে আনো, আমাকে মা'র কাছে নিয়ে চলো।'

হরকিষণকে শান্ত করে আমি বেরিয়ে পড়লুম। বাজার থেকে বার্লি কিনে, যে দোকানে খাবার খেতুম, সেখানে গিয়ে তাদের অনুরোধ করতে তারা কোনো-রকমে সেটুকু খাবার উপোযোগী করে দিলো। হরকিষণকে সেটুকু খাইয়ে দিয়ে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম।

আজ রাতে যেতেই হবে—হরকিষণ যাক আর না যাক—এই কথা ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লুম। কাল রাতেও ঘুমোইনি। যখন ঘুম ভাঙলো তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ঘুম থেকে উঠেই আমি হরকিষণের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সে তখন খাটের ওপরে বসে ছিলো। তার গায়ে হাত দিয়ে দেখলুম—জ্বর আর নেই—অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছে।

হরকিষণ আমায় টাকা দিয়ে বললো—'গাড়ির সময় যদি ভিড়ে টিকিট

না করতে পারা যায়, তাহলে আর যাওয়া হবে না। তুমি এইবেলা গিয়ে টিকিট করে আনো। আজ যে করেই হোক যেতে হবে।'

তার মা'র কাছে একটা টেলিগ্রাম করবার জন্যেও টাকা দিয়ে দিলো।

সমস্ত দিন আমার কিছু খাওয়া হয় নি, দোকানে বসে খেয়ে নিয়ে ডাকঘরে টেলিগ্রাম করে টিকিট কিনে যখন সরাইয়ে ফিরলুম, তখন রাত্রি ন'টা ; ট্রেনের মোটে আর আধ ঘণ্টা দেরী। আর বিশেষ সময় নেই, তাড়াতাড়ি হরকিষণের ঘরে গিয়ে দেখি, যাবার কোনো উদ্যোগই নেই তার, খাটের ওপর বসে নিশ্চিন্তভাবে সে মদ খাচ্ছে! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলুম না—মানুষের শরীরে এতো সহ্য হয়! স্তম্ভিত হয়ে আমি তার কাণ্ড দেখতে লাগলুম—একটা কথাও আমার মুখ ফুটে বেরলো না। সে তার ঘোলাটে চোখ দুটো আমার দিকে তুলে বললো—'টিকিট কিনেছো ভেইয়া, আজই যেতে হবে কিন্তু—'

আমি বললুম—'যেতে যদি হয় তো এখনি ওঠো, আর সময় নেই।' বলে আমি তার কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য জিনিসগুলোকে গুছিয়ে নিলুম, তারপর বললুম—'চলো, রাস্তায় বেরিয়ে গাড়ি ধরবো।'

হরকিষণ সেইভাবেই বসে-বসে বললো—'আর একটু বসো, ভেইয়া। আর একটু বসো, একটা কথা—একটি মাত্র কথা—বাইজীকে—শেষ কথা আমার।'

আমি তার হাতখানা জোর করে ধরে বললুম—'খবরদার! আমি তোমায় এখান থেকে তুলে নিয়ে যাবো। গাড়ি ছাড়তে আর পনেরো মিনিটও নেই।'

হরকিষণ আচম্‌কা হেঁচকা-টান মেরে আমার হাত থেকে তার হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে টলতে-টলতে বাইরে চলে গেল।

আমি বোধহয় মিনিট-দুয়েক বিমূঢ়ের মতন সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলুম। কিন্তু তখনি মনে হলো, ট্রেনের আর দেরী নেই। ঠিক করলুম, তাকে ফেলেই চলে যেতে হবে। সেখান থেকে বেরিয়ে আমার ঘর থেকে জিনিসপত্র আনতে গিয়ে দেখি যে, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

সর্বনাশ! আবার তারা আমার ঘরে গিয়ে ঢুকেছে! রেগে দরজায় লাথি মারলুম। ভেতর থেকে আবার সেই হাসি! উঃ, অসহ্য!

আমার জিনিসপত্র ফেলেই ষ্টেশনের দিকে ছুটলুম। ছুটতে-ছুটতে বেদম হয়ে ষ্টেশনে এসে শুনলুম, গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। আমার হাত, পা, মাথা সমস্ত ঝিম্-ঝিম্ করছিলো, নির্জন ষ্টেশনের একটা বেঞ্চিতে লম্বা হয়ে পড়ে রইলুম।

ঘণ্টাখানেক স্থির হয়ে পড়ে থেকে আবার সরাইয়ে ফিরে আসা গেল। দরজা তখনো বন্ধ। সেই রাতে সরাইয়ের বুড়ো মালিককে ডেকে তুলে সব কথা জানিয়ে তখনি পুলিশে খবর দিতে বললুম।

সে বললো—'কাল সকালে সমস্ত বন্দোবস্ত করবো, আজ রাতে আর কিছু হবে না।'

সেই রাত্রির মতো তারই ঘরে শুয়ে থাকবার জন্যে সে আমায় একটা খাট দিলো।

আমি বললুম—'আমি সারারাত ঐ দরজার গোড়ায় বসে থাকবো, কতো বড়ো বাইজী সে, আমি দেখে নেবো!'

সরাইওয়ালা আমায় কোনো হাঙ্গামা করতে বারণ করে শুয়ে পড়লো। আমি খাটখানা সেখান থেকে তুলে নিয়ে আমার ঘরের দরজার সামনে পেতে তার ওপরে বসে রইলুম।

রাত্রির প্রত্যেক পল, মুহূর্ত, ঘণ্টা আমার মনটাকে করাতের মতন কাটতে-কাটতে অতিবাহিত হতে লাগলো। আমি নিস্পন্দ হয়ে বসে আছি, স্থির দৃষ্টিতে সেই ফাটা দরজার দিকে চেয়ে—একবার খুললে হয়!

আকাশের বুক ফেটে রক্তধারার মতো সূর্যের রশ্মি সবে ধরণীর বুকে এসে ঠেকেছে, এমন সময় ঘরের ভেতর থেকে অতি সন্তর্পণে দরজা খোলার শব্দ হলো। তারপর দরজাটা একটু ফাঁক হতেই আমি একেবারে লাফিয়ে দরজার ওপরে গিয়ে পড়লুম।

বাইজী দরজা খুলছিলো, সে আমাকে দেখেই পালাবার উপক্রম করলো। আমি খপ্ করে তার হাতখানা ধরে বললুম—'শয়তানের বাচ্ছা, আজ তোমার শেষ দিন—'

সরিফুন অনুচ্চকণ্ঠে বলে উঠলো—'এই, চুপ্ চুপ!'

তারপর সে ফিস-ফিস করে বললো—'হরকিষণ মর গই!!!'

আমার মাথায় কে যেন জোরে এক ঘা মুগুর বসিয়ে দিলো, চোখের সামনে দিয়ে ঝক্‌-ঝক্‌ করে বিহ্যুতের মতন কতকগুলো কি খেলে গেল, আমি মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলুম, দেওয়াল ধরে সামলে নিলুম। খাটের কাছে গিয়ে দেখলুম, হরকিষণের দেহখানা পড়ে রয়েছে—তার ঘোলাটে চোখ হুটো তখনো চেয়ে!! আমার মনে হতে লাগলো, এখনি সে হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরে বলবে—ভেইয়া, আমাকে ক্ষমা করো।

তারপর তিনদিন ধরে পুলিশের টানাটানি। বাইজী কি করে হাজত থেকে অব্যাহতি পেলো জানি না, আমাকে আর সরাইয়ের সেই বৃদ্ধ মালিককে তিনদিন ধরে রেখে তারা ছেড়ে দিলো।

চারদিনের দিন ট্রেনে উঠে বোম্বাই রওনা হলুম। পরদিন ভোরবেলা চা-ওলাকে দাম দিতে গিয়ে ব্যাগের খাপ খুলে দেখি, আমার ও হরকিষণের সেই টিকিট হু'খানা তখনো তার মধ্যে রয়েছে। টিকিট হু'খানা হাতে করে ভাবতে লাগলুম যে, একা-একা হরকিষণ বিনা টিকিটেই আজ কতদূরে পাড়ি জমিয়েছে!

চা-ওয়ালার কর্কশ তাগাদা আমার চমক ভাঙিয়ে দিলো।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

সুলোচনা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধ্যা হইয়াছে, সুকিয়া ষ্ট্রীট দিয়া যাইতেছি। ডাক্তারখানা খুলিতে দেরি হইয়া গিয়াছে, সময় হইয়া আসিলো, সুতরাং হন-হন করিয়াই চলিয়াছি—এমন সময়ে বাড়ি-ঘরের থামের ছায়ার আলো-আঁধারির মধ্যে একটি স্ত্রীলোককে দেখিয়াই আমি থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলাম।

এ যেন সেই সুলোচনার মা না? অবিকল সেই রকম দেখিতে, যদিও বহুকাল দেখি নাই। কিন্তু তাও কি সম্ভব? এতকাল পরে সুলোচনার মা বাঁচিয়া থাকিবে এবং কলিকাতা শহরেই থাকিবে?

একটু জোর গলায় ডাক দিলাম—'শুনছেন? শুনছেন? বলি শুনছেন—এই যে?'

যে বৃদ্ধাটি ফিরিয়া দাঁড়াইলো আমার ডাক শুনিয়া এবং হয়তো-বা তাহাকেই কে ডাকিতেছে মনে করিয়া—বিস্ময়ের সহিত দেখিলাম, সে সুলোচনার মা-ই বটে।

সুলোচনার মা কাছে আসিলো। প্রথমে চিনিতে পারিলো না, পরে পরিচয় দিতেই দন্তহীন মুখে এক গাল হাসিয়া বলিলো—'ও, তুমি যদু! আহা, কতকাল দেখিনি তোমাদের!' ইত্যাদি বা ঐ ধরনের কোনো উক্তি।

আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের যবনিকা হঠাৎ সরিয়া গেল। গত মহাযুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্বের কলিকাতা····ঘোড়ার ট্রাম সবে মাত্র বন্ধ হইয়াছে····তখনকার আমলের অতি সুন্দরী আধুনিকাদের মধ্যে যে আমার চোখে সর্বপ্রধান সুন্দরী এবং আধুনিকা ছিলো, কিছুকাল পরে যাহাকে জীবনের জনসমুদ্রে একদম হারাইয়া ফেলি, এ সেই মেয়েটির মা।

তখনকার মেয়েদের চুল বাঁধিবার রীতি বা কাপড়-চোপড় পরিবার ধরন

একালের মতো ছিলো না বটে, কিন্তু সত্যকার সুন্দরী যে হয়, তাহাকে যে-কোনো সাজে, যে-কোনো ঢঙে, যে-কোনো ভঙ্গিতে মানায়, এবং সুলোচনা ছিলো সেই ধরনের সুন্দরী। তাহার সেই দীর্ঘ ঋজু চম্পকগৌর যৌবনদীপ্ত দেহ, লম্বা টানা কালো-কালো ডাগর চোখ, কালো কোঁকড়া-চুলের রাশি, নিটোল সুগঠিত বাহু দু'টি, সুন্দর মুখশ্রী কলিকাতার পথে পথে গলির আড়ালে-আবডালে, পথের বাঁক হঠাৎ ফিরিয়াই, কিম্বা কোনো নির্জন পার্কে পাদচারণরত অবস্থায় কতদিন কল্পনানেত্রে দেখিতাম ; দেশে ফিরিয়া কতো বর্ষণমুখর শ্রাবণ বা ভাদ্র রজনীতে এক-ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া প্রথম-যৌবনের রঙিন নেশায় যাহার মুখ কতবার মনে পড়িতো—সেই সুলোচনার কোনো খবর পাই নাই আজ এতো বছর, ধীরে-ধীরে কবে সে বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছিলো....আবার পুরানো যুগের সেই মেয়েটি ১৯৩০ সালের কলিকাতায় কোথা হইতে ফিরিয়া আসিলো!

একটি প্রেমের কাহিনী। তবে সে-প্রেমের নায়ক আমি নই, গোড়াতেই কথাটি বলিয়া রাখা ভালো। সব যুগেই মেয়েরা যেমন ভালোবাসে, ভালোবাসিয়া কষ্ট পায়, মুখ বুজিয়া সহ্য করে, তিলে-তিলে নির্বোধের মতো নিজের দেহ ক্ষয় করে দুশ্চিন্তায়, দুর্ভাবনায়....অতো রূপ লইয়াও সুলোচনা সে-দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি পায় নাই—জানিতাম, তাই পরবর্তী সময়ে মেয়েদের যখন ভালো করিয়া জানিয়াছিলাম ও বুঝিয়াছিলাম তখন সেকালের তরুণী প্রেমিকা সুলোচনার জন্য মাঝে-মাঝে মনটা কেমন করিয়া উঠিতো।

যাক, এখন সে-সব কথা। বর্তমানের কথাই আবার বলি।

সুলোচনার মা অত্যন্ত বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছে, আজ দেখিয়াই বুঝিলাম। কিন্তু সুলোচনার মা ভিক্ষা করিতেছে কেন? সুলোচনা কোথায়? কারণ ভিক্ষাই সে করিতেছিলো। থামের পাশে দাঁড়াইয়া রাস্তার লোকের কাছে দুই-একটি পয়সা চাহিতেছিলো, আমি লক্ষ্য করিয়াছি।

আমাকে পূর্ব-পরিচিত বলিয়া বুঝিতে পরিয়া বৃদ্ধা একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলো। তাহার সে ভাবটা কাটাইবার জন্য বলিলাম—'এখানেই কোথাও বাসা বুঝি? দোকানে জিনিস কিনতে এসেছিলেন?—ভালো আছেন?'

—'আর বাবা, ভালো আর মন্দ! তুমিও যেমন!'

কথাটা ভালো লাগিলো না, সুতরাং যে প্রশ্নটি এতক্ষণ করিতে বাধো-বাধো ঠেকিতেছিলো, সেটা করিয়া ফেলিলাম। ভাবিয়া দেখিলাম, সুলোচনার বয়স এখন হিসাব-মতো প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বৎসর—সুতরাং তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচের কারণ কি আছে? সে এখন আর ব্রীড়াবনতা সুন্দরী কিশোরী প্রণয়িনী নহে কাহারও।

—'ইয়ে—গিয়ে—সু—আপনার মেয়ে কোথায়?'

—'তাই তো বলছি বাবা, সে কি আর আছে? সে থাকলে আমার আজ এই...' বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিলো।

আমি এ উত্তরের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। অপ্রতিভের মতো বলিলাম—'ও!....'

দুইজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। পরে আমিই বলিলাম—'আজকাল আছেন কোথায়?'

—'রাস্তায়—গবর্নমেন্টের রাস্তায়।'

সবই বুঝিলাম। বড়ো কষ্ট হইলো এ-কথা বলিলে ঠিক কথা বলা হইবে না। কষ্ট হইলেও বুড়ির জন্য হয় নাই। বুড়িকে কিছু পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া দিবো ভাবিতেছি, এমন সময়ে সে বলিলো—'তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে বড়ো ভালো হলো, বাবা। আমার ঘাড়ে সব ফেলে দিয়ে হতভাগী তো পালালো, এখন তার দু'টি ছেলে, একটির বয়েস যোলো আর একটি চোদ্দ, এদের নিয়ে আমার কি দুর্দশা ভাবো দিকি, এ বয়েসে! একটা ঘরে আছি—এখনই ভাড়া দিতে না পারলে তাড়িয়ে দেবে বলেছে। তাই বলছি, রাস্তা ছাড়া তখন যাবো কোথায়?'

—'সুলোচনা কতদিন মারা গিয়েছে?'

—'এই চোদ্দ বছর। ঐ কোলের ছেলেটা যখন দু'মাসের—সেই থেকে মানুষ করছি।'

আমার হঠাৎ একটি কথা মনে হইলো। সুলোচনাকে আমি জানিতাম বটে, কিন্তু তাহার আসল ইতিহাস আমার কাছে রহস্যাবৃত ছিলো। আমি খানিকটা বুঝিতাম, খানিকটা বুঝিতাম না—তাহার আর একটি কারণ আমার বয়সও তখন কম ছিলো। রূপসী সুলোচনা আমার কাছে চিরদিন

নারীত্বের গহন রহস্যের প্রতীক হইয়া আছে। এই উত্তম সুযোগ। বড়ো কৌতূহল হইলো—সুলোচার মায়ের মুখেই তাহার ইতিহাস সব শুনিবো।

বৃদ্ধাকে বলিলাম—'আপনি শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বসে থাকবেন কাল বিকেল পাঁচটার সময়—আমি আসবো। বাড়ি-ভাড়ার ব্যবস্থা যা হয় করা যাবে।'

বুড়ি ছাড়িলো না, তাহার বাসা দেখিতে হইবে এখনই। অগত্যা যাইতে হইলো। বাসা দেখিয়া মনে হইলো, তেমন ঘরে মানুষ থাকিতে পারে না, গরু থাকিলেও কষ্ট পায়। একতলায় ছোট্ট অন্ধকূপের মতো ঘর, একটি মাত্র দোর, সেটা দিয়া ঢুকিতে হয়—দ্বিতীয় দরজা বা জানালা নাই। এই পচা-ভাদ্রে কি ভীষণ গুমট ঘরের মধ্যে।

সুলোচনার ছেলেরা একটু পরে আসিলো। বড়ো সুন্দর ছেলে দুইটি। সুলোচনার মুখ-চোখ ভুলিয়া গিয়াছিলাম ; ইহাদের—বিশেষ করিয়া ছোটো ছেলেটিকে দেখিয়া আবার সুলোচনাকে স্পষ্ট মনে পড়িলো। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, যাত্রাদলে কৃষ্ণ সাজে একটি, অপরটি গান গায়।

হায়, অভাগী সুলোচনা !···তখনকার কালের শৌখিন মেয়ে, তখনকার কালের আধুনিকা স্মার্ট মেয়ে সুলোচনার মা ও ছেলেদের এ কি গৃহ, এ কি গৃহসজ্জা !···ছেঁড়া চটের বিছানা, চটের মধ্যে বিচুলির কুচি-পোরা বালিশ, ভাঙা কলাই-চটা এক-আধখানা সানকি, একটি মাটির কলসী আর দড়ির আলনায় অতি মলিন খান-দুই-তিন কাপড় ও জামা। একখানা কেওড়া কাঠের হাত-দুই চওড়া তক্তপোষ আছে—ছেলে দুইটি তাতে শোয়, বুড়ি শোয় মেঝেতে। তাও এই ঘরে আশ্রয় মিলিতেছে কই ? এই আস্তাবল হইতেও বাড়িওয়ালা নাকি ইহাদের তাড়াইয়া দিবে বলিতেছে !

এই কাহিনীটি আর বেশিদূর অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইবার পূর্বে সুলোচনা কে ছিলো, তাহার সহিত আমার কিভাবে আলাপ—ইহা বলিবো। নতুবা গল্পের অংশ ভয়ানক খাপছাড়া ঠেকিবে।

২

১৯০৬ সালে দেশের স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাস করিয়া কলিকাতার কলেজে পড়িতে আসিয়াছি। বেচু চাটুজ্যের স্ট্রীটে আমারই স্বগ্রামস্থ এক বন্ধুর

বাবা ছেলেপুলে লইয়া বাসা করিয়া থাকিতেন, সেইখানেই উঠিয়াছি। আমার বন্ধুটির দাদা তখন বি-এ পড়েন এবং তাঁহারই সঙ্গে দেখা করিতে প্রকাশচন্দ্র বসু নামে তাঁহারই এক বন্ধু বাসায় ঘন-ঘন যাতায়াত করিতেন। এই প্রকাশবাবু বড়ো অদ্ভুত ধরনের লোক। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে মনে-প্রাণে যোগ দেওয়ার ফলে পুলিশের হাতে গুরুতর প্রহার খাইয়া নাকি কিছুদিন হাসপাতালে এবং কিছুদিন জেলে ছিলেন। তিনি নিজের হাতে কাহাকেও বোমা মারিয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই—কিন্তু আলিপুর-বোমার মামলার সময় পুলিশ দিন-কয়েক তাঁহার পিছু-পিছু ঘুরিয়াছিলো। খুব বলিষ্ঠ, দীর্ঘ চেহারা, তাঁহার মুখের ভাবে বুদ্ধিমত্তা ও মননশীলতার ছাপ অতি সুস্পষ্ট। প্রেসিডেন্সি কলেজের বি-এ ক্লাসের ছাত্র, ছাত্র হিসাবেও যথেষ্ট মেধাবী।

আমরা প্রকাশদাকে যথেষ্ট খাতির করিয়া চলিতাম। তিনি বাড়িতে আসিলে বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত খুশি হইয়া উঠিতেন। প্রকাশের জন্য এ-খাবার করা, প্রকাশের জন্য ও-খাবার করা; চা কোথায়, চেয়ারের উপর পাতিবার কুশন কোথায়; মিনি তাহার হাতের উলের কাজ দেখাইতে ছুটিতেছে; ডলি পড়া বলিয়া লইবার ছুতা করিয়া প্রকাশদার সঙ্গে দুইটি কথা বলিবার সুযোগ খুঁজিতেছে—প্রকাশদার কাছে যেন বাড়িসুদ্ধ লোকের মন বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিবার অধিকার ছিলো না বাড়িতে, তাহা হইলে সকলেই একসঙ্গে তুমুল প্রতিবাদ তুলিবে!

প্রকাশদার সঙ্গে মাঝে-মাঝে সতীশ রায় বলিয়া তাহার এক বন্ধু আসিতেন, মেডিকেল কলেজের ছাত্র, খুব বড়ো-বড়ো চোখ, শ্যামবর্ণ দোহারা চেহারা। ইহারা সবাই খুব ফুর্তিবাজ আমুদে ধরনের লোক—আসিবার সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ি মাতাইয়া তুলিতেন হাসি গল্পে গানে। মাঝে-মাঝে আবার কয় বন্ধুতে ঘরে খিল দিয়া কিসের পরামর্শ করিতেন—তখনো আমাদের জানালা দিয়া উঁকিঝুঁকি মারাও নিষেধ ছিলো।

কৌতূহল চাপিতে না পারিয়া একদিন বন্ধু শরৎকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'ওরা ঘরে দোর দিয়ে কি করে রে?'

শরৎ চুপিচুপি বলিলো—'কাউকে বলিস নি ভাই, ওরা সব অ্যানার্কিস্ট।'

—'তোর দাদাও?'

—'হ্যাঁ। ওরা দাদাকে দলে নিয়েছে।'

শুনিয়া মনের মধ্যে একটা কৌতূহল ও উত্তেজনা অনুভব করিলাম। অ্যানার্কিস্টদের সঙ্গে এক বাসায় আছি ভাবিয়া ভয়ও হইলো।

এইখানে একদিন প্রথম দেখিলাম সুলোচনার মাকে। নিজের ঘরটিতে বসিয়া পড়িতেছি, একটি প্রৌঢ়া বিধবা ঘরে ঢুকিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলো —'প্রকাশ এখানে কবে এসেছিলো, জানো? আজ আসবার কথা আছে?'

দেখিলাম স্ত্রীলোকটির পরনে শাদা থান, বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের বেশি নহে, গায়ের রং খুব ধপধপে ফরসা, বয়স হইলেও মুখশ্রী ভালো। আমার মুখে প্রকাশবাবুর আসিবার সম্ভাবনা আছে শুনিয়া আমারই ঘরে সে বসিলো। আমায় বলিলো—'তুমি কি করো, ছেলে?'

—'পড়ি, ফার্স্ট ইয়ারে।'

—'এটা তোমাদের বাড়ি?'

—'আমার বন্ধুর বাড়ি, আমি এখানে থাকি। বাড়িতে মেয়েরা আছেন —চলুন না বাড়ির মধ্যে, এখানে কেন বসে থাকবেন?'

এইভাবে সুলোচনার মা'র সঙ্গে বাড়ির মেয়েদের আলাপ হইয়া গেল। সুলোচনার মা কিন্তু প্রকাশদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ছাড়া অন্য কার্যে কখনও আসে না, একদিন আমার এ-কথা মনে হইলো। বাড়ির মধ্যে মেয়েরাও এ-কথা বলিতে শুরু করিলো। স্ত্রীলোকটি যে প্রকাশবাবুর কাছে টাকার জন্য আসে, তাহাও সকলে জানিলো। ক্রমে আমাদের সামনেই সে প্রকাশ-বাবুকে বলিতো—'ও প্রকাশ, বাবা—এ-মাসে আর দশটা টাকা না দিলে মেয়ের বই হবে না। ক্লাসে তাকে বকে, বই না-কিনে ইস্কুলে যাবে কি করে?'

আমার বন্ধুকে একদিন বলিলাম—'ওঁর মেয়ে আছে তা তো এতদিন শুনি নি। ওঁরা প্রকাশদার কেউ হন? প্রকাশদা টাকা দেন কেন, ওঁদের?'

বন্ধু বলিলো—'জানি, ওঁর এক মেয়ে এখানে স্কুলে পড়ে। শুনেছি— মেয়েটি সধবা, কিন্তু তার স্বামীর কাছে থাকে না। মা ও মেয়ে কোথায় যেন বাসা করে থাকে, প্রকাশদা আর সতীশদা দু'জনে খরচ দেন। দাদা এ-সব গল্প সেদিন মা'র কাছে করেছিলো।'

—'তা, প্রকাশদা আর সতীশদা টাকা দেন কেন?'

—'ওঁরা অ্যানার্কিস্ট কিনা, দেশের আর দশের সেবা ওঁদের কাজ, বিশেষ করে প্রকাশদার। দাদা বলে, প্রকাশদা বাড়ি থেকে যে টাকা পান, তার বেশির-ভাগ ওদের দিয়ে দেন, নিজে অনেক সময় টাকা ধার করতে আসেন, দাদার কাছে। ছুটো টিউশনি করেন, সে-টাকাও ওদের দিয়ে দেন।'

আমার ক্রমে মনে হইলো, বুড়ি প্রকাশদার কাছে নানা-রকম ফন্দি ও ছুতায় টাকা আদায় করিতে আসে। আর সব সময়েই মেয়ের অজুহাতে। আজ আমার মেয়ের এ নাই, আজ আমার মেয়ের তা নাই, একটা না একটা ছুতা বুড়ির লাগিয়াই আছে। প্রকাশদাও যেন কল্পতরু, 'না' বলিতে শুনিলাম না কোনদিন। বুড়ির উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলাম। বুড়ি বলিলাম, বটে, কিন্তু সুলোচনার মা সে-যুগে বুড়ি ছিলো না।

কতবার ভাবিতাম, প্রকাশদাকে বলি—উহারা ফাঁকি দিয়া আপনার কাছে টাকা লইতেছে, যা চায় আপনি তা দেন কেন? কিন্তু প্রকাশদাকে শ্রদ্ধা-সম্মান করিতাম, কখনও সাহস করিয়া কথাটা বলিতে পারি নাই।

৩

এখানে একদিন সুলোচনা আসিলো তাহার মায়ের সঙ্গে।

দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। রূপসী বটে। পাড়াগাঁ হইতে কয়েক মাস মাত্র আসিয়াছি, অমন রূপ কখনও দেখি নাই। বছর-ষোলো কি সতেরো বয়স, পিঠে দীর্ঘ কালো চুলের বিনুনি দোলানো, যেমন চোখ তেমন ধপধপে গায়ের রং তেমনই নিটোল স্বাস্থ্য, অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী।

বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে স্বভাবতই তার যথেষ্ট ভাব হইয়া গেল। তার পর সে প্রায়ই আসিতে লাগিলো। বিশেষ করিয়া প্রকাশদার আসিবার সময়টাতেই আসে এবং বেশির-ভাগ কথাবার্তা বলে প্রকাশদার সঙ্গেই। প্রকাশদা উপস্থিত থাকিলে সেই যে তাহার চেয়ারের পিছনটি ধরিয়া দাঁড়ায়, তিনি যতক্ষণ এ-বাড়িতে থাকেন, অন্য কোথাও নড়িতে বড়ো একটা দেখি নাই তাহাকে।

প্রকাশদা উঠিয়া চলিয়া গেলে সুলোচনা আমাদের বড়ো বিরক্ত করিতো। হয়তো বা আমাদের সে মানুষ বলিয়াই মনে করিতো না, কে জানে। টেবিলে

বসিয়া পড়িতেছি, স্থলোচনা হঠাৎ আসিয়া বইখানা টানিয়া লইয়া গেল, হয়তো পিছন হইতে আসিয়া দুই হাত দিয়া চোখ চাপিয়া ধরিলো, নয়তো ভূতের গল্প শুনিবার আবদার ধরিয়া বসিলো। পড়িতে দিবে না কিছুতেই; পড়া থাক, তাহার সঙ্গে ছাদে কে যাইবে? ডলির পুতুলের শুভ-বিবাহ এখনই ছাদে অনুষ্ঠিত হইবে তাহার পুতুলের সহিত—ইত্যাদি। এক-এক দিন এক-এক রকমের ব্যাপার।

কিন্তু প্রকাশদা থাকিলে স্থলোচনা এ-রকম করিতো না। তখন তাহার অন্য মূর্তি। ধীর, স্থির, বেশি হাসিতো না, বেশি বকিতো না, কেমন যেন সলজ্জ, সকুণ্ঠ চোখ-মুখের ভাব, কতদিন দেখিয়াছি।

প্রকাশদা স্থলোচনাকে 'স্থ' বলিয়া ডাকিতেন, তাই আমরাও সবাই তাহকে 'স্থ', বলিতাম। একদিন স্থলোচনা তাহাতে আপত্তি করিলো। শরৎকে বলিলো—'প্রকাশদা যা বলেন, তোমরাও তাই বলবে কেন? ও নামে ডেকো না, কানে ভালো লাগে না।'

বড়ো রাগ হইলো। স্থলোচনার চাল-দেওয়া ধরনের কথাবার্তা আমার সহ্য হইতো না—মনে হইতো, মেয়েটি অত্যন্ত গর্বিতা ও চালবাজ। রাগের ঝোঁকে বলিলাম—'তাহলে তুমিও আমাদের সঙ্গে আর মিশতে এসো না।'

স্থলোচনার সহিত আমাদের এ ধরনের খুঁটিনাটি ঝগড়া প্রায়ই চলিতো। তবে সে যে সব-সময়ে আমাদের বাসায় আসিতো এমন নহে বড়ো-জোর মাসের মধ্যে দশ-বারোদিন আসিতো, তাহার বেশি নহে। প্রকাশদা এখানে যে-যে দিন আসিবেন, এমন-দিন ছাড়া স্থলোচনার এখানে আসা কেহ কল্পনাও করিতে পারিতো না।

আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিতাম। সতীশদার প্রতি স্থলোচনা যেন তেমন সন্তুষ্ট নহে, অথচ সতীশদা স্থলোচনা বলিতে অজ্ঞান ছিলেন। আমার বন্ধু শরৎ বলিতো, স্থলোচনাদের কলিকাতার বাসা-ভাড়া ও সমস্ত খরচ নাকি সতীশদা দিতেন। কিন্তু স্থলোচনা সতীশদাকে কেন যে দেখিতে পারিতো না তাহা কি করিয়া বলিবো?

একদিনের কথা বলি। সেদিন সতীশদা আসিবার কিছু পরে স্থলোচনা

তাহার মায়ের সঙ্গে আসিয়া হাজির। সুলোচনার মা বলিলো—'সতীশ, আমাকে দক্ষিণেশ্বর ঘুরিয়ে আনবে, বাবা ?'

সুলোচনাও বলিলো—'হ্যাঁ মামা, (সতীশবাবুকে সুলোচনা মামা বলিয়াই ডাকিতো), চলো আমিও যাবো।'

সতীশদা হাতে যেন স্বর্গ পাইয়াছেন, তাঁহার চোখ মুখের খুশির ভাব দেখিয়া তাহাই মনে হইলো। উৎসাহের সহিত বলিলেন—'হ্যাঁ হ্যাঁ। বরং চলো দক্ষিণেশ্বর থেকে আমরা বরানগরে স্বামী অবধূতানন্দের আশ্রম দেখে আসবো—সেও বড়ো চমৎকার জায়গা, একেবারে গঙ্গার ধারে।'

সুলোচনার মা বলিলেন—'তাহলে অমনি পেনেটির দ্বাদশ-শিবের মন্দিরও দেখে আসি চলো না ?'

সুলোচনাও বলিলো—'বড্ড মজা হয়, মামা। একখানা গাড়ি ডাকো।'

সতীশদা গাড়ি ডাকিতে গিয়াছেন, এমন সময় প্রকাশদা আসিয়া পড়িলেন। সুলোচনা তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করিলো তাহাদের সঙ্গে যাইবার জন্য। তিনি কেন যাইতে চাহিলেন না—তাহা আমি জানি না, সঙ্গে-সঙ্গে সুলোচনাও তাহার মাকে জানাইলো সে কোথাও যাইবে না, মায়ের ইচ্ছা থাকিলে তিনি একাই যাইতে পারেন।

সতীশদা ইতিমধ্যে গাড়ি আনিয়া উপস্থিত করিলেন, কিন্তু ঘটনার নূতন পরিস্থিতি দেখিয়া বড়ো নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। প্রকাশদাও সুলোচনাকে যাইবার জন্য যথেষ্ট বলিলেন, এমন কি শেষে রাগও করিলেন, সুলোচনা কিন্তু কিছুতেই গেল না। অবশেষে বেচারী সতীশদাকে শুধু সুলোচনার মাকে লইয়াই যাইতে হইলো। অবশ্য আমার বন্ধুর বাড়ির মেয়েরা কেউ-কেউ সঙ্গে গেলেন—এতগুলি মেয়ে গেল, তবুও সুলোচনা এক পাও নড়িতে চাহিলো না।

বছর-দুই এইভাবে নানা সুখ-দুঃখের ঘটনার মধ্য দিয়া কাটিয়া পরে ১৯০৮ সালে আমাদের বাসা উঠিয়া গেল। আমি কলেজের হোস্টেলে আশ্রয় লইলাম। সুলোচনাদের সহিত সম্পর্ক ঘুচিয়া গেল। আমার ছাত্র-জীবনের বাকি বৎসরগুলির মধ্যে সুলোচনা বা তাহার মায়ের সঙ্গে চোখের দেখাও নাই একদিনের জন্য। সতীশদাকেও আর কখনও দেখি নাই। ইহাদের না

সুলোচনা

দেখিবার কারণও যথেষ্ট ছিলো, পুলিশের চাপেই বাসা উঠাইতে হইয়াছিলো।

তবে প্রকাশদার সম্বন্ধে বিশেষ ঘটনা এই যে, আমার ছাত্র-জীনের তৃতীয় বৎসরে প্রকাশদা অদ্ভুতভাবে নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। আর কেহ কোনদিন তাঁহাকে দেখে নাই; পূর্ববঙ্গের কোথাও স্বদেশী ডাকাতি করিতে গিয়া পুলিশের গুলিতে মারা পড়িয়াছেন, কয়েক বছর পরে বিশ্বস্তসূত্রে এ-কথা শুনিয়াছিলাম।

বৎসর পাঁচ-ছয় পরের কথা। কলেজ হইতে বাহির হইয়া কলিকাতার বাহিরে চাকুরি করি। কি একটা ছুটি উপলক্ষে হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়া শেয়ালদ' দিয়া বাড়ি ফিরিতেছি। তখনকার আমলে শেয়ালদ' নর্থ ষ্টেশন হয় নাই—যেখানে আজকাল নর্থ ষ্টেশনের সম্মুখে ভাড়াটে গাড়ির আড্ডা, ওখানে অনেক চা পান শরবৎ ইত্যাদির দোকান ছিলো। একটি দোকানে শরবৎ খাইতে গিয়াছি, দেখিলাম একটি ছোকরা এবং তাহার সহিত একটি সুবেশা রূপসী তরুণী সেখানে দাঁড়াইয়া ভাঁড়ে করিয়া শরবৎ খাইতেছে। মেয়েটির দিকে চাহিয়া দেখিলাম—বয়স বৎসর বাইশ-তেইশ হইবে—চোখ ফিরানো যায় না, তাহার দিক হইতে। না, অপূর্ব রূপসী বটে মেয়েটি! ···আমিই শুধু চাহিয়া নাই, আশপাশের অনেকেরই দেখিলাম আমার দশা।

হঠাৎ আমাকে ভীষণ চমকিত ও আশ্চর্য করিয়া দিয়া তরুণী আমার একেবারে সামনে আসিয়া হাসি-মুখে বলিলো—'আরে, যদু-দা যে!'

বলিয়াই সে আমার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিলো। চিনিতে অবশ্য বিলম্ব হইলো না, বলিলাম—'সুলোচনা যে! কোথা থেকে? তোমার মা কোথায়? কি করছো, এখন?'

সুলোচনা এ-সব কথার কোনো উত্তর না দিয়া সর্বপ্রথম আমায় প্রশ্ন করিলো—প্রকাশদার কোনো খবর পেয়েছো?'

প্রকাশদার মৃত্যু-সংবাদ আমি শুনিয়াছি, কিন্তু সে-কথা বলিলাম না।

সুলোচনা আমায় ছাড়িতে চাহে না, তখনকার পরিচিতদের মধ্যে এ কেমন আছে, ও কেমন আছে, বন্ধু শরৎ এখন কোথায়, তাহার দাদা বিনোদ

কি করে, তাহাদের বিবাহ হইয়াছে কিনা—নানা রকম মেয়েলি প্রশ্ন। আমার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিলো—'অনেকদিন পরে দেখা, খাওয়াও দেখি, চলো তো, রায়মশায়ের হোটেলে!'

সেই পুরানো দিনের মতই নিঃসংকোচ ব্যবহার সুলোচনার; মেয়েমানুষ হইয়াও ছেলের মতো ব্যবহার, ধরন-ধারন, সবই সেই এক-রকম বজায় আছে, অবিকল। তবে তাহার পরনে চওড়া জরি-পাড় ফিকে নীল-শাড়ি ও ব্লাউজের বাহার, গলায় চিকচিকে সরু চেন ও পেনডেন্ট, পায়ে রুপালি ব্রোকেডের জুতা, সুগঠিত পেলব সুগৌর হাতে সোনার চুড়ির সঙ্গে সরু ফিতা বাঁধা হাত-ঘড়ি প্রভৃতি দেখিয়া মনে হইলো সুলোচনার অবস্থা ফিরিয়াছে। সুলোচনার শৌখিনতার প্রতি স্নেহ হইলো—এমন সুন্দরী মেয়েরা বেশভূষা না-করিবে, সেন্ট-পাউডার না মাখিবে—তবে সে-সব সৃষ্টি হইয়াছে কাহাদের জন্য? সুলোচনার অঙ্গে পোশাক অলঙ্কার উঠিয়া নিজেরাই ধন্য হইয়া যায় নাই কি?

আমি বলিলাম—'আরে, ছাড়ো-ছাড়ো, হাত ধরে ও-রকম টানাটানি করো না—রায়মশায় কেন, চলো ট্রামে চেপে ন্যাশনাল হোটেলে যাই, কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে।' কিন্তু সঙ্গের ছোকরাটি বাদ সাধিলো, নতুবা সুলোচনাকে লইয়া যাওয়া কষ্টকর হইতো না।

ছেলেটি ঘড়ি দেখিয়া বলিয়া বসিলো—'ট্রেনের দেরি নেই, কোথায় যাবে এখন, বৌদি? এসো, চলো—বাঃ—!'

এমন কি, মনে হইলো যে, ছোকরা যেন সুলোচনার উপর জোর খাটাইতেছে। রাগ হইলো—কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছো বাপু! সুলোচনাকে আমরা ছেলেবেলা হইতে জানি, তুমি তখন জন্মাও নাই। আজ আসিয়াছো আমাদের সামনে সুলোচনাকে ঘড়ি দেখিয়া টাইম বলিয়া দিতে! সুলোচনা যে খুব ভালো মেয়ে নহে, এ ধারণা আমার পূর্ব হইতেই ছিলো, এখন সে-ধারণা আরও বদ্ধমূল হইলো। বেচারী প্রকাশদা! মেয়েদের ভালোবাসার এই তো মূল্য। অন্তত সুলোচনার মতো মেয়েদের। মনটা অশ্রদ্ধায় পূর্ণ হইয়া গেল। সুলোচনাকে লইয়া ছোকরা ষ্টেশনের দিকে চলিয়া গেল।

সুলোচনা যাইতে-যাইতে আমার দিকে ফিরিয়া বলিলো—'দমদমায় বাসা

আজকাল। যেয়ো একদিন—মা আছেন বাসায়। বিস্কুটের কারখানার পেছনে, নরেশ পালের বাগানবাড়ি—'

বলা বাহুল্য, দমদমার নরেশ পালের বাগান-বাড়ি খুঁজিয়া সেখানে যাইবার সুবিধা ও সময় আমার হইয়া উঠে নাই।

বছর-খানেক পরে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব বৎসর ১৯১৩ সালে আমি সন্ধ্যার দিকে এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে ট্রাম ধরিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় একখানি ট্রাম আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলো। হঠাৎ দেখিলাম, প্রথম শ্রেণীর কামরায় একখানি বেঞ্চিতে সুলোচনা একা বসিয়া আছে। আমি বিন্দুমাত্র না ভাবিয়া তখনই ট্রামখানিতে উঠিয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িলাম। সুলোচনা প্রথমটা চমকিয়া উঠিয়াছিলো, পরে আমাকে দেখিয়া ও চিনিতে পারিয়া ভারি খুশি হইয়া উঠিলো। বলিলো—'উঃ, যা ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলে! আমি বলি, কে এসে ঝুপ করে বসে পড়লো রে বাবা!—ভালো? কতদিন দেখা হয় নি—সেই শেয়ালদ' ষ্টেশনে, সেবার—দাঁড়াও, প্রণামটা করি।'

কথাবার্তা বলিতে-বলিতে চাঁদনির মোড়ে ট্রাম আসিলো। সুলোচনা বলিলো—'নামো এখানে, যদু-দা, কুরুশ-কাঁটা কিনবো আর ছেলেটার জন্যে কিনবো হর্লিক্স।'

আমি উহার মুখের দিকে আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া আছি দেখিয়া সুলোচনা সলজ্জমুখে বলিলো—'আজকাল আমার স্বামী এসেছেন যে, আজ প্রায় বছরখানেক। এখন যে রোজগার করছি দু'পয়সা, আসবে বৈকি, এতদিন কেউ খোঁজও নেয় নি।'

—'আজকাল কি করো?'

—'বা রে, আজকাল তো ক্যাম্বেলে নার্সগিরি করি। এতদিন নার্সদের হোস্টেলে ছিলাম—এখন স্বামী ফিরে আসাতে বাসা করেছি দমদমাতে। সেই আর বছর যখন তোমার সঙ্গে দেখা, তখন থেকে দমদমায় বাসা। এসো না আজ, চলো—আমার খোকাকে দেখে আসবে এখন—'

—'না, আজ থাক, আর একদিন হবে। চলো—চা খাবে, স্থলোচনা ?'

—'শোনো বলি। তুমি হলে গিয়ে খোকার মামা, শুধু হাতে যেন যেয়ো না। ওকে একটা হার কিনে দাও না ?'

বড়ো রাগ হইলো। দম দিয়া টাকা আদায় করিয়া লইতে স্থলোচনা মায়ের মতই পটু হইয়া উঠিয়াছে! আপন মামা হইলেও আজকালকার বাজারে শুধু টাকা দিয়া মুখ-দেখা সারে, আর আমি কোথাকার কে, হার কেন দিতে যাইবো ? বলিলাম—'এখন যাবো না, বড়ো ব্যস্ত আছি।'

ট্রাম হইতে নামিয়া আমরা একটা গ্যাসপোস্টের তলায় দাঁড়াইয়াছি, গ্যাসের আলোয় স্থলোচনাকে দেখিয়া সত্যই মুগ্ধ হইয়া গেলাম। এ-রকম রূপসী মেয়েকে লইয়া কোনো চায়ের দোকানে ঢুকিতে সঙ্কোচ মনে হয়—বিশেষত মনে রাখিবেন, ১৯১৩ সালের কলিকাতা, তখনকার দিনে মেয়েরা পথেঘাটে খুব কমই বাহির হইতো। হইলও তাহাই, চায়ের দোকানসুদ্ধ লোক হাঁ করিয়া একদৃষ্টে স্থলোচনার দিকে চাহিয়া রহিলো। তাহার উপর স্থলোচনার মুখে খই ফুটিতেছে কথার। সে চুপ করিয়া থাকিতে জানে না, আমি বড়ো অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম।

আমায় বলিলো—'যাবে না বই কি, ইঃ! ভাগ্‌নের মুখ দেখো নি, কিছু দেবার ভয়ে বোনের বাড়ি যাবে না—লজ্জা করে না বলতে ? যেতেই হবে, আমি নেমন্তন্ন করছি, সামনের শনিবার যাবে, ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো তোমার।'

ইহার সব ব্যাপারই রহস্যাবৃত ; কোথায় এতদিন ইহার স্বামী ছিলো, কোথা হইতে বা আবার আসিলো, এ-সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইলেও চাপিয়া গেলাম। তবে স্থলোচনা যে কখনও মিথ্যা বলে না, তাহা আমি জানিতাম। পূর্বেও দেখিয়াছি এমন সব অবস্থায় সত্য কথা বলিতো, যেখানে সত্য বলিলে তাহার নিজেরই ক্ষতির সম্ভাবনা। কাজেই স্থলোচনার কথায় আমার অবিশ্বাস হয় নাই।

চা খাওয়া ও উল-বোনার কাঁটা কেনার পরে আমি তাহাকে গাড়িতে উঠাইয়া দিতে আসিলাম। গাড়ির কামরায় বসিয়া সে তাহার পাশের বেঞ্চিতে হাত চাপড়াইয়া বলিলো—'এসো, বসো যতু-দা!'

বলিলাম—'আজ নয়, সুলোচনা—মাপ করো। কাজ আছে।'

সুলোচনা অভিমানের স্বরে বলিলো—'না, থাক কাজ। এসো—আসতেই হবে। কতো কথা আছে তোমার সঙ্গে—রাস্তায় দেখা, কি কথাই বা হলো! পুরোনো দিনের কথা আর কার সঙ্গে কইবো?'

পরে হঠাৎ আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিলো—'আচ্ছা, প্রকাশদার আর কোনও খবর পাওনি?'

বলিলাম—'নাঃ, কই আর পেলাম। মনে-মনে ভাবিলাম—সে-কথা জেনে তোমার লাভই বা কি এখন।'

—'বেঁচে নিশ্চয়ই আছেন, তবে পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে আছেন বলে মনে হয়। তাঁর কথা যে কইবো, এমন আর লোক কই—এক তুমি ছাড়া?'

—'কেন, সতীশদা কোথায়?'

—'মামা? মামা বিয়ে-থা করে দেশে দিব্যি সংসারী হয়ে বসেছে। তার মতো মানুষে আর এর বেশি কি করবে। প্রকাশদার মতো কি সবাই?'

গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা দিলো। সুলোচনা বিস্ময়ের সুরে বলিলো—'সত্যি, আসবে না নাকি, যদু-দা? এসো, বসো।'

বলিয়া আমার হাত ধরিতে গেল।

কিন্তু আমার যাওয়া হইলো না। যাইবার প্রবৃত্তি হইলো না। তাহা ছাড়া সেই রাত্রেই আমাকে কর্মস্থানে ফিরিতে হইবে—সুলোচনার সঙ্গে গেলে ট্রেন ফেল হয়। চাকুরি বজায় রাখিয়া তবে অন্য কথা।

তখন কি জানি, সুলোচনার সহিত এই শেষ দেখা!

সতেরো-আঠারো বৎসর পূর্বের কথা এ-সব।

৪

সুলোচনার মা পার্কে আসিলো।

তাহাকে বাড়ি ভাড়ার টাকা মিটাইয়া দিয়া বলিলাম—'এখন বলুন তো, আমি অনেক কথাই জানতাম না আপনাদের সম্বন্ধে। যা জানি ভাসা-ভাসাভাবে জানি। সবটা বলুন।'

বেলা পড়িয়া আসিয়াছিলো। পার্কে ছেলে-মেয়েরা দোলনায় দুলিতেছে, চেঁচামেচি করিতেছে, ঘুগনি চানাচুর কিনিতেছে।

সুলোচনার মায়ের নিকট হইতে নানারূপ জেরা করিয়া যে তথ্যটি উদ্ধার করিয়াছিলাম সেদিন, তাহা যেমন করুণ, জীবনের গভীর অনুভূতির দিক হইতেও তেমনই অপূর্ব। কিন্তু তাহা বৃদ্ধার কথায় বলিলে ঠিকমতো বলা হইবে না। তাই নিজে খানিকটা গুছাইয়া বলিবার চেষ্টা করিলাম।—

সুলোচনার মা অল্প বয়সে মেয়েটিকে লইয়া বিধবা হন।

এদের বাড়ি বর্ধমান জেলায়। সুলোচনার যখন আট বৎসর বয়স, তখন বিবাহ হয় পাশের গ্রামে। স্বামীর বয়স তখন ত্রিশ-বত্রিশ, স্বামীর চেহারা ভালো ছিলো না বলিয়া ছেলেমানুষ মেয়ে তাহার কাছে বড়ো একটা যাইতে চাহিতো না। স্বামী ছিলো মূর্খ ও গোঁয়ার প্রকৃতির লোক, আট বৎসরের স্ত্রীর উপর মারধর ও নানা-রকম অত্যাচার শুরু করে। ফলে ওর মা দেশে জায়গা জমি বিক্রয় করিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া কলিকাতায় আসিলো—তখন সুলোচনার বয়স দশ বৎসর। উদ্দেশ্য, মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইয়া স্বাধীনভাবে থাকিবার কোনো সুবিধা করিয়া দিবে।

কিন্তু তখনকার কালে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা বা স্বাধীন জীবিকা উপার্জন প্রভৃতিকে লোকে ভালো চোখে দেখিতো না। মা মেয়ের হাত ধরিয়া নানা জায়গায় বেড়াইলো। হাতের পয়সা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইয়া গেল—কিন্তু বিশেষ কোনো সুবিধা হইলো না। এদিকে আরও নূতন উপসর্গ, মেয়ে অপূর্ব রূপসী, দশ বৎসরের হইলে কি হয়, তাহাকে দেখায় তেরো-চৌদ্দ বৎসরের মতো—দুষ্ট লোকেব চোখ পড়িলো মেয়ের উপর।

একদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরিয়া মা মেয়েকে বলিলো—'চল্, আজ ডুবে মরবো দু'জনে—এখানে আর কোনও সুবিধে নেই—এবার মান যাবে। গরিবের কেউ নেই।'

মেয়ে তৎক্ষণাৎ রাজি হইলো!

রাত ন'টার সময় মেয়ে বলিলো—'কখন আমরা ডুববো, মা? অন্নপূর্ণার ঘাটে যাই, চলো।'

মা বলিলো—'এখনও সব ঘাটে লোক।' এখন না, দেরি কর্—'

রাত দশটার সময় মা মেয়ের হাত ধরিয়া বাগবাজারের অন্নপূর্ণার ঘাটে সিঁড়ি দিয়া নামিতে-নামিতে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিতেছে—'হ্যাঁ রে, পারবি তো? বল্ আগে থেকে, পারবি তো?'

মেয়ে এতটুকু ভয় খায় নাই। সে দৃঢ়কণ্ঠে বলিলো—'তুমি সঙ্গে থাকলে মা, ঠিক পারবো।'

সেই সময় যামিনী ঘোষ বলিয়া একটি ছোকরা, আপিসের কেরানী, ঘাটের কাছেই কোথাও বসিয়া হাওয়া খাইতেছিলো। সে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলো—'আপনারা এতো রাত্রে এখানে কেন? আর ব্যাপারই বা কি? কি বলাবলি করছেন আপনারা? বাসা কোথায় আপনাদের?'

যামিনী ঘোষের প্রশ্নে বালিকা থতমতো খাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলো। মা সব বলাতে সে-রাত্রে যামিনী মা ও মেয়েকে নিজের বাসার লইয়া গেল।

দিন-পনেরো কাটিলো মন্দ নয়। যামিনী ছেলেটি খুব ভালো, কিন্তু ইহার এক বন্ধু সম্ভবত যামিনীর মুখে ইহাদের ইতিহাস শুনিয়া একবার দেখিতে আসিলো। সেই যে আসা শুরু করিলো, আর সে বাড়ি ছাড়িতে চাহে না। তাহার আসা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়াইয়া গেল। সুলোচনাও সকলের সামনে চিরকাল বাহির হয়, তখন তো আরও ছেলেমানুষ।

ছোকরা মাথার পিছন দিকে চুল ফিরাইতো বলিয়া সুলোচনা আড়ালে মা'র কাছে তাহার নাম রাখিয়াছিলো—কাকাতুয়া। একদিন মেয়ে মাকে বলিলো—'মা, কাকাতুয়া ভারী দুষ্টু। আমাকে গয়নার বাক্স দেখিয়ে বলে কিনা—আমার সঙ্গে যাবি? তোকে এই সব গয়না দেবো—আমি ওর সামনে আর বেরোবো না।'

মা বলিলো—'হতচ্ছাড়া মেয়ে, তুই বা যাস কেন সকলের সামনে? বাড়ির মধ্যে থাকবি, যার-তার সামনে বেরোনো, গল্প করা কি ভালো? আমরা গরিব লোক, আমাদের কতো বিপদ জানিস?'

যামিনীর আর এক বন্ধু ছিলো, সতীশ রায়। সতীশ মা ও মেয়ের দুঃখ শুনিয়া তাহাদের নিজের বাসায় লইয়া আশ্রয় দিলো বটে কিন্তু দিন-কয়েক পরে সেখানেও গোলযোগ বাধিলো। সতীশ সুলোচনাকে দেখিয়া পাগল হইলো। এমন কি, সতীশের মা সুলোচনা বিবাহিতা জানিয়াও ছেলের

সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন ; সুলোচনার মায়েরও অনিচ্ছা ছিলো না, কিন্তু সুলোচনা একেবারে বাঁকিয়া বসিলো। মাকে বলিলো—'মেয়েমানুষের ক'বার বিয়ে হয় ? তোমাদের সব মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে —আমায় আর লেখাপড়া শেখাতে হবে না তোমায়—তুমি আমাকে আমার শ্বশুর-বাড়ি রেখে এসো, সেখানে বাঁচি আর মরি। ঢের হয়েছে।'

এখানে এই সময় একদিন আসিলেন প্রকাশদা।

প্রকাশদা সতীশের বন্ধু এবং ছাত্রমহলে নাম-করা স্বদেশী। অ্যানার্কিস্ট বলিয়া খ্যাতিও তাঁহার যথেষ্ট রটিয়াছে তখন পুলিশের কৃপায়। প্রকাশদা সুলোচনার ইতিহাস সব শুনিলেন এবং প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টায় সুলোচনা বেথুন স্কুলে ভর্তি হইলো। প্রকাশদা মাঝে-মাঝে তাহার পড়াশুনার তত্ত্বাবধান করিতে আসিতেন।

এদিকে সতীশ বড়ো বিরক্ত করিয়া তুলিলো। একই বাড়িতে থাকা, সর্বদা দেখা-সাক্ষাৎ, সামনে না আসিয়া উপায় নাই। নানা-রকম দামী জিনিসপত্র কিনিয়া দিতে আরম্ভ করিলো—সেন্ট, সাবান, কাপড়-জামা ইত্যাদি। সুলোচনা বলিতো—'মামা, এ-সব কেন দিস ? তুই বড়ো স্বার্থপর। এ-সব আমি নেবো না।'

মাকে বলিতো—'মা, অনেক মানুষ দেখলাম এ বয়েসে, প্রকাশদার মতো মানুষ এ পর্যন্ত আর দেখিনি। অন্য ধাতের একেবারে। উনি মানুষ না দেবতা, তাই ভাবি।'

সতীশ দিতো দামী-দামী কাপড়, একবার পূজায় একখানা ভালো বেনারসী শাড়ি দিলো। প্রকাশদা দিলেন একজোড়া মোটা স্বদেশী তাঁতের শাড়ি। সুলোচনার কি আহ্লাদ প্রকাশদার দেওয়া সেই মোটা শাড়ি পরিয়া! সতীশের দেওয়া ভালো শাড়ি সে কদাচিৎ ব্যবহার করিতো, কিন্তু মোটা তাঁতের শাড়ি পরিয়া রোজ স্কুলে যাইতো।

একদিন প্রকাশদাকে সুলোচনা সতীশের ব্যবহার সব খুলিয়া বলিলো। প্রকাশদা বলিলেন—'এখানে তোমাদের আর থাকা উচিত নয়। তোমার লেখাপড়া এখানে থাকলে কিছু হবে না ; অন্য জায়গায় বাসা করো, খরচ যা হয় আমি তার ব্যবস্থা করবো।'

স্থলোচনার এক দূর-সম্পর্কের ভগ্নীপতি কনাই ধরের গলিতে সস্ত্রীক বাসা, করিয়া থাকিতো। স্থলোচনারা সেই বাসায় উঠিয়া আসিলো। আসিবার সময় স্থলোচনা প্রকাশদার দেওয়া মোটা-শাড়ি পরিয়া, সতীশের দেওয়া দামী কাপড়-জামা সেখানেই রাখিয়া আসিলো। সতীশ এই ব্যাপারে দিন-কয়েক নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বিবেচনা করিয়া প্রকাশদার সঙ্গে পর্যন্ত দেখা-সাক্ষাৎ ছাড়িয়া দিলো। মা মেয়েকে বলিলো—'কেন সতীশকে অমন করে চটিয়ে দিলি? ওর মনে কষ্ট দেওয়া হলো না?'

স্থলোচনা বলিলো—'কষ্ট না-পেলে মামার জ্ঞান হবে না, মা। তাছাড়া দেখছো না, আমাদের জন্যে ও সর্বস্বান্ত হতে বসেছিলো, ওর দেওয়া জিনিস আর নেবো না।'

তা সত্ত্বেও সতীশ ওদের নূতন বাসায় যাতায়াত করিতো, জিনিসপত্রও দিতে ছাড়িতো না। স্থলোচনা বলিতো—'মামা, আবার কেন আসিস? তুই বড়ো স্বার্থপর—স্বার্থের জন্যে সব করিস বলে আমার ভালো লাগে না। দেখ্ দিকি প্রকাশদাকে?'

একদিন সতীশ বলিলো—'আচ্ছা, আমি কি করলে তুই খুশি হবি, স্থলোচনা? বল্, আমি তাই করবো।'

স্থলোচনা বলিলো—'তুই বিয়ে কর্, মামা। খুব খুশি হবো তাহলে। আমায় যদি সন্তুষ্ট করবার তোর ইচ্ছে থাকে, খুব শিগগির একটা ভালো মেয়ে দেখে বিয়ে করে ফেল্।'

নূতন বাসায় প্রকাশদা কিন্তু বেশি আসিতেন না এবং আসিতেন না বলিয়াই আমাদের বাসায় যেদিন প্রকাশদার আসিবার কথা থাকিতো, সেদিন স্থলোচনা এখানেই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতো।

এই সময় আলিপুর-বোমার মামলা আরম্ভ হইয়াছিলো। কেমন করিয়া যে প্রকাশদা এই মামলার মধ্যে জড়াইয়া পড়েন, সে-কথা স্থলোচনার মা আমায় বলিতে পারে নাই। প্রকাশদা দীর্ঘদিন অনুপস্থিত রহিলেন। এই অনুপস্থিতির জন্য স্থলোচনা বড়ো ব্যস্ত হইয়া ছটফট্ করিতো বলিয়া তাহার মা একদিন কলেজে খোঁজ করিতে গিয়া জানিলো, কলেজেও প্রকাশদা বহুদিন যাবৎ অনুপস্থিত।

ছয়মাস পরে প্রকাশদা হঠাৎ একদিন এক হাঁড়ি রসগোল্লা লইয়া সুলোচনাদের বাসায় হাজির। সুলোচনা তো খবর পাইয়াই ছুটিতে-ছুটিতে বাহিরের ঘরে আসিলো। বলিলো—'কোথায় ছিলে প্রকাশদা, এতদিন? চেহারা এমন হয়েছে কেন, তোমার?'

প্রকাশদা বলিলেন—'সে-কথা জিগ্যেস করিস নে, সু। তাছাড়া, এই বোধহয় শেষ দেখা। আমি স্বদেশীর আসামী, পুলিশ আমার পেছনে-পেছনে ঘুরছে—আর আসতে হয়তো পারবো না। যাবার সময় একটা কথা জিগ্যেস করে যাই—হয়তো আর দেখাই হবে না—সু, তুই আমায় কখনও ঘৃণা করবি নে, বল্?'

সুলোচনা বলিলো—'তোমাকে অনেক ভালোবাসি, প্রকাশদা। যদি স্বামী না থাকতো, তবে তোমার আরও নিকটে আসতুম। পা ছুঁয়ে বলছি —তা না-হলে তোমার এই বিপদের সময়ে তোমার সঙ্গে চলে যেতুম—একলা যেতে দিতুম না—' বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিলো।

সুলোচনার মা আমায় বলিলো—'মেয়ে আমার কখনও কাঁদতো না। অনেকদিন পরে এই আবার কাঁদলো। যাবার সময় সুলোচনা প্রকাশকে কড়ার করিয়ে নিলো, বিপদ উদ্ধার হলেই আবার ফিরে এসে সকলের আগে ওর সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু প্রকাশ সেই যে গেলো, আর কখনও ফিরে আসেনি, আর ফিরবেও না।'

আমি বলিলাম—'তারপর? আপনাদের কি হলো?'

—'তারপর প্রকাশ তো চলে গেল। শোনো সব কথা, বিশ্বাস করবে না, হয়তো। এই কলকাতা শহরে সেই পোড়ারমুখী মেয়ের আগুনের মতো রূপ নিয়ে সে কি কষ্ট, কি বিপদ গেছে আমাদের! দেখেছিলে তো তাকে, মনে রয়েছে তো তোমার?'

দেখিয়াছিলাম বই কি। আবার এই প্রায় কুড়ি-বাইশ বৎসর পরে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অপরাহ্ণের মৃদু স্তিমিত রৌদ্রালোকে সুলোচনার সেই অপূর্ব-সুন্দর কিশোরী-মূর্তি স্পষ্ট মনের চোখে ফুটিয়া উঠিলো। তাহার সেই ডাগর-ডাগর চোখ, ঘন কালো চুলের রাশি…কথার সেই ভঙ্গি….চমৎকার মুখের হাসি…সর্বোপরি তার অনিন্দ্য মুখশ্রী….

তখনো স্থলোচনাকে বুঝি নাই, চিনি নাই—অভিজ্ঞতার অভাবের দরুণ স্থলোচনাকে সে সময় চরিত্রহীনা ভাবিয়াছি। শুধু আমি নই, আমার বন্ধুর বাসায় মেয়েরা স্থলোচনা সম্বন্ধে এই মন্তব্যই হৃদয়ঙ্গম করিতো। আমিও বিশ্বাস করিতাম। মনে-মমে পরলোকবাসিনীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম।

স্থলোচনার মা বলিলো—'মেয়ে রোজ কাঁদে, প্রকাশ চলে যাওয়ার পরে। জানলা খুলে চেয়ে থাকে। সতীশকে ছ'চোখে দেখতে পারে না। এদিকে যে বাসায় আমরা ছিলাম, ঠিকমতো টাকা দিতে না পারাতে তারা আমাদের রাখতে চাইলো না। কালীঘাটে আমরা উঠে গিয়ে ছোট্ট একটা খোলার ঘরে আশ্রয় নিলাম। একদিন সেখানে এলো কোথাকার রাজার ম্যানেজার—দশ হাজার টাকার লোভ দেখালো। মেয়ের গা সোনায় মুড়ে দেবে। মেয়ে বললো—মা, চুলগুলো কেটে ফেলি, নয়তো আর পারিনে। আমি বাড়ি নেই, গুণ্ডার দল বাড়ি ঘিরে ফেলেছে—বললে বিশ্বাস করবে না—এই কালী-ঘাটে, ইংরেজ-রাজত্বের মধ্যে! মেয়ে মাথায় কেরোসিন তেল ঢেলেছে চুলে —আগুন জ্বেলে মরবে। এমন সময় আমি গিয়ে পড়লাম—লোক ডাকাডাকি করলাম, গুণ্ডার দল পালালো।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'সতীশদা যেতো না, বাসায়?'

—'যেতো, টাকা দিয়ে আসতো আমার হাতে মেয়েকে লুকিয়ে। মেয়েও বড্ড নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে সতীশের সঙ্গে। একটা মুখের ভালো কথাও ইদানীং বলতো না। আগে-আগে ওর চিঠি এক-আধখানার উত্তর দিতো—শেষে তাও বন্ধ করে দিলো। আমায় বলতো—না মা, ওকে আসতে দিয়ো না। ও যে সর্বস্বান্ত হলো—আমাদের দিয়ে। কুকুরের মতো আমরা ওর টাকা খাচ্ছি কেন? ও বিয়ে-থাও করবে না, আমাদের না ছাড়লে।

—'এই সময় পাড়ার এক সহৃদয় প্রৌঢ় ডাক্তার নিজে চেষ্টা করে স্থলোচনাকে মেডিকেল কলেজে নার্সের কাজ শেখবার জন্যে ভর্তি করে দিলেন—পাশ করে প্রথমত সেই ডাক্তারের ডাক্তারখানাতেই কাজ পায় স্থলোচনা। কিছুদিন সেখানে কাজ করবার পরে একদিন এসে বললো—মা, এ জগতে সব সমান। ওখানে আর কাজ করা চলবে না আমার। ছেড়ে দিয়ে এলুম।'

মাস-দুই পরে ক্যাম্বেল হাসপাতালে কাজ জুটিলো। তখনো উহাদের পটলডাঙায় বাসা। মা ক্যাম্বেলের গেট থেকে রোজ রাত এগারোটার সময় মেয়েকে বাসায় আনে সঙ্গে করিয়া। তাহার মধ্যেও বহু বিপদ গেল। ক্যাম্বেলের নার্স সুলোচনার রূপের খ্যাতি তখনো চারিদিকে ছড়াইয়াছে, ছাত্রমণ্ডলীর অনেকের বাসন্তী-প্রেমের স্বপ্ন সে—কতো প্রলোভন তাহাকে যে প্রতিদিন এড়াইয়া চলিতে হইতো! গুণ্ডার হাতে পাড়িতে-পড়িতে কতদিন বাঁচিয়া গিয়াছে, সুলোচনা! একদিন মাকে বলিলো—'প্রকাশদা ফিরে এসে এ-রকম দেখে খুশি হবেন না। প্রকাশদা দেখে অসন্তুষ্ট হন এমন কাজ কখনও করবো না। তুমি আলাদা বাসা করো—আমি ক্যাম্বেলে নার্সদের হোস্টেলে যাই।'

তাহাই হইলো। হোস্টেলে দুইজনের নাম দিলো, যাহারা দেখা করিতে পারিবে—স্বামীর ও প্রকাশদার। আশা ছিলো, প্রকাশদা একদিন হঠাৎ আসিয়া পড়িবেই।

সুলোচনার মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'আচ্ছা, কখনো এর পরে প্রকাশদার চিঠি-পত্র আসতো না?'

বুড়ি দীর্ঘশ্বাস ফেবিয়া বলিলো—'কখনও না। মেয়ে প্রকাশদা বলতে অজ্ঞান। ভাবতো, প্রকাশ ফিরে আসবে। আমায় কতদিন বলেছে এ-কথা। প্রকাশ দেখে খুশি হবে বলেই তো দমদমায় অতিথিশালা খোলা হয়েছিলো ওর স্বামীকে নিয়ে এসে।'

আমি অবাক হইয়া বলিলাম—'অতিথিশালা! সে কি-রকম?'

—'মেয়ের খেয়াল! এদিকে প্রকাশের নাম ক্যাম্বেলের হোস্টেলে লেখানো, ওদিকে দমদমার অতিথিশালা খোলা প্রকাশকে খুশি করবার জন্যে—প্রকাশ তখন মরে ভূত হয়ে গিয়েছে।'

—'ওর স্বামীকে আনলেন বুঝি আবার?'

—'আমরা আনি নি, বাবা। ক্যাম্বেলে একজন রুগী এসেছিলো সুলোচনার শ্বশুর-বাড়ির গাঁ থেকে। সে গিয়ে খবর দিলো—স্বামী এসে পড়লো, মাপ চাইলো—আমরাও জায়গা দিলাম এই ভেবে যে, স্বামী ভিন্ন বাইরে পদে-পদে বিপদ, স্বাধীন হয়েও রূপ নিয়ে সর্বদা সশঙ্কিত। কেউ মিত্র

নেই, সবই শত্রু। আজ যে বন্ধু, কাল সে শত্রু। ওর স্বামীকে নিয়ে দমদমায় বাসা করা গেল। যে যায় সেই খায়, তাই নাম হলো—অতিথিশালা।'

আমার সঙ্গে এই সময়েই সুলোচনার দেখা হইয়াছিলো। সে-কথাও আমি বৃদ্ধাকে বলিলাম।

বৃদ্ধা বলিলো—'তোমার কথা বলেছিলো বটে, এখন আমার মনে হচ্ছে, বাবা। তার পর ও চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্রাকটিস করতে লাগলো। বেশ দু'পয়সা আয় হলো। দু'টি ছেলে হলো। জামাইয়ের এককাঁড়ি দেনা ছিলো দেশে, সব ও শোধ দিলো। সেই সময় একদিন কে এসে বললো, দমদমার বাসায়—প্রকাশ মারা গিয়েছে। শুনেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল সুলোচনা—সেই থেকে হলো তার বুকের রোগ। তাতেই শেষে মারা গেল সে। খবরটা শোনার পর ছ'মাস বেঁচে ছিলো।'

বৃদ্ধা অন্যমনস্কভাবে বলিলো—'সন্ন্যিসি হয়ে যাবো বলে আপদ বিদেয় করবার জন্যে আট বছর বয়েসে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম। সে কোথায় চলে গেছে আজ, কিন্তু আমি এই পঁয়ষট্টি বছর বয়েসে এখনও ভুগছি বন্ধনে। সে স্বামীকে ভালো করলো, তাকে মদ ছাড়ালো, মানুষ করলো—করে মরে গেল। জামাইও মারা গিয়েছে। এখন আমি যদি মরে যাই, ছেলে দুটো নিরুপায়। কোথায় দাঁড়াবে? রাস্তায়—গবর্নমেন্টের রাস্তায়!'

আমার দিকে চাহিয়া বলিলো—'ইদানীং আমাদের বড়ো সুখ হয়েছিলো। সে তুমি দেখো নি। খাট, পিকচার, বাসন—সুলোচনা প্র্যাকটিসে বেশ রোজগার করতো—টাকা জমিয়ে এ-সব করেছিলো। শৌখিন ছিলো খুব, সে তুমিও তো দেখেছো। ময়লা কি কুশ্রী জিনিস দু'চোখে দেখতে পারতো না। হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়লো—জামাইয়ের হাতে অনেক টাকা পড়লো, মেয়ে মারা যাওয়ার পরে। জামাই তেজারতি করতে গিয়ে হাওড়ায় জমি বন্ধক রেখে দু'হাজার টাকা ধার দিয়েছিলো—তারপর সেও তো মরে গেল। হ্যাণ্ডনোটখানা এখনও আছে, হ্যাঁ বাবা, তাতে কিছু হয়?'

বুড়িকে বলিলাম—'চোদ্দ বছর পরে সে হ্যাণ্ডনোটে আর কিছু হবে না।'

হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়িলো। বলিলাম—'আচ্ছা, ওর সঙ্গে একটা ছোকরাকে বেড়াতে দেখছিলাম একবার। সে কে, জানেন?'

বুড়ি বলিলো—'শ্যামবর্ণ একহারা চেহারা তো? বছর-বাইশ বয়েস? ও তার দেওর। পুণ্যর জ্যাঠতুতো ভাই—দমদমার বাসায় থেকে পড়তো।'

আমার কতদিনের ভুল ভাঙিয়া গেল।

সুলোচনা যে-যুগে বাহিরে চলাফেরা করিতো, সে-যুগে মেয়েদের অমন ভাব কেহ পচ্ছন্দ করিতো না বলিয়াই তাহার নামে নানা কথা উঠিয়াছিলো। সেই তরুণীর সচেতন অন্তরাত্মা যাহাকে ভালোবাসিয়াছিলো, তাহারই একনিষ্ঠ ধ্যানে সে দিনের পর দিন বৃথা অপেক্ষা করিয়া মরিতো আশার কুহকে।

ক্যাম্বেলের সামনে দিয়া ট্রামে যাতায়াত করিবার সময় অভাগী সুলোচনার কথা আজকাল বড়ো মনে পড়ে।

জ্যালিয়াত

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

হায়, পল্লীর ছুলালী, সে আজ হইয়াছে কলিকাতার বধূ। বোধহয় সে ভাবে—

'হায় রে রাজধানী পাষাণ-কায়া।
বিরাট মুঠিতলে চাপিতে দৃঢ়বলে,
ব্যাকুল বালিকারে নাহিকো মায়া!'

প্রাণ তাহার কাঁদে—

'কোথা সে খোলা মাঠ উদার পথঘাট,
পাখির গান কই, বনের ছায়া।'

কিন্তু ঐ পর্যন্ত, ইহার বেশি আর কবিবরের মানসী-প্রতিমার সঙ্গে এই মেয়েটির কিছুই মেলে না। তাহার কারণ বোধহয় এই যে, প্রত্যেক ব্যাপারেই ইহার নিজস্ব মতামত খুব দৃঢ় এবং স্পষ্ট। যাহা ভালো লাগে, তাহা চাই-ই ; যাহা লাগে না, তাহা চাই না। সিঁছুরে-আমের লোভে যেদিন গাছের মগডালে উঠিয়া জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াছিলো, সেদিনও ছিলো এ-কথা, আর আজ, ভালো না লাগার দরুণ, কলিকাতা ছাড়া চাই বলিয়া যে-সব ফন্দি-ফিকির মনে-মনে আঁটিতেছে, তাহারও মূলে সেই একই কথা।

মেয়েটির নাম চপলা। নাম যখন রাখা হইয়াছিলো, সে সময় সকলেরই দৃষ্টি ছিলো ওর মায়ের কাঁচা-সোনার মতো রংটির দিকে, এবং কাহারও আর সন্দেহ ছিলো না যে, এমন মায়ের মেয়ের দেহলতাটির মধ্যে একদিন বিদ্যুতের চপলদীপ্তি শান্তশ্রীতে ফুটিয়া উঠিবে। মেয়েটি যেন তাহার স্বভাবসিদ্ধ অবাধ্যতার বশেই সবাইকে এই দিক দিয়া নিরাশ করিয়া দিলো। কিন্তু তবু নামটা রহিলো, সার্থক আকাশের বিদ্যুৎ কেমন করিয়া সত্যই যেন ওর শ্যাম-দেহটুকুর মধ্যে আটক পড়িয়া গিয়াছে ;—সেজন্য ওর মিহি

ভ্রূ দুইটি কথায়-কথায় বিদ্যুৎ-স্ফূরণের মতো অতো কুঞ্চিত হইয়া উঠে, কালো চোখের তারা অতো চঞ্চল, এবং ঠোঁটের কোণে আচমকা হাসি ফুটিয়া, একটু রেশ না রাখিয়াই অমন হঠাৎ মিলাইয়া যায়।

ক'নে দেখানর সময় বাপ পরিচয় দিয়াছিলেন, 'বড়ো শান্ত লক্ষ্মী মেয়ে আমার—এ কিছু বড়াই করে বলছি না। বাড়ির বাইরে পা দিতে জানে না, কলকাতায় বিয়ে হবার জন্যে যেন তোয়ের হয়ে জন্মেছে।'

আগাগোড়া বানানো কথা। ওর বাড়ি ছিলো সদর-রাস্তা, বন-বাদাড়, আর দীঘির ধার। এখন সেখান হইতে তাহারা সর্বদাই ওকে যেন কান্নার সুরে ডাকিতে থাকে।

আদুরে দুষ্টু মেয়ের যতো অত্যাচারের দাগ স্নেহের পরতে-পরতে আঁকা, আসন্ন বিচ্ছেদের সময় সেগুলি রাঙাইয়া উঠে। তবুও মেয়ের বাপ, তাঁহাকে বলিতেই হয়, 'বুঝেছেন কিনা, আমার মা'র মতন শান্ত এমন মেয়ে আর দু'টি পাবেন না ; এ কিছু নিজের মেয়ে বলেই যে বলছি, তা নয়....'

প্রবঞ্চনা ধরা পড়িতে অবশ্য দেরি লাগে নাই। শ্বশুর আপিস হইতে ফিরিয়া বাড়ির চৌকাঠ ডিঙাইয়া সঙ্গে-সঙ্গেই ডাকেন, 'কই গো, আমার শান্তশিষ্ট মা-টি, কোথায় গেলে ?'

চপলা যেমনভাবে যেখানেই থাকুক, লঘুগতিতে আসিয়া হাজির হয়। লঘুগতি কথাটা মোলায়েমভাবেই বলা গেল, আসলে শ্বশুরের এই ডাকটিতে কলিকাতার এই অষ্টাবক্র বাড়িখানি হঠাৎ চপলার পক্ষে ঋজু আর সরল হইয়া যায়, কঠিন বিলাতী মাটির মেঝে বেলপুকুরের দেশী মাটির মতো পায়ের নিচে পরম স্নিগ্ধ, মিঠা হইয়া উঠে। সে এ-রকম গোটাকয়েক লাফেই শ্বশুরের নিকট আসিয়া পৌঁছায়, আবদারের ভর্ৎসনায় চক্ষের তারকা নাচিতে থাকে, চাবির গোছাসুদ্ধ আঁচলটা মাটি হইতে তুলিতে-তুলিতে বলে, 'না বাবা, আজ আপনি বড্ড দেরি করেছেন, তা বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ!'

দেরি যে রোজ হয়ই এমন নহে, তবে এই মিলনটুকুর মূল্য অনেক ; তাই উৎকণ্ঠার জন্য পুত্রবধূর রোজই মনে হয়, বড়ো দেরি হইয়া গিয়াছে। তাহারই অনুযোগ রোজ।

শ্বশুর রোয়াকে নির্দিষ্ট ঈজি-চেয়ারটিতে দেহখানি এলাইয়া দেন। বধূ

জালিয়াত

পাখা আনিয়া হাওয়া করে, পায়ের কাছে বসিয়া জুতার ফিতা খুলিয়া পা দুইখানি খড়মের উপর বসাইয়া দেয়, চাদর খুলিয়া, জামা নামাইয়া ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া গুছাইয়া রাখে।

ধীরে-ধীরে এইসব চলে আর গল্প হয়, 'কী ঠিক হলো, বাবা? বড্ড যেন দেরি হয়ে যাচ্ছে; আর ভালো লাগছে না, আপনার এই কলকাতা, হ্যাঁ!'

'—আর দেরি নেই মা, একটা বাড়ি ঠিক হয়েছে, খালি হলেই আমরা উঠে যাবো সেখানে।'

শ্বশুর-বউয়ের পরামর্শ পাকা হইয়া গিয়াছে, কলিকাতায় আর থাকা হইবে না। কলিকাতার বাহিরে বেশ পাড়াগাঁ দেখিয়া বাড়ি দেখা হইতেছে, ঠিক হইলেই সবাই উঠিয়া যাইবে।

বধূকে শ্বশুর কোলের কাছে টানিয়া লন, মাথায় ধীরে-ধীরে হাত বুলান, করতল হইতে স্নিগ্ধ আশীর্বাদ ক্ষরিতে থাকে। বাৎসল্যের প্রবঞ্চনায় মুখে শান্ত হাসি ফুটিয়া উঠে; ভাবেন, এই দীর্ঘীকৃত আশার মধ্য দিয়া পাড়াগাঁয়ের স্বপ্ন কাটিবে, ক্রমে এই বাড়িরই ইঁট-কাঠের মধ্যে মনটা মায়ায় গাঁথিয়া যাইবে।

স্বপ্ন কিন্তু কাটে না, বরং এদিকে মনটা বিরূপ হইয়া সেই স্বপ্নকেই মায়ার পাকে-পাকে জড়াইয়া ধরে।

অনামধেয় একটি জায়গা; কিন্তু কেমন করিয়া যেন মনের পটে তাহার একটি স্পষ্ট ছবি আঁকিয়া গিয়াছে। বেলপুকুরের সঙ্গে অনেকটা মেলে, ভিজা-ভিজা কালচে মাটি, এখানে-ওখানে গাছপালার সবুজ দিয়া ঢাকা, উপরের আকাশে নীল আস্তরণখানি উবুড় হইয়া পড়িয়াছে, পাশাপাশি দুইটি কোঠা-ঘর—সামনে পাকা রোয়াক, বিকালের পড়ন্ত রোদটি সেখানে জ্বলজ্বল করিতে থাকে। ওদিকপানে রান্নাঘর, সকাল-সন্ধ্যায় তাহার গোল-পাতার ছাউনি ফুঁড়িয়া ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠে। পাকা ঘরের পাশ দিয়া রাস্তা। সে রাস্তা সদর-দুয়ারের চৌকাঠ ডিঙাইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, ডাহিনে জামরুলগাছের নিচ দিয়া। বাঁয়ে কাহাদের পুকুর, তাহার পুরানো ঘাটের শেষ রানায় কাহাদের ঘোমটা-টানা বউ বাসন মাজে, তাহার শাড়ির রাঙা পাড় আর ছোটো রাঙা ঠোঁটের মাঝখানে নোলকটি দুল-দুল করে।

কে একজন সম-বয়সী আসিলো, বউ হাতের উল্টা দিক দিয়া ঘোমটা উঁচু করিয়া হাসিয়া কথা বলে।

আরও কিছুদূরে লতা-জড়ানো পুরানো আমগাছের পাশ দিয়া রাস্তাটা ফিরিয়া দুই দিক দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, আমগাছের শিকড়ের কাছে ইঁট, নুড়ি, খোলামকুচী, রাংচিতার পাতার ছড়াছড়ি, তাহার সঙ্গে-সঙ্গে ছোটো-ছোটো পায়ের দাগ। মন এইখানে আটকাইয়া যায়, যেন নিজেকেই দেখা যায়, গাছের নিচে লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

অন্যমনস্কতা হইতে হঠাৎ সজাগ হইয়া বধূ হাসিয়া বলে, 'তাই বলে আপনি যেন ভাববেন না বাবা, আমি কচি মেয়েদের মতো পাড়ায়-পাড়ায় খেলাঘর রচে কাটাবো—সে ভয় আপনার একটুও নেই, বলে দিচ্ছি! কিন্তু দেরি করলে হবে না, হ্যাঁ!'

মন ভুলাইবার দিকে স্বামীর চেষ্টারও ত্রুটি নাই। ছোটো বোন ক্ষান্তমনির উপর হঠাৎ অত্যধিক স্নেহপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছে। বলে, 'ক্ষেন্তি, চিড়িয়াখানায় একটা নতুন জন্তু এসেছে, যাবি নাকি—দেখতে?'

ক্ষান্তমনি উৎসাহের সহিত বলে, 'হ্যাঁ, যাবো।' তাহার পর হঠাৎ একটু সঙ্কুচিত হইয়া মিনতি করে, 'একটা কথা রাখবে, দাদা?'

'—কি কথা, আবার?'

'—বউদিকেও—।' আর শেষ করিতে সাহস করে না।

'—হ্যাঁঃ, অতো লোকের ঝক্কি বওয়া—সে আমার কুষ্ঠিতে লেখেনি!'

এই করিয়া চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হইয়া গিয়াছে। রাত্রে স্বামী খুব উৎসাহভরে বলে, 'এইবার কি দেখবে বলো; ডালহৌসি স্কোয়ার, হাওড়া স্টেশন?'

বধূ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলে, 'কিছু না।'—বলিয়া ফিরিয়া শোয়।

অনেক সাধাসাধি চলে, 'কলকাতায় এতো-সব দেখবার জিনিস রয়েছে, দেশ-বিদেশ থেকে লোক আসছে দেখতে, গড়ের মাঠ, গঙ্গার জাহাজ, কতো বড়ো-বড়ো বাড়ি ওপরে চাইতে গেলে তো ঘাড় উল্টে পড়ে—'

'—পড়ুক গিয়ে ঘাড় উল্টে—যার সাধ আছে; আমার কলকাতার কিছু ভালো লাগে না; আমায় বাপের বাড়ি দিয়ে এসো।'

'—কলকাতার কিছুই ভালো লাগে না ? আমরাও তো কলকাতার—আমিও তো—'

ঝাঁঝিয়া উত্তর হয়, 'তোমাদের কাউকে ভালো লাগে না ; যারা কলকাতা ভালোবাসে, তাদের দু'চক্ষে দেখতে পারি না।'

দারুণ নিরাশার কথা।

পরের দিন ভগ্নিস্নেহে আবার জোয়ার আসে। প্রশ্ন হয়—'কই রে ক্ষেন্তী, শিবপুরে রামরাজাতলার মেলা ফুরিয়ে এলো, একদিনও তো গেলি না ? দিব্যি পাড়াগাঁয়ে-পাড়াগাঁয়ে জায়গাটি, আমার তো বড্ড ভালো লাগে।'

আজ তিন বৎসর দাদার খোসামোদ করিয়া ফল হয় নাই ; বলিলেই, 'অজ পাড়াগাঁ, এঁদো ডোবা' এই সমস্ত বলিয়া নাক সিঁটকাইয়াছে। আজ বিধি এতো অনুকূল !

ক্ষান্তমনি কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া হাজির হয়, বলে, 'হ্যাঁ দাদা, যাবো। আর একটা কথা শুনবে ? বউদিদিকেও নিয়ে চলো দাদা, আমার দিব্যি। আহা, বেচারি গো, পাড়াগাঁয়ের কথা বলতে-বলতে আত্মহারা হয়ে ওঠে !'

দাদা রাগিয়া বলে, 'ওঃ—ই, আপনি পায় না, আবার শঙ্করাকে ডাকে ! ওইজন্যে কোথাও তোকে নিয়ে যেতে ইচ্ছে হয় না।'

রামরাজা কি ব্যাতাই-চণ্ডীতলা হইতে ফিরিয়া ফল হয় উল্টা। পিঁজরার পাখি ছাড়া পাইয়া আবার পিঁজরায় বন্ধ হইলে যেমন অতিষ্ঠ হইয়া উঠে, মেয়েটির অবস্থা হয় সেই রকম। প্রাণটা আইঢাই করে। প্রতি মুহূর্তে বেলপুকুরের কোনো না কোনো একটি ছিন্ন দৃশ্য চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে ; কথায়-কথায় ভুল হয়, ঝিকে ডাকিতে বাপের বাড়ির দাসী পদী-পিসির নাম মুখে আসিয়া পড়ে ; ননদকে ডাকিতে বাহির হইয়া পড়ে, সই !

ননদ দুই-একবার ভুলটা ভুলের হিসাবেই ধরে, শেষে 'এই যে আসি, সই !' বলিয়া হাসিতে-হাসিতে সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। বলে, 'মরণ ! বলি, তোমার হয়েছে কি আজ ! দাদা এলেই বলবো, তোমার বুনো হরিণকে বনে ছেড়ে দিয়ে এসো।'

বন্য মৃগ নিজেই সে ব্যবস্থায় তৎপর হইয়া উঠে। কলিকাতায় থাকা চলিবে না, কোনমতেই নহে। শ্বশুরকে বলে, 'আমি বলছিলাম, বাবা—'

'—হ্যাঁ মা, বলো।'

'—বলছিলাম, মাস-তিনেক পরেই তো আপনি কাজ নিয়ে ক'মাসের জন্যে ঢাকা চলে যাবেন? এর মধ্যে আমাদের আর নতুন বাসা করে কাজ নেই। আপনারও অসুবিধে—বাবা, আর বাসা-বদলির একটা হিড়িকও তো কম নয়, খরচও অনেক—এই মাগ্‌গিগণ্ডার দিন—'

শ্বশুর নিজের চিকিৎসার এ-রকম আশু সাফল্যে উল্লসিত হইয়া উঠেন, শুধু পাড়াগাঁয়ের নেশা কাটিয়া যাওয়া নহে, সঙ্গে-সঙ্গে গৃহিণীপনার গাম্ভীর্য আসিয়া পড়া একেবারে! বধূর মাথাটি বুকে চাপিয়া বলেন, 'ঠিকই তো, মা! দেখো তো, কথাটা আমার মাথায়ই ঢোকে নি। আর, বুড়ো হতে চললাম, এইবার মা-ই আমাদের বুদ্ধি দেবে কিনা! আমি তাহলে ওদের খোঁজাখুঁজি করতে বারণ করে দেবো। ঢাকা থেকে ফিরে আসি, তখন বরং একটা পাকা-রকম ব্যবস্থা করা যাবে, কি বলো?'

'—হ্যাঁ।' বলিয়া শ্বশুরের বুকে মাথাটি আরও গুঁজিয়া দেয়। ক্ষণেকের জন্য বোধহয় একটু দ্বিধা আসে, সেটুকু কাটাইয়া ধীরে-ধীরে আরম্ভ করে: 'তাই বলছিলাম বাবা—'

'—হ্যাঁ মা, বলো।'

'—এই বলছিলাম, ততদিন না-হয় আমাকে একবার বেলপুকুরেই রেখে আসুন না।'

রোগটা মজ্জাগত; এমনভাবে নিরাশ হইয়া চিকিৎসক হাসিবেন, কি কাঁদিবেন স্থির করিতে পারেন না। চিকিৎসার নূতন-নূতন প্রণালী আবিষ্কার করিতে হয়। এই করিয়া দিন চলে। শ্বশুরের পাঠানোর যে সে-রকম গা নাই—এ-কথাটি ক্রমেই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠে।

কিন্তু শাশুড়ির কাছে চালাকি করিতে সাহস করে না চপলা। কারণ, শাশুড়ী পুরুষ নহে, এবং সেইজন্য, তাহার মতে, বোকা নহে। সোজাই কথাটা পাড়ে সে, 'বাপ, মা, ভাই, ছোটো বোনটি—এদের বহুদিন দেখে নাই, তাই—'

শাশুড়ী চোখ কপালে তুলিয়া বলেন, 'ওমা, অমন কথা বলো না, বউ-মা। এই তো ক'টা মাস এসেছো, আমি সেই মোটে ন'বছরের মেয়েটি শ্বশুর-ঘর করতে এলাম, আর ঝাড়া তিনটি বছর কাটিয়ে—'

চপলারও যেন আশ্চর্যের আর সীমা থাকে না। সবিস্ময়ে বলে, 'এই কলকাতায়, মা?'

'—পোড়া কপাল! কলকাতায় কোথায়, তাহলে তো বাঁচতাম। শ্বশুর থাকতেন ডাহা পাড়াগাঁয়ে—মাঝের পাড়া। নাইবে? সেই আধ কোশ ভেঙে ইচ্ছেমতী। খাবার জল চাই? সেই আধ কোশ ভেঙে ইচ্ছেমতী। গা ধোবে? সেই আধ কোশ—'

বধূ আর প্রাণ ধরিয়া শুনিতে পারে না। বলে, 'ওই! বেরালটা বুঝি কি ফেললো গো!'—বলিয়া হয়তো হঠাৎ সে-স্থান ত্যাগ করে।

স্বামীর উপর উপদ্রব হয়। সে বেচারি জর্জরিত হইয়া অভিমান করিয়া বলে, 'বেশ তো, বাবা-মাকে তুমি রাজী করাও, আমার রেখে আসতে আর আপত্তি কি? আমায় যখন ভালোই বাসো না, মিছিমিছি এখানে থেকে কষ্ট পাও কেন?'

বধূ অবাধে মিথ্যা বলে, একেবারে নির্জলা মিথ্যা, 'বাবা-মা তো খুবই রাজী। বাবা বলেন, আমার তো ছুটি নেই; অজিতকে বললেই বলবে, পড়ার ক্ষতি হবে; না-হয় আসুক না রেখে। মা বলেন, আমার আর কি অমত মা, আহা, এতদিন এসেছো, তবে আজকাল হয়েছে—ছেলের মত আগে। তা তুমি ঠিক এই রকম করে মাকে বলো তো, বলো—মা, অতো ঘ্যানঘ্যান করছে যখন, রেখেই আসি না-হয় দিন-কতকের জন্যে; বাবাকে বলে দিও, কলেজের ক্ষতি হবে না।'

স্বামী অতটা বোকা নহে, এ ফন্দি খাটে না।

কয়েকদিন আবার মুখ অন্ধকার হইয়া থাকে।

কথাবার্তা একেবারে বন্ধ। যতো সব বেয়াড়া আবদার ভাবিয়া স্বামীও কয়েকদিন বেপরোয়া ভাবটা জাগাইয়া রাখে, তাহার পর তাহাকেই মাথা নোয়াইতে হয়। বলে, 'যা হবার নয়, তাই ধরে বসে থাকলে চলবে কেন? বরং চলো, দক্ষিণেশ্বর দেখিয়ে নিয়ে আসি, পাড়াগাঁকে পাড়াগাঁও, কলকাতা

থেকে অনেক দূরও ; বালি হয়ে গেলে বরং নৌকোও চড়া হবে। কেমন, রাজী আছো তো ?'

পরামর্শ আঁটা হয় : দুপুরে ক্ষান্ত যখম স্কুলে থাকিবে, চপলা গিয়া শাশুড়ির আদেশ চাহিয়া লইবে, মিউজিয়াম দেখিবার নাম করিয়া।

বধূ জিজ্ঞাসা করে, 'তোমারও তো কলেজ আছে ?'

'—আমার ঘণ্টাখানেক মাথা ধরবে, ক্ষেন্তী চলে গেলে ভালো হবে !'

কথাটা বুঝিতে একটু দেরী হয়। চপলা স্বামীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, শুধু ভ্রূ জোড়াটি অল্প-অল্প স্ফুরিত হইতে থাকে। তাহার পর হঠাৎ খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠে, বলে, 'ও, বুঝেছি, বাব্বাঃ, তোমার দুষ্টুবুদ্ধি কম নয় তো !'

প্রশস্ত শান্ত গঙ্গায় নৌকা চড়িয়াই চপলার মনটা প্রসারিত হইয়া পড়ে। ওপারে ঘাটের নিচে গিয়া নৌকা লাগে। নামিয়াই এক-হাঁটু করিয়া কাদা, এতবড়ো বিলাসিতা অনেকদিন তাহার ভাগ্যে জোটে নাই। পা টানিয়া-টানিয়া চলিতে-চলিতে সে স্বামীর হাতটা চাপিয়া ধরে। বলে, 'উঃ, বড্ড মজা, না গো ?'

সিঁড়ি বাহিয়া সুবিস্তীর্ণ চত্বর, যেদিকে ইচ্ছা হনহন করিয়া অনেকটা চলিয়া যায়, পায়-পায় কতদিনের শৃঙ্খল যেন খসিয়া পড়িতেছে ; মন্দিরে উঠে, সুগঠিত সৌম্যমূর্তির সামনে মাথা নোয়াইয়া পড়িয়া থাকে অনেকক্ষণ ; কিছুই প্রার্থনা করে না, পড়িয়া থাকার মুক্ত অবসর, তাই পড়িয়া থাকে। গঙ্গার ধারে-ধারে পরিষ্কার চওড়া রাস্তা, ঘন আমগাছের মস্ত বাগান, পাতার গাঢ় সবুজে যেন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, পিছনে আয়ত পুষ্করিণী, বেলপুকুরের দীঘির মতো ; একটু ছোটো—এই মাত্র তফাৎ। ক্রমাগত ঘুরে, একটি মুক্ত বেগচঞ্চল প্রাণ প্রতি মুহূর্তে দেহতটে আসিয়া উচ্ছলিত হইয়া পড়ে—চপল অঙ্গ-বিক্ষেপে, প্রগল্‌ভ হাসিতে, কথার অসংযত স্বরে ; মাঝে-মাঝে পিছন ফিরিয়া চাহিয়া বলিয়া উঠে, 'কই গো ! ওমা, এখনও ওখানে ! পুরুষের পা না ?'

পুকুরঘাটে আসিয়া বসিলো দুইজনে। পা দুলাইতে-দুলাইতে পাশের লতাগুল্মের সঙ্গে স্বামীকে পরিচিত করিয়া দিতে লাগিলো বধূ, 'ওটা ঘেঁটু, ঘেঁটু-ফুল মহাদেব খুব ভালোবাসতেন, সত্যিকারের মহাদেব নয়, খেলাঘরের মহাদেব। আচ্ছা, এর মধ্যে অমূলতার গাছ কোথায়—দেখাও দিকিন, কতো বুদ্ধিমান দেখি!—পারলে না তো? ওই দেখো, কলকে-ফুলের গাছটার মাথার ওপর, ওই হলদে-হলদে—ভয়ঙ্কর বিষ, মশাই! একটু যদি পেটে যায় তো বাড়তে বাড়তে—ওগো, কুঁচকম্বলের চারা—নিশ্চয়ই এক্কেবারে! নিয়ে আসি তুলে?'

উৎসাহের সহিত নামিয়া ক্ষিপ্রগতিতে পুকুর-পাড়ের জঙ্গলের দিকে চলিলো। ঝিরঝিরে-পাতা চারাগাছটি, হাওয়ায় নধর ডগাটি একটু-একটু দুলিতেছে। নিকটে যাইলো তুলিবার জন্য, কিন্তু ঝুঁকিয়া কি ভাবিয়া থামিয়া গেল, তাহার পর ধীরে-ধীরে ফিরিয়া আসিয়া আবার শানের বেঞ্চিটির উপর বসিয়া পড়িলো।

স্বামী হাসিয়া বলিলো, 'কি হলো আবার? খেয়ালী মেয়ে!'

'—নাঃ, থাক; কলকাতায় সেই মাটির টবে থাকতে হবে তো? আমার মতো দুর্দশা হবে, বেচারির।'

দুইজনেই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলো। একটু পরে চপলা স্বামীর হাতটা নিজের কোলে তুলিয়া লইয়া মৃদু হাসিয়া কহিলো, 'একটা কাজ করলে হয় না?....বলছিলাম—বলছিলাম, আমায় এই দিক থেকেই বেলপুকুরে রেখে আসবে?'

অজিত হাসিয়া দুষ্টামির সহিত বলিলো, 'বেশ তো। টাকা?'

'—আমার হাতের দু'গাছা চুড়ি দিচ্ছি।'

স্বামী কি ভাবিয়া আবার চুপ করিয়া রহিলো; পরে বলিলো, 'সে মন্দ কথা নয়; কিন্তু মাকে কি বলবো?'

'—সে আমি ভেবে রেখেছি, বলবে, নাইতে গিয়ে ডুবে গিয়েছে।'

আবার একটু চুপচাপ। চপলা তাগাদা দিলো, 'কই, কি বলছো?'

স্বামীর একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িলো; কিন্তু মনের ভাবটা গোপন করিয়া হাসিয়া বেশ উৎসাহের সঙ্গে বলিলো, 'উঃ, খাসা হয়; তারপর?'

'—তারপর অনেকদূর গিয়ে ভেসে উঠবো, আমায় একজন মাঝি তুলবে, একটু চোখ খুলে বেলপুকুরের নাম করবো—নভেলে যেমন হয় গো—'

'—নভেলে মিউজিয়ামের কোঠা-বাড়িতে কেউ ডুবে মরে না। চলো, ওঠো, বেলা পড়ে এলো।' বলিয়া স্বামী উঠিয়া পড়িলো।

শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী সবাইকেই বোঝা যায়। চপলা মনে-মনে বলে, খুব চালাকি সব, আচ্ছা, আমিও কম সেয়ানা নয়, দেখি।

বাবার কাছে গোপনে পত্র যায়—কাঁদুনিতে, মিথ্যা কথায় ভরা—এরা সব মারে-ধরে, চাবি দিয়ে রাখে—দুই-চক্ষের বিষ হয়ে আছি। কখনও-কখনও এমনও হয়ে থাকে—পাড়ার মেয়েদের কাছে আমার আর মুখ দেখাবার জো নেই ; যে-ই দেখে, বলে—ওমা, কেমন পাষাণ বাপ-মা গো ! এই দুধের মেয়ে—

চিঠি যাহা আসে, তাহাতে এ-সবের উত্তর হিসাবে কিছুই থাকে না ; একরাশ উপদেশ থাকে মাত্র। চপলা মনে-মনে বলে, চপীর ভাগ্যে সব সমান ; আচ্ছা, বেশ !

গ্রীষ্মের দুপুরবেলা। তখন শ্বশুর আপিসে, স্বামী কলেজে, ননদ স্কুলে। চপলা শাশুড়ী আর পিসশাশুড়িকে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতেছিলো, তাঁহারা একে-একে ঘুমাইয়া পড়িলেন। একটু পরে সে বই বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিলো। রামায়ণে তিনজনে আসিয়া পঞ্চবটী বনে বাসা বাঁধিয়াছেন। ঠিক এই জায়গাটিতে শাশুড়িরা ঘুমাইয়া পড়িলেও চপলা বিন্ধ্য-কাননের সেই অপূর্ব বর্ণনা শেষ না করিয়া উঠিতে পারে নাই। অযোধ্যার রামচন্দ্রের চেয়ে পঞ্চবটীর রামচন্দ্রকে বেশি ভালো লাগে। কানন-চারিণী সীতার উপর এক ঈর্ষা-মিশ্রিত সহানুভূতি জাগিয়া উঠিয়া তাহার মনটাকে তৃপ্তি আর অস্বস্তি—দুইয়েই ভরিয়া তোলে।

বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলো চপলা।

বাহিরে কোথাও আর চাওয়া যায় না। মনে হয়, সারা কলিকাতায় যেন আগুন লাগিয়াছে ; উঁচু-নিচু লক্ষ-লক্ষ বাড়ির দেওয়াল বাহিয়া ছাদ-

ফুঁড়িয়া যেন শিখা লক্‌লক্‌ করিয়া উঠিতেছে—কি এক-রকম সাদাটে-নীল আগুন, যাহাতে একটু ধোঁয়ার স্নিগ্ধতা নাই। এই সময়ে বেলপুকুরের কথা বেশি করিয়া মনে পড়ে, দীঘির পাড়ে সেই অন্ধকার সপ্তপর্ণী গাছের তলা, কালো জলের উপর তরতরে ঢেউ—

'—চিঠি আছে!' সঙ্গে-সঙ্গে সদর-দরজায় পিওনের মুঠির ঘা পড়িলো।

চপলা তাড়াতাড়ি নামিয়া যাইতে-যাইতেই দরজার ফাঁক বাহিয়া একখানি পোস্ট কার্ড উঠানে পড়িলো। বাবার চিঠি—শ্বশুরকে লেখা।

ত্রস্তে তুলিয়া লইয়া চিঠিটা চপলা পড়িলো। মামুলী চিঠি, তাহার বিশেষ উল্লেখও নাই। 'আশা করি, বাড়ির সর্বাঙ্গীণ কুশল' আর মামুলী আশীর্বাদে সে যতটুকু আসিয়া পড়ে।

স্বামীর পড়িবার ঘরে গিয়া বসিলো সে। এটা-সেটা লইয়া খানিকটা নাড়াচাড়া করিয়া আবার বাবার চিঠিটা লইয়া পড়িতে লাগিলো। বাবার চমৎকার লেখা! এদের বাড়িতে কাহারও লেখা এমন নহে। বলিতে নাই—গুরুজন, কিন্তু শ্বশুরের লেখা তো একেবারে বিশ্রী! স্বামীর লেখাটা অতো খারাপ নহে বটে, তবুও বাবার লেখার সামনে ঘেঁষিতে পারে না!

স্বামীর গানের খাতাটা টানিয়া লইয়া তুলনা করিতে লাগিলো।—কিসে আর কিসে! ডাগর-ডাগর ছাপার মতো অক্ষর, উপরে ঢেউ-খেলানো মাত্রা, এ এক জিনিসই! স্বামী বলে—একটু কাঁচা লেখা। আহা! কী সব পাকা লেখা রে, নিজেদের!

লেখার দিকে বাবার ঝোঁক ছিলো বড্ড: চপলাকে লইয়াও অনেকটা চেষ্টা করিয়াছিলেন! একেবারে বাবার মতো লেখা হওয়া বরাতের কথা, তাহা হইলেও স্বামীকে সে খুবই হারাইয়া দিতে পারে।

লেখার কথাতেও বেলপুকুর আসে। বাবা-মায়ে তর্ক হইতেছে, বাবা বলিতেছেন, 'চপীর লেখা দেখেই তো ওর শ্বশুর পছন্দ করেছেন।

মা বলিলেন, 'আর ওর অমন চোখ, মুখ, গড়ন বুঝি কিছুই নয়?'

আজকাল শ্বশুর-বাড়িতে নানা মুখে প্রশংসা শুনিয়া মায়ের গুমরের চোখ, মুখ, গড়ন সম্বন্ধে একটু কৌতূহল হইয়াছে, সজ্ঞানতা আসিয়া পড়িয়াছে। হাত-আরশিটা তুলিয়া লইয়া প্রতিচ্ছায়ার দিকে চাহিলো—হাসি-হাসি সলজ্জ,

যেন অন্য কাহার চোখ। বাপের বাড়ির আরশিতে এ-রকম ছায়া পড়িতো না; যতো চায়, চোখ দুইটা যেন লজ্জায় ভরিয়া আসে।

'—ছাই চোখ-মুখ, ছাই গড়ন!'—বলিয়া আরশিটা রাখিয়া দিলো। অন্যমনস্ক হইয়া কলমটা লইয়া পোস্ট-কার্ড দেখিয়া লিখিতে লাগিলো ঃ

'অনেকদিন যাবৎ আপনাদের কোনো সংবাদ না পাইয়া—' ঘাড় নাড়িয়া-নাড়িয়া মিলাইতে লাগিলো সে। ভাবিলো বেশ একটু আদল আসে, বাবার লেখার মতো। তবুও অনেকদিন অভ্যাস ছাড়িয়া গিয়াছে।

কি রকম একটা ঝোঁকের বশে লিখিতে লাগিলো, অনেকদিন যাবৎ—অনেকদিন যাবৎ, দুইবার, চারিবার, আটবার—দশবারেরটা অনেকটা মেলে। এখনও আছে তফাত, তবে বাপের মেয়ের লেখা বলিয়া দিব্য চেনা যায় বটে।

হঠাৎ কথাটা যেন মাথায় পাক দিয়া ঘুরিতে লাগিলো, বাপের মেয়ের লেখা—বাপের মেয়ের লেখা—চপলা আস্তে-আস্তে কলমটা রাখিয়া দিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া দাঁতে নখ খুঁটিতে লাগিলো। দৃষ্টি স্থির, ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত হইয়া খয়েরের-টিপটির কাছে একসঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে। ক্রমে তাহার বুকের ঢিপঢিপানি বাড়িয়া গেল, সমস্ত মুখটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিলো এবং ঠোঁটের কোণে নিতান্ত অল্প একটু হাসির আভাস ফুটিয়া উঠিলো। বাপের মেয়ের লেখা, আর যদি ওটুকু তফাতও মিটাইয়া ফেলা যায়!

মাথার মধ্যে একটি মতলব জঁাকিয়া উঠিতেছে, চপলা এক-মনে সেটিকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিলো। একবার উঠিয়া একটু ঘুরিয়া আসিলো, শাশুড়িরা অকাতরে ঘুমাইতেছেন। ঘড়িতে মোটে একটা বাজিয়াছে।

স্বামীর কলেজ বোধহয় আজ চারটা পর্যন্ত, এখনও ঢের সময়। ঘরে আসিয়া পোস্ট কার্ডটি সামনে, বইয়ের তাড়ার গায়ে হেলান দিয়া রাখিলো, তাহার পর কতকগুলি কাগজ লইয়া ইস্তক শ্রীশ্রীদুর্গা-সহায় হইতে শ্রীঅখিল চন্দ্র দেবশর্মণঃ পর্যন্ত সমস্তখানি নকল করিতে লাগিয়া গেল।

দুইটা বাজিয়া গেল, আড়াইটা, তিনটা। কপালের ঘাম মুছিয়া-মুছিয়া আঁচলখানি ভিজিয়া গিয়াছে। তা যাক। ওদিকে প্রত্যেক অক্ষরের বাঁক, কোণ-কান, মাত্রা একেবারে বাবার লেখার মতো হইয়া দাঁড়াইয়াছে, মেয়ে লিখিয়াছে বলিয়া চিনুক দেখি কে চিনিবে!

তাহার পর আসল কাজ, যাহার জন্য এতো মেহনত। বাপের চিঠি হইতে অক্ষর বাছিয়া বাছিয়া একটা আলাদা কাগজে সন্তর্পণে লিখিলো :

পুনশ্চ। আর বৈবাহিক মহাশয়, আপনার বেহান ক'দিন থেকে একেবারে শয্যাধরা। একবার চপুকে দেখবার জন্য বড়োই ব্যাকুল হইয়াছেন। শ্রীমান অজিত বাবাজীবনের সহিত অতি সত্বর পাঠাইয়া দেন তো ভালো হয়। ইতি—

শ্রী অখিলচন্দ্র দেবশর্মণঃ

কাগজখানি পোস্ট কার্ডের পাশে একেবারে সাঁটিয়া ধরিলো। অবিকল বাবার লেখা। চপলা লেখাটুকু আরও আট-দশবার ভালো করিয়া মক্স করিয়া লইলো, তাহার পর সর্বসিদ্ধিদাত্রী দুর্গাকে স্মরণ করিয়া সমস্তটুকু বাবার পোস্ট-কার্ডে ঠিকানা লেখার দিকে খালি জায়গাটুকুতে সাবধানে লিখিয়া ফেলিলো সে।

লিখিয়াই তাহার মুখটা শুকাইয়া গেল ; কলমটি রাখিয়া ভাবিলো, ওই ঠিকনার কালির সঙ্গে এ কালির মোটেই মিশ খায়না। উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দুই পিঠ তুলনা করিতে লাগিলো। না, এ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, আজকের সদ্য লেখা। এ চিঠি দিলেই তো সর্বনাশ ; আবার না দেওয়াও বিপজ্জনক। এখন উপায় ?

ভাবিতে-ভাবিতে সে নিতান্তই বিচলিত হইয়া উঠিলো এবং কাজটা ক্রমে একটা অপরাধের আকারেই তাহার মনে প্রতীয়মান হইয়া উঠিতে লাগিলো। ব্যাকুল হইয়া বলিলো, 'এ কি করলে, মা-দুর্গা ? তাহলে লেখাতে গেলে কেন এতো করে, মা !'

চপলার এখনও বিশ্বাস, মা দুর্গা নিজের অন্যায়টুকু বুঝিতে পারিয়া হঠাৎ তাহার মাথায় আর একটু বুদ্ধি আনিয়া দিলেন। সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়া বাক্স খুলিয়া একটি চিঠি বাহির করিলো, কাল দুপুরে বসিয়া সইকে খানিকটা লিখিয়াছিলো, এখনও শেষ হয় নাই। কম্পিত বক্ষে চিঠির ভাঁজ খুলিয়া পোস্ট-কার্ডে বাবার লেখার পাশে ধরিলো, এক কালি।

আশ্বস্ত হইয়া নিজের মনে বলিলো, 'মা যে বলেন, ভালো কাজে বিঘ্নি অনেক, তা মিছে নয় ; যাক, কেটে গেল।'

বিকেলে আসিয়া শ্বশুর অভ্যাসমতো জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ কোনো চিঠি-ফিঠি এসেছিলো গো, শান্ত মা?'

চপলা একটুও দ্বিধা না করিয়া উত্তর দিলো, 'কই, না তো বাবা!'

একটু পুরানো হইয়া দুই রকমের কালির গরমিল মিটাইয়া চিঠিটা আসিলো তাহার পরদিন; উঠানের একপাশেই পড়িয়া ছিলো, শাশুড়ী তোলেন। শ্বশুর বালিশের নিচে আপিসের চাবি রাখিতে গিয়া আপনিই পাইলেন; চপলা বাড়িতে ছিলো না তখন।

পাশের বাড়ি হইতে বেড়াইয়া আসিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িলো চপলা। কেমন যেন শ্বশুরের সামনে আসিতে পা উঠিতেছে না, বুকটা ধড়াস-ধড়াস করিতেছে।

ডাক পড়িলো—'কই গো, চপলা মাকে আজ দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

যতটা সম্ভব সহজভাবেই আসিয়া দাঁড়াইলো চপলা। 'কি বাবা?'—বলিয়া মুখ তুলিতেই চোখের পাতা কিন্তু নামিয়া আসিলো।

'—অমন শুকনো কেন, মা? আজ ঘুমোও নি, না? এঃ-ই, দেখেছো দুষ্টু পাড়া-বেড়ানি মেয়ের কাণ্ড?' কাছে টানিয়া লইলেন, 'অসুখ করবে যে। বাবার চিঠি এসেছে, দেখেছো?'

'—কই, না!' চোখ তুলিতেই আবার সঙ্গে-সঙ্গে নামিয়া পড়িলো। মুখটাও একটু রাঙা হইয়া উঠিয়াছে চপলার।

শ্বশুর দেখিলেন, পাগলী মেয়ে, বাপ লইয়া যান না বলিয়া চিঠির নামেই একেবারে অভিমান। ক'দিনই বা সে আসিয়াছে, হিসাব তো করিয়া দেখিবে না। তিনি বলিলেন, 'এসেছে। আর, তোমায় একবার বিশেষভাবে যেতে লিখেছেন বেয়াইমশাই।'

আসল কথাটি জানাইবেন কিনা ভাবিতে লাগিলেন; ক'দিন থেকে শয্যাধরা, বেশ ভাবনার কথা। বলিলেন, 'বেয়ান ঠাকরুণের একটু অসুখ, লিখেছেন। কিন্তু কেমন যেন একটু খাপছাড়া-খাপছাড়া, হঠাৎ শেষের দিকে পুনশ্চ দিয়ে একটু লেখা। আর, এই সেদিন চিঠি এলো, কিছু তো লেখেন নি! যাই হোক, অজিত গিয়ে একবার তোমায় রেখে আসুক।'

সফলতার আনন্দে শরীর-মনের সঙ্কোচটা কাটিয়া যাইতেছে, বুদ্ধিও

খুলিতেছে। চপলা বলিলো, 'খাপছাড়া যে বলছেন বাবা, বোধহয় মনটা সুস্থির নেই, তাই আগে লেখেননি।'

বাপের অসঙ্গতির জন্য কন্যার দুশ্চিন্তা লক্ষ্য করিয়া এবং অদ্ভুত জবাবদিহি শুনিয়া শ্বশুর হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'বাপ নিশ্চয়ই গাঁজা-টাঁজা খান, উল্টো-সোজা জ্ঞানগম্য নেই।'

যাক, কথাটা চপলা পূর্বে অতো খেয়াল করে নাই। বাবার গাঁজা-খুরির অপবাদে যদি আপাতত ওটা চাপা পড়ে তো তাহার আপত্তি নাই।

মনে-মনে খুশি হইয়া বলিলো, 'যান, ঠাট্টা করছেন আপনি।'

মনে পড়িলো, একটা কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, যাহা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিলো। প্রশ্ন করিলো, 'মা'র কি খুব অসুখ নাকি, বাবা? আমার তো ভয়ে হাত-পা যেন অবশ হয়ে আসছে। হঠাৎ যেতে বললো কেন রে, বাপু!'

মুখটা বিমর্ষ করিবারও চেষ্টা করিলো। সরল আনন্দকে কিন্তু কৃত্রিম বিষাদে চাপা দিতে পারিলো না সে। সেটুকু শ্বশুরের লক্ষ্য এড়াইলো না, তবে বাৎসল্য নাকি নিজেকেই নিজে প্রবঞ্চিত করে, তাই ভাবিলেন, আহা, বড়ো ছেলেমানুষ, বাড়ি যাওয়ার আহ্লাদেই ও এখন আত্মবিস্মৃত; ভালোই, যতো ভুলিয়া থাকে।

উত্তর দিলেন, 'না, এই সামান্য একটু জ্বর। তবে দেখতে চাইছেন, তুমি গিয়ে দেখে এসো একবার।' মুখে প্রফুল্লতার ভাবটা টানিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন শ্বশুর।

বধূরও লক্ষ্য এড়াইলো না। শ্বশুরকে প্রবঞ্চনা করার জন্য একটু অনুতাপও বোধহয় হইলো। আহা, বুড়ো মানুষ, তায় গুরুজন। কিন্তু তখনই মনে পড়িলো, আরও একটু প্রবঞ্চনা করা দরকার, উচিত হিসাবেও, আবার ওই গোলমেলে চিঠিটা হস্তগত করিয়া ফেলিবার জন্যও। বলিলো, 'কই, চিঠিটা তো দেখলাম না, বাবা; কী লিখেছেন, দেখি-না একবার। আমি যেন কিছু বুঝতে পারছি না, বাপু!'

শ্বশুর বলিলেন 'হ্যাঁ, এই যে।'

এ-পকেট সে-পকেট খুঁজিলেন তিনি। বলিলেন, 'কোথায় যে রাখলাম,

দোবো'খন খুঁজে, ভালোই আছেন, এমন বিশেষ কিছু নয়। যাও; একবার পাঁজিটা নিয়ে এসো দিকিন।'

ভাবিলেন, একেবারে 'শয্যাধরা' লেখা রহিয়াছে, চিঠিটা দেখানো ঠিক নহে। আহা, নিতান্ত ছেলেমানুষ, এ-ক্ষেত্রে একটু প্রবঞ্চনা করাই ভালো। করিলেনও।

বাক্সপত্র গুছাইতে-গুছাইতে আবার হঠাৎ একটা কথা মনে উদয় হইয়া চপলার সর্বশরীর যেন শিথিল করিয়া দিলো, শ্বশুর যে বাবাকে চিঠির উত্তর দিবেন! তাহা হইলেই তো সব ফাঁস হইয়া যাইবে।

আর তাহার পর যে লাঞ্ছনা, যে কেলেঙ্কারি, তাহা ভাবিতেও যে গা শিহরিয়া উঠে!

এমনই অবস্থা যে, মা-দুর্গাকে খোসামোদ করিলেও কোনো সুরাহা হইবার নহে। মরিয়া হইয়া সে ধিক্কার দিলো, 'এই ছিলো তোমার মনে—মা, শেষকালে? তোমারও তো বাপের বাড়ি আছে, পাগলের মতো ছুটে আসতে হয়।'

যুক্তিটা নিশ্চয় মা-দুর্গার মর্মে লাগিলো। প্রথম ঘোরটা কাটিয়া গিয়া চপলার মাথাটা একটু পরিষ্কার হইলো। শ্বশুরের কাছে গিয়া বলিলো, 'বাবা, বলছিলাম যে—'

'—হ্যাঁ মা, বলো।'

'—এই বলছিলাম, আপনি বাবাকে চিঠিটা লিখে আমায় দিয়ে দেবেন, আমিও তার ওপর দুটো কথা লিখে ডাকে—'

'– চিঠি লিখে তো কোনো ফল হবে না,মা। তোমরা তো কাল সকালেই যাচ্ছো। তাই ভাবছি—'

'—হ্যাঁ বাবা, থাক।' স্বস্তির নিশ্বাস পড়িয়া বুকটা হাল্‌কা হইলো।

'—তাই ভাবছিলাম, একটা না-হয় টেলিগ্রাম—'

সর্বনাশ! চপলা একেবারে কপালে চোখ তুলিয়া বলিলো, 'টেলিগ্রাম!'

'—হ্যাঁ মা, তাই ভাবছিলাম; কিন্তু হিসেব করে দেখছি, সেও তো তোমাদের গাঁয়ে তোমাদের আগে পৌঁছুবে না।'

আর একটি স্বস্তির নিশ্বাস। বাবাঃ, ফাঁড়া যেন কাটিয়াও কাটে না!

তাড়াতাড়ি বলিলো 'হ্যাঁ বাবা, আর মিছিমিছি পয়সা খরচও, এই মাগ্‌গি-গণ্ডার দিন।'

বুদ্ধির জোয়ার নামিয়াছে। একটু থামিয়া বলিলো, 'আর এও তো ভেবে দেখতে হবে বাবা, মা'র অমন অসুখ, এর মধ্যে খুট করে বাড়িতে এক টেলিগ্রাম! শেষকালে খুলে পড়বার আগেই কি হতে কি হয়ে পড়বে; আপনিই বলুন না? তার চেয়ে আমার হাতে বরং ভালো করে চিঠি লিখে দেবেন, আমি গিয়েই বাবাকে দিয়ে দেবো।'

প্রত্যর্পণ

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

যে তাহার নাম চাঁপা রাখিয়াছিলো, সে মোটেই ভুল করে নাই। ফুলটির বর্ণের সহিত দেহের বর্ণের কোনও পার্থক্য ছিলো না; কিন্তু চাঁপার অদৃষ্ট ছিলো মন্দ। দশ বৎসর বয়সে গোপাল বৈরাগীর সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছিলো, তেরো বৎসরে সে বিধবা হইলো। তখন চাঁপার মা বাঁচিয়াছিলো; আর একবার চাঁপাকে পাত্রস্থ করিবার চেষ্টা বুড়ী অনেকবার করিয়াছিলো কিন্তু কন্যা রাজী হইলো না। তারপর মা মরিয়া গেল। চাঁপাও নিরুদ্বেগে দিন কাটাইয়া সবে বিশ বৎসরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

একেবারেই নিরুদ্বেগে দিন কাটাইয়াছে বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। তাহার রূপের পূজারীর অভাব ছিলো না; নবীন গোয়ালা হইতে আরম্ভ করিয়া ছিদাম বৈষ্ণব পর্যন্ত সকলেই এক-আধবার তাহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া ধমক্ খাইয়া গেছে। আজকাল আর বড়ো কেহ চাঁপার কাছে বিবাহের প্রস্তাব লইয়া আসিতো না। একে চাঁপার ধর্ম-বাপ গ্রামের জমিদার রাজীববাবুর শাসন, তাহার উপর চাঁপার তিরস্কার, এই দুইটি পদার্থ পাণিপ্রার্থীদের আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিতেছিলো।

চাঁপা লেখাপড়া কিছু জানিতো। গ্রামের প্রাইমারী বালিকা বিদ্যালয়ে লব্ধ বিদ্যাকে সে ক্রমাগত রামায়ণ-মহাভারত পড়িয়া অনেকদূর অগ্রসর করিয়া লইয়াছিলো। সকালে মুড়ি ভাজিয়া বৈকালে রূপগাঁর বাজারে সে সেই মুড়ি বেচিতো। রাত্রে ফিরিয়া তাহার সঙ্গিনী জমিদার বাড়ির ঝি লক্ষ্মী-বুড়িকে শ্রোত্রীর আসনে বসাইয়া মহাভারত পড়িতো, এইরূপে চাঁপার দিন কাটিয়া যাইতেছিলো।

সেদিন শ্রাবণের মেঘ অপরাহ্ণেই সন্ধ্যা ঘনাইয়া তুলিয়াছে। চাঁপা

প্রত্যর্পণ

তাড়াতাড়ি মুড়ি বেচিয়া বাড়ি ফিরিলো। গৃহের বাহিরের আঙিনায় নিম গাছের ঘন ছায়া অন্ধকার রচনা করিয়া রাখিয়াছে। আঙিনায় পা দিয়াই চাঁপা দেখিলো, কে যেন বারান্দায় শুইয়া রহিয়াছে। অন্ধকারে স্পষ্ট কিছু দেখিবার উপায় ছিলো না, চাঁপা প্রশ্ন করিলো, 'কে ও?' কোনো উত্তর আসিলো না। তখন মুড়ির ডালাটি রাখিয়া একটি প্রদীপ হাতে করিয়া সে বাহিরে আসিলো

যে শুইয়াছিলো তাহাকে চাঁপা কোনও দিন দেখে নাই। কুড়ি-বাইশ বছরের এক যুবক চক্ষু মুদিয়া শুইয়াছিলো, চাঁপা তাহার কাছে দাঁড়াইয়া আবার প্রশ্ন করিতেই যুবক চক্ষু মেলিয়া কহিলো, 'জল।'

চাঁপা জিজ্ঞাসা করিলো, 'তুমি কে? কি হয়েছে তোমার?'

যুবক শুধু কহিলো, 'জল। পিপাসা।'

চাঁপা বুঝিলো, আগন্তুক অসুস্থ। ঘটিতে জল আনিয়া তাহাকে জলপান করাইয়া গায়ে হাত দিয়া দেখিলো দারুণ জ্বর। জিজ্ঞাসা করিলো, 'কে তুমি? এখানে কি করে এলে?'

যুবক যাহা বলিলো, তাহার সংক্ষিপ্তসার এই যে, তাহার নাম বনমালী। মহেশতলায় যাইতে জ্বরের বেগ প্রবল হওয়ায় এইখানে শুইয়া আছে, জ্বর কমিলেই চলিয়া যাইবে। মহেশতলা রূপগাঁ হইতে দুই ক্রোশ পথ। আত্মীয় থাকিলে সেখানে সংবাদ পাইবে ভাবিয়া চাঁপা প্রশ্ন করিলো, 'সেখানে তোমার কে আছে?'

যুবক শুধু কহিলো, 'কেউ না। মন্দির দেখতে যাচ্ছিলাম।'

চাঁপা একটু বিব্রত হইয়া কহিলো, 'তাইতো! এখানে তোমাকে কে দেখবে? কোথা থেকেই বা এলো!'

যুবক কহিলো, 'কাউকে দেখতে হবে না। জ্বর কমলেই আমি চলে যাবো। তুমি যাও।'

যুবকের স্বরে একটু তীব্রতা ছিলো, চাঁপা তাহা অনুভব করিলো। সে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলো না, 'মাথার কাছে ঘটিতে জল রইলো, পিপাসা হলে খেও।' বলিয়া চাঁপা ভিতরে চলিয়া গেল।

রাত ন'টায় চাঁপা একবার বাহিরে আসিলো। বনমালী তখন জ্বরের

ঘোরে অস্ফুটস্বরে প্রলাপ বকিতেছিলো। চাঁপা প্রমাদ গণিলো, বাহিরে এই অবস্থায় একটা মানুষকে কি করিয়া ফেলিয়া রাখা যায় ? আর ভিতরেই বা অপরিচিত যুবাকে স্থান দেয় কি করিয়া ? মানসিক অবস্থা যখন এইরূপ সেই সময়ে লক্ষ্মী আসিয়া উপস্থিত হইলো। সমস্ত শুনিয়া সে কহিলো, 'তা আর কি করবে ? কৃষ্টের জীব, ফেলতে তো পারবে না! বাইরের ঘরে মাচার ওপর বিছানা করে দাও। আহা, কার বাছা যেন !'

সেইটিই সুযুক্তি বোধ হইলো ; বিছানা পাতিয়া দুইজনে ধরাধরি করিয়া আনিয়া বনমালীকে ভিতরে শোয়াইয়া দিলো। সারা রাত্রি ধরিয়া মাথায় জল ঢালিয়া আর পাখার বাতাস করিয়া চাঁপা যখন ঘুমাইয়া পড়িলো, তখন প্রভাত হইয়া গিয়াছে।

সেদিন আর মুড়ি ভাজা হইলো না।

সেদিনও জ্বর পূর্ববৎ রহিলো। চাঁপা প্রথম-প্রথম বিরক্তি বোধ করিতেছিলো, কিন্তু দুপুরে জ্বরের ঘোরে যখন বনমালী তাহার হাত দু'খানি ধরিয়া কহিলো, 'তুমি অনেক করেছো আমার জন্যে—কিন্তু আমি বোধ-করি বাঁচবো না।'

তখন অকস্মাৎ চাঁপার চক্ষু দুইটি ছল্‌-ছল্‌ করিয়া উঠিলো। মুহূর্তের মধ্যে নিজের সমস্ত শ্রম ও অসুবিধার কথা ভুলিয়া গিয়া সে কহিলো, 'ভয় কি ? সেরে উঠবে। তুমি ঘুমোও, আমি বদ্যি ডেকে আনছি।'

মাখন কবিরাজ আসিয়া ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন।

পাঁচদিন দোকান-পাট ফেলিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে চাঁপা বনমালীর সেবা করিলো। কবিরাজ যেদিন আসিয়া কহিয়া গেলেন যে, ভয়ের কারণ আর নাই, সেদিন চাঁপা আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলো। বনমালী তাহার হাত ধরিয়া কহিলো, 'কাঁদছো কেন ? আমি সেরে উঠেছি।'

চাঁপা হাত ছাড়াইয়া পথ্য আনিতে চলিয়া গেল।

অন্নপথ্য পাইবার পর বনমালী কহিলো, 'তুমি যা করেছো আমার জন্যে, তার শোধ নেই। যদি ভগবান দিন দেন—'

চাঁপা কহিলো, 'সে-সব আর এখন শুনতে পারিনে। হপ্তা ধরে দোকান

বন্ধ, এখনি যাবো আমি। তুমি বাইরে বেরিও না, ঘরেই থাকো। আর এই ওষুধটা—' বলিয়া এক মোড়ক গুঁড়া বনমালীর হাতে দিয়া কহিলো, 'এটা দুপুরে তুলসী-রস দিয়ে খেও। আমি এখন স্নান সেরে তুলসী তুলে দিয়ে যাবো'খন।'

সমস্ত দিন ধরিয়া বনমালী কতো কি ভাবিলো। এই দরিদ্র নারীর উপার্জন সে কেবল বসিয়া-বসিয়া ভোগ করিতেছে। এ অবস্থাটা সুখকর নহে। সন্ধ্যায় চাঁপা ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলো, 'জ্বর আসেনি ?'

বনমালী কহিলো, 'না।' পরক্ষণেই কহিলো, 'দেখো, আমি যেতে চাই !'

চাঁপার মুখ সহসা গম্ভীর হইয়া গেল। অন্ধকারে বনমালী তাহা দেখিতে পাইলো না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া সে কহিলো, 'তা বেশ, যাও না। তা আর আমায় জিগ্যেস কেন ?'

কথাটি ঠিক অনুমতির মতো শোনাইলো না দেখিয়া বনমালী চুপ করিয়া গেল। এক প্রহর রাত্রে যখন দুধ-বার্লি লইয়া চাঁপা, উপস্থিত হইলো তাহার কাছে, তখনও তাহার মুখের কালো ছায়াটি কাটিয়া যায় নাই। বনমালী এক চুমুকে পাত্রটি নিঃশেষ করিয়া কহিলো, 'দেখো, তুমি গরীব। আর কতদিন আমাকে পুষবে ? সেইজন্যেই যেতে চাইছি। এখন ভালো হয়েছি, বোধ-করি যেতে পারবো।'

চাঁপা একবার বনমালীর মুখের দিকে চাহিলো। তাহার যে যাওয়াই উচিত তাহাতে চাঁপারও কোনও সন্দেহ ছিলো না, কিন্তু মনের একটি কোণে একান্ত অসহায় অতিথিটির জন্য খানিকটা মমতা সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিলো, 'চলিয়া যাও' বলিতে মন সরিতেছিলো না। অনেক ভাবিয়া কহিলো, 'দু'বেলা ভাত খেয়েই চলে যেও।'

'—আচ্ছা' বলিয়া বনমালী শয্যা লইলো।

সেদিন বনমালী একান্তই ধরিয়া বসিলো যে, বিকালেও তাহাকে ভাত দিতে হইবে। আপত্তি করিলে সে অন্য-কিছু ভাবিয়া লইতে পারে, এই মনে ভাবিয়া চাঁপা কহিলো, 'বেশ !' কিন্তু তাহার মুখের ভাব বদলাইয়া গেল,

সমস্ত দিন আর সে ভালো করিয়া বনমালীর সঙ্গে কথা কহিলো না। বনমালী তাহা লক্ষ্য করিলো। কয়েকদিন নিয়ত নারীর সংসর্গে থাকিয়া রমণীর চিত্ত বিশ্লেষণের তাহার কিঞ্চিৎ ক্ষমতা জন্মিয়াছিলো।

অপরাহ্নে উনান জ্বালিয়া চাঁপা হাঁড়ি চড়াইয়াছে এমন সময় ভিক্ষার ঝুলি হাতে করিয়া এক বৈষ্ণব আসিয়া আঙিনায় দাঁড়াইয়া অতি করুণকণ্ঠে কহিলো, 'দুটো চাল দাও মা, বৈষ্ণব, একাদশীর দিন। পারণ করবো।'

একাদশী শুনিয়াই চাঁপার বুকের ভার যেন অনেকটা লঘু হইয়া গেল, বনমালীর দিকে ফিরিয়া সে কহিলো, 'আজ যে একাদশী, তা তো ভুলেই গেছ্‌লাম।

বনমালী সমস্তদিন ধরিয়াই চাঁপার ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছিলো। এ কথাটির উদ্দেশ্য কি বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইলো না, কহিলো, 'তাহলে আজ আর ভাত খাবো না। থাক।'

চাঁপার মুখখানি প্রসন্ন হইয়া উঠিলো, কহিলো, 'রুটি গড়ে দেবো, দুধ দিয়ে তাই খেও, কি বলো?'

বনমালী নিতান্ত সুবোধ বালকের মতো কহিলো, 'তাই দিও।'

ভিখারী সেদিন চাঁপার বাড়ি হইতে তিনদিনের উপযোগী সিধা লইয়া চলিয়া গেল।

পরদিন বনমালী আর বৈকালে ভাত খাইবার জন্য জিদ্ করিলো না, শুধু বাজারে যাইবার সময় এক দিস্তা রঙীন কাগজ আনিতে চাঁপাকে বলিয়া দিলো। রাত্রে রঙীন কাগজের দিস্তাটি হাতে করিয়া বনমালীর ঘরে আসিয়া চাঁপা জিজ্ঞাসা করিলো, 'আজ কি ভাত খাবে?'

এ প্রশ্নের উত্তর বনমালী অনেকক্ষণই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলো, কহিলো, 'না। এ ক'দিন থাক, একেবারে পূর্ণিমার পরেই খাবো।'

চাঁপা খুশি হইয়া চলিয়া গেল।

প্রভাতে উঠিয়া চাঁপা দেখিলো যে, তাহার ঘরের দাওয়ায় আট-দশটি রঙীন কাগজের খাঁচা, তাহার মধ্যে নানা রঙের পাখি। খাঁচা আর পাখির নির্মাণ কৌশল দেখিয়া সে আশ্চর্য হইয়া গেল। বেলা হইলে বনমালী যখন চোখ মুছিতে-মুছিতে বাহিরে আসিলো তখন চাঁপা কহিলো, 'কাল

প্রত্যর্পণ

সারারাত জেগে বুঝি এই সব করেছো? এরপর যদি অসুখ করে তাহলে কে দেখবে বলো তো?'

বনমালী সে কথার কোনও জবাব না দিয়া কহিলো, 'তুমি তো বাজারে যাবে, এগুলো নিয়ে যাবে।'

চাঁপা কহিলো, 'কি হবে?'

বনমালী কহিলো, 'বিক্রি! দু'দশ আনা যা হয় তাই লাভ। শুধু বসে বসে খাচ্ছি।'

চাঁপা বলিলো, 'তা বলে তুমি রাত জেগে রোগ করে আমাকে ভোগাবে? আর এ-সব বইবে কে? আমি একা মানুষ মুড়ি দেখবো না পাখি দেখবো?'

বনমালী চুপ করিয়া গেল।

বৈকালে চাঁপা দেখিলো যে, সূতার সঙ্গে খাঁচাগুলি ঝুলাইয়া বনমালী বাহির হইতেছে। সকালবেলার কথাগুলি মনে পড়িলো। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া কহিলো, 'তোমাকে আর যেতে হবে না—এক হাঁটু কাদা ভেঙে বাজারে! এমন মানুষ আমি দেখিনি। দাও দেখি আমার হাতে।'

বনমালী বিনা বাক্যে খাঁচার সূতাগাছি চাঁপার হাতে দিয়া কহিলো, 'বেশ সাবধান করে নিয়ে যেও। জোর হাওয়া লাগলে ছিঁড়ে যাবে।

চাঁপা মুড়ির ডালি মাথায় করিয়া হাতে খাঁচাগুলি ঝুলাইয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যায় ফিরিয়া চাঁপা হাসিতে-হাসিতে কহিলো, 'এই নাও গো তোমার খাঁচার দাম। দু'টাকা ছ'আনা।

বনমালী হাত সরাইয়া কহিলো, 'তুমি রাখো!'

চাঁপা কহিলো, 'তোমার জিনিস—'

বনমালী তাহাকে বাধা দিয়া একান্ত অসঙ্কোচে চাঁপার আঁচলের খোঁটায় পয়সাগুলি বাঁধিয়া দিয়া কহিলো, 'তুমি যদি না বাঁচাতে তবে এ খাঁচা কে গড়তো, চাঁপা?'

চাঁপা একবার মাত্র বনমালীর দিকে চাহিয়া রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিলো।

পরদিন হইতে বনমালী রীতিমতো কাগজের ফুল পাখি পাতা গড়িতে লাগিয়া গেল। চাঁপা অবসর মতো তাহার কাজে সাহায্য করিতো। এইরূপে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। একদিন বনমালী কহিলো, 'আচ্ছা,

একটা দোকান-ঘর ভাড়া করলে হয় না? মুড়ি-মুড়কী থাকবে তার সঙ্গে থাকবে ফুল-পাখি-খেলনা। দিনেরবেলা সেখানে বসেই কাজ করবো।'

চাঁপা উৎসাহিত হইয়া কহিলো, 'সে খুব ভালো হবে। তুমি বেচা-কেনা জানো তো? অনেকে আবার ঠকিয়ে নেয়।'

বনমালী কহিলো, 'তুমি শুধু দাম বলে দাঁড়ি পাল্লা ঠিক করে দেবে। আর সব আমি নিজে করবো।'

ইহার পর দোকানে কি-কি রাখিবে সে সম্বন্ধে অনেক রাত্রি পর্যন্ত আলোচনা হইলো। প্রতিবেশিনী মণি বৈষ্ণবীর মতো দোকান করিবার ইচ্ছা চাঁপার অনেকদিন হইতেই ছিলো, কিন্তু একা মানুষের সাধ্য নয় বলিয়া এতদিন অভিপ্রায়টি কার্যে পরিণত হয় নাই। বহুদিনকার আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা আসন্ন দেখিয়া সে অতিমাত্রায় উৎসাহিত হইয়া উঠিলো, সারারাত এই উৎসাহের উত্তেজনায় তাহার ঘুম হইলো না। তাহার মুড়ি-মুড়কির দোকান কয় বৎসরে নবীন সরকারের মতো মনোহারী দোকানে রূপান্তরিত হইতে পারে, তাহারও একটা সময় সে স্থির করিয়া রাখিলো।

চাঁপার দোকান-ঘর ভাড়া করা হইয়া গিয়াছে। মাসিক ভাড়া সাড়ে পাঁচ টাকা শুনিয়া চাঁপা প্রথমে একটু দমিয়া গিয়াছিলো। বনমালী আশ্বাস দিয়া কহিলো, 'সাড়ে পাঁচ টাকা তো একদিনের রোজগার, চাঁপা। পূজোর বাজারে একদিনে কাগজের হাতি আর নৌকো বেচে তোমায় বছরের ভাড়া তুলে দেবো।'

চাঁপা হাস্যময় স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে বনমালীকে পুরস্কৃত করিলো।

রং-বেরং কাগজের ফুল দিয়া বনমালী দুইদিন ধরিয়া ঘরখানি সাজাইয়া ফেলিলো। দোকান সাজানো হইলে চাঁপার সঙ্গে তাহার দুই-একজন বান্ধবী সন্ধ্যাকালে দোকান দেখিতে আসিলো। কি চমৎকার! সমস্ত ঘরখানিতে যেন হাজার-খানেক রঙিন প্রজাপতি উড়িয়া আসিয়া বসিয়াছে। শিল্পীকে প্রশংসা করিয়া মণি বৈষ্ণবী চাঁপার কানে-কনে কহিলো, 'বড়ো ভাগ্যি রে তোর, চাঁপা। দেখিস আবার হেলায় হারাস্ নি যেন!' চাঁপা লজ্জায় লাল হইয়া গেল।

সেদিন ফিরিতে তাহার রাত্রি হইলো। সে একেবারে ভট্টাচার্যমহাশয়ের

নিকট হইতে দোকান খুলিবার দিনক্ষণ পর্যন্ত জানিয়া আসিয়াছে। মাথায় মুড়ির ডালিতে দিস্তা-খানেক খবরের কাগজ।

'—এ কাগজ কি হবে, চাঁপা?' বনমালী জিজ্ঞাসা করিলো।

'—ঠোঙা গড়তে হবে যে। সবাই তো আঁচল পেতে মুড়ি নেবে না।'

হাত বাড়াইয়া বনমালী কহিলো, 'দাও। রাতে তৈরি করে রাখবো।'

'—সারাদিন মেহনৎ করছো, আবার সারারাত জাগতে চাও? তোমার সখ তো খুব!' এই বলিয়া চাঁপা একেবারে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিলো।

আহারান্তে নিজের ঘরে চাঁপা ঠোঙার জন্য কাগজ কাটিতে বসিয়া গেল। কাল দোকানের অন্যান্য আসবাব-পত্র যোগাড় করিতে হইবে। হাতে কাঁচি চলিতেছিলো আর চাঁপার সমস্ত মন তখন মুড়ি-মুড়কির দোকান হইতে আরম্ভ করিয়া নবীন সরকারের মনোহারী ও গোপাল গোয়ালার সন্দেশের দোকান আশ্রয় করিয়া ঘুরিতেছিলো! বেশ স্পষ্টই সে দেখিতে পাইতেছিলো যে, বনমালী রীতিমতো মোটা-সোটা হইয়া লাল খেরুয়ার বাঁধা খাতাখানিতে বড়ো-বড়ো টাকার অঙ্ক কাঁদিতেছে। দোকানের সম্মুখে পথের ধারে অসংখ্য খরিদ্দার আর পিছনে কুঞ্জলতার বেড়ায় ঘেরা ছোটো বাড়ি-খানির আঙিনায় বসিয়া সোনার সূতায় গাঁথা তুলসী-মালা লইয়া সে জপ করিতেছে। আরো যে কতো প্রকারের সুখ-স্বপ্নই শরতের মেঘের মতো একে একে চাঁপার মনের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিলো তাহার সংখ্যা নাই। সহসা সে চমকিয়া উঠিলো। বনমালীর ছবি! খবরের কাগজে বনমালীর ছবি উঠিলো কেমন করিয়া? তাড়াতাড়ি প্রদীপটির কাছে আনিয়া ছবির নীচে লেখা কয়েক ছত্রে চাঁপা চোখ বুলাইয়া লইলো! নিমিষে কোথা হইতে এক অন্ধকারের বন্যা আসিয়া তাহার দোকান-পসার বাড়ি-ঘর সব ভাসাইয়া লইয়া গেল; রহিলো শুধু বনমালীর ছবি, কয়েক পংক্তি অক্ষর আর চাঁপা নিজে। পর মুহূর্তেই দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া সুদীর্ঘ একটি নিশ্বাস টানিয়া চাঁপা কহিলো, 'উঃ!'

একখানি বাংলা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় বনমালীর ছবি, তাহার নিচে লেখা—'আমার ভ্রাতা শ্রীমান্ বনমালী বসু আজ ছয়মাস যাবৎ নিরুদ্দেশ। আমার মাতা তাহার জন্য অন্ন-জল ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার

বাঁচিবার আশা নাই। শ্রীমান্ সামান্য কারণে রাগ করিয়া বাড়ি হইতে চলিয়া গিয়াছে। যিনি তাহার সন্ধান করিয়া দিবেন, তাঁহাকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। —শ্রীকানাইলাল বসু, বর্ধমান।

রাত্রি শেষ হইতে যখন দণ্ডখানেক বাকী ছিলো, তখনও চাঁপা কাগজখানি সম্মুখে ধরিয়া আবিষ্টের মতো বসিয়াছিলো। সহসা কাকের ডাকে তাহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিলো। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে কি ভাবিলো, তাহার পর ভিন্‌গাঁয়ে তাহার মামাতো-ভাই পোষ্টাফিসের পিওন, নাম জলধর, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিয়া গেল।

বনমালী যখন সবে হাত-মুখ ধুইয়া বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া বসিয়াছে তখন চাঁপা ফিরিলো। তখন বেলা হইয়াছে। বনমালী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলো, 'কি হয়েছে তোমার, চাঁপা?' চাঁপা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া কহিলো, 'কিছু না।' তাহার পর মুড়ি ভাজিবার অছিলায় সে বাহির হইয়া ফিরিলো সন্ধ্যার পর।

বনমালী অত্যন্ত উদ্বেগে সমস্ত দিন কাটাইয়া সন্ধ্যায় পথে দাঁড়াইয়া চাঁপার অপেক্ষা করিতেছিলো, চাঁপাকে আসিতে দেখিয়াই কহিলো, 'আজ সারাদিন তোমাকে না দেখে কেবলই ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছি।'

এই কথা শুনিয়া চাঁপার চোখে জল আসিলো। কোনমতে সামলাইয়া সে জবাব দিলো, 'আজ রতন-গাঁয়ে মুড়ির যোগান দিতে গেছ্‌লাম।'

বনমালী কহিলো, 'সারাদিন খাওনি তাহলে! হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও গে। ভাত-তরকারী ঢাকা আছে। আমি একবার দোকানটা দেখে আসিগে।' বনমালী চলিয়া গেল।

দাওয়ায় আঁচল বিছাইয়া চাঁপা ঘণ্টাখানেক গড়াইলো, তাহার পর তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া ভাত লইয়া বসিলো।

বনমালী তাহারই জন্য ভাত রাঁধিয়া গিয়াছে। বিধাতার কি পরিহাস! অন্নের প্রথম গ্রাসটি কপালে ঠেকাইয়া মুখে দিতে গিয়াই সে ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিলো। পরক্ষণেই ভাতের থালা ঢাকিয়া রাখিয়া সে উঠিয়া গেল।

সেদিন আর খাওয়া হইলো না।

কয়দিন হইতে চাঁপা কেন এতো বিমর্ষ আর গম্ভীর হইয়া আছে, বনমালী

তাহা বুঝিতে পারিলো না। চতুর্থদিন আহারান্তে জিজ্ঞাসা করিলো, 'কই, আজ যে দোকান খুলবে? সব আমাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দাও।'

চাঁপা একটি কথা বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শুধু কহিলো, 'সে আজ থাক।'

'—কেন? সামনে পূজোর মরশুম, এখন থেকে গুছিয়ে না নিলে কি করবে? একটা যে দোকান তা তো খদ্দেরের জানা চাই।'

চাঁপা তুলসীতলায় গোবর লেপিতেছিলো, হতাশা-উদাস স্বরে অতি মৃদু কণ্ঠে কহিলো, 'আর দোকান!'

বনমালী শুনিতে পাইলো না, ফিরিয়া সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিলো। চাঁপা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলো, 'দোকানের কথা জানেন নারায়ণ। তুমি আর আমাকে জিগ্যেস করো না।'

বনমালী যদিও এ-কথার অর্থ কিছু বুঝিলো না, তথাপি চাঁপার মুখ দ্বিতীয় প্রশ্ন করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিলো।

বৈকালে তাহার ঘরের বারন্দায় মাথা নিচু করিয়া চাঁপা কাঁথা সেলাই করিতেছিলো আর বনমালী বাহিরের ঘরের রোয়াকে পা ঝুলাইয়া বসিয়া অবিলম্বে দোকান খুলিবার পক্ষে অনেক রকম যুক্তি দেখাইয়া অনর্গল বকিতেছিলো। এমন সময় বাহিরের দরজার কাছে কে ডাকিলো, 'চাঁপা, বোষ্টুমী বাড়িতে আছো।'

চাঁপা উত্তর দিবার পূর্বেই একটি আধ-বয়সী ভদ্রলোক এক বৃদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া আঙিনায় প্রবেশ করিলেন। অকস্মাৎ ভ্রাতা ও জননীকে দেখিয়া বনমালী একেবারে বিমূঢ় হইয়া গেল। বৃদ্ধা বনমালীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। চাঁপা কোনো কথা না বলিয়া বনমালীর ঘরের বরান্দায় একখানি মাছুর বিছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

বাহিরে গরুর গাড়ি অপেক্ষা করিতেছিলো। রাঁধিবার অছিলায় চাঁপা একটি হাঁড়িতে শুধু জল চাপাইয়া রান্নাঘরে উনুন জ্বালাইয়া বসিয়াছিলো। এমন সময় ঝড়ের মতো বনমালী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলো, 'আমি চল্লাম।

কিন্তু তুমি কেন আমার সঙ্গে চাতুরী করলে ? আমাকে সইতে পারো না বললেই তো আমি চলে যেতাম।'

বনমালীকে দেখিয়া চাঁপা উঠিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইলো, বনমালীর অভিযোগের উত্তরে একটি কথাও কহিলো না। একবার তাহার দিকে চাহিলো মাত্র। বনমালী সে সজল চক্ষুর ব্যথাতুর দৃষ্টির অর্থ বুঝিলো না। শ্লেষের স্বরে কহিলো, 'পাঁচশো টাকার লোভ বুঝি !' ভ্রাতা যে তাহার সন্ধানের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন তাহা সে জানিতো।

বনমালীর কথা শুনিয়া চাঁপার চোখে আগুন জ্বলিয়া উঠিলো, কি যেন সে বলিতে যাইতেছিলো এমন সময়, 'চাঁপা মা-লক্ষ্মী কোথা ?' বলিতে-বলিতে বনমালীর মাতা গৃহে প্রবেশ করিলেন, চাঁপাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, 'আমি চললাম মা, তুমি বুড়ির হারানো ধন ফিরিয়ে দিয়েছো, তোমার অক্ষয় বৈকুণ্ঠ হবে। আর বলবার কিছুই নেই, বুড়িকে বাঁচিয়েছো ; যে ক'টা দিন বাঁচবো, নিত্য তোমার নামে নারায়ণকে তুলসী দেবো। এই নাও, সংসারে কতো দরকার কতো রকম আছে, কাছে রাখো।' বলিয়া অনেক প্রকার আশীর্বাদের সঙ্গে ছোটো একটা পুঁটুলী তাহার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। চাঁপা অপলক নেত্রে চলন্ত গো-যানখানির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলো।

এমন সময় মনি-বৈষ্ণবীর রাখাল মানিক আসিয়া ডাকিলো, 'চাঁপাদি ?'

চাঁপার বাড়িতে কে আসিয়াছে জানিবার জন্য মনি তাহাকে পাঠাইয়াছিলো। মানিককে দেখিয়া চাঁপার হুঁস হইলো, একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে কহিলো, 'দয়াল হরি। হরি হে।' তারপর রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করিতে গিয়া হাতের মুঠায় ছোটো পুঁটুলিটি চোখে পড়িলো। খুলিয়া দেখিলো একশত টাকার পাঁচখানি নোট। পুরস্কার ! বিদ্রূপের হাস্যে চাঁপার ওষ্ঠ কুঞ্চিত হইয়া উঠিলো। সে মানিককে কহিলো, 'একটু আয়তো মানিক ! দেখি আমি, গাড়িটা কতদূর গেল !'

গাড়ি তখন কেবল বাবুদের দীঘি ছাড়াইয়া গেছে, এমন সময় পিছন হইতে হাঁপাইতে-হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া মানিক কহিলো, 'গাড়ি রাখো একটুখানি !'

কানাইলাল মুখ বাহির করিয়া কহিলেন, 'কে ?'

'—আমি মানিক ঘোষ। এই নিন্, চাঁপাদি পুঁটুলী ফিরিয়ে দিয়েছে !' পুঁটুলীটি গাড়ির মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে বাঁকা-পথে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বনমালী জিজ্ঞাসা করিলো, 'কি ও দাদা ?'

কানাই কহিলো, 'সেই পাঁচশো টাকার নোট দেখছি ফিরিয়ে দিয়েছে।'

মুহূর্তের জন্য বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া পরক্ষণেই বনমালীর চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিলো।

চাঁপা আজও মাথায় করিয়া মুড়ি বেচে। তার সেই দোকান-ঘর তালা বন্ধ, কিন্তু মাসে মাসে চাঁপা তাহার ভাড়া যোগাইয়া যায়, প্রতি সন্ধ্যায় সন্ধ্যাদীপ দেয়, কেন তাহা কেহ বলিতে পারে না।

প্রত্যাবর্তন

শ্রীবাসব

এমনি তাদের দু'জনের ঘরোয়া অন্তরঙ্গতা বেশ প্রগাঢ় ছিলো। বিমান মানুষটি ভীরু প্রকৃতির। নির্বিবাদী। মনটা তার অবারিত আকাশের মতই উদার। তার মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা ছিলো না। শরীরও তার বেশ সুস্থ ও সবল। সুপুরুষ বলা চলে। উৎপলা কিন্তু একটু অদ্ভুত প্রকৃতির। আনমনা ও উদ্ধত। তার হাবভাবে, চলাফেরায় যেন জগতের সমস্ত পুরুষের প্রতি একটা কেমন ঔদাসীন্য ও তাচ্ছিল্যের ভাব আছে। সুশ্রী, পাতলা গড়ন, রং বেশ ফর্সা, চোখ দু'টি কালো ও ডাগর। চোখের দৃষ্টিতে সঙ্কোচ ও বিদ্রূপ মেশানো চকিত-দৃষ্টি। ঠোঁট দু'টি ঈষৎ চাপা। ব্যর্থতার বেদনায় কি উপেক্ষায় ঠিক বোঝা যায় না। তবে সে যে বিমানের মতো স্পষ্ট নয়, এ-কথা সত্য। তার মাঝে যেন কি এক রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে।

আসলে উৎপলা আকাশ-প্রমাণ উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে সংসারে প্রবেশ করেছিলো। কিন্তু বেচারী হতাশ হয়েছে। তাছাড়া দুঃখের বিষয়, বিয়েটা ঠিক তার আশা-মতো ঘটে ওঠেনি। বিয়েটা তাদের নিতান্তই গতানুগতিক। অমোঘ নিয়তির খেলা। অপরিচয়ের আড়াল ভেঙে ওরা এলো পরস্পরের কাছে। অজানা, অচেনা, আলাদা ছিলো, হঠাৎ একদিন কাছে এসে দু'জনে এক হয়ে গেল। যেমন শতকরা নিরানব্বইজনের হয়।

স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ, কঠিন অটল নিয়মানুবর্তিতায় সমস্ত জীবন একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। স্ত্রীর কর্তব্য কী—উৎপলা তা জানে এবং বাধ্য হয়েই তা সে পালন করে। ইচ্ছায় বা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হোক, যে সম্পর্ক তাদের গড়ে উঠেছে বা সমাজ গড়ে তুলেছে, তা আলো-বাতাসের মতই এমনি সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার যে, মেনে চলা ভিন্ন উপায় নেই। তবুও মাঝে-মাঝে সে

প্রত্যাবর্তন

স্বামীর প্রতি কেমন বিমুখ হয়ে ওঠে। তার সঙ্গ যেন আর ভালো লাগে না, অসহ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে উৎপলা সারাদিন সংসারের কাজ করে, স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখে, আবার যখন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে, তখন সে আর নিজের কর্তব্যনিষ্ঠাকে ধরে রাখতে পারে না। নিজের প্রকৃতিকে সে কিছুতেই দমন করতে পারে না। তার মনে হয়—তার কাজেরও শেষ নেই, নিষ্ঠারও অন্ত নেই। অথচ এই জীবনের কাছে উপরি-পাওনার কোনো প্রত্যাশা নেই। এ স্রেফ দাসীবৃত্তি।

স্বামী কাছে এলে সে চোখ তুলে তাকায় না। উৎপলার মনে হয়, স্বামীর দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহের রেখায়-রেখায় প্রভুত্বের ভাব স্পষ্ট হয়ে ফুটে আছে। সে সহ্য করতে পারে না। তার চোখ দু'টি জ্বালা করতে থাকে। তার জীবনের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে সর্বস্ব অপহরণ করার জন্য স্বামীর বিরুদ্ধে একটা আক্রোশ জেগে ওঠে। সে নিজেকে দমন করতে পারে না। কারণে-অকারণে সে স্বামীর মুখের উপর বলে বসে, 'আমি তোমার দাসী-বাঁদী নই। ভুলে যেও না যে, আমিও মানুষ!'

বিমান তাকে এড়িয়ে চলে। বলে, 'তোমারই, সংসার পলা, তোমারই তো স্বামী।'

এমনি সম্পর্কের মধ্য দিয়েই মাসের পর মাস কাটে। বছরের পর বছর কেটে যায়। অথচ মনের দিক থেকে সত্যকার তাদের কোনো উন্নতি দেখা যায় না। উৎপলা স্বামীকে কোনদিন সত্য করে চায়নি। অথচ সে কর্তব্যনিষ্ঠার দোহাই দিয়ে, দাম্পত্য-ধর্মের অজুহাতে দিনের পর দিন স্বামীকে উপহার দিয়েছে নিজের দেহ। গর্ভে ধরেছে বিমানের সন্তানকে। উৎপলাকে তার জন্য দোষ দেওয়া যায় না। জীবনের উত্তাপ অনাসক্ত মনকেও মোহগ্রস্ত করে তোলে। জীবনের উত্তাপ দিয়ে, যৌবনের সম্ভোগ দিয়ে মনের বিভেদ ঢাকবার প্রয়াস তো অস্বাভাবিক নয়। তাই উৎপলা স্বামীর অধিকারকে কোনদিন সঙ্কুচিত করেনি। তার নিজস্ব সত্তাকে বিসর্জন দিয়েছে স্বামীর ইচ্ছাতলে। এমনিভাবেই বর্বর-যুগের নারী সাড়া দিয়েছিলো আদিম পুরুষের ডাকে। উৎপলার মনে হয়—সেই যুগই এখন চলে আসছে, শুধু এই মেয়ে-পুরুষের মিলনকে নিয়ন্ত্রিত করছে সমাজ। এই সভ্যতার যুগেও

নারীর স্বকীয় ইচ্ছা বলে কিছু নেই! দাম্পত্য-ধর্মের সু-কঠোর নীতিকে সে মনে-মনে মেনে নিয়েছে। স্বামীর ইচ্ছাকে সে খর্ব করতে চায় না। স্বামীর কাজ হচ্ছে—ঘরে মেয়েদের খুশি রাখা, মেয়েদের কাজ হচ্ছে—পুরুষকে শান্ত রাখা। উৎপলার মতে এই হচ্ছে চিরন্তন দাম্পত্য-নীতি। নীতিকে সে মেনে চলতে চায়, শুধু মাঝে-মাঝে যখন সে নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে না, তখনি তার মনটা বিষিয়ে ওঠে। কামনাময় মুহূর্তে স্বামীকে সে ঘৃণা করে।

উৎপলার মাঝে-মাঝে স্বামীর উপর রাগ হয়, অকারণেই। তার চেহারার ছাঁদ যায় বদলে। নিজেকে অত্যন্ত হৃতবল ও মুহ্যমান মনে হয়।

বিমানের মনে কোনো ক্ষোভ নেই, ভ্রূক্ষেপ নেই। উৎপলা সম্বন্ধে তার মনে কোনো সংশয় বা অনুযোগ-অভিযোগের কারণও নেই। কারণ ঘটলেও সে সম্বন্ধে সে উদাসীন, নির্বিকার। সে চিরদিনই উৎপলার কাছে হার মেনেছে। তাতেই তার আনন্দ। আসলে সে জানে—উৎপলার চেয়ে সে বড়ো। উৎপলা তার স্ত্রী, তার অধীন! উৎপলাকে সে সত্যকার জয় করতে পেরেছে কিনা সে জানতেও চায় না, জানেও না। উৎপলাকে তার ভালো লাগে, তার সেবা-যত্নে সে মুগ্ধ। উৎপলার মৃদু হাসি, উৎপলার দীর্ঘ-পক্ষ ঢাকা কালো চোখের কটাক্ষ তার বুকে গোপন উত্তেজনার ঝড় তোলে। সে প্রাণপণে উৎপলাকে সুখী করতে চায়। উৎপলার অদ্ভুত রকমের সখ ও খেয়াল আছে, বিমান সে সখ মেটাবার জন্য সদাই উন্মুখ।

উৎপলা একদিন স্বামীকে বললো, 'চলো না, এবার পূজোয় দিন-কতক ঘুরে আসি।'

বিমানেরও বিদেশে ঘুরে বেড়াবার সখ আছে যথেষ্ট। সদাশিব বিমানের জীবনের এই একটি মাত্র বিলাস।

উৎপলার প্রস্তাবে বিমান লাফিয়ে উঠলো। বললো, 'বেশ তো। যাওয়ার দরকারও হয়েছে। খোকা হওয়ার পর থেকে কোথাও যাওয়া হয়নি। তার ওপর খেটে-খেটে তোমার শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে।'

উৎপলা ভ্রূভঙ্গি করে অভিমানহত কণ্ঠে বললো, 'সেদিকে কি তোমার লক্ষ্য আছে, না তার জন্যে তোমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে?'

বিমান অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে বললো, 'সত্যি, আমিও ক'দিন ধরে বলবো-বলবো ভাবছিলুম। বেশ। ঠিক রইলো, পূজোর ছুটির সঙ্গে বাড়তি ছুটিরও দরখাস্ত করবো এক মাস।'

এইখানে তারা হু'জনে একমত। তাদের মতে শুধু একঘেয়ে কাজ করবার জন্য বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না।

ঠিক হলো হরিদ্বার, দেরাহ্বন ও মুশৌরী।

মুশৌরী থেকে নেমে তারা দেরাহ্বনে কাটালো এক সপ্তাহ। ছোটো ছেলে নিয়ে মুশৌরীর ঠাণ্ডা তাদের সহ্য হলো না। তবে মুশৌরীর প্রাকৃতিক শোভা তাদের মুগ্ধ করলো। পাহাড়ের খাঁজের উপর জনাকীর্ণ রমণীয় শহর। শহর ছাড়িয়ে পাহাড়ের ধূসর শ্যামল দেহ তরঙ্গায়িত রেখা টেনে চলে গেছে, তার উপর ঝাউ আর পাইনের ঘন সবুজ বন। পাশের সু-গভীর খাদগুলোর পানে চাইলে বুক ঢিপ-ঢিপ করে। ওপারে নিরাবরণ ধূসর পাথরের সার আকাশ ভেদ করে উঠেছে। পাহাড়ের চূড়োর উপর সাদা বরফের স্তূপ জমে রয়েছে। পাহাড়ের অপরূপ শোভা দেখে উৎপলা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। উৎপলার শিশু কিন্তু সহ্য করতে পারলো না এখানকার হুরন্ত শীত।

দেরাহ্বন থেকে তারা হরিদ্বারে এলো। এখানকার আধা-শীতের আবহাওয়া তার মনোরম লাগলো। সন্ধ্যায় হর্-কি-প্যারী ঘাটে তারা প্রত্যহ বেড়াতে যায়। পাথরের বুকে লাফিয়ে-লাফিয়ে গঙ্গার স্রোত বয়ে গেছে। হিমশীতল স্বচ্ছ ঝর্নার ধারা।

হঠাৎ বিমানের মনে হলো, এখানে আসার পর থেকেই উৎপলা যেন বড়ো বেশি আনমনা হয়ে পড়েছে। তার সতর্ক দৃষ্টি লক্ষ্য করলো, সে যেন তাকে এড়িয়ে থাকতে চায়, সে যেন বেশির-ভাগ সময় একা-একা থাকতেই ভালোবাসে। হঠাৎ সে যেন বড়ো বেশি গম্ভীর হয়ে গেছে।

বিমান একদিন প্রশ্ন করলো, 'তোমার শরীর এখানে ভালো থাকছে না, পলা? তোমায় যেন বড়ো বেশি ক্লান্ত মনে হচ্ছে।'

বিরক্তির ঝাঁঝালো স্বরে উৎপলা উত্তর দিলো, 'হবে। দিন-রাত টো-টো করে ঘুরে বেড়ালে মানুষের শরীর ক্লান্তই হয়।'

বিমান বললো, 'ঘোরা একটু কমিয়ে দাও তাহলে। শরীর মন দুই-ই যেন ভালো লাগছে না।'

বেশ কঠিন হয়েই উৎপলা বললো, 'চিরদিনই যে আমায় তোমার ভালো লাগবে এমন তো কোনো কথা নেই। আমি তা চাইও না।'

দুপুরের দিকে উৎপলা বিমানকে বললো, 'আমি একবার বড়ো ধরমশালায় ওদের বউ-এর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। অনেকবার করে যেতে বলেছে। খোকা ঘুম থেকে উঠলে একটু দেখো।'

ছাতাটা হাতে নিয়ে যেতে-যেতে উৎপলা বললো, 'ফিরে এসে চা করে দেবো।'

গঙ্গার ধারের পথ ধরে উৎপলা চললো। মনের মাঝে তার একটা অধীর উত্তেজনা। গতিতে তার দ্বিধা-ভরা চাঞ্চল্য, মুখে উদ্বেগ। পথে নামতেই তার মুখ-চোখ রাঙা হয়ে উঠলো। গঙ্গার ওপারে পাহাড়ের চূড়োগুলো পড়ন্ত রোদে আগুনের শিখার মতো জ্বলছে। ছাতাটা কাত করে সে মুখের উপর আড়াল করে ধরেছে। কলুষ মনের গোপনতা ঢাকবার জন্যই যেন সে ছাতার আড়ালে মুখ লুকিয়েছে।

সুদূর অতীত এখন উৎপলাকে ডাক দিয়েছে। রহস্যময় সুমধুর অতীত রূপ পরিগ্রহ করে তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। তার মুখে এক অভিনব অপরূপ দীপ্তি। পুঞ্জীভূত বেদনা যেন আনন্দে রূপায়িত হয়ে উৎপলার মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। অচেনা শহরের এক অচেনা বাড়ির পানে সে এগিয়ে চলেছে। সেইখানে সে তার হারানো জীবনের সন্ধান পেয়েছে। একটা তীব্র গোপন উত্তেজনায় তার অন্তরাত্মা দুলে উঠছে। তবু সে এগিয়ে চলেছে। অসীম তার কৌতূহল। নির্ভুল তার সন্ধান।

একটা বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে সে উৎসুক দৃষ্টি মেলে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো। একটা পাঞ্জাবি চাকর এসে দাঁড়ালো তার সামনে।

উৎপলা প্রশ্ন করলো 'বাবু আছেন?'

'কোন্ বাবু? বাঙালীবাবু?'

উৎপলা উত্তর দিলো, 'হ্যাঁ, বিজনবাবু।'

উৎপলা নিজেই বুঝতে পারলো, তার গলার স্বর কাঁপছে।

'ঠহরিয়ে।' বলে চাকরটা উপরে গেল।

উৎপলার অন্তস্তল টিপ-টিপ করে বলছে, অন্যায়। এ অন্যায়।

ভারী-পায়ের জুতোর শব্দ শোনা গেল।

অর্ধ-অচেতন অবস্থায় উৎপলা উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তার পা কাঁপছে। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে যাচ্ছে।

বিজন এসে সিঁড়ির মাথার দাঁড়িয়েছে। উৎপলা এবার চোখ তুলে তাকালো। হ্যাঁ, বিজনই বটে। পরনে খাঁকি সার্ট। গায়ে একটা দামী স্পোর্টস গেঞ্জি। চোখে মোটা সেলের চশমা। পরিপুষ্ট কব্জিতে সোনার রিষ্ট-ওয়াচ। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহের সুঠাম গঠন। রং যেন আগের চেয়ে অনেক ফর্সা আর উজ্জল হয়েছে।

'কে ?' বিজন প্রশ্ন করলো।

সামনে সরে এসে উৎপলা মৃদু হাসলো। বললো, 'চিনতে পারবে না।'

উৎসুক দৃষ্টি মেলে তার পানে চেয়ে বিজন বললো, 'চিনতে তো পারছি না। কে আপনি ? কাকে চান ?'

এ-কি সত্য ? সত্যই কি বিজন চিনতে পারলো না, উৎপলাকে ? উৎপলাকে তাই বিশ্বাস করতে হবে ? তার মুখখানা মৃত্যু-মলিন হয়ে গেল। বিজনের কাছে তাকে নিজের নাম বলে পরিচয় দিতে হবে ? রাগে অভিমানে তার সমস্ত শরীর জ্বলে গেল। একবার মনে হলো—কোনো উত্তর না-দিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু সে বড়ো অশোভন দেখাবে। তাছাড়া পরাজয়ের কালি মেখে সে পালিয়ে যেতে রাজী নয়। সে বড়ো ঘৃণিত, বড়ো লজ্জাকর। দেহের সমস্ত শক্তি কণ্ঠে জড়ো করে সে বললো, 'আমি উৎপলা। বিজন রায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

একদিন এই উৎপলা ছিলো বিজন রায়ের সর্বস্ব। অন্ততঃ বিজন তাই বলতো, আর উৎপলা তাই দৃঢ় বিশ্বাস করতো। বিজন তাকে আদর করে 'উতলা' বলে ডাকতো। এ কি সেই বিজন ?

বিজন দ্বিধাজড়িত বিস্মিত কণ্ঠে বললো, 'উৎপলা! উৎপলা ?'

যেন বিস্মৃতির ধ্বংসস্তূপ থেকে টেনে বের করে আনছে উৎপলার মৃতদেহটাকে। এমন সময় হঠাৎ বিজন বললো, 'অ্যাঁ! তুমি উৎপলা? চেনবার এতটুকু উপায় রাখোনি যে।'

'তবু ভালো, চিনতে পেরেছো।' কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে কোনো ভাবান্তর নেই। আচারে ব্যবহারে কোনো উৎসাহ নেই। উৎপলার বুকের নিচেটা মুচড়ে উঠলো একটা অপরিসীম বেদনায়। সে অপমানের লজ্জায় মুখ তুলে চাইতে পারলো না।

বিজন সুরটা একটু নরম করে বললো, 'এখানে কবে এলে, উৎপলা? ওপরে আসবে না?'

উৎপলা হঠাৎ মুখ তুলে বললো, 'আসতে বললে তো আসবো?'

বারান্দার ধারে একখানা ঘরে এসে দুখানা চেয়ার টেনে দু'জনে বসলো। সেখানা বসবার ঘর, কি খাবার ঘর ঠিক বলা যায় না। প্রবাসে হয়তো দু'কাজই চলে। ঘরের মেঝেয় টুকিটাকি। এক-পাশে একটা ময়লা বিছানা জড়ো করা, বোধহয় রাত্রে চাকরটা শোয়। মাঝের টেবিলটার উপর একটা টিফিন ক্যারিয়ার, চায়ের টিন ও চায়ের সাজ-সরঞ্জাম। এটা খাবারের টেবিল হিসাবেই ব্যবহার হয়।

বিজন একটা সিগারেট ধরাতে-ধরাতে উৎপলার মুখের পানে না তাকিয়েই প্রশ্ন করলো, 'তারপর? হঠাৎ? ব্যাপার কী, উৎপলা?'

কথাগুলো তীরের মতো সোজা গিয়ে উৎপলার বুকের মাঝে বিঁধলো। কিন্তু সবচেয়ে তাকে ব্যথিত করে তুললো, বিজনের এই নির্লিপ্ততা। এই নির্মম ঔদাসিন্য। এ নিষ্ঠুর অবজ্ঞা সে কিছুতেই যেন সহ্য করতে পারছে না। তার পায়ের নিচে থেকে ঘরের মেঝেটা যেন সরে যাচ্ছে। তার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয়ে আসছে।

কোনমতে সে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, 'ব্যাপার কিছু নয়। তোমাকে দেখতে এলুম। কেমন আছো?'

বিজন সশব্দে হেসে উঠলো, 'তাই নাকি?' তাচ্ছিল্যের হাসি। হাসির নিচে উৎপলা কুঁকড়ে, গুটিয়ে গেল। তার মধুর আচ্ছন্নতা কেটে গিয়ে তার মনকে বিষিয়ে তিক্ত করে তুললো।

এই কি সেই বিজন? পাঁচটি বছরের ব্যবধান কি এর মন থেকে অতীতের সমস্ত স্মৃতিই একেবারে নিশ্চিহ্ন করে মুছে দিয়েছে? এ যেন অতীতের সে মানুষই নয়। অথচ এই লোকটি একদিন তাকে কী ভালোই না বাসতো! তাকে পাবার জন্য কী সাধনাই না করেছে। আর সে? সেও কি কম ভালোবাসতো ঐ বিজনকে! বিজনকে পাবার জন্য সে কি-না করতে পারতো? সেই তার জীবনের প্রথম প্রেম। সেই তার স্বপ্ন-রঙীন অতীতের বিস্তীর্ণ জগৎ! সেই জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়েও এই দীর্ঘ পাঁচ বছর সেই মধুর স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে অতীতের সেই গোপন মায়াপুরীকে স্বপ্ন দেখেছে। আর এই লোকটার যেন অতীত বলতে কিছু নেই। অতীতকে আমলও দেয় না!

বিজন সিগারেটটায় টান দিতে-দিতে বললো, 'যাক্, কেমন আছো?'

উৎপলা কঠিন হয়ে রুক্ষ স্বরে জবাব দিলো, 'সে-কথা জেনে আর লাভ কি তোমার?'

বিজন হেসে উঠলো। সঙ্গে-সঙ্গে সিগারেটটায় গোটা-দুই টান দিয়ে বললো, 'লাভ-লোকসান খতিয়ে কাজ করতে শিখেছো বলে তো মনে হয় না, অন্ততঃ চেহারা দেখে। লাভের খাতায় তো কিছুই জমেনি। সবই লোকসান করেছো।'

উৎপলা একেবারেই নিরুত্তর। তার আহত আত্মাভিমান তাকে মাথা তুলতে দিলো না।

বিজন হঠাৎ জিগ্যেস করলো, 'ছেলেপুলে ক'টি?'

উৎপলা মুখ না তুলেই উত্তর দিলো, 'একটি খোকা।'

বিজন মুখ টিপে হাসলো। কুটিল ভ্রূকুটি করে সে আপন মনে বললো, 'একটিতেই এই। যৌবনটা তো নিঃশেষ করে ফেলেছো!'

উৎপলা আহত স্বরে প্রতিবাদ করতে চাইলো। কিন্তু মাথা তুলতে পারলো না সে।

বিজন হেসে উঠলো। বললো, 'বাঙালীর মেয়েরা বড়ো পল্‌কা হয়। যৌবন তাদের স্বল্পায়ু। আসতেও যেমন, যেতেও তেমনি বেশি সময় লাগে না। যেন জোয়ারের জল।'

বিজন যে কী বলতে চায়, উৎপলা ঠিক বুঝতে পারে না। অথচ না শুনেও তার উঠে যাবার ক্ষমতা নেই। একদিন ছিলো, যখন মুগ্ধের মতো আত্মহারা হয়ে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই বিজনের মুখে তার প্রশস্তি গান শুনেছে। তার রূপের খ্যাতি শুনেছে। আগেকার দিনের সেই বিজন আজ তার চোখে একটা দুঃসহ বিভীষিকা।

বিজন বললো, 'আজ তাই মনে হয়, পাগলামী করে কি ভুলটাই না করতে বসেছিলুম। অন্ধ অচেতনের মতো তোমায় বিয়ে করলে আজ আমার আক্ষেপের সীমা থাকতো না।'

উৎপলা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। বিজন যেন তাকে দৈবাৎ চাবুক মেরে সোজা করে তুলেছে। গভীর যন্ত্রণায় তার হৃদয় ছিঁড়ে যাচ্ছে। তার মাথা ঘুরছে।

বিজন বললো, 'উঠলে কেন? বসো। আমার বউয়ের সঙ্গে আলাপ করবে না? পাঞ্জাবি মেয়ে, চমৎকার কেতা-দোরস্ত। অপমান করবে না, ভয় নেই। পাশেয় ঘরে ঘুমুস্ছে, এখনি উঠবে। ওকে দেখলেই বুঝবে বাস্তব জীবনে কে জিতেছে, তুমি না আমি? তুমি একটু বসো। আমি ওকে ডেকে আনছি।'

বিজন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। চলায় সেই আগের মতই দৃপ্ত ভঙ্গিমা। একদিন উৎপলার কি ভালোই যে লাগতো! সে মুগ্ধ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতো। উৎপলা যে কী করবে বুঝতে পারলো না, সে যেন নিঃশেষে হারিয়ে ফেলেছে নিজের ইচ্ছা-শক্তি, নিজের স্বাধীন-সত্তা। বিজন তাকে তার বিদেশী স্ত্রীর কাছে ছোটো করতে চায়। সে হয়তো খুব সুন্দরী—

সত্যিই যে মেয়েটির হাত ধরে বিজন এসে ঘরে ঢুকলো, সে অপরূপ সুন্দরী। দীঘল সুঠাম দেহ। সুশ্রী গড়ন। দীর্ঘায়ত কালো চোখ। মাথায় কালো ঝাঁকড়া চুল। চুলে পিঙ্গলের ছিটে। পরনে রঙীন চুড়িদার পায়জামা ও পাঞ্জাবি। আর উন্নত বুকের উপর একখানি পাতলা রঙীন ওড়না। নিখুঁত সুন্দরী। ইহুদী মেয়ের মতই চেহারা। মেয়েটি হাসিমুখে ঘরে ঢুকে উৎপলাকে অভিবাদন জানালো।

বিজন বললো, 'একে পাওয়া আমার জীবনে একটা পরম সৌভাগ্যের সূচনা। আমি ওকে মন-প্রাণ দিয়ে চেয়েছি। ও দিয়েছে আমার প্রেমের মর্যাদা। ওর প্রেমের বহ্নি আমার ব্যর্থ-অতীতকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। আমার বিড়ম্বিত জীবনকে মধুময় করে তুলে সার্থকতায় ভরে দিয়েছে।'

বিজনের কথাগুলো আগুনের শিখার মতো উৎপলাকে পোড়াতে লাগলো। সে স্থানুর মতো নিশ্চল হয়ে রইলো।

বিজন কালো ভুরু কুঁচকে বললো, 'দেখেছো, আমি ঠকিনি, কিংবা আত্মহত্যা করে দুঃখকে জয় করিনি।'

উৎপলা ফিরে এসেছে। আসবার পথে নিজেকে তার ভারী অপবিত্র আর অশুচি মনে হয়েছে। এই গোপন অভিসার ও বিজনের সান্নিধ্য তাকে অপবিত্র করে তুলেছে। কিন্তু তবু তার মনে হলো, এতদিন তার মনের মাঝে থেকে-থেকে যে হতাশার সুর তাকে আকুল করে তুলতো, সেই করুণ বিষাদের সুরটা থেমে গেছে। আবার সে সত্যকার জীবনে ফিরে আসতে পেরেছে। অতীতের কলঙ্ক-স্পর্শ থেকে সে মুক্ত হয়েছে। তার মনে হলো, কলুষভরা রহস্যময় অতীতের সব মালিন্য, সমস্ত জঞ্জাল ভাসিয়ে দিয়ে, সে গঙ্গায় মুক্তিস্নান করে ঘরে ফিরেছে। আজ সে পরিপূর্ণভাবে সমগ্র সত্তা দিয়ে স্বামীকে স্বীকার করে নেবে। সে বেঁচে গেছে। মনটা একটা গভীর শান্তির মধ্যে ডুবে গেছে। সে পারবে এইবার পরিপূর্ণভাবে নিজেকে স্বামীর জীবনে মিশিয়ে দিতে।

হাঁপাতে-হাঁপাতে ঘরে ঢুকে উৎপলা হাসবার চেষ্টা করে বললো, 'একটু দেরি হয়ে গেছে, কিন্তু আমি ফিরে এসেছি। রাগ করোনি তো? আমি এসেছি। ওগো, আমি ফিরে এসেছি!'

বলতে-বলতে উৎপলা হঠাৎ স্বামীর পা দুটো জড়িয়ে ধরলো।

বিমান হতভম্ব হলো। ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে সে উৎপলার মুখের পানে চেয়ে রইলো।

শ্রীবাসব

সুচিত্রার কথা

মণীন্দ্রলাল বসু

দীর্ঘদিন ছিন্ন মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ছিলো অবগুণ্ঠিতা নারীর রহস্যমণ্ডিত মুখের মতো, অপরাহ্ণে সহসা হঠাৎ-ওঠা বাতাসে মেঘদল ছিন্নভিন্ন, নির্মেঘ পূর্বাকাশে স্নিগ্ধ নীলিমা, পশ্চিমাকাশের পুঞ্জীভূত মেঘস্তূপে সূর্যের রক্তরাগ যেন দিগন্তব্যাপী চিতাবহ্নির রক্তিমা।

ঘরের অন্ধকার থেকে খোলা বাগানে আকাশ-জোড়া আলোছায়ার মায়ালোকে এসে বসলুম। সমস্তদিন সুচিত্রার কথা ভেবেছি। বর্ষণহীন মেঘকজ্জল আকাশের মতো বিষণ্ণ মনে শান্তি খুঁজে পাচ্ছিলাম না, সন্ধ্যার হিরণ্ময় আলোকস্পর্শে অন্তর দীপ্ত হয়ে উঠলো, বিষাদভার-পীড়িত দিবসের পাত্র ফেটে গিয়ে বের হলো সুধাধারা। যার দুঃখক্লিষ্ট জীবন ব্যর্থ হলো ভেবেছি, মনে হলো—কোনো অমর্ত্যলোকে দীপ্ত মহিমায় সে উদ্ভাসিতা।

এমনি রঙীন আলো-ভরা এক চৈত্র-অপরাহ্ণে কুসুমিত উপবনে সুচিত্রার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিলো। মনে হয়েছিলো, যেন তরুণী বসন্ত-লক্ষ্মী কুসুমাকীর্ণ পথ রাঙা করে আমার দ্বারে এলো। বুকের রক্ত দুলে উঠেছিলো।

বিকচোন্মুখ শতদলের মতো তরুণী তনুলতা বাসন্তী রঙের বস্ত্রে সজ্জিতা, কুঞ্চিত কৃষ্ণ-কেশগুচ্ছে রক্তিম-পুষ্পমঞ্জরী, শুভ্র কোমল কণ্ঠে চুনী-পান্না-মেলানো মালিকা, দীর্ঘ-কৃষ্ণপক্ষ্মময় নয়নে স্বপ্নের গোলাপী আভা, বসন্তের পুষ্পচিত্রিত বনে অজানা ব্যাকুল বেদনায় চঞ্চলা বিহারিণী, সে তরুণী বসন্ত-লক্ষ্মী, নবজীবনের দূতী।

বেনারসী শাড়ি ঝলমল্ করছে গলিত রক্তমণির মতো, লজ্জারুণ আননে চন্দনসজ্জার শোভা, সোনার সিঁথি শোভিত সীমন্তকের রেখা জ্বলজ্বল্

করছে, প্রভাতের শুকতারার মতো দীপ্ত নয়নে নবজাগরণের আলো, হর্ষা-শঙ্কাকম্পিত বক্ষে রক্তের নর্তন, সালঙ্কৃতা সুন্দরী নববধূ সে।

ভাদ্রের ভরা নদীর মতো পুঞ্জ-পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ দেহ, কিন্তু মুখখানিতে মাতৃত্বের অপূর্ব আভা, নয়নে স্নিগ্ধ স্নেহের ছবি, অসুস্থ সন্তানের শিয়রে স্থির বসে আছে, শ্রান্তিহীন সেবার সুখে মগ্না, সে ম্যাডোনা।

রাজপথে বিপুল জনতা ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো, মহাত্মা গান্ধী চালিত অসহযোগ-আন্দোলনকারীদের সঙ্গে রাজশক্তির শান্তিরক্ষকগণের অপূর্ব সংঘাত লেগেছে, তাদের মধ্যে কংগ্রেস-পতাকা হস্তে সব অত্যাচার তুচ্ছ করে শীর্ণা নারী এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, বৈশাখের রৌদ্রপীড়িত আকাশের মতো প্রখর দীপ্তি তার চক্ষে, ভারত-স্বাধীনতা-সংগ্রামে সে তন্বী তাপসী।

তারপর তাকে দেখলুম রক্তাম্বরা পথিকা, ওই শুকতারার মতো পথহারা করুণ ছবি, এই ভৈরবী সন্ধ্যার মতো একাকিনী উদাসিনী চলেছে পৃথিবীর পথ প্রান্তর পেরিয়ে অনন্তলোকের অন্ধকারে তারার আলোয় নতুন পথ খুঁজে। সে অনন্তপথযাত্রিনী।

সুচিত্রার নব-নব রূপের সজ্জার ছবির পর ছবি স্মৃতির পটে ভেসে উঠছে। তাকে আমি ভালোবেসেছি, এ-কথা অলীক, আবার তাকে আমি ভালোবাসিনি, এ-কথা বলাও ভুল হবে। দীর্ঘ জীবনে তার সঙ্গে কয়েকবারই দেখা হয়েছে। কিন্তু প্রথম দেখাতেই দু'জনের মনের দরজা যে খুলে গেছলো, সে দ্বার কালের স্রোতে রুদ্ধ হয় নি। যখনই দেখা হয়েছে, সে মন খুলে অনর্গল কথা বলেছে, দুঃখের দিনে যে-সব কথা রুদ্ধ স্রোতের মতো তার বেদনার গুহায় স্তব্ধ থাকতো, আমার সঙ্গে দেখা হলে সে-সব কথা মুক্ত নির্ঝরিণীর মতো বেরিয়ে আসতো। রঙ্গে হাস্যে বেদনায় অশ্রুতে বলা কতদিনের কতো কথা আজ মনে পড়ছে।

এম্ এস্-সি পরীক্ষা দিয়ে বেকার বসে আছি, কর্মহীন দিনগুলোয় নানা কল্পনার জাল-বোনা, কখনও নতুন কন্‌টিনেন্‌টাল কোনো নভেল পড়ি, কখনও কলেজে নব-প্রবেশিকা সহোদরা গৌরীকে অঙ্ক-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্না করবার

প্রয়াসে তার সব সহপাঠিনীদের গল্প শুনি, অজানা তরুণীদের কলহাস্য মানস কল্পলোকে বাহারের ঝঙ্কারের মতো বাজে, অলস অপরাহ্ণ ভরে ওঠে। গৌরীর সব সহপাঠিনীদের মধ্যে একটি মেয়ের কথা বলতে তার যেমন উৎসাহ তেমনি সুখ; প্রকৃতিতে সে গৌরীর সম্পূর্ণ উল্টো অথচ তার সঙ্গেই সব-চেয়ে ভাব হয়েছে। সে সুচিত্রা, ক্লাসের সেন্‌সেসান, তার নাম কলেজে সবার মুখে। পাহাড়ের কোন্ মিসনারী স্কুল থেকে সিনিয়ার কেম্‌ব্রিজ পরীক্ষা দিয়ে এসেছে, তার নাকি মেম গভর্নেস ছিলো, ভালো বংলা বলতে পারে না, কিন্তু ইংরেজী বলে ইংলিশ প্রফেসারের চেয়ে ভালো, চমৎকার পিয়ানো বাজাতে পারে, আর বোর্ডিঙে গিয়ে মেয়েদের ইয়োরোপীয় নৃত্যের পদসঞ্চালন শিক্ষা দিয়েছিলো বলে ভয়ানক বকুনী খেয়েছে।

সেই সুচিত্রা মূর্তিমতী হয়ে একদিন আমাদের বাড়িতে এলো। হাল্‌কা হলুদ রঙের শাড়ি এমন সুন্দর মানাতে কখনও দেখি নি, শরৎ-উষার সোনার আভা তার চোখে।

বাগানের সামনে বারান্দায় বসেছিলুম, গেটের কাছে এক ট্যাক্সি সশব্দে থামতে চমকে চাইলুম। নৃত্যের চঞ্চল ভঙ্গীতে এক সোনালী স্বপ্ন এগিয়ে আসছে।

'—গৌরী কি আছেন?'

'—বোধহয় পাড়ায় কোথাও বেরিয়েছে, এখনি আসবে।'

'—আমি সুচিত্রা, অপেক্ষা করতে পারি—'

'—আসুন, ভেতরে আসুন।'

'—এ বাগান তো বেশ, আপনি বোধহয় অসিট্‌ডা!'

'—ঠিক চিনেছেন।'

'—শুনেছি আপনার অনেক কথা—If you please—'

দু'খানা চেয়ার বের করে বাগানে দু'জনে বসলুম। এর পর ইংরেজীতেই কাথাবার্তা চলতে লাগলো

'—আপনার কথাও অনেক শুনেছি।'

'—খুব নিন্দাবাদ নয় আশা করি।'

'—গৌরীর মুখেও আপনার প্রশংসা ধরে না।'

'—হ্যাঁ, গৌরী তো আমার জন্যে রীতিমতো লড়াই করে। হ্যাঁ, টুর্গানিয়েভের বইগুলোর জন্যে অনেক ধন্যবাদ।'

'—ভালো লাগছে?'

'—চেকভ আমার কিন্তু আরও ভালো লাগে, জীবনের প্রবহমান ধারা থেকে টুকরো-টুকরো কাটা ছবি, একটা করুণ সুর আছে, আর সি গাল্-এর নিনার কথাগুলো কি সুন্দর। Men and lions, eagles and patridges…I am that spirit….'

সুকণ্ঠি অভিনেত্রীর মতো সে আবৃত্তি করে গেল, তারপর উচ্চরবে হেসে উঠলো।

'—চমৎকার আবৃত্তি করলেন।'

'—ভালো লাগলো! আচ্ছা, বাংলায় এ-রকম ড্রামা আছে, আমার ভারী অভিনয় করতে ইচ্ছে করে।'

'—আমি নাট্যকার হলে একটা লিখতুম আপনার জন্যে। শুনেছি, প্রতিভাসম্পন্না অভিনেত্রীদের প্রেরণাতেই ভালো নাটক যতো লেখা হয়েছে।'

'—না, এখন আমি কারো প্রেরণা হতে চাই না! কিন্তু গৌরী তো এখনও এলো না?'

'—তাহলে চলুক গল্প।'

রুশ সাহিত্য থেকে মস্কো আর্ট থিয়েটারের কথা উঠলো, তারপর ইয়োরোপীয় নৃত্যের কথা, ভাগ্‌নারের সঙ্গীতের কথা; সভ্যতার সঙ্গে নারীর সাজসজ্জার সম্বন্ধ নির্ণয় হলো; গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, লেনিনের রুশিয়া, বিজ্ঞানের নব আবিষ্কারের শুভাশুভ—নানা বিষয়ে তর্ক উঠলো। শেষে সে বললো, 'দেখুন, এ-সব আমি বুঝি না, আমার ভালোও লাগে না। হিন্দু সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার জানতে বড়ো ইচ্ছে আছে, তবে ওস্তাদদের কাছে গান শিখতে পারবো না।'

'—যারা ইয়োরোপীয় মিউজিকের পাঠ নিয়েছে, তাদের পক্ষে—'

'—আমি শিখতে খুব রাজী আছি, কিন্তু একটা প্রণালী চাই তো? আচ্ছা, আপনি অপেরা শুনেছেন? ধরুন ভাগ্‌নারের মাইষ্টার সিঙ্গারের প্রাইজ সঙ্গীতের সুরটা—অনেকে বলে বাগেশ্রীর মতো—'

সুচিত্রা গুন্‌গুন্‌ করে গানটি গাইলো। তারপর আবার শুরু হলো সঙ্গীত নিয়ে তর্ক।

আমাদের সভা যখন ভাঙলো, আকাশ তখন তারায়-তারায় ভরে গেছে একেবারে!

সুচিত্রার সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা প্রায় তিন বছর পরে। অবশ্য এর মধ্যে তার সঙ্গে অনেকবার দেখা হয়েছে, কিন্তু সে দেখাগুলি যেন প্রথম দেখারই কুঁড়ি, পাপড়ির পর পাপড়ি মেলে ফুটেছিলো, তারপর সে ফুল শুকনো হয়ে কখন ঝরো-ঝরো হয়েছিলো জানি না। আবার তাকে নতুন করে দেখলুম, অন্তরের আর এক দ্বার খুলে গেল।

রিসার্চ ওয়ার্ক করে নাম হয়েছে, বিলেত যাবার এক স্কলারসিপ পেলুম। যাবার সব বন্দোবস্ত করে, সেদিন বড়ো ক্যাবিন ট্রাঙ্ক এনে বই-খাতা সব গোছ করছি, সুচিত্রা এলো ঝড়ের বেগে।

'—তুমি না-কি এ মাসে বিলেত যাচ্ছো, অসিট্‌ডা!'

'—প্যাসেজ বুক করে এসেছি, এখন ষ্টিমার কোম্পানীর—অনুকম্পা।'

'—তোমার এখন যাওয়া হবে না।'

'—হবে না! স্কলারসিপটা পেয়েছি—'

'—এ মাসে অন্ততঃ হবে না। আমার সম্বন্ধে কোনো সংবাদ রাখো? না প্রয়োজন মনে করো না—'

'—শুনছিলুম বটে একটা শুভকর্ম—সেটা সঠিক কি-না, কিন্তু তুমি তো কোথাও রাজী হও না—'

'—হ্যাঁ, আমি উদ্বাহ-বন্ধনে বদ্ধ হচ্ছি, এ মাসে।'

'—সেটা তো উদ্বন্ধন নয় যে, রক্ষে করবার জন্যে আমাকে থাকতে হবে, আর সম্প্রদান করবার লোকও তো আছে।'

'—ঠাট্টা রাখো, এ মাসে তোমার যাওয়া হবে না।'

'—তথাস্তু। আর কি বলো! কেমন লাগছে? শুনেছি, এই কোর্টশিপের সময়টায় মনে হয় পৃথিবীর ধুলো ছুঁয়ে চল্‌ছি না।'

'—ছাই কোর্টশিপ! তোমার বন্ধুর তো দেখাই পাওয়া যায় না।'

'—সুবোধের সঙ্গেই তাহলে ঠিক হয়েছে?'

'—তোমার তো বন্ধু!'

'—হ্যাঁ, কলেজে সুবোধের সঙ্গে খুবই ভাব ছিলো। তবে বহুদিন দেখা হয় নি।'

'—এ খবর পেয়েও দেখা করো নি? কি রকম লোক তুমি, অসিট্‌ডা! দেখা করা দরকার ছিলো।'

'—সঠিক জানতুম না।'

'—বেশ যা হোক!'

চামড়ার কুশনটা পিঠে দিয়ে সুচিত্রা সোফায় চেপে বসলো। চোখে মুখে খুসি উপচে পড়ছে, ভাবী মিলনের আনন্দে চঞ্চলা সে।

'—শোনো, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।'

'—মার্কেটিং? সাহায্য করতে হবে, সে বিষয়ে গৌরীই বোধহয়—'

'—তা নয়, তোমার বন্ধুর সম্বন্ধে খবর চাই।'

'—প্রথমে জিগ্যেস করে নিই, বিয়েটা কি ঘটকালি করে হচ্ছে, না যাকে বলে লভ-ম্যারেজ?'

'—দুই বল্‌তে পারো।'

'—কিন্তু পুষ্পধন্বা তাঁর পুষ্পবাণ সজোরে নিক্ষেপ করেছেন দেখছি!'

'—ঠিক বলেছো, আমাকে তুমি খুব বুঝতে পারো দেখছি, আমিও loveএ পড়লুম at last!'

'—কণ্ঠে হতাশার সুর আনলে কি হবে, প্রাণে তো খুশি ধরছে না!'

'—যাক্‌, কাজের কথা বলি, অসিট্‌ডা?'

'—কি জানতে চাও, বিষয়-সম্পত্তি? ওরা বাংলার প্রাচীন অভিজাত বংশ, সুবোধ তার সম্পত্তির অংশ ভাগ করে নিয়েছে, বোধহয় বিধবা মা ছাড়া আর কেউ বনেদী নিয়ম ও মেয়েলী বিধিবিধান মানবার লোক নেই ঘরে, ওদের পাঁচ-মহলা বাড়ির মোটা থামের ইঁটগুলো না-কি লর্ড ক্লাইভের আমলের, তবে তোমার জন্যে আশা করি বালিগঞ্জী পাড়ায় সাহেবী ফ্যাশানে বাড়ি তৈরি হবে।'

'—সম্পত্তির বিষয় আমি জানতে চাই না, চাই মানুষ সম্বন্ধে জানতে ! তোমার বন্ধু লোকটি কেমন ?'

'—ভালোই তো মনে হয়, বনেদী ঘরের ছেলে, দেখতেও সুশ্রী, ব্যবহার অতি নম্র, ভদ্র—তোমার সঙ্গে তো আলাপ হয়েছে।'

'—জানো তো প্রেম অন্ধ। মাঝে-মাঝে আমার কেমন মনে হয়—'

'—ভয় করে ?'

'—ভয় আবার কি ! বাঘের খাঁচায় তো ঢুকছি না।'

'—কিন্তু খাঁচা তো বটে, একবার ঢুকলে বেরোনো শক্ত।'

'—সে-কথা আমি মানি না। বিয়েতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হবে কেন, এ-কথা আমি বুঝতে পারি না।'

'—দেখো, তর্ক করে এ-কথার মীমাংসা হয় না, জীবনে অভিজ্ঞতার সুখ-বেদনা দিয়ে এর সত্যতা যাচাই হয়।'

'—সকালবেলা তোমার কাছে আমি বক্তৃতা শুনতে আসি নি, অসিট্ডা। শোনো, কাল সকালে তুমি আসবে, মার্কেটিং করতে হবে কিছু, কাল বিকেলে এক চায়ের পার্টি দিচ্ছি, ভালো সসেজ্ আর প্যাটি খুঁজে কিনতে হবে। আর আজ বিকেলে তোমার বন্ধুর কাছে যাবে। একটা ভালো ফটোও তোলাতে চাই। তোমার ক্যামেরা আনবে। আজ চললুম।'

সুচিত্রার দীর্ঘ কৃষ্ণ-নয়নের দিকে চাইলুম, কৃষ্ণ-চক্ষুতারকায় অস্বাভাবিক দীপ্তি। তার খুশিতে, তার চঞ্চলতার স্পর্শে আমিও মেতে উঠলুম। সত্যই, বিলেত যাওয়া পেছিয়ে দিলুম।

যাত্রার আগে সুবোধ-সুচিত্রা আমাকে একদিন নিমন্ত্রণ করলো, তাদের পুরাতন বনেদী বাড়িতে। সুবোধের পূর্ব-পুরুষগণের বৃহৎ মলিন তৈলচিত্রসারি-শোভিত প্রাচীন পারস্য-কার্পেট পাতা লম্বা বৈঠকখানায় বসে সুচিত্রার নবালঙ্কারের সঙ্গে সুবোধের পিতামহী-প্রপিতামহীদের প্রাচীন ভারী সোনার গহনা মিলিয়ে দেখতে হলো, জর্জেটের শাড়ির সঙ্গে প্রাচীন বেনারসীর তুলনা করতে হলো, বিয়ের উপঢৌকন-আসবাব সব দেখে অতি মুগ্ধতার ভাব মুখে আনতে হলো। আবেগে সুচিত্রা প্রগ্‌লভা। আমার বিলেতে যাওয়া বা সেখানে পড়া সম্বন্ধে কোনো ঔৎসুক্য প্রকাশ করলো না

সে, তার শাড়ি গহনা স্বামী শাশুড়ী এই নিয়েই গল্প চললো। সুবোধ বেশি কথা বললো না, মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলো।

বিদায়ের সময় সুচিত্রা হেসে বললো, 'সারাক্ষণ নিজেরই গল্প করলুম! সাবধানে থেকো বিদেশে, আর বিলিতী বৌদি কিন্তু এনো না ভাই, ফিরে এলে খুব ভালো মেয়ে দেখে দেবো।'

হেসে বললুম, 'সে চিন্তা এখন থেকে করতে হবে না। সত্যি কথা বলো, সুখী হয়েছো?'

মুক্তোর দুল দুলিয়ে সুচিত্রা বললো, 'কি মনে হয়? এর উত্তর ফিরে এলে দেবো।'

শুভ্র মুক্তোর মতো অশ্রু-বিন্দুতে আয়ত-নয়ন ভরো-ভরো। চোখ মুছে উচ্চরবে হেসে বললো, 'যাবার সময় মন খারাপ করে দিলুম না তো? ভালো ডান্স-মিউজিকের রেকর্ড পাঠিও।'

ইয়োরোপ থেকে ফিরলুম প্রায় পাঁচ বছর পরে। সুচিত্রাদের খবর মাঝে-মাঝে পেয়েছি গৌরীর চিঠিতে, চিঠি লেখা বিষয়ে সুবোধ আমার চেয়ে কুড়ে। শুনেছিলুম, প্রথম সন্তানটি নষ্ট হয়ে গেছে, দ্বিতীয় সন্তানটি জন্ম থেকেই অসুস্থ, তাকে নিয়ে সুচিত্রার চিন্তার অন্ত নেই—গান, সাজ-পোশাক সামাজিক জীবন—সব প্রায় ত্যাগ করেছে সে। আর একটি সন্তান জন্মে কয়েক মাস পরেই মারা যায়।

সকালে সুচিত্রাদের সঙ্গে দেখা করতে যাবো বলে বেরোচ্ছি, গৌরী আমার পথ আটকালো, বললো, 'কোথায় যাচ্ছো, দাদা? তোমার কাছে এটা সিল্কের পাঞ্জাবি যে!'

'—ভাবছি সুচিত্রাদের সঙ্গে দেখা করে আসি, ওর ছেলের জন্যে রাশিয়ান-ফার দেওয়া গরম জামা এনেছি, দিয়ে আসি।'

'—বসো দাদা, তোমার যাওয়া তো হবে না।'

'—কেন?'

'—জানো না, সে ছেলেটি তো মারা গেছে কয়েক মাস হলো। তোমার

ও প্যাকেট রেখে দাও। আর অতো সেজেগুজে যেও না, সুচিত্রা এখন একেবারে বদলে গেছে।'

'—তা, এ ছেলেটিও মারা গেল!'

'—শুধু পুত্রশোক নয়। আগে খবর দিয়ে যাওয়া ভালো। হয়তো দেখাই করবে না।'

সেদিন আর যাওয়া হলো না। পরদিন সকালে সুচিত্রাদের বাড়ি গেলুম। তকমা-পরা বুড়ো দারোয়ান সেলাম করে পুরাতন বৈঠকখানায় বসালো। সেই চিরপ্রাচীন বৃহৎ গৃহের স্বপ্নালোক যেন পরিচিত পৃথিবীর কোনো প্রভাত বা সন্ধ্যার আলো নয়, এ যেন কোনো কালাতীত লোকের আলোক। গিলটি-করা মোটা ফ্রেমের তৈলচিত্রগুলি চির-পুরাতন স্থানে তেমনি স্থির নিবদ্ধ, ধূলিমলিন চিত্রগুলি থেকে রাজা রামপ্রসাদ, লক্ষণপ্রসাদ প্রভৃতি সুবোধের পূর্ব-পুরুষগণ তেমনি স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে, হলদে মার্বেল পাথরের তাকে-তাকে পরীদের মূর্তি, পুরাতন ফরাসী ঘড়ি, নানা স্ফটিক পুত্তলী তেমনি নিশ্চল দাঁড়িয়ে। মাথায় বৃহৎ ঝাড়ের ত্রিকোণ কাচগুলি তেমনি ঝকমক্ করছে, বুঝি এখনি পরিহাসের সুরে টুং-টুং করে হেসে উঠবে। সেই স্তব্ধ ঘরে সুচিত্রা যখন ক্লান্তগতিতে নীরবে এলো, মনে হলো, সেও বুঝি এই ঘরের একটা আসবাব বা পুত্তলী হঠাৎ নড়ে উঠলো, অথবা সোনালী ফ্রেম থেকে শতাব্দী-মলিন মূর্তি শঙ্কিতভাবে নেমে এলো।

একটু পরিহাসের সুরে সুচিত্রা বললো, 'মনে পড়লো, তাহলে? একেবারে ভুলে যাও নি, অসিতদা!'

তার শীর্ণ মুখের দিকে চাইলুম, দেখলুম—প্রখর জ্বালাময় দৃষ্টি তার ঘন কালো চোখে।

'—আমার ছেলেটি মারা গেছে, জানো তো!'

'—কাল শুনলুম।'

'—কাল শুনলে! তোমার কাছে সে কাল পর্যন্ত বেঁচেছিলো! কিন্তু আমার কাছে সে যে অনেকদিন হলো মারা গেছে। সেই কোট কই? আনবে লিখেছিলে।'

'—এনেছি। আজ আনতে পারলুম না।'

'—কেন? আমায় দিয়ে যেও। কি দেখছো?'

'—বড়ো রোগা হয়ে গেছো।'

'—দেহের চেহারা দেখছো, কিন্তু মনের চেহারা তো দেখতে পাচ্ছো না, ভাগ্যিস পাচ্ছো না!'

'—সুবোধ কোথায়?'

'—এখানে নেই, দার্জিলিঙে।'

'—দার্জিলিঙে? ওদিকেও কি জমিদারী আছে?'

'—না, হাওয়া খেতে।'

'—তুমিও তো গেলে পারতে, কলকাতায় সময়টা এখন ভালো নয় বিশেষ। তাছাড়া—'

'—হ্যাঁ, তাছাড়া আমার শরীর ভালো হতে পারতো। না, তোমার বন্ধুর প্রতি অবিচার করবো না, তিনি অনেকবার আমায় বলেছিলেন যেতে, আমিই ইচ্ছে করে যাই নি। ছ'মাস আগে গেছলুম, সাতদিন থেকেই চলে এলুম, তোমার বন্ধু বড়োই রেগে গেছলেন; তা রাগ অবশ্য তিনি করতে পারেন।'

আমি নীরবে শুনতে লাগলুম।

'—কি, চুপ করে আছো কেন, কথা কও অমিতদা! বিলিতী বৌদিদি এনেছো নাকি?'

'—আনলে দেখতেই পেতে।'

'—ভালোই করেছো। তবে হুট করে একটা বিয়ে করো না যেন। আর শোনো, একটা কাজ তোমায় করতে হবে, আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।'

'—অমন করে কেন বলছো! কি বলবে, তাই বলো।'

'—তুমি তো ছিলে না, আমার ছেলের একটা ভালো ফটোও নেই; চলনসই একটা আছে, সেটা তোমায় ভালো করে এনলার্জ করে দিতে হবে, কেমন! মাঝে-মাঝে ভাবি অয়েল-পেন্টিং করাবো, কিন্তু এই সব পুরোনো ছবিগুলোর দিকে চেয়ে আর ইচ্ছে করে না।'

'—দেবো করিয়ে, কিছু সময় লাগবে।'

'—একটা এনলার্জমেন্ট করানো হয়েছে, কিন্তু সেটা আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না।'

চুপ করে ভাবলুম, কোনটাই তোমার পছন্দ হবে না।

'—আর একদিন এসো। আজ আমার শরীর তেমন ভালো নেই। না না, এখন উঠো না, আর একটু বসো, বহুদিন পরে তোমায় দেখলুম।'

'—তুমি তো আজকাল কারো সঙ্গে দেখা করো না, শুনছি।'

'—হ্যাঁ, ভালো লাগে না। কি জানো, আমি আজকাল যেন নিজের মনের মধ্যে বাস করি, এই পুরোনো বনেদী-বাড়ির মতো ছায়া-ভরা নিঝুম মন, এক রহস্যময় জানা-অজানায় মেশা অপূর্ব দেশ, বোধহয় এই বাড়ি ধীরে-ধীরে আমাকে জীর্ণ করছে।'

'—তোমার শিক্ষাদীক্ষা একেবারে আলাদা।'

'—না, এরা আমার ওপর কোনদিন কোনো-রকম জোর করেন নি, আমার শাশুড়ী সেদিকে খুব ভালো, জোর করেন নি বলেই আমি হার মেনেছি; মনে হয়েছে, এই প্রাচীন বংশের পুরোনো বিধিব্যবস্থা মানা আমার কর্তব্য, এর ট্রাডিসনের ভার বহন করতেই হবে। এঁদের বংশের অন্য সব বধূদের চেয়ে আমি কতো স্বাধীন, এখনও গাড়িতে উঠতে তাঁদের দু'ধারে কানাত পড়ে।'

'—কিন্তু এটা তোমার স্বাভাবিক নয়। হয়তো বালিগঞ্জ বা আলিপুরের দিকে খোলা বাড়ি করলে—'

'—আমার শাশুড়ী তো এই পুরোনো বাড়ি ছেড়ে যাবেন না, আমারও আজকাল যেতে ইচ্ছে করে না। আমাদের উঠোনে একটা শ্যাওলা-পড়া ভাঙা দেওয়াল তোমায় দেখাবো, কি সুন্দর ছোটো-ছোটো ইট!'

'—কিন্তু এমন মুষড়ে থাকলে চলবে কেন? তুমি যে প্রাণে ভরা, এই দুশো বছরের পুরোনো ফ্যাংলা-পড়া দেওয়াল ভেঙে বিংশ-শতাব্দীর জীবন কল্লোল প্রবাহিত হবে, কতো বিচিত্র রূপে, কতো নতুন বর্ণভঙ্গিমায়।'

'—এখনও ইয়োরোপীয়-জীবনের স্বপ্নাঞ্জন চোখে রয়েছে বুঝি, আমি অনেক ভেবে দেখেছি, এদেশে ইয়োরোপের সভ্যতা ইয়োরোপের আইডিয়া চলবে না।'

'—শোনো স্থচি, সে পুরোনো তর্ক করে কোনো লাভ নেই। আমি শুধু তোমায় এই অনুরোধ করছি, তুমি এ ভাঙা পুরোনো প্রাসাদ ছেড়ে মাঝে-মাঝে বাইরে বের হও, নিজেকে এমন করে আবদ্ধ করো না।'

'—হবো, বের হবো অসিতদা, কোনো প্রাচীন প্রাচীর আমার পথ রুদ্ধ করতে পারবে না, সেই তরুণী স্থচিত্রা মরে যায় নি।'

আবেগে তার মুখ জ্বলজ্বল্ করে উঠলো। বুঝলুম, অস্থস্থ শরীরে তাকে উত্তেজিত করা ঠিক হবে না। খরতাপ বৈশাখী আকাশের মতো শুষ্ক-নয়নে বেদনার শ্যামল ছায়া ঘনিয়ে আসছে।

ধীরে বললুম, 'আজ উঠি, আর একদিন আসবো, ছবিটা দেবে নাকি, এনলার্জ করাতে দিতে পারি।'

আমার দিকে অশ্রু ভরো-ভরো নয়নে চাইলো। আর্তনাদের মতো বলে উঠলো, 'আজ নয়, ওই একখানি ছবিই আমার আছে—' তারপর আঁচলে মুখ গুঁজে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম। সোনার গিল্‌টি-করা ফ্রেমের মধ্যে শতাব্দী-মলিন ছবিগুলি হতবাক স্থিরভাবে চেয়ে রয়েছে। আমিও চিত্রার্পিত অচল হয়ে বসে রইলুম। কতক্ষণ পরে বলতে পারি না। কারণ, প্রবাহী-কালের বোধশক্তি লুপ্ত হয়ে গেছলো ; হয়তো কয়েক মিনিট পরে। স্থচিত্রা আবার ছায়ার মতো নিঃশব্দ-চরণে ঘরে প্রবেশ করলো। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি তার। বোধহয় প্রথমে আমাকে দেখতে পায় নি। তারপর চমকে উঠলো।

'—ও! তুমি বসে আছো! আচ্ছা, আছো যখন আর একটা কথা শুনে যাও তবে।'

'—আজ যাই, আর একদিন আসবো, এসে শুনবো।'

'—না, না ; আজ শুনে যেতে হবে। শুনেছো কিছু?'

'—কি?'

'—আমার ছেলের চিকিৎসা সম্বন্ধে শুনেছো কিছু?'

'—কলকাতার বড়ো-বড়ো ডাক্তার সব দেখেছিলেন।'

'—ভুল শুনেছো! মিথ্যে কথা। কে বলেছে? আমার ছেলে তো বিনা চিকিৎসায় মরেছে।'

'—ডাক্তার-বিভ্রাট? কলকাতার অনেক বড়োলোকের বাড়িতে তাই হয় বটে।'

'—মোটেই ডাক্তার-বিভ্রাট নয়। প্রথমে এঁরা ডাক্তার দেখান নি, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন তাগা-তাবিজ মানৎ, চণ্ডীপাঠ—এই সব চলেছে আর চলেছে হোমিওপ্যাথিক জল-পড়া; তারপর যখন বড়ো-বড়ো গাড়ি-জুড়ি মোটরে করে এসে কলকাতার ডাক্তারের দল ভেঙে পড়লেন, তখন too late—too late—বুঝলে?'

'—শোনো, সুচি—'

'—জানি, তুমি আমায় কি বলবে, ঈশ্বর যাকে মারেন কোনো ভিষক্ তাকে বাঁচাতে পারে না। মানি। কাউকে আমি দোষ দিচ্ছি না। ভালো ভেবেই এঁরা সব করেছেন। কিন্তু এই ঘটেছে। সুচিকিৎসা হয় নি। এই কথা তোমায় বলতে ভুলে গেছলুম। বলা হলো। আচ্ছা, আজ যাও ভাই, আর একদিন এসো।'

খরধার তলোয়ারের প্রখর দীপ্তি সুচিত্রার চোখে। কেমন ভয় হলো। আমি থাকলে সে আরও উতলা হয়ে উঠবে। নতমুখে বিদায় নিলুম।

কয়েক মাস পরে পশ্চিমের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পেয়ে চলে যাই। প্রায় তিন বছর পরে কলকাতায় ফিরলুম। ইতিমধ্যে ভারতের আকাশে এক রাজনৈতিক ঝড় বয়ে গেছে, চারিদিক থম্‌থম্ করছে। আমি যখন ল্যাবোরেটারীতে টেষ্ট-টিউব ও মাইক্রোস্‌কোপের সঙ্গে বিজ্ঞানের নব-রহস্যের সন্ধান করেছি, মহাত্মা গান্ধী তখন উনআশি বীর-সহযাত্রী নিয়ে ডাণ্ডি-যাত্রা শুরু করেছেন, লবণ-আইন ভঙ্গ হয়েছে, ভারত গভর্নমেণ্ট মহাত্মাকে বন্দী করলো, তারপর আবার মুক্তি দিয়ে আপোষের চেষ্টা করছে।

মনে পড়ে, শীতের শেষ হবে। লণ্ডনে তৈরি একটা হাল্‌কা গরম সুট পরে বের হচ্ছি, গৌরী আমাকে আটকালো, 'দাদা, কোথায় চলেছো, সুচিত্রাদিদির কাছে যাবে না তো?'

হেসে বললুম, 'ঠিক আন্দাজ করেছিস।'

গম্ভীরভাবে গৌরী বললো, 'শোনো দাদা, সুচিত্রাদিদির কাছে এখন তোমার যাওয়া হবে না, ওই ইংলিশ কাপড়ের সুট পরে যাওয়া মোটেই চলবে না। ও-রকম সুট পরে তাঁর স্বামী ছাড়া আর কেউ তাঁর সামনে যেতে সাহস করে না। খদ্দরের কাপড় আছে?'

অবাক হয়ে বললুম, 'খদ্দর? পশ্চিমে ধুতি তো বড়ো পরি নি, ওই মোটা খদ্দর পরবো! সুচিত্রার কাছে খদ্দর পরে যেতে হবে নাকি? এ তো আর গান্ধী-মহারাজকে দেখতে যাচ্ছি না!'

গৌরী হেসে বললো, 'হ্যাঁ, সুচিত্রাদিদির দর্শন যদি চাও তো খদ্দর পরেই যাওয়া ভালো, তা না-হলে মিছিমিছি খানিকটা বকুনী খেয়ে বক্তৃতা শুনে ফিরে আসবে। সুচিত্রাদি যে এখন মস্তবড়ো গান্ধী-শিষ্যা, কংগ্রেসের এক নেত্রী, ছেলেদের দল নিয়ে শোভাযাত্রা মিটিং কতো করেছেন, জেলে গেছলেন, এই তো এক মাস হলো জেল থেকে বেরিয়েছেন।'

লক্ষ্য করে দেখলুম, গৌরীর শাড়িখানিও খদ্দরের। অতি সশ্রদ্ধভাবে সে সুচিত্রা সম্বন্ধে কথা বলছে। আগে তো সুচিত্রাকে দিদি বলতে কখনও শুনি নি। জিগ্যেস করলুম, 'তুইও কি সুচিত্রার শিষ্যা হয়েছিস?'

গম্ভীরভাবে গৌরী বললো, 'চেষ্টা করছি, পারি কি? সংসারের যা ঝামেলা! শোনো দাদা, তুমি বরং একটা খদ্দরের পাঞ্জাবি কিনে নিয়ে এসো, আমি খদ্দরের কাপড় দেবোখন; কাল খদ্দর পরে যেও।'

বললুম, 'তথাস্তু! এ-সব ব্যাপারে তোর পরামর্শ শুনে চলা ভালো।'

বিলিতী গরম গেঞ্জির উপর খদ্দরের পাঞ্জাবি পরে পরদিন সকালে সুচিত্রাদের পুরাতন বাড়িতে হাজির হলুম। দেখলুম, গেটের সামনে সরু গলি জুড়ে প্রকাণ্ড মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে। গাড়ির ভিতর হাল-ফ্যাশানে টুইডের সুট-পরা একটি মোটা কালো ভদ্রলোকের পাশে জর্জেটের শাড়ি-পরা একটি যুবতী, তাঁর ঝলমল্ সজ্জায় চোখে ধাঁধা লাগে, কানে চুনীর দুল, ঠোঁটে গালে আঙুলের নখে লাল রঙের বাহার, শাড়ির পাড়ে সোনা, সব ঝক্‌মক্ করছে। গাড়ির খোলা দরজার কাছে নিখুঁত পাট-ভাঙা সুট পরে সুবোধ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমাকে হঠাৎ দেখে সুবোধ একটু লজ্জিতভাবে এগিয়ে এলো,

তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে চলে যাবার চেষ্টা করা বড়োই অভদ্রতা হবে। হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে বললো, 'হ্যালো, ওল্ড বয়! যাও, সুচিত্রা আছে বোধহয়। ভেরি সরি, আমাকে বেরতে হচ্ছে, এঁদের সুটিং আধঘণ্টার মধ্যে আরম্ভ হবে, আজ ওয়েদারটা ভালো পাওয়া গেছে, এঁকে তো চিনতে পারছো, সুবিখ্যাতা শিপ্রা, ভারতের সিনেমা-গগনে brightest star আর ইনি বিখ্যাত ডিরেকটার—আচ্ছা, আজ গুড বাই।'

ড্রাইভার ষ্টার্ট দেওয়াতে সুবোধ তাড়াতাড়ি মোটরে উঠে বসলো।

বুড়ো দারোয়ান সেই পুরাতন বৈঠকখানায় আমায় বসালো। ঘরটা যেন আরও অন্ধকার, তৈলচিত্রগুলি আরও মলিন মনে হলো।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো আমাকে। অনেকক্ষণ পরে খদ্দর পরিহিত এক তরুণ যুবক এসে বললো, 'আপনি আমার সঙ্গে আসুন, সুচিত্রা দেবী ডাকছেন।'

অবাক হয়ে তার সঙ্গে চললুম। বৈঠকখানাটি বাড়ি ও অন্দর মহলের মধ্যাংশে, তারই একটি বড়ো ঘরে এক সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের সামনে সুচিত্রা বসে, কয়েকটি তরুণ যুবক সামনে দাঁড়িয়ে।

টেবিলের উপর লিখতে-লিখতে সুচিত্রা বললো, 'ও, অসিতদাদা, বসো, এক মিনিট। আচ্ছা সুজিত, তুমি কি বলতে চাও, বলো। আমি কোনো বিরুদ্ধ মত-প্রকাশে বাধা দেবো না, চিন্তার স্বাধীনতা চাই। আমি যা বুঝেছি, তুমি বলতে চাচ্ছো, মহাত্মা বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে রফা করছেন, এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করতে পারবো না কেন, আমরা তো কোনো বাধা দিচ্ছি না। না সুজিত, এ বিষয়ে আমি ভেবে দেখছি, সভানেত্রীরূপে আমি এ-রকম আলোচনা করতে মত দিতে পারি না। অন্য মিটিংএ হয়তো হতে পারে, কিন্তু এ সভায় নয়। আচ্ছা, আজ আমার এই পুরোনো বন্ধু এসেছেন, কাল সকালে আবার তোমরা সবাই এসো, তখন সমস্ত আলোচনা হবে।'

যুবক-দল চলে গেলো, সুচিত্রা খদ্দর-মোড়া সোফায় এলিয়ে বসলো। সোফার উপর দেওয়ালে মহাত্মা গান্ধীর বৃহৎ তৈলচিত্র, জানলায় খদ্দরের রঙীন পর্দা, ঘরের কোণে ত্রিবর্ণ কংগ্রেস-পতাকা।

'—বড়ো আনন্দ হলো তোমায় দেখে, অসিতদাদা। খদ্দর পরেছো দেখে, আরও সুখী হলুম।'

'—তা, তোমারা যখন জেলে যাচ্ছো, আমরা তখন আর খদ্দর পরতে পারবো না। ঘরটিও তো বেশ সুন্দর সাজিয়েছো, খদ্দর দিয়ে। এমন সুন্দর যে খদ্দরের সব জিনিস আছে, আমি তা জানতুম না। আর বেশ আলো-বাতাস ঘরটাতে।'

'—হ্যাঁ, ওই ঘুপসি বৈঠকখানা ঘরে আমি আর ঢুকি না, ও-রকম সব ঘর ভেঙে দেওয়া একান্তই দরকার। মুক্তি পেয়েছি অসিতদাদা, আমি এবার মুক্তি পেয়েছি—'

'—সত্যিই কি মুক্তি পেয়েছো তুমি, সুচিত্রা? তবে মোটা হয়েছো, দেখতে পাচ্ছি।'

'—তোমরা অবিশ্বাসীর দল! হ্যাঁ, জেলে গিয়ে মোটা হয়েছি। কাগজে পড়েছিলে তো, কি-রকম শোভাযাত্রা হয়েছিলো? সে এক অপূর্ব উপলব্ধি। বিকেলে পথের ধারে জানলায় দাঁড়িয়েছিলুম; ভাবছিলুম, মধ্য-রাতে সুষুপ্ত মহাত্মাকে ভারত গভর্নমেন্টের ম্যাজিস্ট্রেট যখন জাগিয়ে তুলে বন্দী করতে গেছলো, তখন মহাত্মা কি সুন্দর হেসেছিলেন, আর সেই ম্যাজিস্ট্রেটের মুখ—এমন সময় দেখলুম, পথে একদল ছেলে জাতীয় পতাকা নিয়ে শোভাযাত্রা করে চলেছে; একটি ছেলে বলছে—ভাই, বড়ো-রাস্তার মোড়ে কিন্তু যাওয়া চলবে না, গলিতেই ঘুরি, সেখানে না কি লাঠি চলছে—আর একটি ছেলে বললো—ভয় করলে চলবে না। থাকতে পারলুম না, তর্‌তর্‌ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পথে বেরিয়ে পড়লুম, নিলুম পতাকা তাদের হাত থেকে, বললুম, এসো আমার সঙ্গে, কোনো ভয় নেই। ভয় করলে জীবনে কোনো কাজই করা যায় না।'

'—তোমার সেই সময়ের দীপ্ত মুখ দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'—ঠাট্টা রাখো!'

'—তোমার প্রাণ যে আবার জেগে উঠেছে, ক্লাইভের আমলের পুরোনো ছেঁৎলা-পড়া দেওয়াল ভেঙে যে বেরোতে পেরেছো, ওই দেখেই আমার আনন্দ।'

বক্তৃতার ভঙ্গীতে আমিও উত্তর দিলুম। সুচিত্রা শ্রান্ত হয়ে চুপ করে বসে রইলো।

কিছুক্ষণ পরে সে বললো, 'তোমার বন্ধুকে দেখতে পেলে ?'

কণ্ঠে আর বক্তৃতার সুর নেই, মুখে উদাস ভাব।

'—হ্যাঁ, খুব বড়ো নতুন মোটরকার কেনা হয়েছে, দেখলুম।'

'—সিনেমা কোম্পানীর ডিরেক্টরের ডি-লুক্স গাড়ি না-হলে চলবে কেন! সেই গাড়িই তো ফিল্মে উঠবে। শিপ্রাকে দেখলে ?'

'—ওই অভিনেত্রী ? হ্যাঁ, চুনীতে রুজেতে রঙীন ঝলমল্ !'

'—দর্শনে হৃদয় টলমল্ নয় তো !'

সুচিত্রার কণ্ঠস্বরে ব্যথিত হলুম। এ পরিহাস নয়, চাপা কান্না। সম্মুখে দেওয়াল-জোড়া ডগডগে রঙের এক তৈলচিত্রের দিকে চেয়ে রইলুম, একটি ছোটো ছেলে, রঙীন ব্রোকেডের কোট পরা, বৃহৎ রিনেসাঁ স্তম্ভের পাশে করুণভাবে দাঁড়িয়ে ; মনে হয়, এই ছবিটি সুবিখ্যাত চিত্র 'ব্লু বয়' ছবিটির অনুকরণে অঙ্কিত।

'—শোনো, একটা কাজ তোমায় করতে হবে, আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। হ্যাঁ, এনলার্জমেণ্ট নয়, অয়েল-পেন্টিংই একটা করালুম, এক বড়ো ইংরেজ চিত্রকর এসেছিলেন, তাঁকে দিয়েই করালুম। খোকনকে তো তুমি দেখো নি ! জীবন্ত প্রতিমূর্তি হয়েছে। মাঝে-মাঝে আমি ভুল করে ডেকে উঠি, খোকা—ওরে খোকা।'

'—সুন্দর হয়েছে ছবিটি। ভান্ ডাইকের ছবি বলে ভুল হয়।'

'—ঠিক বলেছো, শিল্পীটিকে সবাই আধুনিক ভান্ ডাইক্ বলে।'

চোখ মুছে সুচিত্রা বললো, 'কিন্তু এ কাজটি তোমাকেই করতে হবে। তোমার বন্ধুকে বুঝিয়ে বলতে হবে, আমি যেমন মুক্তি পেয়েছি, তেমনি তাঁকেও মুক্তি দিতে চাই।'

'—গান্ধী বা খদ্দর সম্বন্ধে তার মতবাদ তোমার সঙ্গে এক বলে মনে হলো না।'

'—সে-কথা আমি বলছি না। আমি এই চাই, তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করুন।'

'—বিয়ে! আর একটা!'

'—এতে অবাক হবার, চম্‌কে ওঠবার কি আছে?'

'—তুমি সত্যিই বলছো?'

'—ভুলে যাও কেন, আমি মহাত্মার শিষ্যা।'

'—বেশ, সুবোধকে আমি জানাতে পারি, সে আর একটা বিয়ে করতে পারে, তাতে তোমার বিশেষ মত আছে।'

'—সে-কথা তো আমিও জানিয়েছি। তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে করা দরকার, সে চেষ্টা তোমায় করতে হবে।'

'—অর্থাৎ সিনেমা কোম্পানীটিকে তুমি লিকুইডেসনে দিতে দাও।'

'—চুলোয় যাক্ সিনেমা কোম্পানী! তুমি কিছুই বুঝছো না। আমার শাশুড়িকে যখন প্রথম বলেছিলুম, তিনিও বোঝেন নি। প্রথমে খুব আপত্তি করতেন, এখন মত দিয়েছেন, এ প্রাচীন বংশ লুপ্ত হয়ে যায়, তিনি চান না। বুঝলে, বংশরক্ষা হওয়া দরকার। আজ যদি খোকা বেঁচে থাকতো!'

'—আচ্ছা, আমি সুবোধকে বলবো, কিন্তু তুমি ভেবে দেখো।'

বিহ্বলার মতো সুচিত্রা আমার দিকে চাইলো, ক্ষুব্ধ হতাশের সুরে বলে উঠলো, ভেবে-ভেবে আমি শ্রান্ত, আর তো আমি ভাবতে পারি না, অসিতদা; তোমরা আমার জন্যে একটু ভাবো, একটু ভাবো—'

দুই চক্ষুর তট ছাপিয়ে অশ্রুর বান ডেকে এলো সুচিত্রার।

প্রায় দু'বছর পরে।

গৌরী চিঠি লিখলো, 'সুচিত্রাদিদির বড়ো অসুখ, বোধহয় বেশিদিন বাঁচবেন না, তোমার কথা প্রায়ই বলেন, তোমাকে একবার দেখতে তাঁর বড়ো ইচ্ছে, তোমাকে চিঠি লিখবেন বলছিলেন, কিন্তু বোধহয় লিখতে পারেন নি; তুমি একবার এসো, দাদা। কয়েক মাস আগে গেছলেন ওঁদের জমিদারীর এক গ্রামে দেশের কাজ করতে, বললেন, চাষীদের ঘরে থাকবো, তাদের মতন! এই নিয়ে সুবোধবাবুর সঙ্গে খুব ঝগড়া হয়ে গেছলো। সুচিত্রাদি বলেছিলেন, তুমি তোমার জমিদারীতে সুটিং করবার জন্যে যেতে পারো আর

আমি কাজ করবার জন্যে যেতে পারবো না কেন? সুবোধবাবু বললেন, তুমি অন্য গ্রামে গিয়ে তো কাজ করতে পারো, আমার জমিদারীতে গিয়ে এমনিভাবে থেকে শুধু আমাকে হীন নীচ করবার চেষ্টা করছো। কিন্তু জেনো, আমাদের মান বহু শতাব্দীর, এ-সব মন্দ চেষ্টায় কিছুই ক্ষতি হয় না। সে এক মস্ত কাণ্ড। যাক্, গ্রাম থেকে সুচিত্রাদিদি যে জ্বর নিয়ে ফিরলেন, এখনও তা সারে নি। ডাক্তারেরা অসুখের বড়ো-বড়ো নাম উচ্চারণ করে, হু'দিন অন্তর ওষুধ বদলায়, কিন্তু অসুখ সারছে না। বোধহয় বেশিদিন নেই, তুমি নিশ্চয় একবার এসো, দাদা।'

ছুটি নিয়ে কলকাতায় আসতে হলো।

মনে পড়ে, শীত-অপরাহ্নের ম্লান আলোয় ঘরটি ছায়া-ভরা গত শতাব্দীর পঙ্খের কাজ করা দেওয়াল পুরাতন হাতির দাঁতের রঙের, পিঠে গোল কুশন ঠেসান দিয়ে সুচিত্রা বসে, পায়ের উপর জরি-পাড় লাল পুরাতন শাল জড়ানো, সান্ধ্য-সূর্যের এক ঝলক আলো তার পাণ্ডুর মুখে, যেন শীতের বালুচরলীনা শীর্ণা স্রোতস্বতী। অনেকক্ষণ ছিলুম সে ঘরে, তার রোগশয্যার পাশে, কিন্তু বেশি কথা হয়নি; সব কথা মনেও নেই।

বলেছিলুম, 'ছুটি নিয়ে এলুম তোমায় দেখতে।'

ম্লান হেসে বলেছিলো সুচিত্রা, 'এসেই যে জিগ্যেস করো নি, কেমন আছো, ডাক্তারেরা কি বলছে, কি করে অসুখ হলো, সেজন্যে তোমাকে অনেক— অনেক ধন্যবাদ।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবার বললো, 'জানো অসিতদা, আবার সেই মনের জগতে ফিরে গেছি, স্মৃতির রাজ্যে; পুরোনো-দিনের কথা, বিশেষতঃ শৈশবের কলেজ-জীবনের কথা বড়ো মনে পড়ে। সেই যে বোর্ডিঙের ঘরে দরজা বন্ধ করে ফক্সট্রট নেচেছিলুম, সেজন্যে প্রিন্সিপাল কি তাড়াই দিয়েছিলেন সেদিন আমাদেরকে! আর আমার সঙ্গে সেই তোমাদের বাড়ির বাগানে যখন প্রথম দেখা হয়েছিলো, মনে পড়ে? ভাগ্যিস সেদিন গৌরী বাড়িতে ছিলো না!'

বললুম, 'হ্যাঁ, খুব মনে পড়ে; গৌরী থাকলেও তোমার সঙ্গে বেশ আলাপ হতো।'

করুণ হেসে সে বললো, 'হ্যাঁ, এ যে ভবিতব্য! শোনো অসিতদা, ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের কিছু রেকর্ড পাঠিয়ে দেবে আমায়, ভালো অপেরার গান আর ডান্স মিউজিকও চাই, আমারগুলো হারিয়েছে, ভেঙে গেছে, এখানে খুঁজেও পাচ্ছি না।'

ধীরে-ধীরে বললুম, 'নিশ্চয় পাঠিয়ে দেবো, আমি নিজে এসে শুনিয়ে যাবো তোমায়।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে স্থচিত্রা আবার বললো, 'ভদ্রলোকটির সঙ্গে বোধহয় দেখা হলো না। আজ কোন্ ফিল্মের 'প্রথম রজনী' বুঝি! জানো, এখন মনে আমি একটা গভীর শান্তি অনুভব করি, মাঝে-মাঝে এমন একটা অলৌকিক গভীর আনন্দ জাগে! বোধহয়, এই ঘর-বাড়ি ভাঙা-দেওয়াল, এই শহরের জনতা, এই দুর্ভাগা দেশ—সব ভরে সেই আনন্দের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সে অপূর্ব উপলব্ধি। তখন সবাইকে ভালোবাসতে, ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু সে বোধহয় বেশিক্ষণ থাকে না।'

শ্রান্ত হয়ে স্থচিত্রা চুপ করলো। ছায়া-ভরা ঘরে নীরবতা থম্থম্ করতে লাগলো।

একটু পরে আবার সে বলতে লাগলো, 'জানো, বর্তমানের ঘটনা যেন আমায় স্পর্শ করে না, অতীতের স্মৃতি আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন, এই নিয়ে আমি কেবলই ভাবি। মনে আছে, তোমায় একদিন সি গালের নিনার কথা আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলুম, সে এক-লক্ষ বছর পরের কথা ভাবতে পারে নি, আমি একশো বছর পরের কথাই ভাবি, তখন ভারত স্বাধীন হয়ে গেছে, সমস্ত পৃথিবীতে শান্তি, নতুন সমাজ ব্যবস্থা, I am that spirit, তখনও থাকবো—তখনও আমি থাকবো!'

অন্ধকার কোণে রোমান ক্যাথলিক নার্স যে এতক্ষণ নিস্তব্ধ বসে মালা জপছিলেন, দেখি নি; কালো ছায়ার মতো তিনি আমার সামনে এসে দাঁড়াতে চমকে উঠলুম।

স্থচিত্রা হেসে উঠলো, 'ওই আমার monitress উঠেছেন, আর আমার কথা কওয়া চলবে না; তোমাকেও যেতে হবে বোধহয়, আমি ওকে বলি, পুলিশ হলেই পারতে, নার্স হলে কেন! তবে মায়ের চেয়েও যত্ন করে

তা বলবো ! ওকে দেখলে আমার কন্‌ভেণ্টের দিনগুলো মনে পড়ে যায়, বিশেষতঃ সিষ্টার এলেনবোগেনের কথা।'

নার্স টি আমার কানে চুপি-চুপি বললো, 'সময় হয়ে গেছে, যেতে হবে।' তারপর টেবিল-ল্যাম্প জ্বেলে পর্দা ঢাকা দিয়ে কোণে গিয়ে বসলেন, মালা জপতে।

সুচিত্রা আবার হেসে বললো, 'অসিতদা, ওই কৃষ্ণবেশিনী ভাবেন আমাকে সারিয়ে তুলবেন, হ্যাঁ, I shall live, dance and sing—কি বলো সিষ্টার—হয়তো শেষে রোমান ক্যাথলিকও হয়ে যেতে পারি—হা—হা—Shall dance and sing—হা-হা !'

আমিও হেসে সুচিত্রার কাছ থেকে বিদায় নিলুম। মনে পড়লো, আগে প্রতিবার সুচিত্রার অশ্রুজলের সঙ্গে বিদায় নিয়েছি। এবার সে হেসে বিদায় দিলো। কিন্তু পথে বোধহয় সেই প্রাচীন অন্ধকার বাড়িটির দিকে চেয়ে চোখের জল চেপে রাখতে পারলুম না।

সুচিত্রার সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। আর জীবনে দেখা হবে না।

ময়দান

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

চৌরঙ্গীতে সন্ধ্যার জনতা জমে উঠেছে। বিষে ও অমৃতে মেশানো জীবন যেন প্রকাণ্ড একটা কড়াইয়ে টগবগ করে ফুটছে। কতটুকু বিষ কতটুকু অমৃত—এ নির্ণয় করতে বিধাতা পারেন কিনা তিনিই জানেন, কিন্তু মানুষ পারে না, বিচক্ষণতম রাসায়নিকও না। গোটা ময়দানটাই যেন একটা বিরাট কটাহ। সেদিন পুলিশের ডেপুটি কমিশনার বক্তৃতা দিয়েছেন—রাত্রে গোটা ময়দানটা রহস্যপুরী হয়ে ওঠে। রহস্যপুরী বলতে তিনি অবশ্যই বলেছেন অপরাধতত্ত্বের রহস্যের কথা। অন্ধকার জমে থাকে গাছের তলায় তলায়—কলকাতা মহানগরীর অন্তরের অপরাধ-প্রবণতা সন্ধ্যার অন্ধকার হওয়ামাত্র সরীসৃপের মতো গর্ত থেকে বেরিয়ে ছুটে আসে এখানে অবাধ বিচরণের জন্য।

বিমল খরবটা পড়ে হেসেছিলো।

কয়েকদিন আগে সে বসেছিলো কার্জন পার্কে। সুরেন্দ্রনাথের মূর্তির নিচে বেদীটায় অন্ধকারে চুপ করে বসেছিলো। হঠাৎ এসে জুটলো সেখানে বেদের মেয়ে ক'জন আর জন-তিনেক রাত্রের অন্ধকারে উল্লাস-প্রয়াসী। বেচারীকে উঠতে হলো। এ-সব তার অজানা নয়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এদের সে দেখেছে। বেদের মেয়েদের উৎপাতে কার্জন পার্কের দক্ষিণ-দিকের রাস্তাটায় পথ-হাঁটা চলে না। শুধু তাদেরই উৎপাত নয়। ভদ্র ঘরের কুমারী মেয়ের মতো সেজে অনেক মেয়ে পুরুষ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সেদিন তার অন্ধকারের নেশা লেগেছিলো। মনে আছে—তিথি ছিলো অমাবস্যা, আকাশে ছিলো মেঘ, সে অন্ধকারের নেশায় সামনের মাঠের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছিলো। মনুমেন্টের তলায় সিঁড়ির উপর বসে আছে

কতকগুলি লোক। নিস্তব্ধ হয়ে প্রেতের মতো বসে আছে সব—মধ্যে-মধ্যে জ্বলন্ত বিড়ি-সিগারেটের আগুন জ্বলে-জ্বলে উঠছে। আরও একটু এগিয়ে গেল সে। একটা গাছের তলায় গিয়ে চুপ করে বসলো।

কয়েক মিনিট পরেই একজন এসে গাছটার তলায় দাঁড়ালো, ওই দিকটায়—একটি মেয়ে।

বিব্রত হলো বিমল। ভাবলো, উঠে বা গলার সাড়া দিয়ে জানিয়ে দেয় নিজের অস্তিত্ব। তার আগেই মৃদুস্বরে সে ডাকলো, 'নেপী!'

বিমল উত্তর দেবে কিনা বুঝতে পারলো না।

মেয়েটি আবার ডাকলো, 'নেপী! আমি এসেছি!'

এগিয়ে এলো সে বিমলের দিকে। চমকে উঠলো এক ঝলক আলোয়, টর্চের আলো। মুহূর্তে নিভেও গেল। আলোটা শুধু নিভেই গেল না, সঙ্গে-সঙ্গে টর্চটা পড়েও গেল, মেয়েটি অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো, 'বিমলবাবু।'

'—কে?'

'—আস্তে কথা বলবেন।'

'—কিন্তু কে—'

'—আমি—নীলা সেন—এখন নীলা চ্যাটার্জী।'

'—ও!' বিস্ময়ের আর অবধি রইলো না বিমলের। নীলার মতো মেয়ে এখানে? এই অন্ধকারে, এই পাপের রাজ্য কলকাতার ময়দানের গাছতলায়? সে প্রশ্ন না করে পারলো না, 'তুমি এখানে?'

'—নেপীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

নেপী নীলার সহোদরা, রাজনৈতিক দলের কর্মী, আত্মগোপন করে রয়েছে সে এখন।

'—ওই, নেপী আসছে বোধহয়।'

একটা পেন্সিল-টর্চের আলো একটু দূরে জ্বলেই নিভে গেল!

একটি সাদা মূর্তি নড়ছে।

'—আমি চলি।' বিমল উঠে পড়লো।

'—দেখা করবেন না, নেপীর সঙ্গে?'

'—না।'

খানিকটা এসে বিমল দেখলো—নেপী আর নীলা দু'জনে হন-হন করে চলে যাচ্ছে—দক্ষিণ মুখে। বুঝলো সে, নেপী তাকে বিশ্বাস করতে পারেনি! আর একদিন দেখেছিলো—আর একজনকে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের কাছাকাছি একটা রাস্তার ধারে গ্যাস-পোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলো একটি মেয়ে পাথরের মূর্তির মতো। সে তাকে দেখেও চমকে উঠেছিলো! মেয়েটি অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। দু'টি ছোকরা তার চারপাশে ঘুরছে। এ মেয়েটিকেও বিমল চেনে। মিশ্রা যে তাকে দাদা বলে, মিশ্রাকে সে ভুলবে কি করে? মিশ্রাও রাজনৈতিক দলের কর্মী। সেও আত্মগোপন করে আছে। বিমল তার সামনে এসে একটু দূরে দাঁড়ালো। মিশ্রা তেমনি অচঞ্চল মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো। মুখের এতটুকুও পরিবর্তন হলো না। চোখের দৃষ্টি ফিরলো না, ভ্রূ নড়লো না। আশ্চর্য হলো না বিমল। ভাবলো, কোনো সহকর্মীর জন্য দাঁড়িয়ে আছে। মনে-মনে অজস্র আশীর্বাদ জানিয়ে সে চলে গেল আপনার পথে।

সেদিন মনে পড়ে গিয়েছিলো—এমনি একটা গাছতলায় শহীদ নলিনী বাগচী তিনদিন পড়েছিলেন—অসুস্থ অবস্থায়। কলকাতায় বিগত কালের বিপ্লবের নাটকের কতো খণ্ড-দৃশ্যের পটভূমি এই রাত্রির ময়দান—তার হিসাব নেই।

তবে ডেপুটী কমিশনারের কথা এক হিসাবে পুরোপুরি সত্য।

যে কালে নলিনী বাগচী গাছতলায় পড়েছিলেন অসুস্থ অবস্থায়—এই ময়দানের গাছতলা তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলো, সে কালের আত্মরক্ষা বিভাগের দৃষ্টিতে নলিনীর আচরণ রাজনৈতিক অপরাধ বলে গণ্য ছিলো। এ কালে নেপী—মিশ্রা—এরাও রাজনৈতিক অপরাধের জন্য দায়ী। আবার ওরা যদি কখনও রাজনৈতিক অধিকার আয়ত্ত করতে পারে—হয়তো তখন আর কোনো দলের কর্মী এমনিভাবে এই গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকবে। শহীদেরা নিজেদের দলকে প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে দিয়ে চলে যায়; যারা থাকে—অধিকার যাদের হস্তগত হয়, তখন তারাই এখানকার অপরাধ দলনের ভার গ্রহণ করে। ময়দানের অন্ধকারে এমনিভাবেই ঘনঘটার ফাঁকে-ফাঁকে দু'চারটি তারাফুল ফুটবে।

বিমলই হয়তো তাদের দেখেও মুগ্ধ হবে এমনিভাবেই।

ভাবতে-ভাবতেই চলেছিলো বিমল। এমন সময় হঠাৎ সামনে থেকে কে একজন নারী-কণ্ঠে বললো, 'একটু দাঁড়ান তো।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো বিমল, মনুমেণ্টের উত্তর দিকে—এ-পাশে ভাবানীপুর খেলার মাঠ—ও-পাশে বাস দাঁড়াবার জায়গা। মধ্যে যুদ্ধের সময় তৈরি রাস্তাটা। সেই রাস্তায় কাঁধে একটা-কিছু নিয়ে একটি মেয়ে চলে আসছে। দক্ষিণদিক থেকে আসছে। অস্পষ্ট আলো। তবু বিমল মেয়েটিকে যেন চিনতে পারলো। মেয়েটিকে প্রায়ই দেখা যায় এসপ্ল্যানেডে। একটি ঘুমন্ত ছেলে কাঁধে ফেলে মেয়েটি কার্জন পার্কটা বেড় দিয়ে ঘোরে। এসপ্ল্যানেড ট্রাম-চক্রটায় ঘুরে বেড়ায়। প্রথম দিন বিমল দেখে মনে করেছিলো—কোনো গৃহস্থ-বধূ। সমস্ত চেহারাটায় তার একটি নিরপরাধ জীবনের ছাপ মাখানো আছে। মনে হয়, একটি গ্রাম্য-বধূ সদ্য কলকাতায় এসে পথ হারিয়েছে।

দু'দিন-একদিন অন্তর বিমল এখানে আসে। কলকাতার জীবনকে দেখে। এরপর যতদিন সে এসেছে এ জায়গায়, প্রায় প্রতিদিনই সে দেখেছে মেয়েটিকে, দেখেছে একটা ঘুমন্ত ছেলে কাঁধে ফেলে সাদাসিধে আর নিরীহ চেহারার একটি মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এসপ্ল্যানেডে, কার্জন পার্কের চারপাশের রাস্তায়। দেখে ওর ভুল ভেঙে গেছে। হয় পেটের দায়ে, নয় পেশায় আর নেশায় ঘুরে বেড়ায় ও! ছেলেটা এমনভাবেই ঘুমোয়; সম্ভবত ঘুমের কোনো ওষুধ খাওয়ায়।

মেয়েটিকে চিনতে পেরে সে ভ্রূ কুঞ্চিত করলো, দাঁড়িয়েছিলো থমকে—চলতে আরম্ভ করলো। পিছন থেকে মেয়েটি বললো, 'দয়া করে একটু দাঁড়ান। বিপদে পড়েছি আমি।'

কণ্ঠস্বরে আকুতি ছিলো তার। সে আকুতি অভিনয় বলেই মনে হলো বিমলের। মেয়েটি এগিয়ে এলো, দ্রুতপদেই এগিয়ে এলো। হাঁপাচ্ছিলো, একটু জোরেই হেঁটেছে বিমলকে ধরবার জন্য।

বিমল বললো, 'কি হয়েছে আপনার? কি বলছেন?'

'—একটু এগিয়ে দিন আমাকে। ট্রাম পর্যন্ত।'

ভ্রূ কুঞ্চিত করে বিমল বললো, 'এই অন্ধকারে মাঠের মধ্যে কোথায় গিয়েছিলেন আপনি ?'

এ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে সে বললো, 'ক'জন হিন্দুস্থানী আমার পেছু নিয়েছে।'

'—অন্ধকারে একলা মাঠের মধ্যে ঘুরলে—এ তো হবেই।'

'—ট্রামের ওখানে গেলেই আলোর মধ্যে আর-কিছু করতে পারবে না ওরা আমার !'

বিমল আর কোনো প্রশ্ন করলো না। মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়েই হাঁটতে লাগলো সে।

আলোকিত এসপ্ল্যানেডে এসে মেয়েটি মুহূর্তে জনতার মধ্যে মিশে গেল। বিমলকে একটি কথা পর্যন্ত বললো না। বিমলও কথা বলার অবকাশ পেলো না, কথা বলবার জন্য যখন পিছন ফিরলো তখন সে তার পিছনে ছিলো না, কখন যে তার সঙ্গ পরিত্যাগ করেছে, বিমল জানতেও পারেনি। একটু সন্ধান করে দেখতেই নজরে পড়লো, দেখলো—চলে যাচ্ছে মেয়েটি।

পরের দিনও বিমল দেখলো মেয়েটি যথানিয়মে এসপ্ল্যানেডের জনতার মধ্য থেকে কার্জন পার্কের ছমছমে আলো-আঁধারির রহস্যের মধ্যে মিলিয়ে গেল—সুন্দর-দর্শন সরীসৃপের মতো, সবুজ লাউডগা সাপের মতো গাছের পাতার সঙ্গে মিশে গেল যেন।

দু'দিন পর, সেদিন একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। কোলে ছেলে নিয়ে হাত তুলে নমস্কার করার উপায় ছিলো না—একটু হেসে মেয়েটির বললো, 'নমস্কার !'

বিমল কোনো উত্তর না দিয়েই চলে গেল পাশ কাটিয়ে। চলে যাচ্ছিলো সে চৌরিঙ্গীর দিকে। কিছুদূর এসে তাকে দাঁড়াতে হলো, রাস্তায় মোটরের প্রবাহ চলেছে যেন। মিনিট-দুয়েক দাঁড়াতে হলো। এর মধ্যেই সে এসে তার পাশে দাঁড়ালো। বললো, 'শুনুন।'

চমকে উঠলো বিমল, 'কি ?'

'—নমস্কার করলাম। আপনি একটা কথাও না বলে চলে এলেন ?'

'—এলাম। আপনার সঙ্গে এভাবে আলাপ করবার তো কোনো হেতু নেই আমার।'

মেয়েটি বললো, 'দীন-দুঃখীকে দয়াও তো করে থাকেন!'

'—দয়া?' বিস্মিত হলো বিমল। ঠিক খুঁজে পেলো না, এ-কথার কি উত্তর দেবে।

'—কিছু খাওয়াবেন আমাকে?'

'—খাওয়াবো?'

'—হ্যাঁ। আজ আর—।'

মেয়েটি হাসলো। আশ্চর্য অভিনয় করতে পারে সে। এমন ব্যঙ্গ মেশানো বেদনা ফুটে উঠলো তার হাসিতে যে, তার বোধহয় তুলনা হয় না।

বিমল পকেট থেকে একটি টাকা বের করে তার হাতে দিয়ে বললো, 'এই নিন। যা খুশি হয় খাবেন।'

মেয়েটি হাত সরিয়ে নিলো। বললো, 'না। টাকা আপনার রাখুন। খাওয়াবেন তো চলুন না—কোনো হোটেলে—'

'—না।'

'—তবে মোড়ে ওই ফিরিওয়ালারা খাবার বেচছে—দহি-বড়া—কচুরী।—চলুন, খেতে-খেতে আপনাকে বলবো আমার কথা। আমার অনেক দুঃখের কথা।'

চৌরঙ্গীর পশ্চিম দিকে পার্ক-করা মোটরের সারির মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিলো। কৌতূহলী দর্শকেরা আশপাশ ভিড় জমাচ্ছিলো। বিমল বিব্রত এবং ক্রুদ্ধ হয়েই বললো, 'চলুন।'

কার্জন পার্কের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে খাবারের ফিরিওয়ালারা অপেক্ষাকৃত অভিজাত। চাকাওয়ালা হাত-গাড়িতে খাবার সাজিয়ে তার উপর গ্যাসের আলো জ্বেলে বিক্রি করে। পাঞ্জাবি ভদ্রলোকেরা এখানে বেশি ভিড় করে। মেয়েরা আঙুল দিয়ে দেখায়—খাবারওয়ালা তুলে ঠোঙার উপর দেয়।

খাবারওয়ালার হাতে একটা টাকা দিয়ে বিমল বললো, 'ইনি যা-যা খেতে চান, দাও।'

মুহূর্তে মেয়েটি বাঁ হাতে বিমলের জামার খুঁট চেপে ধরে বলে, 'না।'

'—মানে ?'

'—যেতে পাবেন না।'

রূঢ় হয়ে উঠলো বিমল, 'কেন এমন-ধারা বিরক্ত করছেন আমাকে ?'

'—বিরক্ত ? বিরক্ত হচ্ছেন আপনি ?'

'—হ্যাঁ, হচ্ছি।'

একটা বিচিত্র দৃষ্টি তার চোখে খেলে গেল। একটা বিদ্যুৎ চমকে উঠলো যেন। বিমল গ্রাহ্য করলো না, চলে গেল। কিন্তু ট্রামের জন্য দাঁড়াতে হলো তাকে।

বেহালা বা আলিপুরের ট্রাম যাচ্ছিলো। মেয়েটি পাশে এসে দাঁড়ালো। বললো, 'ইচ্ছে করলে মিছিমিছিও অপদস্থ করতে পারি আপনাকে। কিন্তু না, তা করবো না। যান আপনি, চলে যান।'

দিন পনেরো পর। এ পনেরোদিন বিমলের এসপ্ল্যানেডে যাওয়া ঘটে ওঠেনি। কয়েকদিন গিয়েছিলো বাইরে, ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়ে কয়েক-দিন বাইরে বের হয়নি। সেদিন সন্ধ্যায় পরিচ্ছন্ন আকাশ এবং জ্যোৎস্না ওকে ঠেলেই যেন ঘর থেকে বের করলো।

এসপ্ল্যানেডের আলোর মধ্যে জ্যোৎস্না নেই। সে গিয়ে বসলো মনুমেণ্টের তলায়। মাঠের ঘাসের উপর জ্যোৎস্না পড়েছে—ঘাসের ডগা-গুলিতে অত্যন্ত ক্ষীণ ঝিকমিক ছটা বেজেছে, একটি অপরূপ কোমল শুভ্র যেন গলে এলিয়ে পড়েছে তৃণাস্তরণের শ্যাম-লাবণ্যের উপর। বড়ো-বড়ো গাছগুলোর উপরের পাতার ছটা পড়েছে। কিন্তু মনুমেণ্টের চারপাশে নানা বিচিত্র খেলা চলেছে। জন-কয়েক বসে চাঁদের আলোয় তাস খেলছে। সম্ভবত জুয়া। জন-কয়েক মিলে গাঁজা খাচ্ছে। জায়াপতি হিসাবে দম্পতি কি-না কে জানে—দু'টি যুগল রয়েছে, তারা প্রায় নিঃশব্দ হয়ে বসে আছে। মধ্যে-মধ্যে ছোটো-ছোটো দল এসে ঘুরপাক খেয়ে দেখে যাচ্ছে, যুগল দু'টির সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ঘুরে চলে যাচ্ছে! হঠাৎ তাসওয়ালাদের কলহ বাধলো। কলহ ক্রমে প্রবল হয়ে উঠছিলো, একজন

আর একজনকে মেরে বসলো এক চড়। বিমল উঠে পড়লো। এখানে আর বসা যাবে না।

এগিয়ে এসে সে বসলো একটা গাছতলায়।

একটা পায়ের শব্দ, নরম ঘাসের উপর কোনো পথিক চলেছে। শব্দ এসে বিমলের পিছনেই থামলো। বিমল মুখ ফিরিয়ে দেখলো—সেই মেয়েটি, তারই পাশে সে বসে পড়লো।

বিমল ভয় পেলো আজ।

বসে সে বললো, 'মনুমেন্টের সামনের রাস্তা থেকে দেখেছি আমি। পেছনটা দেখেই চিনেছি। একবার দেখলে আর আমার ভুল হয় না।'

'—কিন্তু কি চাও তুমি আমার কাছে?' আজ আর সে তাকে আপনি বলে সম্ভ্রম করলো না।

সে বললো, 'টাকা আর চাইবো না আপনার কাছে। বাবাঃ, সেদিন যে রাগ আপনার!'

'—মিছে কথা।'

'—না।' ছেলেটাকে কোলে নিয়ে ঘোমটা টেনে হাত বাড়িয়ে সে বললো 'কচি-বয়েসী মেয়ের হাতে সন্ধ্যে থেকে একটা টাকার চেয়ে অনেক বেশি পড়ে।'

'—তাও করো?'

'—করি বই-কি। না-হলে পাপ করতে হয়।'

বিমল ব্যঙ্গ-হাসি হেসে তার মুখের দিকে তাকালো। বারবার না-এর ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে সর্বাঙ্গ দিয়ে অস্বীকার করে সে দৃঢ়স্বরে বললো, 'না। পাপ আমি করি না।'

'—তবে রোজ সন্ধ্যেয় এমন করে ঘোরো কেন এই ময়দানের আবছায়া-ভরা রাস্তায়-রাস্তায়?

'—কেন ঘুরি? হাসলো একটু, তারপরে বললো:

* * *

'সেদিনও ঠিক এমনি রাত্রি ছিলো—এমনি চাঁদনী রাত—'

বাধা দিয়ে বিমল প্রশ্ন করলো, 'তোমার নাম কি? কোথায় বাড়ি?'

'—নাম আমার সুষমা। বাড়ি মানে, দেশ কোথায় তা জানি না। জ্ঞান হওয়া অবধি থাকি কলকাতায়। বাবার নাম জানি না। মা আমার বাবার ঘর ছেড়ে চলে এসেছিলো—এ-কথা জানি। তখন আমার বয়েস হবে দেড় কি দু'বছর। যে লোকটির কাছে মা থাকতো—তাঁকে অল্প-অল্প মনে পড়ে। তাকেই বলতাম বাবা! যা পাপ তিনি করে থাকুন, আমাকে কিন্তু তিনি বড়ো ভালোবাসতেন। সুষি বলে ডাকতেন। ভালো-ভালো ফ্রক এনে সাজিয়ে মায়ের হাত ধরে রাত-দিন এখানে বেড়াতে আসতেন। এ জায়গাটা ছেলেবেলা থেকে আমার চেনা। সে সময় কি ফুলই ফুটতো এই পার্কে। তারপর হঠাৎ তিনি মারা গেলেন। আমার বয়েস তখন চোদ্দ-পনেরো।

'মাকে বলে গেলেন—সুষিকে গান-বাজনা শিখিয়ো—লেখা-পড়া শিখিয়ো—ওই তোমার ভার নেবে একদিন। গানের গলা ভালো, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ—নিজের পথ ও নিজেই করে নেবে।'

একটু চুপ করে ভেবে নিলো কিছু সুষমা। তারপর বললো, 'বোধহয় মা আর আমার পালক-পিতা যা করেছিলেন তাতে যে পাপ হয়েছিলো, তার বেশিটা ছিলো আমার মায়ের। আমার মনে আছে—বাবার—হ্যাঁ বাবাই বলবো তাঁকে, বাবার মৃত্যুর কিছুদিন পর একদিন পাড়ার মহিলা সমিতির একজন এসে মাকে বললো—শুনলাম আপনি খুব অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছেন। হঠাৎ স্বামী মারা গিয়ে—

'মা তার কথায় বাধা দিয়ে বললো—কে বললো আপনাকে?

'মেয়েটি ভড়কে গেল। বেশ একটু অবাক হয়ে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলো খানিক্ষণ।

'মা বললো—স্বামী নিয়ে চিরকাল ঘর আর কে করে?

'মেয়েটি বললো—তা বলি নি। বলছি—একলা মেয়েছেলে—মেয়েটিকে নিয়ে বিব্রত হয়েছেন—

'—হ্যাঁ, তা হয়েছি। কিন্তু আপনি কে?

'—আমি পাড়ারই মেয়ে। এ পাড়ার মহিলা সমিতি থেকে আপনার কাছে এসেছি আমি।

'—মহিলা সমিতি? জামা সেলাই, ঠোঙা তৈরি—? না, ও-সব আমি পারবো না, দরকারও নেই। তেমন অবস্থা আমার নয়।

'মেয়েটি হেসে এবার বললো—বেশ তো। সে-সব করে কাজ কি আপনার? আপনার মেয়ের জন্যে কোনো ব্যবস্থা যদি করতে হয়—বলুন। পড়ছে তো এখন?

'—ঘরেই পড়ছে। আর গান শিখছে।

'—পড়ার জন্যে আমাদের ওখানে ক্লাশ আছে, সেখানে দেবেন?

'—না—না। ও-সবের মধ্যে আমি নেই। দু'দিন পরে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরবে—পরোপকার করে। ওকে আমি সিনেমায় দেবার জন্যে তৈরী করছি!

'মেয়েটি চলে গেল।

'আমি সেদিন অবাক হয়ে গেলাম। চোখে একটা ঘোর লেগে গেল। সিনেমায় নামবো আমি? দেওয়ালের গায়ে কাননবালা, সন্ধ্যারাণীর মতো ছবি থাকবে আমার? এমনি দেখাবে আমাকে!

'বাবা বেঁচে থাকতেই একটা হারমোনিয়ম কেনা হয়েছিলো। সারাদিন চেঁচাতাম—সা—রে—গা—মা—। সারেগা, রেগামা; সা—সা—'

বলতে-বলতে হেসে উঠলো সুষমা। তারপর বললো, 'জানেন, আমাদের পাশের বাড়িতেই যারা থাকতো, তারা শেষ পর্যন্ত অধীর হয়ে একদিন টিন বাজানো শুরু করলো। আমিও আরম্ভ করতাম—সা—রে—গা—মা—ওদের বাড়ি থেকেও অমনি শুরু হতো—ট্যাং—ট্যাং—ট্যাং—ট্যাং।

'আজ হাসছি—সেদিন কিন্তু চোখে জল আসতো।

'ক্রমে গান শিখে গেলাম কিছু-কিছু। দু'তিনটে গান বেশ ভালো গাইতে শিখলাম। টিন-বাজানোও বন্ধ হলো। অবিশ্যি আমি গান শিখলাম, আমার গান শুনে ওরা লজ্জা পেলো, এ বলে নয়। গান গাইতে আমি ক্লান্ত হলাম না, কিন্তু টিন বাজিয়ে ওরা ক্লান্ত হলো। যখন ওরা টিন বাজাতো, তখনও আমি থামতাম না, বরং ওদের বাজনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জোরে গান গাইতাম, পর্দা চড়িয়ে দিতাম। ওস্তাদও একজন জুটেছিলো—বাবার বন্ধু। বাবার মৃত্যুর পর সেই ছিলো আমাদের সংসারের একমাত্র বন্ধু। অকপট

বন্ধু, নিজের বুদ্ধিমতো পরামর্শ দিতো সে। সে-ই মায়ের মাথায় ঢুকিয়েছিলো —সিনেমায় দেওয়ার কথা।

'সিনেমায় যারা নামে, তাদের সুখ-ঐশ্বর্য তো আলিবাবার গল্পের ডাকাতদের গুহার ধনসম্পদের মতো। আমার ওস্তাদ বলতো—বুঝেছো না, সুষির মা—একবার ছবিতে নামাতে পারলে হয়, বাস—চিচিং-ফাঁক।

'আমাকে ডাকতো সে—শিষ দিয়ে—'সু-সি।

'আমাকে বলতো—খবরদার যেমন-তেমন করে কাপড় পরবি নে। ফেরতা দিয়ে কাপড় পরবি। চব্বিশ ঘণ্টা এমনি করে কাপড় পরবি। পলার মালা, পুঁথির দুল, কাঁচের কঙ্কন এনে দিতো।

'বাবা একটা বড়ো আয়না কিনেছিলো এক সময়। পুরোনোই কিনেছিলো, সেটার ভেতরটায় ছ্যাকরা-ছ্যাকরা দাগ ধরেছিলো বলে চেহারা ভালো দেখা যেতো না; আমি সেই আয়নাটার সামনে সেই সব পরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতাম—নাচতাম। একটা ছবির গান ভারী প্রিয় ছিলো—"ভালো না লাগে তো দিয়ো না মন"।

'ওস্তাদ বলতো—আমায় কিন্তু তোর গানে সুর দিতে হবে। তোকে জেদ ধরতে হবে।

'লোকটা পাগল ছিলো। বুঝলেন না! নিজের কদরও জানতো না। ভাবতো—কাননবালার চেয়েও আমি নাম করবো সিনেমায়।

'আমিও তাই ভাবতাম। মা-ও তাই বিশ্বাস করতো। এক-একদিন রাত্রে মা ওস্তাদের সঙ্গে বসে পরামর্শ করতো, আমি শুনতাম আর বাড়ির সামনে দেড় হাত ফালি বারান্দায় বসে দু'হাত চওড়া গলিটার মাথার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না থাকলে আকাশ দেখতাম, কৃষ্ণপক্ষ হলে তারার ঝিকিমিকি দেখতাম, মেঘলা হলে মেঘ কখন চমকাবে তারই অপেক্ষা করতাম।

'মা বলতো—গাড়ি থাকলে কলকাতার বাইরেই ভালো। তাছাড়া টেলিফোন থাকলে ভাবনা কি!

'ওস্তাদ বলতো—শহরের বাইরে হলে জায়গার ভাবনা কি? ভালো জায়গা আর সিনেমার ষ্টুডিয়োর লাগাও, টালিগঞ্জের রিজেণ্ট পার্ক, কি তার আশপাশে।—

'মা বলতো, কলকাতার বাইরে দুঃখ শুধু মাটির-তলার ড্রেনের। এছাড়া আর দুঃখ কী?

'—কিস্যু ভাবনা নেই! ও-সব যা ব্যবস্থা হয়েছে আজকাল!—আমাকে কিন্তু একখানা ঘর দিতে হবে।

'—নিশ্চয়। নইলে সব দেখবে-শুনবে কে? তাহলে কাল সকালে খুব ভোরে ওকে তৈরি করে রাখবো।

'—একেবারে ঘড়ি ধরে যেতে হবে।

'একজন ডিরেক্‌টার নাকি দেখতে চেয়েছেন আমাকে।

'গেলাম! ভোরবেলায় উঠে সেজেগুজে বেরুলাম। সাজতে তখন শিখে গিয়েছি। রুখু চুল, সাদা মিলের কাপড়, টাইট-হাতা টকটকে লাল রঙের ব্লাউজ; মোট কথা—একেবারে মডার্ন মেয়ে। কাঁধে প্ল্যাষ্টিকের ভ্যানিটি ব্যাগ নিলাম ঝুলিয়ে।

'ডিরেক্‌টার বাংলাদেশের মস্ত ডিরেক্‌টার। দেখে ফিরিয়ে দিলেন। বললেন—আমি যে রকমটি খুঁজছি, ঠিক সে রকমটি নয়।—তবে—। তবে এসেছো, বলছো—অভাব। তা—ছোটখাটো কিছু দিতে পারি। তাও পারবে কিনা আমার সন্দেহ আছে।

'ওস্তাদ সেখানে কেঁচোর মতো নিরীহ। মুখে তার একটিও কথা ফুটলো না। চুপ করে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে লাগলো।

'ডিরেক্‌টার বললেন—যেদিন কাজ থাকবে, সেদিন দশ টাকা হিসেবে পাবে। বুঝেছো?

'ওস্তাদ বললো—ইয়েস স্যর। তাই হবে, স্যর।

'বাড়ি এসে ওস্তাদ লাফালো। বললো—ও হলো একটা কাক। ও সবারই মাংস খায়—ওর মাংস দুনিয়ায় কেউ খেতে পারতো না। কিন্তু ধর্মের কল আপনি নড়বে। দিক না ছোটো পার্ট। ওতেই বাজীমাৎ হয়ে যাবে। একজন নাম-করা সিনেমা অভিনেত্রীর নাম করে বললো—তাকে ছোট্ট একটা পার্ট দিয়ে নামিয়েছিলো গিরিজাবাবু ডিরেক্‌টার। মাত্র পঞ্চাশ টাকা দিয়েছিলো। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে গেল। এক পার্ট করেই ব্যস বাজীমাৎ। যেদিন বই খুললো, তার তিনদিনের মধ্যে চার-চারটে

কন্‌ট্রাক্ট। একেবারে হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার। এও ঠিক তাই হবে। বলেই শিস দিয়ে ডাকলো—স্থ—সি!

'সবচেয়ে পাগলামী করলো সে—যখন ডিরেক্‌টার আমায় পার্ট দিলেন। একটি পাড়াগেঁয়ে নতুন বউয়ের পার্ট দিলেন।

'ওস্তাদ বললো—আজ্ঞে না, স্যর। মডার্ন মেয়ের পার্ট ভিন্ন ও কিন্তু নামবে না।

'ডিরেক্‌টার বললেন—মানাবে না। এতেই ওকে ভালো মানাবে।

'—না। ও হবে না, স্যর। গুড-বাই টু ইওর চ্যারিটি স্যর। দশটা টাকা ঋন করে ফেলে দিয়ে পাগল আমাকে উঠিয়ে নিয়ে চলে এলো।

'মা বললো—উঠিয়ে নিয়ে এলে—কিন্তু।

'—কিন্তু কিসের? আবার ঠিক করেছি আমি। কালই।

'ওস্তাদ পাগল হলেও করিতকর্মা লোক। তিনদিনের দিন নতুন ডিরেক্‌টারের কাছে নিয়ে গেল। পার্টও পেলাম ওস্তাদের মনের মতো। আমারও মনের মতো। কলেজের মেয়ে, স্বদেশী করে বেড়ায়। একটা খবরের কাগজের আপিসে স্ট্রাইক হয়েছে—পিকেটিং করেছে সেখানে। পার্ট করলাম। ছবি খুললো। দেখতে গিয়ে নিজেকে দেখেই নিজের ঘেন্না হলো। ঠিক যেন হাড়গিলের মতো কুৎসিত একটা মেয়ে আমি। লোকে টিট্‌কারী দিয়ে উঠলো। আমি কেঁদে ফেললাম। ওস্তাদ গাল দিতে লাগলো ক্যামেরাম্যানকে।

'ব্যস, আমার সিনেমার স্বপ্ন ভেঙে গেল।

'দিন-কয়েক ধরেই ওস্তাদের সঙ্গে মায়ের পরামর্শ চললো। মা বললো—ভোরবেলা উঠে তৈরি হবি। বেরিয়ে যেতে হবে ওস্তাদের সঙ্গে। পাড়ায় বলবি চাকরি পেয়েছিস। সকাল-সন্ধ্যে ডিউটি। ফিরবি—আটটা ন'টায়। আবার বেরুবি সাড়ে পাঁচটায়। বুঝেছিস?

'সেদিন বুঝিনি। পরে বুঝলাম—অনেক পরে। মায়ের ছিলো একটা অদ্ভুত ভঙ্গি। পাড়ায় মা ছিলো একা, কারুর সঙ্গেই বনাবন্তি ছিলো না। প্রায়ই আমাকে বলতো, কারুর সঙ্গে মিশবি নে। ওরা আমাদের ঘেন্না করে। আমরা পাপী। আমরা গরীব। একদিন ওদের দেখিয়ে দেবো আমি।

'দোষও হয়তো ছিলো না। পাড়ার লোকে হাসতো—আমার এই চালচলন দেখে। এতে আমরাও রাগ হতো। চোখ ফেটে জল আসতো। কিন্তু উপায় কী আর ?

'মা পাড়ার লোকের কাছে মন রাখবার জন্যে এই নতুন ব্যবস্থা করলো। আমারও ভালো লাগলো। ভোরবেলা সেজেগুজে বেরিয়ে যেতাম। পথে-পথে ঘুরে পার্কে বসে সকালবেলাটা কাটিয়ে বাড়ি ফিরতাম। ওস্তাদ পথে আমায় ছেড়ে দিয়ে চলে যেতো। সকালে একটা কাজ ছিলো তার।

'সন্ধ্যেবেলা আমার সঙ্গে থাকতো সে। ঘুরতাম পথে-পথে, সিনেমার সামনে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে আঁকা ছবি দেখতাম।

'একদিন মা বললো—আর তো চলে না, সুষি। দু'বছর যা করে চললো—সে ভগবান জানেন।

'উপায় আমিই বা কি করবো ? ভেবে আমিই বা কি উপায় পাবো ?

'মায়ের চোখ হঠাৎ জ্বলতে লাগলো। আমি ভয় পেলাম। মা আমার হাত চেপে ধরে বললো—এক উপায় আছে।

'—কি, বলো ?

'মা বললো—বড়োলোকের ছেলে দেখে তাকে ধরতে হবে তোকে। ওস্তাদ দেখিয়ে দেবে। তুই ডেকে তার সঙ্গে আলাপ করবি। তারপর! তারপর তাকে তোকে বাঁধতে হবে। বিয়ে করতে বাধ্য হবে। বড়ো হয়েছিস, বুঝতে পারছিস সব। এ-ছাড়া উপায় নেই!

'শরীর শিউরে উঠলো। মায়ের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। মায়ের কথা শুনে যেমন ভয় হলো, তেমনি আমার রক্তে লাগলো নাচন। আমার পাপ কিনা জানি না। তবে নিজের স্বামী পৃথিবীর মানুষের মেলা থেকে পছন্দ করে, তাকে মুগ্ধ করে আনার মধ্যে নেশা আছে, রক্তে নাচন আপনি লাগে, বুকের মধ্যে রেলগাড়ি ছুটে চলে, কান গরম হয়ে ওঠে; বিশেষ করে ষোলো-সতেরো বছর বয়েসে।

'ওস্তাদ এনে দিলো একটা ঝোলা। শৌখিন, চমৎকার ঝোলা। আর এনে দিলো কতকগুলো সাবান, সেন্ট, স্নো। ওই সব বিক্রির অজুহাত নিয়ে আলাপ করতে হবে।

'দেড় বছর আগে একটি মডার্ন মেয়ে ঘুরতো কলকাতার পথে। সুন্দর চেহারা, সুন্দর পোশাক দেখলে ডেকে বলতো—একটু শুনুন।

'দাঁড়াতে হতই। ষোলো-সতেরো বছরের একটি মডার্ন মেয়ে ডাকলে কোন্ ছেলে না-দাঁড়াবে?

'—কিছু সাবান, সেন্ট কিনুন না।

'তারপর ধীরে-ধীরে একটি গল্প। সত্যি গল্পই। একটু-আধটু পাল্টে বলতে হতো। বললাম—ম্যাট্রিক পাশ করলাম, আশা ছিলো স্কলারশিপ পাবো। কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ। পেলাম না। ভর্তি হয়েছিলাম। ফ্রিশিপও পেয়েছিলাম। কিন্তু ফ্রিশিপ পেলেই তো পড়া হয় না। আরও খরচ আছে। মায়ের টি-বি। দেনা হয়ে গেছে। বাবার এক বন্ধু দেনা দিয়েছিলো, লোকটা পিশাচ। সে এখন—।

'চুপ করে মুখ নামাতাম।

'প্রশ্ন হতো—সে এখন কি করছে? জুলুম?

'—টাকা চাইছে ফিরে। চেঁচামেচি করে না, মন্দ কথাও বলে না, মিষ্টি করেই যা বলে, তার চেয়ে মন্দ আর কিছু হয় না। লোকটির বুড়ো বয়েসে স্ত্রী মারা গেছে—। বলে—।

'—কি বলে?

'—কি বলবে বলুন। আমাকে বিয়ে করতে চায়। অগত্যা এই পথ বেছে নিয়েছি। এতবড়ো শহরে খেটে খেতে পারবো না।

'জিনিস বিক্রি হতো। হয়তো ওই ওতেই আমার জীবনের সব সমস্যা মিটে যেতো। একালের ছেলেদের যতো খারাপ লোকে বলে বা ভাবে, তা তারা নয়। তারা বিশ্বাস করতো আমার কথা—আমাকে সাহায্য করতো বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বিক্রি করে দিতো আমার জিনিস। আমার সঙ্গে দু'চারটে রসিকতা করতো, খানিকটা গল্প করতো। তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু বিপদ হলো অন্যদিকে। বিক্রির টাকা রোজকার রোজ খরচ হয়ে গেল। আমার ঝোলার জিনিস ফুরিয়ে গেল। যারা জিনিস দিয়েছিলো, তারা দাম পেলো না। ওস্তাদ অনেক কাঁদাকাটি করলো—তবুও আর ধার দিলো না।

'তাদের আপিস থেকে বেরিয়ে সেই দিনই দাঁড়িয়ে আছি ফুটপাথে—ভাবছি ; একজন চেনা ছেলে এসে বললো—কই, দিন ছ'খানা সাবান।

'বললাম—নেই।

'—তাহলে কাল দেবেন।

'—না।

'—কি ব্যাপার ?

'স্পষ্ট খুলে বললাম—জিনিসের টাকা ভেঙে খেয়ে ফেলেছি।

'—সে কি !

'—দেবেন কিছু টাকা ?

'—টাকা ? কতো টাকা ?

'—একশো।

'—এ—ক—শো। মাফ করবেন। চলে গেল সে। আমিও চলতে শুরু করলাম। এই এসপ্ল্যানেডের দিকেই। ঘুরতে লাগলাম কার্জন পার্কের চারদিকে। দু'তিনজনের সঙ্গে দেখা হলো।

'একজন বললো—দেবো। মুখের দিকে চেয়ে বললো—সন্ধ্যের সময় এইখানেই দেখা হবে। পেছনে শিস উঠলো। ঠিক পেছনে পার্কের রেলিংয়ে হেলান দিয়ে বসেছিলো ওস্তাদ। আমার পেছনে-পেছনেই আছে সে। সে শিস দিয়ে উঠলো—স্—সি!

'পিঠ চাপড়ে ওস্তাদ বললো—বাহাদুর মেয়ে।

'মা বললো—আরও কিছু টাকার জন্যে বলনি।

'আমি সমস্ত দিনটা অস্থির হয়ে কাটালাম। যেন জ্বর হয়েছে আমার। বুকের ভেতরে একটা উদ্বেগে কেমন কষ্ট হলো। সন্ধ্যার আগে সাবান মেখে স্নান করতে গিয়ে হঠাৎ সাবান হাতে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। হাত কাঁপতে লাগলো—পাউডারের পাফ তুলে নিয়ে।

'কার্জন পার্কের কোণে দাঁড়ালাম।

'কতজন পাক দিতে শুরু করলো আমার চারদিকে। ওস্তাদ বসে রইলো সামনের ঘাসের ওপর।

'একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো। সে নামলো। বললো—এসো।

'আমি নিঃশব্দে গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলাম। ওস্তাদও এসে সামনে দরজার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে বললো—আমি ওর সঙ্গে এসেছি, স্যর।

'সে আমার মুখের দিকে তাকালো।

'আমি বললাম কি যেন, কি বলেছিলাম মনে নেই। বিড়-বিড় করে কি ছুটো কথা যেন। আমার সর্বাঙ্গ তখন জ্বরে যেন পুড়ে যাচ্ছে। মাথায় বিকার হয়েছে।

'এই মাঠটার কোনো-একটা গাছতলায় সে আমাকে দশখানা নোট হাতে দিলো। বসলাম দু'জনে। সে প্রথম কথা বললো—প্রথমে তোমায় আমি ভালো ভেবেছিলাম। কিন্তু—। অন্ধকারের মধ্যেও বুঝতে পারলাম —সে হাসছে।

'তারপর সে বললো—যাও, তুমি বাড়ি যাও। এ-রকম কাজে বিপদ আছে। বুঝেছো। এই কথা বলবার জন্যেই তোমাকে নিয়ে এসেছি।

'আমায় যেন কে চাবুক মারলো। আমি উঠেই ছুটতে আরম্ভ করলাম, কাপড়ে আগুন লাগলে মানুষ যেমন করে ছুটে বেড়ায়—তেমনিভাবে ছুটে বেড়াচ্ছিলাম। কোনদিক লক্ষ্য করে নয়—চীৎকার করে নয়—শুধু ছুটছিলাম। আমার হাত চেপে ধরলো ওস্তাদ—বললো, সুষি—সুষি—ছিঃ! ছিঃ!

'আমি দু'হাতে নখ দিয়ে তার মুখে আঁচড়ে দিলাম। রক্তাক্ত করে দিলাম মুখখানা। আবার ছুটলাম। ছুটতে গিয়ে পড়ে গেলাম একটা নালার মধ্যে। দু'দিকে গাছের ডাল এসে পড়েছে। অন্ধকার থম-থম্ করছে। দূরে-দূরে জ্বলছে টিম-টিমে গ্যাস-বাতি। পড়ে গেলাম—উপুড় হয়ে। মনে হলো পৃথিবী দুলছে, কিসের একটা ঢেউয়ের ওপর ছোটো একখানা নৌকোর মতো আছড়ে পড়ে দুলছে; কিছুক্ষণ পর মাথা তুললাম! মনে হলো চারদিকটা পাক খাচ্ছে, আলোগুলো ঘুরছে—লাল নীল আলোর বিজ্ঞাপনগুলো পাক খাচ্ছে—জোরে নয়—আস্তে-আস্তে। তারপর এক সময় সব থামলো।

'কে বললো—ওঠো। তুমি পাগল নাকি!

'দেখলাম সেই লোকটি দাঁড়িয়ে। বললো—এ-পথে তুমি এলে কেন?

চলো, এসপ্ল্যানেডে তোমায় পৌঁছে দিই। এ কি, এ যে কাদায় একেবারে মাথা থাকে পা পর্যন্ত ভরে গেছে। লোকের সামনে দাঁড়াবে কি করে?

'আমিও দেখলাম, আমার নিজের দিকে তাকিয়ে। মনে হলো, ভেতরটা বাইরে ফেটে বেরিয়েছে।

'সে বললো—চলো।

'ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়েই ছিলো; ওস্তাদ শুধু এলো না।

'এসপ্ল্যানেডে ফিরিওয়ালাদের কাছে একখানা শাড়ি, একটা সেমিজ কিনে একটা হোটেলে আমায় নিয়ে গেল। বললো—স্নান করে, কাপড় জামা পালটে এসো।

'সেমিজের ওপর কাপড় ফেরতা দিয়ে পরা চলে না। সাধারণ পুরোনো ধাঁচে কাপড় পরে মাথা হেঁট করে বেরিয়ে এলাম। মুখের পাউডার-স্নো ধুয়ে গেছে—আসল চেহারা বেরিয়ে পড়েছে আমার।

'সিনেমার পর্দায় হাড়গিলের মতো সেই ছবি মনে পড়লো।

'সে বসেছিলো ঘরের মধ্যে। একখানা ঘরই সে ভাড়া নিয়েছিলো এক ঘণ্টার জন্যে। আমি বেরিয়ে আসতেই সে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো—বাঃ।

'আমার মাথাটা আরও নুয়ে পড়লো লজ্জায়। সে ঠাট্টা করলো। কিন্তু তবু সে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আমার মুখ তুলে ধরে বললো—বাঃ—কি চমৎকার দেখাচ্ছে তোমায় বলো তো! দেখেছো নিজেকে, আয়নায়? এর ওপর সিঁথিতে যখন চওড়া করে সিঁদুর পরবে, তখন মনে হবে যেন লক্ষ্মী-ঠাকুরুণটি। চলো—এসপ্ল্যানেডে পৌঁছে দিই। বাড়ি চলে যাও। এ-পথে আর এসো না—এমন বিশ্রী—ছি!

'হোটেল থেকে যখন বের হই, তখন একজন তাকে বলেছিলো—আরে, তুমি এখানে? এ-পথে? সত্যিই তুমি?

'সে বলেছিলো—সত্যিই আমি, প্রদ্যোৎ বসু। তোমার দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেনি। অনুমানও তোমার সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নয়, তবে—। যাক সে-কথা—মেয়েটিকে আমার ভালো লেগেছে!

'—বান্ধবী?

'—তাই।

'আমি আড়চোখে তার মুখের দিকে না তাকিয়ে পারিনি? তার ঠোঁটে মাখামাখি করা সে হাসি!

'তাকে খুঁজতেই আমি আসি। একেবারে যে সাজে তার আমাকে ভালো লেগেছিলো—সেই সাজে। সিঁথিতে সিঁদুর সেদিন ছিলো না। এখন সিঁদুর পরছি মোটা করে এধার থেকে ওধার পর্যন্ত। প্রায়ই আমি। মধ্যে মধ্যে হতাশ হই! তখন কয়েকদিন আসি না। আবার মনে জেগে ওঠে আগুন। আবার আসতে আরম্ভ করি।

'ছেলেটা ভাড়া করা। ওই ওস্তাদই ভাড়া করে দিয়েছে। সন্ধ্যেবেলা কি যেন খাইয়ে দেয় দুধের সঙ্গে। ভিখারী মেয়ের ছেলে। মা মরে গেছে। সেও খালাস পেয়েছে—আমিও নিশ্চিন্ত। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে তাকে খুঁজি। ছেলেটা কাঁকে থাকে। একজন দু'জন ভদ্রলোক পেলে, তাদের কাছে ভিক্ষে চাই। গল্প একটা তৈরি আছে। বলি, আমার ছেলে এটা—স্বামী পঙ্গু। দু'একজন বাড়ি পর্যন্ত দেখতে গেছে। কিন্তু তাতেও ঠকেছে। ওস্তাদের কাছেই থাকি। সে গলির মোড়ে লোক সঙ্গে আমাকে দেখলেই বিছানায় শুয়ে কাতরায়। বড়ো ভালো লোক। বলেছে—যদি তার দেখা পাস—কিম্বা যদি ভুলই তুই করিস—তবে তার জন্যে খুঁজি তুই ভাবিস নে। আমি আমার খাওয়া-থাকার দিয়ে যাবো। রেশনকার্ডেও লিখিয়েছে—সে আমার স্বামী। এতেই চলে যাচ্ছে এখন আমাদের। তবে—। চলবে না শেষ পর্যন্ত। অথচ—

'অথচ দেখুন, যে সম্বলের কথা ভাবছি—সে বয়েসের সঙ্গে-সঙ্গে চলে যাচ্ছে! শুধু একবার তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। এখানে তার আসার কথা, আগে সে আসতো! কিন্তু কে জানে—সে বেঁচে আছে কিনা!'

মেয়েটি চুপ করে গেল।

বিমল ওর গল্পে বিশ্বাস করেনি। খানিকটা হয়তো সত্য, কিন্তু কার্জন পার্কের চারিদিকে রাত্রের অন্ধকারের মধ্যে পাপ যখন প্রেত-পুরীর অশরীরীদের মতো আলো-আঁধারির মধ্যে স্বচ্ছন্দ-বিচরণে ঘুরে বেড়ায় তখন একটি কুমারী মেয়ে স্বপ্ন-বিহ্বলার মতো, যে তরুণ তাকে

প্রত্যাখ্যান করে অপমান করেছিলো, তাকে খুঁজে বেড়ায়—এ একেবারে
অসম্ভব বলেই মনে হয়েছে তার।

তবু সে তাকে সেদিন দশটা টাকা দিয়েছিলো।

সে সেদিন তার পায়ের ধুলো নিয়ে হেসে বলেছিলো, 'আবার যেদিন
নেহাত অভাব পড়বে, সেইদিন আপনাকে ধরবো।'

হেসে বলেছিলো, 'যাবেন একদিন আমার বাসায়। দেখে আসবেন
ওস্তাদকে। দেখবেন বিছানায় শুয়ে কেমন পচে যাচ্ছে।'

বিমল এসপ্ল্যানেডে গিয়ে সাবধানে ঘুরতে লাগলো এর পর।

সে কিন্তু ঘোরে। কাঁকে ছেলে নিয়ে একটু কাত হয়ে পদক্ষেপে
ক্লান্তি এবং কাতরতা ফুটিয়ে ঘোরে। আজ ঘোরে, কাল ঘোরে, রোজ
ঘোরে—কার্জন পার্কের পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্তে চলে যায়, গাছের
তলার অন্ধকারে মিশে যায়, আবার আলোর নিচে ফুটে ওঠে, আবার ডুবে
যায় অন্ধকারে—একটু কাত হয়ে ক্লান্ত পদক্ষেপে—ওই চলে গেল পশ্চিম-
দক্ষিণ প্রান্তে। চমৎকার একটি মিথ্যাবাদিনী।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পদ্ম-গোখরো

কাজী নজরুল ইসলাম

রসুলপুরের মীর সাহেবদের অবস্থা দেখিতে-দেখিতে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিলো। লোকে কানা-ঘুষা করিতে লাগিলো, তাহারা জীনের বা যক্ষের ধন পাইয়াছে। নতুবা এই দুই বৎসরের মধ্যে আলাদীনের প্রদীপ ব্যতীত কেহ এরূপ বিত্ত সঞ্চয় করিতে পারে না।

দশ বৎসর পূর্বেও মীর সাহেবদের অবস্থা দেশের কোনো জমিদারের অপেক্ষা হীন ছিলো না সত্য, কিন্তু সে জমিদারি কয়েক বৎসরের মধ্যেই 'ছিলো ঢেঁকি হলো তুল, কাট্‌তে-কাট্‌তে নির্মূল' অবস্থায় আসিয়া ঠেকিয়াছিলো।

মুর্শিদাবাদের নওয়াবের সহিত টেক্কা দিয়া বিলাসিতা করিতে গিয়াই নাকি তাঁদের এই দুরবস্থার সূত্রপাত।

লোকে বলে, তাঁহারা খড়মে পর্যন্ত সোনার ঘুঙুর লাগাইতেন। বর্তমান মীর সাহেবের পিতামহ নাকি স্নানের পূর্বে তেল মাখাইয়া দিবার জন্য এক গ্রোস সুন্দরী যুবতী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন!

তাঁহার মৃত্যুর সাথে-সাথে স্বর্ণ-লঙ্কা দগ্ধ-লঙ্কায় পরিণত হইলো। এমন কি তাঁহার পুত্রকে গ্রামেই একটা ক্ষুদ্র মক্তব চালাইয়া অর্ধ-অনশনে দিনাতিপাত করিতে হইয়াছে।

এমন পিতামহের পৌত্রের নিশ্চয়ই কোনো খানদানী জমিদার বংশে বিবাহ হইলো না। তবে যে বাড়ির মেয়ের সহিত বিবাহ হইলো, সে বাড়ির বংশ-মর্যাদা মীর সাহেবদের অপেক্ষা কম তো নয়ই, বরং অনেক বেশি।

বিলাসী মীর সাহেবের পৌত্রের নাম আরিফ। বধূর নাম জোহরা।

জোহরার রূপের খ্যাতি চারিপাশের গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিলো। কিন্তু অতো রূপ, অমন বংশ-মর্যাদা সত্ত্বেও দরিদ্র সৈয়দ সাহেবের কন্যাকে গ্রহণ করিতে কোনো নওয়াব-পুত্রের কোনো উৎসাহই দেখা গেল না।

মেয়ে গোঁজে বাঁধা থাকিয়া বুড়ি হইবে—ইহাও পিতামাতা সহ্য করিতে পারিলেন না। কাজেই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বর্তমান দরিদ্র মক্তব শিক্ষক মীর সাহেবের পুত্র আরিফের হাতেই তাহাকে সমর্পণ করিয়া বাঁচিলেন।

মীর সাহেবদের আর সমস্ত ঐশ্বর্য উবিয়া গেলেও রূপের ঐশ্বর্য আজও এতটুকু ম্লান হয় নাই। এবং এ রূপের জ্যোতি কুতুবপুরের সৈয়দ সাহেবদের রূপ খ্যাতিকেও লজ্জা দিয়া আসিয়াছে।

কাজেই আরিফ ও জোহরা যখন বর-বধূ বেশে পাশাপাশি দাঁড়াইলো, তখন সকলেরই চক্ষু জুড়াইয়া গেল। যেন চাঁদে-চাঁদে প্রতিযোগিতা।

পিতার মন খুঁৎ-খুঁৎ করিলেও জোহরার মাতার মন জামাতা ও কন্যার আনন্দোজ্জ্বল মুখ দেখিয়া গভীর প্রশান্তিতে পুরিয়া উঠিলো। আনন্দে প্রেমে আবেশে শুভ-দৃষ্টির সময় ডাগর চক্ষু ডাগরতর হইলো।

আরিফের মাতা কিছুদিন হইতে চির-রুগ্না হইয়া শয্যাশায়িনী ছিলেন। বধূমাতা আসিবার পর হইতেই তিনি সারিয়া উঠিতে লাগিলেন। আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, 'বৌমার পয়েই আমি সেরে উঠলাম, আমার ঘর আবার সোনা-দানায় ভরে উঠবে।'

গ্রামময় এই কথা পল্লবিত হইয়া প্রচার হইয়া পড়িলো যে, মীর সাহেবদের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

মানুষের 'পয়' বলিয়া কোনো জিনিস আছে কিনা জানি না, কিন্তু জোহরার মীর-বাড়িতে পদার্পণের পর হইতেই মীর সাহেবদের অবস্থা অভাবনীয়রূপে ভালো হইতে অধিকতর ভালোর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলো।

গ্রামে প্রথমে রাষ্ট্র হইলো, মীর সাহেবদের নববধূ আসিয়াই তাহাদের পূর্বপুরুষের প্রোথিত ধন-রত্নের সন্ধান করিয়া উদ্ধার করিয়াছে, তাহাতেই মীর-বাড়ির এই অপূর্ব পরিবর্তন।

গুজবটা একেবারে মিথ্যা নয়। জোহরা একদিন তাহার শ্বশুরালয়ের জীর্ণ প্রাসাদের একটা দেয়ালে একটা অস্বাভাবিক ফাটল দেখিয়া কৌতূহলবশেই সেটা পরীক্ষা করিতেছিলো। হয়তো বা তাহার মন গুপ্ত ধন-রত্নের সন্ধানী হইয়াই এ কার্যে ব্রতী হইয়াছিলো। তাহার কী মনে হইলো, সে একটা লাঠি দিয়া ফাটলে খোঁচা দিলো। সঙ্গে-সঙ্গে ভিতর হইতে ক্রুদ্ধ সর্পের গর্জনের মতো একটা শব্দ আসিতে সে ভয়ে পলাইয়া আসিয়া স্বামীকে খবর দিলো।

বলা বাহুল্য, আরিফ নববধূকে অতিরিক্ত ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছিলো। শুধু আরিফ নয়, শ্বশুর-শাশুড়ী পর্যন্ত জোহরাকে অত্যন্ত সুনজরে দেখিয়াছিলেন।

জোহরার এই হঠকারিতায় আরিফ তাহাকে প্রথমে বকিলো, তাহার পর সেইখানে গিয়া দেখিলো সত্য সত্যই ফাটলের ভিতর হইতে সর্প-গর্জন শ্রুত হইতেছে। সে তাহার পিতাকে বাহির হইতে ডাকিয়া আনিলো।

পুত্র অপেক্ষা পিতা একটু বেশি দুঃসাহসী ছিলেন। তিনি বলিলেন, 'ও সাপটাকে মারতেই হবে, নইলে কখন্ বেরিয়ে কাউকে কামড়িয়ে বসবে। ওর গর্জন শুনে মনে হচ্ছে, ও নিশ্চয়ই জাত সাপ!' বলিয়াই বধূমাতাকে মৃদু তিরস্কার করিলেন।

স্থানটা জঙ্গলাকীর্ণ হইয়াছিলো। অতি সন্তর্পণে তাহার খানিকটা পরিষ্কার করিয়া বার-কয়েক খোঁচা দিতেই একটা বৃহৎ দুগ্ধ-ধবল গোখ্‌রো সাপ বাহির হইয়া আসিলো, মস্তকে তাহার সিন্দুর বর্ণ চক্র বা খড়মের চিহ্ন। আরিফ সাপটাকে মারিতে উদ্যত হইতেই পিতা বলিয়া উঠিলেন, 'মারিস্‌নে মারিস্‌নে, ও বাস্তু-সাপ। দেখছিস নে, ও যে পদ্ম-গোখ্‌রো।'

আরিফের উদ্যত যষ্টি হাতেই রহিয়া গেল। জঙ্গলের মধ্যে পদ্ম-গোখ্‌রোরূপী বাস্তু সাপ অদৃশ্য হইয়া গেল।

সকলে চলিয়া আসিতেছিলো। জোহরা আরিফকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলো, 'তোমরা যখন সাপটাকে খোঁচাচ্ছিলে, তখন কেমন এক-রকম শব্দ হচ্ছিলো। ওখানে নিশ্চয়ই কাঁসা বা পেতলের কোনো কিছু আছে।'

আরিফের চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিলো। সে আসিয়া তাহার

পিতাকে বলিতে তিনি প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, 'কই রে, সে রকম কোনো শব্দ তো শুনি নি।'

আরিফ বলিলো, 'আমরা তো সাপের ভয়েই অস্থির, কাজেই শব্দটা হয়তো শুনতে পাইনি।'

পিতা-পুত্রে সন্তর্পণে দেয়ালের কয়েকটি ইট সরাইতেই দেখিতে পাইলেন, সত্যই—ভিতরে কি চক্‌চক্‌ করিতেছে।

পিতা-পুত্রে তখন পরম উৎসাহে দুই-ঘন্টা পরিশ্রমের পর যাহা উদ্ধার করিলেন, তাহাকে যক্ষের ধন বলা চলে না, কিন্তু তাহা সামান্যও নয়। বিশেষ করিয়া তাহাদের বর্তমান অবস্থায়।

একটি নাতিবৃহৎ পিতলের কলসী বাদশাহী আশরফীতে পূর্ণ। কিন্তু এই কলসী উদ্ধার করিতে তাহাদের জীবন প্রায় বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলো।

কলসী উদ্ধার করিতে গিয়া আরিফ দেখিলো, সেই কলসীর কণ্ঠ জড়াইয়া আর একটা পদ্ম-গোখরো। আরিফ ভয়ে দশ হাত পিছাইয়া গিয়া বলিয়া উঠিলো, 'ওরে বাপরে! সাপটা আবার এসেছে ঐখানে।'

জোহরা অনুচ্চ কণ্ঠে বলিলো, 'না, ওটা আর একটা। ওটারই জোড়া হবে বোধহয় সেটা। প্রথমটা ওই দিকে চলে গেছে, আমি দেখেছি।'

কিন্তু এ সাপটা প্রথমেরটিই হোক বা অন্য একটা হোক, কিছুতেই কলসী ছাড়িয়া যাইতে চাহে না। অথচ পদ্ম-গোখ্‌রো মারিতেও নাই।

কলসীর কণ্ঠ জড়াইয়া থাকিয়াই পদ্ম-গোখ্‌রো তখন মাঝে-মাঝে ফণা বিস্তার করিয়া ভীতি প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

জোহরার মাথায় কি খেয়াল চাপিলো, সে তাড়াতাড়ি একবাটী দুধ আনিয়া নির্ভয়ে কলসীর একটু দূরে রাখিতেই সাপটা কলসী ত্যাগ করিয়া শান্তভাবে দুগ্ধ পান করিতে লাগিলো। জোহরা সেই অবসরে পিতলের কলসী তুলিয়া লইলো। সাপটা অনায়াসে তাহার হাতে ছোবল মারিতে পারিতো, কিন্তু সে আর কিছু করিলো না। এক-মনে দুগ্ধ পান করিতে করিতে ঝিঁঝিঁ পোকার মতো এক প্রকার শব্দ করিতে লাগিলো। একটু পরেই আর একটি পদ্ম-গোখ্‌রো সেখানে আসিয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে লাগিলো।

জোহরা বলিয়া উঠিলো, 'ওই, আগের সাপটা! এখনো গায়ে খোঁচার দাগ রয়েছে! আহা, দেখেছো কী-রকম নীল হয়ে গেছে!'

আরিফ ও তাহার পিতা-মাতা বিস্ময়ে জোহরার কীর্তি দেখিতেছিলেন। ভয়ে বিস্ময়ে তাহাদেরও মনে ছিলো না যে, তাহাকে এখনি সাপে কামড়াইতে পারে! এইবার তাহারা জোর করিয়া জোহরাকে টানিয়া সরাইয়া আনিলো।

কলসীতে সোনার মোহর দেখিয়া আনন্দে তাহারা জোহরাকে লইয়া যে কি করিবে, কোথায় রাখিবে—ভাবিয়া পাইলো না।

শ্বশুর-শাশুড়ী অশ্রুশিক্ত চোখে বারে বারে বলিতে লাগিলেন, 'সত্যিই মা, তোর সাথে মীর-বাড়ির লক্ষ্মী আবার ফিরে এলো।'

কিন্তু এ সংবাদ এই চারিটি প্রাণী ছাড়া গ্রামের আর কেহ জানিতে পারিলো না। সেই মোহর গোপনে কলিকাতায় গালাইয়া বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া গেল, তাহাতে বর্তমান ক্ষুদ্র মীর-পরিবারের সহজ জীবন-যাপন স্বচ্ছন্দে চলিতে পারিতো। কিন্তু বধূর 'পয়' দেখিয়াই বোধহয়—আরিফ তাহারই কিছু টাকা লইয়া কলিকাতায় আসিয়া কয়লার ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিলো। ব্যবসায় আশার অতিরিক্ত লাভ হইতে লাগিলো।

বৎসর-দুইয়ের মধ্যে মীর-বাড়ির পুরাতন প্রাসাদের পরিপূর্ণরূপে সংস্কার হইলো। বাড়ি-ঘর আবার চাকর-দাসীতে ভরিয়া উঠিলো।

পরে কর্পোরেশনের কনট্রাক্টরী হস্তগত করিয়া আরিফ বিপুল অর্থ উপার্জন করিতে লাগিলো।

কোনো-কিছুরই অভাব থাকিলো না, কিন্তু জোহরাকে লইয়া তাহারা অত্যন্ত বিপদে পড়িলো।

এই অর্থপ্রাপ্তির পর হইতেই জোহরা যেমন পদ্ম-গোখ্‌রো-যুগলের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ-প্রবণ হইয়া উঠিলো, সাপ দুইটিও জোহরার তেমনি অনুরাগী হইয়া পড়িলো। অথবা হয়তো দুধ-কলার লোভেই তাহারা পিছু পিছু ফিরিতে লাগিলো।

জোহরার শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামী পাপের ভয়ে যেন প্রাণ হাতে করিয়া সর্বদা মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। বাস্তু সর্প—মারিতেও পারেন না, পাছে আবার এই দৈব-অর্জিত অর্থ সহসা উবিয়া যায়।

অবশ্য সর্প-যুগল যেরূপ শান্ত ধীরভাবে বাড়ির সর্বত্র চলা-ফেরা করিতে লাগিলো, তাহাতে ভয়ের কিছু ছিলো না। তবু জাতি সর্প তো! একবার ক্রুদ্ধ হইয়া ছোবল মারিলেই মৃত্যু যে অবধারিত।

পিতৃ-পিতামহের ভিটা ত্যাগ করিয়া যাওয়াও একপ্রকার অসম্ভব! তাহারা কি যে করিবে ভাবিয়া পাইলো না।

জোহরা হয়তো রান্না করিতেছে, হঠাৎ দেখা গেল সর্প-যুগল তাহার পায়ের কাছে আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। শাশুড়ী চীৎকার করিয়া উঠেন। বধূ তাহাদের তিরস্কার করিতেই তাহারা আবার নিঃশব্দে সরিয়া যায়।

বধূ, শাশুড়ী খাইতে বসিয়াছে, হঠাৎ বাস্তু সর্পদ্বয় আসিয়াই বধূর ডালের বাটিতে চুমুক দিলো! দুগ্ধ নয় দেখিয়া ক্রুদ্ধ গর্জন করিয়া উঠিতেই বধূ আসিয়া অপেক্ষা করিতে বলিতেই তাহারা ফণা নামাইয়া শুইয়া পড়ে, বধূ দুগ্ধ আনিয়া দেয়, খাইয়া তাহারা কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়।

ভয়ে শাশুড়ীর পেটের ভাত চাল হইয়া যায়।

ইহাও সহ্য হইয়াছিলো, কিন্তু সাপ দুইটি এইবার যে উৎপাত আরম্ভ করিলো তাহাতে জোহরার স্বামী বাড়ি ছাড়িয়া কলিকাতা পলাইয়া বাঁচিলো।

গভীর রাত্রে কাহার হিম-স্পর্শে আরিফের ঘুম ভাঙিয়া যায়। উঠিয়া দেখে, তাহারই শয্যাপার্শ্বে পদ্ম-গোখ্‌রোদ্বয় তাহার বধূর বক্ষে আশ্রয় খুঁজিতেছে। সে চীৎকার করিয়া পলাইয়া আসিয়া বাহির-বাটিতে শয়ন করে। জোহরা তিরস্কার করিলে তাহারা ফিরিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু আবার কিছুক্ষণ পরে ভীত-সন্তানের মতো তাহারা ফিরিয়া আসিয়া তাহার পায়ে লুটাইয়া-লুটাইয়া যেন কি মিনতি জানায়।

জোহরার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠে! আর তিরস্কার করিতে পারে না। বেদেনীদের মতো নির্বিকার নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাদের আদর করে, পার্শ্বে ঘুমাইতে দেয়।

জোহরার বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে তাহার দুইটি যমজ সন্তান হইয়াই আঁতুড়ে মারা যায়। জোহরার স্মৃতি-পটে সেই শিশুদের ছবি জাগিয়া উঠে। তাহার ক্ষুধাতুর মাতৃ-চিত্ত মনে করে, তাহার সেই দুরন্ত শিশু-যুগলই যেন অন্য রূপ ধরিয়া তাহাকে ছলনা করিতে আসিয়াছে! তাহাদের মৃত্যুতে যে দংশন-জ্বালা সহ্য করিয়া সে আজও বাঁচিয়া আছে, ইহারা যদি দংশনই করে তবুও তাহার অপেক্ষা ইহাদের দংশন-জ্বালা বুঝি তীব্র নয়। স্নেহ-বুভুক্ষু তরুণী মাতার সমস্ত হৃদয়-মন করুণায় স্নেহে আপ্লুত হইয়া উঠে, ভয়-ডর কোথায় চলিয়া যায়, আবিষ্টের মতো সে ঐ সর্প-শিশুদের লইয়া আদর করে, ঘুম পাড়ায়, সস্নেহে তিরস্কার করে।

স্বামী অসহায় ক্রোধে ফুলিতে থাকে, কিন্তু কোনো উপায়ও নাই। তাহার ও তাহার প্রাণের অধিক প্রিয় বধূর মধ্যে এই উদ্যত-ফণা ব্যবধান লঙ্ঘন করিতে পারে না। নিষ্ফল আক্রোশে অন্তরে-অন্তরে পুড়িয়া মরে।

পয়মন্ত বধূ—তাহার উপরে রাগও করিতে পারে না! রাগ করিয়াই বা করিবে কি, তাহার তো কোনো অপরাধ নাই।

একদিন সে ক্রোধবশে বলিয়াছিলো, 'জোহরা, তোমাকে ছেড়ে চাই না এই ঐশ্বর্য! মেরে ফেলি ও দুটোকে! এর চেয়ে আমার দারিদ্র্য ঢের বেশি শান্তিময় ছিলো।'

জোহরা দুই চক্ষুতে অশ্রু-ভরা আবেদন লইয়া নিষেধ করে! বলে, 'ওরা আমার ছেলে! ওরা তো কোনো ক্ষতি করে না। কাউকে কামড়াতে জানে না তো ওরা!'

আরিফ ক্রুদ্ধ হইয়া বলে, 'তোমায় দংশন করে না ওরা, কিন্তু ওদের বিষের জ্বালায় আমি পুড়ে মলুম! আমার কি ক্ষতি যে ওরা করেছে, তা তুমি বুঝবে না! এর চেয়ে যদি ওরা সত্যি-সত্যিই দংশন করতো, তাও আমার পক্ষে এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে ঢের বেশি সুখের হতো!'

জোহরা উত্তর দেয় না, নীরবে অশ্রু মোচন করে। ইহারা যে তাহারই মৃত খোকাদের অন্যরূপী অবির্ভাব বলিয়া সে মনে করে, তাহাও সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না, সংস্কারে বাধে।

পিতা-পুত্র ও মাতা শেষে স্থির করিলেন, জোহরাকে কিছুদিনের

জন্য তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হোক। হয়তো সেখানে গিয়া সে ইহাদের ভুলিয়া যাইবে। এবং সর্প-যুগলও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া অন্য কোথাও চলিয়া যাইবে!

একদিন প্রত্যুষে সহসা আরিফের পিতা জোহরাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'মা, বহুদিন বাপের বাড়ি যাওনি, তোমার বাবাকে দু'তিনবার ফিরিয়ে দিয়ে অন্যায় করেছি, আজ আরিফ নিয়ে যাবে, তুমি কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে এসো!'

জোহরা সব বুঝিলো, বুঝিয়াও প্রতিবাদ করিলো না। নীরবে অশ্রু মোচন করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় কিন্তু সাপ দুইটিকে কোথাও দেখিতে পাইলো না।

আরিফ বধূকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া ব্যবসা দেখিতে কলিকাতা চলিয়া গেল।

জোহরার পিতা-মাতা কন্যার নিরাভরণ রূপই দেখিয়া আসিয়াছেন, আজ সে যখন সালঙ্কারা বেশে স্বর্ণকান্তি স্বর্ণভূষণে ঢাকিয়া গৃহে পদার্পণ করিলো, দরিদ্র পিতা-মাতা তখন যেন নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কন্যা-জামাতাকে কোথায় রাখিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

দু'একদিন যাইতে না যাইতে পিতা-মাতা দেখিলেন, কন্যার মুখের হাসি শুকাইয়া গিয়াছে। সে সর্বদা যেন কাহার চিন্তা করে। সকল কথায় কাজে তাহার অন্যমনস্কতা ধরা পড়ে।

মাতা একদিন কন্যাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁরে, আরিফকে চিঠি লিখবো আসতে?'

কন্যা লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিলো, 'না মা, উনি তো শনিবারেই আস্‌বেন!'

জামাই আসিলো, কিন্তু তবু কন্যার চোখে-মুখে পূর্বের মতো সে দীপ্তি দেখা গেল না।

মাতা কন্যাকে বলিলেন, 'সত্যি বলতো জোহরা, তোর কি জামাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?'

জোহরা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলো, 'না মা! উনি তো আগের মতই

আমায় ভালোবাসেন! বাড়িতে আমার দু'টি খোকাকে ফেলে এসেছি, তাই মন কেমন করে।'

জোহরার মাতা আরিফের এই হঠাৎ অর্থ-প্রাপ্তির রহস্য কিছু জানিতেন না। কন্যার যমজ সন্তান হইয়া মারা গিয়াছে এবং ঐ বাড়ির প্রথা-মতো সেই সন্তান দু'টিকে বাড়িরই সম্মুখের মাঠে গোর দেওয়া হইয়াছে জানিতেন। মনে করিলেন, কন্যা তাহাদেরই স্মরণ করিয়া এ-কথা বলিলো। গোপনে অশ্রু মুছিয়া তিনি কার্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

দেখিতে-দেখিতে ছয় মাস চলিয়া গেল। জোহরাকে লইয়া যাইবার কথা কেহ বলে না। জোহরার পিতা-মাতা অপেক্ষাও জোহরা বেশি ক্রুদ্ধ হইলো। কি তাহার অপরাধ খুঁজিয়া পাইলো না। স্বামী প্রতি শনিবারে আসে, কিন্তু অভিমান করিয়াই সে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করে না।

মাতা কিন্তু থাকিতে পারিলেন না। একদিন জামাতাকে বলিলেন, 'বাবা! জোহরা তো এক-রকম খাওয়া-দাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে! ওর কি কোনো রোগ-বেরামই হলো, তাও তো বুঝতে পারছিনে—দিন-দিন শুকিয়ে মেয়ে যে কাঠ হয়ে যাচ্ছে!'

আরিফের অন্তর কাঁপিয়া উঠিলো। বিষাক্ত সাপকে যে মানুষ এমন করিয়া ভালোবাসিতে পারে, ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে ভাবিতে লাগিলো, জোহরা কি উন্মাদিনী? হঠাৎ তাহার মনে হইলো, জোহরার মাতামহ বিখ্যাত সর্প-তত্ত্ববিদ ছিলেন। ইহার মাঝে হয়তো সেই সাধনাই পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে!

ইহার মধ্যে সে বহুবার রসুলপুর গিয়াছে, কিন্তু সাপ দু'টিকে জোহরা চলিয়া যাইবার পর দুই-একদিন ছাড়া আর দেখিতে পায় নাই। কিন্তু সেই দুই-একদিনই তাহারা কি উৎপাতই না করিয়াছে! তাহা দেখিয়া বাড়ির কাহারও বুঝিতে কষ্ট হয় নাই যে, উহারা জোহরাকেই খুঁজিয়া ফিরিতেছে।

উদ্যত-ফণা আশী-বিষ! তবু সে কি তাহাদের কাতরতা, মিনতি! একবার আরিফ, একবার তাহার পিতা—একবার তাহার মাতার পায়ে লুটাইয়া পড়িতে চায়, আর তাহারা প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলায়!

আরিফ এ-কথা বধূর কাছে প্রকাশ করে নাই, জোহরাও অভিমানভরে তাহাদের কোনো কথাই জিজ্ঞাসা করে নাই।

জামাতা কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্য কোনরূপ উৎসুক প্রকাশ করিতেছেন না দেখিয়া জোহরার পিতা একদিন আরিফকে বলিলেন, 'বাবা, জানো তো আমরা কতো গরীব! মেয়ে তো শয্যা নিয়েছে! দেশে যা দুর্দিন পড়েছে, তাতে আমরা খেতেই পাচ্ছিনে, মেয়ের চিকিৎসা তো দূরের কথা! মেয়েটা এখানে থেকে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে, তার চেয়ে তুমি কিছুদিনের জন্যে ওকে কলকাতায় বা বাড়িতে নিয়ে যাও। তারপর ভালো হলে আবার রেখে যেয়ো!' বলিতে-বলিতে চক্ষু সজল হইয়া উঠিলো তাহার।

স্থির হইলো, আগামীকল্য সে প্রথমে জোহরাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবে, সেখানে ডাক্তার দেখাইয়া একটু সুস্থ হইলে তাহাকে রসুলপুরে লইয়া যাইবে।

রাত্রে আরিফের কিসের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে চক্ষু মেলিতেই দেখিলো, তাহার শিয়রে একজন কে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দাঁড়াইয়া এবং পার্শ্বের কামরায় আর একজন লোক—বোধহয় স্ত্রীলোক, জোহরার বাক্স ভাঙিয়া তাহার অলঙ্কার অপহরণ করিতেছে। ভয়ে সে মৃতবৎ পড়িয়া রহিলো; তাহার চীৎকার করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত কে যেন অপহরণ করিয়া লইয়াছে!

কিন্তু ভয় পাইলেও তাহার মনে কেমন সন্দেহ হইলো। স্ত্রীলোক ডাকাত! সে ঈষৎ চক্ষু খুলিয়া তাহাকে চিনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলো। কিন্তু বাহিরে এমন ভান করিয়া পড়িয়া থাকিলো, যেন সে অঘোরে ঘুমাইতেছে।

যে ঘরে সে এবং জোহরা শয়ন করিয়াছিলো তাহার পার্শ্বেই আর একটি কামরা—স্বল্পায়তন। সেই কামরায় একটি স্টীলের ট্রাঙ্কে জোহরার গহনাপত্র থাকিতো। প্রায় বিশ হাজার টাকার গহনা।

জোহরা বহু অনুনয় করিয়া আরিফকে ঐ গহনাপত্র রসুলপুরে রাখিয়া আসিবার জন্য বহুবার বলিয়াছে, আরিফ সে কথায় কর্ণপাত করে নাই। সে বলিতো, 'তোমার কপালেই আজ আমাদের ঐ অর্থ অলঙ্কার, ও ক'টা টাকার অলঙ্কার যদি চুরি যায় যাক্, তোমাকে তো চুরি করতে পারবে না। ও তোমার জিনিস, তোমার কাছেই থাক্! আর তাছাড়া তোমার বাবা এ অঞ্চলের পীর, ওঁর ঘরে কেউ চুরি করতে সাহস করবে না।'

আরিফ নিজের চক্ষুকে নিজে বিশ্বাস করিতে পারিলো না, যখন দেখিলো ঐ মেয়ে-ডাকাত আর কেহ নয়, সে তাহার শাশুড়ী—জোহরার মাতা!

দু'দিন আগে ঝড়ে ঘরের কতকগুলি খড় উড়িয়া গিয়াছিলো এবং সেই অবকাশ পথে শুক্লা দ্বাদশীর চন্দ্র-কিরণ ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিলো। শাশুড়ী সমস্ত অলঙ্কারগুলি পোঁটলায় বাঁধিয়া চলিয়া আসিবার জন্য মুখ ফিরাইতেই তাহার মুখে চন্দ্রের কিরণ পড়িলো এবং সেই আলোকে আরিফ যাহার মুখ দেখিলো, তাহাকে সে মাতার অপেক্ষাও ভক্তি করে! তাহার মুখে চোখে মনে অমাবস্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলো।

এতো কুৎসিত এ পৃথিবী!

সে আর উচ্চবাচ্য করিলো না। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিলো। সে দেখিলো, তাহার শাশুড়ীর পিছু-পিছু তরবারিধারী ডাকাতও বাহির হইয়া গেল। তাহারা উঠানে আসিয়া নামিতেই সে উঠিয়া বাতায়ন-পথে দেখিতে পাইলো, ঐ ডাকাতও আর কেহ নয়—তাহারই শ্বশুর।

আরিফ জানিতো, কিছুদিন ধরিয়া তাহার শ্বশুরের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছিলো। দেশেও প্রায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। মাঝে-মাঝে তাহার শ্বশুর ঘটি-বাটি বাঁধা দিয়া অন্নের সংস্থান করিতেছিলেন, ইহারও সে আভাস পাইয়াছিলো। ইহা বুঝিয়াই সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অর্থ সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলো, কিন্তু তাহার শ্বশুর তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। জোহরার হাতে দিয়াও সে দেখিয়াছে, তাঁহারা জামাতার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য লইতে নারাজ।

হীনস্বাস্থ্য জোহরা অঘোরে ঘুমাইতেছিলো, আরিফ তাহাকে জাগাইলো না। ভয়ে, ঘৃণায়, ক্রোধে তাহার আর ঘুম হইলো না।

সকালের দিকে একটু ঘুমাইতেই কাহার ক্রন্দনে সে জাগিয়া উঠিলো। তাহার শাশুড়ী তখন চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে, চোরে তাহাদের সর্বনাশ করিয়াছে!

জোহরাও তাড়াতাড়ি জাগিয়া উঠিয়া, বিস্ময়বিমূঢ়ার মতো চাহিয়া রহিলো।

আরিফের আর সহ্য হইলো না। দিনের আলোকের সাথে-সাথে তাহার ভয়ও কাটিয়া গিয়াছিলো।

সে বাহিরে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলো, 'আর কাঁদবেন না মা, ও অলঙ্কার কারা যে চুরি করেছে তা আমি জানি, ইচ্ছা করলে এখনি তাদের ধরিয়ে দিতে পারি।'

বলা বাহুল্য, এক মুহূর্তে শাশুড়ীর ক্রন্দন থামিয়া গেল! শ্বশুর-শাশুড়ী দুইজনে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলো।

আরিফ বাহিরে চলিয়া যাইতেছিলো, হঠাৎ তাহার শ্বশুর জামাতার হাত ধরিয়া বলিলো, 'কে বাবা, সে চোর? দেখেছো? সত্যিই দেখেছো তাকে?'

আরিফ অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলো, 'হ্যাঁ, দেখেছি! কলিকাল কিনা, তাই সব-কিছু উল্টে গেছে! যার চুরি গেছে, তারিই চোরের হাত চেপে ধরার কথা, এখন কিন্তু চোরই যার চুরি গেছে তার হাত চেপে ধরে!'

শ্বশুর যেন আহত হইয়া হাত ছাড়িয়া দিলো।

আরিফ জোহরাকে ডাকিয়া রাত্রির সমস্ত ব্যাপার বলিলো এবং ইঙ্গিতে ইহাও জানাইলো যে, হয়তো এ ব্যাপারে তাহারও হাত আছে!

জোহরা মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল! তাহার মূর্ছা ভাঙিবার পর আরিফ বলিলো, সে এখনি এ বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে! এ নরক-পুরীতে সে আর এক মুহূর্তও থাকিবে না।

শ্বশুর-শাশুড়ী যেন পাথর হইয়া গিয়াছিলো; এমন কি জোহরার মূর্ছাও আরিফই ভাঙাইলো, পিতা-মাতা কেহ আসিয়া সাহায্য করিলো না।

আরিফ চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই জোহরা তাহার পায়ে লুটাইয়া বলিলো, 'আমাকে নিয়ে যাও, আমাকে এখানে রেখে যেয়ো না। খোদা জানেন, এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, আমি কোনো অপরাধ করিনি।'

আরিফ জোহরার কন্নাকাটিতে রাজী হইলো তাহাকে কলিকাতা লইয়া যাইতে। এবং স্বামীর নির্দেশ মতো জোহরা পিতা-মাতাকে আর কিছু প্রশ্ন করিলো না।

চলিয়া যাইবার সময় জোহরার পিতা-মাতা ছুটিয়া আসিয়া কন্যা-জামাতার হাত ধরিয়া কান্নাকটি করিতে লাগিলো, তাহারা বাসি-মুখে বাড়ি ছাড়িয়া যাইতে পারে না। অন্ততঃ সামান্য কিছু খাইয়া তবে তাহারা যেন যায়!

আরিফ হাঁপাইয়া উঠিতেছিলো, এ-বাড়ির বায়ুতেও যেন কিসের পূতিগন্ধ! তবু সে খাইয়া যাইতে রাজী হইলো, সে আজ দেখিবে—মানুষের ভণ্ডামির সীমা কতদূর!

জোহরা যতো জিদ্ করিতে লাগিলো, সে এ-বাড়িতে আর জল-স্পর্শও করিবে না, আরিফ ততই জিদ্ ধরিলো, না, সে খাইয়াই যাইবে!

জোহরা তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলো, সে কিছু খাইলো না। আরিফ কিন্তু খাইবার মিনিট কয়েকের মধ্যেই বমি করিতে লাগিলো।

জোহরা আবার মূর্ছিতা হইয়া পড়িলো! সে মূর্ছার পূর্বে মায়ের দিকে তাকাইয়া একটি কথা বলিয়াছিলো—'রাক্ষুসী!'

আরিফের বুঝিতে বাকী রহিলো না, সে কি খাইয়াছে!

কিন্তু এখানে থাকিয়া মরিলে চলিবে না। এই মৃত্যুর ইতিহাস সে তাহার পিতা-মাতাকে বলিয়া যাইবে। সে উর্ধ্বশ্বাসে স্টেশন অভিমুখে ছুটিলো।

স্টেশনে পৌঁছিয়াই সে ভীষণ রক্ত-বমন করিতে লাগিলো। রক্ত বমন করিতে করিতেই সে প্রায় চলন্ত ট্রেনে গিয়া উঠিয়া পড়িলো।

ট্রেন তখন ছাড়িয়া দিয়াছে। স্টেশন-মাষ্টার চীৎকার করিতে করিতে সে তখন ট্রেনে গিয়া উঠিয়া বসিয়াছে।

কামরা হইতে একজন সাহেবী পোশাক-পরা বাঙালী চেঁচাইয়া উঠিলেন, 'এটা ফার্স্ট ক্লাস, নেমে যাও, নেমে যাও!'

আরিফ কোনো কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই আবার রক্ত বমন করিতে লাগিলো।

দৈবক্রমে যে বাঙালী সাহেবটি ট্রেনে যাইতেছিলেন, তিনি কলিকাতার একজন বিখ্যাত ডাক্তার।

আরিফ অস্ফুটস্বরে একবার মাত্র বলিলো, 'আমায় বিষ খাইয়েছে, আমার—'

বলিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। ডাক্তার-সাহেব মফস্বলের এক বড়ো জমিদার বাড়ির 'কলে' গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গেই ঔষধপত্রের বাক্স ছিলো। তিনি তাড়াতাড়ি 'সার্ভেন্ট-কামরা' হইতে চাকরকে ডাকিয়া তাহার সাহায্যে আরিফকে ভালো করিয়া শোয়াইয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া ইঞ্জেক্শন্ দিতেই রোগীকে অনেকটা সুস্থ মনে হইতে লাগিলো। বমি বন্ধ হইয়া গেল।

ইচ্ছা করিয়াই ডাক্তার-সাহেব গাড়ি থামান নাই। কারণ, গাড়ি কলিকাতায় পৌঁছিতে দেরি হইলে হয়তো এ হতভাগ্যকে আর বাঁচানো যাইবে না।

ট্রেন কলিকাতায় পৌঁছিলে, ডাক্তার সাহেব এ্যাম্বুলেন্সে করিয়া আরিফকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন।

জোহরা সত্য-সত্যই পয়মন্ত, আরিফ মৃত্যুর সহিত মুখোমুখি আলাপ করিয়া ফিরিয়া আসিলো।

এদিকে জোহরা চৈতন্যলাভ করিয়াই শুনিলো, তাহার স্বামী চলিয়া গিয়াছে, তখন সে উন্মাদিনীর মতো ক্রন্দন করিতে করিতে তাহার পিতার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিলো, তাহাকে এখনি তাহার শ্বশুর-বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়া হউক!

প্রতিবেশীরা কিছু বুঝিতে না পারিয়া, প্রশ্নের পরে প্রশ্ন করিতে লাগিলো।

জোহরার পিতা-মাতা সকলকে বুঝাইলেন, কন্যার সমস্ত অলঙ্কার গত

রাত্রে চুরি যাওয়ায় জামাতা পুলিশে খবর দিতে গিয়াছে, মেয়েও সেই শোকে প্রায় উন্মাদিনী হইয়া গিয়াছে।

পীর-সাহেবের অভিশাপের ভয়ে লোকে বাড়িতে ভিড় করিতে পারিলো না, কৌতূহল দমন করিয়া সরিয়া গেল।

তিনদিন তিন-রাত্রি যখন কন্যা জলস্পর্শও করিলো না, তখন পিতা পাল্কী করিয়া কন্যাকে রসুলপুর পাঠাইয়া দিয়া পুণ্য করিবার মানসে মক্কা যাত্রা করিলেন।

আরিফও সেইদিন সকালে কলিকাতার হাসপাতাল হইতে মোটর-যোগে বাড়ি ফিরিয়াছে।

আশ্চর্য! সে বাড়ি ফিরিয়া কিন্তু পিতা-মাতাকে কিছু বলিলো না। এই তিনদিন ধরিয়া সে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অনেক কিছু ভাবিয়াছে। পিতা শুনিলে, তাহাদের খুন করিতে ছুটিবেন। তাহারা তো মরিবেই, তাহার পিতাকেও সে সেই সাথে হারাইবে। জোহরাও আত্মহত্যা করিবে!

জোহরা! জোহরা! ঐ তিনটি অক্ষরে যেন বিশ্বের মধু সঞ্চিত! সে মৃত্যুকে স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, দৈবকে ভিন্ন কাহাকেও সে দোষী করিবে না! বাহিরেও না, অন্তরেও না!

সে তখনও জানে না যে, আবার বাঁচিয়া ফিরিয়াছে! আর কাহাকে সে অপরাধী করিবে? তাহারা যে তাহারই প্রিয়তমার পরমাত্মীয়! বাঁচিয়া সে যেন নবজীবন লাভ করিয়াছে। এ যেন তাহার আর এক জন্ম! মৃত্যুর স্পর্শ তাহাকে সোনা করিয়া দিয়াছে।

পুত্রের মুখ দেখিয়া পিতা-মাতা চমকিয়া উঠিলেন, 'একি, এমন নীল হয়ে গেছিস কেন? একি চেহারা হয়েছে তোর?'

আরিফ শান্তস্বরে বলিলো, 'কলেরা হয়েছিলো, এসিয়াটিক কলেরা। বেঁচে এসেছি এই যথেষ্ট।'

পিতা-মাতা পুত্রকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শত

দরিদ্রকে ডাকাইয়া দান-খয়রাৎ করিলেন। সন্ধ্যায় বাড়িতে মৌলুদ শরীফের ব্যবস্থা করিলেন।

তখনো সূর্য অস্ত যায় নাই, এমন সময় বাড়ির দ্বারে আসিয়া জোহরার পাল্কী থামিলো। জোহরা পাল্কী হইতে মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখে নামিতেই সম্মুখে আরিফকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া তাহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলো, তুমি এসেছো—বেঁচে ফিরে এসেছো?'

বলিতে-বলিতে সে মূর্ছিতা হইয়া পড়িলো। সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। মূর্ছা ভাঙিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, আরিফের পিতা-মাতা কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিলেন, 'তোরা দু'জনই কি মরতে-মরতে ফিরে এলি?'

মাতা কাঁদিতে লাগিলেন, 'আমার সোনার প্রতিমার কে এমন অবস্থা করলে!'

আরিফ জোহরাকে নিভৃতে ডাকিয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলো। জোহরা স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলো, 'না না, তুমি শাস্তি দাও! তোমরা আমায় ঘৃণা করো, মারো!'

আরিফ জোহরার অধর দংশন করিয়া বলিলো, 'এই নাও, শাস্তি!'

দুঃখ বিপদের এই ঝড়-ঝঞ্ঝার মাঝেও জোহরা তাহার পদ্ম-গোখরোর কথা ভুলে নাই। এতদিন সে তেমনি নীরবে তাহাদের কথা ভুলিয়া আছে, যেমন করিয়া সে তাহার মৃত খোকাদের ভুলিয়াছে। কিন্তু সে কি ভুলিয়া থাকা! এই নীরব অন্তর্দাহের বিষ-জ্বালা তাহাকে আজ মৃত্যুর দুয়ার পর্যন্ত ঠেলিয়া আনিয়াছে! সে সর্বদা মনে করে, সে বেদেনী, সে সাপুড়ের মেয়ে! সে ঘুমে জাগরণে শুধু সর্পের স্বপ্নে দেখে। সে কল্পনা করে, তাহার স্বামী নাগলোকের অধীশ্বর, সে নাগ মাতা, নাগ-রাজেশ্বরী।

বাড়িতে আসিয়া অবধি কাহাকেও পদ্ম-গোখরোর কথা জিজ্ঞাসা না করায়, শ্বশুর-শাশুড়ী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, বৌ ওদের কথা বোধহয় ভুলিয়া গিয়াছে।

গভীর রাত্রে জোহরা স্বপ্ন দেখিতেছিলো, তাহার মৃত খোকা দুইজন যেন আসিয়া বলিতেছে, 'মাগো, বড়ো খিদে, কতদিন আমাদের দুধ দাওনি! আমরা কবরে শুয়ে আছি, আর উঠতে পারিনে! একটু দুধ। মা! একটু দুধ! বড়ো খিদে!'

'খোকা—খোকা' বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া জোহরা জাগিয়া উঠিলো। দেখিলো, স্বামী ঘুমাইতেছে। প্রদীপ জ্বালিয়া কি যেন অন্বেষণ করিলো, কেহ কোথাও নাই।

সে আজ উন্মাদিনী! সে আজ শোকাতুরা মা, সে পুত্রহারা জননী! তাহার হারা-খোকা ডাক দিয়াছে, তাহারা ছয় মাস না খাইয়া আছে!

পাগলের মতো সে দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। বাড়ির সম্মুখেই মীর-পরিবারের গোরস্থান। ক্ষীণ শিখা প্রদীপ লইয়া উন্মাদিনী মাতা দুইটি ছোট্ট কবরের পার্শ্বে আসিয়া থামিলো। পাশাপাশি দুইটি ছোট্ট কবর, যেন দুইটি যমজ ভাই—গলাগলি করিয়া শুইয়া আছে।

শিয়রে দুইটি কৃষ্ণচূড়ার গাছ, জোহরাই স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিলো। এইবার তাহাতে ফুল ধরিয়াছে। রক্ত বর্ণের ফুলে-ফুলে কবর দুইটি ছাইয়া গিয়াছে।

মাতা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলো, 'খোকা! খোকা! কে তোদের এতো ফুল দিয়েছে, বাবা! খোকা!'

মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলো না ঐ কবর ধরিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলো—জানে না, জাগিয়া উঠিয়াই জোহরা দেখিলো, তাহার বুকে কুণ্ডলী পাকাইয়া সেই পদ্ম-গোখরো-যুগল!

জোহরা উন্মত্তের মতো চীৎকার করিরা উঠিলো, 'খোকা—আমার খোকা, তোরা এসেছিস, তোদের মাকে মনে পড়লো?' জোহরা আবেগে সাপ দুইটিকে বুকে চাপিয়া ধরিলো, সর্প দুইটিও মালার মতো তাহার কণ্ঠ-বাহু জড়াইয়া ধরিলো।

তখন ভোর হইয়া গিয়াছে!

জোহরা দেখিলো পদ্ম-গোখরোদ্বয়ের সে দুগ্ধ-ধবল কান্তি আর নাই, কেমন যেন শীর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে। তাহারা বারে-বারে জিভ বাহির করিয়া

যেন তাহাদের তৃষ্ণার কথা, ক্ষুধার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে—মা গো, বড়ো খিদে! তুমি তো ছিলে না, কে খেতে দেবে? একটু দুধ! বড়ো খিদে মা, বড়ো খিদে!

জোহরা তাহাদের বুকে করিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিলো, তখনো কেহ জাগিয়া উঠে নাই।

সে হেঁসেলে ঢুকিয়া দেখিলো, কড়া-ভরা দুগ্ধ।

বাটীতে করিয়া দিতেই সাপ দুইটি বুভুক্ষের মতো বাটীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুগ্ধ পান করিতে লাগিলো। যেন কতো যুগযুগান্তরের ক্ষুধাতুর ওরা।

জোহারার দুই চক্ষু দিয়া তখন অশ্রুর বন্যা বহিয়া চলিয়াছে।

শাশুড়ী উঠিয়া বধূর কীর্তি দেখিয়া মূক, স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; বধূ তাঁহাকে দেখিতে পাইবারমাত্র বলিয়া উঠিলেন, 'ও মা কি হবে, এ বালাইরা এ ছ'মাস কোথায় ছিলো? যেমনি তুমি এসেছো, আর অম্‌নি গায়ের গন্ধে এসে হাজির হয়েছে!'

জোহরা আহত স্বরে বলিয়া উঠিলো, 'ষাট, ওরা বালাই হবে কেন মা? ওরা যে আমার খোকা!'

শাশুড়ী বুঝিতে পারিলেন না, হাসিয়া বলিলেন, 'সত্যিই ওরা তোমার খোকা, বৌমা। তুমি চলে যাবার পর আমরা দু'একদিন ওদের দুধ দিয়েছিলাম। ওমা—শুন্‌লে অবাক হবে, ওরা দুধ ছুঁলেই না। চলে গেল! সাপও মানুষ চেনে! কলিকালে আরও কতো কি দেখবো!'

সাপ দুইটি তখন বোধহয় অতিরিক্ত দুগ্ধপান বশতঃই নির্জীবের মতো বধূর পায়ের কাছে শুইয়া পড়িয়াছিলো।

সেইদিনই সন্ধ্যা-রাত্রিতে বাড়ির একজন দাসী চীৎকার করিয়া উঠিলো, 'ও মা গো, ভূতে ধরলো গো! জিনের বাদ্‌শা গো! জিন ভূত!' বলিয়াই সে প্রায় অজ্ঞান হইয়া পড়িলো। বাড়িময় ভীষণ হৈ-চৈ পড়িয়া গেল।

আরিফের মাতা তখন আরিফকে ডাকিয়া বলিতেছিলেন, 'হ্যাঁরে, বৌমা যে আবার পোয়াতি, তা তো বলিস্‌নি। ওর যে ব্যথা উঠেছে।'

আরিফ বলিতেছিলো, 'কিন্তু এখন তো ব্যথা ওঠার কথা নয় মা, মোটে তো সাত মাস।'

এমন সময় বাড়িময় ভয়ানক সোরগোল উঠিলো, 'ভূত! ভূত! য়্যাদ্দাড়িয়ালা ভূত!'

বাড়ির চারক-চাকরাণী সকলে বলিলো, তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে—জ্যান্ত ভূত! আকাশে গিয়া তাহার মাথা ঠেকিয়াছে! বাড়ির মধ্যে আম-গাছতলায় দাঁড়াইয়া আছে!

আরিফ, আরিফের মাতা লণ্ঠন লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। সত্যই তো কে যেন গাছতলায় প্রেতমূর্তির মতো দাঁড়াইয়া!

তাঁহাদের পিছনে-পিছনে যে ভূত দেখিতে জোহরাও বাহির হইয়া আসিয়াছিলো, তাহা কেহ দেখে নাই।

হঠাৎ ভূত চীৎকার করিয়া উঠিলো, 'ওরে বাপরে, সাপে খেলে রে!'

জোহবা চীৎকার করিয়া উঠলো, 'বাবা, তুমি!'

আরিফের মাতাও বলিয়া উঠিলো, 'য়্যাঁ, বেয়াই?'

জোহরা তখন চীৎকার করিতেছে, 'ও সত্যিই ভূত। বাবা নয়, বাবা নয়, ও ভূত! ওকে মারো! মেরে বের করে দাও!'

হঠাৎ সে শুনিতে পাইলো, ভূত যেন যষ্টি দ্বারা নির্দয়ভাবে কাহাকে প্রহার করিতে করিতে চীৎকার করিতেছে, 'ওরে বাপ্‌রে, সাপে খেয়ে ফেললো! আমায় সাপে খেয়ে ফেললো!'

জোহরা উন্মাদিনীর মতো তাহার শাশুড়ীর হাতের লণ্ঠন কাড়িয়া লইয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে ছুটিলো, 'ওগো, আমার খোকাদের মেরে ফেললো! ওকে ধরো! ওকে ধরো!'

জোহরার সাথে-সাথে সকলে আম-গাছতলায় গিয়া দেখিলো, ভূত সত্যই আর কেহ নহে, সে জোহরারই পিতা। তাহাকে তাহাদের বাস্তু সাপ পদ্ম-গোখরোদ্বয় নির্মমভাবে দংশন করিতেছে এবং ততোধিক নির্মমভাবে সে সর্পদ্বয়কে প্রহার করিতেছে।

জোহরা একবার 'খোকা' এবং একবার 'বাবা' বলিয়াই মূর্ছিতা হইয়া পড়িলো।

জ্ঞান হইলে জোহরা আরিফকে ডাকিলো। সকলে সরিয়া গেলে, সে জিজ্ঞাসা করিলো, 'আমার খোকারা কই?' আমার পদ্ম-গোখরো? আমার বাবা?'

আরিফ কাঁদিয়া বলিলো, 'জোহরা! জোহরা! কেউ নেই! সব গেছে! সকলে গেছে। তোমার বাবা মরেছেন পদ্ম-গোখরোর কামড়ে!' তোমার মা মারা গেছেন কলেরা হয়ে। ওঁরা মক্কা যাচ্ছিলেন। তোমার মা রাস্তায় মারা গেলে, তোমার বাবা অনুতপ্ত হয়ে তোমায় শেষ দেখা দেখতে আসেন লুকিয়ে। লুকিয়েই হয়তো তোমায় দেখে চলে যেতেন। এমন সময় চাকরাণী দেখতে পেয়ে ভূত বলে চীৎকার করে! ঠিক সেই সময় তোমার পদ্ম-গোখরো তাঁকে তাড়া করে!'

জোহরা হাঁপাইতে-হাঁপাইতে বলিলো, 'বেশ হয়েছে, জাহান্নামে গেছে ওরা! যাক্। আমার পদ্ম-গোখরো—আমার খোকারা কোথায় বলো!'

আরিফ বলিলো, 'তোমার বাবা তাদের মেরে ফেলেছেন!'

'—য়্যাঁ! খোকারা নেই?' বলিয়াই জোহরা অজ্ঞান হইয়া পড়িলো।

ভোর হইতে না হইতে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, মীর সাহেবদের সোনার বৌ এক-জোড়া মরা সর্প প্রসব করিয়া মারা গিয়াছে।

স্ত্রী-চরিত্র

বনফুল

গভীর রাত্রি।

মশারির মধ্যে শুইয়া শ্রীমতী সুনন্দা একটি মাসিক পত্রিকায় আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। পাশেই শ্রীযুক্ত তমালকান্তি পাশ-বালিশ জড়াইয়া ধরিয়া নাক ডাকাইতেছে। উহারা স্বামী-স্ত্রী। এক বৎসর বিবাহ হইয়াছে।

সুনন্দা রোজই এইরূপ করে, অর্থাৎ শুইবার সময় একখানা বাংলা বই লইয়াই মাথার শিয়রে আলো জ্বালাইয়া বিনিদ্র নয়নে পড়িতে থাকে। তমালকান্তিও রোজ এইরূপ করে অর্থাৎ নির্বিবাদে ঘুমায়।

মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাইতে-উল্টাইতে হঠাৎ সুনন্দার নজরে পড়িলো, একটি গল্পের নাম 'গল্প নহে'। আশ্চর্য নাম তো! লেখকের নাম নাই। সুনন্দা পড়িতে শুরু করিলো। পড়িতে পড়িতে ক্রমশ সুনন্দার মন নির্মলা নাম্নী মেয়েটির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলো। বিশ্বনাথ ছোকরাটির উপর সুনন্দার প্রথমটা রাগ হইয়াছিলো, কিন্তু সে রাগও বেশিক্ষণ টিঁকিলো না। বিশ্বনাথ যখন বিদায়কালে নির্মলার দুইটি হাত ধরিয়া হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলো, তখন সুনন্দার রাগও জল হইয়া গেল। বিশ্বনাথ নির্মলাকে পাইলো না—পাইলো কাদম্বিনীকে। গল্পটি সংক্ষেপে এইরূপ—

বিশ্বনাথ নামক যুবকটি গ্রীষ্মের ছুটিতে মাতুলালয়ে বেড়াইতে গিয়াছিলো। সেখানে অন্য কোনো কাজ না থাকায় সে পুষ্করিণী-তীরে গিয়া আড্ডা গাড়িলো। উদ্দেশ্য, মাছ ধরা। একদিন ফাতনার দিকে চাহিয়া-চাহিয়া বেচারা প্রায় অন্ধ হইবার যোগাড় হইয়াছে, এমন সময় এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। ফাতনা ডুবিলো এবং বিশ্বনাথ মরিয়া হইয়া প্রচণ্ড এক খ্যাঁচকা-টান দিয়া বঁড়শি তুলিয়াই একেবারে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলো।

'ওগো—মা গো—'

সচকিত বিশ্বনাথ পিছন ফিরিয়া দেখে, বঁড়শি একটি কিশোরীর কাপড়ে গিয়া আটকাইয়াছে। বলা বাহুল্য, কিশোরী আর কেহ নহে—নির্মলা।

এই শুরু।

তাহার পর ভদ্রভাবে যতো প্রকারে প্রেমালাপ করা সম্ভব তাহা ইহারা করিয়াছে এবং করিতো, যদি না বিশ্বনাথের মাতুল রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেন। মাতুল মহাশয় তাঁহার সুপ্রচুর গুম্ফরাজির অন্তরালে ঈষদ্ধাস্য করিয়া ব্যাপারটাকে যৌবনসুলভ বাতুলতা বলিয়া উড়াইয়া দিলেন এবং প্রতিষেধক-স্বরূপ কাদম্বিনী প্রয়োগ করিয়া বসিলেন।

বিশ্বনাথ প্রথমটা রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিলো কিন্তু বেচারা একা কি করিবে! সে বড়ো-জোর মাতুলকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে, কিন্তু সমস্ত সমাজকে ঠেকানো তাহার সাধ্যাতীত। বিশ্বনাথ ব্রাহ্মণ এবং নির্মলা কায়স্থ। সুতরাং নির্মলার হাত ধরিয়া ক্রন্দন করা ব্যতীত আর কিছুই করিতে পারিলো না।

বেশ লিখিয়াছে গল্পটি। নির্মলার জন্য সুনন্দার ভারী কষ্ট হইতে লাগিলো। আলো নিবাইয়া সুনন্দা যখন শয়ন করিলো, তখন নির্মলার দুঃখে একবিন্দু অশ্রু তাহার নয়নে টলমল করিতেছে। কি নিষ্ঠুর সমাজ!

তাহার পরদিন সন্ধ্যাকালে তমালকান্তি আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখে, তুমুল কাণ্ড। বেচারা ডেলি-প্যাসেঞ্জার; সকালে উঠিয়াই স্নানাহার করিয়া আটটা সাতান্নর লোকাল ট্রেনে আপিস চলিয়া যায় এবং সাতটা বিয়াল্লিশের লোকাল-যোগে ফিরিয়া আসে।

সুনন্দার এমন ভাবান্তর ইতিপূর্বে সে লক্ষ্য করে নাই। মুখখানি তোলো-হাঁড়ির মতো করিয়া সুনন্দা বসিয়া আছে। তমাল আসিয়া ঢুকিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইলো এবং বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া গাড়ু-গামছা আগাইয়া দিয়া চায়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য রান্নাঘর অভিমুখে চলিয়া গেল।

মুখে একটিও কথা নাই। জামা-জুতা ছাড়িতে-ছাড়িতে তমাল ভাবিতে লাগিলো, ব্যাপার কি!

মিনিট-পাঁচেক পরে এক পেয়ালা গরম চা হস্তে সুনন্দা প্রবেশ করিলো। মুখ তখনও তোলো-হাঁড়ি।

তমাল চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া বলিলো—'দেখো, আজ গাড়িতে 'পুষ্পসুরভিসার' বলে একটা মাথার তেল বিক্রি করছিলো। রোজই করে। কাল মনে করছি কিনে আনবো এক শিশি। গন্ধটাও ভালো, আর আমাদের মল্লিকমশাই বলছিলেন যে, মাথাও নাকি বেশ ঠাণ্ডা রাখে।'

সুনন্দা নীরবে বাহির হইয়া গেল।

তমাল বুঝিলো, গতিক সুবিধার নহে। হঠাৎ হইলো কি। চা নিঃশেষ করিয়া তমাল বাহিরে গিয়া দেখে, সুনন্দা তাহার অর্ধসমাপ্ত উলের মাফলারটা লইয়া বুনিতে বসিয়া গিয়াছে। তমাল হাসিয়া বলিলো—'আজ এতো গম্ভীর যে! সমস্ত মুখখানা আজ এমন থমথম করছে কেন? ব্যাপার কি?'

সুনন্দা আর আত্মসংবরণ করিয়া থাকিতে পারিলো না। বোমার মতো ফাটিয়া পড়িলো। বলিলো—'আমার কাছে সোহাগ জানাবার দরকার কি? যাও না—তোমার নির্মলার কাছে, যার হাত ধরে বিয়ের আগে কেঁদে বলেছিলে—আমার মন তোমায় দিয়ে গেলাম নির্মলা। বিয়ে করতে চললো এই দেহটা। সমাজের নিষ্ঠুর হাড়িকাঠে বলি দিতে চললাম নিজেকে।'

বিস্মিত তমাল কহিলো—'নির্মলা আবার কে! পাগল হয়ে গেলে নাকি তুমি!'

সুনন্দা কিছু না-বলিয়া 'গল্প-প্রভাকর' নামক মাসিক পত্রিকাটি এবং সম্পাদকের চিঠিখানি স্তম্ভিত তমালের হস্তে তুলিয়া দিলো।

সম্পাদক মহাশয় লিখিতেছেন—

সবিনয় নিবেদন,

আপনার 'গল্প নহে' নামক গল্পটি এই মাসে প্রকাশিত হইলো। এক সংখ্যা 'গল্প প্রভাকর'ও আপনার নামে অদ্য পাঠাইলাম। গল্পটি প্রকাশ

করিতে নানা কারণে বিলম্ব হইলো বলিয়া কিছু মনে করিবেন না। আর একটি গল্প চাই। ইতি—

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ তালুকদার।

বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো তমালের মনে পড়িয়া গেল যে, প্রায় দুই বৎসর পূর্বে উক্ত গল্পটি সে 'গল্প-প্রভাকরে' পাঠাইয়াছিলো বটে। তাহার পর তমালের বিবাহ হইয়াছে, চাকরি হইয়াছে, সাহিত্য-চর্চা সে বহুকাল ছাড়িয়া দিয়াছে। এই গল্পটির কথা সে ভুলিয়াই গিয়াছিলো। আজ হঠাৎ একি আকস্মিক বিপদ!

আমতাআমতা করিয়া তমাল বলিলো—'ওটা একটা গল্প লিখে-ছিলাম বটে অনেকদিন আগে। তাতে হয়েছে কি?'

'গল্প? তুমি তো নিজেই লিখে দিয়েছো 'গল্প নহে'!'

তমাল একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলো—'ওটা একটা—ইয়ে—স্টাইল—বুঝলে কিনা—'

সুনন্দা কিছুই বুঝিলো না। বুঝিতে সে চায়ও না। নির্মলার ঠিকানাটা জানিতে পারিলে একবার গিয়া দেখিতো, মেয়েটি কেমন রূপসী। স্বামী যেরূপ লিখিয়াছেন ঠিক সেইরূপ কি না!

ঈর্ষায় তাঁহার সমস্ত অন্তর পুড়িতে লাগিলো। অথচ এই কয়েক ঘণ্টা পূর্বেই নির্মলার দুঃখে সুনন্দার চোখে জল আসিতেছিলো।

স্ত্রী-ভাগ্য

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ধীরাজের বিবাহ ও দাম্পত্যজীবন হাসির ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিলো।

ধীরাজ আমার ছেলেবেলার বন্ধু; তারপর বড়ো হইয়া কলিকাতার একই মেসে একই ঘরে বাস করিয়াছি, এবং একই শেয়ার-দালালের অফিসে কেরানীগিরি করিয়াছি। সুতরাং তাহার হৃদয় মনের একটা স্পষ্ট চিত্র আমার মনে থাকা উচিত। কিন্তু এখন মনে হয় তাহার হৃদয়ের মধ্যে একটা গোপন চোর-কুঠরি ছিলো; সেখানে সে কী রাখিতো আমি কোনদিন জানিতে পারি নাই।

অথচ সে চাপা প্রকৃতির লোক ছিলো না। তাহার ছিপ্‌ছিপে লম্বা চেহারা দেখিলে ও ধারালো মুখের শাণিত কথাবার্তা শুনিলে মনে হইতো, সে বিজ্ঞানের ছাত্র; তাহাকে কেরানী শ্রেণীর মানুষ বলিয়া একেবারেই মনে হইতো না। সাধারণ মানুষ যে-সকল প্রসঙ্গ সঙ্কোচবশে এড়াইয়া যায়, সে তাহা খোলাখুলিভাবে আলোচনা করিতো। তখন আমরা দু'জনেই অবিবাহিত, সম্পূর্ণ আত্মীয়স্বজনহীন এবং দরিদ্র কেরানী। আমি এখনো দরিদ্র কেরানীই রহিয়া গিয়াছি, কিন্তু ধীরাজের জীবনে এই কয় বছরে এতো উত্থান-পতন ঘটিয়াছে যে, বিস্মিত হইতে হয়।

ধীরাজের বুদ্ধি ছিলো অত্যন্ত প্রখর, কিন্তু তাহার দেহটা ছিলো ঠিক সেই পরিমাণে অলস ও নিষ্কর্মা। ছুটির দিনে সারাদিন বিছানায় পড়িয়া থাকিতো; ঘরে আড্ডা বসিলে সে বিছানায় শুইয়া-শুইয়াই আড্ডায় যোগ দিতো। অফিসে না গেলে চাকরি থাকিবে না, তাই অফিসে যাইতো। তাও অফিসের কাজ এমন বেগারঠেলাভাবে করিতো যে, আমি তাহার অর্ধেক কাজ করিয়া না দিলে চাকরি থাকিতো কিনা সন্দেহ।

ধীরাজের বিবাহ একটি বিচিত্র ঘটনা। একটা ছুটির দিনে সকালবেলা আমি বাজারে গিয়াছিলাম, তেল সাবান টুথ-পাউডার প্রভৃতি কিনিবার ছিলো। বেলা দশটা নাগাদ ফিরিয়া আসিয়া দেখি, ধীরাজ শয্যাত্যাগ করিয়াছে, দাড়ি কামাইয়াছে, কাপড়-চোপড় পরিয়া তৈয়ার হইয়া আছে। আমাকে দেখিয়া বলিলো—'চল্, এখনি বেরুতে হবে।'

আমি হাঁ করিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলাম—'তোর আজ হলো কি! কোথায় যেতে হবে?'

সে বলিলো—'পরে শুনিস্। এখন চট্ করে ভালো কাপড়-চোপড় পরে তৈরি হয়ে নে।'

পনরো মিনিটের মধ্যে বাহির হইলাম। রাস্তায় চলিতে-চলিতে জিজ্ঞাসা করিলাম—'কোথায় যাওয়া হচ্ছে সেটা এবার জানতে পারি কি?'

ধীরাজ বলিলো—'আমি যাচ্ছি বিয়ে করতে। সিভিল ম্যারেজ্। তুই আমার সাক্ষী।'

রাস্তায় দাঁড়াইয়া পড়িলাম—'বিয়ে! করে সঙ্গে? কোথায়?'

সে আমার বাহু ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলো—'বেশি দূর নয়, পাঁচ মিনিটের রাস্তা।'

'কিন্তু পাত্রী কে? কার মেয়ে?'

'কার মেয়ে জানি না। পাত্রীকে জানি; নাম ঊষা পাঠক। স্বাধীন মেয়ে, ইন্সিওরেন্সের দালালি করে।'

আবার দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

'কে দালালি করে?'

'পাত্রী।'

অতঃপর আর কিছু বলিবার রহিলো না। বীমার দালালি করে এমন মেয়ে নিশ্চয় আছে, নচেৎ ধীরাজ তাহাকে বিবাহ করিবে কেমন করিয়া? কিছুক্ষণ নীরবে চলিবার পর বলিলাম—'বিয়ের কথা আগে বলিসনি কেন?'

সে বলিলো—'কী এমন মহামারী ব্যাপার যে ঢাক পিটোতে হবে?'

নানা প্রশ্নের মধ্যে একটা প্রশ্ন প্রবলতর হইয়া উঠিলো। জিজ্ঞাসা

করিলাম—'কোথায় তোদের দেখাশুনো হলো তাও জানি না। তা—প্রেম নাকি? প্রেমে পড়েছিস্?'

ধীরাজ প্রশ্নের উত্তর দিলো না, ঠোঁট টিপিয়া একটু হাসিলো।

ইতিমধ্যে আমরা একটি তিনতলা বাড়ির সামনে আসিয়া পৌঁছিলাম, সুতরাং আর প্রশ্ন করাও হইলো না। ধীরাজ আমাকে লইয়া সেই বাড়ির ডগায় উঠিলো।

ছিমছাম পরিচ্ছন্ন একটি ফ্ল্যাট। যে যুবতীটি ফ্ল্যাটের দরজা খুলিয়া দিলো সেও বেশ ছিমছাম। সুন্দরী নয়, মুখখানি টিয়াপাখির মতো; কিন্তু চোখে আছে চটুল কটাক্ষ, পরিপক্ক অধরে আছে খুনখারাবি রঙের হাসি। বেশবাস পরিবার ভঙ্গীতে দেহকে আচ্ছাদন করার চেয়ে উন্মোচন করার চেষ্টাই বেশি।

ধীরাজ পরিচয় করাইয়া দিলো—'আমার বন্ধু, মানিক ঘোষ। উষা পাঠক—আমার—'

উষা পাঠক আমার পানে চোখ বাঁকাইয়া হাসিলো।

সুসজ্জিত ঘরে গিয়া বসিলাম। ঘরের সাজসজ্জা দেখিয়া মনে হয় ধীরাজের ভাবী স্ত্রীর পয়সা আছে, বীমার দালালি করিয়া নিশ্চয় অনেক টাকা রোজগার করে।

ঘরে আরও দুইটি মানুষ আছে। বিলাতী পোশাক-পরা ফিটফাট দুইটি যুবক। একজন বাঙালী, অন্যটি মাড়োয়ারী। ইহারা পাত্রীর বন্ধু, বিবাহে সাক্ষী দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে।

অল্পক্ষণ পরেই বিবাহের পুরোহিত, অর্থাৎ রেজিস্ট্রার মহাশয় চাপরাসীর হাতে বিরাট খাতা লইয়া উপস্থিত হইলেন। পাত্র-পাত্রীকে দুই-একটি সওয়াল-জবাব, খাতায় নাম লেখা, সাক্ষীদের সহি-দস্তখত। ব্যস্, বিবাহ হইয়া গেল। ঢাক-ঢোল নাই, বরযাত্রী-কন্যাযাত্রীর কামড়া-কামড়ি নাই, উলু সাতপাক কুশণ্ডিকা নাই, অথচ পাকা বিবাহ। রেজিস্ট্রার মহাশয় দক্ষিণা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

খাসা বিবাহ।

অতঃপর আমরা—সাক্ষীরা জলযোগপূর্বক প্রস্থান করিলাম। নববধূ

বঙ্কিম কটাক্ষপাত করিয়া খুনখারাবি রঙের হাসি হাসিলো। ধীরাজ বলিলো—
‘আচ্ছা, কাল অফিসে দেখা হবে।’

বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। মনটা খারাপ হইয়া গেল। একে তো বিবাহের পদ্ধতিটা নিতান্তই অনভ্যস্ত, তাহার উপর উষা পাঠক মেয়েটাকেও ভালো লাগিলো না। তাহার বন্ধু দুইটিকেও ভালো লাগিলো না। তাহাদের চালচলন ভাবভঙ্গী খুবই পরিমার্জিত, তবু কিন্তু ভালো লাগিলো না।

ছুটির দিনে বাসার অন্য অধিবাসীরা সকলেই বাসায় ছিলেন, পাশের ঘরে আড্ডা বসিয়াছিলো। আমি ফিরিয়া আসিলে দুই-তিনজন আমাদের ঘরে আসিলেন। একজন বলিলেন—‘কি ব্যাপার বলুন দেখি! ধীরাজবাবু আজ দুপুরের আগেই বিছানা ছেড়ে কোথায় গেলেন?’

মনের দুঃখে ধীরাজের বিবাহের কথা বলিলাম। শুনিয়া সকলে চেঁচামেচি করিতে লাগিলেন—‘এ কি রকম কথা! ধীরাজবাবু বিয়ে করলেন, অথচ আমাদের একবার জানালেন না! না-হয় বরযাত্রী না-ই যেতাম, রসগোল্লা না-ই খেতাম’—ইত্যাদি।

সুশীলবাবু নামক এক ভদ্রলোক বলিলেন—‘বোধহয় অসবর্ণ বিবাহ। পাত্রীর নাম কি?’

বলিলাম—‘উষা পাঠক।’

সুশীলবাবুর ভ্রূযুগল গুণছেঁড়া ধনুকের মতো লাফাইয়া উঠিলো—‘উষা পাঠক! বলেন কি মশাই! সে যে নামজাদা মেয়ে!’

‘নামজাদা মেয়ে! আপনি তাকে চেনেন নাকি?’

সুশীলবাবু বলিলেন—‘পরিচয় নেই। তবে কীর্তিকলাপ জানা আছে। ছি ছি ছি, ধীরাজবাবু শেষে উষা পাঠককে বিয়ে করলেন! এই জন্যেই বুঝি কাউকে খবর দেননি।’

‘উষা পাঠকের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে আপনি কী জানেন?’

সুশীলবাবু অরুচিসূচক মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন—‘অনেক কিছুই জানি; শুধু আমি নয়, আরো অনেকে জানে। উষা পাঠক যখন কলেজে পড়তো, তখন একটা ছেলের সঙ্গে নটঘট করেছিলো, পরে জানাজানি হয়ে

যায়; কলেজ থেকে দু'জনকেই তাড়িয়ে দেয়। তারপর উষা বীমার দালালি আরম্ভ করে। বীমার দালালিটা ছুতো, আসলে বড়ো-মানুষের ছেলেদের মাথা খাওয়াই ওর পেশা।'

সুশীলবাবুরা চলিয়া যাইবার পর গুম হইয়া বসিয়া রহিলাম। ধীরাজ কি জানিয়া-শুনিয়া একটা নষ্ট-মেয়েকে বিবাহ করিলো? কিন্তু কেন? এই লইয়া মেসে টিটিক্কার পড়িয়া যাইবে ভাবিয়া মনটা বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিলো।

পরদিন ধীরাজ আসিলো না। মেসেও ফিরিলো না। ইহার পর মাস-দুয়েক আর তাহার দেখা নাই। তাহার কাপড়-চোপড় বাক্স-বিছানা সবই বাসায় পড়িয়া আছে। তাহার চরিত্র যতদূর জানি তাহা হইতে অনুমান করিলাম, সে নব-পরিণীতা স্ত্রীর বাসায় বিছানায় শুইয়া পরমানন্দে দিন কাটাইতেছে। রোজগেরে বৌ যখন পাইয়াছে তখন আর কাজ করিবে কেন? বলা বাহুল্য, চাকরি রহিলো না।

আমি ইচ্ছা করিলে তাহার স্ত্রীর বাসায় গিয়া খোঁজখবর লইতে পারিতাম। কিন্তু তাহার স্ত্রীর সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহার পর আর সেদিকে যাইবার উৎসাহ ছিলো না। যাক্‌গে, মরুকগে, আমার কী—এইরূপ মনোভাব লইয়া বসিয়া ছিলাম। বাসায় আমার ঘরে ধীরাজের বদলে অন্য লোক আসিয়াছিলো।

একদিন বিকালে অফিস হইতে বাহির হইয়া ফুটপাথে পা দিয়াছি, একটি ঝকঝকে নূতন মোটর আসিয়া ফুটপাথ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইলো। গাড়ির মধ্যে বসিয়া আছে ধীরাজ। তাহার চেহারাও মোটরের মতো ঝকঝক করিতেছে; পরিধানে পুরু সিল্কের প্যাণ্টুলুন ও মিহি সিল্কের বুশ-শার্ট, মাথার চক্‌চকে চুল ব্যাক্‌ব্রাশ করা। গাড়ি চালাইতেছে একজন ছোকরা শিখ। দেখিয়া-শুনিয়া আমি কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেলাম।

ধীরাজ গাড়ির দরজা খুলিয়া দিয়া বলিলো—'আয়, তোকে বাসায় পৌঁছে দিই।'

মনের আড়ষ্টতা দূর হইবার পূর্বেই গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম। গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিলো।

ধীরাজ আমার পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিলো, সোনার সিগারেট-কেস আমার সামনে খুলিয়া ধরিয়া বলিলো—'তুই কি ঘাব্‌ড়ে গেলি নাকি?'

দামী সিগারেট। আমি যে-সিগারেট খাই তাহার এক প্যাকেটের চেয়েও এই একটা সিগারেটের দাম বেশি। ধীরাজ লাইটার জ্বালিয়া সিগারেট ধরাইয়া দিলো। আমি নীরবে দুই-তিন টান দিয়া বলিলাম—'কার গাড়ি?'

ধীরাজ ভ্রূ তুলিয়া বলিলো—'আমার গাড়ি। আর কার?'

প্রশ্ন করিলাম—'টাকা কোথায় পেলি?'

ধীরাজের চক্ষু উত্তেজিত হইয়া উঠিলো—'টাকা—রোজগার করেছি। পাঁচ হপ্তায় সাঁইত্রিশ হাজার টাকা রোজগার করেছি। বিশ্বাস হয়?'

'বিশ্বাস করা শক্ত। কিসে এতো টাকা রোজগার করলি?'

'শেয়ার-মার্কেটে। এতদিন মিছেই কেরানীগিরি করে মরেছি। যদি গোড়া থেকে ফাট্‌কা খেলতাম—এতদিনে লাখপতি হয়ে যেতাম।'

তাহার মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, হঠাৎ অনেক টাকা রোজগার করার উত্তেজনা সে এখনো কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। মনে-মনে একটু ঈর্ষা যে অনুভব না করিলাম এমন নহে। বলিলাম—'শেয়ার-মার্কেটে জুয়া খেলতে হলে মূলধন দরকার। তুই মূলধন পেলি কোথায়?'

ধীরাজ তখন সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলো। বিবাহের পর তাহার স্ত্রী বলিয়াছিলো—'কেরানীগিরিতে কি পয়সা আছে? তুমি শেয়ার-মার্কেটে যাতায়াত আরম্ভ করো।'

এই বলিয়া তাহাকে দুই হাজার টাকা দিয়াছিলো। ধীরাজ শেয়ার-দালালের অফিসে চাকরি করিয়া শেয়ার বেচাকেনা সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জানিতো, কিন্তু নিজে কখনো শেয়ারের খেলা খেলে নাই। সে ভয়ে-ভয়ে অগ্রসর হইলো। কিন্তু এমনি তাহার জোর বরাত, প্রথম হইতেই সে লাভ করিতে আরম্ভ করিলো। বৌ তাহাকে শেয়ার সম্বন্ধে 'টিপ' সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিতো। ক্রমে এমন দাঁড়াইলো, সে যে-শেয়ার কেনে সেই শেয়ারের দাম চড়চড় করিয়া চড়িয়া যায়। গত পাঁচ হপ্তায় সে সাঁইত্রিশ

হাজার টাকা লাভ করিয়াছে; তাহার পর মোটর কিনিয়াছে, দেড়শো টাকা মাহিনা দিয়া ড্রাইভার রাখিয়াছে। এখন আরো কিছু টাকা হস্তগত করিতে পারিলেই বালিগঞ্জে বাড়ি কিনিবে।

কাহিনী শেষ করিয়া ধীরাজ বলিলো—'একেই বলে পুরুষস্য ভাগ্যং।'

মনে-মনে ভাবিলাম, স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং-ও বটে। মুখে বলিলাম—'খাসা বৌ যোগাড় করেছিস। কথায় বলে স্ত্রী-ভাগ্যে ধন। তা তুই তো আর আমাদের পচা মেসে ফিরে আসবি না; তোর জিনিসপত্র আমার কাছে পড়ে রয়েছে, সেগুলো নিয়ে যা।'

ধীরাজ তাচ্ছিল্যভরে বলিলো—'ও আর এখন কী হবে, তোর কাছেই থাক, পরে দেখা যাবে।'

গাড়ি আসিয়া মেসের সামনে থামিলো। আমি নামিবার উপক্রম করিতেছি, ধীরাজ বলিলো—'তুই একটা লাইফ ইন্সিওরেন্স পলিসি নে-না।'

ফিরিয়া বলিলাম—'লাইফ ইন্সিওরেন্স পলিসি!'

সে বলিলো—'হ্যাঁ। আমি পঞ্চাশ হাজারের নিয়েছি। তুই অন্তত দশ হাজারের নে। বিশ বছর পরে টাকা পাবি।'

বলিলাম—'তা তো পাবো, কিন্তু ততদিন খাবো কি? যা মাইনে পাই, প্রিমিয়ম দিয়ে কিছু বাঁচবে কি?'

সে হাসিয়া বলিলো—'আচ্ছা, পাঁচ হাজারের নিস্। বেশি প্রিমিয়ম দিতে হবে না, আমার বৌ সব ঠিকঠাক করে দেবে। একদিন আসিস্ আমার বাসায়।'

আমি উত্তর দিলাম না, গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলাম। গাড়ি চলিয়া গেল। ধীরাজের কপাল খুলিয়াছে, কিন্তু আমার তো খোলে নাই। পেটে ভাত নাই—পাঁচ হাজার টাকার ইন্সিওরেন্স!

মেসের দোরগড়ায় সুশীলবাবুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। তিনি ভুরু তুলিয়া বলিলেন—'ব্যাপার কি! কার মোটরে চড়ে অফিস থেকে ফিরলেন?' তিনি পদব্রজে অফিস হইতে ফিরিতেছিলেন।

বলিলাম—'ধীরাজের মোটরে চড়ে।'

তাঁহার মুখে বিস্ময় ও অবিশ্বাসের সঙ্গে বেশ অসন্তোষ ফুটিয়া উঠিলো।

বলিলেন—'তাই নাকি! ধীরাজবাবু তাহলে এখন স্ত্রীর রোজগারে মোটর হাঁকাচ্ছেন ?'

বলিলাম—'পুরুষস্য ভাগ্যং। কি করবেন, বলুন।'

সুশীলবাবু হঠাৎ দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন—'ঝাঁটা মারি অমন ভাগ্যের মুখে। ইজ্জতের বদলে মোটরগাড়ি! ছ্যাঃ।' তিনি ঘৃণাভরে পাদদাপ করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন? বুঝিলাম, ধীরাজের বিবাহের সংবাদে তিনি যতটা ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন তাহার ভাগ্যোদয়ের সংবাদে ততোধিক অসুখী হইয়াছেন। আমাদের মতো সামান্য সাধারণ মানুষের পক্ষে ইহাই বোধহয় স্বাভাবিক। ধর্মের জয় এবং অধর্মের ক্ষয় দেখিবার জন্য আমাদের মন সর্বদাই উৎসুক; ইহার ব্যতিক্রম দেখিলে মন খারাপ হইয়া যায়।

ধীরাজের ভাগ্যোন্নতির খবর মেসে প্রচারিত হইলো। ধীরাজের অনুপস্থিতিতে আমাকে লক্ষ্য করিয়াই বাক্যবাণ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলো; কারণ, আমিই ছিলাম তাহার নিকটতম বন্ধু এবং সম্প্রতি তাহার মোটর গাড়িতে চড়িয়াছি। আমি কিন্তু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বিচলিত হইলাম না, বরং ব্যঙ্গকারীদের দলে ভিড়িয়া গেলাম। তাহাতে প্রতিপক্ষের অভাবে ব্যঙ্গ-বীরেরা একটু ভগ্নোদ্যম হইলেন বটে, কিন্তু পাঁয়তাড়া কষা একেবারে বন্ধ হইলো না। বিশেষতঃ সুশীলবাবু উদ্যোগী পুরুষ, তিনি মাঝে-মাঝে বাহির হইতে নূতন খবর সংগ্রহ করিয়া আনিয়া স্তিমীয়মান জল্পনাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতেন।

একদিন তিনি অফিস হইতে ফিরিয়া আমার ঘরে আসিলেন, তক্তপোশের পাশে বসিয়া বলিলেন—'আজ এক জবর খবর শুনলাম। উষা পাঠক, মানে ধীরাজবাবুর সহধর্মিণী এখন এক মাড়োয়ারী ছোকরার সঙ্গে ধর্মকর্ম করে বেড়াচ্ছেন। রাত্রে বাড়ি থাকেন না, মাড়োয়ারীর সঙ্গে হোটেলে রাত্রিযাপন করেন। মাড়োয়ারী ছোকরাটি নেহাত হেঁজিপেঁজি নয়, তার বাপ বুলিয়ন-মার্কেটের একজন দিক্‌পাল।'

বিবাহের সময় মাড়োয়ারী সাক্ষীকে দেখিয়াছিলাম মনে পড়িলো; ইনি সম্ভবত তিনিই। কিন্তু সুশীলবাবুকে সে-কথা বলিয়া তাঁহার রসদ

বাড়াইতে ইচ্ছা হইলো না, হাসিয়া বলিলাম—'তবেই দেখুন। ধীরাজের বৌকে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সবাই ভালোবাসে। এমনকি মাড়োয়ারী পর্যন্ত।'

সুশীলবাবু বলিলেন—'বলিহারী যাই! ছোঁড়াগুলো কি দেখে মজেছে তাও বুঝি না। দাঁত উঁচু, ঠোঁট মোটা—রূপের ধুচুনি!'

বলিলাম—'রূপ দেখে কেউ মজে না, সুশীলবাবু। যা দেখে মজে তার খাস বিলিতী নাম হচ্ছে—'যৌন আবেদন।'

'ঝাঁটা মারি!' বলিয়া সুশীলবাবু উঠিয়া গেলেন।

এইভাবে দিন কাটিতে লাগিলো। সুশীলবাবু মাঝে-মাঝে বাহির হইতে খবর আনিয়া শোনান; উষা পাঠক কোন্ পার্টিতে কতো পেগ্ হুইস্কি টানিয়াছে, কাহার সহিত কতবার নাচিয়াছে—এই ধরনের খবর। কিন্তু যতই দিন কাটিতে লাগিলো, উষা-ধীরাজের কেচ্ছা ততই বাসী হইয়া পড়িতে লাগিলো। ধীরাজের ভাগ্যোদয়ও গা-সওয়া হইয়া গেল। ধীরাজ আমাকে তাহার বাসায় যাইতে বলিয়াছিলো, আমি অবশ্য যাই নাই; সেও আর আসে নাই। ধীরাজ আমাদের জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। ভালোই হইয়াছে; ক্ষুদ্র কেরানী আমরা, বড়োমানুষের সঙ্গে আমাদের কিসের সম্পর্ক!

অতঃপর প্রায় দুই বছর পরে আবার তাহার সহিত দেখা হইলো। এবার আর মোটরগাড়ি নাই; আমার অফিসের সামনে একটা ল্যাম্প্-পোস্টে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিলো। দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। তাহার চেহারার সেই গিল্‌টি-করা চাকচিক্য আর নাই; মুখে শুষ্ক বিবর্ণ ভাব।

আমাকে দেখিয়া ফ্যাকাসে হাসিলো, ল্যাম্প্‌পোস্ট হইতে মেরুদণ্ড বিযুক্ত করিয়া বলিলো—'কি রে, কেমন আছিস্?'

আমি এদিক-ওদিক চাহিলাম—'তোর মোটর কোথায়?'

'মোটর—' সে কথা পালটাইয়া বলিলো—'তুই বাসায় ফিরবি তো? বাসে যাবি, না হেঁটে?'

'হেঁটে। এখন বাসে চড়া অসাধ্য।'

'চল্ তবে, আমিও খানিকদূর তোর সঙ্গে হাঁটি।'

দুইজনে পাশাপাশি চলিলাম। কথাবার্তা নাই। তাহার সহিত

যেন মনের সংযোগ ছিঁড়িয়া গিয়াছে। শেষে সে নিজেই বলিলো—'মোটরটা বিক্রি করে ফেলতে হলো। তিন মাস ধরে ক্রমাগত লোকসান চলেছে। বাজারের ধার শোধ করতে হবে তো।'

'নগদ টাকাও শেষ হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ। নগদ বেশি ছিলো না। বৌ—' বলিয়া ধীরাজ থামিয়া গেল।

চকিতে তাহার পানে চাহিলাম—'বৌ কোথায়?'

ধীরাজ কুণ্ঠিত স্বরে বলিলো—'বৌ এখানে নেই। ব্যাঙ্কে জয়েণ্ট-অ্যাকাউণ্টে টাকা ছিলো, সে সব টাকা নিয়ে গেছে।'

'কোথায় গেছে? কদ্দিন গেছে?'

'মাস-তিনেক হলো। বোধহয় বোম্বাই গেছে।'

'বোধহয় বোম্বাই গেছে—তার মানে? তোকে কিছু বলে যায়নি?'

ধীরাজ চুপ করিয়া রহিলো। বুঝিলাম বৌ টাকাকড়ি হস্তগত করিয়া পলাইয়াছে। হয়তো মাড়োয়ারী নাগর সঙ্গে আছে।

মনটা নিষ্ঠুর হইয়া উঠিলো; বলিলাম—'কার সঙ্গে পালালো? মাড়োয়ারীর সঙ্গে?'

ধীরাজ আমার পানে একটা গুপ্ত কটাক্ষ হানিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলো; অস্পষ্টস্বরে বলিলো—'না না, তুই ভুল শুনেছিস। মাড়োয়ারী নয়। বৌ ইন্সিওরেন্সের কাজে গেছে, বম্বেতে ওদের হেড অফিস—'

'তুই এখন আছিস কোথায়?'

'বৌ-এর বাসাতেই আছি। বছরখানেকের ভাড়া আগাম দেওয়া ছিলো, এখনো ছ'মাসের মেয়াদ আছে।'

'তাই সেখানেই পড়ে আছিস্? তোর মতন বেহায়া দেখিনি। তুই যদি মানুষ হতিস্, বৌকে ডিভোর্স করতিস্।' বলিয়া আমি সবেগে পা চালাইলাম। রাগে আমার গা জ্বালা করিতেছিলো।

ধীরাজ কিন্তু আমার সঙ্গ ছাড়িলো না, সেও পা চালাইলো। কিছুদূর চলিবার পর হঠাৎ বলিলো—'আমাকে পাঁচশো টাকা ধার দিতে পারিস?'

প্রথমটা ধাঁধা লাগিয়া গিয়াছিলো, তাহার পর হাসিয়া উঠিলাম—'ও—এইজন্যে আমাকে মনে পড়েছে! টাকা ধার চাই! তা আমি কতো

মাইনে পাই তা তো জানিস্। পাঁচশো টাকা জলে ফেলে দেবার মতন অবস্থা আমার নয়।'

সে বলিলো—'বম্বে থেকে ফিরেই তোর টাকা শোধ করে দেবো।'

'বুঝেছি, বম্বে যাওয়ার জন্যে টাকা দরকার। বৌকে ফিরিয়ে আনবি। তা—ভালো কথা। কিন্তু আমি টাকা ধার দিতে যাবো কেন? আমার টাকা অতো সস্তা নয়।'

আমি আরো জোরে পা চালাইলাম। এবার ধীরাজ আমার সঙ্গে তাল রাখিবার চেষ্টা করিলো না, আস্তে-আস্তে পিছাইয়া পড়িলো। আমি কিছুদূর গিয়া ঘাড় ফিরাইলাম; সে ফুটপাথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া যেন কি চিন্তা করিতেছে। তাহার পর পিছু ফিরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলো।

বাসায় ফিরিতেই সুশীলবাবু ঘরে আসিয়া বসিলেন—'আপনার বন্ধু-পত্নীর নতুন খবর শুনেছেন?'

বলিলাম—'শুনেছি, বম্বে পালিয়েছে। খবর কিন্তু নতুন নয়, তিন মাসের পুরোনো।'

সুশীলবাবু একটু নিরাশ হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—'তা যেন শুনেছেন। কিন্তু কার সঙ্গে পালিয়েছে জানেন কি?'

'না। কার সঙ্গে?'

সুশীলবাবু বিজয়দর্পিত কণ্ঠে বলিলেন—'ওটাই তো আসল খবর। পালিয়েছে ধীরাজবাবুর ড্রাইভারের সঙ্গে!'

'ড্রাইভার! মানে মোটর-ড্রাইভার?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা ঝুঁটি-বাঁধা শিখ ছোঁড়া ছিলো, তার সঙ্গে ভেগেছে। গলায় দড়ি—গলায় দড়ি! একটা বাঙালী জুটলো না, শেষকালে শিখ! বাঙালীর মুখে চুনকালি পড়তে আর কী বাকি রইলো?'

উষা যদি শিখের বদলে বাঙালীর সঙ্গে পলাইত তাহা হইলে কিরূপে বাঙালীর গৌরববৃদ্ধি হইত বুঝিলাম না। যাহোক, সুশীলবাবু উষ্ণ ক্ষোভ প্রকাশ করিতে করিতে প্রস্থান করিলে আমি ধীরাজের কথাই ভাবিতে লাগিলাম। যে বৌ শিখ-ড্রাইভারের সঙ্গে কুলত্যাগ করিয়াছে, ধীরাজ তাহাকে খুঁজিতে যাইতেছে। যদি খুঁজিয়া পায় তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া

আনিবে। পতিব্রতা নারীর গল্প শুনিয়াছি, পঙ্গু স্বামীকে কাঁধে তুলিয়া বেশ্যালয়ে গিয়াছিলেন ; কিন্তু পুরুষ সম্বন্ধে এরূপ রূপকথা শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়িতেছে না। ধীরাজ একটা নূতন আদর্শ সৃষ্টি করিলো।

কিন্তু কেন? প্রেম? নিকষিত হেম? ইহাই যদি প্রেম হয় তবে ঝাড়ু মারি আমি প্রেমের মুখে।

মাস-তিনেক পরে সুশীলবাবুই আবার নূতন খবর আনিলেন। লোকটির সংবাদ সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা অসামান্য। কেন যে সংবাদপত্রের রিপোর্টার না হইয়া কেরানীগিরি করিতেছেন তাহা তিনিই জানেন। বলিলেন—'ধীরাজবাবু শিখ-ড্রাইভারের হাত ছাড়িয়ে বৌকে ফিরিয়ে এনেছেন, মনের সুখে ঘরকন্না করছেন।'

'তাই নাকি! অবস্থা কেমন?'

'অবস্থা খুবই উন্নত। কিন্তু শিখ-ড্রাইভারকে বোধহয় ফিরিয়ে আনেননি, এখন নিজেই মোটর হাঁকাচ্ছেন। আবার নতুন গাড়ি, কাঁচপোকার মতো রং!'

আমার বন্ধুর তালিকা হইতে ধীরাজের নাম কাটিয়া দিয়াছি। আমি যদি কোনদিন বিবাহ করি, পাড়া-গাঁ হইতে একটা হাবাগোবা মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করিবো। তথাপি যদি সে কাহারও সহিত পলায়ন করে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া আর একটা হাবাগোবা মেয়ে বিবাহ করিবো। আমার জীবনাদর্শের সহিত ধীরাজের জীবনাদর্শের কোনো মিল নাই।

মাসখানেক পরে একদিন ধীরাজ-দম্পতিকে স্বচক্ষে দর্শন করিলাম। সিনেমা দেখিতে গিয়াছিলাম, ছবি শেষ হইলে ভিড়ের মধ্যে গুঁতাগুঁতি করিতে করিতে পথে বাহির হইয়াছি, দেখি ধীরাজ একটা কাঁচপোকা-রঙের চকচকে নূতন গাড়িতে স্টীয়ারিং হুইলের পিছনে উঠিয়া বসিলো, তাহার স্ত্রী পাশে বসিলো। ধীরাজের চেহারা এবং বেশভূষায় আবার লক্ষ্মীশ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাঁচপোকা-রঙের মোটর মোলায়েম সুরে হর্ন বাজাইয়া চলিয়া গেল। আমাকে বোধহয় দেখিতে পায় নাই।

ইহার পর আরো দেড় বছর কাটিয়া গিয়াছে, ধীরাজকে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। সে বালিগঞ্জে বাড়ি কিনিলো কিনা খবর রাখি নাই। সুশীল-

বাবুর অনুসন্ধিৎসাও আর নাই, মেসে ধীরাজকে লইয়া ঠাট্টা-তামাসাও থামিয়া গিয়াছে। একই কেচ্ছা লইয়া মানুষ কতকাল ঘাঁটাঘাঁটি করিতে পারে? অনেক নূতন কেচ্ছা আসিয়া পুরাতনকে স্থানচ্যুত করিয়াছে।

এক রবিবার দিন দুপুরবেলা দিবানিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া দেখি ধীরাজ তক্তপোশের পাশে বসিয়া আছে। আবার সেই পুনর্মূষিক অবস্থা। বেশবাস অপরিচ্ছন্ন, চুলে তেল নাই, মুখ শুষ্ক।

কোনো কথা না বলিয়া উঠিয়া গেলাম। চোখে-মুখে জল দিয়া আসিয়া তাহার পাশে বসিলাম।

'কী, আবার বৌ পালিয়েছে! কিন্তু এবার কার সঙ্গে পালালো? গুজরাতী না মাদ্রাজী?'

সে উত্তর দিলো না, মুখখানা কেমনধারা করিয়া বসিয়া রহিলো। বলিলাম—'তা মুখ বুজে বসে থাকলে কি হবে, কোমর বেঁধে বেরিয়ে পড়্, বৌকে খুঁজে ঘরে নিয়ে আয়। আমি কিন্তু টাকা ধার দিতে পারবো না।'

ধীরাজ আস্তে-আস্তে বলিলো—'উষা কলকাতাতেই আছে…তাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু এলো না—' পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া আমার হাতে দিলো।

কাগজের ভাঁজ খুলিয়া দেখিলাম, তাহাতে মেয়েলি অক্ষরে লেখা আছে—'তোমার সঙ্গে আমার পোষাচ্ছে না, আমি আর একজনের সঙ্গে চললাম। তুমি এই চিঠির জোরে ডিভোর্স নিতে পার। —উষা'

চিঠি ফিরত দিয়া বলিলাম—'তবে তো রাস্তা খোলা। কার সঙ্গে পালিয়েছে?'

ধীরাজ পূর্ববৎ ম্রিয়মাণ স্বরে বলিলো—'সিরাজ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, তার ছেলের বাড়িতে আছে। বাড়ির ফটকে দারোয়ানের পাহারা, আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে না।'

'তাহলে আবার বৌকে ফিরিয়ে আনতে চাস্! ধন্যি তুই। ধন্যি তোর ভালোবাসা!'

সে ক্লান্তস্বরে বলিলো—'তুই সবই ভুল বুঝেছিস। ভালোবাসা নয়। কিন্তু যাক। আমাকে পুরোনো চাকরিটা আবার জুটিয়ে দিতে

পারিস? টাকাকড়ি সব গেছে, বাসাটাও হপ্তাখানেকের মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে।'

বলিলাম—'চাকরি খোয়ানো যতো সহজ, জোটানো ততো সহজ নয়। চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'দেখিস। বাক্স-বিছানা সব আছে তো? আচ্ছা, আজ উঠি, কাল দেখা করবো।—উষা বড়ো পয়মন্ত ছিলো।'

চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরাজ চলিয়া গেল।

পরদিন বিকালে অফিস হইতে বাহির হইয়া দেখি ধীরাজ ল্যাম্প্‌পোস্টে ঠেস্‌ দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে দেখিয়া মুখে হাসি আনিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। ধীরাজের জীবন-প্রহসন যে এমন ট্র্যাজিক্‌ সুরে পরিসমাপ্তি লাভ করিবে তাহা কল্পনা করিতে পারি নাই।

সবেমাত্র অফিস-আদালতের ছুটি হইয়াছে, রাস্তা দিয়া বাস ও মোটরের উদ্দাম স্রোত বহিয়া যাইতেছে। আমি ফুটপাথে তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছি, হঠাৎ রাস্তায় একটা বিশেষ রকমের মোটর-হর্নের আওয়াজ শুনিয়া ধীরাজ তীরবিদ্ধের ন্যায় ঘুরিয়া দাঁড়াইলো। তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড মোটর-গাড়ি মন্থরগতিতে যাইতেছে; গাড়িতে বিলাতী বেশধারী মালিক-চালকের পাশে বসিয়া আছে ধীরাজের স্ত্রী উষা। তাহাদের গাড়ি আমাদের ছাড়াইয়া কিছুদূর গিয়াছে, ধীরাজ চীৎকার করিয়া ফুটপাথ হইতে রাস্তায় নামিয়া গাড়ির পিছন-পিছন ছুটিলো। তাহার পর—

বিকাল সাড়ে-পাঁচটার সময় সদর রাস্তা দিয়া পাগলের মতো ছুটিলে যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাই ঘটিলো।

একটা দ্রুতগামী বাস তাহাকে ধাক্কা দিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিলো, বিপরীত দিক হইতে অন্য একটা বাস তাহাকে মাড়াইয়া চলিয়া গেল।—

ধীরাজের মনস্তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করি। সে বলিয়াছিলো—ভালোবাসা

নয়। তবে কী? সে বুদ্ধিমান এবং অলস প্রকৃতির মানুষ ছিলো! তাহার মনে টাকার ক্ষুধা ছিলো ভোগ-বিলাসের লোভ ছিলো। বিবাহের পর তাহার কপাল খুলিয়াছিলো; আবার বৌ পলাইবার সঙ্গে-সঙ্গে অবস্থার দারুণ অবনতি হইয়াছিলো। ধীরাজের বিশ্বাস জন্মিয়াছিলো—বৌ তাহার ভাগ্যদাত্রী; তাই সে প্রাণপণে নষ্ট-চরিত্র স্ত্রীকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলো। ইহাই কি তাহার মনস্তত্ত্ব? এ-ছাড়া আর কি হইতে পারে? কিংবা—হয়তো—

উষা পাঠক ধীরাজকে কেন বিবাহ করিয়াছিলো সে-রহস্য আমি ভেদ করিতে পারি নাই। স্বৈরিণী নারীর মন বোঝা আমার কর্ম নহে। তবে উষা যে ভাগ্যবতী নারী তাহাতে সন্দেহ নাই! ধীরাজের জীবন-বীমার পঞ্চাশ হাজার টাকা সে পাইয়াছে।

উলু

মনোজ বসু

উলু! উলু! উলু!

মেয়েরা উলু দিতেছে। শিবনাথেরও যেন নবযৌবন ফিরিয়া আসিলো। বৈঠকখানা পার হইয়া একেবারে লাফাইতে-লাফাইতে তিনি তাহাদের মধ্যে গিয়া পড়িলেন।

'ও কি হচ্ছে? ওরে শালীরা, একি লগ্ন-পত্তোর হচ্ছে—না, পাকা দেখা?'

মেয়েরা হারিবার পাত্র নহে। কমলা মুখ ঘুরাইয়া বলিলো, 'তার চেয়ে বেশি, দাহ! শুভদৃষ্টি হচ্ছে। বর ঐ চার-চোখে তাকিয়ে-তাকিয়ে মেয়ের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিচ্ছে। নাম ভাঁড়িয়ে কি আর আমাদের চোখে ধূলো দেওয়া যায়?'

পরাস্ত হইয়া শিবনাথ তখন বলিলেন, 'দে, তবে খুব করে উলু দে। এ ভাঙা ঘরে দশ বছর তো হয়নি ও-পাট!'

বলিয়া হাসিতে গিয়া বুড়া চোখ মুছিলেন।

দশ বছর আগেকার সে ঘটনা মনে পড়িলে চোখে জল আসিবার কথা বটে। শিবনাথের একমাত্র ছেলে সন্যাসী হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। ঘরে অতুল রূপ লইয়া পুত্রবধূ যোগিনী সাজিলো। গৌরী তখন বছর-পাঁচেকের, সেই গৌরীর বিয়ে, দিন-ক্ষণ সমস্ত স্থির, টাকাকড়ির কিছু অগ্রিম লেন-দেন হইয়া গিয়াছে। আজ হঠাৎ বরের কয়জন বন্ধু মেয়ে দেখিতে আসিয়াছেন। এবং উহাদের মধ্যে বর নাকি আসেন নাই, তিনি কিছুতেই আসিলেন না, তাঁর নাকি ভয়ানক লজ্জা—ইত্যাদি ইত্যাদি।

অন্দর হইতে শিবনাথ পুনশ্চ বৈঠকখানায় গিয়া দাঁড়াইলেন।

উলু

ওদিকে তখন মহা মুশকিল, মেয়ে কিছুতেই মুখ তুলিবে না। শিবনাথ মিনতি করিতে আসিলেন, 'ও গরবী দিদি, কথা শোন্, কিসের এতো লজ্জা? আচ্ছা, আমার দিকে চা দিকি—'

এতো পীড়াপীড়ি—গৌরীর ফর্সা মুখ একেবারে রাঙা হইয়া গিয়াছে, মেয়ে ঘামিয়া খুন। চেষ্টা-চরিত্র করিয়া এক-একবার মুখ তুলিতে যায়, খানিক উঠিয়া আবার নত হইয়া পড়ে, মুখ সে কিছুতে তুলিতে পারিলো না।

বন্ধুরা সদয় হইয়া বলিলো, 'থাক্, থাক্, ঐ হয়েছে—'

শিবনাথ হাসিয়া বলিলেন, 'বড্ড লজ্জা। আজকালকার মেয়ের মতো নয়। এই বুড়োর সঙ্গে থেকে-থেকে একেবারে যেন আদ্দিকালের বুড়ী হয়ে উঠেছে।' তাহার পর সকলের পিছনের চশমা-চোখে নিতান্ত গোবেচারা গোছের ছেলেটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'তোমাকে একটু উঠতে হবে, দাদা।'

বুড়ার কথায় যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে—আগন্তুকেরা সকলেই এমনিভাবে তাকাইলো।

শিবনাথ বলিলেন, 'মানে, আমার ছোটো মেয়ে কালই এখান থেকে চলে যাচ্ছে জামায়ের সঙ্গে সিমলা পাহাড়ে। বিয়ের সময়ে থাকতে পারবে না, সে একবার একটু ভালো করে দেখতে চায়।'

নিশিকান্ত মল্লিক মহাশয় ও-পাড়ার একজন মাতব্বর ব্যক্তি। তিনি আসিয়াছিলেন। হাসিয়া বলিলেন, 'পাত্র কনে দেখতে এসেছে, আর পাত্রী বুঝি বর না দেখে ছেড়ে দেবে!'

বন্ধুরা তুমুল আপত্তি করিতে লাগিলো।

'বললাম তো—পাত্র আমাদের মধ্যে নেই। আমরা কি মিছে কথা বলছি মশাই?'

'সে আমরা বুঝলাম। কিন্তু ওরা যে শোনে না।' শিবনাথ নেপথ্যের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'ওরা ঐ ওঁকে পাঠিয়ে দিতে বলছে।'

বন্ধুরা চোখ টেপাটেপি করিতে লাগিলো, এবং তাদের দিকে করুণ অসহায় দৃষ্টি ফেলিয়া চশমাধারী উঠিলো।

অন্দরে মহা সোরগোল।

'ও গৌরী, শীগগির আয়, দেখ্ এসে। কোথায় গেলি হতভাগী, বর পছন্দ করবি আয়—'

মেয়ে তো আর এক-আধটি নয়, পনোরো-বিশ কি তারও বেশি হবে। নানা বয়সের। তাদের মধ্যে পড়িয়া সভয়ে ছেলেটি বলিলো, 'আজ্ঞে, আমি বর নই—'

'সে হচ্ছে। আস্তিনটা তোলো দিকি।'

দেখিতে ভাল মানুষ হইলে কি হয়, আসলে কিন্তু ছেলেটি মোটেই সে-রকম নহে, অধিকতর ভয়ের ভঙ্গি করিয়া বলিলো, 'আজ্ঞে না। আস্তিন গুটিয়ে কি হবে?' দৃষ্টিটা ছিলো বিশেষ করিয়া খুব স্থূলকায়া একজনের দিকে। বলিলো, 'আপনাদের সঙ্গে পেরে উঠবো না, আমি আপোষে হার মানছি।'

সুধা আগাইয়া আসিয়া বলিলো, 'উনি কে—জানো?'

'না—'

তোমারই বউয়ের ছোটো পিসি। তাহলে তোমারও পিসি হলেন। উনি তোমায় দেখতে চেয়েছিলেন।'

ছেলেটি মনে-মনে জিভ কাটিলো। সুধা তখন আস্তে আস্তে তাহার হাতের জামা সরাইয়া দিয়া বলিলো, 'এই যে—জতুক রয়েছে। ও জুয়োচোর, তুমি ঢাকলে কি হয়? ঘটক যে ফাঁস করে দিয়েছে। তোমার চোখে চশমা, হাতে জতুক, নাম নবনী। মিথ্যে নাম বলবার শাস্তি এবার কি হবে বলো তো?'

হাতে-হাতে ধরা পড়িয়া নবনীর আর কথা বলিবার জো রহিলো না। বিজয়ীর দল তখন শাসাইতে লাগিলো, 'শাস্তি দেবার জনকে ডাকছি এখনি। দেখো, তোমার কি হয়। গৌরী—গৌরী!'

ভাঙাচোরা অতি পুরানো প্রকাণ্ড দালান। তাহারই মধ্যে পাথরের মতো ভারী কালো হাঙর-মুখো খাটের উপর গদি ও সেকেলে জাজিম পড়িয়াছে। বর সেইখানে শাস্তির প্রত্যাশায় বসিয়া রহিলো। কিন্তু কোথায় গৌরী?

পাতি-পাতি করিয়া এ-ঘর ও-ঘর সমস্ত খোঁজ হইলো। এক

উলু

জায়গায় বালিশ বিছানা গাদা করা, দুষ্ট মেয়ে করিয়াছে কি—একদম তার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, ধরিবে কাহারো সাধ্য কি! সকলে খুঁজিয়া মরে—সে এক-একবার মুখ বাড়াইয়া চোখ মিটি-মিটি করিয়া মজা দেখে, কাছাকাছি কেহ আসিলে তখনই আবার লুকাইয়া পড়ে। কিন্তু একবার কেমন একটু অসাবধানে গোটা-তিন-চার বালিশ দুমদাম করিয়া মেজেয় পড়িয়া গেল। আর রক্ষা আছে! ধরিয়া ফেলিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে তাকে লইয়া চলিলো।

ঝুম-ঝুম-ঝুম পায়ের তোড়া বাজিতেছে। প্রায় দোরের গোড়া অবধি পৌঁছিয়াছে, নবনী তখন যুক্ত-করে কাতর হইয়া কহিলো, 'আমার অন্যায় হয়েছিলো, মাপ করুন।'

কিন্তু ততক্ষণে মেয়ে আসিয়া লজ্জিত মুখে মেজে লইয়াছে।

ছোটো পিসি হাসিয়া ডাক দিলেন, 'ধুলোয় বসিস্‌নে। উঠে আয় খাটের ওপর।'

কমলা কহিলো, 'ইস, পোড়ারমুখী লজ্জায় আর বাঁচেন না! মনে না ধরে, দাদুকে বল্। এখনো সময় আছে।'

অনেক জোর-জবরদস্তি করিয়াও মেয়েকে উঠানো গেল না। তখন ছোটো পিসি বরের হাত ধরিয়া বলিলেন, 'তুমি বাবা, তবে একটু নিচে নেমে এসো। আমার বড়ো সাধ একটু পাশাপাশি বসিয়ে দেখে যাই।'

শিহরিয়া নবনী বলিলো, 'না—না।'

সুধা বলিলো, 'আপত্তিটা কি ভাই? দু'দিন আগে আর পরে। পিসিমা এতো করে বলছেন। ওতে কোনো দোষ নেই। এসো—'

অবশেষে উঠিতেই হইলো। সকলে জোর করিয়া গৌরীকে নবনীর পাশে বসাইয়া দিলো। দু'টিতে অপরূপ মানাইয়াছে। কে বেশি ভালো, তুলনা করিয়া বলিবার জো নাই। দৃষ্টি আর ফিরানো যায় না।

ছোটো পিসির চোখ ছলছল করিয়া উঠিলো। এমন রাজ-রাজেশ্বরী মেয়ের বাপ না-জানি কোন্ দূর-দেশে ছাই-ভস্ম মাখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! গাঢ়স্বরে বলিলেন, 'চিরজীবী হও তোমরা।' দু'জনের চিবুকে হাত ঠেকাইয়া আশীর্বাদ করিলেন।

বর ধীরে-ধীরে উঠিয়া আবার খাটের উপর গিয়া বসিলো। ছোটো পিসি পাখা লইয়া বাতাস করিতে করিতে সাগ্রহে নবনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন দেখলে বলো, বাবা।' আমি একবার কানে শুনে যাই। দেখতে তো পাবো না।'

'ভালো।'

সুধা রাগিয়া উঠিলো, 'শুধু ভালো? ইঃ, নিজের একটুখানি কটা চামড়া আছে কিনা—সেই দেমাকে বাঁচেন না! মেয়ে তো তোমরা ডজন-ডজন দেখেছো, শুনলাম। এমনটি আর দেখেছো কোথাও?'

মুখ টিপিয়া নবনী বলিলো 'কিন্তু দোষও আছে—'

ছোটো পিসি শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন' 'কি দোষ, বাবা?'

'আপনি কেন? আপনি চলে যান, পিসিমা। আমি আর-সকলের সঙ্গে কথা বলছি।' বলিয়া সেই আর-সকলের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলো, 'ঐ গৌরী-টৌরী—সত্যযুগের নাম চলবে না। নাম বদলাতে হবে।'

'এই?' চলিয়া যাইতে বলিলেও ছোটো পিসি এক-পা নড়েন নাই। এতক্ষণে তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। বলিলেন, 'তোমাদের যে রকম খুশি—বিয়ের সময় সেই নাম দিয়ে নিও। ও তো আজকাল হচ্ছেই। ঐ যে হালদারদের পট্‌লি, বিয়ের সময় তার নাম হয়ে গেল সুলেখা দেবী।'

সকলেই খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলো।

বর তখন চুপি-চুপি কহিলো, 'বন্ধুরা সবাই বলছিলেন, নামটা মীরা হলেই যেন—'

'মীরা? মীরাবাঈ?' কমলা একেবারে হাততালি দিয়া নাচিয়া উঠিলো। বলিলো, 'কিন্তু আমাদেরও একটা আপত্তি আছে, বরমশাই।'

বর সপ্রশ্নভাবে চাহিলো।

কমলা বলিতে লাগিলো, 'তোমারও নাম ঐ নবনী-টবনী চলবে না, ভাই। তোমারও নাম হবে কুম্ভ সিং।'

সুধা টিপ্পনী কাটিলো, 'শূন্য কুম্ভ। যে রকম বক-বক করে।'

'যে আজ্ঞে,' বলিয়া বর তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে ঘাড় নোয়াইলো। উলু

কমলা বলিলো, 'আরও আছে—'

'হুকুম হোক।'

'পাল্কী চেপে বিয়ে করতে আসা চলবে না।'

নবীন বলিলো, 'পাল্কী হবে না। নৌকোর ব্যবস্থা হয়েছে।'

'উঁহু, তাও চলবে না।' হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কমলা বলিলো, 'ঘোড়ায় চড়ে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে আসতে হবে! মশাল জ্বলবে, জয়ঢাক বাজবে, মাথায় উষ্ণীষ ঝলমল্ করবে—'

'কিন্তু আমি সে রাজসজ্জা দেখতে পাবো না!' ছোটো পিসির মুখ-ভরা আনন্দ-দীপ্তির মধ্যে আবার অশ্রু চকচক্ করিয়া উঠিলো। বলিলেন, 'যাই হোক বাবা, গৌরীকে তুমি আদর-যত্ন করবে। বড্ড অভিমানী। বাপ থেকেও নেই, হতভাগী বড্ড ভালোবাসার কাঙাল।'

বর ও বরের বন্ধুরা চলিয়া গিয়াছে। মেয়েরা ধুপধাপ বাহিরের ঘরে আসিয়া কলকণ্ঠে শিবনাথের সম্বর্ধনা করিলো।

'চমৎকার! সত্যি দাদু, তোমার পছন্দ আছে। এ মাণিক কোথা থেকে খুঁজে-পেতে আনলে?'

কিন্তু উহাদের বয়স এমনি, সোজা কথাটারও বাঁকা মানে হইয়া যায়। শিবনাথ বলিলেন, 'ঠাট্টা করছিস্?'

নিশিকান্ত মল্লিক তখনো বসিয়া গুড়গুড়ি টানিতেছিলেন। নল ফেলিয়া উৎসাহেরপ্রাবল্যে খাড়া হইয়া বসিয়া বলিলেন, 'ঠিক ধরেছিস সব। কেবল রাঙা-মূলো, ভেতরে কিছু না। আমি তাই বলছিলাম দাদাকে।'

ছোটো পিসি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, 'না মল্লিক মশায়, তা কেন? আলাপে ব্যবহারে বিদ্যেয় চেহারায় ছেলে একেবারে হীরের টুকরো।'

'হা-হা-হা' করিয়া প্রবল হাসির চোটে বক্তব্যের শেষটা মল্লিক উড়াইয়া দিলেন। বলিলেন, 'এদিকে ভাঁড়ে যে মা ভবানী—এক কাঠা জমাজমি নেই, ঘরে ছুঁচোয় তে-রাত্তির করে—সে খবর জানিস?'

শিবনাথ দুঃখিত স্বরে কহিলেন, 'কিন্তু সর্বাঙ্গসুন্দর পাই-বা কোথায়?'

স্থধার মুখে কিছু আটকায় না। তৎক্ষণাৎ কহিলো, 'কেন, এই মল্লিমশায়! ঘরদোর বিষয়-সম্পত্তি, নাতিপুতি বিয়ের সঙ্গে-সঙ্গে এমন কোথায় মিলবে?'

'যাঃ, ফাজিল!' বলিয়া শিবনাথ তাড়া দিয়া উঠিলেন। হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, 'তাহলে পছন্দ হয়েছে তোদের? যাক, বাঁচলাম। ও যে আমার কতো সাধের গরবিনী—ঐ দুর্গা-প্রতিমা কি যার-তার হাতে দিতে পারি?'

কমলা বলিলো, 'তুমি তো শিব-ঠাকুর আছো দাহু, অন্যের হাতে দিতে গেলে কেন?'

'চেষ্টার কি কসুর করেছি? মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়, বলে—বুড়ো। কিছুতেই রাজী হয় না।....ও কে রে? ও গৌরী, ও গরবী, ও গরবিনী, এদিকে এসো। বলে যাও, বর পছন্দ হলো কিনা!'

গৌরী জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলো। ঝুম-ঝুম করিয়া তোড়া বাজাইয়া পলাইয়া গেল।

বিয়ের দিন। সেই ভাঙা বাড়ির চেহারা বদলাইয়াছে, জঙ্গল একদম নাই, বৈঠকখানার ইঁট-বাহির-করা দেওয়ালের উপর লাল-নীল কাগজ আঁটা হইয়াছে। ভিতরের উঠানে মস্ত সামিয়ানা ফুল দেবদারুপাতা দিয়া বিবাহ-আসর সাজানো। সকাল হইতে ঢোল আর কাঁসি পাড়া সরগরম করিয়া তুলিয়াছে।

শিবনাথ অন্দরে আসিয়া ঘন-ঘন তত্ত্ব লইতেছেন।

'আহা, দিদির আমার মুখ শুকিয়ে গেছে। একটু দুধ খেতে দাও। ওতে কিছু দোষ হবে না। দাও বউমা, দাও।'

মেয়ের মা'র যদি বা একটু মন নরম হয়—কিন্তু এই বিয়ে উপলক্ষে শিবনাথের ছোটো বোন আসিয়াছে, নাম কাদম্বিনী, তাঁর একেবারে ধনুক-ভাঙা পণ, যা বিধি আছে একচুল তার এদিক-ওদিক হইবে না! একদিন না খাইলে কেহ আর মরিয়া যায় না।

উলু

বড়ো সুন্দর পিঁড়ি-চিত্র করা হইয়াছে ; আলপনার বড়ো পদ্মটি যেন সত্য-সত্যই একটি শ্বেতপদ্ম হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। শিবনাথ মহা আনন্দে চেঁচাইয়া বাড়ি মাৎ করিতে লাগিলেন।

'ও দিদি, কোথায় পালালি গো ? এদিকে আয়।'

'কি দাদু ?'

'আয়। ঐ পদ্মটার ওপর কমলে-কামিনী হয়ে একবার দাঁড়া দিদি, আমি দেখি।'

'যাঃ—' বলিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছিলো গৌরী, এবারে মা আসিয়া হাত ধরিলেন। তাঁরও যেন ঐ ইচ্ছা। আনন্দদীপ্ত মুখে বলিলেন, 'বস্ না একটু—বাবা বলছেন।'

গৌরীর তবু লজ্জা। এক একবার মুখ তোলে, চোখাচোখি হইলেই হাসিয়া ঘাড় নামায়। তারপর অনেক সাধ্য-সাধনায় এক-পা এক-পা করিয়া পিঁড়ির উপর ধপ করিয়া বসিয়া পড়িলো। সেই মুহূর্তেই আবার উঠিয়া দৌড়। দৌড়—দৌড়। মেয়ে আর ত্রিসীমানায় নাই। আর ছেলেমানুষ শিবনাথও পাকা দাড়ি দোলাইয়া পিছন-পিছন ছুটিলেন।

'ধর্ ধর্—'

লগ্ন দুইটি—একটি সন্ধ্যার পর, আর একটি মধ্য-রাত্রের দিকে। সন্ধ্যার লগ্নেই শুভকার্য চুকিয়া যায়, সকলের সেই ইচ্ছা। বাড়িতে মানুষ-জন নাই। কুটুম্বের মধ্যে আসিয়াছে ঐ এক কাদম্বিনী, পাড়ার লোক ধরিয়া কাজকর্ম খাওয়ানো-দাওয়ানো সমস্ত করিতে হইতেছে ; কাজেই সকাল-সকাল হইয়া গেলে সবদিকে সুবিধা বরপক্ষকে বারবার এই কথাটা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অন্ধকার বেশ ঘোর হইয়া আসিতে মশালের বোঝা লইয়া কদমতলার ঘাটে জনাকয়েক গিয়া দাঁড়াইলো।

একটু পরেই রায়গঞ্জের বাঁকের দিক দিয়া ঢোলের আওয়াজ শুনিতে পাওয়া গেল। শিবনাথ কোমরে গামছা বাঁধিয়া কাজকর্মের তদারকে ব্যস্ত ছিলেন, দূরের সেই ঢোলের বাদ্যে তাঁহার বুকের মধ্যে গুর-গুর্ করিয়া উঠিলো। এ-পক্ষের ঢুলিরা সারা-পাড়া মেয়েদের সঙ্গে-সঙ্গে জল-সইয়া

ঘুরিয়া এখন বসিয়া-বসিয়া চিঁড়া ও নারিকেল-সন্দেশ চিবাইতেছিলো। শিবনাথ তাহাদের উপর গিয়া রুখিয়া পড়িলেন, 'ওরে বেটারা, হাত-পা কোলে করে বসে রইলি—ওরা যে এসে পড়লো। জবাব দিবিনে? জিততে পারলে গামছা বকশিস একখানা করে!'

'গুড়-গুড়-গুড়-গুড়'—বীরদর্পে ঢোলে কাঠি দিয়া দিতে এদিককার বাজনদারেরা উঠিয়া পড়িলো। শিবনাথ আর সেখানে নাই। চরকির মতো এদিক-ওদিক ঘুরিতে-ঘুরিতে অবশেষে কনের ঘরে গিয়া দাঁড়াইলেন। চন্দন-আঁকা মুখ, লাল চেলি-পরা, শুভ্র-অঙ্গে সোনার গহনা ঝিকমিক্ করিতেছে। আদর করিয়া মুখখানি তুলিয়া ধরিতে ঝরঝর্ করিয়া এক-রাশ চোখের জল ঝরিয়া পড়িলো শিবনাথের। বলিলেন, 'ও দিদি, নতুন বর পেয়ে বুড়োকে মনে থাকবে তো?'

গৌরীর বড়ো ইচ্ছা করিতে লাগিলো, দাহুর চোখ মুছাইয়া দেয়। কিন্তু সাহস হইলো না। সুধা, মিনু, কমলারা সব নানাদিকে রহিয়াছে। যে শত্রুপুরীতে বাস, ফাঁক পাইলে কেউ আজ রেহাই দিবে না।

সদর-বাড়িতে এদিকে তুমুল কাণ্ড। লোকে লোকারণ্য। ফটকের এ-ধারে রাস্তার দিকে মুখ করিয়া কন্যাপক্ষের ঢুলি ও কাঁসিদারেরা। ওদিককার ঢুলির দল তাদের সামনে মুখোমুখি যুদ্ধভঙ্গিতে আসিয়া দাঁড়াইলো। তেজী ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকাইয়া সুপুষ্ট পেশীবহুল হাত ঝাঁকাইয়া তারা ঢোলে ঘা দিতেছে, মুখে বলিয়া সেই বোলগুলি অবিকল ঢোল ও কাঁসির মধ্য দিয়া আদায় করিতেছে; ভিড়ের মধ্য হইতে বাহবা আসিতেছে। বরের ঢোলে হাঁকিলো—

কোথায় কনে—কুলো ব্যাঙ?

অমনি তুই ফেরতা দিয়া কন্যাপক্ষের জবাব—

ঘরের কনে দেবো ক্যান্? ঘরের কনে দেবো ক্যান্?

তির্যগ্‌গতিতে অমনি পাঁচ-সাত পা ছুটিয়া আসিয়া বরের ঢুলি কাঠি দিতে লাগিলো—

না দিবি তো এলাম ক্যান্? না দিবি তো ভাঙবো ঠ্যাং—
ভাঙবো ঠ্যাং—ভাঙবো ঠ্যাং!

উলু

হঠাৎ ইহার মধ্যে শিবনাথের চিৎকারে রসভঙ্গ হইলো।

'বর কই?'

বরের বাপ নাই, জ্ঞাতিসম্পর্কের এক কাকা বর-কর্তা। আগাইয়া আসিয়া তিনি বলিলেন, 'এই এসে পড়লো বলে। পেছনের নৌকোয় আসছে। বরযাত্রীরা প্রায় সব এসে গেছেন।'

নিশিকান্ত মল্লিক মহাশয়ের উপর ভাঁড়ারের ভার। বর দেখিতে তিনিও আসিয়াছিলেন। বলিলেন, 'আচ্ছা কাণ্ড! বিয়ে যেন আপনাদের মশায়। গ্রামের মানুষ সব ভেঙে এসেছে—ছাদের উপর, ঐ ওরা সব কি রকম তাকিয়ে। বাজনা-টাজনাগুলো বর আসা পর্যন্ত সবুর করতে হয়।'

বরকর্তা হাসিয়া উঠিয়া সগর্বে কহিলেন, 'এ হলো বরযাত্রীর বাজনা। বর এলে কি আর এই হবে? ইংরেজি-বাজনা মশায়, ইংরেজি-বাজনা। জয়ঢাক রয়েছে, জিলিপি-বাঁশী—বরের নৌকোয় আসছে সব। এ ঢোলের বাপ্তি-টাপ্তি উড়ে যাবে তার মধ্যে।'

বরযাত্রীরা আসন গ্রহণ করিলেন, কিন্তু ভিড় কমিলো না। বর ঐ আসে, ঐ আসে। নিঃশ্বাস নিরুদ্ধ করিয়া সকলে ফটকের দিকে চাহিয়া আছে। ক্রমশ চারিদিকে কেমন ঝিমাইয়া পড়িতে লাগিলো সবাই। প্রথম লগ্ন কাটিয়া গেল, ত্রিসীমানার মধ্যে ইংরেজি-বাজনার সাড়াশব্দ নাই।

গ্রামে মধু চক্রবর্তীর ঘোড়া আছে। ঘোড়ায় করিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দেওয়া হইলো, নদীর তীরে তীরে কুকশিমার ঘাট অবধি যাইবেন, যদি পথে বরের নৌকার দেখা পান।

ক্ষণপরে নিশিকান্ত বৈঠকখানায় আসিয়া বিনা ভূমিকায় বলিলেন, 'মশাইরা, গাত্রোত্থান করুন।'

বর-কর্তা এদিক-ওদিক তাকাইয়া বলিলেন, 'অর্থাৎ?'

হাসিয়া নিশিকান্ত বলিলেন, 'সে-সব কিছু নয়, মশায়; কাজকর্ম এগিয়ে রাখছি। উঠে পড়ুন।'

'কিন্তু ওরা না এসে পড়লে—সে কি রকম হবে!'

হঠাৎ তিনি অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'আর ঐ যে কথায়-কথায় ইংরেজি বলে, গোঁফ-কামানো, টেড়ি-কাটা ঐগুলোকে আমি দু'চক্ষে

দেখতে পারিনে, মশায়। ওরাই তো গোল বাধালো। বসে-বসে চা গিলছে, আর বললো—আপনারা রওনা হন, আমরা ছোটো নৌকোটায় চলে যাবো, কতক্ষণ আর লাগবে? নবনীকে বললাম, তুই আয়। ও বললো, কলকাতার বন্ধুদের ফেলে যাই কি করে? বেটারা ঠিক কুকশিমার হাটে বসে খিচুড়ি ভোজ লাগিয়েছে। আস্ত রাক্ষস এক একটা।' বলিয়া তিনি দলের সকলকে তুলিয়া আগাইয়া দিলেন, উঠিয়া গিয়া তাহারা ভোজনে বসিলেন।

বরযাত্রীদলের পরিতোষপূর্বক আহারে কোনো বাধা ঘটিলো না। তাহার পর একদল-তুইদল করিয়া গ্রামের নিমন্ত্রিত মেয়ে-পুরুষদের আহার-পর্বও সমাধা হইয়া গেল। তবুও কিন্তু বরের খোঁজ নাই!

বিয়ে-বাড়ি তখন একেবারে নিস্তব্ধ। পাড়ার সকলে তুই-একজন করিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন—আপাতত বাড়ি গিয়া একটু ঘুমাইয়া লওয়া যাক, ইংরেজি-বাজনা শুনিলেই তখন আসা যাইবে। বৈঠকখানায় বড়ো আলো নেভানো, মিটি-মিটি বাতি জ্বলিতেছে, বরযাত্রীদের নাসিকা-গর্জন ছাড়া কোনদিকে কোনো ধ্বনি নাই। অন্দরের উঠানে সাজানো বিয়ের আসরের খানিক দূরে মেয়ের মা আবছা-অন্ধকারে বসিয়া আছেন। আর শিবনাথ একবার ঘর একবার বাহির, কেবলই ছুটাছুটি করিতেছেন।

শেষ-লগ্নও উত্তীর্ণ হইয়া যায় এমনি সময়ে খটখট্ করিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া মধু চক্রবর্তী আসিয়া নামিলেন। ঘটক ত্রিলোকতারণ তাঁহার পিছন হইতে ভিজা কাপড়ে লাফাইয়া পড়িয়া হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলো। শিবনাথ ছুটিয়া আসিলেন, কাদম্বিনী আসিলেন, ওদিকে কোথায় ঝিনমিন্ গহনা বাজিয়া উঠিলো।

'কি? কি? কি?'

'নৌকোডুবি।'

চোখ মুছিতে-মুছিতে বৈঠকখানা হইতে বরের কাকা ছুটিয়া আসিলেন।

'সে কি, সর্বনাশ! ঝড় নেই, ঝাপটা নেই—'

ঘটক বলিলো, 'ভরতের দেউলের ঐখানটায় এসে বাবুরা সব একদিকে ঝুঁকে পড়লেন। কোটালের গাঙ, টানের মুখ—'

উলু

কাঁপিতে-কাঁপিতে শিবনাথ বলিলেন, 'নবনীধন ?'

ঘটক দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িয়াছে।

আর্ত আকুল চিৎকার করিয়া শিবনাথ কহিতে লাগিলেন, 'বর কোথায় ? বলো শিগগির—বলো—বলো—'

তাহার পর বজ্রাহতের মতো তিনিও সেইখানে বসিয়া পড়িলেন।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল।

কাদম্বিনী আসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'বসে থাকলে তো হবে না, দাদা। কপালের ভোগ। ওঠো।'

শিবনাথ ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া ছিলেন তাহার পর উঠিয়া সদর-বাড়ির দিকে চলিলেন। সেখানে অপরিসীম নিঃশব্দতা। আবছা-অন্ধকারের মধ্যে প্রকাণ্ড উঠানটির ভয়াবহ শূন্যতা যেন প্রেতপুরীর মতো লাগিতেছে। বৈঠকখানার বাতি জ্বলিতে-জ্বলিতে একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়াছে, দপ করিয়া তাহাও একসময় নিভিয়া গেল। শিবনাথ বসিয়া রহিলেন।

এমনি সময়ে ছায়ামূর্তির মতো মেয়ের মা'র হাত ধরিয়া কাদম্বিনী আসিয়া দাঁড়াইলেন। পুত্রবধূ কাঁদিয়া শ্বশুরের পায়ের উপর পড়িলেন। বলিলেন, 'ও বাবা, না খেয়ে না দেয়ে সাতরাজ্যি ঘুরে খুকীর আমার সোনার বর এনেছিলে—কোথায় গেল সে ? তাকে নিয়ে এসো।'

পলকহীন চোখ মেলা ছিলো, এইবার শিবনাথ চোখ বুজিলেন। চোখের কোণ দিয়া দরদর্‌ধারে জল গড়াইয়া পড়িতে লগিলো।

'চুপ করো বউমা, চুপ করো।' কাদম্বিনী আঁচল দিয়া নিজের চোখ মুছিলেন, বলিলেন, আভ্যুদয়িক হয়ে গেছে, ও মেয়ে তো ঘরে রাখা যাবে না, দাদা। ওঠো—'

মেয়ের মা আগুন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'কে তাড়ায় আমার মেয়েকে ? আমিও ঐ সঙ্গে বিদায় হবো তাহলে !'

কাদম্বিনী বলিলেন, 'অবুঝ হোস্‌নে বউমা, রাত পোহালে মেয়ে যে বিধবা হয়ে যাবে। তার চেয়ে রাতের মধ্যে একজনকে এনে—'

ভগ্নকণ্ঠে শিবনাথ বলিলেন, 'কাকে পাবো? সোনার প্রতিমা কার হাতে দেবো?' বলিয়া মাথায় হাত দিলেন।

'কিছু না-হলে তো হবে না—ওঠো।' হঠাৎ কাদম্বিনীর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। বলিলেন, 'ঐ নিশি মল্লিক। বউ মরবার পর দিনকতক উসখুস করেছিলো না? কাকে দিয়ে যেন একবার খবর পাঠিয়েছিলো, শুনেছিলাম।'

'অমন কাজ করো না পিসিমা, মেয়ে আমার আত্মহত্যা করবে।' মেয়ের মা আবার কান্নায় ভাঙিয়া পড়িলেন। বলিলেন, 'আমি যেমন ওকে জানি, কেউ তোমরা জানো না। ও আমার বড্ড অভিমানী।'

কাদম্বিনী বলিলেন, 'বউমা, অবুঝ হোস্‌নে। আর তো উপায় নেই। রাত শেষ হয়ে এলো। তুমি এসো দাদা—'

নিশিকান্ত মল্লিকের কর্তব্যজ্ঞান খুব প্রখর বলিতে হইবে। বিয়ে-বাড়িতে বাহিরের একটি মানুষও নাই। কেবলমাত্র তিনি যথারীতি ভাঁড়ার আগলাইয়া বসিয়া আছেন। শিবনাথকে লইয়া এক-রকম টানিতে-টানিতে কাদম্বিনী সেখানে উপস্থিত হইলেন।

প্রস্তাব শুনিয়া মল্লিক তো আকাশ হইতে পড়িলেন। সে কি! ইহা যে স্বপ্নেও ভাবিতে পারা যায় না। ঘর খালি করিয়া তিন তিন দফা ঘরের লক্ষ্মী বিদায় হইয়াছে, বুকের মধ্যে তাঁর যা হইয়া থাকে সে কথা আর বলিয়া কাজ কি! আবার সেখানে কোন্‌-মুখে আর একজনকে লইয়া বসানো যায়? ঘাড় নাড়িয়া দৃঢ়কণ্ঠে নিশিকান্ত বলিলেন, 'না, ও হবার জো নেই—'

কাদম্বিনী বলিলেন, 'না বললে হবে না, মল্লিকমশায়। ও-যে বিধিলিপি। গৌরী তোমার হাঁড়িতে চাল দিয়ে এসেছিলো—বিয়ে কি আর কোথাও হবার জো আছে। রাত শেষ হয়ে এলো। ওঠো—'

অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর নিশিকান্ত নরম হইলেন। শিবনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'কিন্তু সোনা-রুপো নগদ-টাকা—যা

উলু

সমস্ত দেওয়া হচ্ছিলো, তার এক-পাই এদিক-ওদিক হলে চলবে না। কতো ঝক্কি পোহাতে হবে—কতো লোকে কতো কি বলবে—বাড়িতে এক পাল ছেলেপুলে রয়েছে—বুঝে দেখুন ব্যাপারটা।'

চুক্তি সমাধা হইয়া গেলে ধাঁ করিয়া নিশিকান্ত কোমরের গামছা খুলিয়া হাত পা ধুইয়া পিঠের উপর কোঁচার খুট তুলিয়া সভ্য-ভব্য হইয়া বরাসনে বসিলেন। বলিলেন, 'বাড়িতে খবর দিয়ে কাজ নেই। পঙ্গপালগুলো এসে জুটবে, বাধা পড়ে যাবে। আমার তো ইচ্ছে ছিলো না। কি করি—তোমাদের এই মহাবিপদ!'

পুরুত-ঠাকুর চলে গেছেন, তাঁকে যে ডাকতে হবে।

শিবনাথ হতভম্বের মতো বসিয়া ছিলেন, তাঁহার গায়ে নাড়া দিয়া কাদম্বিনী বলিলেন, 'যাও না একবার—ও দাদা, ঠাকুরমশায়কে আর পাড়ার ওদের সব ডেকে নিয়ে এসো।'

নিশিকান্ত বাধা দিয়া উঠিলেন, 'না না—বাজে-লোক জুটিয়ে কাজ নেই। ওঁকে যেতে হবে না। আমি যাচ্ছি।'

উদ্যোগী পুরুষ। হ্যারিকেন জ্বালাইয়া নিজেই পুরোহিত ডাকিতে বাহির হইলেন।

ঢুলীরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলো, তাহাদের আর ডাকা হইলো না। রাত্রি শেষ প্রহর। নিঃশব্দে বিবাহের আয়োজন হইলো।

'গৌরী। গৌরী!'

গৌরী ঘুমায় নাই, জানালায় বসিয়া বাহিরের অন্ধকারে তাকাইয়া ছিলো। ঝুন-ঝুন্ করিয়া সে উঠিলো। শিবনাথ সজল কণ্ঠে বলিলেন, 'চলে আয় দিদি, সম্প্রদান হবে।'

ধীরে-ধীরে মেয়ে পিঁড়ির উপর বসিলো।

ফিস-ফিস করিয়া কাদম্বিনী বলিলেন, 'দেখলে বউ-মা? তুমি যে কতো ভয় করেছিলে, মেয়ে আত্মহত্যা করবে—হেন করবে, তেন করবে। সত্যি, বড্ড শান্ত মেয়ে।'

নিঃশব্দ অন্ধকারাচ্ছন্ন অতি বৃহৎ সেকেলে বাড়ি। দুইটি মাত্র লণ্ঠনের স্তিমিত আলো। মাথার উপরে নির্নিমেষ নক্ষত্রমণ্ডলী। হঠাৎ আলোর

শিখা কাঁপাইয়া হু-হু শব্দে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া বহিয়া গেল। পুরোহিতের দেহের প্রতি শিরায় কম্পন বহিলো। বলিলেন, 'নাও, হয়ে গেল এবার। বর-কনে ঘরে তোলো। এ কি-রকম কাণ্ড—এমন তো দেখিনি কখনো। একটা উলু পর্যন্ত দিতে পারলো না কেউ!'

কাদম্বিনী বলিলেন, 'ও বউ-মা, দাও না গো। আমি বিধবা মানুষ—আমায় যে দিতে নেই।'

শুভ বিবাহে উলু দেওয়া বিধি, এবং বিবাহক্ষেত্রে সধবা বলিতে ঐ এক মেয়ের মা। দু'তিনবার তিনি চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গলা যেন কাঠ হইয়া গিয়াছে। স্বর না ফুটিয়া চোখের জলে কাপড় ভিজিয়া যায়।

শিবনাথ নিস্তব্ধ পাথরের মতো বসিয়া ছিলেন—হঠাৎ মহা চেঁচামেচি শুরু করিলেন, 'কে আছিস—শাঁখ নিয়ে আয়। বাজনদার বেটারা বাজা এইবার বাজনা তোদের। দিদি আমার বিদেয় হয়ে গেল। ওগো বউ-মা, তুমি একটু উলু দাও—'

পুরোহিত বলিলেন, 'উলু দাও, শাঁখ বাজাও—মেয়ে-জামাইকে ঘরে তোলো।'

তবু চুপচাপ। হঠাৎ ইহার মধ্যে কি হইয়া গেল। সেই বিয়ের কনে—চন্দন ও অলঙ্কারে ভূষিতা চিরদিনকার সেই শান্ত লাজুক মেয়েটি অকস্মাৎ গুণ-ছেঁড়া ধনুকের মতো পিঁড়ির উপর খাড়া হইয়া দাঁড়াইলো। এক ঝটকায় চেলির ঘোমটা টানিয়া দূর করিয়া দিলো। বিদ্যুল্লতার মতো মুখখানি জ্বলিতেছে তাহার। উষাকালের শান্ত নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া বিমথিত করিয়া আরম্ভ করিলো, 'উলু—উলু—উলু—'

'ধর্ ধর্। ধরে বসা। তেল জল নিয়ে আয়, বাতাস কর্।' শিবনাথ আর্তনাদ করিয়া আসিয়া গৌরীকে ধরিলেন। পুরোহিত, কাদম্বিনী সকলেই ধরিলেন। ধরিয়া বসায় কাহার সাধ্য—মেয়ের গায়ে যেন অসুরের বল। কোনদিকে তাহার দৃষ্টি নাই, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই ভাঙা-বাড়ির প্রত্যেকটি অলিন্দ কাঁপাইয়া ক্রমাগত সে উলু দিতেছে, 'উলু—উলু—উলু—'

'ও গৌরী, মাগো আমার—'

উ

মা পাগলের মতো দুই হাতে সকলকে ঠেলিয়া সরাইয়া একেবারে মেয়ের মুখের কাছে মুখ লইয়া আসিলেন। বলিতে লাগিলেন, ওগো, তোমরা ধরে-বেঁধে আমার মাকে খুন করলে। আয় মা, তুই আর আমি চলে যাই—'

ধপাস করিয়া গৌরী সংজ্ঞাহারার মতো আবার পিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িলো।

এতো গোলমালের মধ্যেও বর কিন্তু অবিচল! আসন হইতে তিনি নড়েন নাই, এবং ইহাদের কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া মৃদু-মৃদু হাসিতেছিলেন। এইবার বিজয়ীর মতো মুখ করিয়া কাদম্বিনীকে কহিলেন, 'দেখলে তো দিদিমা, ঠাণ্ডা হয়ে বসলো কিনা! অনেক দেখা আছে, তোমার এ নাত-জামাই তো আজকের লোক নয়—'

সে বিষয়ে কারো সন্দেহ ছিলো না, কাদম্বিনীরও নয়। নিশি মল্লিক বলিতে লাগিলেন, 'এই কাজ করে চুল পাকিয়ে ফেললাম, জানতে কিছু বাকি আছে? সমস্তদিন খায়নি, তার ওপর এই রকম একটা গণ্ডগোল হয়ে গেল। ও অমন হয়েই থাকে। আর এই নিয়ে আপনারা কি-সব আরম্ভ করে দিলেন বলুন তো!'

মেয়ে তখন দিব্য জড়সড়ো হইয়া বসিয়াছে, ঠিক আগেকার মতো। এই মেয়েই যে একটু আগে এমন করিয়া উঠিয়াছিলো, ভাব দেখিয়া তিলমাত্র বুঝিবার জো নাই। ফুটফুটে সকাল হইয়া গিয়াছে। সকলে লজ্জিত হইয়া পড়িলো।

পুরুত বলিলেন, 'এক-পাক বাসরটা বেড়িয়ে এসো হে, মল্লিক; রীতিরক্ষে করতে হয়।'

'অনেক পাকই হয়ে গেছে ঠাকুরমশায়, এখন আমার অনেক কাজ—হেঁ হেঁ—'

মল্লিক দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া হাসিতে-হাসিতে গাঁটছড়া খুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শিবনাথের উদ্দেশে বলিলেন, 'একা মানুষ—জানেন তো, দাদামশায়। কিছু মনে করবেন না। এখনই বাড়ি গিয়ে বউ তোলবার ব্যবস্থা করতে হবে।'

দীর্ঘপদক্ষেপে নিশিকান্ত অদৃশ্য হইলেন। এবং বিকেলে পাল্কী

লইয়া আসিয়া বধূ বরশয্যা গহনা ও টাকাকড়ি দেখিয়া-শুনিয়া হিসাব করিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

কাদম্বিনীও সেইদিন চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পর চাকরটা কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে, ঝি নিচে শুইয়া। এ-ঘরে বুড়া দাদু আর ও-ঘরে মা আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িলেন।

অনেক রাত্রে খোলা-জানালার সামনে দেবদারু-ফল খাইতে বাদুড় ঝটাপটি লাগাইলো। মা'র ভয়-ভয় করিতে লাগিলো। উঠিয়া গিয়া খট্ করিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন।

ও-ঘর হইতে শ্বশুর প্রশ্ন করিলেন, 'বউ-মা জেগে আছো?'

'ঘুম আসছে না।'

'আমারও না। এসো, তাস খেলি।'

আলো লইয়া শ্বশুরের শয্যার একান্তে বধূ তাস লইয়া বসিলেন। তাস হাতে ধরিয়াই শিবনাথ ঝিমাইতে লাগিলেন।

বধূ বলিলেন, 'বাবা টেক্কা ঘুস দিলে যে!'

'ইস্, বড্ড ভুল হয়ে গেছে তো! হাত-দুই খেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'দুত্তোর, একি হয়? আমি বাপু, খেলা দেখতে পারি।'

ইহাদের অভ্যাস এই, অনেক রাত্রি অবধি মা ও গৌরী তাস খেলিতো। শিবনাথ বধূর দিকে জুত দিবার নাম করিয়া বসিয়া-বসিয়া ঝিমাইতেন। গৌরী বলিতো, 'ও দাদু, শুয়ে পড়ো না—'

অর্ধমুদ্রিত চোখ বড়ো-বড়ো করিয়া মেলিয়া হাসিয়া শিবনাথ বলিতেন, তোর ঘাড়ে পঞ্জা-ছক্কা না দিয়ে? ও বউ-মা, বসে বসে করছো কি?'

গভীর রাত্রে গৌরী ঘুমাইয়া পড়িতো, প্রকাণ্ড খাটের আর একধারে শিবনাথ ঘুমাইতেন। মা উঠিয়া আলো নিভাইয়া অন্য ঘরে চলিয়া যাইতেন।

শিবনাথ বলিতে লাগিলেন, 'গরবী-দিদি এমন আড্ডাটা ভেঙে দিয়ে গেল—আমার বড্ড রাগ হচ্ছে। আসুক সে একবার। আচ্ছা, সে এখন কি করছে—বলো দিকি বউ-মা?'

'ঘুমুচ্ছে আর কি। কাল সারা-রাত তো দু'পাতা এক করেনি।'

শিবনাথ যেন কতকটা সান্ত্বনার ভাবে কহিতে লাগিলেন, 'এক হিসেবে বর নিতান্ত মন্দ হয়নি। বাড়ি-ঘর, চাকর-চাকরানী, এলাক-পোশাক কোনো-কিছুর অভাব নেই। এক, বয়েসের দিক দিয়ে একটু— তা এর চেয়েও ঢের-ঢের বেশি বয়েসে মানুষে বিয়ে করছে!'

বধূ কিন্তু সায় দিতে পারিলেন না, চুপচাপ রহিলেন। শিবনাথ তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, 'কিছু বলছো না যে, বউ-মা?'

মৃদুস্বরে বধূ কহিলেন, 'কি আর হবে!'

শিবনাথ রুখিয়া উঠিলেন, 'কি হবে, মানে? ভেবে দেখো দিকি, মন্দটা কি! আমি তো বলি, ও নবনীধনের চেয়ে ভালোই হয়েছে। গরবী-দিদিও মনে-মনে বুঝে দেখেছে তাই। ভারী চালাক মেয়ে। আজকে কেমন ঠাণ্ডা হয়ে পাল্কীতে উঠে বসলো। আমি ভেবেছিলাম, কতো কাঁদা-কাটা করবে। একবার টু' শব্দটা করলো না!'

এক পক্ষেরই কথা চলিতেছে, বধূ নিরুত্তর।

নিঃশ্বাস ফেলিয়া শিবনাথ বলিতে লাগিলেন, 'যা ভয় হয়েছিলো আমার! তুমি দেখো বউ-মা, নিশি আমার দিদিকে কি-রকম যত্ন করবে। তিন-তিনটে বউ গিয়েছে, এবারে রাঙা বউ পেয়ে ধিন-ধিন করে কাঁধে তুলে নাচাবে। তুমি দেখো।'

বলিয়া নিজের রসিকতায় হা-হা করিয়া নিজেই হাসিয়া আকুল।

বধূ ধীরে-ধীরে উঠিয়া দোর ভেজাইয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

আরো কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে। আলো নিভিয়া ঘর অন্ধকার। ডাকা-ডাকিতে শিবনাথের ঘুম ভাঙিয়া গেল। বধূ পা ধরিয়া নাড়িতেছেন আর ডাকিতেছেন, 'বাবা বাবা!'

শিবনাথ তাড়াতাড়ি লাফাইয়া উঠিলেন।

'শুনতে পাচ্ছো?'

'কি ?'

হাত ধরিয়া এক-রকম টানিয়া শ্বশুরকে বধূ নিজের ঘরে জানালার দেবদারু গাছের কাছে লইয়া আসিলেন।

'শুনতে পাচ্ছো না, ঐ কে যেন উলু দিচ্ছে ?'

শিবনাথ বলিলেন, 'না তো—'

'শোনো। মা আমার এসেছে—ঢুকতে পারছে না, বাইরে বাড়ির ফটকের ঐখানে উলু দিচ্ছে। ভালো করে কান পেতে শোনো দিকি—'

এমনি সময়ে আবার একঝাঁক উলু উঠিলো। অনেক দূরের অস্পষ্ট ধ্বনি রাত্রির বুক কাটিয়া আসিতেছে—

'উলু—উলু—উলু!'

'যাচ্ছি দিদি।' উন্মাদের মতো আকাশ-ফাটানো কণ্ঠে শিবনাথ চিৎকার করিয়া উঠিলেন। এক লাফে দুই-তিন ধাপ করিয়া সিঁড়ি ভাঙিয়া অন্ধকারের মধ্যে প্রকাণ্ড দুইটি মহল পার হইয়া ছুটিয়া চলিলেন। পিছনে-পিছনে মা-ও ছুটিলেন। ফটক খুলিয়া অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে দেখা গেল, গৌরী। একটা গাছের উপর অজস্র জোনাকি পড়িয়া ঝকমক করিতেছে, তাহারই তলায় ছোটো-ছোটো অজস্র ঝুপসি গাছ। তার মাঝখানে আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিয়া গৌরী ক্রমাগত উলু দিয়া যাইতেছে, 'উলু—উলু—উলু—'

সকাল হইবার সঙ্গে-সঙ্গে নিশিকান্ত মল্লিকও উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, 'দিনমানে খাসা ভালো মানুষ—কোনো গোলমাল নেই। সন্ধ্যে থেকে ক্ষেপেই উঠলো। উলু দেয় আর ছুটে-ছুটে বেড়ায়। কালরাত্রি বলে আমার আবার সামনে যাবার জো ছিলো না। মেজো খোকা, খুদি আর চারুকে বলে দিলাম। তা ওদের কাজ ? জোরজার করে ধরে শুইয়ে দিয়েছিলো। কখন পালিয়ে এসেছে। সকালবেলা উঠে খোঁজ—খোঁজ—'

একটু পরেই পাল্কী-বেহারা চলিয়া আসিলো।

শিবনাথ মিনতি করিয়া বলিলেন, 'আমাদের এখানে ক'দিন রেখে যাও, দাদা। আমরা সুস্থ করে তারপর পাঠিয়ে দেবো।'

হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া নিশিকান্ত বলিলেন, 'মিছে ব্যস্ত হচ্ছেন। আজকে ফুলশয্যে, তারপর বউ-ভাত। জ্ঞাতির পাতে দুটো ভাত দেবো, মনন করেছি। বিয়ে তো ঐ রকমে হলো, এর পরে একেবারে কিছু না করলে লোকে যে গায়ে থুথু দেবে।'

শিবনাথ বলিলেন; 'নিতান্ত আজকের দিনটে থাকুক। ওর মনটা একটু ভালো হয়ে যাক।' নাতজামায়ের হাত দু'খানা ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমার তো সেই থেকে গা কাঁপছে, দাদা। সমস্ত রাত ও ঘুমোয়নি, কেউ আমরা ঘুমোইনি। এখন একটু ঘুমোচ্ছে। আজকে থাক, কাল নিয়ে যেও।'

মল্লিক মুখ কালো করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইলেন। বলিলেন, 'তাই আমি সেদিন কিছুতে রাজী হচ্ছিলাম না। চুন-কালি আমার মুখে ভালো করে পড়ুক গিয়ে। আজকে ফুলশয্যে নেমন্তন্ন-আমন্তন্ন হয়ে গেছে— আত্মীয়-কুটুম্ব এসেছে—'

বিরস মুখে শিবনাথ কহিলেন, 'তবে নিয়ে যাও।'

ঘুম হইতে মেয়েকে ডাকিয়া তোলা হইলো। সকলকে প্রণাম করিয়া শান্তভাবে গৌরী পাল্কীতে গিয়া বসিলো। নিশিকান্ত ভরসা দিয়া বলিলেন, 'কিছু ভাবনা করবেন না, দাদামশাই। আপনারা জানেন না তাই, আমার বিস্তর দেখা আছে। কাল তো আমি দেখাশুনো করতে পারিনি—এখন থেকে নিজে দেখবো, যত্ন-আত্তি করবো, দরকার হয় ডাক্তার দেখাবো। ভয় কি? শাশুড়ী ঠাকরুনকে বুঝিয়ে দেবেন।

কিন্তু চেষ্টা যত্ন এবং নিশিকান্তের নিজের দেখা সত্ত্বেও ঠিক আগের রাত্রির মতো উলু পড়িতে লাগিলো। এবং এদিন একেবারে অন্দরের উঠানের উপর সেই দেবদারু-গাছটির গোড়ায়। ফুলের মালা, সর্বাঙ্গে ফুলের অলঙ্কার, মূল্যবান কাপড়ে-চোপড়ে এসেন্সের সুগন্ধ। বাতাস সেই গন্ধে সুরভিত

হইয়াছে, ফুলের শয্যা হইতে পলাইয়া রাজরাজেশ্বরী দেবদারুর ডাল ধরিয়া কলকণ্ঠে যেন ঘুমন্ত নিশীথিনীর কানে উলুধ্বনি করিতেছে, 'উলু—উলু—উলু—'

'গৌরী, গৌরী!'

যেন তার সম্বিৎ নাই, যেন সে আর কোনো জগতে চলিয়া গিয়াছে। ধরিয়া আনিয়া গৌরীকে শোয়ান হইলো। তারপর আর কোনো গোল নাই, চুপ করিয়া সে ঘুমাইতে লাগিলো।

শিবনাথ চোখের জল মুছিয়া বলিলেন, 'উঠোনে এলো কি করে, বউ-মা?'

বধূ বলিলেন, 'ফটক আমি খুলে রেখেছিলাম।'

'তুমি কি জানতে?'

'আমার মন ডেকে বলেছিলো। ভাবলাম, যদি আসে, সে কি আমার পথে দাঁড়িয়ে থাকবে?'

পরদিন পাল্কী-বেহারা সহ নিশিকান্ত যথারীতি দর্শন দিলেন। মুখখানা হাঁড়ির মতো। বলিলেন, 'এই করে নিত্য আমার পাল্কী-ভাড়া লাগছে পাঁচ-সিকে। প্রতিবিধান করা আবশ্যক হয়ে উঠেছে, রাতবিরেতে বউ-ঝি এই এক মাইল পথ পায়ে হেঁটে আসবে—এই বা কি রকম!'

শিবনাথ বলিলেন, 'ও তো সহজ বুদ্ধিতে আসেনি। দিদি আমার তেমন মেয়ে নয়।'

নাত-জামাই গর্জাইতে লাগিলেন, 'না, বজ্জাতের হাঁড়ি। আমি জেগে আছি—বলে, বাইরে থেকে আসছি। তারপর চোঁ-চা ছুট! আমি আর রাগ করে এলাম না। এরকম ব্যাধি তো কোনো-পুরুষে শুনিনি। সমস্ত ঢং মশায়, বাপের বাড়ি আসবার ছুতো। কিন্তু যাবে কোথায়, আমিও তিন-তিনটে বউ সায়েস্তা করেছি।'

এই বিষয়ে এককালে মল্লিক মহাশয়ের সুনাম রটিয়াছিলো বটে, সেই কথা স্মরণ করিয়া মেয়ের মা ও শিবনাথ দুইজনেই শিহরিয়া উঠিলেন।

এতদিন পরে শাশুড়ী আজ জামায়ের সঙ্গে প্রথম কথা কহিলেন, 'না বাবা, ছুতো ধরবার মেয়ে ও নয়।'

স্বর কাঁপিতে লাগিলো, কথা আর ফুটিতে চায় না। তবু বলিতে লাগিলেন, 'সমস্ত সেরে যাবে বাবা, তুমি দৃষ্টি-মুখ দিয়ো। গৌরী আমার বড়ো শান্ত মেয়ে।'

পরম কৃতার্থ হইয়া জামাতা পায়ের ধূলা লইলেন। একমুখ হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, 'নিশ্চয়-নিশ্চয়। মন্তোর পড়ে বিয়ে করেছি—চালাকি কথা নয়। যা করতে হয়, আমি করবো। কিছু ভেবো না মা, মেয়ে তোমার ঠিক হয়ে যাবে। ছটো-দিন সবুর করো।'

ভক্তিমান জামাই পুনশ্চ শাশুড়ী ও দাদাশ্বশুরের পায়ের ধূলা লইয়া বিদায় লইলেন।

শিবনাথ বলিলেন, 'আজকেও কি ফটক খুলে রাখবে, বউ-মা?'

বধূ জবাব দিলেন না, কিন্তু ফটক খুলিয়া রাখিলেন। গভীর রাত্রি পর্যন্ত জানালায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর সপ্তর্ষিমণ্ডল পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িলো, শেষ-রাত্রের চাঁদের আলো তেরছা হইয়া ঘরের মধ্যে লুটাইয়া পড়িলো, শিয়ালের দল শেষ-ডাক ডাকিয়া চুপ করিলো, তখন শিবনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, 'বাবা, উলু কিছু শুনতে পাচ্ছো?'

কান পাতিয়া ছইজনে আরো অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। জগতের ক্ষীণতম স্পন্দনটুকুও বুঝি থামিয়া গিয়াছে, এমনি গভীর নিদারুণ স্তব্ধতা। সেই স্তব্ধতা ভাঙিয়া হাসিয়া শিবনাথ বলিলেন, 'গরবী-দিদি এতক্ষণ বরের কাছে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। চলো, চলো বউমা; আর কোন ভয় নেই—'

দিন-সাত-আট কাটিয়া গেল, কোনো গোল নাই। নিশিকান্ত বহুদর্শী লোক —বাগ মানাইবার ক্ষমতা আছে, স্বীকার করিতে হয়। ইতিমধ্যে ঝি গিয়া দিন-তিনেক খবর আনিয়াছে। প্রথম-দিন গৌরীর সঙ্গে দেখা হইয়াছিলো, দাছকে বলিস নিয়ে যেতে। কিন্তু তা হইবার জো নাই, বউ-ভাত হয় নাই।

এবং কবে যে সে শুভদিন আসিবে তাহাও নিশিকান্ত ঠিক করিয়া বলেন না।
তাহার পর আরও দুইদিন গিয়াছে কিন্তু জামাই দেখা হইতে দেন নাই।
শেষের দিন চটিয়াই আগুন। বলিয়া দিলেন, নিত্য-নিত্য তোমরা শত্রুতা
সাধতে কেন আসো বলো দিকি?'

ঝি অবাক।

জামাতা বলিতে লাগিলেন, 'বাপের বাড়ির কুটোগাছটা দেখলে মন
খারাপ হয়ে যায়, আর তুমি তো আস্ত মানুষ একটা। ওষুধ-পত্তর হচ্ছে—
নিজেরা রাত-দিন লেগে পড়ে আছি, প্রায় ঠিক হয়ে এসেছে, তোমরাই এসে
গোল বাধাও। কিন্তু আর বিশেষ গোলমাল নেই—ওঁদের গিয়ে বোলো।'

ঝি ফিরিয়া আসিলো।

খবর শুনিয়া শিবনাথ নিশ্চিন্তে নিঃশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন, 'ও
বউ-মা, মিছিমিছি আর ফটক খুলে রাখো কেন? আঁব-দুধ মিশে গেছে—
আঁটি এখন তল্। শুনলে? নাত-জামায়ের আমার চেষ্টার কসুর নেই।
আহা, চিরজন্ম বেঁচে থাক। কিন্তু শালীর আক্কেলটা দেখো, নতুন বর পেয়ে
বুড়োটাকে একদম ভুলে গেল! না আসতে পারিস, এক-আধ ছত্র চিঠি
লিখেও তো খোঁজ নেওয়া যায়।'

মনের আনন্দে হাসিয়া বুড়া ছাদ ফাটাইতে লাগিলেন।

পরের দিন সকালবেলা শিবনাথ উঠিয়া খাটের উপর বসিয়াই
গুড়গুড়ি টানিতেছিলেন। বধূ আসিয়া অস্বাভাবিক উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলো,
'বাবা, গৌরী এসেছে।'

'এসেছে?' গুড়গুড়ি ফেলিয়া শিবনাথ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।
'ও বউ-মা, পাল্কী করে এসেছে তো? নইলে নাত-জামাই রেগে যাবে।'

'দেখবে এসো।' বলিয়া উন্মাদিনীর মতো বধূ শ্বশুরের হাত ধরিয়া
লইয়া চলিলেন। নিচে গিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন, 'ওরে, কে কোথায়
আছিস, ছুটে আয়। মা আমার ফিরে এসেছে শ্বশুর-বাড়ি থেকে।'

ঝি ও চাকর ছুটিয়া আসিলো। রাস্তার উপর তখন ভিড় জমিয়া
গিয়াছে। ফটকের গা ঘেঁষিয়া ফুটন্ত-চাঁপার গুচ্ছের মতো গৌরী এলাইয়া
পড়িয়া আছে। ছিন্ন বেশ, রুক্ষ আলু-থালু চুল, পিঠের ও হাতের কাপড়

উলু

সরিয়া গিয়াছে, তাহার আগাগোড়া ব্যাপিয়া বড়ো-বড়ো রক্তের রেখা। সোনার অঙ্গে আপন হাতে নিশিকান্ত বেত মারিয়াছে, চামড়া কাটিয়া গিয়াছে; চাপ-চাপ রক্ত জমিয়াছে।

রাস্তার লোক একজন মন্তব্য করিলো, 'পশু!'

মা কাণ্ডজ্ঞান ভুলিয়া সেইখানে—রাস্তার উপর আছড়াইয়া পড়িলেন, 'মা আমার, আজ কি গয়না পরে এলি?....ও বাবা, তুমি আমায় ফটক খুলতে মানা করলে, মা আমার সমস্ত রাত এইখানে রয়েছে। কতো ডেকেছে, কাল-ঘুম ঘুমিয়েছিলাম!'

অজ্ঞান অবস্থায় বাড়ির মধ্যে ধরাধরি করিয়া আনা হইলো। ডাক্তার আসিলেন। নিশি মল্লিকের কাছে খবর গেল, রাগ করিয়া তিনি আসিলেন না। বেলা প্রহর-দেড়েকের সময় রোগিণীর জ্ঞান ফিরিলো। জ্বর খুব বেশি, চোখ দুইটি জবাফুলের মতো লাল। চোখ মেলিয়াই সে লাফাইয়া উঠিতে যায়। তাহার পর প্রলয়ের কণ্ঠে বলিয়া উঠে, 'উলু—উলু—উলু!'

বিকালের দিকে গৌরী ঘুমাইলো। ডাক্তার বলিলেন, 'বিকারে দাঁড়িয়েছে মনে হয়। ওষুধে কাজ হয়েছে। একটু কমেছে। আমি চলে যাচ্ছি—কিন্তু খুব সাবধান!'

এক ঘণ্টা—দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল, গৌরী শান্ত চোখ দুইটি বুজিয়া তেমনি ঘুমাইতেছে। মা ভয়ে-ভয়ে একবার নাকের কাছে নিঃশ্বাসের স্পর্শ লন। পরে বার্লি তৈয়ারির জন্য রান্নাঘরে গেলেন। কেহ নাই। হঠাৎ, 'উলু—উলু—উলু—'

বিছানা ছাড়িয়া গৌরী উঠিয়াছে। রুক্ষ এলায়িত চুলের বোঝা। কবে কখন সিঁদুর পরিয়াছিলো, তাহার রেখাটি কপালের উপর জ্বলজ্বল করিতেছে। রক্তের রেখা নিটোল শুভ্র অঙ্গে চিত্র-বিচিত্র ডোরা কাটিয়া গিয়াছে। অসম্বৃত বেশ-ভূষা। নিচের তলায় নামিয়া আসিয়া পুরানো বাড়ির কক্ষে-কক্ষে ঝঙ্কার তুলিতেছে, 'উলু—উলু—উলু!'

মনোজ বসু

'ধর্ ধর্—'

কে তাহার সঙ্গে ছুটিয়া পারিবে? ধরিতে গেলে সেই অপরূপ রূপে খিল-খিল্ করিয়া হাসিয়া সে ছুটিয়া পলায়।

বেলাশেষে সূর্য আকাশ-প্রান্তে নামিয়া আসিয়াছে, বেড়ার ধারে সন্ধ্যামণি ফুটিয়া উঠিলো, হাওয়ায় ঝুর-ঝুর্ করিয়া দেবদারু পাতা ঝরিতে লাগিলো। তাহারই মধ্যে মহাপ্রলয়ের অগ্নিশিখার মতো নাচিয়া-নাচিয়া সে উঠানময় ঘুরিতে লাগিলো। যেখানে সামিয়ানার নিচে বিয়ের বাসর রচিত হইয়াছিলো, পায়ের আঘাতে সেই শুকনা শতচ্ছিন্ন ফুল উড়াইতে লাগিলো।

আকাশ-বাতাস মথিত করিয়া, বাড়ির প্রতি কক্ষ, অলিন্দ, প্রত্যেকটি ইঁট স্পন্দিত করিয়া অশ্রান্ত কণ্ঠের অবিরাম তরঙ্গ উঠিতে লাগিলো, 'উলু—উলু—উলু—'

বেলা ডুবিবার সঙ্গে-সঙ্গে গৌরী চোখ বুজিলো।

বদলি মঞ্জুর

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ছোটো একটি ব্র্যাঞ্চ-লাইন। এক জংসন-স্টেশন হইতে বাহির হইয়া আর-এক জংসন-স্টেশনে গিয়া মিশিয়াছে। মাঝে-মাঝে ছোটো-ছোটো কয়েকটি স্টেশন।

তা লাইনের সব-কয়টি স্টেশনই দেখিতে প্রায় এক-রকম।

পয়েন্টিং-করা লাল ইটের তৈরি ছোট্ট একখানি ঘর, সুমুখে একটুখানি ঢাকা বারান্দার এক-পাশে কাঠের বেঞ্চি পাতা, তাহার পাশেই ওজন করিবার লোহার যন্ত্র, জানালার গায়ে টিকিট কিনিবার ঘুলঘুলি।

ভিতরে একটি টেবিলের উপর টেলিগ্রাফের যন্ত্র সাজানো। যিনি টেলিগ্রাফ করেন, তাঁহাকেই টিকিট দিতে হয়, তিনিই স্টেশন-মাস্টার—তিনিই সব। এ্যাসিস্টান্টের বালাই এ লাইনে নাই। এ্যাসিস্টান্ট বলিতে একজন খালাসী। স্টেশনেও কাজ করে, আবার মাস্টারের বাড়ির কাজও করিয়া দেয়। মাস্টারের চাকর রাখার খরচটা অন্তত বাঁচে।

মন্দ নয়।

স্টেশন-মাস্টার এইচ. পি. ব্যানার্জি। আসল নাম—হরিপদ। মাহিনা বাহাত্তর টাকা। সুখে-স্বচ্ছন্দেই সংসার চলে। স্টেশনের কাছেই ঠিক তেমনি পয়েন্টিং-করা ইটের তৈরি দু'খানি ঘরের একটি কোয়ার্টারে—হরিপদ-মাস্টারের সংসার। সংসার বলিতে একমাত্র তাহার স্ত্রী—বীণা-পাণি। ছেলে-পুলে নাই, একা মানুষ—একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট।

বীণার কাজকর্ম এক-রকম নাই বলিলেই হয়। ইঁদারা হইতে রামধনিয়া খালাসী জল আনিয়া দেয়, তাহার স্ত্রী লছমীর কল্যাণে ঘর ঝাঁট দিতে হয় না, বাসন মাজিতে হয় না—শুধু দু'বেলা দু'টি রান্না।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

আছে একরকম ভালোই ; কষ্টের মধ্যে শুধু সে নিঃসঙ্গ, একাকিনী। এখানে আসিবার পূর্বে বীণা ছিলো এক পল্লীগ্রামে—তাহার মামার বাড়িতে। সেখান হইতে আসিয়া অবধি কোথাও যাওয়া তাহার আর একটিবারের জন্যও ঘটিয়া ওঠে নাই। মনে হয়, এই আট বৎসর ধরিয়া সে যেন এই ছোট্ট খাঁচাটির মধ্যে বন্দিনী হইয়া আছে। আশেপাশে এমন কেহ নাই যে, ডাকিয়া দু'টা কথা কয় ; উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে শুধু ওই খাঁচার মতো ছোটো ঘরখানি—এতো অপরিসর যে, দু'দণ্ড নড়িয়া-চড়িয়া ছুটিয়া-খেলিয়া বেড়াইবারও উপায় নাই, এক লছমীর সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা কথা কহিতে তাহার ভালোও লাগে না।

হরিপদ খাইবার সময় বাসায় আসে। স্নান করিয়া ঠাণ্ডা হইয়া খাইতে বসিলে, পাখা হাতে লইয়া বীণা তাহাকে বাতাস করিতে-করিতে বলে, 'হ্যাঁগা, আর কতদিন? এখান থেকে তোমার বদলি কি আর হবে না ছাই?'

হরিপদর সেই এক জবাব। বলে, 'কই আর হয়!'

বলে, 'কেন, জায়গাটা তেমন মন্দ তো নয়! সব জিনিসই সস্তা। তরি-তরকারি তো এক-রকম কিনতেই হয় না, তাছাড়া কাল থেকে আধসের করে দুধের বন্দোবস্ত করেছি, খাঁটি দুধ—একেবারে বিনি পয়সায়।'

বলিয়া একটুখানি গর্বের হাসি হাসিয়া হরিপদ তাহার মুখের পানে তাকায়। ভাবে, হয়তো বীণা তাহার এই বুদ্ধিমত্তার তারিফ করিবে। কিন্তু তারিফ করা দূরে থাক, হাতের পাখা তখন তাহার অত্যন্ত মৃদু গতিতে চলিতে থাকে, হেঁট-মুখে বুকের আঁচলের পাড়টা সে বাঁ-হাত দিয়া টানিয়া-টানিয়া সোজা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে, মনে হয়, কথাটায় যেন সে কানই দেয় নাই।

হরিপদ কিন্তু না শুনাইয়া তৃপ্তি পায় না, বলে, 'ওইখানে ওই জানলায় দাঁড়ালে বাইরে দক্ষিণ দিকে ও-ই যে ওই গাছপালায়-ঢাকা গাঁ'টা দেখা যায়, ওই গাঁ থেকে চাষাদের আর গয়লাদের ছেলেগুলো সব লাইনের ধারে গরু চরাতে আসে। কচি-কচি অমন ঘাস তো আর কোথাও পাবে না। রামধনিয়াকে দিয়ে গরুগুলো কাল আটক করেছিলাম। বললাম, খবরদার

ব্যথিত ম্লান ব্যগ্র ব্যাকুল চক্ষু পরম ঔৎসুক্য-ভরে তাহাদের মুখের পানে তাকাইয়া থাকে। কোনদিন হয়তো-বা একটি মুখের চেহারা সে সারাদিন মনে করিয়া রাখে, আবার কোনদিন-বা সব মিলিয়া-মিশিয়া একাকার হইয়া যায়, মনে করিয়া রাখিবার মতো একখানি মুখও তাহার নজরে পড়ে না।

ট্রেন চলিয়া যায় ; বীণা দেখে, দিগন্তবিস্তৃত শূন্য প্রান্তর, এদিকে ধানের মাঠ, ওদিকে ওই মাঠের মাঝখানে গাছপালায়-ঢাকা ছোট্ট একখানি গ্রাম,—দূরে—বহুদূরে, মাঠ প্রান্তর পার হইয়া গিয়া অস্পষ্ট বৃক্ষ-শ্রেণীর মাথার উপরে নীল আকাশ যেন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। দিনের পর দিন ঋতুর পর ঋতু ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে, বীণার চোখের সুমুখে তাহার ওই সঙ্কীর্ণ সঙ্কুচিত খণ্ড পৃথিবীটির রূপ বদলায়।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের খর রৌদ্রতাপে দেখে চারিদিক ঝাঁঝাঁ করিতেছে, মাঠের মাটি ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেছে, দূরে শুধু শুষ্ক প্রান্তরের মাঝখানে পত্রহীন কয়েকটি পলাশের গাছে রক্ত-রাঙা পুষ্পের সমারোহ! বৈকালের দিকে পশ্চিমের আকাশ অন্ধকার করিয়া কালবৈশাখীর কালো মেঘ দেখা যায়, মাঠের ধূলা উড়াইয়া ঘূর্ণীবায়ু ঘুরিয়া-ঘুরিয়া নাচিয়া বেড়ায়, তাহার পর কোনদিন-বা বৃষ্টি নামে, কোনদিন-বা ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে শুরু করে।

দেখিতে-দেখিতে বর্ষা আসে। দিবা-রাত্রি ঝম-ঝম করিয়া বৃষ্টি পড়ে। নিদাঘতপ্ত তৃষিত ধরিত্রী যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। বীণা তাহার সেই ছোট্ট জানালার পাশে তখনও বসিয়া থাকে—দেখে, বহুদূর হইতে বৃষ্টির ধারা ঝম-ঝম্ করিয়া তাহারই দিকে আগাইয়া আসিতেছে, চোখে-মুখে তাহার বৃষ্টির ঝাপটা আসিয়া লাগে, তবু সে কোথাও উঠিয়া যায় না। তাহারও তৃষিত আত্মা যেন অজান্তে বর্ষণ কামনা করে, এদিকের দরজার ফাঁকে ঘন-ঘন স্টেশনের দিকে তাকায়, স্বামী তাহার কাজ করিতেছে, কখন যে আসিবে তাহার কোনও স্থিরতা নাই। মাঠ-ঘাট সব জলে ভরিয়া যায়, দুপুরে দূরের গ্রাম হইতে জালি কাঁধে লইয়া লাইনের ধারের ডোবায় বাগদীর মেয়েরা মাছ ধরিতে আসে, ধানের মাঠে চাষীদের নিড়ান চলে, সূর্যাস্ত হইতে না-হইতেই কড়্-কড়্ করিয়া ব্যাঙের ডাক শুরু হয়।

তাহার পর শরতের নির্মল আকাশে চাঁদ ওঠে। জ্যোৎস্নার আলোয়

সবুজ ধানের মাঠের উপর দিয়া বাতাস বহিয়া যায়। রোমাঞ্চিত শস্যক্ষেত্রের শিহরণ যেন বীণার দেহে আসিয়া লাগে।

দেখিতে-দেখিতে সবুজ ধানের মাঠ হলুদ হইয়া উঠে। উত্তর দিক হইতে ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা বাতাস বয়। বীণা তখনও তাহার সেই ক্ষুদ্র বাতায়ন-পার্শ্বের নির্দিষ্ট স্থানটি পরিত্যাগ করে না, গায়ে কাপড় জড়াইয়া দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া দেখে, চাষীরা ধান কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে, গরুর গাড়ি বোঝাই করিয়া কাটা ধানের আঁটি লইয়া তাহারা গান গাহিতে গাহিতে গ্রামের দিকে চলিয়াছে।

তাহার পরেই বসন্ত। সৃষ্টিছাড়া এই প্রান্তরের মাঝখানে তাহাদের ওই ছোট্ট ঘরখানির ততোধিক ছোটো জানালার পথেও বসন্তের হাওয়া অনধিকার প্রবেশ করে। অপরিসর উঠানের এক-পাশে বীণা তাহার নিজের হাতে বেল-ফুলের যে গাছটি পুঁতিয়াছে, তাহারও শুষ্ক শাখায় সাদা-সাদা কয়েকটি কুঁড়ি ধরে।

এমনি করিয়া বছর কাটিয়া যায়।

জানালার বাহিরে প্রতিদিন সেই একই দৃশ্য দেখিয়া-দেখিয়া বীণার জীবন যেন এইবার হাঁপাইয়া উঠিয়াছে।

সকালের ট্রেনটা পার করিয়া দিয়া হরিপদ যখন বাসায় আসে, বীণা তখন রান্না করে। তাও সে রান্না করিতে-করিতে উঠিয়া একবার স্বামীর কাছে আসিয়া বসে। হাসিয়া বলে, 'হ্যাঁগা, তুমি বদলির দরখাস্ত করেছো, না আমায় মিছে কথা বলে ভুলিয়ে রাখছো ?'

হরিপদ তাহার জুতায় কালি ঘষিতে-ঘষিতে মুখ তুলিয়া বলে, 'কেন গো, বদলি-বদলি করে যে আমায় ক্ষেপিয়ে তুললে দেখছি।'

বীণা রাগ করিতে জানে না। মৃদু হাসিয়া আবার তাহার উনানের কাছে গিয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ—আর সে তাহাকে ক্ষেপাইবে না। খানিকক্ষণ সে চুপ করিয়া এটা-সেটা নাড়াচাড়া করিতে-করিতে ভাবে, রেল কোম্পানির মতো নিষ্ঠুর কোম্পানি আর পৃথিবীতে কেহ নাই। স্বামী তাহার খাটিয়া-খাটিয়া হয়রান হইয়া উঠিতেছে, ছুটি না থাক, অন্যত্র বদলি না করুক—স্ত্রীর সঙ্গে দু'দণ্ড বসিয়া কথা বলিবার অবসরও তো দেওয়া উচিত !

উনানে ভাত চড়াইয়া দিয়া হাত ধুইয়া বীণা আবার ঘরে আসিয়া ঢোকে। বলে, 'কেন, আমি কি তোমার জুতো ঘষে দিতে পারি না?'

হরিপদ বলে, 'না, পারবে না কেন? আমিই ঘষছি, তাতে আর হয়েছে কি!'

তাহার পর বেচারা বীণা আর কোনও কথা খুঁজিয়া পায় না, হেঁট-মুখে দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে স্বামীর জুতা-ঘষা দেখিতে থাকে।

সেইদিনই দুপুরে বীণা হঠাৎ এক সময় বলিয়া বসে, 'বিকেলের দুটো ট্রেনই নাকি উঠে যাবে শুনছিলাম, কই, গেল না তো?'

হরিপদ বলে, 'ট্রেন উঠে গেলে তোমার ভারী দুঃখু হয়, না?'

বীণা জিজ্ঞাসা করে, 'কেন?'

হরিপদ বলে, 'জানলার ধারে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাহলে আর লোক দেখা হয় না।'

বীণা হাসিয়া বলে, 'না, পারলে না বলতে। বিকেলের ট্রেন দুটো উঠে যাওয়াই আমি চাইছি। উঠে গেলে বাঁচি।'

এবার হরিপদ বলে, 'কেন?'

এ 'কেন'র জবাব দিতে গিয়া বীণার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসে। লজ্জায় সে তাহার গাল দু'টি রাঙা করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলে, 'বা-রে! ও-সময় একা থাকতে আমার কষ্ট হয় না বুঝি! তোমার কি! তুমি তো লোকজনের সঙ্গে....'

বলিয়াই বীণা জানালার কাছে গিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়ায়। বাহিরে চাহিয়া দেখে, ইঁদারাটার কাছে রামধনিয়ার পাঁঠি ছাগলটাকে একটা খুঁটির সঙ্গে 'দিকদড়ি' দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। পাছে লাইনে কাটা যায় বলিয়া লছমী তাহাকে এমনি করিয়াই গলায় তাহার একটি লম্বা দড়ি দিয়া রোজ বাঁধিয়া রাখে।

সুদীর্ঘ আট বৎসর পরে তাহাদের একঘেয়ে জীবনে হঠাৎ একদিন এক বৈচিত্র্য দেখা দিলো।

সন্ধ্যার ট্রেনখানি স্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, হরিপদ তাহার কালো আলপাকার কোট ও মাথায় গোল টুপিটা পরিয়া ট্রেনের যাত্রীদের টিকিট

লইবার জন্য একটি আলোর খুঁটির নিচে দাঁড়াইয়া। ট্রেন হইতে লোক নামিলো মাত্র দু'জন, উঠিলো একজন। হঠাৎ কে যেন ট্রেনের হাতল ধরিয়া ডাকিলো, হরিপদদাদা !'

পরিচিত কণ্ঠস্বর !

হরিপদ দেখিলো, প্ল্যাটফরমের আলোটা তাহার মুখে গিয়া পড়িয়াছে। চিনিতে দেরি হইলো না।—'সুকুমার যে রে? নাম্, নাম্!—নেমে পড়!'

সুকুমার ছোকরাটি কি যেন বলিতে যাইতেছিলো, হরিপদ ততক্ষণে তাহার কাছে আগাইয়া আসিয়া হাতে ধরিয়া তাহাকে গাড়ি হইতে নামাইলো, সঙ্গে মাত্র একটি সুটকেশ। গাড়ি ছাড়িয়া দিলো।

সুকুমার বলিলো, 'তুমি যে এ-স্টেশনে আছো, তা আমি জানতাম না দাদা, তবে এই লাইনে যে আছো, তা জানি। সেইজন্যেই তো প্রত্যেকটি স্টেশনে উঁকি মেরে-মেরে দেখছিলাম—যদি দেখা হয়ে যায়। ভালোই হলো, অনেকদিন পরে দেখা হয়ে গেল। তুমি ভালো আছো? বৌদি ভালো আছে?'

ঘাড় নাড়িয়া হরিপদ বলিলো, 'হ্যাঁ, ভালোই আছে। আচ্ছা, চল্ তোকে বাসাতেই রেখে আসি।'

বলিয়া সেই জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যায় দু'জনে তাহাদের সেই ছোট্ট বাসার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলো। হরিপদ ডাকিলো, 'ওগো, খোলো-খোলো, ছাখো কে এসেছে, ছাখো।'

বীণা তাড়াতাড়ি দরজা খুলিতে আসিয়া দেখে, স্বামীর সঙ্গে এক অপরিচিত যুবক। তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া সে সরিয়া যাইতেছিলো, হরিপদ বলিলো, 'বিয়ের সময় মাত্র একবার দেখেছিলে, চিনতে পারবে না। আমাদের যোগেশ-মামার ছেলে গো—সুকুমার। এবার চিনলে তো?'

বীণা এইবার তাহার ঘোমটাটা ঈষৎ তুলিয়া দিয়া সুকুমারের মুখের পানে চকিতে একবার তাকাইয়াই চোখ নামাইলো।

সুকুমার তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিলো, 'প্রণাম বৌদি, কিন্তু আপনি ও-রকম লজ্জা যদি করেন তো এই আমি চললাম।'

বীণাকে বাধ্য হইয়া তাহার মুখের পানে আর-একবার তাকাইতে হইলো।

সুটকেশটা ঘরের ভিতর রাখিয়া হরিপদর সঙ্গে সুকুমার কথা কহিতে-ছিলো ; বীণা তাহার জন্য চা তৈরি করিতে গেল।

সুকুমার বলিলো, 'কয়লার কারবার করছি কিনা, তাই একবার মানিকগঞ্জে যাচ্ছিলাম। কাল সকালেই কিন্তু আমায় চলে যেতে হবে, হরিপদদাদা!'

'আচ্ছা, সে দেখা যাবে। এখন তুই বোস্, তোর বৌদির সঙ্গে কথাবার্তা বল্ ততক্ষণ, আমি আমার কাজটা সেরে আসি।' বলিয়া হরিপদ স্টেশনে চলিয়া গেল।

বৌদিদির চা তখনও হয় নাই।

ঘরের মধ্যে একাই-বা সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে কেমন করিয়া!

উঠানের পাশেই ছোট্ট রান্নাঘর। সুকুমার উঠিয়া গিয়া রান্নাঘরের চৌকাঠের উপর বসিলো।

'বৌদির ঘরকন্না দেখতে এলাম। বাঃ, এখনও লজ্জা করছেন বৌদি? না বৌদি, তাহলে আমি চললাম।'

বীণা এইবার তাহার মাথার ঘোমটা সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়া তাহার সেই সুন্দর মুখখানি অনাবৃত করিয়া হাসিয়া বলিলো, 'কেন, যাবে কেন ঠাকুরপো, বিয়ে করেছো নাকি?'

সুকুমার হাসিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলো, 'না বৌদি, বিয়ে আর হলো না। হলে আপনাকে নেমন্তন্ন করবো। যাবেন তো?'

বীণা বলিলো, 'কেন যাবো না?'

চা তৈরি করিয়া চায়ের বাটি বীণা সুকুমারের হাতের কাছে আগাইয়া দিয়া বলিলো, 'ভালো চা হয়তো হলো না ঠাকুরপো, তা কি আর করবে বলো, ও-ই খেতে হবে।'

চায়ে চুমুক দিয়া সুকুমার বলিলো, 'বৌদির হাতের তৈরি চা, এ-ই আমার অমৃত। এর চেয়ে ভালো চা আমার জোটে না বৌদি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

আলাপ জমিয়া উঠিতে দেরি হইলো না। বীণা আজ বহুদিন পরে কথা কহিয়া বাঁচিয়াছে। কথা বলিবার লোক পাইয়াছে, তাই কথা যেন তাহাদের আর ফুরাইতে চাহে না।

'রাত্রে তুমি কি খাও, ঠাকুরপো? তোমার জন্যে লুচি করে দিই খানকতক, কি বলো?'

'দোহাই বৌদি, রাত্রে লুচি আমি কোনদিনই খাই না, আমি ভাত খাবো।'

বীণা বলে, 'ভালো তরি-তরকারির ব্যবস্থা কিছু নেই যে ঠাকুরপো, ভাত খেতে তোমার কষ্ট হবে। এমন হতচ্ছাড়া জায়গা আর দেখিনি—কিচ্ছু মেলে না।'

সুকুমার বলে, 'এবার আমি রাগ করবো বৌদি, এ কি আরম্ভ করলেন আপনি? অতো লৌকিকতা আমার ভালো লাগে না।'

বৌদি বলে, 'লৌকিকতা নয় ভাই, তুমি কি আর রোজ আসছো? পথ ভুলে হঠাৎ এসে পড়েছো, আর হয়তো এ-বৌদিদিটির কথা তোমার মনেই থাকবে না—'

সুকুমার বলে, 'থাক। ভুলে যাবার মতো বৌদি আপনি নন। আপনাকে একবার যে দেখে সে বোধহয় জীবনে আর ভোলে না।'

এ-কথার জবাব সে আর খুঁজিয়া পায় না, চোখ তুলিয়া সুকুমারের মুখের পানে একবার তাকাইয়াই মুখ নামাইয়া সেও ঈষৎ হাসিয়া বলে, 'থাক।'

তাহার পর দু'জনেই চুপ।

সুকুমারের চা খাওয়া শেষ হইয়াছিলো। বাটিটি হাত হইতে নামাইয়া দিয়া বলিলো, 'আপনি এবার বোধহয় রান্না করবেন? আমি এখানে বসে থাকলে আপনার লজ্জা করবে না তো?'

বীণা ঘাড় নাড়িয়া বলিলো, 'না।' বলিয়া সে চৌকাঠের কাছেই একটি আসন পাতিয়া দিয়া বলিলো, 'ভালো করে চেপে এইখানে বসো ঠাকুরপো, তোমার কষ্ট হচ্ছে।'

সুকুমার ভালো করিয়াই চাপিয়া বসিলো।

পরদিন সকালেই সুকুমারের চলিয়া যাইবার কথা, বীণা বলিলো, 'পাগল হয়েছো ঠাকুরপো, আজ কি তোমায় ভালো করে না খাইয়ে ছেড়ে দিতে পারি কখনও? যেতে হয়, কাল যেয়ো।'

এ অনুরোধ এড়ানো শক্ত। বাধ্য হইয়া সেদিন তাহাকে থাকিতে হইলো।

বীণা তাহার স্বামীকে রাত্রেই বলিয়া রাখিয়াছিলো; সকালে হরিপদ কোথা হইতে একটা মাছ সংগ্রহ করিয়া রামধনিয়াকে দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে।

সুকুমার বলিলো, 'দাদাকে দেখছি স্টেশনের সব কাজই করতে হয়, বাড়ি এসে দু'দণ্ড যে বিশ্রাম করবে, তারও ফুরসত মেলে না—না বৌদি? একা একা দিন আপনার কাটে কেমন করে বলুন তো?'

বাহিরে মাছটা পড়িয়া আছে, তাড়াতাড়ি সেটা কুটিবার ব্যবস্থা না করিলে এখনই হয়তো কাকে মুখ দিবে, তাই সে সলজ্জ একটুখানি হাসিয়া এক-রকম ছুটিয়াই বাহিরে চলিয়া গেল। মুখে কিছুই বলিতে পারিলো না।

ব্যাপারটা যে সুকুমার বুঝিলো না তাহা নয়, কথাটা বলা হয়তো তাহার উচিত হয় নাই, তাই সে কিছুক্ষণ জানালার বাহিরে একদৃষ্টে তাকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলো।

কিন্তু তাহার এই নীরবতাও বীণার ভালো লাগিলো না। মাছ-কোটা শেষ করিয়া হঠাৎ এক-সময় ঘরে ঢুকিয়া বলিলো, 'অমন চুপ করে বসে রইলে যে ঠাকুরপো?'

হাসিয়া সুকুমার বলিলো, 'ঝগড়া করবো আপনার সঙ্গে?'

বীণাও হাসিলো। বলিলো, 'করো না। পারবে?' বলিয়াই সে আর জবাবের অপেক্ষা না করিয়াই রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিলো।

আহারাদির পর খানিকটা বিশ্রাম করিয়া সুকুমার বলিলো, 'যাই, একটু স্টেশনে বেড়িয়ে আসি।'

বীণা বলিলো, 'এসো। খাঁচার ভেতর কাল থেকে বাস করে জীবন বোধহয় তোমার হাঁপিয়ে উঠেছে।'

বহুলি মযুর

সুকুমার তাহার বৌদির দিকে তাকাইয়া মৃদু একটুখানি হাসিলো। বীণা জিজ্ঞাসা করিলো, 'হাসলে যে?'

সুকুমার বলিলো, 'আমার যদি এই একদিনেই হাঁপিয়ে ওঠে, আপনার তাহলে আট বছরে কি হওয়া উচিত?'

তাচ্ছিল্যভরে বীণা বলিলো, 'আমার কথা ছেড়ে দাও ভাই, আমি মেয়েমানুষ, আমাদের উপায় কি!'

বলিয়াই ম্লান একটু হাসিয়া বলিলো, 'বেশী দেরি কোরো না, আমি চা তৈরি করে রাখবো।'

দেরি অবশ্য বেশি সে করে নাই, ফিরিয়া যখন আসিলো তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। দরজার কড়া নাড়িবামাত্র হ্যারিকেন লণ্ঠন হাতে লইয়া বীণা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলো।

দেখা গেল, বীণা বেশ করিয়া গা ধুইয়া ভালো করিয়া চুল বাঁধিয়াছে, ভালো একখানি শাড়ি পরিয়াছে, জামা গায়ে দিয়াছে, পায়ে লাল টকটকে আলতা, হাতে কয়েক-গাছা সোনার চুড়ি, জামা-কাপড় হইতে তাহার ভুর্-ভুর্ করিয়া সস্তা একটা এসেন্সের উগ্র গন্ধ বাহির হইতেছে। কিন্তু মানাইয়াছে চমৎকার! হঠাৎ দেখিলে দু'দণ্ড তাকাইয়া থাকিতে হয়।

সুকুমার বলিয়া উঠিলো, 'বাঃ! এ যে তোমায় দেখছি আর চিনতে পারা যাচ্ছে না, বৌদি!'

সলজ্জ একটু হাসিয়া বীণা বলিলো, 'কেন? অপরাধ?'

সুকুমার বলিলো, 'অপরাধ নয় বৌদি, ছাই চাপা আগুনের যেমন ছাই উড়ে গেলে আগুন বেরিয়ে পড়ে, তোমারও দেখছি আজ তাই হয়েছে। কাল থেকে দেখছিলাম, চুলগুলো উস্কোখুস্কো, ময়লা একখানা কাপড়, পায়ে আলতা ছিলো না—সত্যি বৌদি, আজ আপনাকে একেবারে নতুন মানুষ বলে বোধ হচ্ছে।'

বীণা বলিলো, 'তোমারও যে দেখছি মাথা খারাপ হলো ঠাকুরপো, আমার রূপ নিয়ে কবিত্ব করতে গিয়ে 'আপনি' 'তুমি'তে যে গুলিয়ে ফেললে!'

সুকুমার বলিলো, 'তা হোক বৌদি, আপনাকে 'আপনি' না হয় নাই বললাম, কিন্তু সত্যি বলছি বৌদি, তোমায় আজ ভারি ভালো দেখাচ্ছে।

দেখো তো, পায়ে আলতা না পরলে মেয়েদের কখনও মানায়! আজ তোমার ও-পায়ের ওপর প্রণাম করতেও সুখ!'

বীণা হঠাৎ হাসিয়া উঠিলো।

'বাঃ, হাসছো যে, বৌদি? আমি কি মিছে বললাম?'

'না, সেজন্যে হাসিনি, তুমি আলতার কথা বললে, তাই হঠাৎ হেসে ফেললাম। বাক্স খুলে দেখি—আলতা নেই। সে যে আজ ক'বচ্ছর ধরে নেই কে জানে। তখন কি করলাম জানো?—ওই দেখো!'

বলিয়া বীণা আঙুল বাড়াইয়া মেঝের উপর যে জিনিসগুলি দেখাইয়া দিলো সুকুমার সেগুলি চিনিতে পারিলো না। বলিলো, 'কি এগুলো?'

বীণা বুঝাইয়া বলিলো, 'আমাদের ওই ইঁদারার পাশে কতকগুলো ফণিমনসার গাছ আছে দেখেছো? ওই গাছের ওগুলো ফুল কি ফল জানিনে ভাই, ছোটবেলায় ওই দিয়ে আমরা আলতা পরতাম; আজও হঠাৎ আলতা পরবার শখ হতেই লছমীকে ডেকে ছুরি দিয়ে ওইগুলো কেটে আনালাম। ভারি বিশ্রী কাঁটা, হাতে একবার ফুটলে আর সহজে বেরোতে চায় না, তাই খুব সাবধানে বেছে-বেছে ওইগুলো টিপে টিপে লাল-লাল রস নিঙড়ে আলতা যখন আমি পরছিলাম, তখন তুমি দরজায় কড়া নাড়লে, অতি কষ্টে হাসি চেপে তোমায় আমি দরজা খুলে দিলাম—দাঁড়াও, ওগুলো ফেলে দিই।'

বলিয়া সেই ফণি-মনসার ফলগুলো মেঝে হইতে কুড়াইয়া লইয়া বীণা হাসিতে-হাসিতে জানালা গলাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিতে লাগিলো।

সুকুমার বলিলো, 'এতেই এমনি, তা না-জানি সত্যিকারের আলতা পরলে....'

হাত নাড়িয়া বীণা বলিলো, 'হয়েছে!' বলিয়াই একবার হাসিলো। বলিলো, 'নাঃ, এতো প্রশংসা যখন করলে, তখন তোমায় এক পেয়ালা চা আমায় দেখছি এনে দিতেই হলো। উনোন আমার ধরে গেছে, বেশি দেরি হবে না, বসো।'

বীণা চা তৈরি করিতে গেল।

রান্নাঘর কাছেই, সুকুমার সেইখানে বসিয়া-বসিয়াই বলিলো, 'প্রশংসা নয় বৌদি, সাজলে তোমায় সত্যিই বড়ো সুন্দর দেখায়।'

রান্নাঘর হইতে জবাব আসিলো, 'কিন্তু তাতে তো কিছু লাভ হবে না, ঠাকুরপো, তুমি এবার খুব সুন্দরী একটি মেয়ে দেখে বিয়ে করো। মেয়ে দেখবার ভারটা না-হয় আমার হাতেই দিও।'

সুকুমার চুপ করিয়া মুচকি-মুচকি হাসিতে লাগিলো।

সেইদিন রাত্রেই সুকুমারকে মানিকগঞ্জে যাইতে হইবে। না গেলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা।

সুকুমার বলিলো, 'তোমায় ছেড়ে যেতে আমার ইচ্ছে হয় না, বৌদি। সে-কথা না বললেও বুঝতে নিশ্চয় পেরেছো। আচ্ছা, ফেরার পথে যদি পারি তো না-হয় আর একবার...'

'এসো' কথাটা বীণার মুখ দিয়া আর বাহির হইলো না। সুকুমার যে এতো শীঘ্র হঠাৎ আবার চলিয়া যাইবে তাহা সে এক-রকম ভুলিয়াই গিয়াছিলো।

হরিপদ ইহারই মধ্যে দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। হাঁকিয়া বলিলো, 'তুই তবে আয় সুকুমার, আমার আর দাঁড়াবার অবসর নেই, ভাই।'

'যাই।' বলিয়া সুটকেশটা তুলিয়া লইয়া হরিপদর পিছু-পিছু সুকুমারও বাহির হইয়া গেল।

বীণার বাড়ির পাশ দিয়া যে গাড়ি পার হইয়া যায়, এ-দু'দিন বীণা সে-কথা ভুলিয়াই ছিলো, আজ এই অতিথিটি চলিয়া যাইবামাত্র দৃষ্টি তাহার আবার সেইদিকে নিবদ্ধ হইয়াই রহিলো।

মানিকগঞ্জ যাইবার গাড়ি পার হইলো প্রায় আধঘণ্টা পরে। গাড়ির আরোহীদের মধ্যে সুকুমার ছিলো জানালার পথে তাকাইয়া আর সেই ক্ষুদ্র গৃহের বাতায়নপার্শ্বে বীণা ছিলো তাহার ব্যগ্র-ব্যাকুল দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া; আকাশে ছিলো অজস্র জ্যোৎস্না, গাড়িতে ছিলো আলো, অথচ কেহ

কাহাকেও দেখিতে পাইলো না, বীণার অস্থির চঞ্চল ছু'টি চক্ষুতারকার সুমুখ দিয়া সশব্দে ট্রেনখানা পার হইয়া গেল।

শূন্য গৃহ আবার তেমনি খাঁ-খাঁ করিতে লাগিলো।

আবার সেই একঘেয়ে একটানা জীবন!

ছু'তিনদিন পরে আবার সুকুমারেরর ফিরিবার কথা।

বীণা জানালার কাছে বসিয়া বসিয়া ট্রেন দেখে, আর ভাবে, আর দিন গোনে।

জানালার বাহিরে ধরিত্রীর যে ভগ্নাংশটুকু তাহার চোখের সুমুখে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে প্রতিভাত হইয়া আছে, চোখ বুজিলেই যে-দৃশ্য তাহার মনশ্চক্ষে হুবহু ছবির মতো ভাসিয়া ওঠে, সেটুকু দেখিয়া-দেখিয়া এখন তাহার এমন হইয়াছে যে, সে না দেখিয়াও বলিয়া দিতে পারে— লাইনের ধারে একটি হেলানো পলাশগাছের নিচে একটি উইএর টিবি, পাশেই ছোট্ট একটি ডোবায় বারো-মাস জল জমিয়া থাকে, তাহারই এক কোণে একটি রক্ত-সাপলার ঝাড়, লাল রঙের ছুইটি শালুক সে সেখানে রোজই ফুটিয়া থাকিতে দেখে, ঝোপের ভিতর একটি ডাহুক-দম্পতি বোধকরি তাহাদের বাসা বাঁধিয়াছে। দিনের বেলা তাহারা কোথায় থাকে কে জানে, সন্ধ্যা হইলেই ডাহুক ছুইটি তাহাদের সন্তান-সন্ততি লইয়া ওই সাপলা-ঝোপে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। বীণা জানে, সুমুখে ধানের মাঠের তিনটা মাঠ বাদ দিয়া চতুর্থ মাঠের আলটা বাঁকা। দূরে একটা পুকুরের পাড়ে পঁচিশটি তালের গাছ, দক্ষিণ দিক হইতে পাঁচটা গাছের পর যে ফাঁকটুকু আছে, দিনের সূর্য সেইখানে গিয়া পেঁছিলেই তাহার রং হয় লাল, বীণা তখন বুঝিতে পারে—সূর্যাস্ত হইতে আর দেরি নাই।

কিন্তু আজকাল আর ও-সবের দিকে তাহার নজর যেন কম, আজকাল সে দেখে শুধু মানিকগঞ্জ হইতে আসিবার ট্রেন। ট্রেনের জানালার পথে আরোহীদের মধ্যে সুকুমারের অনুসন্ধান করে; নিরাশ হইয়া শেষে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। বহুদূর হইতে শব্দ শুনিয়া সে ঠিক বলিয়া দিতে পারে—মালগাড়ি কি প্যাসেঞ্জার।

হু'দিন যায়, তিনদিন যায়, চারদিনের দিন—তখন সে আশা ছাড়ে না, মনে হয় সুকুমার আসিবে।

কিন্তু দিনের পর দিন পার হইয়া শেষে সপ্তাহ পার হইয়া গেল। সুকুমার আসিলো না।

বীণা ভাবে, বিবাহ না করুক, সুকুমার বেশ ভালো ছেলে, কয়লার কারবার করিয়া বেশ হু'পয়সা রোজগার করে, যে মেয়ের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে সে হয়তো তপস্যা করিতেছে। নিজের রোজগার ছাড়িয়া দিয়া এখানে তাহার এমনই-বা কি আকর্ষণ যে, বসিয়া-বসিয়া হু'দিন গল্প করিয়া যাইবে! আসিতে সে পারে না, কেনই বা আসিবে, আর সেই-বা নিতান্ত স্বার্থপরের মতো তাহার আসিবার কথাই-বা ভাবে কেন?

হরিপদর জমাটা বড়ো ময়লা হইয়াছিলো, বীণাকে সেদিন সে ডাকিয়া বলিলো, 'জামাটায় আজ একটু সাবান দিয়ে দিয়ো তো।'

সাবান দিবার জন্য জামাটা সে উঠানে লইয়া যাইতেছিলো, পকেটে কিছু আছে কি না দেখিবার জন্য একটা পকেটে হাত ঢুকাইতেই ভারী-মতো কি-একটা বস্তু তাহার হাতে ঠেকিলো।—জিজ্ঞাসা করিলো, 'এটা কি গো?'

জিনিসটা বাহির করিয়া বীণা দেখিলো—লাল কাগজের বাক্সোয় মোড়া তরল আলতার একটি শিশি। জিজ্ঞাসা করিলো, 'হ্যাঁগো, এটা তুমি পেলে কোথায়?'

আহারাদির পর হরিপদ একবার গড়াইয়া লইতেছিলো, বলিলো 'দেখলে, কি-রকম মনের ভুল! আজ চারদিন ধরে তোমায় বলবো-বলবো করেও ভুলে গেছি। সুকুমার সেদিন রাত্রের ট্রেনে মানিকগঞ্জ থেকে বাড়ি ফিরছিলো, গাড়ি থেকে আমায় ডেকে সেদিন তোমার জন্যে ওই আলতার শিশিটে দিয়ে গেছে। এতো-করে বললাম, তা কিছুতেই নামলো না, বললো—বড়ো জরুরী কাজ আছে দাদা, আজ আসি। আমার হয়ে তুমি বৌদিকে বলো যেন হুঃখ করে না।'

অনেকক্ষণ ধরিয়া আলতার শিশিটি বীণা নাড়াচাড়া করিয়া ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলো। খুলিয়া দেখিলো, চমৎকার আলতা! রক্তের মতো লাল!

তাহার পর দেড় বৎসর পার হইয়াছে। সুকুমার আর আসে নাই। হরিপদর আরও চার টাকা মাহিনা বাড়িয়াছে।

তখন বসন্তকাল। পলাশের ঝোপে, লাইনের ধারে, যেখানে-সেখানে যখন-তখন কোকিল ডাকিতে শুধু করিয়াছে। এমনি দিনে হরিপদর বদলির দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়া আসিলো।

বদলি হইয়াছে প্রকাণ্ড এক জংসন-স্টেশনে। সেখান হইতে বেশি দূরে নয়। বীণার মামার-বাড়ির কাছেই।

কিন্তু হইলে কি হয়, বীণার যেন এখন আর সে উৎসাহ নাই। গত তিন-চার মাস তাহাকে ম্যালেরিয়ায় ধরিয়াছে। অতো রূপ তাহার এই অল্পদিনের মধ্যেই কেমন যেন ম্লান হইয়া গেছে।

বাসার জিনিসপত্র রামধনিয়া বাঁধা-ছাঁদা করিয়া দিলো। লছমী আসিয়া চোখে কাপড় চাপা দিয়া কাঁদিতে লাগিলো।

জংসন-স্টেশনের চমৎকার কোয়ার্টার। বাড়িগুলোও বড়ো, উঠানে জলের কল, স্নান করিবার ঘর, চৌবাচ্চা, ইলেকট্রিকের আলো। চারিদিকে লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া, সাহেব-মেম—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছোটখাটো শহরের মতো জায়গা। লাল ফুলে-ভরা প্রকাণ্ড একটি কৃষ্ণচূড়ার গাছ দরজার সুমুখে একেবারে তাহাদের উঠানের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

হরিপদ হাসিয়া বলে, 'কেমন? হয়েছে তো এবার?'

বীণাও ম্লান একটুখানি হাসে। ঘাড় নাড়িয়া বলে, 'হ্যাঁ।'

হরিপদ বলে, 'ভালোই হলো। এখানে এসে শরীরটা তোমার সারবে হয়তো। রেলের খুব বড়ো ডাক্তার আছে, কালই একবার ডেকে দেখাবো ভাবছি।'

বীণা বলে, 'না গো না, আর ডাক্তার দেখাতে হবে না। এমনিই সেরে যাবে।'

কিন্তু সারে না। স্নান করিতে গেলেই গায়ে জল ঠেকিবামাত্র শরীরটা তাহার কেমন যেন শির্-শির্ করিয়া উঠে, স্পষ্ট জ্বরও হয় না, অথচ

ভিতরে ভিতরে দিন-দিন বড়ো দুর্বল হইয়া যায়, তাহাতেই কোনরকমে নিজের হাতেই সংসারের কাজকর্ম করে স্নানও করে ভাতও খায়—অথচ মুখ ফুটিয়া স্বামীকে কোনদিন কোনও কথাই বলে না।

বলে না তো বলে না, হরিপদও নিজের কাজকর্ম লইয়া ব্যস্ত থাকে। ডাক্তার আনিবার কথা সে ভুলিয়া গেছে।

এখানে আসিয়া অবধি হরিপদর প্রায়ই রাত্রে 'ডিউটি' পড়ে, দিনের বেলায় পড়িয়া-পড়িয়া ঘুমায়।

সেদিন সে অমনি ঘুমাইতেছে, রান্না সারিয়া হরিপদকে স্নান করিবার জন্য উঠাইতে গিয়া বীণা থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে সেইখানেই বসিয়া পড়িলো। বলিলো, 'ওগো, আমার জ্বর এলো।'

লেপের পর লেপ চাপা দিয়া জড়াইয়া ধরিয়াও হরিপদ বীণার কাঁপুনি আর থামাইতে পারে না।

শীতে কাঁপিতে-কাঁপিতে লেপের তলা হইতে বীণা বলিলো, 'ওগো, তুমি রাত জেগেছো, যাও, স্নান করোগে, করে নিজেই চারটি হেঁসেল থেকে —কি আর করবে লক্ষ্মীটি....' বলিয়া লেপের তলায় হাতড়াইয়া-হাতড়াইয়া হরিপদর হাতখানা বীণা তাহার অগুনের মতো গরম হাত দিয়া ধরিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলো।

সে কান্না হরিপদ দেখিতে পাইলো না।

'দাঁড়াও, আজই ডাক্তার আনছি।' বলিয়া সে স্নান করিবার জন্য উঠিয়া গেল।

নিজেই ভাত বাড়িয়া খাইয়া হরিপদ ফিরিয়া আসিতেই বীণা জিজ্ঞাসা করিলো, 'খেলে? ভালো করে খেয়েছো তো—কাঁসার সেই বড়ো বাটিতে মাছের ঝোল ছিলো, আর কলাইকরা সেই সাদা রঙের....'

কথাটা হরিপদ তাহাকে আর শেষ করিতে দিলো না, বলিলো, 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সবই খেয়েছি। তুমি একটুখানি চুপ করে ঘুমোও দেখি। আমি ডাক্তার ডেকে আনি।'

বীণা তাহার মুখের ঢাকা খুলিয়া বলিলো, 'না, তুমি যেয়ো না। ডাক্তার ডাকতে হয়—এরপর ডেকো।'

এই বলিয়া সে একদৃষ্টে তাহার স্বামীর মুখের পানে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিলো, 'আমায় এক গ্লাস জল দিয়ে তুমি ঘুমোও। তোমায় আবার রাত জাগতে হবে।'

বীণাকে জল খাওয়াইয়া হরিপদ সত্যই ঘুমাইলো।

বৈকালে ঘুম ভাঙিতেই দেখে, বীণা বসিয়া-বসিয়া একটা ঝাঁটা লইয়া ঘর ঝাঁট দিতেছে। হরিপদ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলো, 'ও কি ও কি হচ্ছে?'

বীণা হাসিয়া বলিলো, 'জ্বর আমার অনেকক্ষণ সেরে গেছে।'

হরিপদর বিশ্বাস হইতেছিলো না। বলিলো, 'পাগল হলে না কি?'

বীণা তাহার কাছে উঠিয়া আসিয়া বলিলো, 'বিশ্বাস না হয়, দেখো গায়ে হাত দিয়ে।'

হরিপদ তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিলো, সত্যই তাই। জ্বর তাহার ছাড়িয়া গেছে।

বীণা বলিলো, 'বড়ো খিদে পেয়েছে। কি খাই, বলো দেখি?'

হরিপদ উঠিয়া দাঁড়াইলো। জামা গায়ে দিয়া বলিলো, 'দাঁড়াও, আগে ডাক্তারবাবুকে একবার ডাকি।' বলিয়া সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

ডাক্তার বলিয়া গেলেন, 'ম্যালেরিয়া, পুরোনো জ্বর, ও অমনি আসে আর যায়। খেতে দিন, কিন্তু একবার চেঞ্জে পাঠাতে পারলে ভালো হয়।'

হরিপদ খানিক ভাবিয়া বলিলো, 'চেঞ্জে? পাড়াগাঁয়ে পাঠালে চলে?'

ঘাড় নাড়িয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'চলে।' বলিয়া তিনি ঔষধের প্রেস্‌ক্রিপশন লিখিয়া দিলেন।

ঔষধ চলিতে লাগিলো।

জ্বর অমনি আসে আর যায়। হরিপদ বুঝাইয়া বলে, 'দেখো, আমি কিছুদিন না-হয় হোটেলেই খাই, আমার কোনও কষ্ট হবে না। তুমি যাও দিন-কতক মামীমার কাছেই থেকে এসোগে, কেমন?'

বীণা বলে, 'না গো না, আমার কিচ্ছু হবে না, আমি বেশ আছি।'

হরিপদ রাগ করিয়া বলে, 'তোমার সঙ্গে কে পারবে বলো! বেশ, থাকো। এমনি করে জ্বর আসুক আর অনাচার-অত্যাচার করো, তারপর একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে থাকবে; এখন হোটেলে খেতে দিচ্ছো না, তখন আমায় নিজে রেঁধে খেতে হবে।'

বীণা হাসিয়া বলে, 'মরি মরি, নিজে রেঁধে খাবার লোকটি কেমন! তখন তুমি আর-একটা বিয়ে করবে।'

হরিপদ আর জবাব দেয় না। রাগ করিয়া নীরবে বসিয়া থাকে।

বীণা তাহার রাগ ভাঙাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে। বলে, 'না গো না, রাগ করলে? না-না, বিয়ে তুমি করবে না, তা আমি জানি। তোমার বিয়ে করবার সময় কোথায়?'

এমনি করিয়া রাগ-অভিমানের পালা চলিতে-চলিতে বীণাকে একদিন রাজি হইতে হইলো। বলিলো, 'আচ্ছা, তবে তাই আমায় দিয়েই এসো বাপু, শরীরটা না-হয় সেরেই আসি। কিন্তু—'

'কিন্তু কি?'

বীণা বলিলো, 'আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করে বলো....ওগো না-না, ছি! হোটেলে আবার মানুষে খায়! তার চেয়ে এক কাজ করো। এখানে রাঁধুনী বামুন পাওয়া যায় না?'

হরিপদ বলিলো, 'তাই না-হয় একটা বামুন-টামুন দেখে বাড়িতে রান্না করিয়েই খাবো।'

বীণা বলিলো, 'খাবো নয়। তোমায় আমি খুব ভালো করে চিনি। পকেটে আলতার শিশি রেখে যে চারদিন ভুলে যায়....বামুন তুমি একটা নিয়ে এসো ডেকে। তাকে আমি দেখিয়ে-শুনিয়ে দিই, দু'দিন রান্না করুক, আমি দেখি—তার পর...'

ব্রাহ্মণ এক ছোকরাকে পাওয়া গেল। নাম যতীন। সেখান হইতে ক্রোশখানেক দূরের একটা গ্রামে তাহার বাড়ি! রাঁধে ভালো। কাজকর্ম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

বীণা তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিলো। তাহার পর

স্বামীকে তাহার গায়ে-মাথায় হাত দিয়া ঠিক সময়ে স্নানাহার করিবার শপথ করাইয়া জানাইলো যে, সে যাইতেছে বটে, কিন্তু মোটেই সে সেখানে বেশিদিন থাকিতে পারিবে না, চিঠি লিখিবামাত্র সে যেন তৎক্ষণাৎ নিজে গিয়া তাহাকে লইয়া আসে।

বলিলো, 'বাক্স আমি নিয়ে যাবো না। দু'চারখানা কাপড়-জামা তোমার ওই টিনের হাত-বাক্সটাতে যা ধরে তাই নিয়েই আমি চললাম। তারপর দরকার হয়—মামীমা দেবেন, সেজন্যে ভেবো না।'

দিনকয়েক পরে একটি দিনের মাত্র ছুটি লইয়া হরিপদ তাহাকে তাহার মামীমার কাছে রাখিয়া আসিলো।

বাপের বাড়ি কাছেই, কিন্তু সেখানে তাহার মাও নাই, বাবাও নাই, মামার বাড়িতেই ছেলেবেলা হইতে মানুষ, তাই তাহাকে তাহার মামীমার কাছে রাখিয়া আসা ছাড়া আর উপায় কি!

বীণার চিঠি আসে—সে বেশ ভালোই আছে। জ্বর এক-আধটু মাঝে-মাঝে আসে বটে, কিন্তু সে কিছুই নয়, আসে আর যায়।

চিঠি পড়িয়া হরিপদ খুশি হয়। আহা, এতদিনের সাধ তাহার—বদলি হইয়া যদিই-বা সে জংসন-স্টেশনে আসিলো, আসিয়া অবধি একটি দিনের জন্যও সে সুখে বাস করিতে পায় নাই, এইবার সে সারিয়া আসিয়া আবার সেই আগের মতই হাসিয়া-খেলিয়া কাজ করিয়া বেড়াইবে।

কিন্তু দুনিয়ার বিধাতা বুঝি হরিপদর চেয়েও নিষ্ঠুর। তাহারই মতো অন্ধ!

এক মাস পার হইতে না হইতেই মামীমার কাছ হইতে এক চিঠি আসিলো।—বীণার যেমন জ্বর হয় তেমনি জ্বর আসিতেছিলো, দিন-চার-পাঁচ আগে জ্বরটা একটু বেশি করিয়াই আসিয়াছে, এখনও মগ্ন হয় নাই, কাল রাত্রে একটু বিকারের মতো হইয়াছিলো, ভুল বকিতে-বকিতে হঠাৎ বাক্‌রুদ্ধ হইয়া গেছে। জ্ঞান রহিয়াছে, কিন্তু কথা কহিতে পারিতেছে না। তুমি বাবা একবার আমার এই চিঠিখানি পাইবামাত্র আসিও।

চিঠিখানি পাইবামাত্র হরিপদর মাথা ঘুরিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ স্টেশন-মাস্টারের কাছে গিয়া ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া একশিশি ঔষধ লইয়া হরিপদ ট্রেনে চড়িয়া বসিলো।

গ্রামে ঢুকিতে বুকখানা তাহার অজানা আতঙ্কে ছড়ছড় করিতেছিলো, তবু সে গ্রামে ঢুকিলো। লোকজনের মুখের পানে তাকাইতে তাহার ভরসা হইলো না। কোনরকমে মুখ নিচু করিয়া মামীমার ঘরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইতে দেখা গেল, মামীমা নিজেই দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। হরিপদকে দেখিবামাত্র তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। হরিপদ তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলো। অতি কষ্টে মামীমা বলিলেন, 'হয়ে গেছে বাবা, বীণা চলে গেছে।' আর কিছুই তিনি বলিতে পারিলেন না। বলিবার প্রয়োজনও ছিলো না। হরিপদ তখন মাটিতে বসিয়া পড়িয়াছে, চোখ দিয়া দর্দর্ করিয়া জল গড়াইতেছে, ঠোঁট দুইটা থর্থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

এমন অকস্মাৎ সে চলিয়া যাইবে কে জানিতো!

মামীমা কাঁদিতে-কাঁদিতে তাহাকে হাতে ধরিয়া উঠাইলেন। বীণার ওষুধের শিশিটা সেইখানেই কাৎ হইয়া পড়িয়া রহিলো।

দেখা গেল, শবদাহের জন্য গ্রামের লোকজন আসিয়া উঠানে জড়ো হইয়াছে। সুমুখে ঘরের মেঝের উপর বীণার মৃতদেহ আপাদমস্তক সাদা চাদর দিয়া ঢাকা।

চাদরখানা সরাইয়া দিয়া উন্মাদের মতো হরিপদ তাহার মৃতদেহের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলো।

মামীমা কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিলেন, 'যাবার সময় কিছু বলে গেল না বাবা, শুধু ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইলো।'

কথাটা শুনিয়া হরিপদর কান্না যেন আরও বাড়িয়া গেল। বীণার সেই অর্ধ-মুদ্রিত ঘোলাটে দুইটি চক্ষুর পানে তাকাইতে গিয়াও সে আর তাকাইতে পারিলো না। বুকের ভিতরটা তাহার মোচড় খাইয়া হু-হু করিয়া উঠিতেই সে মামীমার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিলো, 'আসতে ও চায়নি মামীমা, আমি ওকে জোর করে পাঠিয়েছিলাম।'

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

নদী-তীরের শ্মশানে বীণার মৃতদেহ দেখিতে-দেখিতে চোখের সুমুখে পড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

হরিপদকে মামীমা বার-বার করিয়া শ্মশান হইতে বাড়ি ফিরিতে বলিয়াছিলেন, শবযাত্রীরাও বারেবারে তাহাকে গ্রামে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলো, কিন্তু হরিপদ কাহারও কথা শুনিলো না। অবস্থা তখন তাহার ঠিক পাগলের মতো। বীণার হাতের আটগাছি শোনার চুড়ি ও কানের দুল দুইটি লইয়া ভিজা কাপড় পরিয়া ভিজা জামাটি কাঁধে ফেলিয়া নদী-তীরের পথ দিয়া হরিপদ চলিয়া গেল। পুরোহিত তাহার পিছনে-পিছনে কিছুদূর ছুটিয়া আসিয়া কাঁচা মাটির একটা ঢেলার মধ্যে খানিকটা চিতাভস্ম ও বীণার অস্থি কয়টি তাহার হাতে দিয়া বলিলো, 'পারোতো এইটি গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ো, বুঝলে ? দিতে হয়।'

মাটির ঢেলাটিও হরিপদ হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিলো।

ট্রেনে চড়িয়া হরিপদ যখন তাহার নির্দিষ্ট স্টেশনে নামিয়া বাসার দিকে চলিতে লাগিলো, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। রেল লাইনের উপর দিয়া প্রকাণ্ড একটা সেতু পার হইতে হয়। তাহারই উপর দিয়া হরিপদ ধীরে ধীরে চলিতেছিলো। কিছুদিন পূর্বে এই স্টেশনে কয়েকবার মালগাড়ি হইতে প্রচুর জিনিসপত্র চুরি যায়, তাই এখন এখানে বহুদূর পর্যন্ত ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা। আলোগুলি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে লোহার লাইন, আর তার, আর গাড়ি। অদূরে 'লোকোশেড্'। কালো-কালো প্রকাণ্ড দানবের মতো ইঞ্জিনগুলো হুম্-হুম্ করিয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। ওদিকে ইলেকট্রিকের ইঞ্জিন-ঘর কারখানা, এদিকে যন্ত্র, ওদিকে কল। শুধু লোহা আর ইস্পাত, শুধু স্টীম আর আগুন! হরিপদর অফিসটা দেখা যাইতেছিলো। কলের মতো লোকগুলো সেখানে কাজ করিতেছে। মনে হইলো, সে নিজেও ওই কলকারখানার সামিল। যন্ত্রের মতো পরের ইঙ্গিতে সেও তাহার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের যাত্রাপথে অন্ধের মতো হাঁটিয়া চলিয়াছে। ছুটি নাই, অবসর নাই, বিশ্রাম নাই, ক্লান্তি নাই—মৃত্যুপথযাত্রী

বদ্‌লি মঞ্জুর

বীণাকে একটুখানি দেখিবার অবসর পর্যন্ত নাই! বীণার কথা মনে হইতেই তাহার চোখের সুমুখে যেন হু-হু করিয়া চিতাগ্নি জ্বলিয়া উঠিলো—নদী-তীরের সেই শ্মশান আর সেই চিতা; আর সেই ধূম, সেই আগুন, আর সেই নিঃসাড় নিস্পন্দ বীণার মৃতদেহ!....হাতে তাহারই অস্থি!

ধীরে-ধীরে এক-পা এক-পা করিয়া হরিপদ সেই কৃষ্ণচূড়ার গাছের তলা দিয়া তাহার কোয়ার্টারের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলো। সেই কোয়ার্টার! এইখান হইতেই বীণাকে সে জোর করিয়া মামীমার কাছে রাখিয়া আসিয়াছিলো। ঘরের বাহিরে একটা আলো জ্বলিতেছে। দেখিলো যতীন ছোকরাটি বারান্দায় চাদর বিছাইয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন। হরিপদ তাহাকে আর জাগাইলো না। ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিলো। ভিজা কাপড় প্রায় শুকাইয়া গেছে। জামাটা কাঁধ হইতে নামাইয়া রাখিতে গিয়া ঠক্ করিয়া কিসের যেন শব্দ হইলো। হাত দিয়া দেখিলো বীণার চুড়ি! বীণার চুড়ি ও দুল বীণার বাক্সেই রাখিয়া দিবে ভাবিয়া খাটের নিচে বালিসের তলা হইতে তাহার চাবির তোড়াটি বাহির করিয়া সে বাক্স খুলিলো। বীণার সেই বাক্স। তাহারই নিজের হাতে সাজানো জিনিস। কিন্তু এ-কি! থাকে-থাকে সাজানো কাপড়-জামা সব যেন লাল! মনে হইলো—সব যেন রক্তে ছাপানো। হরিপদ তাহার চোখ দুইটা ভালো করিয়া রগড়াইয়া লইলো—দেখিলো, না, চোখের ভুল নয়, সত্যই তাই। কম্পিত হস্তে ধীরে-ধীরে একটি-একটি করিয়া কাপড়-জামাগুলি হরিপদ নামাইতে লাগিলো। দেখিলো, বাক্সের এক কোণে সযত্ন-রক্ষিত সুকুমারের দেওয়া সেই আলতার শিশিটি। ভাঙিয়া কোন্ সময় সমস্ত আলতা গড়াইয়া পড়িয়াছে।

কয়েকটি কাপড়ের তলায় দেখিলো, তাহারই দেওয়া রেল কোম্পানির একটি সাদা খাতা। খাতার কয়েকটি পাতা ছিঁড়িয়া চিঠির মতো কি-যেন লেখা হইয়াছে। কাগজগুলি হরিপদ তুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিলো। বীণার হাতের লেখা কয়েকখানি চিঠি! কিন্তু চিঠির অধিকাংশ অক্ষর লাল আলতার দাগে অস্পষ্ট। একখানি চিঠির কিয়দংশ সে পড়িতে পারিলো। লেখা আছে ঃ

'ভাই ঠাকুরপো—' তাহার পর অনেকগুলি অক্ষর কাটা। তাহার পর লিখিয়াছে, 'তোমাকে যে চিঠি দিবো কিন্তু ঠিকানা জানি না যে!'

সে চিঠিখানির আর কিছু পড়িবার উপায় নাই।

আর একখানি চিঠি! আগাগোড়া সবই লাল, মাঝখানে মাত্র কয়েকটি লাইন ঃ

'...সাজিলে আমাকে ভালো দেখায়। তুমি যে আমায় আলতা পরিয়া ভালো করিয়া সাজিতে বলিলে, কিন্তু কাহার জন্য সাজিবো ভাই? কে দেখিবে? তোমার দাদা কাজের লোক। চব্বিশ ঘণ্টা সে তাহার কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকে। তাহার কি আর দেখিবার অবসর আছে ছাই!...'

হরিপদর হাত হইতে কাঁপিতে-কাঁপিতে কাগজগুলি মাটিতে পড়িয়া গেল। মাথার ভিতরটা বোঁ-বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিলো। এবং তাহার দুই মুদ্রিত চক্ষুর সম্মুখে মনে হইলো যেন সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড লাল রক্তে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।...চারিদিকে অজস্র ইঞ্জিন আর ধোঁয়া, কল আর কারখানা টেলিগ্রাফের তার, আর যন্ত্রের শব্দ!...ওদিকে হুইস্‌ল্ বাজিলো, এদিকে ট্রেন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, রামধনিয়ার চিৎকার, লছমীর ঝগড়া....টেলিগ্রাফ আসিয়াছে...বীণার...অসুখ, বীণা রাগ করিয়াছে, বীণা চলিয়া যাইবে। সত্যই তো! তাহার অবসর কোথায়! তাহার অবসর কোথায়!...

কোয়ার্টারের মাঠে যাত্রা শুনিয়া যতীন এমন ঘুম ঘুমাইয়াছে যে, উঠিলো যখন, তখন প্রভাত হইয়া গেছে। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিতেই দেখিলো, দরজা খোলা, ঘরে আলো জ্বলিতেছে, বাবু কোন্ সময় আসিয়াছেন তাহাও সে বুঝিতে পারে নাই। ঘরে ঢুকিতেই দেখে, বাবুর খালি গা, খালি পা, বাক্স খোলা, বাক্সের জিনিসপত্র ঘরময় ইতস্ততঃ ছড়ানো, আর তাহারই মাঝে বাবু তাহার বাক্সের ডালির উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

আর...পাশের বাড়ির সাদা রঙের একটা পোষা বিড়াল বীণার সেই অস্থিপিণ্ডটা লইয়া ঘরের মেঝের উপর পা দিয়া গড়াইয়া-গড়াইয়া খেলা করিতেছে!

বদ্‌লি মঞ্জুর

মাধবী মাসী

প্রমথনাথ বিশী

মেয়েদের বোর্ডিঙের মেট্রন—মাধবী মাসী। ছোটো থেকে বড়ো, ঝি-চাকর থেকে লেডি-সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সকলেরই সে মাধবী মাসী, এর চেয়ে বেশি পরিচয় তার আর কেউ জানে না। ছোটো-ছোটো মেয়েরা প্রথম যেদিন আসে, পুরাতনীদের সঙ্গে কি তাদের কানাঘুষা হয়, অমনি তারা মাধবী মাসী বলিয়া ডাকিতে শুরু করে। আবার বয়স্ক মেয়েরা যেদিন কলেজের পড়া শেষ করিয়া বোর্ডিং ছাড়িয়া যায়, তার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিয়া যায়—মাধবী মাসী, চললাম। মাধবী হাতের সেলাইটা ক্ষণকালের জন্য রাখিয়া দিয়া বাহির হইয়া আসে; গাড়ি আসিয়া থাকিলে গাড়ির দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, বিদায়প্রার্থী মেয়েটি বলে, মাধবী মাসী, মনে রেখো। মাধবী কোনো কথা না বলিয়া শুধু একবার হাসে; তাহাতে অনেক কিছু বলা হয়। মেয়েটি বুঝিতে পারে। লোকে কেন এমন করিয়া হাসিতে পারে না? তার বদলে কতকগুলো আজেবাজে বকে—বোঝার চেয়ে অনেক বেশি ভুল-বোঝার সৃষ্টি হয়।

বিকালবেলা স্কুল-কলেজ থেকে মেয়েরা ফিরিতে শুরু করে। আগে স্কুলের ছোটো-ছোটো মেয়েরা ফেরে। তারা ছুটিয়া ঘরের মধ্যে কোনো-রকমে বইগুলি ফেলিয়া দিয়া মাধবীর ঘরে আসিয়া ঢোকে—মাধবী মাসী, খিদে পেয়েছে। তারপর কলেজের বয়স্কা মেয়েরা ফেরে, তারা এখন ছুটিয়া চলা ছাড়িয়াছে; ঘরে আসিয়া বই-খাতাপত্র রাখিতে কিছু সময় তারা নেয়, তারপরে একে-একে আসিয়া মাধবীর ঘরে বসে। 'খিদে পেয়েছে' এ-কথাটা মুখে বলে না, কিন্তু মাধবী বুঝিতে পারে। মাধবী একবার হাসিয়া হাতের সেলাইটা রাখিয়া দিয়া উঠিয়া খাবার ঘরের দিকে যায়—সকলে

তাহাকে অনুসরণ করে। জল খাওয়া শেষ হইলে মেয়েরা খেলাধুলা করিতে যায়, কেহ বা বেড়াইতে বাহির হয়, তখন মাধবী আবার ফিরিয়া আসিয়া সেলাইটি তুলিয়া নেয়। তাহার মন কি ভাবিতে থাকে, অভ্যস্ত আঙুলগুলি কাঁটা চালাইয়া নিয়মিত পথে বুনিয়া চলে। তার আর বিরাম নাই। কাঁটার টানে উলের পুঞ্জীভূত স্ফীত গোলকটা ক্রমে ছোটো হইয়া আসিতে আসিতে হঠাৎ এক সময়ে ফুরাইয়া যায়, তবু আঙুলের চলার বিরাম নাই! এমন সময়ে লেডি-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হয়তো পাশ দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি ডাক দিয়া বলেন—'মাধবী মাসী, আলোটা জ্বেলে নাও। চোখ দুটো যে যাবে।'

মাধবীর ধ্যান ভাঙিয়া যায়, দেখে ঘর অনেকক্ষণ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে; সে চট করিয়া বিদ্যুতের আলোটা জ্বালায়; দেখে উল অনেকক্ষণ ফুরাইয়া গিয়াছে; বিনা সুতায় কি বুননই না সে বুনিতেছিলো! একবার সে হাসে। কি মনে পড়ে? হয়তো নিজের জীবনের ইতিহাসটাই মনে পড়ে। তার জীবনও তো বিনা সূতায় বোনা না-হওয়া একখানা কিঙ্খাবের পর্দা। সূতাও নাই, পর্দাও নাই, শুধু অদৃষ্টের হাতের সূচী-চালনা আছে, আর তার আঘাত আছে।

খেলা শেষ করিয়া মেয়েরা ফেরে, বেড়াইয়া মেয়েরা ফেরে। প্রথমে সকলে আসিয়া মাধবীর ঘরে একবার হাজিরা দেয়। তাহাদের সারাদিনের অভিজ্ঞতা মাধবী মাসীর জন্য সঞ্চিত হইয়া আছে।

'—মাধবী মাসী, অন্তু আজ পড়া পারেনি।'

'—তাই বই কি! আচ্ছা মাধবী মাসী, মিশরের রাজধানীর নাম জেনে কি লাভ হবে?'

'—নইলে ভূগোল জানবে কি করে?'

মাধবী বাদী-বিবাদী দু'জনের দিকে তাকাইয়া একবার করিয়া হাসে; মিশরের রাজধানীর পরিচয় জানার অনুকূলে-প্রতিকূলে দুইজনেই সেই হাসিতে নিজের সমর্থন খুঁজিয়া পায়।

মাধবী বলে—'এবার একটু পড়তে বসোগে।'

ছোটো মেয়েরা হুড়দাড় করিয়া প্রস্থান করে, বোধকরি, পড়িবার উদ্দেশ্যেই তাহারা চলিয়া যায়।

বড়ো মেয়েরা তখনো উঠে না। তাহারা কথা বলিয়া যায়, মাধবী বুনিতে বুনিতে শোনে।

'—মাধবী মাসী, এবারে আর পাস করতে পারবো না।'

'—মাধবী মাসী, ও পাশ না-করলে আমরা সবাই ফেল।'

'—আচ্ছা, কি যে বলো? এ বছর কতদিন অসুখে ভুগলাম জানো তো!'

'—পাশ করবেই। বড়ো-জোর স্কলারশিপ না পেতে পারো।'

'—তাহলে এম-এ পড়বো কি করে?'

অনিতা ও বিনতার কথোপকথন; মাধবী মাসী শ্রোতা।

মিশরের রাজধানীর নাম কাইরো, কাইরো....

'—চিনিসের পুত্র আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট—দি গ্রেট...'

'—বু....বু...বু...'

—'উঁ...উঁ...উঁ....'

মাধবী মাসী হাসিলো। মেয়েরা হাসিলো। সকলেই বুঝিলো ভৌগলিক রস্ত ও ঐতিহাসিক অস্ত প্রতিযোগিতা করিতে-করিতে পরস্পরকে নিরস্ত করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া একবার পরস্পরের প্রতি মুখ ভেঙচাইলো। পাশের ঘরের অদৃশ্য যুগল-মুখভঙ্গী মনে করিয়া আবার সকলে একবার হাসিলো। মাধবী মাসীও হাসিলো।

বড়ো মেয়েদের উঠিয়া যাও বলিতে হয় না। নিজের গরজেই তাহারা উঠিয়া যায়, লেখাপড়ার গরজ তাহাদের আছে। তবে লেখা বলিতে চিঠি লেখাও বুঝাইতে পারে, পড়া বলিতে চিঠি পড়া বোঝাও অসম্ভব নয়।

রাত দশটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া মিটিয়া বোর্ডিং নিস্তব্ধ হইয়া যায়, পাড়াতে সাড়া-শব্দ থাকে না; কেবল মাধবীর ঘরের বাতিটির বিরাম নাই, আর বিরাম নাই তার আঙুলগুলির। সে অনন্য মনে সাদা জমিনের উপর সুতার ফুল কাটিয়া চলিয়াছে, ওই অন্ধকার জমিনে জোনাকির জ্বলা-নেভা যেমন ফুল কাটিতেছে; নিশান্তের প্রকৃতি উন্মুখ ফুলের কুঁড়িগুলিকে ফুটাইয়া তুলিবার উপক্রম করিয়া সবুজের জমিনে ফুল কাটিবার আয়োজন করিতেছে; কোনো সাড়া নাই, শব্দ নাই, কোনোপ্রকার গতির চেষ্টা-মাত্র যেন নাই;

বিশ্ব যেন রাত্রির অন্ধকারের গোলকধাঁধাঁর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া ঘুরিয়া-ঘুরিয়া হতাশ হইয়া অবশেষে বসিয়া পড়িয়াছে। কেবল মাধবীর ঘরের ঘড়িটার দুঃসাহসী কাঁটা দু'টির দুস্তর কাল-সমুদ্রের মধ্যে তালে-তালে দাঁড় ফেলিবার শব্দ, কেবল মাধবীর আলোকোজ্জ্বল আঙুল কয়টার অভ্যস্ত নিপুণ গতি; এইটুকু শব্দ, এইটুকু গতি না থাকিলে সমস্ত বিশ্ব-ব্যাপারকে নিস্তব্ধ, নিশ্চল বলিয়া মনে করা যাইতো।

॥ ২ ॥

মাধবীর বিস্তৃত পরিচয় অফিসের দপ্তরে হয়তো কোথাও আছে। কিন্তু লোকে তার বিষয়ে খুব অল্পই জানে। তার বাড়ি কোনো এক দূর পল্লীগ্রামে, নদীর ধারে, আম-কাঁঠালের ছায়ায়। কিন্তু বাড়ি যাইতে কেহ কখনো তাহাকে দেখে নাই; লোকের যতদূর মনে পড়ে, সে এই বোর্ডিঙেরই যেন সজীব, স্থাবর একটা চিহ্ন! যেমন ওই শিরীষের গাছটা, গভীর ইঁদারাটা, ঝুম্‌কো-লতার দেউড়িটা, তেমনি বোর্ডিঙের মাধবী মাসী।

সে অল্প বয়সে বিধবা। পরনে শুভ্র থান শাড়ি, গায়ের রং ফর্সা, কিছু হাসিতে স্বচ্ছতা, সব মিলিয়া যেন একটি বৃষ্টিস্নাত রজনীগন্ধার ঝাড়। কিন্তু ভালো করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, তাহার মুখে কেমন একটা ক্লান্ত প্রশান্তির ছায়া; রবিবার বিকালের মধ্যে কেমন একটি বিষণ্ণ ক্লান্তি আছে, চারিদিকে হাঁকডাক, ছুটোছুটি, আমোদ-প্রমোদ, সবই আছে, কিন্তু সবই কেমন যেন এক-প্রকার মেঘের ছায়াতে ম্লান, মাধবীর মুখে অনেকটা সেই রকমের ভাব।

বোর্ডিঙের মেয়েদের সঙ্গ সে পায় বটে, কিন্তু তাহার কোনো সঙ্গী নাই; পুরাপুরি তাহার সঙ্গে কেহ মিশিতে পারে নাই; খানিকটা অগ্রসর হইয়াই থামিয়া যাইতে হয়। সে একটা কাচের আবরণের ওপারের জিনিস; দেখা যায়, কিন্তু হাত পৌঁছায় না। তাহার বয়স কতো—এ প্রশ্ন কখনো কাহারও মনে জাগে নাই; অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিলো,

এইটুকু মাত্র সবাই জানে। বোধ-করি মাধবী নিজেও নিজের বয়স ভুলিয়া গিয়াছে। আর মনেই বা থাকিবে কি করিয়া? তুলনায় বয়স সম্বন্ধে মানুষ সচেতন থাকে। ছোটবেলা মা-বাপ, ভাই-বোন আছে; তারপরে প্রণয়ী আছে, স্বামী আছে; তারপরে আবার ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি আছে। কিন্তু মাধবীর তো কেহই নাই। উত্তর মেরুর নির্জনতায় গিয়া কিছুকাল থাকিলে মানুষ যেমন বয়স ভুলিয়া যায়, মাধবীরও তেমনি ঘটিয়াছে; সে সংসারের উত্তর মেরুর চিরধবল, চির-নির্জন শূন্যতার অধিবাসিনী; তাই তাহার হাসিতে, বসনে, মুখের ভাবে মেরু-সুলভ এক প্রকার শীতল শুভ্রতা। কিন্তু মেরুর বরফের চাপার তালেও নাকি আগ্নেয়গিরি আছে বলিয়া শোনা যায়।

॥ ৩ ॥

বোর্ডিঙে তো বছরের পর বছর কতো মেয়েই আসে, কতো মেয়েই চলিয়া যায়; সকলেই মাধবীর স্নেহ পায়, অনেকেই সঙ্গ পায়, তবু কেহ তাহার সঙ্গী হইতে পায় না। কিন্তু বিনতার সঙ্গে মাধবীর একটু বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, যদি মাধবীর সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠতা শব্দটা ব্যবহার করা চলে!

বিনতার প্রতিদিন মাধবীর কাছে চুল বাঁধা চাই। রবিবার ছুটি বলিয়া চুল বাঁধা কিছু দীর্ঘকাল ধরিয়া চলে। চুল বাঁধার মস্ত সুবিধা এই যে, কেহ কাহারো মুখ দেখিতে পায় না বলিয়া মনের কথা বেশ খুলিয়া বলিতে পারে।

বিনতা জিজ্ঞাসা করিলো—‘আচ্ছা, মাধবী মাসী, স্বামীকে তোমার মনে পড়ে?’

মাধবী বলিলো—‘না।’

বিনতা আবার জিজ্ঞাসা করিতো—‘একেবারে না?’

মাধবী বলিলো—‘কিছুই না।’

‘—আচ্ছা, মাধবী মাসী; তোমার ক’বছর বয়েসে বিয়ে হয়েছিলো?’

মাধবী আচ্ছা করিয়া চুলের ফিতা আঁটিতে-আঁটিতে বলিলো—'ন'বছরে।'

'—তিনি মারা গেলেন কবে?'

ততক্ষণ বেণী প্রায় কুণ্ডলিত হইয়া উঠিয়াছে।

মাধবী বলিলো—'বিয়ের এক বছর পরে।'

বিনতা জিজ্ঞাসা করিলো—'এই এক বছর তো তাঁকে দেখেছিলে?'

মাধবী খোঁপার উপরে কয়েকটা আঘাত করিয়া সেটাকে মানানসই করিতে করিতে বলিলো—'তিন-চারবার।'

'—তবু মনে পড়ে না?'

মাধবী এবার বলিলো—'মনে পড়ে বইকি?'

বিনতা সাগ্রহে বলিলো—'কি রকম?'

'—একটা কনুই-এর মতো।'

মাধবী বলিলো—'তার আর কিছু মনে নেই, কেবল তার কনুইটা মনে আছে।'

বিনতা মুখ না ফিরাইয়াও বুঝিতে পারিলো মাধবী একবার হাসিলো। কিন্তু বিনতা হাসিতে পারিলো না। তাহার পর কয়েকদিন ধরিয়া বিনতার মনে মাধবীর কনুইরূপ স্বামীর কথা ঘুরিয়া-ফিরিয়া খোঁচা দিতে লাগিলো। কাজেই সেটাকে মাধবীর একটা পরিহাস ভাবিয়া লঘু করিয়া উড়াইয়া দিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলো। অবশেষে অন্যান্য মেয়ের মতো বিনতাও একদিন কলেজের পড়া শেষ করিয়া বোর্ডিং ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

একদিন মাধবীর নামে একখানা চিঠি আসিলো; চিঠিপত্র তার নামে বড়ো আসে না। মাধবী চিঠি খুলিয়া দেখিলো, বিনতা লিখিতেছে, আগামী ২৩শে তারিখে তাহার বিবাহ। বিনতার বিবাহ! মাধবী চমকিয়া উঠিলো—তবে তো ইতিমধ্যেই অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে! হিসাব করিয়া দেখিলো বিনতার বি, এ, পাশ করিবার পরে দুই বছরের বেশি অতিক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু যেন সেদিনের কথা মাত্র—চুল বাঁধিতে বাঁধিতে গল্প করিতেছিলো!

বিনতার বিবাহে মাধবীর যাওয়া সম্ভব হইলো না। সে নিজের হাতের তৈরি একটি জামা বিনতাকে পাঠাইয়া দিলো। আর মনে-মনে ওই তারিখটিতে একটা লাল চিহ্ন দিয়া রাখিলো। প্রতি বছর ওইদিন একটি করিয়া জামা তাহার নামে ডাকে পাঠাইয়া দিতো।

এই রকম করিয়া দিন যায়, বছর যায়, কিন্তু কতদিন গেল, কতো বছর গেল, মাধবী তাহা যেন জানিয়াও জানিতে পারে না। একদিন বিকালবেলা, মেয়েরা যখন খেলাধুলা করিতে গিয়াছে, বোর্ডিং যখন শূন্যপ্রায়, তাহার ঘরের সম্মুখে একখানা গাড়ি আসিয়া থামিলো। সে সচকিত হইয়া উঠিবার আগেই বিনতা ঘরে প্রবেশ করিলো।

'—মাধবী মাসী, দেখা করতে এলাম।'

মাধবী খুশি হইয়া হাতের সেলাই রাখিয়া বলিলো—'বিনতা, আয়, বস্। সঙ্গে ওটি কে?'

বিনতা বলিলো—'ওর জন্যেই তো এলাম। আমার মেয়ে, মমতা। এবারে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছে।'—এই বলিয়া মমতাকে বলিলো—'নাও, মাধবী মাসীকে প্রণাম করো। আমাদের মাসী।'

মমতা প্রণাম করিলো।

বিনতা বলিয়া চলিলো—'ওকে বোর্ডিঙে রাখতে হবে। তোমার কাছে ছাড়া কোথায় আর রাখি! তাই তোমার হাতে দিয়ে গেলাম।'

মাধবী উঠিয়া দুইজনকে খাইতে দিলো। আহারাদি করিয়া মমতাকে মাধবীর কাছে রাখিয়া বিনতা চলিয়া গেল; সে কন্যার বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হইলো।

সারারাত্রি মাধবীর ঘুম হইলো না, অভ্যস্ত সেলাইয়ে বারংবার ছেদ পড়িতে লাগিলো। তাহার মনে হইতে লাগিলো, পাশের ঘরে মমতা ঘুমাইতেছে—বিনতার মেয়ে। তবে এর মধ্যে অনেক বছর চলিয়া গিয়াছে, অনেক বছর। আচ্ছা, কতো বছর দেখাই যাক্ না। হিসাব করিয়া দেখিলো প্রায় পনেরো বছর। বিনতার বিবাহের পরে পনেরো বছর। পনেরোটা জামা তাহা হইলে সে পাঠাইয়াছে। এতকাল সে যন্ত্রচালিতের মতো বছরে-বছরে বিবাহের তারিখে জামা পাঠাইয়া দিতো—কখনো হিসাব

করিয়া দেখে নাই—কতো বছর গেল। এইবার প্রথম মাধবী বছরের হিসাব করিলো। সে বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলো, যে পনেরো বছর সঞ্চিত হইয়া মমতার জীবনে যুক্ত হইয়াছে, সেই পনেরো বছর তো কাল-তরঙ্গের আঘাতে তাহার জীবন হইতেও ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। কালের গতি অতি সাধারণ অভিজ্ঞতা—কিন্তু মাধবীর কাছে তাহা অতিশয় অসাধারণ বলিয়া মনে হইলো।

বায়ুহীন কাচের পাত্রে কোনো পদার্থ রাখিলে তাহা অবিকৃত থাকিয়া যায়, মাধবীও সেই রকম একটা মানসিক কাল-শূন্যতার মধ্যে এতদিন যেন ছিলো ; কাল সম্বন্ধে সে সচেতন ছিলো না বলিয়া জরা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। এবারে মমতার পরিচয়ের ফাটল দিয়া কাল-জগতের হাওয়া তাহাকে স্পর্শ করিলো, জরা অত্যন্ত ধীরে-ধীরে, কিন্তু অত্যন্ত নিঃসংশয়িতরূপে তাহাকে আক্রমণ করিতে শুরু করিলো।

মাধবীর কাজকর্ম সমস্তই পুরাতন পথে চলে বটে, কিন্তু সে আর কাল-শূন্যতায় ফিরিয়া যাইতে পারে না ; মমতাকে যখনই দেখে অমনি কালের ব্যবহার সম্বন্ধে সে সজাগ হইয়া উঠে। মমতাকে সে ভালোবাসে বোর্ডিঙের মেয়ে বলিয়া, তাহাদের চেয়েও বেশি ভালোবাসে বিনতার মেয়ে বলিয়া, কিন্তু তবু তাহাকে কেন যেন সম্পূর্ণ সহ্য করিতে পারে না! মমতা তাহার কাছে কালের সতর্কবাণী!

একদিন লেডি-সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বলিলেন—'মাধবী মাসী, তোমার চেহারা এমন খারাপ হলো কেন? রাত জেগে সেলাই করা বন্ধ করো। যাওনা, এবার পূজোর ছুটিতে কোথাও বেড়িয়ে এসো গিয়ে।'

মেয়েরা বলে—'মাধবী মাসী, তুমি কেমন যেন বুড়ো হয়ে গেলে!'

'—ছিঃ ছিঃ, বুড়ো মাসী নিয়ে আমাদের লজ্জা করবে যে!'

ঝি-চাকরেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে—'মাধবী মাসীর বয়েস হয়েছে। আর বেশিদিন নয়!'

মাধবী শোনে আর অবাক্ হয়ে ভাবে—মমতার প্রতি কেমন একরূপ অসহিষ্ণুতা অনুভব করে, মমতাকে আরও বেশি করিয়া ভালোবাসে।

আগে সময় কেমন করিয়া যাইতো মাধবী বুঝিতে পারিতো না,

এখন তাহার সময় যাইতে চাহে না! মাধবী সেলাই করিতেছে, পাশের ঘর হইতে মমতার কণ্ঠ শব্দভেদী বাণের মতো তাহার অপসৃত যৌবনের ক্ষীণ লক্ষ্যটার উপরে নির্ঘাত আসিয়া আঘাত করিলো; মাধবীর সেলাই হাত হইতে পড়িয়া গেল। মাধবী অনেক কষ্টে একটা পদ্ম তুলিয়াছে, এখন তাহার উপর ভ্রমরটি বসাইলেই হয়, কোথা হইতে মমতার উচ্ছলিত খিলখিল হাসি অদৃষ্টের নিপুণ হস্তনিক্ষিপ্ত পাশার মতো চিক্কণ শব্দ তুলিয়া তাহার জীবন-ছকের উপর পড়িয়া সযত্নে সাজানো সব গুটি ওলট-পালট করিয়া দিলো, মাধবীর ভীত-ভ্রমর কোন্ পথে যে পলায়, সে বুঝিতেই পারে না! অবশেষে মাধবীও বুঝিতে পারে সে বুড়া হইয়া পড়িয়াছে।

আগের মতই সে রাত্রি জাগিয়া সেলাই করিতে বসে বটে, কিন্তু রাত্রি জাগাই হয়, সেলাই আর হয় না। সে নিজের হারানো জীবনের দরজায় প্রহরীর মতো একাকী জাগিয়া বসিয়া থাকে। আকাশে তারা নড়ে, পৃথিবীতে শিশির ঝরে, জোনাকির জ্বলা-নেভা অন্ধকারে জমিতে আগুনের ফুল কাটিতে থাকে, ঘড়ির কাঁটা প্রত্যেক মুহূর্তটিকে বাজাইয়া-বাজাইয়া গ্রহণ করে, কেবল মাধবীর আঙুল আর চলে না, তাহার সূতা আর ফুরায় না, অসমাপ্ত পদ্মের দিক হইতে দৃষ্টি বিলুপ্ত দিগন্তের দিকে কখন নিক্ষিপ্ত হয়, ওখান দিয়াই যে তাহার হারানো যৌবন কোন্ প্রত্যাবর্তনহীন শূন্যতার মধ্যে প্রস্থান করিয়াছে!

স্বাহা

যুবনাশ্ব

কম্পিত ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে ধরে দাস সায়েব উঠে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন। ভারী চোখের পাতার কোণ থেকে বড়ো বড়ো ফোঁটা স্ফীত নাকের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো। জানলার শার্সীতে হাত ভর দিয়ে, তারই মধ্যে মুখ গুঁজে সরকারের খেতাবী উজীর, পঞ্চাশ বছরের বুড়ো দাস সায়েব ছেলেমানুষের মতো ফুঁপিয়ে উঠলেন। আবেগ-প্রাবল্যে তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত কেঁপে উঠতে লাগলো।

নিচে লাল সুরকীর সরু রাস্তা ধরে ডাক্তারের টু-সীটার সশব্দে বেরিয়ে গেল।

পেছন থেকে মিসেস দাসের গলা শোনা গেল, 'ওগো, তুমি এতো অধীর হচ্ছো কেন? যা গেছে, তা কি ফিরবে আর? আর কষ্ট কি তোমারই একার? আর কারো বুকে কি তোমার মতই লাগেনি?…'

দাসের কাঁধে হাত রেখে মিসেস দাস কোমর থেকে একটা সিল্কের রুমাল বের করে, চোখ মুছে ও নাক ঝেড়ে, কপালে হাত দিয়ে চুল ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে বললেন, 'এখানকার যা কাজ সে সম্বন্ধে তো উদাসীন থাকলে চলবে না। সোফারকে গাড়ি দিয়ে মার্কেটে পাঠিয়েছি ফুল আনতে, রতন নিচে ফোনে বসে আছে—রাজ্যশুদ্ধ লোকের শোকপ্রকাশের জবাব দিতে।'

দাস সায়েব কাঁধ থেকে মিসেসের হাত নামিয়ে দিয়ে তাঁর দিকে না তাকিয়ে ক্লান্ত ধরা গলায় বললেন, 'আমায় মাপ করো লীলা, যা করবার তুমিই করো, ও-সব তুমিই ভালো বোঝো। আমি একটু একা থাকতে চাই।' বলে স্খলিত পায়ে তিনি ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মিসেস মিনিট-খানেক বোকার মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কাঁধ-ঝাড়া দিয়ে স্বামীর উদ্দেশে বললেন, 'মেয়ে তোমার শুধু একারই মরেনি, তাই বলে ঢঙ করতে শিখিনি আমরা। বাড়াবাড়ি কিছুরই ভালো নয়, দু'ফোঁটা চোখের জল বেশি ফেললেই কি আর মরা মেয়ে ফিরে আসবে? যখনকার যা, তখনকার তা। মেয়ের শোকে এখনকার কর্তব্য ভুললে চলবে কেন?....দেখি কাদের ওখানে থেকে আবার ফুল নিয়ে চিঠি এসেচে, জবাবটা লিখে দিগে—'

আর একবার কপালে ও চুলে হাত বুলিয়ে তিনি দ্রুতপদে নিচে নেমে গেলেন।

ড্রইংরুমের দক্ষিণে লটির শোবার ঘর। একটা দরজা মাঝে, ভারী পর্দা দিয়ে ঢাকা। ঘরের সাথে পশ্চিমে স্নানের ঘর, পূবে চওড়া বারান্দা, টবে ও অর্কিডে সাজানো। সেদিকে দুটো দরজা। ঘরের ঠিক মাঝখানে চওড়া খাটটার ওপর আপাদমস্তক কাশ্মীরী চাদরে ঢাকা, তেইশের কোঠা না পেরতেই অচিন পথের দেওয়ানা, লটি দাস শুয়ে আছে। দু'একগাছা চুল বালিশের ওপর দিয়ে এসে এপাশে-ওপাশে ঝুলছে। শোয়ার ধরণ-ধারণ এতো স্বাভাবিক যে, দেখলে মনে হয় রোজ যেমন সে খাওয়ার পর একটা বই হাতে করে শুয়েই অমনি ঘুমিয়ে পড়তো, আজো তেমনি পড়েছে। মাথার দিকে আয়নার টেবিলে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তেমনি সাজানো। আজ কেবল রূপোর চিরুণীটার দাঁতের ফাঁকে একগাছা চুলও বেধে নেই, আর টেবিলের চকচকে মেহগ্নিতে এক ফোঁটা পাউডারও পড়েনি।

লটির হাত দু'খানা বুকের ওপর, মাথাটা ডাইনে কাঁধের দিকে একটু হেলানো। চাদরের ভেতর দিয়ে আর কিছু দেখা যায় না।

কিন্তু কেউ যদি মুখের চাদরটা উঠিয়ে ফেলতো, তবে দেখতে পেতো, লটির আজকের ঘুম প্রকাণ্ড প্রশান্তির ঘুম নয়। অল্প ফাঁক ঠোঁট দু'টোতে অতৃপ্তির প্রত্যাশা মাখানো। মুদিত চোখের কোণ বেয়ে যে অশ্রুধারা ছাপ রেখে গেছে, তার উৎস শুধু দৈহিক যন্ত্রণাই খুলে দেয়নি। নাকের ডগার যে লালিমাটুকু মরণ এখনো মুছে নিতে পারেনি, তার পেছনে অনেক অনুক্ত বেদনার কাহিনী পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।

লটি দাস···সোসাইটির নামকরা সুন্দরী মেয়ে লটি! রূপে-গুণে তার তুলনা ছিলো না। যে পার্টিতে তার যাওয়া হতো না, সেখানকার ছেলে-বুড়ো সবাই মন-মরা হয়ে উঠতো তার অভাবে। যে ডিনারে সে যোগ দিতো না, সেখানকার প্রত্যেকটি ডিশ বিস্বাদ হয়ে উঠতো। তার একটা কথা রাখবার জন্যে দরকার হলে কেউ-কেউ প্রাণ দিতে পারতো। ছোকরা ব্যারিষ্টার সরকার বিলেত থেকে গোঁফের ধার ছেঁটে মর্কট সেজে এসেছিলো। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, কেউ তাকে বড়ো করে রাখতে অথবা কমিয়ে ফেলতে রাজি করাতে পারেনি। লটির একবার নাক সেঁটকানোর মর্জিতে সে-জোড়া সমূলে অন্তর্হিত হয়েছিলো। ষাট বছরের বুড়ো, পেনশানভোগী সিবিলিয়ান হালদার সায়েব, তাঁর তিরিশ বছরের মৌতাত হাভানা সুদ্ধ লটিকে তুষ্ট করবার জন্যে ছেড়ে, সিগারেট ধরেছিলেন। সমাজে লটির প্রতিপত্তি ছিলো অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মতো।

ঘণ্টা দুই-আড়াই হলো লটির মৃত্যু হয়েছে, এরই মধ্যে ফোনে ও লোকের মারফৎ খোঁজ-খবরের ভিড় শুরু হয়ে গেচে। একতলার হল-কামরা কালো পোশাকে ও ক্রেপে অন্ধকার হয়ে উঠেছে। সাদা ফুল লটির ঘরে আসছে, ঘর ভরে উঠলো বলে। সমাগত শোক প্রকাশকদের নিয়ে মিসেস দাসের ব্যস্ততার আর অবধি নেই। আদর, অভ্যর্থনা, ঘন-ঘন শুকনো চোখে রেশমি রুমাল ঝুলোনো, 'মিষ্টার দাসের হঠাৎ এই খানিক আগে শরীরটা'—বলে তাঁর হয়ে মাপ চাওয়া—অনবরত চলছে। অভ্যাগতদের মধ্যে কলকাতার বড়োদরের কতিপয় ইংরেজ ও বহু বাঙালী সায়েব-মেমের মধ্যে বিশেষ কেউ আর বাকি নেই। কেউ বিষণ্ণ মুখে চুপ করে আছেন, কেউ মিসেস দাসকে দু'একটা সান্ত্বনার কথা বলছেন—কেউ চাপা গলায় অস্ফুটস্বরে লটির বিষয়ই আলোচনা করছেন।

যাঁরা আসতে পারেননি তাঁদের মধ্যেও লটির মৃত্যুসংবাদ কম আলোড়নের সৃষ্টি করেনি। কেউ হয়তো হাইকোর্ট বেরোবার মুখে খবর পেয়ে ফিরে এসেছেন, 'লটি, লটি দাস! এমন হঠাৎ—কেন, কি হয়েছিল তার! এমন শক্ত কিছু হয়েচে বল তো আগে শুনিনি—'

একটু-একটু করে তাঁর মাথায় সমস্ত স্মৃতি একের পর এক ভেসে উঠেছে।

স্বাহা

লটি আমায় ছুটো ফুল দিয়েছিলো দে'র গার্ডেন পার্টিতে। দিন-কয়েক পর আমি একটা ব্রোচ প্রেজেন্ট নিয়ে যেতে তার মুখ ভার···শেষে মায়ের তাড়ায় বেচারিকে রাজি হতে হলো। মিসেস সরকারের বুক্-টিতে সে way of an eagle হয়ে গেছলো। প্রথম ধরি আমি—good gracious ! ওকি বারোটা! ডি, সি-র সাথে একটা কনসলটেশন ছিলো যে—ঘড়িটা বেগড়ায়নি তো !....

সকাল প্রায় সাতটায় লটির মৃত্যু হয়েছে। শরীরটা অসুস্থ ছিলো ক'দিন থেকে, কাল সারাদিন ঘর থেকে বেরই হয়নি। আজো সকালে চা খেয়েছে ঘরেই। খানিকক্ষণ পরে বাথরুমে গোঙানির শব্দ শুনে মিসেস দাস ছুটে গিয়ে দেখেন, সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আসল ব্যাপার কি, আর কারো জানা না থাকলেও মিসেসের অজানা ছিলো না। কিন্তু সে-কথা তিনি যে জন্যেই হোক, কাউকে বলা উচিত মনে করেননি। সেবা-শুশ্রূষা ডাক্তার—কিছুরই ত্রুটি হয়নি, তবু তাকে ধরে রাখা গেল না, যে মায়ের কথা সে জীবনে কোনদিন ঠেলেনি, তাঁর সহস্র কাতরোক্তিতেও না।

ডাক্তার পরীক্ষা করে সবই বুঝতে পেরেছিলেন, দাস সায়েবকে বলেও গেছেন। কিন্তু সে তো বাইরে বলা চলে না। মিসেস দাস সবায়ের প্রশ্নের জবাবে বলছেন, 'না। স্লিপ করে বাথরুমে পড়ে গিয়ে মাথা ঠুকে যায় ওয়াশ বেসিনের কানায়; ব্রেইন কঙ্কাশন, ছু'ঘণ্টা পুরোও রাখা গেল না—সঙ্গে সঙ্গে চোখে রুমাল।

মিসেস দাসকে হৃদয়হীনা মনে করলে ভুল করা হবে। হৃদয় তাঁর সত্যিই ছিলো, শুধু মায়া-মমতার জায়গায় সোসাইটি ও ফ্যাশন তাঁর সবটুকু জুড়ে ছিলো। নিজে তিনি ছা-পোষা ঘরের মেয়ে। পঁচিশ বছর আগে যখন ডেপুটি নরেন দাসের সাথে তাঁর বিয়ে হয়, দাস তখন যাযাবর বৃত্তি ধরে বাংলাদেশের মহকুমায়-মহকুমায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

দাসের মতামত বরাবরই একটু সায়েবী। ওটা পৈতৃক উত্তরাধিকার, তাঁর বাবা রমেশ দত্তদের আমলের ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন হিন্দু ছিলেন। কিন্তু স্ত্রীর বিলিতিয়ানায় তাঁকেও মাঝে-মাঝে ব্যস্ত হয়ে উঠতে হতো। মুখে কিছু বলা সম্ভব হতো না, কিন্তু মনে মনে তিনি স্ত্রীর ধরণ-ধারণ অপছন্দ করতে শুরু করলেন।

বিয়ের বছর-তিনেক পর যখন লটি হলো, মিসেসের নব উন্মেষিত সভ্যতার চক্ষু গিয়ে তার ওপর পড়লো। স্বামীর কাছে আমল না পেয়ে তিনি মেয়ের শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে পড়লেন। লটির বছর ন'য়েক বয়সের সময় তিনি স্বামীর কর্মস্থল পিরোজপুর মহকুমা ত্যাগ করে সকন্যা দার্জিলিং-এ সমারূঢ়া হলেন। উদ্দেশ্য স্থায়ী অবস্থান, উপলক্ষ্য মেয়ের শিক্ষা।

মায়ের নিপুণ তত্ত্বাবধানে মেয়ের পড়া ও তার ফিরিঙ্গীয়ানা তড়িৎ-গতিতে অগ্রসর হতে লাগলো। সতেরো বছর বয়সে লটি পিয়ার্সন ম্যাগাজিনে কবিতা ও ত্রিলোক মানে তিন্‌ঠো আদমী বলতে শিখলো।

কুড়ি বছর বয়সে তার পিয়ানো বাদন ও ইংরেজি অভিনয় পটুতার খ্যাতি দার্জিলিং মেলে সাঁড়া ব্রিজ পার হয়ে কলকাতায় এসে পেঁছালো।

এই সময় একদিন 'কলকাতা গেজেটে' খবর বেরোলো যে, দাস সায়েব অস্থায়ীভাবে অতিরিক্ত জেলা কালেকটরের পদে উন্নতি হয়ে আলিপুরে বদলি হয়েছেন।

কলকাতায় এসে প্রথম শ্রেণীর ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে মিশতে ডেপুটি-জায়ার যে অসুবিধে, মেয়ের দৌলতে মিসেস দাস তা কাটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। লটির খ্যাতি প্রতিপত্তির জোরে হোমরা-চোমরা বাঙালি সায়েব-মেম মহলের সব দরজাই তাঁর জন্যে উন্মুক্ত হতে লাগলো।

লোয়ার সারকুলার রোডের এক ফ্ল্যাটে দাস সায়েব বাসা নিয়েছিলেন। আসবাবপত্র এলো পার্ক স্ট্রীটের বিলিতি দোকান থেকে, মোটরও এলো একখানা—ফোর্ড। মোটর নিয়ে সায়েব-মেমে প্রথম দিনেই বচসা হয়ে গেল। মিসেস বললেন, 'আমি হেঁটে বেড়াবো সেও ভালো, কিন্তু তোমার কলের টমটমে চড়তে পারবো না।'

দাস ফাইল থেকে মুখ না তুলেই বললেন, 'বেশ তো! বয়েস হলে হাঁটার মতো ভালো জিনিস কি আর আছে?'

মিসেস ঠাট্টা গায়ে না মেখে বললেন, 'মল্লিক সায়েবের মেম ডেমলার কিনলো সেদিন, তারাও তো আর ক্যাশ সব টাকা দেয়নি!'

'—সত্যি কথা। মল্লিক নগদ দেয়নি, কিন্তু দেবে। অর্থাৎ দিতে পারবে। কারণ, মাস গেলে সে বেতন পায় সাতশশো, আর আমার?

শ্বাহা

হপ্তা-খানেকও হয়নি, সাড়ে আটশোর কোটা পেরিয়ে বারোশো পঁচাত্তরে ঠেকেছে।’

জবাবে মিসেস দুর্বোধ্যভাবে যা-তা বলে উঠে গেলেন।

কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে ওই ফোর্ড-গাড়ি, কলকাতার সবচেয়ে দামী গাড়ি হয়ে উঠলো। ওই গাড়িতে লটির পাশে একটু বসবার জায়গা পেলে, বহুৎ রোলস মিনার্ভা-র মালিকও নিজেকে ধন্য মনে করতে লাগলেন। দেখে-শুনে, মিসেস দাস হেঁটে বেড়ানর শুভ-সঙ্কল্প ত্যাগ করলেন।

সোসাইটি পুরোমাত্রায় চলতে লাগলো।

দিন-কতক পর একদিন রাতে শুতে যাবার আগে দাস সায়েব মিসেসকে বললেন, ‘ছাখো, মল্লিকের ছেলের সঙ্গে লটির বেশি মেলামেশা আমি পছন্দ করিনে।’

মিসেস ভ্রু কপালে তুলে বললেন, ‘কে, টুটু? The finest young man in society! তেরো বছর বিলেতে ছিলো, পাব্লিক স্কুল আর—’

‘জানি। একটি আস্ত বাঁদর হয়ে ফিরে এসেচে, তাও জানি।’

‘—কে বললো তোমায়? নিশ্চয়ই কেউ চুকলি করেচে। ওগো, ঘটে যদি তোমার একটুও বুদ্ধি থাকতো, তবে তুমি এ-সব ভাবতেও না। অমন বাপ-মায়ের ছেলে, জুনিয়ারদের মধ্যে পসারও হয়েচে মন্দ নয়। আর তাছাড়া—ও-ও লটিকে, ইয়ে, খুব সাধারণভাবে দেখে না। কে কোথায় কি কানে তুলেচে, তাই তাকে cut করতে হবে?’

স্ত্রীর দিকে একটু কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাস বললেন, ‘শোনো লীলা, অতো কথা আমি শুনতে চাইনে, বুঝতেও চাইনে। I don’t want Mullick Jr to get thick with Lottie ব্যস্।

তিনি বিছানায় গিয়ে উঠলেন।

মিসেস কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন। তারপর তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে উঠলেন, ‘ইস! ভারি তো!’

মুখে বললেন বটে, ইস্, কিন্তু স্বামীকে তিনি চিনতেন। বেশি কথার মানুষ তিনি নন, গায়ে পড়ে বড়ো-কিছু বলতেও আসেন না। আজকের পর প্রকাশ্যভাবে টুটুর সাথে মেলামেশা যে তিনি বরদাস্ত করবেন না—এ

সুনিশ্চিত। কিন্তু তা বলে তার নিজেরও তো একটা মতামত আছে! মেয়ের ওপর দাবি কি শুধু একা বাপেরই! স্বামীর কথামতো চললে সোসাইটিতে মুখ দেখানো কঠিন হয়ে উঠবে যে। মল্লিক বাড়িতে তো ঢোকাই যাবে না—ছিঃ!

এমন সময় লটির গলা শোনা গেল, 'মাম্, মাম্,—তোমার চিঠি, নেলিদের ওখান থেকে—'

'—ইয়েস, ডিয়ার।' বলে মিসেস উঠে গেলেন।

পরদিন বিকেলে সার এস. এন. দত্তের ফটকের সামনে দাসের ফোর্ড এসে দাঁড়াতেই ইজের-কোর্তার তবক-জোড়া কয়েকজন ইয়ং-মেন এগিয়ে এসে মিসেস ও মিস দাসকে অভ্যর্থনা করে নামিয়ে নিলো।

শেষ টান দিয়ে সিগারেটের পোড়া টুকরোটা ছুড়ে ফেলে টুটু মল্লিক বললো, 'by jove, Baby, you are late! ঝাড়া একঘণ্টা আমরা তোমার পথ-চেয়ে দাঁড়িয়ে! Couldn't you come earlier?'

মৃদু হেসে লটি বললো, 'না, ড্যাডির অফিস থেকে ফিরতে বড্ড দেরি হলো আজ, তাই—'

'—Hell! চলো, মিসেস দাস এগিয়ে গেছেন।'

টুটু সিগারেট বের করে বাঁ হাতের উল্টো পিঠে ঠুকতে লাগলো।

মল্লিক জুনিয়ারকে লটি যে খুব পছন্দ করতো, তা নয়। কিন্তু মনের অপছন্দকে ব্যবহারে প্রকাশ করবার মতো সাহসও তার ছিলো না, শিক্ষাও হয়নি! টুটুর ধরণ-ধারণ ক'দিন থেকে একটু কেমন-কেমন ঠেকলেও সে কিছু গায়ে মাখেনি। চলতে-চলতে টুটু বললো, 'কি হবে এখনি ওই বুড়োদের দলে ভিড়ে? চলো, একটু বেড়ানো যাক বাগানের দিকে।'

লটি বললো, 'কিন্তু মাম miss করবে আমাকে—'

'—আশ্চর্য! তুমি কি কচি-খুকী রয়েচো এখনো? মা-র আঁচল ধরে ঘুরতে হবে!'

'—তা নয়। তবে কারো সাথে দেখা হবার আগেই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া—'

'—কি হবে দেখা করে? ওখানে গেলেই তো ভায়োলেট মিত্তিরের

ক্যাটকেটে গলার সুর ভাঁজা, না-হয় রেণু চৌধুরীর demned Bengali songs শুনতে হবে।'

'—বাংলা গান আমার খুব ভালো লাগে।'

'—কবে থেকে? সেদিন পর্যন্ত তো দেখেছি, বাংলা তুমি ভালো বোঝোই না—'

'—তারপর শিখেছি।'

অপ্রসন্ন মুখে টুটু বললো, 'বেশ, চলো তাহলে।'

দু'জনে গিয়ে ড্রইংরুমে উঠলো।

লেডি দত্ত লটির হাত ধরে বললেন, 'বড্ড দেরী হলো লটি, তোমাদের। এসো এ-ঘরে, কিছু মুখে দেবে চলো।'

গৃহকর্ত্রীর কথা শুনে অভ্যাগতদের জনকয়েক কিচির-মিচির করে উঠলো, 'oh dear, no! Don't rob us of her company!'

হালদার সায়েব পাকা ভুরু-জোড়ার ওপর প্যাঁসনেটা বসিয়ে বললেন, 'তাহলে বিভা, খাবারটাই এখানে আনার ব্যবস্থা করো। এসো গো মা লক্ষ্মী, এইখানে এসো।' তিনি হাত ধরে লটিকে নিজের পাশে বসালেন।

লটি বসে, অল্প হেসে বললো, 'আজো খেয়েছেন ওগুলো!'

একটু বিব্রত হয়ে অপরাধীর মতো হালদার বললেন, 'খুব কম মা, খুব কম। তিরিশ বছরের মৌতাত—তা আজ সমস্ত দিনে মাত্র ছ'টা খেয়েচি।'

লটি বললো, 'বারে, বেশ তো! আমি কি আপনাকে একেবারে হঠাৎ ছেড়ে দিতে বলেচি? কমাতে-কমাতে ছেড়ে দেবেন।'

হালদার আশ্বস্ত হয়ে লটির মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন, 'মা লক্ষ্মী!' তারপর সুধোলেন, 'দাস এলো না যে?'

মিত্র সায়েবের মেমের সাথে মিসেস দাস পর্দার কাপড়ের ডিজাইন নিয়ে বচসা করছিলেন; হালদার সায়েবের কথা কানে যাবামাত্র বলে উঠলেন, 'তাঁর মাথাটা বড়ো ধরেচে আজ, তাই আর বেরোতে পারলেন না।'

এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে, ভ্রুকুটি করে লটি পিয়ানোর পাশে রেণু চৌধুরীর কাছে উঠে গেল।

বাইরে, বাগানের ধারের বারান্দায় টুটু মল্লিক ও ভায়োলেট মিত্তির সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে গল্প করছিলো।

আধপোড়া সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে ভায়োলেট বললো, 'Horrid! গাঁজা!'

মল্লিক বললো, 'Sorry! my brand—'

'—I know, but not mine' বলে, ভায়োলেট আংটি-আঁটা রেশমী ব্যাগ খুলে সুদৃশ্য ছোটো সোনার কেস বের করে খুলে ধরে বললো, 'try?'

একটা তুলে, নিজের নিঃশেষিতপ্রায় সিগারেটটা থেকে ধরিয়ে নিয়ে, লম্বা এক-টান দিয়ে টুটু বললো, 'ঘাস খেলেই পারো!'

'—খাইনে বলেই তোমাকে চিনেচি। তারপর what about your latest?'

কপালে চোখ তুলে টুটু বললো, 'মানে?'

'—ন্যাকা, কিছু বোঝো না? ও-সব আমার কাছে নয়। I am—'

'—কি বাজে বক্‌চো, ভায়োলেট।'

'—আমি বাজে বক্‌চি? খ্যাপা কুকুরের মতো লটি দাসের পেছু নিয়েচো, শুধু আমি কেন, a host of others waiting! চোখ এড়ানো অতই সোজা!'

'—I say, Vi, আস্তে, আস্তে, তুমি বড্ড চেঁচিয়ে কথা কও!'

'—Fiddlesticks! What do I care? সবাই জানুক, সেই তো আমি চাই। তুমি যে কি চিজ—'

'—আহা, চটো কেন? কি করতে চাও তুমি, আমায় ফাঁসাবে? সে তুমি পারবে না, তাহলে সাথে-সাথে নিজেকে ফাঁসতে হবে এবং তোমার রাঁচির মীনা মাসী—' কথা শেষ না করে টুটু রেলিংয়ে বসে দেয়ালে ঠেস দিলো।

ভায়োলেট ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। বললো, 'ও!—That's what you are backing on? ভালো করেচো, মল্লিক জুনিয়র; মেয়েদের তুমি চেনোনি। নিজে আমি যাই করে থাকি না কেন, to save that inno-

স্বাহা

cent kind's honour, I can risk my own—এই মুহূর্তে I shall warn Lottie—এই বলে যাচ্ছি তোমাকে, আমার কথা বাদ দাও, আমি old sport, আর সবার কথা ? যারা জানে, তারা সবাই জানে—'

একটু বিব্রত হয়ে টুটু বললো, 'don't be silly, Violet! হেল্লো, এই যে সরকার, এসো এসো! ওকি, তোমার গোঁফ কোথায় গেলো? দেখেচো, ভায়োলেট—'

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মল্লিকের দিকে তাকিয়ে ভায়োলেট বললো, বাঁচলে এখনকার মতো।' তারপর সরকারের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি জানি। আর কেন কামিয়েচে তাও জানি।'

আমতা আমতা করে সরকার বললো, 'হেঃ, কি জানেন আপনি? আমার খুশি আমি কামিয়েচি।'

ভায়োলেট বললো, 'বটে, ডাকবো লটিকে ?'

মুখ চুণ করে সরকার ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে লাগলো।

মল্লিক বললো, 'কেন ওকে ঘাঁটাচ্চো, সরকার। তারচেয়ে চলো, গলাটা একটু ভিজিয়ে আসা যাক। শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেচে। যাবে নাকি, ভায়োলেট ?'

'—I refuse to drink with you.'

গলা ভিজিয়ে সরকার আর মল্লিক যখন ফিরলো, তখন পিয়ানোতে লটি গান গাইছে। একপাশে পিয়ানোয় ঠেস দিয়ে ভায়োলেট একখানা বিলিতী স্বরলিপির পাতা ওল্টাচ্ছে। আর মাঝে-মাঝে লটির মুখের দিকে তাকাচ্ছে।

সে মুখ তাকিয়ে দেখবার মতো। যথেষ্ট হিংসার কারণ থাকা সত্ত্বেও ভায়োলেট মনে মনে তারিফ না করে পারছিলো না।

লটির গান শেষ হবা-মাত্র ঘন-ঘন করতালির সাথে সবাই 'thank you, thanks' বলে চেঁচিয়ে উঠলো।

মল্লিক-জায়া বললেন, 'একখানা গেয়েই ফাঁকি দেবে ? আর একটা হোক না—সেই *lovely lady of ludlaw*—'

লটি বললো, 'বাঃ, আমি তো খানিক আগেই আরো দুখানা গেয়েছি। একা আমিই entertainment-এর ভার নেবো নাকি? আর কারো গাওয়া উচিত—'

মিসেস রায় বললেন, 'তা তো বটেই, বেচারী হয়রান হয়ে পড়েচে। তাহলে ভায়োলেট, you'r nearest the Pino—'

ভায়োলেট বললো, 'আমায় গাইতে বলার সেই বোধহয় একমাত্র কারণ? Of course, I don't mind.' বলে সে বসে পড়লো।

মিসেস রায় লজ্জিত হয়ে বললো, 'না না, তা কেন।'

লটি উঠে হালদার বুড়োর পাশে এসে বসলো। বুড়োকে সে মনে-মনে ভারী পছন্দ করতো, শ্রদ্ধাও করতো। শিশুর মতো সরল মানুষ। এই পরবেশী ও পরভাষী সামাজে তিনি যখন তাকে মা-লক্ষ্মী বলে ডাকতেন, তখন তার সত্যিই খুব ভালো লাগতো।

বসেই কব্জির দিকে তাকিয়ে লটি বললো, 'ইস্, রাত যে অনেক—'

'—ক'টা?'

'—দশটা দশ।'

'—তাহলে একটু রাত হয়েচে বটে। কেমন লাগলো তোমার আজকের পার্টি?'

'—বেশ।'

'—বিভা ভারি ভালো মানুষ, না? একটু সেকেলে, তা আমাদের কাছে তাই ভালো লাগে। হালের চালচলন পছন্দ হয় না আমার, তবে বরদাস্ত করে যাই।'

'—তাহলে আমাদের ভালো লাগে না, আপনার?'

'—তুমি বড়ো কথা কাটো, মা-লক্ষ্মী; আমি কি তাই বললুম? তবে, এই আজকালকার সবাই, এতো ছোটো সব জিনিস নিয়ে এরা থাকে, ভালো লাগে না। চালচলনও সব কেমন যেন! এই ধরো না ইয়ং মল্লিক, well, to be frank, I detest the fellow!'

টুটু মল্লিক একপাল মেয়ের মধ্যে আসর জমিয়ে বসেছিলো। লটি সেদিকে তাকিয়ে দেখলো, হালদারের কথার জবাব দিলো না।

স্বাহা

মিসেস দাস গৃহকর্তার সাথে দামী-দামী মোটরের গল্প করছিলেন। লটি তাঁকে বললো, 'It's getting late, Mum—'

'—কেন, ক'টা বেজেচে?'

'—Time we were gone! সাড়ে দশ।'

সার এস. এন. বললেন, 'সেকি, এখনি—?'

মিসেস দাস বললেন, 'হ্যাঁ, ওঁর শরীরটা ভালো নেই আজ।'

'—তাহলে—'

'—হ্যাঁ, উঠি তাহলে। এসো লটি। ও, লটি, ছাখোতো গাড়ি এসেচে কিনা—'

টুটু মহিলা-চক্র ত্যাগ করে এগিয়ে এসে বললো, 'ও আর দেখে কি হবে। চলুন, আমিই পৌঁচে দিয়ে আসি।'

লটি আপত্তি করে বললো. 'না না, তাতে কাজ নেই। কি হবে খামাখা। আর এতো রাতে, কষ্ট করে—'

'—Pleasure, কষ্ট নয়, চলুন।'

মিসেস দাস পুলকিতভাবে বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ, টুটু, so kind of you. আচ্ছা, গুডবাই—বাই—'

সম্মিলিত হাত-নাড়া ও অভিবাদনের কোলাহল ত্যাগ করে তিনজনে বেরিয়ে এলেন। দু'সেকেণ্ড পর মল্লিক জুনিয়রের লম্বা নিচু স্পোর্টিং সানবীম নিঃশব্দে কম্পাউণ্ড পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

ড্রইংরুমে বসে সানবীমে টুটু মল্লিকের স্থানে নিজেকে কল্পনা করে সরকার সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

মাস তিনেক পরের এক রবিবার।

দুপুরের খাবার পর লটি তার শোবার ঘরে বইয়ের সেলফের কাছে বছর-খানেকের জমানো হ্যাশ ও ষ্ট্রাণ্ডের পঙ্কোদ্ধার করছিলো। পরনে লালপেড়ে গরদ, গায়ে ওই কাপড়েরই একটা ঢিলে আস্তিন জামা। ভিজে চুলের বোঝা ডগায় গেরো দিয়ে পিঠের উপর ছাড়া।

জানলা দিয়ে একরাশ হেমন্তের মিঠে রোদ তার গায়ে পিঠে এসে পড়েছে।

সে গুন-গুন করে রেণু চৌধুরীর কাছে সম্প্রতি শেখা একটা বাংলা গানের এক চরণ ভাঁজছিলো, আর তারই ফাঁকে ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে যাচ্ছিলো।

'—ঘরেতে ভ্রমর এলো গুন-গুনিয়ে....গুন-গুনিয়ে! বারে গ্ল্যাক্সো বেবি! দেখলেই চুমো খেতে ইচ্ছে হয়!...ঘরেতে...'

দরজার কাছে শব্দ শুনে সেদিকে না তাকিয়েই সে বললো, 'কোন হ্যায়—'

পর্দার ফাঁকে শ্বেত-শ্মশ্রু 'বয়ে'র পাগড়ি দেখা গেল।

'—কেয়া হ্যায়, বয়? সাব্ বোলা রাহা? বহুৎ খু—বোলো ম্যয় আ-রহি—আভী হি—'

উঠে টয়লেট র‍্যাকের ওপর থেকে তোয়ালে নিয়ে, মুখ হাত পা ভালো করে মুছে, কপালের ওপর ব্রাশটা দু'একবার বুলিয়ে সে নিচে চললো।

বসবার কামরায় ঢুকতে গিয়েই লটি একটু অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো। দাস সায়েবের পাশে সেরিডানের ওপর একজন যুবক বসেছিলো। গায়ের রং রোদে পোড়া গৌর, ঈষৎ তামাটে, চওড়া কপাল ও প্রকাণ্ড নাক—গ্রীক ভাস্করের খোদিত মূর্তির মতো। পোশাক-পরিচ্ছদ সায়েবী ও আড়ম্বরহীন। একগোছা চুল বাঁ-কপালের ওপর এসে পড়েছে। বোতাম খোলা কোটের তলায় মস্তবড়ো বুকটার ওপর 'টাই' অবিন্যস্তভাবে হাওয়ায় উড়ছে। ওপরে ঠোঁটের ধার দিয়ে কয়েক ফোঁটা ঘাম ফুটে উঠেছে।

একটু ইতঃস্তত করে লটি বললো, 'Sorry Dad, জানতুম না আর কেউ আছেন।'

'—আর কেউ মানে দিস জেণ্টলম্যান, অর্থাৎ ডাকু তো? তোমার ঘাবড়াতে হবে না লটি, ওর সামনে তুমি at home feel করতে পারো। She is Lottie—ডাকু, সেই নোয়াখালির ছোট্ট ফ্রক-পরা লটি। একে তোমার মনে নেই লটি, সেই ডাকুদা—নোয়াখালির মিঃ রায় ছিলেন ডেপুটি,

স্বাহা

তাঁর ছেলে। তোমার তো ভালো নাম আছে ডাকু—হ্যাঁ হ্যাঁ, শঙ্কর: শঙ্কর রায়।'

শঙ্কর হাত তুলে নমস্কার করতে যাচ্ছিলো, লটি হাত বাড়ালো দেখে করকম্পন করে বললো, 'নোয়াখালির পরেও দেখেচি আপনাকে দার্জিলিং-এ দু'একবার। সানি ব্যাঙ্কে—'

'—আপনি যেতেন, চৌধুরীদের বাড়িতে? দেখিনি তো।'

'—দুর্ভাগ্য! অথচ শেষবার ওই বাড়িতেই উঠেছিলাম। নোয়াখালির কথা তো আপনার মনে থাকা সম্ভব নয়, তখন আপনি বেজায় ছোটো।'

'—হ্যাঁ, তবে আপনিও সে সময় বিশেষ বড়ো ছিলেন না মনে হয়।'

হেসে শঙ্কর বললো, 'না। এই ধরুন বারো-তেরো।'

'—তাই বলুন! আপনি আমার চেয়ে বছর চারেকের বড়ো মাত্র।'

দাস সায়েব বললেন, 'আচ্ছা লটি, তোমার মাকে ডেকে পাঠালুম, এলেন না তো!'

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মিসেস দাস ঘরে ঢুকলেন। জামা-কাপড়, চুল, জুতো—ফিটফাট, মুঠোর রুমালটা একবার নাকে ঘষে তিনি বসলেন।

'—লীলা, চিনলে একে? দাস সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন।

অস্ফুট স্বরে মিসেস বললেন, 'কই—'

'—ভালো রে, ভালো! সুরেন রায়ের ছেলে, ডাকু। সেই নোয়াখালিতে—ওঃ, তুমি বেশি ছাখোনি ওদের বটে।'

মিসেস দাস হাত বের করে বললেন, 'Good day, Mr. Roy—well, how do you do—'

হাত-ঝাঁকানো সমাধা করে, ভালো করে বসে শঙ্কর বললো, 'আমি বেশ আছি। আপনি ভালো তো?'

মিসেসের দু'চোখ লাল হয়ে উঠলো। মিঃ দাস ও লটি হো-হো করে হেসে উঠলেন।

দাস সায়েব বললেন, 'লীলা, তুমি মিঃ রয়-মিঃ রয় করচো কাকে? ও ডাকু, নামেও কাজেও—ব্যাস্‌, সেই ওর যথেষ্ট পরিচয়। নামেও কাজেও। কি বলো হে?'

লটির সাগ্রহ হাসি-রঙীন ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে ডাকু বললো, 'কিন্তু সমাজে বাস করে নামের সাথে খাপ খাইয়ে জীবন-যাপন করলে কি আর চলবে—'

'—আরে বাদ দাও, তোমার সমাজ! সেই ছেলেবেলার মতো ডানপিটেই রয়েচো এখনো? মারামারি করে হেষ্টিংস হাউস ছাড়লে, সে আমি এখনো ভুলিনি।'

'—তাইতেই তো সায়েব হওয়াটা পুরো হয়ে উঠলো না। আর দু'দিন থাকলেই খাস বিলেতিদের সাথে টেক্কা দিতে পারতুম।' বলে ডাকু হাসলো, তারপর বললো, 'শুধু প্যাপীর জন্যে। খেলা-ধুলোয় ও-রকম বরাবর হয়, বিশেষ হকিতে। তাই বলে মাষ্টাররা মোড়লী করতে আসে না। হাতে ছিলো ডাণ্ডা, মাথায়ও বোধকরি খুন চেপেছিলো! কষ্ট হয় টুটু মল্লিকের জন্যে। অবশ্য তার ছোটোমানষেমীর যোগ্য শাস্তি হয়েছিলো। তবে মারটা একটু বেশিই খেয়েছিলো। দিন-দশেক ছিলো হাসপাতালে।'

'—কোন্ টুটু? মল্লিক সায়েবের ছেলে?'

'—হ্যাঁ, তারপরই ওর বাবা ওকে বিলেতে পাঠিয়ে দেন। শুনলুম, ফিরেচে নাকি বছর-খানেক হলো।'

'—হ্যাঁ, বারে জয়েন করেচে। লীলা, তুমি ওর কীর্তিকলাপ শুনে ভাবচো, বুঝি ও একটি আস্ত গুণ্ডা! He is a self-made man. নিজের জোরে রেলে বড়ো কাজ পেয়েছে, জামালপুরে;—যাক এখন নয়, কোথায় উঠেচো এসে কোলকাতায়? হোটেলে? সে কি! সুরেনের ছেলে, আমি থাকতে এসে হোটেলে উঠবে—না না, absurd! আজই সন্ধ্যের ভেতর চলে এসো, ব্যাগ এণ্ড ব্যাগেজ। No arguments! তোমার একজন দাদা জুটলো লটি, বহুৎ বদমাস,—ডাকু দাদা।' বলে দাস সায়েব সস্নেহে তাদের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন।

মিসেস দাস গম্ভীর মুখে ঘাড় কাত করে পরম মনোযোগের সাথে কাঁধের ব্রোচটার শিল্প-সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করছিলেন, এবার গম্ভীরতরভাবে দাস সায়েবের দিকে তাকালেন।

লটি ভাবলো ওয়েল—বেশ তো! ডাকু—ডাককুদা!

স্বাহা

তারপর ডাকুর দিকে তাকিয়ে বললো, 'কখন আসছেন তাহলে? সত্যি, না-এলে ভারী দুঃখিত হবো আমরা, হবো না, মাম্?'

দীর্ঘ দেহ টান করে দাঁড়িয়ে ডাকু বললো, 'এলে আমি বেঁচে যাই সত্যি, তবে আপনাদের ভুগতে হবে।'

দাস সায়েক বললেন, 'আচ্ছা, আদবকেতা তোমায় নামায় না। We shall expect you before tea, বুঝলে? লীলা, তোমার কোনো engagement নেইতো, বিকেলে?'

'—আছে বৈ কি। I am going to Mullick's for tea—'

'—বেশ, লটি থাকবে।'

'—সেকি? ওকে তো যেতেই হবে, তাঁরা বিশেষ করে বলেছেন।'

মায়ের হিপ্নোটিজম আজ যেন লটিকে কায়দায় আনতে পারলো না। সে বাধা দিয়ে বললো, 'না, আমি যাবো না। Not feeling up to it—'

দাস সায়েক মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাহলে তুমি বেরোবে না। ডাকু, তুমি ঠিক এসো তাহলে।'

'—আসবো। চললুম, খুড়িমা। চলি, মিস দাস।'

ডাকু যাবার পর খানিক চুপ করে থেকে মিসেস বললেন, 'আমি নেভিতে যাচ্ছি, যাবে তুমি?'

লটির যেন আজ কি হয়েছিলো। সে বললো, 'বাব্বা, এই দুপুরে! আমি তার চেয়ে একটু ঘুমুবো।'

'—কি আলসেই হচ্চো দিন-দিন!'

ঈষৎ হেসে লটি বললো, 'আলসে নয়, তবে দিন-রাত ওই পোশাক পরিচ্ছদ ঘাঁটতে ভালো লাগে না আর। আমার এখন একটু পড়তে ইচ্ছে করচে।'

বিস্মিতভাবে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মিসেস উঠে গেলেন। লটি সশব্দে চটিতে পা গুঁজে গুন্-গুন্ করতে-করতে ঘরে চললো।

ঘরে গিয়ে লটি দেখলো, বিছানার ওপর তার জাপানী স্পানিয়েলটা দিব্যি গুঁড়িসুঁড়ি হয়ে আরাম করে ঘুমুচ্চে। অন্যদিন সে সেটাকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজে শুয়ে পড়তো, কিন্তু আজ তাকে কোলে নিয়ে চুমো খেয়ে বললো,

জানিস রুবি, মেরে দাদা মিলা একঠো, ডাক্কু—ডাকস্, ডিক—ডিক—তবে রে পাজী কুকুর, আচ্ছা নাক চেটে দিলি কি বলে, বল্ তো !'

কোল থেকে রুবিকে নামিয়ে দিয়ে, লটি মুখে-চোখে জল দিয়ে এলো। তারপর একখানা বই হাতে করে শুয়ে, বইখানা খোলবার আগেই ঘুমিয়ে পড়লো।

দিন-দশেক পর কলকাতা ছাড়বার দিন, দুপুরে খাবার পর লটির ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকু ডাকলো, 'লটি, শুনছো ?'

'—কি ?'

'—শোনো !'

লটি এসে বেতের চেয়ারটার ওপর বসলো। পাঁচিলে হেলান দিয়ে ডাকু দাঁড়িয়েছিলো, বললো, 'আজ আমি যাচ্ছি, জানো।'

'—হ্যাঁ।'

'—ছাখো, ভালো করে গুছিয়ে বলা আমার ক্ষমতার বাইরে। হঠাৎ যদি অন্যায় কিছু বলে ফেলি, দোষ নিও না।'

'—আচ্ছা' বলে লটি একটু অবাক হয়ে তাকালো। তারপর বললো, 'কিন্তু কথাটা কি তা না বলে শুধু বাজে বক্চো।'

'—তাহলে বলে ফেলি। ওয়ান—টু—থ্রী, তুমি আমায় বে' করবে ?

লটি অবাক ! হবারই কথা। কারণ, ব্যাপারটা যেমন অদ্ভুত, তেমনি অপ্রত্যাশিত। বিয়ের নানারকম প্রস্তাবের বিবরণ সে শুনেচে, পড়েচে। কিন্তু এ-রকমটা তার ধারণার বাইরে। তার হাসা উচিত, না চটা উচিত—কিছু বুঝতে না পেরে বোকার মতো তাকাতে লাগলো।

ডাকু হো-হো করে হেসে উঠলো, কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বললো, 'তুমি আশ্চর্য হবে জানি, কিন্তু আমি সঠিক জবাব চাই। 'না' বললে আমি খুশিই হবো, যদি তাই তোমার মনের কথা হয়।'

ডাকুর কণ্ঠস্বরে একাগ্রতা প্রকাশ পেতেই লটির মুখ লাল হয়ে উঠলো ; সে অন্যদিকে মুখ ফেরালো।

স্বাহা

ডাকু বললো, 'তুমি ভেবে সন্ধ্যের আগে আমায় বলো। হ্যাঁ, একটা কথা। ভেবো-না এইবারের দু'দিনের পরিচয়ে, অতবড়ো একটা কথা বলে ফেললুম। নোয়াখালিতে, তখন অবশ্য খুবই ছোটো—কিন্তু ছেলেবেলার সে আকর্ষণের পরিণতির পরিচয় পাই দার্জিলিং-এ। যাক, তোমার জীবন কোন্ পথে চলেছে, জানিনে, হয়তো আমার ভবঘুরের জীবনযাত্রার সাথে তার আগাগোড়াই গরমিল। যদি অপ্রীতির কারণ হয়ে থাকি, ক্ষমা করো, তবে খুলে বলো, আমি জানতে চাই। না জেনে ঢের দিন গেচে, আর সংশয় সইতে পারিনে।'

ডাকু উঠতেই লটি মৃদুকণ্ঠে ডাকলো, 'ডাকুদা—'

'—ডাকচো?'

'—হ্যাঁ।'

'—কি, বলবে?'

লটি চুপ করে থাকলো। তারপর মুখ তুলে বললো, 'যদি আমি সন্ধ্যের আগে কিছু ভেবে ঠিক না করে উঠতে পারি?'

ডাকু দাঁড়িয়েছিলো, এইবার চেয়ারের হাতলের ওপর বসলো। বললো, 'বেশ, অপেক্ষা করবো।'

'—আজই যাবে?'

'—হ্যাঁ, যেতেই হবে।'

'—আবার আসবে কবে?'

'—শিগগির নয়। ছুটি পাওয়া বড়ো শক্ত। তুমি লিখো।'

'—লিখবো।'

'—বেশ।' তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ডাকু বললো, 'আমার সম্বন্ধে কিছু জানতে চাও? কোনো কথা—'

'—দরকার নেই।'

'—তাহলে চলি এখন?'

'—আচ্ছা।'

সন্ধ্যের ডাক-গাড়িতে লটির জবাব না নিয়েই ডাকুকে কলকাতা ...ড়তে হলো। গাড়ি ছাড়বার আগের মুহূর্তে লটি বললো, 'আমি লিখবো।'

ডাকু যাবার পর এক সপ্তাহ না যেতেই একদিন সন্ধ্যেবেলা স্বামী-স্ত্রীতে কথা হচ্ছিলো। লটি বাড়ি ছিলো না। সায়েব জানতেন, ব্যানার্জি পরিবারের সাথে সে এম্পায়ারে গেছে। কথাটা আংশিক সত্যি, সে ছবি দেখতে গেছে সত্যি, কিন্তু গেছে বিজুতে, এবং টুটুর সাথে। এটুকু মেমসায়েবের কারসাজি।

দাস বলছিলেন, 'ডাকু পৌঁছে চিঠি লিখেছে। একটা অদ্ভুত খবর আছে। সে লটিকে বিয়ে করতে চায়।'

'—Heavens! ওই ভূতটার সাথে লটির বিয়ে! কি স্পর্ধা! Unmannerly half-civilised boor—'

'—তার মানে? সোসাইটির সঙগুলোর মতো ইংরেজি বুকনী কাটে না, কথায়-কথায় দিব্যি গালে না, বেপরোয়া মদ্যপান করে না, এই তো। আমার ডাকুকে ভালো লাগে।'

'—তা লাগুক। বিলেত যায়নি, একটা আস্ত জানোয়ারই তো রয়ে গেছে এখনো। সমাজেও ওর কোনো স্থান নেই।'

'—একবার বিলেত ঘুরে এলেই জানোয়ারত্ব ঘুচে যেতো? আমাকেও তাহলে জানোয়ারের দলে ফেলচো তো?'

মেমসায়েব কথাটা বলে ফেলেই লজ্জিত হয়েছিলেন। বললেন, 'তা নয়, তা নয়। আমি ঠিক বোঝাতে পারচি না, অর্থাৎ, set-এর বাইরে একজন অজানা অচেনা—'

দাস সায়েব বাধা দিয়ে বললেন, 'একটু সমঝে। তুমি যে ডেপুটির স্ত্রী, এ-কথা তুমি ভুললেও, বাঁড়ুজ্যে-মল্লিক পরিবারের কেউই এক মহলার তরে ভুলবে না জেনো। শঙ্কর রায়ের সাথে মেয়ের বিয়ে দিলে তোমার অমর্যাদা হবার ভয় নেই। সোসাইটির গিন্নীদের জিগ্যেস করে দেখো, যে ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে পারলে তাঁদের অনেকেই বর্তে যাবেন। ও যে কাজ করে, সে-কাজ পাবার জন্যে বহু বিলেত-ফেরৎ মল্লিক-বাঁড়ুজ্যের ছেলে জুতোর তলা খুইয়ে ফেললো। কাদের নিয়ে তোমার set, লীলা? নিজের দেশে পরদেশী এ্যাকটিং এবং কৃত্রিম জীবনযাপনে অভ্যস্ত জনকয়েক তাসের সায়েব-বিবি! রাস্তার ভিখারীর যা কালচার, যা tradition, তাদেরও

তাই, তফাৎ শুধু সিল্ক স্যুট ও ছেঁড়া-কাঁথার। সে অত্যন্ত স্থূল তফাৎ। যাক। তর্ক বৃথা। আমি নিজে মনে করি তোমার টুটু মল্লিকের চেয়ে ডাকু অনেক উঁচুদরের ছেলে।'

'—টুটুর নাম করচো কেন? সে কী করলো তোমার?'

'—করেনি কিছু, কিন্তু ওই একটি লোক আছে, যাকে দেখলে আমার গা জ্বলে যায়।'

'—গা তোমার জ্বলে যেতে পারে, কিন্তু এই তোমায় বলে রাখচি আমি, তার চাকর থাকবার যোগ্যতাও নেই, তোমার ডাকুর।'

টুটুর প্রতি দাস সায়েবের মনোভাবের আঁচ মিসেস পেয়েছিলেন, তাই লটির সাথে তার মেলামেশাটাকে যতদূর সম্ভব আড়াল করে রাখতেন! শুধু আড়াল নয়, মেলামেশার সুযোগ ঘটাতেও মেয়ের প্রতি তাঁর হিপ্নোটিজম বিদ্যার প্রয়োগ করতে হতো প্রায়ই।

তাঁর প্রথম থেকেই ইচ্ছে টুটুর সাথে সম্পর্কটা পাকা করে ফেলেন। তাহলে সিভিলিয়ান বৈবাহিক সুবাদে ডেপুটি-জায়াত্বের হীনতাটুকু একেবারে শেষ হয়ে যায়। টুটুর সম্বন্ধে যে-সব কথা কানে আসে, সোসাইটিতে সে-সব ধর্তব্যের মধ্যে নয়। ও বয়েসে ও-রকম একটু-আধটু সব ছেলেরই হয়।'

কিন্তু স্বামীর বর্তমান মনোভাবে এ অভিলাষ প্রকাশে অনেক বিপদ। তাই সর্বাগ্রে তিনি মেয়েকে পোষ মানাবার ফিকিরে ছিলেন।

দাস সায়েব একখানা বইয়ে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ পরে মৌনতা ভঙ্গ করে বললেন, 'তাই তো, রাত হয়ে চললো যে! Time they were back!'

মিসেস বললেন, 'কটা বেজেচে?'

'—ন'টা।'

'—ভারি রাত হয়েচে। দশটার আগে তো ছবিই শেষ হবে না।'

দাস সায়েব আর কোনো কথা কইলেন না। বই হাতে আপিস-কামরার দিকে উঠে গেলেন। মেমসায়েব লাইব্রেরীতে উঠে চিঠি লেখা নিয়ে বসলেন।

লটির মনের গভীরতা ছিলো না বললে ভুল হবে; কিন্তু সে গভীরতার উপরের জল-রাশি ছিলো ঘোলাটে। তাই তরঙ্গ উঠলে আলোড়ন তলস্পর্শ করতো না। কিন্তু ইদানীং যেন সে নিয়মের ব্যতিক্রম হতে শুরু হয়েছিলো।

দৈনন্দিন জীবনযাপনের কৃত্রিমতার চাপ তাকে মাঝে-মাঝে পীড়া দিতো। মাঝে-মাঝে মনে হতো, সমাজটা যেন একটা দানব, যেন কি এক উগ্র নেশায় মত্ত হয়ে চালকহীন রেলগাড়ির ইঞ্জিনের মতো ভীমবেগে চোখ লাল করে ছুটে চলেচে—কোনো রকমে পায়ের তলায় লাইন ছুটো বেঁকে বসলেই ধ্বংস অনিবার্য। কোনো আশা, কোনো মঙ্গলের সম্ভাবনাও নেই—ঝোড়ো হাওয়ায় যেন তীব্র হিংস্র বিদ্রূপ, টিটকারী দিয়ে মাতামাতি করে বেড়াচ্ছে।

আতঙ্কে তার অন্তর আর্ত হয়ে উঠতো।

ঠাণ্ডা মাথায় মাঝে-মাঝে সে ভাবতে বসতো। পড়বার বাতিক তার চিরদিনই ছিলো, কিন্তু পড়ে সে সম্বন্ধে ভাববার অভ্যেস ছিলো না। এইবারে সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে সব-কিছু দেখতে গিয়ে এই কথাটাই তার বারে-বারে মনে হতো যে, সুন্দরের অভাবের অবস্থাটা হয়তো তবু সওয়া যাবে, কিন্তু অসুন্দরের উপস্থিতি অসহ্য।

তার এ ক্ষণিক উন্মেষের আয়ু দীর্ঘ হতো না, ভগ্নস্তূপের ক্ষণত্যুতি স্ফূলিঙ্গের মতো চরম পরিণতির দিকে ঢলে পড়তো।

আজ টুটু মল্লিকের সাথে বেরোতে তার যথেষ্ট আপত্তি ছিলো, কারণ অনেক। কিন্তু একটিও বলা হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া মা-কে কথা দেওয়া হয়ে গিয়েছিলো।

একটি জিনিস সে বুঝেছিলো, মল্লিকের সাথে ঘনিষ্ঠতা মা-র কাম্য। কিন্তু যা বোঝা তার সর্বাগ্রে উচিত ছিলো, অর্থাৎ এ আত্মীয়তার ওপর তার নিজের মন বিরূপ, সেইটেই সে পরিষ্কার বোঝেনি।

ছবি সাড়ে আটটায় ভাঙলো, বেরিয়ে লটি বললো, 'আমি বাড়ি যাবো, আমার মাথা ঘুরচে।'

টুটু বললো, 'I say, what—মাথা ঘুরচে, এতো ভালো কথা নয়! Let us have some food first—খাবার সময়ও হয়ে গেচে।'

'—খাবার জন্যে নয়। তুমি যে কোল্ড-ড্রিংক দিলে এনে, সেইগুলো খাবার পর থেকে। বিচ্ছিরি ঝাঁজ লাগলো।'

টুটুর ঠোঁটের ধার দিয়ে পাৎলা হাসি উঠেই মিলিয়ে গেল। বায়স্কোপে প্রারম্ভিক দু'পেগে তার পানতৃষ্ণা কেবল বৃদ্ধিই পেয়েছিলো। তাই সে অধিক বাক্যব্যয় না করে বললো, 'still, খেতে তো হবে। চলো ফার্পোতে।'

হোটেলে ঢুকে লটি বললো, 'তুমি কিছুতেই drink করতে পাবে না। মাতালের সাথে ঘুরতে ভয় করে।'

টুটু বললো, 'মাতাল? কি যা-তা বলচো? হুইস্কি অবশ্যই আমি খাই, কিন্তু তা বলে—যাক। I say, তোমার মাথা ঘুরচে বলছিলে না, দাঁড়াও let me get soothing something for you—'

'—আমি কিছু খাবো না।'

'—এখানে scene করো না। শেষে মাথা ঘুরে পড়ে-টড়ে যাবে, একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড হবে।'

জিন মেশানো জিঞ্জারের প্রভাবে লটির মাথা তখন বেশ ঝিমঝিম করছিলো। সে আর কথা বললো না।

ডিনার যখন শেষ হলো, তখন রাত সাড়ে দশটা। ততক্ষণে টুটুর দু'পেগ হুইস্কি ও দুটো কক্‌টেল এবং লটির চারটে 'soothing something' শেষ হয়ে গেচে।

নিচে গাড়িতে এসে টুটু বললো, 'what about a long drive? বাড়ি যাবার আগে বুঝেচো তো—একটু মাথাটা ঠাণ্ডা—'

লটির কিছু বলবার মতো অবস্থা ছিলো না। সে জড়িত-স্বরে একটা কি বলবার চেষ্টা করে টুটুর কাঁধে মাথা রাখলো!

শিস্ দিয়ে টুটু এ্যাকসেলারেটারে পা দাবালে। কলকাতার রাস্তা হয়ে গাড়ি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে অপ্রকৃতিস্থ বেগে ছুটলো।

রাত দেড়টায় বাড়ি ফিরে, মিসেসের সুবন্দোবস্তে লটির নিজের ঘরে পৌঁছাতে বিশেষ কষ্ট পেতে হয়নি বটে কিন্তু তার চেহারা দেখে মিসেসের মন শঙ্কাকুল হয়ে উঠলো। অনবরত দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে থাকতে-থাকতে

লাল ঠোঁটে গভীরতর লাল দাগ কেটে দাঁত বসে গেছে। চোখ দুটোর রং হয়েচে অস্তসূর্যের আলোয় বর্ষার নদীর ঘোলা জলের মতো।

সারা বিনিদ্র-রাত লটির মুদিত চোখের ওপর বায়োস্কোপের ফিতের মতো অস্পষ্ট দুঃস্বপ্নের ছায়া ঘুরতে লাগলো। পাশ-বালিশের সুখকর উত্তপ্ত আলিঙ্গনের সাথে-সাথে মত্ত টুটু মল্লিকের প্রসারিত বাহুর বিভীষিকা ফুটে উঠতে লাগলো।

নারী-জীবনের প্রথম জৈবযজ্ঞে নিহত, নিশ্চেতন মানসকে আবরণ করে, তার সর্বাঙ্গ অসহায় ভীতিতে থেকে-থেকে শিউরে উঠতে লাগলো।

দিন যায়, ডাকুকে আর লেখা হয়ে ওঠে না। লেখবার মতো গুছিয়ে কথাও যোগায় না, লিখবো বলে তোড়জোড় করে বসতেও আলসেমি লাগে। লটি যেন দিন-দিন ছনমনে হয়ে উঠছে।

সে হঠাৎ অসামান্য রূপসী হয়ে উঠেছে। দেহ-তটে যৌবনের বান ডেকেছে। পাড় উপচে পড়ো-পড়ো। কিন্তু চোখের কোণে চিন্তার কালিমা গাঢ়তর হয়ে উঠেছে।

মিসেসের মন খুব ভালো। লটি কোনদিনই তার অবাধ্য ছিলো না। এখন যেন আরো বাধ্য হয়েছে। টুটুর সাথে বেরোতে তার আপত্তি নেই, আর্মি নেভির সেলেও দিনে দুপুরে, যখন-তখন, সে মায়ের সাথে বিনা ওজরে বেরিয়ে পড়ে। মিসেস এমনও আশা করেন যে, টুটুর সাথে আর একটু ঘনিষ্ঠতা চোখে পড়লেই তিনি সম্বন্ধের কথাটা পাকাপাকি করে ফেলবেন। তাঁর মনে ডাকু ঘটিত একটা আশঙ্কার কারণ সর্বদাই জাগরুক ছিলো, বিশেষ করে দাস সায়েবের মনোভাবের পরিচয় পাবার পর থেকে। Absurd, তাহলে সমাজে বাস ওঠাতে হবে। মল্লিক-বাড়িতে তিনি আর যাবেন কোন্‌মুখে।

সেদিন মল্লিকের বাড়িতে ডিনার ছিলো, ডিনারের পর সবাই বসবার কামরায় সমবেত হতে, ভায়োলেট মিত্তির লটিকে একলা বারান্দায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বললো, 'চলো, একটু বেড়াই।'

স্বাহা

'—চলো।'

কিছুক্ষণ ফুলের বেড়ার ধার দিয়ে ঘোরবার পর হঠাৎ ভায়োলেট বললো, 'I say Lottie what has Tutu done to you—I mean—'

লটির মুখ সহসা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে হঠাৎ লাল হয়ে ওঠলো। সে অস্ফুটস্বরে বললো, 'কিছু না।'

ভায়োলেট ঐকান্তিক সৌহার্দ্যের সুরে বললো, 'সে বুঝলুম। কিন্তু তুমি তো বেবী নয়, লটি; আত্মরক্ষার এডুকেশনও কি তোমার হয়নি? —Or are you thinking of getting stuck to that worm? আমি অনেক আগেই এঁচেছিলুম কিন্তু—' তারপর ক্ষুণ্নভাবে বললো, 'আমার উচিত ছিলো তোমায় সাবধান করে দেওয়া। তোমার মা জানেন?'

লটি মৃদুস্বরে বললো, 'আমি বলিনি।'

'—বলে ফেলো, আর দেরি করো না। এমনিই বোধহয় দেরী হয়ে গেচে।'

অজ্ঞাত বিভীষিকায় লটির সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠলো। তার আচ্ছন্ন মনে যে-সব কথা রূপ পরিগ্রহ করে উঠতে পারেনি, ভায়োলেটের খোলাখুলি কথাবার্তার পর সে-সব জোয়ারের জলের মতো তার চিন্তাকে প্লাবিত করতে লাগলো—

রাতে বাড়ি ফিরে সে ডাকুকে চিঠি লিখতে বসলো। একান্ত নির্ভরের স্বপ্নে তার চোখের সামনে চওড়া একখানা বুকের ছবি ভেসে উঠতে লাগলো। চিঠি লিখে, সীল করে সে যখন উঠলো, তখন রাত আড়াইটে।

মায়ের কথাতেই তার জীবন নিয়ন্ত্রিত, অথচ জ্ঞান হবার পর যেচে তাঁকে কিছু বলতে যাওয়ার স্মৃতি মনে আসে না। আজ এই অসম্ভব সময়ে পা টিপে টিপে মায়ের ঘরের সামনে গিয়ে ডাকলো, 'মা—'

সে-রাত মায়ের ঘরে, মায়ের পাশে শুয়ে কাটলো।

ডাকুর চিঠির জবাব আসে না। লটির দিন কাটে না। একা ঘরে থাকা আর ওষুধ খাওয়া—এই কাজ। তার অসুখ।

তার অসুখ, সেই দুশ্চিন্তায় দাস সায়েবের মাথার সব ক'টা চুল সাদা হয়ে উঠলো। সে শুনেছে, টুটুর সাথে তার বিয়ের প্রস্তাবে আপত্তি উঠেছে। আপত্তিকারী টুটু নিজে। কানাঘুষো শোনা যায়, সে বিলেতে বিয়ে করে এসেছে ; তার বিলিতি স্ত্রী চিঠি দিয়েছে, আসছে।

মিসেস হাল ছাড়েন না। মনে-মনে ঠিক করেন, সার এস. এন্-এর ভাইপো অরুণ সিভিলিয়ান হয়ে আসছে, তার সাথে লটির বিয়ে দেবেন। এই আপদটা এখন ভালোয়-ভালোয় চুকলে হয়।

লটিকে দেখতে যাঁরা আসেন, মিসেস অদম্য উৎসাহে তাঁদের তোয়াজ করে বিদেয় করেন। লটির কাছে ঘেঁষতে দেন না।

তারপর একদিন, এমন করে দিন কাটাবার আর আবশ্যক রইলো না। বাথরুমে গোঙানী শুনে ছুটে গিয়ে সংজ্ঞাহীন লটির ভূপতিত দেহ আবিষ্কার করলেন, যন্ত্রপাতি, ডাক্তার—সব মিথ্যে হলো, সে কাহিনীর বিশদ বর্ণনা অনাবশ্যক। তারই পরিণতির সূত্রেই এ আখ্যায়িকার আরম্ভ।

ডাকু কাজে লাইনে ছিলো। ফিরে চিঠি পেয়ে, সে লটিকে নিতে এসেছিলো।

এইটুকু লটির জেনে যাওয়া হয়নি।

শাঁখা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

এ-পাড়াতে এমন কাউকে দেখতে পাবে ভাবতে পারতো না কেউ। এঁটোখেকো কাকের দল যেমন উচ্ছিষ্টের লোভে ঠোঁট ফাঁক করে বসে থাকে, মেয়েগুলো তেমনি চোখ ফাঁক করে চেয়ে রইলো।

ঘাড় সোজা রেখে তাকিয়ে-তাকিয়ে দু'দুবার ঘুরে গেল রেবতী। আরো একবার। এ-মোড় থেকে ও-মোড়। বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো কেউ-কেউ, কেউ-কেউবা ভঙ্গিতে একটু বিভ্রম আনলো। তবু রেবতী চক্কর দিয়ে যাচ্ছে, শালের আঁচলের কাঁধ বদ্‌লে-বদ্‌লে। কার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে তারি ঔৎসুক্যে কুরে-কুরে তাকাচ্ছে মেয়েগুলো।

রেবতীর তরফ থেকেও এ-কথা কেউ বিশ্বাস করতে পারতো না। সে উঁচু ঘরের ছেলে, উঁচু নাকের, উঁচু মাইনের সে চাকুরে—এ-সব কিছু নয়; বছর পুরো হয়নি বিয়ে করেছে সে। আর যাকে বিয়ে করেছে, সে তিল-তিল সৌন্দর্য দিয়ে তৈরি। যেমন রং, তেমনি অবয়ব। যেমন কচি তেমনি টাটকা। বিশ্বাস করতে পারতো না স্বয়ং সে নববধূ।

রেবতীর কিসের এ অতৃপ্তি? কিসের বা আকাঙ্ক্ষা ঐ মেয়েগুলোর?

মেয়েগুলো হাল ছেড়ে দিলো, যখন আরো দু'চক্কর ঘুরে গেল রেবতী, তার চোখ ও পকেট সম্বন্ধে দুটো বিপজ্জনক মন্তব্য করেও যখন সাড়া মিললো না, তখন সিদ্ধান্ত করলো: 'নিশ্চয়ই পুলিশের গোয়েন্দা, কারো জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'তাই বলো।' হ্যারিকেনের পলতেটা কমিয়ে দিয়ে রোহিণী বললো, 'নইলে অমন দরের লোক আসবে কিনা এই খোলার বস্তিতে!'

'ছাড়ান দে।' বকের মতো গলা বেঁকিয়ে বললো রাজুবালা:

'ঢের দেখেছি। আগে যখন মাঠকোঠায় ছিলাম ধুচুনিপাড়ায়, তখন আমার ঘরে এক ব্যারিস্টার আসতো। ফতোবাবু নয়, দস্তুরমতো সাহেব। প্যান্ট-কোট, জুতো-মোজা—ফিতে-বাঁধা জুতো। তার জন্যে একটা চেয়ার রাখতে হয়েছিলো ঘরে, নিচে নেমে বসতো না কখনো বিছানায়।'

চক্করের পরিধিটা ক্রমে-ক্রমে ছোটো হয়ে আসছে রেবতীর। তার ভুল হচ্ছে কিনা কে জানে।

রাস্তাটা আসলে ধোপাপটি। তারই দু'দিক দিয়ে দুটো ফালি গলি-পথ গেছে বেরিয়ে। তার মধ্যে ঠেসাঠেসি করে মেয়েগুলো বাস করছে কায়কষ্টে। একটা ফুলুরির দোকান, একটা মুদিখানা। মাঝখানে হঠাৎ চটের পর্দাফেলা একটা একতলা কোঠাবাড়ি, ভিতরে শিশুদের শব্দ। রাংঝালের দোকান পেরিয়ে আবার ক'টা মেয়ের ছিটেফোঁটা। এদেরটা টিনের চালার বস্তি। কেমন একটু আলাদা, অসংলগ্ন।

শান-বাঁধানো সংকীর্ণ রোয়াকের উপরে বসে দু'হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে বুড়ি একটা কাশছে, আর তার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কে-একটি অল্পবয়সী মেয়ে। অন্ততঃ ডৌল দেখে তাই মনে হয়। মাত্র আঁচল টেনে গায়ের শীত নিবারণের কঠিন চেষ্টা দেখে। অথচ, আশ্চর্য, এতটুকু চাঞ্চল্য নেই। বুড়ির যেই কাশিটা থামছে, অমনি ভাঙা গল্পের জের টানছে দু'জনে। রেবতীকে পাশ দিয়ে শ্লথ পায়ে বারে-বারে চলে যেতে দেখেও তারা থামছে না, মনোযোগী হচ্ছে না। নড়ে-চড়ে সরে-বসে এতটুকুও সম্মতি বা সমর্থন আনছে না। পাশের ঘরটাই যদি ও-মেয়ের হয় তবে তার জন্য সেই দরজা বন্ধ, নিশ্চল দরজায় রূঢ় অক্ষরে প্রত্যাখ্যানই লেখা আছে নিশ্চয়।

নিশ্চয়ই ভুল হচ্ছে রেবতীর। শীতে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলেই কেউ আর অপাঙক্তেয় হয় না। রেবতী বাড়িয়ে দিলো তার পরিক্রমের এলাকা।

'মঙ্গলার সামনে ঘুর-ঘুর করছে!' গলির মুখের মেয়েগুলো বলাবলি করে উঠলো, রেবতীকে শুনিয়ে, একটু বা শ্লেষের সুরে। শুধু যেন অসাধ্য নয়, অন্যায়।

'খ্যাংরা ঝেড়ে দেবে কপালে।' কে একজন স্পষ্ট গলায় বলে উঠলো।

শাঁখা

স্থান ছেড়ে অস্থানে গিয়ে চড়াও হচ্ছে এ যেন তারই প্রতিবাদ।

সরহদ্দ-সীমানা পেরিয়ে পাশ-আলি জমির লোককে বে-দখল করার বিরুদ্ধে নালিশ। একটা চাপা শব্দ মেয়েগুলোর গলার মধ্যে অস্ফুট হয়ে রইলো।

তবু যেন রেবতী নিবে যেতে পারলো না। নতুন জ্যোৎস্নায় কী যেন সে দেখেছে বলে তার মনে হচ্ছে।

কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়ার চাঁদ উঠে এসেছে দেয়ালের আড়াল ছেড়ে। বড়ো রাস্তায় সফর করতে বেরিয়েছিলো কতকগুলি মেয়ে, যাদের শরীরে এখনো সাহস আছে, মুখে বা আশা, তাদেরই কেউ-কেউ ফিরছে এখন শিকার জুটিয়ে। তাদেরই কে-একজন বললো মঙ্গলাকে উদ্দেশ্য করে: 'কী লো মঙ্গলা, এখনো বাইরে দাঁড়িয়ে?'

মঙ্গলা বোধ-করি লুকিয়ে একবার তাকালো রেবতীর দিকে। বললো, 'কী করবো ভাই, টোপ ধরে না, ঠুকরে বেড়ায়।' বলেই লম্বা দমে হেসে উঠলো। হাসিটাও অদ্ভুত। হাল্‌কা পাখায় এক-ঝাঁক পাখির উড়াল দেবার মতো। শব্দটা এ-অঞ্চলের বাইরেকার শব্দ। ঘোলা জলে কখনো এমন বুদ্বুদ ফোটে না।

তবু, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে নির্ভুল এগিয়ে গেল রেবতী।

মঙ্গলা কুঁকড়ে গেল। বুড়ি বলে উঠলো: 'পোড়ারমুখো মিন্সে—'

মুহূর্তে রেবতী গুটিয়ে নিলো নিজেকে। ফটফটে জ্যোৎস্নায় মঙ্গলার হাতে দেখতে পেলো সে দু'গাছি সাদা শাঁখা। তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল সে গলি ছেড়ে।

কিন্তু সেই চকিত চাউনিতে কী যেন বলি-বলি করে উঠেছিলো মঙ্গলা। তাই পরদিন সন্ধ্যাধূসর হয়ে উঠবার আগেই আবার রেবতী সেই গলির মুখে পা বাড়ালো।

তখনো গলিটা তার চিহ্নিত চেহারা পায়নি। আধাখেঁচড়া এলোমেলো হয়ে আছে। এখন যদি কোনো তল পাওয়া যায় মেয়েটার। তার প্রাত্যহিক পরিবেষ্টনে।

রাস্তার কলের কাছে বসে মঙ্গলা একটা পিতলের থালা মাজছিলো।

এক নিমিষে চোখাচোখি হলো দু'জনের। কাল অনেকক্ষণ ঘুরে গেছে তার আশে-পাশে—যেন চিনতে পারলো মঙ্গলা। কী ভেবে চোখে আর সেই পরিচয়ের প্রশ্রয় রাখলো না, মুখ ঘুরিয়ে নিলো। রেবতী দেখলো, হাতে শাঁখা আছে বটে, কিন্তু সিঁথি নিশ্চিহ্ন।

বুক বেঁধে রেবতী এগুলো দু'পা। বললো, 'তোমাদের এখানে ঠিকে ঝি পাওয়া যায়?'

'তাই খুঁজছেন বুঝি, দু'দিন ধরে?' চোখে ঝিলিক দিয়ে মঙ্গলা মুখ টিপে হাসলো।

'হ্যাঁ, পাচ্ছিনে সুবিধে-মতো। তুমি করবে কাজ?'

'আবার ঝি-গিরি! খুরে দণ্ডবৎ, মশাই।' গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো মঙ্গলা।

'তুমি তবে কী করো?'

'হিরু গয়লার খাটালে কাজ করি। গরু-মোষের খাটাল। খাটতে-খাটতে জান শেষ। পেরে উঠিনে।' মুখে একটা অতি-ক্লান্তির আর্তি আনলো মঙ্গলা।

রেবতী ভেবে পেলো না এ নির্দয়াচরণ কেন? এমন যার ফুলন্ত ও ফুটন্ত দেহ সে কেন ঘাঁটতে যাবে ঐ আবর্জনা? হৃদয় দৃঢ় করে ফের সে প্রশ্ন করলো: 'তুমি থাকো কোথায়?'

'কোথায় আবার! এই গলিতে।'

'ঘর কোন্‌টা?'

'ঐটে।'

'যেটা সেদিন দেখেছিলে দোর-দেয়া।'

'তোমার সঙ্গে বুড়ি কে-এক গল্প করছিলো কাল—কে সে?'

'আমার মা।'

থালা হাতে করে মঙ্গলা ফিরে গেল তার ঘরে। ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলো। পিছনে একটিবার ফিরেও তাকালো না।

রেবতী পথ দেখলো।

কিন্তু পরদিন বিকেলে আবার সে এসে হাজির। যথার্থ সাহস

শাঁখা

স্থান ছেড়ে অস্থানে গিয়ে চড়াও হচ্ছে এ যেন তারই প্রতিবাদ।

সরহদ্দ-সীমানা পেরিয়ে পাশ-আলি জমির লোককে বে-দখল করার বিরুদ্ধে নালিশ। একটা চাপা শব্দ মেয়েগুলোর গলার মধ্যে অস্ফুট হয়ে রইলো।

তবু যেন রেবতী নিবে যেতে পারলো না। নতুন জ্যোৎস্নায় কী যেন সে দেখেছে বলে তার মনে হচ্ছে।

কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়ার চাঁদ উঠে এসেছে দেয়ালের আড়াল ছেড়ে। বড়ো রাস্তায় সফর করতে বেরিয়েছিলো কতকগুলি মেয়ে, যাদের শরীরে এখনো সাহস আছে, মুখে বা আশা, তাদেরই কেউ-কেউ ফিরছে এখন শিকার জুটিয়ে। তাদেরই কে-একজন বললো মঙ্গলাকে উদ্দেশ্য করেঃ 'কী লো মঙ্গলা, এখনো বাইরে দাঁড়িয়ে?'

মঙ্গলা বোধ-করি লুকিয়ে একবার তাকালো রেবতীর দিকে। বললো, 'কী করবো ভাই, টোপ ধরে না, ঠুকরে বেড়ায়।' বলেই লম্বা দমে হেসে উঠলো। হাসিটাও অদ্ভুত। হাল্কা পাখায় এক-ঝাঁক পাখির উড়াল দেবার মতো। শব্দটা এ-অঞ্চলের বাইরেকার শব্দ। ঘোলা জলে কখনো এমন বুদ্বুদ ফোটে না।

তবু, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে নির্ভুল এগিয়ে গেল রেবতী।

মঙ্গলা কুঁকড়ে গেল। বুড়ি বলে উঠলোঃ 'পোড়ারমুখো মিন্সে—'

মুহূর্তে রেবতী গুটিয়ে নিলো নিজেকে। ফটফটে জ্যোৎস্নায় মঙ্গলার হাতে দেখতে পেলো সে দু'গাছি সাদা শাঁখা। তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল সে গলি ছেড়ে।

কিন্তু সেই চকিত চাউনিতে কী যেন বলি-বলি করে উঠেছিলো মঙ্গলা। তাই পরদিন সন্ধ্যাধূসর হয়ে উঠবার আগেই আবার রেবতী সেই গলির মুখে পা বাড়ালো।

তখনো গলিটা তার চিহ্নিত চেহারা পায়নি। আধাখেঁচড়া এলোমেলো হয়ে আছে। এখন যদি কোনো তল পাওয়া যায় মেয়েটার। তার প্রাত্যহিক পরিবেষ্টনে।

রাস্তার কলের কাছে বসে মঙ্গলা একটা পিতলের থালা মাজছিলো।

এক নিমিষে চোখাচোখি হলো দু'জনের। কাল অনেকক্ষণ ঘুরে গেছে তার আশে-পাশে—যেন চিনতে পারলো মঙ্গলা। কী ভেবে চোখে আর সেই পরিচয়ের প্রশ্রয় রাখলো না, মুখ ঘুরিয়ে নিলো। রেবতী দেখলো, হাতে শাঁখা আছে বটে, কিন্তু সিঁথি নিশ্চিহ্ন।

বুক বেঁধে রেবতী এগুলো দু'পা। বললো, 'তোমাদের এখানে ঠিকে ঝি পাওয়া যায়?'

'তাই খুঁজছেন বুঝি, দু'দিন ধরে?' চোখে ঝিলিক দিয়ে মঙ্গলা মুখ টিপে হাসলো।

'হ্যাঁ, পাচ্ছিনে সুবিধে-মতো। তুমি করবে কাজ?'

'আবার ঝি-গিরি! খুরে দণ্ডবৎ, মশাই।' গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো মঙ্গলা।

'তুমি তবে কী করো?'

'হিরু গয়লার খাটালে কাজ করি। গরু-মোষের খাটাল। খাটতে-খাটতে জান শেষ। পেরে উঠিনে।' মুখে একটা অতি-ক্লান্তির আর্তি আনলো মঙ্গলা।

রেবতী ভেবে পেলো না এ নির্দয়াচরণ কেন? এমন যার ফুলন্ত ও ফুটন্ত দেহ সে কেন ঘাঁটতে যাবে ঐ আবর্জনা? হৃদয় দৃঢ় করে ফের সে প্রশ্ন করলো: 'তুমি থাকো কোথায়?'

'কোথায় আবার! এই গলিতে।'

'ঘর কোন্‌টা?'

'ঐটে।'

'যেটা সেদিন দেখেছিলে দোর-দেয়া।'

'তোমার সঙ্গে বুড়ি কে-এক গল্প করছিলো কাল—কে সে?'

'আমার মা।'

থালা হাতে করে মঙ্গলা ফিরে গেল তার ঘরে। ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলো। পিছনে একটিবার ফিরেও তাকালো না।

রেবতী পথ দেখলো।

কিন্তু পরদিন বিকেলে আবার সে এসে হাজির। য[illegible]াহস

দেখানো হয়নি, আজ সে স্পষ্ট প্রস্তাব করবে। রাখে, ভালো; না রাখে, আরো ভালো। গালিগালাজ না শুনতে হলেই হলো, একটা কোনো কুচ্ছিত চেঁচামেচি। মঙ্গলাকে যে-রকম স্বচ্ছন্দ মনে হয়, তাতে 'না' বলতে হলে সে ঠাণ্ডা গলায়ই 'না' বলবে।

কালকের মতই পাঁশুটে সন্ধ্যা, কিম্বা আরো একটু নিবিড়। আশ্চর্য, গলির কিছুটা ভিতরে পাকুড় গাছের নিচে মঙ্গলা দাঁড়িয়ে আছে। যেন অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। যেন-বা কার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। পরনে কালকের সেই ধুলট-শাড়ি, অপীন-দেহের পক্ষে আঁচলটা এতো পর্যাপ্ত যে, নিচে জামা আছে কিনা বোঝা যায় না, চুলগুলি ঝাঁকড়-মাকড়। অসহিষ্ণুতার যন্ত্রণায় চোখ দুটো চকচক্ করছে।

'রাত ন'টার পরে আসবেন।' পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার আগেই মঙ্গলা রেবতীর উদ্দেশ্যে বললো নিচু গলায়। আর বলেই অন্তর্ধান হলো তার ঘরে, ভয়-পাওয়ার মতো। এমন দ্রুত শব্দে দরজা বন্ধ করলো যেন তাকে তাড়া করেছে।

অনেক অনাঘ্রাত প্রেমেও এমন রোমাঞ্চ রেবতী পায়নি। চঞ্চল-অচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে কতক্ষণ, তারপর চলে গেল দূরের রাস্তায়।

রাত ন'টার পর যখন সে ফিরে এলো চুপিসারে, তখন খাওয়া-দাওয়া সেরে খোলা দরজার দিকে পিঠ করে বসে মঙ্গলা পান সাজছে। কোনো ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা না করেই রেবতী বেমালুম ঢুকে পড়লো। আর বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করে মঙ্গলা দরজা বন্ধ করে দিলো। যেন এর মধ্যে কোনই নতুনত্ব নেই। যেন ডাল-ভাত।

দরজাটা বন্ধ করলেই নিরাপদ হওয়া যায় না। তার অনেকাংশেই থেকে যায় অনাবৃতি। একটা ছেঁড়া নোংরা কাপড় দিয়ে মঙ্গলা সেই ফাঁক-গুলি ভরে দিতে লাগলো। সেই অবসরে ঘরের আরো অনেক-কিছু দেখে নিলো রেবতী। আর, সমস্ত কিছু দেখে নিলো সে উলঙ্গ কুপির কলঙ্কিত শিখায়।

ইঁটের উপরে পা-তোলা উঁচু তক্তপোশ—একমাত্র রাজাসন। পাটির অতিরিক্ত শয্যা নেই। দেয়ালে নেই একটা পট, নিদেন জলচৌকির উপরে

ক'টা বাসন। সামান্য একখানা আর্সি নেই কোথাও, ফুলের তেল বা মুখে-ঘষার পাঁক। দড়িতে ঝোলানো অন্তত রঙিন শাড়ি একখানা।

তক্তপোশে সমাসীন হলো রেবতী, মঙ্গলা ঘাড় নিচু করে পান সাজতে লাগলো।

'এখানে কদ্দিন আছো ?'

'এই দশ বছর।' কেমন আর্দ্র শোনালো মঙ্গলার গলা।

'দশ বছর! বলো কী? দশ বছরেও এই হাল!'

মঙ্গলা কথা বললো না। রেবতী লক্ষ্য করে দেখলো তার শিথিল আঙুলের বেষ্টনী থেকে পানের খিলি খুলে যাচ্ছে।

'এই তো তোমার গুছিয়ে নেবার বয়েস—করলে কী এতদিন? তা ছাড়া এমন খোলতাই চেহারা তোমার, তাজা আনাজের মতো। শোনো, শোনো—' হাত বাড়িয়ে রেবতী ধরতে গেল মঙ্গলাকে : 'আমি যখন এসে পড়েছি একবার, আর তোমার ভয় নেই। তোমার হাল-চাল বদ্‌লে দেবো একদিনে।'

মঙ্গলা হঠাৎ কেঁদে ফেললো। বললো, 'সেই ভরসায়ই তো দরজা আপনাকে আজ খুলে দিলাম, বাবু।'

এই অসম্ভব কথাটার জন্য প্রস্তুত থাকলেও কান্নার জন্য রেবতী কখনো প্রস্তুত ছিলো না। আগে ফুলে-ফুলে কান্না, এখন একেবারে হু-হু শব্দে। শুধু কান্না নয়, দুই ব্যাকুল হাতে মঙ্গলা রেবতীর পা দুটো জড়িয়ে ধরলো : 'আপনিই আমাকে এই প্রথম কুলের বার করলেন, আপনি আর আমাকে পায়ে ঠেলবেন না।'

রেবতী চোখে অন্ধকার দেখলো। শুধু মঙ্গলার শাঁখা শ্বেত বজ্রাগ্নির মতো জ্বলতে লাগলো সেই অন্ধকারে।

সিধে, সমতল পথের পথিক রেবতী, ভয় পেয়ে গেল এই দুর্গম, দুরারোহ পথের ভূমিকায়। ভীত, মূঢ় গলায় বললো, 'কুলের বার করলাম মানে? এই তোমার নতুন নাকি?'

'হ্যাঁ বাবু, এই নতুন, আপনিই প্রথম। এতদিন, এই দশ বছর, আমি একজনের কাছেই বাঁধা আছি।'

রেবতী নিঃশ্বাস ফেললো। নিঃশ্বাস ফেললো মঙ্গলার এই নিষ্ঠানাশের বেদনায়। জিগ্যেস করলো : 'কে সেই বাঁধা লোক ?'

'বাড়িওলা।' যেন অনেক মমতায় তার এই কথাটা মঙ্গলা উচ্চারণ করলো।

'কে, এই বস্তির বাড়িওলা, যার কাছে তুমি কাজ করো?' কেলেঙ্কারির ভয়ে যেন আঁতকে উঠলো রেবতী।

'না। সে তো হিরু গয়লা। আমার এ-বাড়িওলা বামুন। আর তার বাড়ি নেই একখানাও।'

'এই দশ বছর তার কাছেই আছো ?'

'তার কাছেই আছি। কিন্তু সে আর টানতে পারছে না আমাকে।' আবার মঙ্গলার চোখ ছাপিয়ে কান্নার ঢেউ উঠলো : 'এই দশ বছর ধরেই প্রায় পারছে না। মাঝে-মাঝে আসে, কখনো-কখনো খরচ দিয়ে যায়। তাই দিয়ে চলে না সব-দিন। সেই বা কী করবে বলুন, দিন-কে-দিন তার অবস্থা যাচ্ছে পড়ে, কী করেই বা দেবে! তাই রাগ করতে পারিনে ; তবু ধরে আছি আঁকড়ে। কিন্তু আর পারছি না বাবু, চেয়ে দেখছেন তো এই ঘরের চেহারা, আর আমার এই জামা-কাপড়া।' বলে মঙ্গলা তার বুকের আঁচলটা বিস্তৃত করে ধরলো।

আঁচলটাতে প্রকাণ্ড একটা ফালা আর তার গায়ের জামাটা একটা থলে না বালিশের ওয়াড় বোঝা দায়।

'জামা-কাপড়ে কিছু আসে যায় না, বাবু। শীতে বিছানা নেই, তাও সইতে পারি। কিন্তু সেঁকা রুটি আর দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে পারিনে।'

'ভাত জোটে না নাকি তোমার ?'

'প্রায়ই জোটে না। বাড়িওলা পয়সা দিলে তো জুটবে। ক'দিন ধরে এদিকে তার দেখা নেই। মা তাই তার ওপর ভীষণ চটে আছে এ ক'দিন। পোড়ারমুখো মিন্সে, সেদিন মা আপনাকে বলেনি বাবু, বলেছিলো ঐ বাড়িওলাকে। কিন্তু তাকে গাল দিয়ে লাভ কী বলুন। আমি তো জানি তাকে। পয়সা কিছু যোগাড় করতে পারলেই সে দিয়ে যাবে আমাদের। পারছে না বলেই আসছে না। আমার কষ্টে কি তার সুখ?'

'তোমার মা কোথায় ?'

'আর বলবেন না। বুড়ো মাকে লাগিয়েছি ঝি-গিরির কাজে। বাসন মাজতে গেছে বাবুদের বাড়িতে। রাতের পাট তুলে ঘরে ফিরতে প্রায় এগারটা। এই বাঘাটে শীত।'

'তুমি নিজে কোনো কাজ করো না কেন ? ও, হ্যাঁ, হিরুর খাটালেই তো খাটো বললে।'

'সে তো তার বকেয়া বাড়ি-ভাড়া শুধবার জন্যে। নইলে, বড়িওলার অমত ছিলো না, দু'দুবার আমিও গিয়েছিলাম ঝি-গিরি করতে। দুটোই বড়োলোকের বাড়ি। প্রথম বাড়িতে বাবুর বড়ো ছেলে পেছু নিলে, দ্বিতীয় বাড়িতে বাবু নিজে ধরলেন আঁচল চেপে। খেংরে মুখ ভেঙে দিতে পারলাম না, এই দুঃখ। আর কোনদিন মাড়াইনি ও নরকের রাস্তা। মা বলে, লেগে থাকলে হিল্লে হয়ে যেতো এতদিনে। দরকার নেই আমার অমন হিল্লে হওয়ায়। যার কোলে আছি, তার কোলেই থাকি, তা আমার কাঁটাই হোক আর তুলোই হোক ! আমার স্বামী যদি মানুষ হতো, তবে তার কোলই আমি ছাড়তাম নাকি জীবনে ?'

এমন বিপদে পড়বে রেবতী কল্পনাও করতে পারেনি। কোথায় ফূর্তি করতে আসা, তা না, দুঃখের ঢোল-সমুদ্র। কিন্তু অসহিষ্ণু হলে মঙ্গলা ক্ষমা করবে না। মঙ্গলাকে পেতে হলে দুঃখী বলেই পেতে হবে।

ইতিহাসটা ছোটো। তেরো বছর বয়সে বিয়ে হয় মঙ্গলার, স্বামী বদ্ধ পাগল। কে নাকি বলেছিলো বিয়ে করলে পাগলামি সেরে যাবে ; আসলে দাঁও মেরেছিলো মঙ্গলার বাপ। দু'বছর অপেক্ষা করেও যখন পাগলামি ভালো হলো না তখন শাশুড়ীর অসুখে সেবা করবার জন্য শাশুড়ীর সঙ্গে সে কলকাতাও এলো। উঠলো এসে এক টিনের চালার বস্তিতে, পড়লো এই বাড়িওলার নজরে। রাতারাতি শাশুড়ীর অসুখ গেল সেরে, বাড়িওলার হাত থেকে মোটা টাকা নিয়ে সে প্রস্থান করলো।

তবু, তখনো কাঁদেনি মঙ্গলা। নিজেকে ভাবেনি অভাগিনী বলে। ভেবেছে, যতক্ষণ সে একাশ্রিতা ততক্ষণ সে কিছুতেই অসতী নয়। হোক বাড়িওলা বুড়ো, না হোক সে ঠিক মনের মতন, তবু সে-ই যখন তাকে প্রথম

শাঁখা

ছুঁলো, মঙ্গলাও তাকেই শেষ পর্যন্ত ছুঁয়ে থাকবে। তাই সে কোনো কষ্ট মনে করেনি, কোনো লোভকেই ভাবেনি লোভনীয় বলে। ভাই বিয়ে করে মাকে তাড়িয়ে দিলো, মা এলো মঙ্গলার আশ্রয়ে। নিজের দশ-হাত শাড়ি পাঁচ-হাত হলো, আধ-পো চাল এক কুনকে। মা এসে দেখাতে লাগলো পর্দা-ফেলা, শিকলে-কুকুর-বাঁধা, বেড-সুইচ-জ্বালানো কোটা ঘরের স্বপ্ন, কিন্তু মঙ্গলা টললো না। তার লণ্ঠন নেমে আসুক কুপিতে, তোশকের তন্তুমাত্রও আর না থাক, শীতে তার এই ছেঁড়া আঁচলই সম্বল হোক, তবু সে ছাড়বে না বাড়িওলাকে। সে থাকবে একগম্যা। বাড়িওলার বাড়ি-ঘর যাক, কিন্তু সে আছে।

'কিন্তু বাড়িওলাই বা তোমাকে ছাড়েনি কেন এতদিন? তোমার এতো দুঃখ দেখেও?' রেবতী টিপ্পনী কাটলো: 'তার এ কী ব্যবহার!'

'কী বলবো বলুন। হয়তো অভ্যেস। বুড়ো-বয়সে হয়তো একটু সেবা পাবার লোভ। হয়তো বা ভালোবাসা।' কথাটা বলে নিজেকেই শাসিয়ে উঠলো মঙ্গলা: 'কিন্তু এই শুকনো ভালোবাসায় কী হবে বলুন! তিনদিন ধরে ভাতের মুখ দেখিনি। আজ দিন-পাঁচেক তার দেখা নেই।'

যাক, রাত এবার পোহালো মঙ্গলার। রেবতী যখন এসে পড়েছে তখন আর ভাবনা নেই, তার মাটির দেয়াল আয়না হয়ে উঠবে আগাগোড়া। কিন্তু এদিকে যে রাত হয়ে যাচ্ছে রেবতীর।

'শুনুন।' রেবতীর উদ্ধৃত হাত সরিয়ে দিয়ে মঙ্গলা বললো, 'কিন্তু এক সর্ত। আপনি আমার একার না হোন, কিছু আসে যায় না, কিন্তু আমি আপনার একার থাকবো—এইটেই আমার একমাত্র কড়ার। নইলে—'

পাছে আবার কান্নায় উথলে ওঠে, রেবতী অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললো, 'নিশ্চয়। আমি তোমার জন্যে আলাদা ঘর ভাড়া নেবো, লেপ তোশক খাট তোরঙ্গ আয়না আলমারি আস্তে-আস্তে সব এনে জড়ো করবো তোমার ঘরে, নিজে আসি আর না আসি, তোমার মাসোয়ারা ঠিক আসবে।'

মঙ্গলা তবুও ঢিল দিলো না। বললো, 'দেখুন, অতোশতো আমি চাইনে। থাকবার ঘর, শোবার সামান্য বিছানা, পরবার অল্প কাপড়, পেট ভরে খাবার চারটি ভাত, আর আমি একজনের, আমি স্ত্রী, আমার একদিন

বিয়ে হয়েছিলো, আমি হাতে শাঁখা পরেছিলাম—তা বোঝবার ও বিশ্বাস করবার মতো একটা অবস্থা। সেটুকুই যদি আমি পাই, তাহলে আমাকে পায় কে? তা না-হলে বাড়িওলাকে লুকিয়ে এমনি ছুটোও তো আনতে পারি লোক, কে-বা তাকে বলতে আসছে বলুন—কিন্তু তাহলে আমার শাঁখার যে কোনো মান থাকে না।'

তোমাকে যদি আলাদা বাড়িতে নিয়ে যাই এখান থেকে, তবে খুব চটবে তোমার বাড়িওলা?'

'চটলে আর উপায় কী বলুন। এমনিভাবে পেট চটিয়ে ক'দিন আর বাঁচতে পারে মানুষে? আপনি যখন থাকবেন কায়েম হয়ে তখন আর আমার ভয় কী? এ পাড়া থেকে উঠে যাবো, হদিসই পাবে না। কি, রাখবেন তো ঠিক?'

'আজ থেকেই। আজই তোমাকে টাকা দিয়ে যাবো আগাড়ি!

'কবে বাড়ি বদলাবেন?'

'কাল না হলে পরশু। একটা দিন ঘুরে-ঘুরে দেখি।'

দরজায় কার ঘা পড়লো। সংক্ষিপ্ত, সন্দিগ্ধ। এলো বুঝি বাড়িওলা। গা কাঁটা দিয়ে উঠলো রেবতীর। নিচু গলায় বললো, 'বাড়িওলা এলো বুঝি আজ?'

'না, রাত ন'টার পর সে আসে না! এ মা এসেছে।'

কাপড়ের গোঁজ সরিয়ে দরজা খুলে দিলো মঙ্গলা! বুড়ি দেখলো রেবতীকে, চিনলো ও সমর্থন করলো। দামী শাল, সোনার বোতাম, কব্জির ঘড়ি, সর্বোপরি সম্ভ্রান্ত চেহারা আনলো এই সমর্থনের আনন্দ। নির্দন্ত মুখে হেসে বললো, 'মেয়ের সুমতি হলো এতদিনে?'

এ আরেক জঞ্জাল—রেবতী মনে করলো। বললো, 'তোমার মা থাকবে কোথায়?'

'কেন, আমি যেখানে থাকবো। ঘর না হোক দোরে। একটা মাদুর হলেই মা শুয়ে কাটিয়ে দিতে পারে।'

'কিন্তু এখানে তোমার দাওয়া কোথায়?'

'এখানে? এখানে মা বাইরে বসে কাটিয়ে দিতে পারবে!'

'এই পচা শীতের মধ্যে ? ঐ বুড়ো মানুষ ?' নিমিষে কেমন জুড়িয়ে গেল রেবতী।

'নইলে আর উপায় কি, বলুন।' মঙ্গলা কুন্ঠিতের মতো বললো।

'আচ্ছা, আজ থাক। পরশু একেবারে ঘর ঠিক করে তোমাদের নিয়ে যাবো। দু'খানা ঘর, আলাদা। একটা মা'র, একটা তোমার।' রেবতী নেমে পড়লো তক্তপোশ থেকে।

'আপনি আর আসবেন না ?'

'আসবো বলেই চলে যাচ্ছি অমনি। হবেই আসতে।'

'তাহলে আপনার গায়ের শালখানা রেখে যান।'

'বিশ্বাস করো, ঠিক আসবো।'

'বড্ড শীত করে রাত্তিরে, গায়ে দেবার কিছু নেই—'

'তোমার জন্যে লেপ নিয়ে আসবো কাল। সত্যি বলছি।'

'পরশু ঘর, কাল লেপ, আজ কী ?' মঙ্গলা ঘোলাটে চোখে হাসলো ; 'আজ কি স্বপ্ন ?'

'আজ টাকা।' রেবতী তার মনিব্যাগের হাঁ খুললো।

আশাতীত টাকা। গণনার মধ্যে আনতে পারেনি মঙ্গলা। অভি-ভূতের মতো নিজের থেকেই সে রেবতীর হাত চেপে ধরলো, বললো, 'আমি আর কিছু চাই না, আমি তোমার, আমি একজনের—শুধু এইটুকুই বুঝতে চাই। শুধু এইটুকুই।'

'কি লো, টোপ গেলে নাকি ?' হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই রেবতী শুনলো ক'টা সঞ্চরমান মেয়ে মঙ্গলার উপর মুখিয়ে উঠেছে।

মঙ্গলার মা অদূরে শান-বাঁধানো রোয়াকে বসে দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢেকে কাশছিলো, কাশি না থামতেই উঠলো খেঁকিয়ে : 'টোপ গেলে না গেলে তোদের কি লা, শতেক-খোয়ারি ?'

মেয়েগুলোও কদর্যতর ভাষায় খনখনিয়ে উঠলো। এক কথায়, বাড়িওলাকে তারা বলে দেবে। তাকে লুকিয়ে তারি ঘরে এ কারবার তারা বরদাস্ত করতে পারবে না। একনিষ্ঠার মাহাত্ম্য কীর্তন করবে তারা।

উত্তরে মঙ্গলা কী বলে শোনবার জন্য দাঁড়ালো রেবতী। এদের কাছে থেকে ছড়ার টুকরোই শুধু সে শেখেনি, শিখেছে কোঁদল করার কায়দা।

দু'একটা বিশ্রী বকুনিও বেরিয়ে আসছে থেকে-থেকে।

'তোদের তাতে গা টাটায় কেন লা, মুখপুড়িরা? ছোঁ মেরে তোদের শিকার কেড়ে নিয়েছি, তাই না? কী আছে তোদের যে লোক আসবে তোদের কাছে? ঐ তো সব কেলে-হাঁড়ির চেহারা, কিষ্কিন্ধ্যা-ফেরৎ, তায় আবার অতো ঠাট কিসের শুনি? গলি থেকে রাস্তা আর রাস্তা থেকে গলি—সারারাত তো চটি ফটফটিয়ে বেড়াস, জোটে কী অদেষ্টে? মুটে-মজুর, মেথর-মুদ্দোফরাস—তাই অমন হাড়াইডোমাই করছিস। তোদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে রাজপুত্তুর এলো আমার ঘরে, চোখ চেয়ে আর সইতে পারছিস না। বলে দিস বাড়িওয়ালাকে—আমি তোয়াক্কা রাখি নাকি তার?'

একা মঙ্গলা সেই বাঘিনীদের সঙ্গে পেরে উঠবে কেন? এ-পাড়ার নীতিশাস্ত্রে এতবড়ো অন্যায় এতবড়ো পাপ কেউ ভাবতেও পারে না। যে পাঁচজনের সামগ্রী, তাকে মঙ্গলা কী বলে একা অধিকার করবে, মঙ্গলা যখন একা একজনের? রাজুবালার লোক যদি সরযূ না নিতে পারে, তবে সরযূ-রাজুবালার লোককে মঙ্গলা নেয় কোন্ স্বত্বে? ছুটো থাকতো মঙ্গলা, কেউ কথাটি বলতো না। সে ঘটিও কিনবে গঙ্গাস্নানও করবে, চলবে না তা।

গণতন্ত্র জয়ী হলো। রেবতী পালিয়ে গেল গলি ছেড়ে।

দু'দিন পর এলো বাড়িওয়ালা, হাতে ঠোঙায় করে কিছু খাবার, রং-চটা ফেঁসে-যাওয়া র‍্যাপার ঢাকা দিয়ে। অনেকদিন পর কিছু খাওয়াবে আজ মঙ্গলাকে। ট্যাঁকে করে একটা সিকিও সে নিয়ে এসেছে বাঁচিয়ে।

ঘরে ঢুকে একটা মমতার ভাব করতেই মঙ্গলা অশ্রুঘন কণ্ঠে বললো, 'আমাকে ছুঁয়ো না, আমি নষ্ট হয়ে গেছি।'

বিমূঢ়ের মতো এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো বাড়িওলা। কবে যে মঙ্গলা অনষ্ট ছিলো তাই যেন সে ভাবতে লাগলো।

মঙ্গলার আর রা নেই। মুখ গোঁজ করে বসে রইলো। খাবারের ঠোঙাটা নিলেও না হাত বাড়িয়ে।

কী ব্যাপার—পাঁচ কাহন করে বুঝিয়ে বললো প্রতিবেশিনীরা।

শাঁখা

বাঁধা থেকেও কিনা ফুড়ুকফাঁই। ঘোমটার নিচে থেকে কিনা উঁকিঝুঁকি। এক মুর্গির কবার জবাই হবে জিগগেস করি? এ কী নেমকহারামি! বছর দশেক ধরে আছে এই বাড়িওয়ালা—কই, কখনো কেউ দেখেনি তো আর কারু দিকে নজর দিতে! তার কিনা এই প্রতিদান! এঁটো পাত যে কখনো স্বর্গে যায় না, তা কে না জানে?

একটা প্রতিবাদ করলো না মঙ্গলা। ছুরপনেয় কলঙ্কের ভার মাথায় করে বসে রইলো নিঃশব্দে। মুখের কথায় একটা ক্ষমা পর্যন্ত চাইলো না।

রাত ন'টার কাছাকাছি আসতেই বাড়িওয়ালা অভ্যেস মতো চলে গেল র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে। বোধ-করি এতদিনে একটা পাকাপাকি ছুতো পেলো মঙ্গলাকে ছেড়ে দেবার। ট্যাঁকের সিকিটা দিয়ে মোড়ের পানের দোকান থেকে এতদিনে বিড়ি নয়—সিগারেট কিনলো।

মঙ্গলা তাই এখন জনতায় নেমে এসেছে—রাধারাণীর পাশেই তার ঘর। খাট-পালং তোশক-জাজিম হয়নি বটে, কিন্তু হয়েছে একটি বিছানা, বাঁদিপাতার খাটো লেপ একখানা। তক্তপোশের এক-পাশে দেয়াল ঘেঁষে একটি স্টিলের ট্রাঙ্ক, মস্তবড়ো ফুল-আঁকা টিনের স্যুটকেশ। কাঠের বেঞ্চিতে গোটাকয়েক বাসন—ঠিলি, পিকদানি, ডাবোর, থালা-বাটি ক'টি, সব ঝকঝক করছে। ক্যালেণ্ডারের চীনে-মেয়ের ছবি টাঙানো দেয়ালে। ভাঁজ-করা আয়না হয়েছে একখানা, বেঞ্চির নিচে কাগজের বাক্সের ডালায় খেলো ক'টি প্রসাধনের কৌটা। ভাত আর তার রোজকার মতো কিনে খেতে হয় না। ভিতরের দাওয়ার এক-পাশে তোলা উনুনে তার রান্নার জায়গা হয়েছে। দশদিনেই অনেক উন্নতি হয়েছে মঙ্গলার। অনেক উন্নতি হয়েছে। চটি ফটফটিয়ে পায়চারি করে সে চাঁদের আলোয়। রাজুবালার সঙ্গে তার এখন গলায়-গলায় ভাব।

শুধু হাতের শাঁখা ছ'গাছি আর নেই। তার বদলে এখন কেমিকেলের চুড়ি ঝলমল করছে।

অকাল বসন্ত

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

বোস সাহেব তৃতীয়বার বিবাহের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাঁর প্রথম পক্ষের একমাত্র ছেলে বিমান পুরীর জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট। আই-সি-এস। বছরখানেক হলো বিলেত থেকে মেম বিয়ে করে ফিরেছে।

দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র মেয়ে করুণার বিয়ে হয়েছে মাস-চারেক হলো। সে থাকে টাটানগরে। সেখানে তার স্বামী কি একটা বড়ো চাকরি করেন।

বোস সাহেব নিজে হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করেন। বয়স সবে ষাট পেরিয়েছে। বছরচারেক আগেও ভালো টেনিস খেলোয়াড় বলে নাম ছিলো। এখনও খেলেন। কিন্তু আর তেমন সুবিধা হয় না। স্ত্রী বিয়োগের পর থেকে তাঁর কোমরের পরিধি দ্রুতবেগে বেড়ে যাচ্ছে। সেজন্য খেলতে অসুবিধা হয়।

আশ্চর্য মানুষ এই বোস সাহেব। মনের মধ্যে কোনো গোলমাল নেই, হৃদয়ের দ্বার তাঁর সকল সময়ই অবারিত। বয়সের ব্যবধান মানেন না। দিনেরবেলা অল্প একটু অর্গল যদি বা থাকে, সন্ধ্যার পরে দোতলার দক্ষিণের খোলা বারান্দায় মদের গ্লাসের সামনে বসলে তাও আর থাকে না। তখন 'মানুষ আমার ভাই, তিন ভুবন আমার স্বদেশ'। ছেলে-মেয়ে এবং জামাই-এর সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক তাও ঠিক পিতা-পুত্রের নয়, বন্ধুত্ব।

সুতরাং বিবাহের বাঞ্ছা মনে জাগতেই তিনি অকপটে তাদের লিখে জানালেন।

খবরটি বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো ছেলে, মেয়ে ও জামাইয়ের কাছে গিয়ে পৌঁছালো। তারা সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলো।

বিমান তার স্ত্রীকে ডেকে বললো, 'শুনছো এলেন, বাবা আবার বিয়ে করতে যাচ্ছেন।'

তার হাতের মধ্যে চিঠিখানা তখনও কাঁপছিলো।

ওঘর থেকে ছুটতে-ছুটতে এলেন এলো। বিমানের কম্পিতে হাতের দিকে না চেয়েই বললো, 'তাই নাকি? কবে? আমরা সবাই যাচ্ছি তো?'

তার চোখে-মুখে খুশি যেন উপছে উঠলো। বিমান গম্ভীরভাবে বললো, 'ছিঃ, এলেন! বাবার বিয়ে, একি ঠাট্টার কথা!'

এলেন থতমতো খেয়ে বললো, 'এদেশেও বুড়োরা বিয়ে করে তো!'

'—করে। কিন্তু তা নিন্দনীয়। বাবা বিয়ে করবেন কি? বড়ো-বড়ো ছেলে-মেয়ে রয়েছে। দু'দিন পরে নাতি-নাতনী হবে।'

বলে এলেনের দিকে চেয়ে চোখ মটকালো। লজ্জায় এলেনের শ্বেত-পদ্মের মতো মুখ এক ঝলক রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো।

তাড়াতাড়ি বিমানের গা ঘেঁষে বসে বললো, 'কিন্তু বাবা যদি বিয়ে করতে চান, তোমরা কি করে আটকাতে পারো, বলো?'

'—যে করে হোক, আটকাতেই হবে। আমি ভাবছি....' বিমান একটু থেমে এলেনের দিকে চাইলো।

এলেন জিগ্যেস করলো, 'কি ভাবছো, বলো?'

বিমান সোফা থেকে উঠে বললো, 'কিছুই ভাবতে পারছি না। মোট কথা, বাবার সঙ্গে একটা কথা হওয়া দরকার। সামনের ছুটিতে আমি নিজে একবার কলকাতায় যেতে পারি। কিন্তু সব চেয়ে ভালো হয়, যদি ওঁকেই এখানে আনা যায়।'

একটু পরে বললো, 'সেই সঙ্গে করুণাকেও। তার কথা বাবা কোনদিন ঠেলতে পারেব না।'

মতলবটি মাথায় আসতেই বিমান উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বললো, 'দাঁড়াও, এখনি দু'খানা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিই।'

বলেই বিমান লেখবার ঘরে চলে গেল।

টেলিগ্রাম দু'খানা পাঠিয়ে মিনিট-পনেরো পরে সে বসবার ঘরে ফিরে এলো।

এলেন তখন বাইরের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে কি ভাবছিলো।

বাঁ হাত দিয়ে তাকে কাছে টেনে নিয়ে বিমান বললো, 'কি ভাবছো?'

এলেন একটু হাসবার চেষ্টা করে বললো, 'কিছুই ভাবিনি।'

'—তুমি যেন এই বিয়েতে বাধা দিতে চাওনা, মনে হচ্ছে।'

'—সত্যি।'

'—কেন চাও না?'

এলেন গম্ভীর হয়ে বললো, 'দেখো, বুড়ো মানুষদের আমরা চিনি না। তাঁদের মনের কথাও জানি না। যদি ধার যায়, বাবার ছেলেমি করার বয়েস পেরিয়ে গেছে, অভিজ্ঞতাও অনেক হয়েছে, তাহলে কেন বাধা দেবো?'

বিস্ময়ে বিমানের চোখ বড়ো-বড়ো হয়ে উঠলো।

এলেন বলতে লাগলো:

'—তুমি জিগ্যেস করলে, কি ভাবছিলাম। ভাবছিলাম কি জানো? ভাবছিলাম, ভালোবাসা শুধু আমাদের বয়েসেই একচেটিয়া কি না। কিন্তু জবাব পেলাম না।'

'—কার কাছ থেকে?'

'—নিজের মনের কাছ থেকে।'

বিমান অসহিষ্ণুভাবে বললো, 'কিন্তু আমাদের সমাজে ব্যাপারটা যে কতোখানি হাস্যকর, সেকি তুমি ধারণা করতে পারছো না?'

এলেন শান্তভাবে বললো, 'না। সেই জন্যেই তোমাকে বাধা দিতে পারছি না। চুপ করে রয়েছি।'

'—করুণা খবর পেয়েছে কিনা কে জানে!'

'—তুমি তাকেও টেলিগ্রাম করলে না?'

হাই তুলে বিমান বললো, 'করলাম তো। এখানে আসতে লিখেছি। দেখি, কি জবাব দেয়।'

করুণা কিন্তু আগেই খবর পেয়েছিলো, বিমানের সঙ্গেই। স্বামী তখন অফিসে। করুণা সমস্ত বিকেলটা ছটফট করে কাটালো। কী সর্বনেশে

চিঠি! বনবিলাস না আসা পর্যন্ত সে চিঠির মাথামুণ্ডু কিছুই তো বুঝতে পারবে না।

বনবিলাস আসতেই করুণা তাকে পোশাক ছাড়বারও ফুরসত দিলো না। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'শুনছো,—বাবা বিয়ে করতে যাচ্ছেন!'

'—বাঁচা গেল! অনেকদিন পরে এবার একটা বরযাত্রীর নিমন্ত্রণ পাওয়া যাবে।'

বনবিলাস কোটখানা খুলে হ্যাঙারে রাখলো।

'—বাবার বিয়ে নিয়ে তুমি ঠাট্টা করছো?'

করুণার বড়ো-বড়ো চোখ দিয়ে টপ-টপ্ করে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো হঠাৎ।

বিব্রত হয়ে সে বললো, 'ঠাট্টা আমি করছি না, তুমি করছো?'

'—আমি করছি?' করুণার জল-ভরা চোখে বিস্ময় ভরে উঠলো।

'—তা না তো কি? বাবা বিয়ে করতে যাচ্ছেন, এ-কথা তো তুমিই বললে আমাকে।'

'—সে তো সত্যি কথা। এই দেখো—বাবার চিঠি।'

করুণা বাবার চিঠিখানা বনবিলাসকে দিলো।

বনবিলাসের বাঁ হাতটা তখনও টাইএর উপর। কিন্তু টাই আর খোলা হলো না। পাশের চেয়ারে বসে এক নিঃশ্বাসে চিঠিখানা পড়ে গেল। তারপর বললো, 'বাবা রসিকতা করেননি তো? তিনি কিন্তু তা পারেন।'

জোরে জোরে মাথা নেড়ে করুণা বললো, 'কখ্খনো না। বাবা না লিখলেও আমি ঠিক বুঝতে পারছি, এ নিশ্চয় সেই সুচরিতা মিত্তিরের কাণ্ড।'

'—তিনি কে?'

'—কোথাকার ইন্সপেক্ট্রেস অফ স্কুলস্। আমাদের বাড়ির পাশেই বাড়ি করেছেন। মা বেঁচে থাকতেই আমাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া ছিলো। এখন আরও বেড়েছে।'

'—তুমি জানতে?'

'—জানতাম। কিন্তু ওরকম ভাবিনি। তাহলে কি ঢুকতে দিতাম!'

করুণার চোখে একটা হিংস্র আগুন জ্বলে উঠলো।

বনবিলাস হাসলো। পরে জিগ্যেস করলো, 'কি রকম লোক ?'

'—মন্দ নয়।'

স্পষ্টাস্পষ্টি ভালো বলতে করুণার বাধলো।

'—তবে আর কেন ? লাগিয়ে দাও।'

তপ্ত কড়ায় ফেলা মাছের মতো করুণা যেন জ্বলে উঠলো। বললো, 'লাগাবো। কি জানো ? আগুন ! আমি কালই কলকাতা যাচ্ছি।'

'—কালই ? সর্বনাশ ! এই রাগের মাথায় যেয়ো না। বরং পরশু যেয়ো। শনিবার আছে, আমি নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো।'

'—তুমি পরশুই এসো। কিন্তু আমাকে আর থাকতে বলো না। মন আমার ভয়ানক খারাপ। রাত্রে গাড়ির সময় থাকলে আজ রাত্রেই চলে যেতাম।'

করুণার মনের অবস্থা সেই রকমই।

তবু কালকেই তার যাওয়া হলো না। বাঁধা-ছাঁদা সব তৈরি। বিকেল ছ'টায় গাড়ি। একটু পরে টিকিট এবং বার্থ রিজার্ভেশনের জন্য লোক যাবে স্টেশনে। এমন সময় বিমানের টেলিগ্রাম এলো।

বনবিলাস এসে বললো, 'তাহলে আজ থাক। আমিও বরং এই সুযোগে ক'দিনের ছুটি নিই। দু'জনে একসঙ্গে যাওয়া যাবে। তোমরা যতক্ষণ ঝগড়াঝাটি কান্নাকাটি করবে, আমি ততক্ষণ সমুদ্রের হাওয়ায় শরীর সারাবার চেষ্টা করবো।'

বনবিলাস এমনিতেই বিশালকায়। বাঙালীর ঘরে সাধারণত এ-রকম স্বাস্থ্য বড়ো একটা দেখা যায় না।

সুতরাং স্বামীর শরীর সারাবার কথায় করুণা হেসে ফেললো। তারও ইচ্ছা বনবিলাসের সঙ্গেই যায় কিন্তু।

করুণা জিগ্যেস করলো, 'তোমার ছুটি পেতে কতো দেরি হবে ?'

'—কিছুমাত্র দেরি হবে না। শনিবার আমরা বেরুতে পারবো।'

'—ঠিক তো ?'

'—নিশ্চয়। ম্যাজিস্ট্রেটের দৌড়টা আমাকে দেখতেই হবে।'

'—দৌড় কিসের ?'

'বুঝতে পারলে না। শ্বশুরমশায়ের বিয়ের কথা শুনে তোমরা সবাই হৈ-হৈ করে কলকাতা যেতে পারতে? সেখানে বৃদ্ধ তাঁর নিজের দুর্গে সমাসীন। কাছে রয়েছে প্রধান সেনাপতি সুচরিতা মিত্তির। যাকে বলে 'Bearding the lion in his own den'—বড়ো সহজ ব্যাপার নয়। আর এ হচ্ছে বৃদ্ধকে তাঁর নিজের দুর্গ থেকে অরক্ষিত, নিরস্ত্র অবস্থায় নিজের কোর্টে বার করে এনে চাপ দেওয়া। বুঝলে?'

করুণা বিজয়ানন্দে উচ্ছ্বসিতভাবে হেসে উঠলো। বললো, 'তাই তো! আমি তো এতো কথা ভাবিনি। কিন্তু তুমিও যাচ্ছো তো?'

'—নিশ্চয়ই। শনিবার সন্ধ্যেয়।'

কিন্তু যাঁর বিরুদ্ধে এতো ষড়যন্ত্র তিনি তখন শয্যাগত।

দিন-তিনেক আগে টেনিস খেলতে গিয়ে বোস সাহেব ডান পা মচকে বাড়ি ফেরেন। সেই থেকে শয্যাগত। দু'দিন তো উঠতেই পারেননি। আজ উঠে বসেছেন এবং একটু একটু হাঁটবার চেষ্টা করছেন!

তখন আষাঢ়ের সূর্য অস্ত গেছে। কিন্তু ক্ষান্ত-বর্ষণ-মেঘের উপর রঙের সমারোহ শেষ হয়নি।

দক্ষিণের খোলা বারান্দায় একটা টিপরের উপর পা তুলে দিয়ে ইজিচেয়ারে বোস সাহেব শুয়ে ছিলেন। মার্বেল পাথরের মেঝেয় হাঁটু মুড়ে বসে সুচরিতা তাঁর পায়ে কি একটা ওষুধ পেস্ট করে দিচ্ছিলেন।

সুচরিতার মাথার কাঁচা-পাকা চুলের দিকে চাইলে সন্দেহ হয়, তাঁর বয়স হয়তো পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর মুখ, চোখ এবং নাতি-স্থূল দেহের গড়নের দিকে চাইলে সে ভুল ঘোচে। তখন মনে হয়, বয়স পঞ্চাশের এই দিকেই হবে।

একমনে হেঁট হয়ে তিনি পেস্ট করছিলেন। আরামে বোস সাহেবের চোখ বন্ধ হয়ে আসছিলো। চোখ বন্ধ করে অসাড়ে তিনি ইজিচেয়ারে শুয়ে ছিলেন।

পেস্ট শেষ করে সুচরিতা তাঁর দিকে চাইলেন।

কী সুখ!

প্রশস্ত ললাটে, নিমীলিত নেত্রে, মাথার বিরল পাকা-চুলে রক্ত-মেঘের আভা এসে পড়েছে।

কী মুখের ডৌল! বৃদ্ধের এই রূপ আর কারও চোখে হয়তো পড়বে না। কিন্তু সুচরিতা এই রূপের দিকে চেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। চোখ যেন আর ফেরাতে পারেন না। ধীরে ধীরে বোস সাহেব চোখ মেলতেই লজ্জিত সুচরিতা তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

ঈষৎ হেসে ডান হাতখানি বোস সাহেব সুচরিতার মাথায় স্পর্শ করলেন। সে স্পর্শে তিনি যেন শিউরে উঠলেন। জিগ্যেস করলেন, 'কেমন বোধ হচ্ছে?'

'—একটু ভালো।'

'—তার মানে অনেকখানি খারাপ।'

বোস সাহেব হা-হা করে হেসে উঠলেন। তারপরে বললেন, 'বসো। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।'

পাপের কুশন দেওয়া মোড়ায় বসে সুচরিতা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বোস সাহেবের দিকে চাইলেন।

বোস সাহেব একটু থেমে গলা ছেড়ে বললেন, 'বিমান একটা টেলিগ্রাম করেছে।'

সুচরিতা নিঃশব্দে তেমনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

বোস সাহেব বললেন, 'আমাকে পুরী যাবার জন্যে লিখেছে। কেন কে জানে? বোধকরি শরীরের জন্যে। শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, লিখেছিলাম। কিন্তু এই ভাঙা পায়ে কী এখন যেতে পারবো? পা অবশ্য অনেকটা সেরে আসছে। কাল-পরশু হয়তো মোটামুটি হাঁটতে পারবো। তবু·······?'

পশ্চিমের দিগন্ত থেকে বর্ণচ্ছটা ধীরে-ধীরে ম্লান হয়ে আসছে। সেইদিক চেয়ে বোস সাহেব অনর্গল বলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ সুচরিতার দিকে চেয়ে থমকে গেলেন।

তাঁর মুখে কুটিল হাস্যরেখা ফুটে উঠেছে।

বোস সাহেব থমকে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কি, হাসছো যে?'

'—না, হাসিনি। বোধহয় তোমার শরীরের জন্যেই টেলিগ্রাম করেছে। তাই হবে।'

বিব্রতভবে বোস সাহেব বললেন, 'তা না তো তুমি কি মনে করো?'

সুচরিতা এবারে উচ্ছ্বসিতভাবে হেসে উঠলেন। বললেন, 'তুমি না বক্তৃতায় হাইকোর্ট কাঁপিয়ে থাকো? জটিল মামলা জলের মতো সোজা, আর সোজা মামলা হুশ্ছেত্থ করে তোলো?'

বোস সাহেব সবিনয়ে বললেন, 'সে বদনাম আমার আছে, সুচরিতা। নইলে মক্কেল টাকা দিতো না।'

'—তুমি কি এই টেলিগ্রামের অর্থ সত্যিই বুঝতে পারছো না?'

'—যা বুঝেছি সে তো তোমায় বললাম।'

সুচরিতা অবাক হয়ে বোস সাহেবের শান্ত মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর ওঁর একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে সযত্নে টেনে নিয়ে বললেন, 'সংসারে অনেক লোক দেখলাম, কিন্তু তোমার সঙ্গে কারও তুলনা চলে না।'

'—ঠাট্টা করছো?'

সুচরিতা, গম্ভীরভাবে বললেন, 'ঠাট্টা নয়। সাধারণ মানুষ থেকে তুমি অতুলনীয়। যতই তোমাকে দেখছি, ততই এই ধারণা আরও আমার দৃঢ় হচ্ছে।' তারপর কথাটি ফেরাবার জন্য তাড়াতাড়ি বললেন, 'তাহলে কবে যাচ্ছো, তুমি?'

'—তুমি বলে দাও।'

সুচরিতা একটু ভেবে বললেন, 'বিমান যখন লিখেছে তখন তোমার বেশি দেরি করা উচিত নয়। আমি বলি তুমি সোমবার যাও বরং। আমি এখনই সরকারমশাইকে বলে দিচ্ছি, তিনি কালকে গিয়ে তোমার বার্থ-রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করবেন। ঝগড়ু তোমার সঙ্গে যাবে।'

'—আর তুমি? তুমি যাবে না?'

সুচরিতার মুখে কিসের যেন একটা কালো ছায়া পড়লো। কিন্তু এক মুহূর্তে তিনি যেন নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর সহজ কণ্ঠে

বললেন, 'আমার যাওয়া সম্ভব হবে না। ঝগড়ু সঙ্গে থাকলে, আমার মনে হয় তোমার কিছু অসুবিধে হবে না।'

বোস সাহেব চুপ করে রইলেন।

সোমবার সকালে সুচরিতা একবার বোস সাহেবের খবর নিতে এলেন। পায়ের ব্যথা বোস সাহেবের অনেকখানি সেরে গেছে। নেই বললেই হয়। পুরী যাবার উৎসাহে তাঁকে অনেকটা উজ্জ্বল দেখাছে। দেখে সুচরিতা অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন।

সুচরিতা বুঝতে পেরেছিলেন, বোস সাহেবের ইচ্ছা তিনি সুদ্ধ তাঁর সঙ্গে যান। কিন্তু এও তিনি বুঝেছিলেন, বর্তমানে সে যে সম্ভব নয়—সে-কথা বোস সাহেবকে বোঝানো অসম্ভব! সুতরাং সে চেষ্টা তিনি করেননি। কিন্তু যাবার সময় এই জন্যে বোস সাহেবের যে ক্ষোভ রয়ে গেল সে-কথা ভেবে তিনি মনে-মনে অস্বস্তি বোধ করছিলেন। বোস সাহেবের উৎসাহ এবং ফুর্তি দেখে সে অস্বস্তি অনেকখানি দূর হলো।

বোস সাহেব সুচরিতাকে দেখেই উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'এসো, এসো। তোমার কথাই ভাবছিলাম। দেখো তো, সব জিনিস ঠিক মতো নেওয়া হলো কি না?'

'—তোমার গোছানো সব হয়নি এখনও?'

'—হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে। এখন তুমি একবার দেখে পাস করে দিলেই হয়।'

ঝগড়ু বাঁধা-ছাঁদা করছিলো।

সুচরিতা তার দিকে চেয়ে বললেন, 'টেনিস ব্যাগটা খুলে দে তো। ওটা যাবে না।'

বোস সাহেব ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, 'ওটা নিয়ে যেতে দেবে না? বৌমা খুব ভালো টেনিস খেলেন। ইচ্ছা ছিলো……'

'—ইচ্ছা এখন থাক! ওই খোঁড়া পায়ে এখন কিছুদিন খেলা হবে না। মশারিটা নিয়েছিস, ঝগড়ু?'

ঝগড়ু জিভ কেটে উপরের দিকে ছুটছিলো। তাকে থামিয়ে সুচরিতা জিগ্যেস করলেন, 'ওষুধগুলো নিয়েছিস তো?'

ঝগড়ু বললো, 'সেগুলো নিয়েছি, মাসীমা।'

'—আচ্ছা, তাহলে মশারিটা তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়। দাঁড়া, আমিও যাচ্ছি। ওপরের ঘরটা দেখলে বোঝা যাবে, কি নিয়েছিস আর কি নিসনি।'

উপরের ঘরের চারিদিকে সুচরিতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে দেখলেন। না, আর কিছু ঝগড়ুর ভুল হয়েছে বলে হলো না!

সুচরিতা নেমে আসছেন, এমন সময় ঝগড়ু বললো, 'সাহেব তো যাচ্ছেন মাসীমা, কিন্তু কাল রাত্তিরে ওঁর একটু জ্বর হয়েছিলো।'

'—সেকি রে?'

'—হ্যাঁ। আপনাকে জানাতে বিশেষ করে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আমার মনে হলো, আপনাকে জানানো দরকার।'

বোস সাহেবের অসুখের খবর এতো লোক থাকতে সুচরিতাকে জানানো ঝগড়ু দরকার মনে করেছে। এর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত অন্য সময় হলে হয়তো সুচরিতার দৃষ্টি এড়াতো না। একটু হয়তো তিনি লজ্জাই পেতেন। কিন্তু অসুখের খবরে তিনি লজ্জার অবসর পেলেন না। বললেন, 'কই—আমি তো টের পেলাম না।'

ঝগড়ু সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললো, 'এখনও একটু জ্বর আছে বোধহয়!'

নিচে এসেই সুচরিতা জিগ্যেস করলেন, 'তোমার শরীরটা শুকনো দেখাচ্ছে কেন? জ্বর নয়তো?'

'—না, না! জ্বর কিসের? ঝগড়ু বলেছে বুঝি?'

বাঁ হাতের উল্টো পিঠে বোস সাহেবের ললাট স্পর্শ করে সুচরিতা বললেন, 'গাটা একটু গরমই বোধ হচ্ছে যেন। ঝগড়ু, থার্মোমিটারটা দে তো, বাবা।'

দেখা গেল জ্বর একটু আছে, নিরানব্বই-এর কাছাকাছি।

বোস সাহেব বললেন, 'ও কিছু নয়। দুপুর-নাগাদ ও আর থাকবে না। তারপর পুরীর মতো জায়গা—'

সুচরিতা নিঃশব্দে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। বোস সাহেব বোঝাতে লাগলেন নিরানব্বইটা আসলে জ্বরই নয়। ওটুকু উত্তাপ নানা কারণেই ওঠে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুচরিতা বললেন, 'সরকারমশাইকে খবর দে তো ঝগড়ু। বল্‌, এখনি স্টেশনে গিয়ে আর একখানা টিকিট কিনে আনতে। বার্থ পাওয়া যায় ভালোই, না যায় তো যে কোনো ক্লাসের একখানা টিকিট। আর তুই আমর সঙ্গে একবার আয়। বিশেষ কিছুই আনতে হবে না। একটা সুটকেস, আর একটা বেডিং।'

বোস সাহেব লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, 'তুমি যাবে?'

'—না গিয়ে উপায় কি? তুমি তো সহজ লোক নও। আমার মুখ না হাসিয়ে ছাড়বে কেন?'

বোস সাহেব এ খোঁচা গায়েই মাখলেন না। বললেন, 'ভাগ্যিস, একটু জ্বরের মতো হয়েছিলো!'

কথাটা বোস সাহেব এমন করে বললেন যে, ঝগড়ুটা পর্যন্ত হাসি চাপবার জন্য পালালো।

স্টেশনে বোস সাহেবদের অভ্যর্থনা করবার জন্য ওরা দলকে-দল সবাই এসেছিলো।

বোস সাহেব ট্রেন থেকে নামলেন। মুখে সেই প্রসন্ন হাসি। লজ্জা অথবা কুণ্ঠার চিহ্নমাত্র নেই। ওরা অবাক হয়ে গেল। এমন কি একটু দমেই গেল। কিন্তু উত্তেজনা সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল না। বোস সাহেবকে বগল-দাবা করে ওরা মোটরে নিয়ে গিয়ে তুললো। চাকরটিকে বলে গেল মালপত্র নিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি করে আসতে।

একরাশ পোঁটলা-পুঁটলির মধ্যে ঝগড়ুকে নিয়ে সুচরিতা সেই প্ল্যাটফর্মে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। বিমানের চাকর ও আর্দালী মালপত্রগুলো ঘোড়ার গাড়িতে তোলবার জন্য টানাটানি করতে লাগলো। সুরচিতা সেদিকে চেয়েও দেখলেন না।

অকস্মাৎ যেন তিনি পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়েছেন।

'—মা!'

ঝগড়ু তাঁকে মা বলে না। মাসীমা বলে। এই প্রথম তাঁকে মা বলে ডাকলো। তার স্বরে জেদের জবরদস্তি।

'—মা!'

সুচরিতা বিহ্বলের মতো চাইলেন।

ঝগড়ু বললো, 'পুরী আমার চেনা জায়গা। অনুমতি করেন তো, আমরা দু'জনে একটা হোটেলে গিয়ে উঠি।'

ব্ল্যাক-আউটের কল্যাণে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম অন্ধকার। সেই অন্ধকারে সব কিছু ঝাপসা হয়ে গেছে; ছগড়ুর কথাগুলো পর্যন্ত। কোনো কিছুই যেন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না!

অন্যমনস্কভাবে সুচরিতা শুধু প্রতিধ্বনি করলেন, 'হোটেলে!'

ওদের কাছেই শ্বেতবসনা একটি নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে ছিলো। অন্ধকারে ওরা দেখতে পায়নি। হোটেলের নাম শুনে তিনি এগিয়ে এলেন। গাড়ির জানলার আলো তাঁর মুখে আসতেই ঝগড়ু সসম্ভ্রমে সেলাম করলো। একটু সরে দাঁড়ালো।

মূর্তি সুচরিতার সামনে দাঁড়িয়ে ইংরেজিতে বললো, 'আমি মিসেস বোস। আপনার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি। বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছে। আসুন আপনি।'

ওর কণ্ঠস্বরে সুচরিতা সমবেদনার আভাষ পেলেন। কে জানে, ঠিক চিনতে পারলেন কিনা। ওর প্রসারিত ডান হাতখানি নিজের দুই হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে একটুক্ষণ কি যেন ভাবলেন সুচরিতা। কিংবা হয়তো কিছুই ভাবলেন না তিনি। প্রথম আঘাতে ভাববার শক্তিই যেন তাঁর নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। তবু বললেন, 'আমায় যেতে বলছো? চলো।'

বাইরে একখানা ট্যাক্সি ছিলো। ওঁরা দু'জনে তাইতে উঠলেন। এতক্ষণে ঝগড়ুর মুখ প্রসন্ন হলো। সেও ওঁদের পিছনে পিছনে এসে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসলো।

সেই রাত্রে বোস সাহেবের জ্বর খুব বাড়লো। রাত্রে তিনি একাই ছিলেন। সুতরাং রাত্রে আর কেউ টের পায়নি। সকালে ঝগড়ু ওদের চায়ের টেবিলে খবরটা এনে দিলো।

বিমান ও তার স্ত্রী, করুণা ও তার স্বামী এবং সুচরিতা সমুদ্রের দিকের বারান্দায় একটা গোল টিপয়ের চারিদিকে বেতের চেয়ারে বসে বোস সাহেবের জন্যই অপেক্ষা করছিলো। সুচরিতার সঙ্গে করুণার আগেই আলাপ ছিলো। এলেনের সঙ্গে স্টেশন থেকে আসবার সময় পথে কিছু আলাপ হয়েছিলো; রাত্রে আর বিশেষ কথা হয়নি। সুচরিতা এবং বোস সাহেব ক্লান্ত ছিলেন। ওরা নিজের নিজের শোবার ঘরে এক-এক পেয়ালা কফি খেয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। বলতে গেলে, সকালেই আলাপের পর্ব শুরু হয়েছিলো।

কিন্তু তাকে ঠিক রসালাপ বলা চলে না।

বিবাহের ব্যাপার নিয়ে প্রথম সুযোগই যে তাঁর উপর আক্রমণ আরম্ভ হবে, সে তিনি গোড়া থেকেই অনুমান করেছিলেন। এবং সেজন্য প্রস্তুত হয়েই চায়ের টেবিলে এসে যোগ দিয়েছিলেন। আক্রমণটা যে all out হবে তাতেও তাঁর সন্দেহ ছিলো না। সতর্ক হয়েই তিনি অপেক্ষা করছিলেন। কেবল প্রথম আক্রমণটা কোন্ দিক থেকে আরম্ভ হবে, সেইটাই তিনি ঠিক করতে পারছিলেন না।

করুণা তাঁর বিশেষ চেনা এবং স্নেহের পাত্রী। সুতরাং তার উপর তাঁর কিছু ভরসা ছিলো। অথচ প্রথম আক্রমণ অপ্রত্যাশিতভাবে সেই দিক থেকেই শুরু হলো।

করুণা বললো, ‘এই বয়সে বাবা আবার বিয়ে করতে যাচ্ছেন, আপনারা কিছু শুনেছেন, মাসীমা?’

কাড়া-নাকড়া বাজিয়ে ধুম-ধামের আক্রমণ নয়। যেন হাপরের আক্রমণ, দাঁত বসছে, কিন্তু বেদনা নেই।

সুচরিতা মৃদু হেসে বললেন, ‘কিছু কিছু শুনেছি বই কি, মা।’

‘—একি ঠিক হচ্ছে মনে করেন? আপনাদের বাধা দেওয়া উচিত ছিলো না?’

'—আমার পক্ষে যতখানি বাধা দেওয়া উচিত, তা দিয়েছিলাম, মা। কিন্তু সঙ্গত-অসঙ্গত প্রশ্ন যদি তোলো, তাহলে বলবো, সে-কথা তোমরা তুলতে পারো, আমি পারি না।'

সুচরিতার জবাব দেবার ভঙ্গীতে শুধু করুণা নয়, সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই অপ্রীতিকর আলোচনা ওঠার সময় থেকেই এলেন অস্বস্তি বোধ করছিলো। ইতিমধ্যে ঝগড়ু এসে বোস সাহেবের জ্বরের সংবাদ দিতেই সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

'—জ্বর, খুব বেশি জ্বর? কখন থেকে জ্বর হয়েছে?'

ওরা সবাই উঠতে যাচ্ছিলো। সুচরিতা ঝগড়ুকে শান্তভাবে বললেন, 'সাহেবকে জিগ্যেস করো, চা তাঁর ঘরে পাঠিয়ে দেবো কিনা, আর বলো আমরা চা খেয়েই আসছি।'

আশ্বস্তভাবে ওরা বসলো।

কিন্তু সেই অস্বস্তিকর বিয়ের প্রশ্ন আর উঠলো না—সকলের মন তখন বোস সাহেবের অসুখের দিকেই ঝুঁকেছে। ওরা নীরবে চা খেয়ে বোস সাহেবের ঘরে গেল। কেবল সুচরিতা একপ্রান্তে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে খবরের কাগজ পড়তে লাগলেন। কেন যে তিনি ওদের সঙ্গে বোস সাহেবের ঘরে গেলেন না, তা তিনিই জানেন। ওরাও কেউ তাঁকে ডাকবার প্রয়োজন বোধ করলো না।

বোস সাহেবের জ্বর নিতান্ত কম নয়, একশোর একটু বেশি। বিমান ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে কতকগুলো জরুরী কাজ সেরে নেবার জন্য তার অফিস-ঘরে গিয়ে বসলো।

করুণা ও বনবিলাস সমুদ্র-স্নানে বেরিয়ে পড়লো।

এলেন তার সাংসারিক কাজগুলো একবার তদারক করে ধীরে-ধীরে এসে সুচরিতার কাছে বসলো। বললো, 'জ্বর একশোর ওপর।'

খবরের কাগজ থেকে মুখ না তুলেই সুচরিতা বললেন, 'জানি। রাত্রে দুই পর্যন্ত উঠেছিলো।'

'—আপনি কি রাত্রে টেম্পারেচার নিয়েছিলেন ?'

রাত্রের কথা বলেই সুচরিতা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সেটা কাটিয়ে শান্তভাবে বললেন, 'ওখান থেকে অল্প জ্বর নিয়েই বেরিয়েছিলেন। সমস্ত রাস্তায় সেটুকু ছাড়েনি। আমার কেমন ভয় হচ্ছিল, ট্রেনের ধকলে রাত্রে জ্বরটা বাড়তেও পারে। তাই একবার টেম্পারেচার নিয়েছিলাম।'

এলেন নিঃশব্দে একটুক্ষণ কি যেন ভাবলো। তারপরে বললো, 'ডাক্তার ডাকতে লোক গেছে। আশা করা যায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই এসে যাবেন।'

সুচরিতা আপন মনে খবরের কাগজ পড়তে লাগলেন। তারপরে এলেনের দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, 'তোমার সঙ্গে টেনিস খেলবার জন্যে উনি র‍্যাকেট নিয়ে বেরুচ্ছিলেন। আমিই সেটা খুলে রেখে দি। এখন শুয়ে-শুয়ে টেনিস খেলছেন।'

দু'জনেই হাসলো।

এলেন বললো, 'একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস করবো ?'

সুচরিতা হেসে বললেন, 'না করলেই চলবে না ?'

মিনতির সুরে এলেন বললো, 'একটি কথা শুধু। আপনি এখানে এলেন কেন ?'

'—বুঝতে পারছো না ? ওঁর জ্বর, না এসে আমার উপায় ছিলো ? একে ভাঙা পা, তার ওপর জ্বর। এতো তাড়াতাড়ি উনি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন দেখে বাধা দিইনি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললেন, 'এখানে আমার অসম্মানের যে কোনো ত্রুটি হবে না, সে আমি জানতাম। কিন্তু তারই বা উপায় কি বলো ?'

এলেন ব্যাকুলভাবে কি বলতে যাচ্ছিলো। সুচরিতা তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'আমি জানি, তুমি এজন্যে খুব লজ্জিত। কিন্তু তুমি কি করবে ? তুমি কি করতে পারো? আমি বুঝতে পারছি তুমি অসহায়। কিন্তু একটা কথা বিশ্বাস করো, এ বিষয়ে আমি যথেষ্ট বাধা দিয়েছিলাম। কিন্তু, কিছুতেই ওকে নিরস্ত করতে পারিনি।'

হাতের খবরের কাগজগুলো মেঝেয় ফেলে দিয়ে উত্তেজিতভাবে সুচরিতা বলতে লাগলেন, 'বাধা দেবার কথাই তো! যাকে বিয়ের বয়েস বলে, সে ওঁর কিম্বা আমার কারও নেই। ছেলেপুলে, ঘর-সংসারের উচ্চাশাও নেই। তবে আবার বিয়ে কেন? কিন্তু উনি কিছুতেই শুনবেন না।'

এলেন নিঃশব্দে সাগ্রহে শুনে যেতে লাগলো।

সুচরিতা বলতে লাগলেন, 'কেন শুনবেন না, সে তোমরা বুঝবে না। উনিও বুঝতে পারবেন না। বোঝবার ইচ্ছা যদি থাকে, ওঁর প্রশান্ত মুখের দিকে চেয়ে তোমাদের নিজেরই বুঝে নিতে হবে।'

এলেন তাড়াতাড়ি ওঁর একখানা হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে বললো, 'আমাকে কিছুই বলতে হবে না, মা। আপনার মুখের দিকে চেয়েই বুঝে নিয়েছি। কিন্তু সবাই কি তা বুঝবে?'

দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে সুচরিতা বললেন, 'তাও জানি। বুঝবে না। তাদের নিন্দা উপহাস ক্রোধ আমাদের সইতেই হবে। সে যদি না পারি তবে কিসের ভালোবাসা? কিন্তু চলো। ডাক্তার এলেন মনে হচ্ছে।'

সাতদিন সাতরাত্রি জ্বরে ভোগার পর কাল ভোরে বোস সাহেবের জ্বর ছেড়েছে। সুচরিতা চায়ের টেবিলে আসেননি। তাঁর চা বোস সাহেবের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

চায়ের টেবিলে করুণা বললো, 'কাল আমরা যাচ্ছি, দাদা!'

'—কালকে? সে কি হয়? বাবা আর একটু সেরে উঠুন।'

বনবিলাস বললো, 'আর ভয়ের তো কিছু নেই। আমার ছুটিও যে ফুরিয়েছে।'

এলেন বললো, 'আবার কবে আসছো, বলো? এবারে কোনো যত্নই তোমাদের হলো না।'

'—তার দরকার ছিলো না, বৌদি। শুধু ভেবে দেখুন, উনি না থাকলে আমাদের আরও কতো কষ্ট হতো।'

ক'দিন থেকে 'উনি' বলতে সবাই সুচরিতাকেই বুঝছে। এলেন বললো, 'এরকম শুশ্রূষা আমি চোখে কখনও দেখিনি! সাতদিন সাতরাত্রি ওই এক চেয়ারে উনি ঠায় বসে।'

বনবিলাস বললো, 'সেই কথাই ভাবছি, বৌদি। পুরীর সমুদ্র আর ওঁর এই সেবা সব সময় আমার মনে জেগে থাকবে।'

একটুখানি ঠোঁট দাঁতে কামড়ে নিয়ে করুণা বললো, 'ওঁর সব ভালো, কেবল ওই বেহাপনা ছাড়া। গিয়ে দেখি আঁচলে করে বাপির মুখ মুছিয়ে দিচ্ছেন। আমাকে দেখে এতোটুকু লজ্জা পেলেন না। এ বয়সে অতোখানি ভালো নয়। যে বয়সে যা।'

বনবিলাস হেসে বললো, 'চাঁদে কলঙ্কের মতো ওটুকু ত্রুটি থাক না, করুণা।'

করুণা হাতের চামচটা প্লেটে ঘষতে ঘষতে বললো, 'বেশ, তা যেন রইলো। কিন্তু এ বয়সে বিয়ে করার কোনো মানে হয়?'

এলেন উত্তর দিলো, 'হয়তো হয়। অন্তত ওঁদের মুখের দিকে চেয়ে আমি তো এর মানে পেয়েছি। যৌবন নেই, দেহের প্রয়োজনও ফুরিয়েছে, তবু একজনকে নইলে আর একজনের জীবন দুর্বহ হয়ে উঠেছে, এ-যে কতো বড়ো:কথা ভেবে দেখেছো, করুণা?'

ব্যঙ্গভরে করুণা বললো, 'ও! তুমি তো দেখছি তাহলে এ বিয়ের পক্ষেই।'

এলেন অকস্মাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বললো, 'আমি পক্ষেই থাকি আর বিপক্ষেই থাকি, তাতে কিছু যায় আসে না, করুণা। তুমি কি এখনো বোঝনি, এ বিয়েতে বাধা দেবার ক্ষমতা কারও নেই?'

করুণা বললো, 'বুঝেছি। কিন্তু যাবার আগে আমরা এইটুকু ওঁদের জানিয়ে দিয়ে যাবো যে, এই অন্যায়ে আমাদের সম্মতি নেই।'

এলেন উত্তেজিতভাবে উত্তর দিলো, 'অন্যায়? ন্যায়-অন্যায়ের শেষ কথা কি তোমার জানা হয়ে গেছে?'

করুণার হাত ধরে হঠাৎ এলেন হিড়-হিড় করে ভিতরের দিকে নিয়ে গেলো। বোস সাহেবের ঘরের বাইরে পর্দার আড়ালে তা

অকা

করিয়ে পর্দাটা একটু ফাঁক করে ফিস্‌-ফিস্‌ করে এলেন বললো, 'একে তুমি অন্যায় বলো ?'

করুণা দেখলো ঃ

বোস সাহেবের খাটের পাশে একখানা ইজি চেয়ারে সুচরিতা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। তাঁর মাথার কাঁচাপাকা চুল বিশৃঙ্খল। চোখের কোণে কালি পড়েছে। শ্রান্ত, শুষ্ক মুখ, ঠোঁটের ফাঁকে গভীর প্রশান্তি।

সেই মুখের দিকে চেয়ে করুণাও থমকে দাঁড়িয়ে রইলো।

যৌবনজ্বালা

অন্নদাশঙ্কর রায়

১

ডিনার শেষ হলে মহিলারা উঠে গেলেন বসবার ঘরে। আমার স্ত্রী চলে যাচ্ছেন দেখে অন্যমনস্কভাবে আমিও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করছি, এমন সময় পিছন থেকে আমার কোট ধরে টানলেন গৃহকর্তা, ব্যারিস্টার মৌলিক। কানে-কানে বললেন, 'কথা আছে।'

আমি থমকে দাঁড়ালুম, 'কী কথা!'

তিনি মুখ টিপে মুচকি হাসলেন। কথাটা আর কিছু নয়, এটিকেটের ভুল। বলতে হলো না যে, মহিলারা কিছুক্ষণ নিরালায় থাকবেন, সে সময় পুরুষদের যাওয়া বারণ। তাঁর হাসি থেকে অনুমান করলুম, কী কথা। চোরের মতো চুপি-চুপি ফিরে এলুম খানা-কামরায়। একটা ফাঁড়া কেটে গেল।

ইতিমধ্যে জনা-চারেক অভ্যাগত মিলে জটলা শুরু করে দিয়েছিলেন! হাতে পানপাত্র, মুখে চুরুট। আমার তো ও-সব চলে না, আমি এক পেয়ালা কফি হাতে ওঁদের সঙ্গে ভিড়ে গেলুম। ভিড় দেখলেই ভিড় বাড়ে। যে যার চেয়ার টেনে নিয়ে ঘিরে বসলো চার ইয়ারকে! কেউ কেউ টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো।

প্রোফেসর মণিমোহন দে বলছিলেন ইঞ্জিনীয়ার প্রদোষকুমার সেনকে, 'তুমি আসাম থেকে আসছো। তুমিই বলতে পারবে আসলে কী হয়েছিলো। আমরা তো নানা মুনির নানা বয়ান শুনছি। কেউ বলে, শিকার করতে গিয়ে দৈব দুর্ঘটনা। কেউ বলে স্রেফ আত্মহত্যা।'

প্রদোষ মাথা নাড়লেন, 'না, য়্যাকসিডেন্ট নয়।'

সকলে বুঝতে পারলো বিকল্প কী। তবু মুখ ফুটে জিগ্যেস করলো ব্যারিস্টার বীরেশ্বর ঘোষাল, 'তাহলে কী ?'

'সুইসাইড।'

'সুইসাইড!' ঘোষাল উত্তেজিত হয়ে বললো, 'আমি বিশ্বাস করিনে। স্বয়ং যুধিষ্ঠির এসে হলফ করে বললেও আমি বিশ্বাস করবো না যে, বিশ্বজিৎদা আত্মহত্যা করেছে। বিলেতে থাকতে আমাকে রক্ষে করেছিলো কে ? কাকে আমি বিবেকের মতো ভয় করতুম ? জিতেন্দ্রিয়, চরিত্রবান, সত্যনিষ্ঠ—'

আমি বুঝতে পেরেছিলুম, যাঁর কথা হচ্ছিলো তিনি আমার কলেজের বিখ্যাত খেলোয়াড় বিশ্বজিৎ সিংহরায়। বাংলার রাজপুত। ছ'ফুট লম্বা, সুশ্রী চেহারা, মুখচোরা প্রকৃতি। খুব কম ছেলের সঙ্গেই মেশেন, যাদের সঙ্গে মেশেন তারা বলে মনটা সাদা, যাদের সঙ্গে মেশেন না তারা বলে মাথা গরম। আমি ছিলুম বয়সে অনেক ছোটো, দূর থেকে দেখতুম আর শ্রদ্ধা করতুম।

'কিন্তু কথাটা কি সত্যি ?' বললুম ঘোষালকে বাধা দিয়ে।

'চুপ। চুপ।' গৃহকর্তা আমার পিঠে টোকা মেরে সাবধান করে দিলেন যে, ও ঘরে মহিলারা রয়েছেন।

ঘোষাল তখনো গজগজ করছিলো, 'কিন্তু কেন ? কোন্ দুঃখে আত্মহত্যা করবেন বিশ্বজিৎদার মতো লোক। একটা নষ্ট মেয়েমানুষের জন্যে ?'

প্রদোষ দপ্ করে জ্বলে উঠলেন, 'নষ্ট মেয়েমানুষ কাকে বলছো ?'

'তুমি জানো, কাকে বলছি। শী ইজ এ বিচ্।'

'চুপ চুপ।' বলে মৌলিক তার মুখ চেপে ধরলেন।

প্রদোষ বললেন, 'যে বিচ্ নয় তাকে বিচ্ বলে ভুল করেছিলো বিশ্বজিৎ। সেই জন্যে এই ট্রাজেডী। কিন্তু আগে দরজাগুলো ভেজিয়ে দেওয়া হোক। এ-সব কথা মেয়েদের জন্যে নয়।' এই বলে প্রদোষ আর একটা সিগার ধরালেন।

আমরা যে যার চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে দরজাগুলো ভেজিয়ে দিয়ে এলুম। কে জানে, মেয়েরা যদি শুনতে পায় তা হলেই হয়েছে। গৃহকর্তা সবাইকে দিয়ে গেলেন যার যা অভিরুচি। আমি নিলুম আর এক পেয়ালা কফি। প্রদোষ বলতে আরম্ভ করলেন।

২

ঘোষালকে পাপের হাত থেকে রক্ষে করবার জন্যে ছিলো বিশ্বজিৎ, কিন্তু বিশ্বজিৎকে ভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষে করবার জন্যে ছিলো না তেমন কেউ। বিশ্বজিৎ হচ্ছে সেই জাতের মানুষ, যারা রামধনুর সাতটা রং দেখতে পায় না, যাদের চোখে দু'টি মাত্র রং। সাদা আর কালো। মেয়েদের সে দু'ভাগে বিভক্ত করেছিলো। ভালো আর মন্দ।

জানো তো, মেয়েরা কতো বিচিত্র প্রকৃতির। কোনো দু'জন মেয়ের প্রকৃতি এক নয়। এমন কি কোনো একজন মেয়ের প্রকৃতি সব সময় এক রকম হয় না। সকালে-বিকেলে শাড়ির রং বদলায় কেন, জানো? মনের রং বদলায়। এই আশ্চর্য প্রাণীকে নিয়ে প্রাণে বাঁচতে হলে সাত-সাতটা রংয়ের জন্যে চোখ থাকা চাই। যারা রং-কানা তাদের উচিত নয় বেশি বয়েস পর্যন্ত অবিবাহিত থাকা। বিশ্বজিতের বাবা তার বিয়ে না দিয়ে তাকে বিলেতে পাঠিয়েছিলেন এই ভরসায় যে, বিশ্বজিতের নীতিবোধ নির্ভরযোগ্য। তিনি জানতেন না যে, ওই ধরনের পুরুষরাই মরে সকলের আগে। মেয়েদের ওরা চিনতে পারে না। ভুল করে। ভুলের মাশুল মৃত্যু।

বিশ্বজিতের ধারণা ছিলো—সেই মেয়েরাই ভালো, যারা পুরুষদের সঙ্গে মেশে না। যারা পুরুষদের সঙ্গে মেশে তারা খারাপ। যারা যতো বেশি মেশে, তারা ততো বেশি খারাপ। ওদের বাড়িতে ওরা কড়া পর্দা মানতো। বাড়ির মেয়েদের সম্বন্ধে ওরা ছিলো পুরোদস্তুর রক্ষণশীল। অথচ বাঈজীর নাচ না হলে ওদের বাড়ির কোনো উৎসব পূর্ণাঙ্গ হতো না। সাদা আর কালো, ভালো আর মন্দ, এর বাইরে যে আর কোনো রং বা রীতি থাকতে পারে, বিশ্বজিতের সে শিক্ষা হয়নি দেশে থাকতে। বিদেশে

গিয়ে হতে পারতো, কিন্তু ঐ যে বললুম—তেমন কেউ ছিলো না, যে শেখাবে।

বিশ্বজিৎ পাপের হাত থেকে রক্ষে পেয়েছিলো, তা ঠিক। তিন বছর বিলেতে কাটিয়েও সে মেয়েদের সঙ্গে খেলা করেনি, নাচেনি, অন্যান্য পুরুষের অসাক্ষাতে কথা বলেনি। মেয়েরা পর্দা মানে না বলে ও নিজে এক রকম পর্দা মানতো। মেয়েদের সামনে বড়ো-একটা বেরোতো না, ট্রামে-বাসে কিংবা টিউব ট্রেনে গা ঘেঁষে বসতো না, দাঁড়াতও না। ওর জন-কয়েক ভক্ত ছিলো। যেমন ঘোষাল। তাদের কারো সঙ্গে তরুণী বান্ধবী দেখলে ও তাকে বয়কট করতো। শেষ পর্যন্ত ওর ঐ একমাত্র ভক্তই অবশিষ্ট ছিলো। এবং সেটিও একটি ভণ্ড। মাফ কোরো, ঘোষাল। নয়তো হাটে হাঁড়ি ভাঙবো।

দেশে ফিরে বিশ্বজিৎ বিয়ে করলে পারতো, কিন্তু ওর এক ধনুর্ভঙ্গ পণ ছিলো। যতদিন না নিজের পয়সায় মোটর কিনছে ততদিন ও নিজেকে ওর শ্বশুরকুলের সমকক্ষ মনে করবে না। সমকক্ষ না হয়ে পাণিগ্রহণ করবে না। ও ফরেস্ট সার্ভিসে যোগ দিয়ে আসামে চাকরি নিলো। চাকরির গোড়ার দিকে যে মাইনে পাওয়া যায় তাতে মোটর কেনার প্রশ্ন ওঠে না। বিয়ের প্রস্তাব এলে মোটরের অভাব বলে ও সে প্রস্তাব বানচাল করে দেয়। অবশ্য যারা মেয়ে দিতে চায়, তারা মোটর দিতেও রাজি। কিন্তু তাহলে সমকক্ষতার গৌরব থাকে না।

শিকারের শখ ওর ছেলেবেলা থেকেই ছিলো। ফরেস্ট অফিসার হয়ে ওটা হয়ে উঠলো ওর একমাত্র শখ। বন-জঙ্গল পরিদর্শন করতে গিয়ে ও শিকার করে বেড়াতো মাসের মধ্যে পনেরো-বিশদিন। যতো রকম বুনো জানোয়ার ওর খপ্পরে পড়তো তাদের সহজে নিস্তার ছিলো না। নিজেও বিপদে পড়তো কোনো-কোনো সময়। ওকে দেখলে মনে হতো না যে, ও ঠিক সামাজিক মানুষ। অথচ লোক অতি অমায়িক। শত্রু বলতে কেউ ছিলো না ওর। কাউকে মাংস, কাউকে চামড়া, কাউকে শিং উপহার দিয়ে ও সবাইকে খুশি রেখেছিলো।

এমন সময় ওখানে শিকারের খোঁজে এলেন হায়দরাবাদের এক

সামন্ত রাজা ও তাঁর রানী। এঁরা কিছুদিন থেকে শিলংএ বাস করছিলেন। ইউরোপে এঁরা পড়াশুনো করেছেন, ইউরোপের প্রাকৃতিক দৃশ্য এঁদের ভালো লাগে, সেদিন থেকে শিলং ভারতে অদ্বিতীয়। শিকার উপলক্ষে এঁরা মাঝে-মাঝে বনে-জঙ্গলে ঘোরেন, ফরেস্ট বাংলোয় ওঠেন। ফরেস্ট অফিসারদের সাহায্য নেন। অফিসাররাও এঁদের সঙ্গ পেয়ে কৃতার্থ বোধ করেন। হায়দরাবাদের সামন্ত রাজাদের ধনের প্রসিদ্ধি আছে। অফিসারদের কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে এঁরা গলা থেকে মণিমুক্তোর হার খুলে দেন। যারা নেয় না, তারাও মুগ্ধ হয়ে যায়।

বিশ্বজিৎ নিলো না, মুগ্ধ হলো। রাজা রানী দু'জনে তাকে সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ জানালেন, সে যেন শিলংএ তাঁদের অতিথি হয়! বিশ্বজিৎ বারকয়েক 'না না, তা কি হয়' ইত্যাদি বলার পর কেমন করে একবার 'আচ্ছা' বলে ফেললো। লোকটা সত্যনিষ্ঠ। 'আচ্ছা' যখন বলেছে, তখন শিলং তাকে যেতেই হবে, ছুটি তাকে নিতেই হবে, রাজা-রাজড়ার অতিথি তাকে হতেই হলো, যদিও সে তাঁদের সমকক্ষ নয়। ওঁরা তাকে ক্লাবে নিয়ে গিয়ে হোমরা-চোমরাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, গবর্নমেণ্ট হাউসে নিয়ে গেলেন কল করতে। ওঁরা ওর পরিচয় দিলেন এই বলে যে, বাঘ-ভালুকের এতবড়ো শত্রু আসাম প্রদেশে আর নেই। এর ফলে লাটসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি তাকে ধরে বসলেন—তাঁর জন্যে যেন শিকারের আয়োজন করা হয়।

বিশ্বজিৎ যখন শিলং থেকে ফিরলো, তখন তার অন্তরে ঝড়ের মাতন। এক-এক সময় তার মনে হচ্ছে, কাজটা সে ভালো করলো না। রাজ-অতিথি হবার মতো যোগ্যতা তার কই! তারপরে মনে হচ্ছে, যাই বলো এমন সৌভাগ্য আর কোনো ফরেস্ট অফিসারের হয়নি, লাট-সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারিকে গোটা-দুই বাঘ মারিয়ে দিতে পারলে স্বয়ং লাটসাহেব এসে হাজির হবেন। তারপরে প্রমোশন কে ঠেকায়!

প্রাইভেট সেক্রেটারি নিজে আসতে পারলেন না, এলেন তাঁর মেম-সাহেব। আর কে এলেন, শুনবে? রানী-সাহেব। এবার রাজা-সাহেব অন্য কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। দুই ভদ্র-মহিলার পার্শ্বচর হলো বিশ্বজিৎ।

তার মাথাটা একটু ঘুরে গেল। যদিও সে তাঁদের সমকক্ষ নয়, তবু সেই একমাত্র অফিসার—যাঁকে তাঁরা এই সম্মানের উপযুক্ত বিবেচনা করেছেন। বিদায়কালে দু'জনেই তার আকাশস্পর্শী প্রশংসা করলেন। রানী তো সোজাসুজি বলে বসলেন, 'আর কারো সঙ্গে শিকার করে আমি এমন আনন্দ পাইনি। যতদিন আসামে আছি, ততদিন আর কারো সঙ্গে শিকার করবো বলে মনে হয় না।'

এ-সব হলো সামাজিকতার অঙ্গ। কিন্তু বিশ্বজিৎ লোকটা অসামাজিক তথা সত্যনিষ্ঠ। তাই অক্ষরে-অক্ষরে বিশ্বাস করলো। ও বোধহয় আশা করেছিলো এরপর লাটসাহেব আসবেন অরণ্যবিহারে! সে-রকম কোনো খবর কিন্তু এলো না। কিছুদিন আনমনা থেকে সে একাই বেরিয়ে পড়লো সফরে। এক মাস তাঁবু ঘাড়ে করে নানা দুর্গম স্থলে ঘুরলো। তারপরে সদরে ফিরে অবাক হয়ে গেল, যখন দেখলো রানী তার জন্যে সারকিট হাউসে অপেক্ষা করছেন। এবারেও রাজা সময় পাননি। কোনো মহিলাও নেই তাঁর সঙ্গে, অবশ্য পরিচারিকা বাদে।

এ এক পরীক্ষা। বিশ্বজিৎ প্রশ্নপত্রের উত্তর খুঁজে পেলো না! মাইনের টাকা তুলে, বিল মিটিয়ে, জমে-ওঠা ফাইল পরিষ্কার করে দু'একদিনের মধ্যেই আবার রওনা হলো রানীর সঙ্গী হয়ে। খুব যে তার ভালো লাগছিলো তা নয়। একে ক্লান্ত, তার ওপর সন্দিগ্ধ। যে মেয়ে পর-পুরুষের সঙ্গে শিকারে যায়, সে কি শুদ্ধ? সে কি নিষ্পাপ? এ কী ভীষণ পরীক্ষা তার জীবনে। এরপরে কে সহজে বিশ্বাস করবে যে, সে নিজে অপাপবিদ্ধ! রানীকে 'না' বলার মতো মনের জোর তার ছিলো না। বলতে পারলো না যে, পরস্ত্রীর সঙ্গে শিকার করতে যাওয়া তার বিবেক-বিরুদ্ধ। কিংবা তার শরীর ভালো নেই, কোমরের ব্যথা, ডাক্তার বিশ্রাম নিতে বলেছে। অথচ সমস্তক্ষণ অশুচি বোধ করলো, অপরাধী বোধ করলো।

রানী বিলেতে পড়াশুনো করেছেন, পুরুষমানুষের সঙ্গে মেলামেশায় অভ্যস্ত। বিশ্বজিৎ বিলেতে ছিলো শুনে তিনি ওকে নিজের সেটের একজন বলেই ধরে নিয়েছিলেন। অন্তরঙ্গতার ছলে কখনো বলেন 'ডিয়ার', কদাচিৎ 'ডারলিং'। এ-সব মুখের কথা, মনের কথা নয়। কিন্তু বিশ্বজিতের

তো অভিজ্ঞতা নেই। সে ভাবল এসব মনের কথা। রানী কি তাহলে তার প্রেমে পড়েছেন? এ কি কখনো সম্ভব? তার মতো সামান্য লোকের সঙ্গে প্রেম! ভাবনায় পড়লো বিশ্বজিৎ। ওদিকে আবার প্রেম কথাটার ওপরে তার বিরাগ ছিলো। জিনিসটা ভালো নয়। যার সঙ্গে যার বিয়ে হয়নি তার সঙ্গে প্রেম তো রীতিমতো পাপ। বিশ্বজিৎকে এই পাপের হাত থেকে রক্ষে করবে কে?

একবার শিকার থেকে সে যখন ফিরলো, তখন তার অন্তরে সাগর মন্থনের মতো একটা ব্যাপার চলছিলো। সেও প্রেমে পড়লো নাকি! পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম! এর চেয়ে মরণ শ্রেয়। রানী চলে গেলেন বহু সংখ্যক জন্তুজানোয়ার মেরে। জানতে পেলেন না যে, আরো একটি প্রাণীকেও মেরে রেখে গেলেন। এ রকম আলোড়ন সে আর কখনো অনুভব করেনি। তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলো না যে, মেয়েটা খারাপ। কিন্তু সে নিজে কোন্ ভালো! কী করে সে তার ভাবী বধূকে বোঝাবে যে, তার হৃদয়ে লেশমাত্র অনুরাগ জন্মায়নি! নিজের ওপর তার যে অবিচল বিশ্বাস ছিলো, তা যেন একটু নড়লো। সে কি সত্যি সচ্চরিত্র, না সেও ডুবে-ডুবে জল খায়? তার কি উচিত ছিলো না, রানীর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করা? কিন্তু সে তা পারলো কই? রানী যখন জানতে চাইলেন, 'আবার কবে শিলং আসছেন, বলুন,' সে উত্তর দিলো, 'আপনাদের অসুবিধে হবে।' রানী সকৌতুকে বললেন, 'আমরা কি বাঘ-ভালুক যে, আপনার জ্বালায় আসাম ছেড়ে পালাবো? ওয়েল, ডিয়ার ডু কাম জাস্ট ফর এ ডে!'

অগত্যা একদিনের জন্যে বিশ্বজিতের শিলং যাত্রা। একদিনের জায়গায় তিনদিন হলো, তবু কেউ তাকে ছেড়ে দেয় না। রাজা ডাকেন টেনিস খেলতে, রানী নিয়ে যান সমাজে পরিচয় করাতে। যে ছেলে কোনদিন মেয়েদের সঙ্গে মেশেনি, সে রানীর সঙ্গে পাশাপাশি আসনে বসে রানীর মোটর চালনা দেখে ও মাঝে-মাঝে স্টীয়ারিং ধরে। যে মানুষ কোনদিন বড়ো-কর্তাদের খোসামোদ করেনি, সে একদিন দুপুরে সেক্রেটারিয়েটে গিয়ে ছুটির দরবার করে আসে। দিন-পনেরো ছুটি

না-হলে নয়। সে মোটর চালাতে শিখছে। কথাটা সত্যি। যেমন সত্যি অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ। অথচ এটা মিথ্যে। এমন মিথ্যে যে, বলতে গেলে সারা মুখ লাল হয়ে ওঠে। বুক টিপ-টিপ করে। চোখ আপনি নত হয়। ভয় হয়, ধরা পড়ে গেছে।

ওদিকে তার বিবেক তাকে এক মুহূর্ত ছুটি দেয় না। পনেরো দিনের ছুটি তো দূরের কথা। যে মেয়ে পর-পুরুষের সঙ্গে মোটর-বিহার করে, সে কি ভালো মেয়ে? কিন্তু যে ছেলে পররস্ত্রীর সঙ্গে মোটরে করে ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়, সেই বা কেমন ছেলে? একদিন তো সে বিয়ে করবে। সেদিন কি তার স্ত্রী তাকে বিশ্বাস করবেন? ভবিষ্যতের জন্যে কী গভীর অশান্তির খাদ কেটে রাখছে সে! সমস্ত বিবাহিত জীবনটাই খাদে পড়ে চূরমার হবে, যদি সময় মত ব্রেক না কষে। পনেরো দিন ছুটি নিলেও প্রত্যেক দিন সে উপায় খোঁজে পালাবার। কিন্তু পারে না পালাতে। বাইরে থেকে বাধা নেই, পাহারা নেই। কেউ তাকে ধরে রাখবে না। একবার মুখ ফুটে বললেই হলো, 'আমার কাজ পড়ে আছে। আমাকে যেতে হবে, রানী।' কিন্তু ওটুকু বলার মতো ইচ্ছাশক্তি লোপ পেয়েছিলো। কিছুতেই সে মুখে আনতে পারে না ও-কথা। বাজে বকে। ভাবে, মোটর চালানো তো শিখছে। এও কি একটা কাজ নয়!

আসল কারণটা তার অবচেতন মনে নিহিত ছিলো। সেখানে তার ইচ্ছাশক্তিকে অবশ করে রেখেছিলো মন্ত্রশক্তি। খারাপ মেয়ে, এই দু'টি শব্দের যেন একটা মন্ত্রশক্তি ছিলো। উচ্চারণ করলেই মন্ত্রশক্তির ক্রিয়া শুরু হতো। মনে মনে উচ্চারণ করেও নিস্তার নেই। খারাপ মেয়ে, খারাপ মেয়ে, খারাপ মেয়ে জপ করতে করতে বিশ্বজিৎ তার নিজের অজ্ঞাতসারে মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মতো পরবশ হয়েছিলো। এর জন্যে দায়ী কে? দায়ী তার ঐ রং-কানা চোখ। যে চোখ রামধনুর সাতটা রং দেখে না। রং বলতে বোঝে, সাদা আর কালো। সাদা দেখতে না পেলে কালো দেখে।

সে সময়ে বিশ্বজিতের যদি কোনো সুহৃদ থাকতো, তাহলে তাকে তার নিজের ভুলের হাত থেকে বাঁচাতো। নিজের ভুলের হাত থেকে বাঁচলে পরে সে নিজের গুলির হাত থেকেও বাঁচতো। কিন্তু তেনন কোনো

সুহৃদ ছিলো না তার। আমি হলে বলতুম, যাকে তুমি খারাপ মেয়ে ভাবছো সে খারাপ নয়। ওটা তোমার আত্মপ্রতারণা। খারাপ মেয়ে ভেবে তুমি ওর কাছে যা আশা করছো, কোনদিন তা পূর্ণ হবে না। বিশ্বজিৎ অবশ্য রাগ করতো, অস্বীকার করতো যে, তার কোনো কামনা আছে। কিন্তু অস্বীকার করলে হবে কী! পুরুষমাত্রেরই অবচেতন মনের গুহায় যে সব অন্ধ কামনা নিহিত রয়েছে, খারাপ মেয়ের গন্ধ পেলেই তারা চরিতার্থতার জন্যে ফাঁদ পাতে। সে যদি খারাপ মেয়ে হয়ে না থাকে তবে নিজের ফাঁদে নিজেকেই পড়তে হয়। তখন মরণ অনিবার্য, যদি না কেউ সময়মতো উদ্ধার করে।

শিলং থেকে ফিরে বিশ্বজিৎ সফরে বেরিয়ে পড়বে, এমন সময় টেলিগ্রাম এলো রানী আবার আসছেন। আতঙ্ক ও উল্লাস দুই পরস্পর-বিরোধী ভাব তার বুক জুড়ে তাণ্ডব বাধিয়ে দিলো। একবার সে পালাবার কথা ভাবে, পালিয়ে গিয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকবে। একবার ভাবে, পালিয়ে যাওয়া তো কাপুরুষের কাজ, পুরুষের কাজ বিপদের সম্মুখীন হওয়া। একবার মনে করে মিথ্যে বলাটাই এ-ক্ষেত্রে সত্যি বলা। পাল্টা টেলিগ্রাম করা উচিত, আমি অসুস্থ। একবার মনে করে, সাহস থাকে তো সত্যি বলাই উচিত। তুমি খারাপ মেয়ে, আমি তোমার সঙ্গে শিকারে যাবো না। আমার বৌ রাগ করবে, যখন বিয়ের পর শুনবে।

পাল্টা টেলিগ্রাম করা হলো না। পালিয়ে যাওয়া হলো না। স্টেশনে গিয়ে রানীকে অভ্যর্থনা করলো, অন্যান্য অফিসারের সঙ্গে বিশ্বজিৎ। এবারে সে স্থির করেছিলো, শিকারে যাবার সময় আরো দু'একজন অফিসারকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে। তাঁরাও রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু যাত্রাকালে দেখা গেল কারো ছেলের অসুখ, কারো মেয়ের অসুখ। অর্থাৎ কর্ত্রীর হুকুম নেই। কোনো মহিলা তাঁর স্বামীকে বিশ্বাস করে পরস্ত্রীর সঙ্গে শিকারে ছেড়ে দেবেন না। অগত্যা বিশ্বজিতের আর দোসর পাওয়া গেল না। হাতির পিঠে বসতে হলো রানীর সঙ্গে তাকেই। পাশাপাশি বসে অঙ্গের সুরভি পায়। কেবল সুরভি নয়, পরশ। অমন অবস্থায় পড়লে মুনি-ঋষিদেরও মন টলে। বিশ্বামিত্র মুনি হলেও বিশ্বজিৎ মুনির

চেয়ে জিতেন্দ্রিয় হতেন না, এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি। বিশ্বজিৎ মুনি বহুকষ্টে আত্মসংরবণ করলেন। হাতির পিঠে চড়েছো কখনো? চড়াই-উৎরাই করেছো? তখন পাশের লোকটিকে পাশ বালিশ বলে ভুল করা স্বাভাবিক। কখনো পড়ে যাবার ভয়ে, কখনো আচমকা ধাক্কা খেয়ে, কখনো হাতির অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে পাল্লা রেখে হেলে-দুলে কতবার যে মানুষ মানুষের গায়ে টলে পড়ে তার হিসেব নেই। এর জন্যে অবশ্য কেউ লজ্জিত হয় না। মাফ চায় না। এটা স্বাভাবিক।

৩

হাল-কামরা ও খানা-কামরার মাঝখানের দরজাগুলো ভেজানো ছিলো বলে আমরা নিশ্চিন্ত মনে গল্প শুনছিলুম। হঠাৎ মণিমোহণ বলে উঠলেন, 'সর্বনাশ! কোণার দরজাটা ফাঁক দেখছি যে!'

ঘোষাল পা টিপে-টিপে গেল দরজার কাছে। ছুটে এসে বললো, 'মেয়েদের বিশ্বাস নেই। বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ।'

ষড়যন্ত্র করবার সময় হাতেনাতে ধরা পড়লে যেমন চেহারা হয়, আমাদের সকলের চোহারা হলো সেই রকম। মুখে কথা নেই, চোখে পলক নেই, হাতের গ্লাস হাতে, কেবল চুরুটের ধোঁয়া উঠছে চিমনির ধোঁয়ার মতো অন্তরীক্ষ জুড়ে। তাহলে অন্তরাল থেকে ওঁরা সমস্ত শুনেছেন।

ভিজে বেড়াল সেজে আমরা একে-একে হাল-কামরায় চললুম। আরো আগে যাওয়া উচিত ছিলো, দেরি হয়ে গেছে বলে ক্ষমা প্রার্থনা করলুম। গল্পটার খেই হারিয়ে গেল বলে মনে-মনে মুণ্ডপাত করলুম। কে একজন হেসে উঠলো, সঙ্গে-সঙ্গে হাসির রোল উঠলো। হাল্‌কা হয়ে গেল ঘরের আবহাওয়া।

'বাস্তবিক, মেয়েরা না শুনলে গল্প বলে আরাম নেই।' বানিয়ে বললেন প্রদোষ, 'এরা কি গল্প শুনতে জানে, না ভালোবাসে! যে যার পানাহার নিয়ে ব্যস্ত। শুনুন আপনারা, বাকীটুকু বলে শেষ করি। আমাকে আর এক জায়গায় যেতে হবে।'

গল্প আবার শুরু হতে আমাদের মুখের হাসি মুখে মিলিয়ে গেল। গল্পটা তো হাসির গল্প নয়। আমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পেরেছিলুম ট্রাজেডির বীজ বোনা হয়েছে, যা হবার তা হবেই। সেইজন্যে আমাদের কারো মনে সুখ ছিলো না।

প্রদোষ বলতে লাগলেন—

এতক্ষণ আমি গল্প বলছিলুম বেপরোয়াভাবে। পুরুষের কাহিনী পুরুষালি ধরনে। এখন আমাকে ভব্যতার মুখোশ পরতে হবে। নয়তো মহিলারা মনে করবেন, আমি তাঁদের গায়ে পড়ে অপমান করছি। না না, আপনারা মুখ ফুটে কিছু বলবেন না, কিন্তু গল্পের মাঝখানে উঠে চলে যাবেন। যাক, উপায় নেই শেষ করতে তো হবে।

বেচারা বিশ্বজিৎ! আসুন, আমরা সকলে মিলে তার জন্যে চোখের জল ফেলি। আমাদের চোখের জলের তর্পণ পেলে তার আত্মা তৃপ্ত হবে। বেচারা বিশ্বজিৎ! তার সব ছিলো, কিন্তু এমন একজন বন্ধু ছিলো না—যে তাকে সৎ পরামর্শ দিয়ে রক্ষে করতে পারতো। আমি থাকলে বলতুম, আগুন নিয়ে খেলতে চাও খেলো, কিন্তু আগুনকে খারাপ বলে ভুল করো না। যে মেয়ে খারাপ নয় তাকে খারাপ মেয়ে ভাবলে বিপদে পড়বে! এমন কি, যে মেয়ে সত্যি-সত্যি খারাপ, তাকেও খারাপ ভাবতে নেই। খারাপ ভাবলে খারাপ দিকে মন যাবে। কিছুতেই মনটাকে ফেরাতে পারবে না। এমন কি, পালিয়ে গিয়েও বাঁচবে না। বাঁচতে যদি চাও তো জপ করো, ভালো মেয়ে, সহজ মেয়ে, স্বাভাবিক মেয়ে। তাহলে মন্ত্রশক্তি ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যাবে। সে পথ বাঁচবার পথ।

ও যে আত্মসংবরণ করতে গিয়ে দারুণ কষ্ট পাচ্ছিলো রানী তা জানতেন না, জানলে শিকারের শখ সংবরণ করে বিদায় নিতেন। তাঁর ছিলো শিকারের নেশা। মনের মতো শিকারী সাথী পেলে এ নেশা যেন মিটতেই চায় না। তিনি বয়সে বড়ো। তাঁর এমন কোনো অপূর্ণ কামনা ছিলো না, যার জন্যে বিশ্বজিৎকে তাঁর প্রয়োজন। তিনি ভাবতেই

পারেননি যে, তাঁর সঙ্গে মিলে-মিশে একজন বিলেত-ফেরত সম্ভ্রান্ত যুবক এতদূর বিভ্রান্ত হতে পারে। এ-কথা তাঁর মনে উদয় হয়নি যে, তিনি খারাপ মেয়ে বলেই সঙ্গদোষে বিশ্বজিতও খারাপ ছেলে হয়ে উঠেছে। যা সম্ভব নয়, তাকেই সম্ভব মনে করে সে কষ্ট পাচ্ছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আপনি ভালো তো জগৎ ভালো। তাঁর সম্বন্ধে জগৎ কী ভাবছে সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ ছিলো না।

রানী যে রূপসী ছিলেন, তা বোধহয় বলতে ভুল হয়ে গেছে। দাক্ষিণাত্যের রূপের আদর্শ উত্তরাপথের সঙ্গে মেলে না। আমরা যদি সংস্কারমুক্ত হয়ে নিরীক্ষণ করি, তাহলে দাক্ষিণাত্যের রূপ আমাদের নয়ন-রোচক হবে। অজন্তার গুহাচিত্র কার না মনোহরণ করে! দাক্ষিণাত্যে আমি যতবার গেছি, দক্ষিণী মেয়েদের রূপ আমাকে মুগ্ধ করেছে।....আপনারা অমন উসখুস করবেন না। বিয়ে যখন করবো তখন বাঙালীই করবো। আপাতত যে ক'দিন স্বাধীন আছি, সে ক'টা দিন ত্রৈলঙ্গ ললনাদের রূপ-গান করি। যেমন কালো তাঁদের রং তেমনি কালো তাঁদের কেশ, তেমনি কালো তাঁদের চোখ, আর তেমনি কালো তাঁদের কালো চোখের কাজল। নানা রঙের ফুল তাঁদের অলকে, নানা রঙের শাড়ি তাঁদের অঙ্গে, নানা রঙের মণি-মানিক তাঁদের আভরণে। কালোকে পরাস্ত করার জন্যে আর সব ক'টা রং যেন চক্রান্ত করেছে। তাঁদের দেখে মনে হয়—তাঁরা রঙ্গিণী। চিকণ কালো বলে কৃষ্ণের যে বর্ণনা আছে তাঁদেরও সেই বর্ণনা। কৃষ্ণের মতই আশ্চর্য তাঁদের আকর্ষণ। আমাদের রানী মহাভারতের কৃষ্ণার মতো রূপসী। কয়েকটি বিশেষণ এলোমেলোভাবে আমার মনে আসছে। উত্তপ্ত, মদির, মায়াময়, সুঠাম, বিলোল।

থাক, আর না। রানী যদি দেখতে খারাপ হতেন, বিশ্বজিৎ অতটা উদ্দীপ্ত হতো না। খারাপ মেয়ে যদি দেখতে সুন্দর হয়, সুন্দর মেয়ের যদি স্বভাব খারাপ হয়, তাহলে তার যে সম্মোহন, তা দুরন্ত ঘোড়ার মতো দুর্বার। বিখ্যাত ঘোড়সওয়ার বিশ্বজিৎ কতো দুরন্ত অশ্বের টানে উদ্দাম হয়েছে! সেই সব ছিলো ফার্স্ট হর্স। আর এ হলো, মহিলারা মাফ করবেন, আমার বিচারে নয়, বিশ্বজিতের বিচারে ফার্স্ট উওম্যান। এর যে টান তা প্রলয়ঙ্কর।

ফরেস্ট বাংলোয় দু'জনের দু'খানা ঘর। মাঝখানে খাবার ঘর দু'জনের এজমালি। খাওয়াদাওয়ার পরে তারা বারান্দায় ইজি-চেয়ার পেতে গল্প করতো। তারপর যে যার ঘরে শুতে যেতো। গল্প করতে-করতে বেশ একটু রাত হয়ে যেতো। রানী বলতেন, 'ওয়েল, ডিয়ার, আমি আর জেগে থাকতে পারছিনে। কাল খুব ভোরে উঠতে হবে, মনে থাকে যেন।' বিশ্বজিৎ বলতো, 'বেয়ারাকে বলা আছে, রাত থাকতে ডাকবে।' তখন রানী বলতেন, 'সুনিদ্রা হোক, সুখ স্বপ্ন দেখো।' বিশ্বজিৎ বলতো, 'তুমিও।' রানী হেসে বলতেন, 'আমি? আমি স্বপ্ন দেখবো আমার নূতনতম বাঘকে।' বিশ্বজিৎ আমতা-আমতা করে বলতো, 'আর আমি? আমি স্বপ্ন দেখবো আমার—' কিছুতেই তার মুখ দিয়ে বেরোতো না, 'বাঘিনীকে'। তারপর চলে যেতো নিজের ঘরে।

শিকার করতে যারা যায়, তারা জানে একদিন হয়তো বাঘের হাতে জান যাবে। বিশ্বজিতেরও সে জ্ঞান ছিলো। কিন্তু সে কেয়ার করতো না। এরপরে তার মনে হতে থাকলো, বাঘের হাতে নয়, বাঘিনীর হাতে। সে কেয়ার করলো না। জীবনে তার এক সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়েছিলো। ভবিষ্যতের কথা সে আর ভাবতে চায় না, ভাবতে চায় শুধু বর্তমানের কথা। বর্তমানে তার কর্তব্য কী? যে সুযোগ তার মুঠোর মধ্যে এসেছে, সে সুযোগ কি ছাড়া উচিত? না ভোগ করা উচিত? ভোগ করতে গিয়ে হয়তো বিয়ে করাই হবে না। আর কাউকে বিয়ে করা অন্যায় হবে। অথচ ভোগ না করে যদি হাত-ছাড়া করে, তবে এলো কেন এ সুযোগ তার জীবনে? কেন এলো? কে আসতে বলেছিলো? সে তো শিলং থেকে ফেরবার সময় আমন্ত্রণ জানায়নি। পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলো, গুড বাই। তা সত্ত্বেও যদি আসে, তবে কেন আসে? এ কি কেবল শিকারের জন্যে আসা?

খারাপ মেয়ে, সুন্দর মেয়ে! কেন তোমার আসা! সুন্দর মেয়ে, খারাপ মেয়ে, কেন তোমার থাকা! বেশ বুঝতে পারছি, বিয়ে এ জীবনে ঘটবে না। অদৃষ্টে নেই। কেউ আমাকে বিয়ে করতে চাইবে না, যখন শুনবে আমার কীর্তিকাহিনী। আমার ভবিষ্যৎ আমি তোমার জন্যে বিসর্জন

দিলুম। তুমি কি আমাকে নিরাশ করবে? নিরাশ করলেও আমি মরেছি, না করলেও মরেছি। বাঘিনীর হাতেই আমার জান যাবে। তুমি যদি আমাকে শিকার করো, তাহলে আমার বেঁচে থাকাও মরে থাকা!

একদিন বিশ্বজিৎ নিজের ইজিচেয়ার থেকে নেমে রানীর কোলে মাথা রেখে বারান্দার ওপর পা ছড়িয়ে বসলো। তিনি মাথা টিপে দিতে-দিতে বললেন, 'মাথা ধরেছে? না? পুওর ডারলিং!' সে তাঁর একখানা হাত নিজের হাতের ভেতর টেনে নিলো। তারপর কী মনে করে ছেড়ে দিলো। রানী বুঝতে পারলেন, এ ব্যথা মাথাব্যথা নয়। যৌবন বেদনা। এ-রকম যে হবে, এ তিনি কল্পনা করেননি। অথচ না হওয়াই বিচিত্র। রানী তাঁর হাত সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন না, পাছে বিশ্বজিৎ দুঃখ পায়। নিজের সর্বনাশ না করে বন্ধুকে যেটুকু সুখ দেওয়া সম্ভব সেটুকু দিতে তাঁর অনিচ্ছা ছিলো না। তার বেশি তিনি কেমন করে দেবেন? বিশ্বজিৎ বিয়ে করে না কেন? তিনি কি বাধা দিচ্ছেন?

এ-সব কথা খোলাখুলি বলে ফেললেই ভালো করতেন রানী। কিন্তু মেয়েলি লজ্জা তাঁকে নির্বাক করেছিলো। ফলে বিশ্বজিৎ এক-এক করে অনেক কিছু পেলো। একদিনে নয়, অনেক দিনে। সব সুখ যখন পেয়েছে, তখন চরম সুখ কেন বাকী থাকে? এই হলো তার অনুক্ত জিজ্ঞাসা। এর উত্তরে পেলো অনুচ্চারিত উত্তর। তা হবার নয়। সে বিশ্বাস করলো না, যে রানী আর সব দিয়েছেন, তিনি ওটুকু দিতে পারেন না। 'ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে। ইচ্ছা নেই, তাই বলো। কী করে থাকবে, আমি তো রাজারাজড়া নই। অসমকক্ষ।'

এ-কথা শুনে রানী বললেন, 'তুমি যখন বিয়ে করবে, তখন আপনি বুঝবে যে, তোমার স্ত্রী এ জিনিস আর কাউকে দিতে পারেন না। এ কেবল স্বামীর জন্যে।'

নির্ভুল উত্তর! বিশ্বজিতের স্ত্রী যদি এ জিনিস আর কাউকে দেন তবে সে তার নিজের হাতে তাঁকে গুলি করবে। এ জিনিস তো দূরের কথা, কোনো জিনিস না। সে স্বীকার করলো যে, রানী যা বলছেন, তা ঠিক। অথচ তার শিরায়-শিরায় যে আগুন জ্বলছিলো, তারও তো নির্বাণ চাই।

তখন তার এমন অবস্থা যে, সে আর আত্মসংবরণ করতে পারে না, যদিও জানে এবং মানে তার আত্মসংবরণ করা উচিত।

বিশ্বজিতের অভ্রান্ত বিশ্বাস—ও মেয়ে খারাপ মেয়ে। সে নিজেও কিছু কম খারাপ নয়। তাহলে তাদের দু'জনের সম্পর্কের ন্যায়সঙ্গত পরিণতি কী? যেটা ন্যায়শাস্ত্রে বলে সেইটেই তো হবে। না যেটা ধর্মশাস্ত্রে বলে সেইটে?

প্রজ্বলিত অনলে দগ্ধ হতে-হতে এমন এক মুহূর্ত এলো, যখন না ভেবেচিন্তে বিশ্বজিৎ বললো, 'রানী, কাল আমি বাঘ শিকার করতে গিয়ে নিজেকেই গুলি করবো। তুমি সে দৃশ্য সইতে পারবে না। লোকে হয়তো তোমাকেই দোষ দেবে। সময় থাকতে তুমি সদরে চলে যাও।'

রানী তা শুনে স্তম্ভিত হলেন। বললেন, 'তুমি কি পাগল হয়েছো! এতো তুচ্ছ কারণে কেউ আত্মহত্যা করে! চলো, তুমিও সদরে চলো। তোমাকে আমি শিলং নিয়ে গিয়ে তোমার মনের মতো একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবো।'

বিশ্বজিৎ ও-কথা কানে তুললো না! আলটিমেটাম দিলো, 'আমি যা চাই, তা আজ রাত্রেই পাবো। নয়তো আর কোনদিন পাবো না! কাতর স্বরে বললো, 'এখন তোমার হাতে আমার জীবন-মরণ। তোমারও 'পরেই সবকিছু নির্ভর করলুম।'

রানী তার মুখের দিকে তাকাতে পারছিলেন না। পায়ের দিকে তাকিয়ে চোখের জল ঝরালেন। মৌনং সম্মতিলক্ষণং ভেবে সে তাঁকে কাছে টেনে নিলো! তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললেন, 'বন্ধু, তুমি কি আমার সর্বনাশ করবে? এই কি তোমার মনে ছিলো?'

বিচলিত হয়ে বিশ্বজিৎ বললো, 'রানী, আমি কি তোমার সর্বনাশ করতে পারি! একবার আমার দিকে তাকাও! আমাকে দেখে কি মনে হয় যে, কারো সর্বনাশ করতে পারি! তুমি কাল সদরে চলে যেয়ো। আমার কপালে যা থাকে, তাই হবে।'

তিনি তার বুকে মাথা রেখে অনেকক্ষণ কাঁদলেন। কিন্তু কিছুতেই তাকে দিয়ে বলাতে পারলেন না যে, সেও তাঁর সঙ্গে সদরে যাবে। দু'জনের

একজনেরও চোখে ঘুম ছিলো না। অবশেষে বিশ্বজিৎ বললো, 'যাই, ভোরবেলা জাগতে হবে, জীবনের শেষ ঘুম ঘুমিয়ে নিই।'

রানী তার কপালে চুমো দিয়ে বললেন, 'কাল আমি তোমাকে চোখে চোখে রাখবো। কোথাও যেতে দেবো না।'

পরের দিন ভোর হবার আগেই বিশ্বজিৎ বেরিয়ে পড়লো জঙ্গলে। রাত্রে তার ঘুম আসেনি। সারা অঙ্গে যৌবনজ্বালা। শীতল জল এতো কাছে, তবু এতো দূরে! তবে কি এ জল নয়, মরীচিকা! খারাপ মেয়ে, সুন্দর মেয়ে, আমি কি তোমাকে চিনতে পারিনি? সুন্দর মেয়ে, খারাপ মেয়ে, তুমি কি আমাকে ভুল বুঝতে দিয়েছিলে? কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে। আমি যা মুখে বলি, তা কাজে করি। তুমি সে দৃশ্য সইতে পারবে না। বিদায়।

রানী তাঁর প্রসাধন শেষ করে বাইরে এসে শুনলেন বিশ্বজিৎ রওনা হয়ে গেছে। তাঁর চা খাওয়া হলো না। তিনি হাতির খোঁজ করলেন। হাতি ছিলো, তাঁকে সদরে নিয়ে যাবার জন্যে। তিনি হুকুম দিলেন, সদরে নয়, সাহেব যে পথে গেছেন, সেই পথে চালাও। সে-পথ কারো জানা ছিলো না। সাহেব তো কাউকে বলে যায়নি। ঘুরতে-ঘুরতে রানীর বেলা হয়ে গেল। দূর থেকে কানে এলো বন্দুকের আওয়াজ। দিক্ নির্ণয় করে তিনি হাতি ছুটিয়ে দিলেন। পৌঁছে দেখলেন জীবনদীপ নিবে গেছে।

এমনি করে তার যৌবনজ্বালার অবসান হলো। বেচারা বিশ্বজিৎ। রানীকে বাঁচাবার জন্যে সে একখানি চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলো, কী ছিল সে চিঠিতে। রানী সেখানা কুটি-কুটি করে ছিঁড়ে আগুনে ফেলে দিলেন।

৪

প্রদোষের জবানবন্দী শেষ হলো যখন, তখন মেয়েদের সকলের চোখে জল। পুরুষদের কারো মুখে কথা ছিলো না। ঘোষাল তো ছোটো ছেলের মতো গালে হাত রেখে শুনছিলো। বোধহয় ভাবছিলো, অমন মানুষের এমন পরিণাম কি সত্যি!

'সেই রানী তারপরে কী করলো ? উৎসুকভাবে জানতে চাইলেন মিসেস মৌলিক।

'রানী তারপরে সন্যাসিনী হয়ে গেলেন। তাঁর গলার গোলকোণ্ডার হীরের হার খুলে দিলেন সিভিল সার্জেনের মেমসাহেবকে। তাঁর পাঁচ রকমের মণি বসানো পাঁচ আঙুলের আংটি পরিয়ে দিলেন পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের মেমসাহেবকে। তাঁর প্ল্যাটিনামের ব্রেসলেট দিয়ে দিলেন ফরেস্ট কন্জারভেটরের মেমসাহেবকে। তা বলে বিশ্বজিতের অধস্তন কর্মচারীদের স্ত্রীদের বঞ্চিত করলেন না। তাঁদের বিলিয়ে দিলেন নাকে ও কানে পরবার যতো-রকম অলঙ্কার। আর শাড়িগুলো খয়রাৎ করলেন চাকরবাকরদের জানানাদের।'

'তারপরে ?' প্রশ্ন করলেন মৌলিকের বোন মিসেস ঘোষাল।

'তারপরে ?' ডেপুটি কমিশনারের তো মেমসাহেব নেই। তিনি চিরকুমার। তিনি হৈ-চৈ বাধিয়ে দিলেন। তখন রানী গিয়ে মোলাকাৎ করলেন লাটসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারির মেমসাহেবের সঙ্গে। খবর এলো, ডেপুটি কমিশনার জয়েন্ট সেক্রেটারি হয়েছেন। অযাচিত পদবৃদ্ধি।

এরপরে মহিলাদের কৌতূহল লক্ষিত হলো না। মণিমোহন বললেন, 'সেন, তোমার ঐ রানীটি মোটেই ভালো মেয়ে নয়। যা দিতে পারে না, তার আশা দিয়ে ছেলেটাকে বাঁদর-নাচ নাচিয়েছে। ছেলেটা যে মারা গেল, তার জন্যে দায়ী তোমার রানী।'

'আমার রানী! বেশ ভাই, বেশ!' প্রদোষ মহিলাদের দিকে তাকালেন, 'কিন্তু রানী যদি খারাপ মেয়েই হতো, যা দেবার নয় তাও দিতো। তাহলে এই ট্রাজেডী ঘটতো কি ?' তিনি আপীল করলেন।

দেখা গেল রানীর বিরুদ্ধে রায় দিলেন একজন কি দু'জন বাদে আর সব পুরুষ। আর বিশ্বজিতের বিরুদ্ধে মহিলারা সবাই।

মল্লিকা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শুভ স্বপ্ন-বিস্তার নয়, ধুলো-জঞ্জাল মেশানো খানিকটা ময়লা বালি ছড়ানো জায়গা।

সমুদ্রের সানন্দ দান নয়, মনে হয় পয়সা নিয়ে ফরমাশ মতো কেউ বুঝি ঢেলে দিয়ে গেছে।

এই চৌপাটি।

সমুদ্রও আছে, যেন নীল অসমতার নকল করা পরিহাস।

কিন্তু মনের ওপরেও শ্যাওলা ধরানো নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টি যখন দু'দণ্ডের জন্যে একটু থামে, মেঘলা আকাশের ভ্রূকুটি সত্ত্বেও একটু হাঁফ ছাড়তে মানুষকে ওইখানেই আসতে হয়। ওই ভিজে বালির ওপরেই বসতে হয় কাগজ কি রুমাল পেতে, আর অসংখ্য সমব্যথীদের মাঝখানে নিজের সংকীর্ণ স্বত্বটুকু বাঁচিয়ে হয় সমুদ্রের দিকে ফিকে তার বিষণ্ণ নিস্তেজ ঢেউ গুনতে, নয় উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে চার্নি রোডের রাস্তা পার করা পোলের ওপর দিয়ে অবিরাম জনস্রোত দেখতে হয়।

নেহাত অসম্ভব না হলে প্রতিদিন সায়াহ্নে এই যার নিয়মিত প্রকৃতি-বিলাস, নিজের প্রাদেশিক পোশাকে সজ্জিত থাকলে একদিন কেউ না কেউ তাকে অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে চির-পরিচিত ভাষায় সম্বোধন করতেও পারে।

'শুনছেন মশাই, শুনছেন? আপনি তো বাঙালী?'

না-শোনার ভান করে বাঙালীত্ব অস্বীকার করা তখন বোধহয় সম্ভব নয়। সুবিকাশের পক্ষে অন্তত সম্ভব হয়নি।

সে মুখ ফিরিয়ে সম্বোধককে দেখেছে এবং বিস্মিত হয়েছে।

বাঙালীকে দেখে ঠিক যিনি চিনতে পারেন তাঁর নিজের চেহারা পোশাকে বাঙালীয়ানার পরিচয় কোথাও নেই। চৌপাটির এই ছত্রিশ জাতের ভিড়ে তাঁকে অনায়াসে লক্ষ্য না করে থাকা যায়। তিনি যে বাঙালী হতে পারেন, এ-সন্দেহ মনে উদয়ও হয় না।

তিনি নিজেও সে-কথা জানেন ও তার জন্যে কিঞ্চিৎ গর্বও অনুভব করেন বোঝা গেল। সোনার ঝিলিক দেওয়া বাঁধানো দু'পাটি দাঁতই বার করে হেসে বলেছেন, 'বাঙালী বলে চিনতে পারলেন না তো? কেউ পারে না। এই এতো বছর এখানে আছি, অগুজরাটীর সঙ্গে গুজরাটী, মারাঠীর সঙ্গে মারাঠী, আবার তামিলের সঙ্গে তামিল। কিন্তু বাঙালী দেখলেই মনটা কেমন দুর্বল হয়ে যায় এখনো। গায়ে পড়ে আলপ করে ফেলি।'

শ্রীপতিবাবুর সঙ্গে এমনি করেই পরিচয়।

এবং তারপর মল্লিকার সঙ্গে।

সেই আশ্চর্য একমাত্র মল্লিকা, সকলের যৌবনের স্বপ্নে একবার না একবার যে অঞ্চল বুলিয়ে দিয়ে যায়।

শ্রীপতিবাবুর মারফত মল্লিকার সাক্ষাৎ, অবিশ্বাস্য মনে হয়।

এ যেন ফুটপাথে কেনা সস্তা ক্যালেণ্ডারের ছবি আটা পিস-বোর্ডের ছেঁড়া মলাটের পেছনে মহকবির ছন্দোবন্ধ কল্পনা!

প্রথম দিন সুবিকাশ একটু বিমূঢ় হয়ে গেছলো।

চৌপাটিতে দিন-দুই আপাত-আকস্মিকভাবে দেখাশোনা হবার পরই শ্রীপতিবাবু বাড়িতে নিয়ে গেছলেন একরকম ধরেবেঁধে।

চেহারা পোশাকে শ্রীপতিবাবু যেমন অবাঙালী, বাস করবার পাড়া নির্বাচনেও তাই। বাঁধাধরা প্রাদেশিক পাড়ায় এ-শহরে সবাই আজকাল থাকবার সুযোগ পায় না। তবু শহরের যে-অঞ্চলে শ্রীপতিবাবু তাকে নিয়ে গিয়ে তুলেছিলেন, নেহাত অকাজেও কোনো বাঙালী বুঝি সেখানে যায় না। বোম্বাইয়ের সাবেকী মিল অঞ্চল। কাঠে ইঁটে জোড়াতালি দেওয়া শ্রীহীন জরাগ্রস্ত সব বাড়ি।

চটা-ওঠা, পায়ের-ভারে-কাঁপা নড়বড়ে কাঠের সিঁড়িতে কটু একটা রাসায়নিক গন্ধ। নীচের তলায় কিসের একটা গুদোম হবে!

কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে ওপরের ঘরে উঠলেই বিস্ময়।

না, তখনো মল্লিকার সঙ্গে দেখা হয়নি। বিস্ময়, ঘরের সাজসজ্জা আসবাব দেখে।

শ্রীপতিবাবু যে শৌখিন লোক, তার প্রৌঢ়ত্ব ঢাকবার সযত্ন প্রসাধন ও বেশভূষা দেখলেই বোঝা যায়, কিন্তু সেই শৌখিনতা যে মেকী নয়, বসবার ঘরটির সব কিছুতে তার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য। শ্রীপতিবাবুর রুচি উঁচুদরের এবং সে-রুচিকে প্রশ্রয় দেবার মতো সঙ্গতিও নিশ্চয় আছে।

কিন্তু এই পাণ্ডববর্জিত পাড়ায় নিজেকে নির্বাসনের অর্থ কী?

সে-প্রশ্ন মনের মধ্যে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই মল্লিকার দেখা মেলে।

সব প্রশ্ন তখন বিহ্বলতায় নীরব।

এই মল্লিকা! সুবিকাশের মনে যা হয়েছিলো তাকে সূক্ষ্মতম কবিতার ভাষা দিলেও বুঝি অপমান করা হয়।

এমন করে প্রথম দেখা যাদের জীবনে ঘটে তারা ঈর্ষার পাত্র কিনা সন্দেহ।

মল্লিকা সুন্দরী কি না, কী তার গায়ের রং, পরিচ্ছদের শ্রী, সুবিকাশ কিছুই বোধহয় দেখতে পায়নি। সে দেখেছিলো নিজের মনের মল্লিকাকে।

রক্ত-মাংসের মল্লিকার চোখে যে অভ্যর্থনার বদলে ছিলো রূঢ় কাঠিন্য তা সে লক্ষ্যও করেনি তাই।

শ্রীপতিবাবু পরিচয় করিয়ে দেননি। তিনি তখন নিজের কথাতেই মশগুল।

'পাড়াটা দেখে বেশ ভড়কে গিয়েছিলেন, কেমন? ভেবেছিলেন কোন্ বিদঘুটে বদমাশির আড্ডায় না নিয়ে এলাম। আরে মশাই, সত্যিকারের নিরিবিলি নির্ঝঞ্ঝাট এমন জায়গা পাবো কোথায়! নির্বিবাদী শহর বলতে হয় তো বোম্বাই। এ-জায়গা আবার তার ওপর এক-কাঠি। আমি মরি কি বাঁচি যেমন খোঁজ রাখে না, তেমনি নাচি কি গান গাই তা নিয়েও মাথাব্যাথা নেই কারো।

মল্লিকা যেমন হঠাৎ ঘরে এসে পড়েছিলো তেমনিই চলে যাচ্ছিলো। শ্রীপতি এতক্ষণে যেন লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'ভালো-মন্দ ঘরে যা আছে

নিয়ে এসো, মল্লিকা। দেশের লোক এসেছে বাড়িতে। নিন্দে যেন না করতে পারে।'

মল্লিকা একটু দাঁড়িয়ে কোনো-কিছু না বলেই চলে গিয়েছিলো। শ্রীপতি তাঁর ঈষৎ কর্কশ গলায়, ঈষৎ কৃত্রিম ভঙ্গিতে কী-যে বলে চলেছিলেন, সুবিকাশ ভালো করে শুনতে পায়নি। শুধু অস্পষ্টভাবে তার প্রথম বুঝি সেদিন মনে হয়েছে, শ্রীপতিবাবুর কথা শুধু একটু কৃত্রিম নয়, কেমন একটু কপটতা মেশানো।

প্রথম দিন আর কিছুই সে বোঝেনি। বোঝেনি বেশ কিছুদিন পর্যন্ত। বুঝলে আকণ্ঠনিমগ্ন হবার আগে সে হয়তো নিজেকে সাবধান করবার একটু নিষ্ফল চেষ্টাও করতো। যতো ক্ষীণই হোক, তার সামাজিক বিবেকই তাকে বাধা দিতো যথাসাধ্য।

কিন্তু বোঝা সহজ ছিলো না তার পক্ষে। আচরণে, কথায়, কি সজ্জায়, কোনো ইঙ্গিতও সে পায়নি।

মল্লিকা মাথায় ঘোমটা দেয় না, সিঁন্দূরও পরে না। শ্রীপতিবাবুর সঙ্গে তার বয়সের তফাতও এমন যে, সত্যিকার সম্পর্কটা অনুমান না করতে পারাটা অস্বাভাবিক নয়। আর যাই ভাবুক, মল্লিকা শ্রীপতির স্ত্রী হতে পারে, সে কল্পনাও করেনি।

ভুল সেদিন ভাঙলো অত্যন্ত রূঢ়ভাবে।

শ্রীপতি তার অফিসেই ফোনে অনুরোধ জানিয়েছিলেন অফিস-ফেরতা একবার যাবার জন্যে।

সিঁড়িতেই মল্লিকার সঙ্গে দেখা। সে নেমে আসতে গিয়ে সুবিকাশকে দেখে থেমে পড়েছিলো। ওপরের ধাপে মল্লিকা, নিচে সুবিকাশ। পথ যেন আগলানো।

'উনি তো বাড়ি নেই!'—এ ক'দিনের পরিচয়ে মল্লিকার স্বল্প একটি-দু'টি কথায় যে নির্লিপ্ত স্বর শুনেছে তাই আর একটু কঠিন।

কিন্তু সে কাঠিন্য তখন লক্ষ্যের বাইরে।

সিঁড়িটা সব সময়েই অন্ধকার, সন্ধ্যের দিকে আরো। নইলে সুবিকাশের মুখের চেহারাটা মল্লিকার কাছে লুকোনো থকতো না।

মল্লিকা

আবছা অন্ধকার তাকে বাঁচিয়েছে। কোনো রকমে অর্ধস্ফুট স্বরে শ্রীপতির অনুরোধের কথাটা সে তাই জানাতে পারলো।

মল্লিকা কয়েকটা মুহূর্ত তবু নীরব। তারপর 'আসুন' বলে সে ওপরে উঠে গেল। সুবিকাশ গেল তার পেছনে একটা বিমূঢ় বিহ্বল যন্ত্রণা নিয়ে।

মল্লিকা দরজার তালাটা খুললো। অন্ধকারে চাবি লাগাতে একটু বিলম্ব। সিঁড়ির রাসায়মিক গন্ধ ছাপিয়ে মল্লিকার সান্নিধ্যের একটা উষ্ণ অবশ করা সুবাস।

মল্লিকার পেছু-পেছু সুবিকাশ ঘরে ঢুকলো। বোঝা গেল, সুবিকাশের আসার কথা সে জানে না। ঘরে তালা লাগিয়ে কোথায় বার হচ্ছিলো।

'আমি না-হয় এখন যাই। আপনি তো কোথায় বেরুচ্ছিলেন।' এতক্ষণে সুবিকাশের ভদ্রতাটুকু করবার শক্তি এলো।

'না, বসুন।' মল্লিকার প্রায় আদেশ। সে ভেতরে চলে গেল।

বসলো সুবিকাশ। যান্ত্রিক বসা। এখন শুধু শ্রীপতির জন্যে অপেক্ষা করা। মল্লিকা নেহাত প্রয়োজনে বা শ্রীপতির আহ্বানে ছাড়া তার সামনে এখনো পর্যন্ত আসেনি। আজও আসবার কোনো প্রয়োজন নেই। কতক্ষণ শ্রীপতির জন্যে অপেক্ষা করবে বসে? অপেক্ষা করাই বা কেন? বসে থাকাটাই অসহ্য, বিশেষ এই ঘরে, পাশের ঘরেই মল্লিকা আছে জেনে। পাশের ঘরে এবং অসীম সমুদ্রের ওপারে।

অপেক্ষা করতে কিন্তু বেশিক্ষণ হলো না। মল্লিকাই এলো বাইরে বেরুবার সাজটা বদলে।

এসে কাছেই বসলো; অত্যন্ত বেশি কাছে।

শুধু পোশাক সে বদলায়নি, মুখের চেহারাতেও কী যেন একটা পরিবর্তন। কাঠিন্যের সঙ্গে একটু বিদ্রূপ হয়তো।

'আপনার সঙ্গে ভালো করে আলাপ হয়নি।'

উত্তর অনেক রকমের হয়, কিন্তু সুবিকাশ নীরব।

'কতদিন ওঁর সঙ্গে আপনার পরিচয়?' আলাপ নয়, জেরা যেন।

'বেশিদিন নয়। কতদিন, আপনিই তো জানেন!' সুবিকাশের মুখে একটু ক্লান্ত হাসি।

'না, জানি না। বাইরের আলাপ ঘরে না পৌঁছানো পর্যন্ত জানবো কী করে!' একটু থেমে মল্লিকা আবার বললো, 'আপনি তো বড়ো চাকরি করেন, শুনেছি। ঈর্ষা করবার মতো কাজ। এখানে কি একলাই থাকেন।'

'হ্যাঁ।' কী এ আলাপের অর্থ, সুবিকাশের পক্ষে বোঝা কঠিন।

বোঝা গেল একটু পরে।

'এতো লোক থাকতে ওঁর সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা হওয়াটা একটু আশ্চর্য নয়?'

সুবিকাশ এতক্ষণে নিজেকে একটু সামলে নিতে পেরেছে বোধহয়। স্থির দৃষ্টিতে মল্লিকার দিকে তাকিয়ে বললো, 'বয়সের তফাতের কথা ভাবছেন?' মল্লিকা চোখের দৃষ্টি ফেরালো, কিন্তু পলকের জন্যে। তারপরই সুবিকাশের দিকে অকম্পিত দৃষ্টিতে চেয়ে অদ্ভুত একটু হেসে বললো, 'না, বয়সের নয়, চরিত্রের।'

কোনো উত্তর সুবিকাশের মুখে যোগালো না।

মল্লিকাই আবার বললো, 'আপনি কে, কী আপনি করেন, আমরা জানি। এখানকার বাঙালীরা অনেকেই হয়তো জানে। কিন্তু ওঁর সম্বন্ধে কিছু কি আপনি জানেন? উনি আপনার জগতের লোকই নন। ওঁর সঙ্গে আপনার কোনো মিল কোথাও নেই বন্ধুত্ব হবার মতো।'

'বন্ধুত্ব কি মিল ধরেই হয়?' নেহাত কথার কথা।

মল্লিকাও তা অগ্রাহ্য করে হঠাৎ জিগ্যেস করলো, 'কতো টাকা এ ক'দিনে ধার দিয়েছেন?'

'ধার!' সুবিকাশ স্তম্ভিত।

'হ্যাঁ, ধার বলেই কতো টাকা এ পর্যন্ত উনি নিয়েছেন?'

একটা অসহ্য স্তব্ধতা যেন হঠাৎ ঝনঝন করে চুরমার হয়ে গেল।

'নিইনি এখনো, তবে নেবো বলেই অতো-করে ডেকে পাঠিয়েছি।' মাথার টুপিটা খুলে গায়ের কোটটার সঙ্গে টাঙিয়ে রেখে, শ্রীপতি স্মিতমুখে কাছে এসে বসলেন। নির্বিকার মুখে হেসে বললেন, 'মল্লিকা, আগে থাকতে বলে ভালোই করেছো। দু'দিনের আলাপ হতে-না-হতেই কী করে চেয়ে

মল্লিকা

বসবো ভাবতে-ভাবতেই আসছিলাম। যাক্, কথাটা যখন জেনেই ফেলেছো, আমায় হতাশ যেন না হতে হয়। বড্ড ঠেকে গেছি। তোমার তো হাত ঝাড়লে পর্বত! হাজারটা টাকায় তাতে টোলও খাবে না।'

কিসে সুবিকাশ বিস্মিত? আপনি থেকে তুমি-তে আসায়, না, শ্রীপতি নিজের মুখে সেই ধার-ই চাওয়ায়!

বিস্মিত আরো বেশি মল্লিকার ব্যবহারে। মল্লিকা লজ্জাও পেলো না, উঠেও গেল না। ঈষৎ হেসে বললো, 'মোটে হাজার টাকা শুনে সুবিকাশবাবু বোধহয় লজ্জা পাচ্ছেন। একে ধার বললে অপমান করা হয়।'

সুবিকাশ টাকা দিয়েছে এবং সেই একবার নয়। কী একটা অস্পষ্ট জ্বালা মেটাবার জন্যেই তার এই নির্বিচার অকুণ্ঠ দেওয়া। সে জ্বালা কি মল্লিকারই বিরুদ্ধে? সুবিকাশ বোঝবার চেষ্টা করে না।

মল্লিকারও এখন ভিন্ন রূপ।

অন্তরঙ্গতা না হোক, সে কঠিন দূরত্ব আর নয়। শ্লেষের আভাস একটু থাক, কিন্তু সমাদরে স্নিগ্ধতাও বুঝি আছে।

সুবিকাশ নিয়মিতভাবেই সে-বাড়িতে আসে, যায়। লোকের দৃষ্টি বিশেষ করে যেখানে পড়বার নয়, এমন জায়গায় তিনজনকে একসঙ্গে কখনো-কখনো দেখা যায়। কখনো শুধু দু'জনকে।

কিন্তু পাশাপাশি গাড়িতে কি সিনেমার সীটে বসেও সুবিকাশ জানে, সে যেখানে ছিলো সেইখানেই আছে। মল্লিকা দূর নয়, কিন্তু অনন্ত অদৃশ্য ব্যবধান তেমনি আছে মাঝখানে। সে ব্যবধান ভেঙে ফেলবার কোনো চেষ্টা সুবিকাশও করে না, অন্তত সজ্ঞানে তো নয়। সে বুঝি তার নিয়তি মেনে নিয়েছে।

কিন্তু জ্বালা বুঝি একেবারে যাবার নয়।

শ্রীপতি ক'দিন ধরেই জানাচ্ছেন, সামনের সপ্তাহেই তাঁদের বিয়ের তারিখের বাৎসরিক উৎসব। সুবিকাশ সেদিন যেন আসতে না ভোলে। বাইরের কেউ নয়, তিনজনে মিলেই যা কিছু আনন্দ করা হবে।

সেদিন কথাটা আবার জানাতে মল্লিকা হঠাৎ সুবিকাশের দিকে চেয়ে হেসে বলেছে, 'আচ্ছা, কি সেদিন আমাদের দেবেন বলুন তো ?'

'আহা, দেবার কথা এর ভেতরে কোথা থেকে আসছে!' শ্রীপতি প্রতিবাদ করেছেন, 'আমাদের উৎসব। ও আসবে, আনন্দ করবে, তাহলেই হলো।'

'না, তাহলে হলো না। পাবার মতো কিছু উপহার না পেলে উৎসব আমার ভালোই লাগে না। সত্যি কী দেবেন বলুন তো?' মল্লিকার আগ্রহটা একটু অস্বাভাবিক।

সুবিকাশ একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে থেকে ধীরে-ধীরে বলেছে, 'ঠিক যা দেওয়া উচিত, তাই দেবো।'

উৎসবের দিন সুবিকাশ এসেছে যথাসময়েই। উপহারও এনেছে। শ্রীপতির জন্যে সোনার রিস্ট-ব্যাণ্ড সমেত দামী সোনার ঘড়ি, মল্লিকার জন্যে একটা ছোটো আংটি—বেশ ছোটো।

শ্রীপতিবাবু সানন্দে ঘড়ি হাতে পরতে-পরতে আপত্তি জানিয়েছেন, 'দেখো দিকি, এতো খরচ করবার কী দরকার ছিলো! এই দামী ঘড়ি তার ওপর সোনার ব্যাণ্ডটা না দিলে হতো না! নাঃ, বড়ো চাকরিই করো, বুদ্ধিশুদ্ধি কোনকালে হবে না।'

তারপর খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার আগেই ঘড়ি হাতে পরেই বিশেষ জরুরী কাজে বেরিয়ে গেছেন আধ ঘণ্টায় ফেরবার নাম করে।

টেবিলের দু'ধারে দু'জন। কিছুক্ষণ কারুর মুখে কোনো কথা নেই।

মল্লিকাই প্রথম কথা বলেছে, 'আপনার বিদ্রূপ আরো সূক্ষ্ম হবে আশা করেছিলাম।'

'বিদ্রূপ। সূক্ষ্ম হোক মোটা হোক বিদ্রূপ কোথায় দেখলেন ?'

উত্তরে মল্লিকা একটু হেসেছে মাত্র।

'ওঃ, আপনি উপহার দুটোর কথা ভাবছেন, কিন্তু ওর মধ্যে বিদ্রূপ তো নেই। আপনাদের বিয়ের ব্যাপারে ওঁর পাওনাই তো বরাবর বেশি।'

কথাটা সুবিকাশ যেদিকে নিয়ে যাবে ভেবেছিলো, তা যায়নি।

মল্লিকা মৃদু একটু হেসে বলেছে, 'আপনার কী ধারণা বলুন তো ?

মল্লিকা

আমাদের এ বিয়েটা একটা দুর্ঘটনা, যার জন্যে আমার ভাগ্য কি উনিই দায়ী? একটা অনাথ অসহায় মেয়ে হিসেবে আমায় ধরে-বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে, আর উনি তার সুযোগ নিয়েছেন, এই বোধহয় আপনি ভাবেন!'

'ঠিক তা হয়তো ভাবি না। কিন্তু এ বিয়ে স্বাভাবিকও তো নয়।'

'না, নয়, কিন্তু এ বিয়েতে ভাগ্যের হাতও নেই। আমি স্বেচ্ছায় ভালোবেসে ওঁকে বিয়ে করেছি।' মল্লিকার শেষ কথাগুলো যেমন শান্ত, তেমনি দৃঢ়।

'স্বেচ্ছায়! ভালোবেসে!' সুবিকাশের স্বরে সুস্পষ্ট অবিশ্বাস।

এই বিশ্বাস যেন মল্লিকাকে হঠাৎ উত্তেজিত করে তুলেছে।

'হ্যাঁ, বিশ্বাস করা আপনার পক্ষে শক্ত হয়তো, কিন্তু প্রথম যৌবনে মেয়েদের মন কী থাকে আপনি জানেন না, তাই। অবশ্য ছবির নায়কের নামে নাচা মনের কথা বলছি না, মন বলে সত্যি কিছু পদার্থ যাদের থাকে, বলছি তাদের কথা। তারা শুধু রূপ দেখে না, গুণও হয়তো বোঝে না, নিজেদের বয়সী সাধারণ ছেলেদের তাদের মনে ধরে না। তাদের নেহাত হাল্‌কা কাঁচা জলো লাগে। এ-সব মেয়েদের মনে মোহ ধরায় বিশেষত্ব শক্তি আর প্রতিভা। এরা স্বপ্ন দেখে আশ্চর্য পুরুষের, বয়েস-গুণে তাকে বিচার করে না।'

'সব বুঝলুম, কিন্তু আসলের নামে মেকীও তো মাত করে যায়।'

'নিশ্চয়ই যায়। কিন্তু আমার বেলা সে-কথা আমি মানবো কেমন করে? ক্ষয়ে যাওয়া ভাঙা রেকর্ড আপনি শুনেছেন, সুর গিয়েছে হারিয়ে, স্বর গিয়েছে বুজে, দেখছেন শুধু একটা শুকনো খোলস। কিন্তু আমি অন্য কিছু দেখেছি, মুগ্ধ হয়ে শুনেছি সেই আশ্চর্য সব কথা। আজ আর কী প্রমাণ আপনাকে তবে দেবো!' হতাশভাবে মল্লিকা ঘরটা একবার হাত নেড়ে দেখিয়েছে, 'আছে শুধু এই ঘরটা। কিন্তু এই ঘরের সামান্য এই ক'টা জিনিসেও তার মনের যেটুকু রং লেগে আছে, তাতে তাকে কি একেবারে ফাঁকি বলে মনে হয়?'

মল্লিকা মুহূর্তের জন্যে চুপ করেছে। তারপর নিজেকেই যেন বিশ্বাস

করবার জন্যে তীব্রস্বরে বলেছে, 'না, মেকীতে আমি ভুলিনি। আশ্চর্য পুরুষকেই আমি বেছে নিয়েছিলাম সকলের মতের বিরুদ্ধে, রূপ, বয়েস কিছু না বিচার করে। তার জন্যেই সব কিছু আমি ছেড়ে এসেছি।'

মেয়েদের হৃদয়ের বিরুদ্ধে সব তর্ক নিষ্ফল, এ-কথা সুবিকাশের তখনই বোঝা উচিত ছিলো। সে তা বোঝেনি। তাই আবার জের টানতে চেয়েছে কথার, 'কিন্তু তারপর?'

'তারপর আর কী? একটানা দুর্ভাগ্যের ইতিহাস, বিদ্যুতের মতো তলোয়ারও যাতে মরচে ধরে ভেঙে যায়। কিন্তু—' মল্লিকা নিজকে এতক্ষণে শান্ত করে একটু হেসেই বলেছে, 'দুর্ভাগ্যে মনের প্রথম ছাপ কি কখনো মোছে!'

মোছে বলেই মনে হয়েছে কিন্তু একদিন। অদৃশ্য অলক্ষ্য ব্যধানও বুঝি ভেঙে পড়ে।

কিছুদিন ধরে শ্রীপতি যেন কেমন একটু অস্থির বিচলিত। সুবিকাশের অসময়ে আসা-যাওয়া নয়, কিন্তু আজকাল শ্রীপতিকে প্রায়ই পাওয়া যায় না। মল্লিকাও আবার কেমন যেন কঠিন হয়ে উঠছে, কঠিন স্থির শুধু বাইরের চেহারায়, কিন্তু তার চোখে একটা গভীর অবসাদ অসতর্ক মুহূর্তে লুকোনো থাকে না।

শ্রীপতি বা মল্লিকা কেউ সেদিন বাড়িতে নেই। নিয়মিত সময়েই এসে দরজায় তালা দেখে সুবিকাশ একটু বিস্মিত হয়েই ফিরে যাচ্ছিলো। সিঁড়ির নিচেই মল্লিকার সঙ্গে দেখা।

'আসুন, অনেকক্ষণ এসেছেন নাকি?'

'না।'

আবার সেই কাঠের সিঁড়ির কটু গন্ধ। সেই সান্নিধ্যের সুবাস। কিন্তু আজ স্বাদ যেন আলাদা।

সুবিকাশ অফিস-ফেরতা সাধারণত এখানেই আসে। মল্লিকা আজ কিন্তু তার চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করতে গেল না। বসলও না কাছে।

মল্লিকা

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা, যা প্রায় বিরল হয়ে এসেছে আজকাল। যাহোক কিছু কথায় সুবিকাশ সেটা যখন ভাঙবে কি না ভাবছে, তখন অপ্রত্যাশিতভাবে মল্লিকা বললো, 'আমার কিছু টাকার দরকার।'

সুবিকাশ এ-বাড়িতে টাকা অনেক দিয়েছে এ-পর্যন্ত, কিন্তু এই সামান্য ক'টা কথা এতো তীব্র আঘাত দিতে পারে সে. কখনো ভাবতে পারেনি। মুখ দিয়ে তার.কোনো কথাই বের হলো না।

মল্লিকা আবার বললো, 'উনিই আজকালের মধ্যে হয়তো চাইতেন, তার আগে আমিই চাইলাম।'

'কিন্তু ওঁর চাওয়ায় আপনার চাওয়ায় তফাত নেই কি?' সুবিকাশ এবার বলতে পারলো তিক্ততা গোপন না করেই।

'আছে, আমি ফেরত দেবো বলেই চাইছি।'

'ফেরত দেবেন? কেমন করে?'

'জানি না। কিন্তু সংকল্প তাই।'

'কিন্তু যার কাছে কিছুই কোনদিন ফেরত পাবার নয়, তার কাছে এই ক'টা টাকা ফেরত পাবার লোভ আমার নেই। টাকা আমি আপনাকে দিতে পারবো না।'

'না, টাকা আমায় দিতেই হবে।' মল্লিকা যেন সমস্ত সংযম হারিয়ে অধিক ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

স্তব্ধ হয়ে গেল সুবিকাশ দুর্বোধ্য একটা যন্ত্রণায়। বেশ রূঢ়ভাবেই বললো, 'অনেক কিছুই তো করেছেন। এই একটা জায়গায় সহধর্মিণী না হলে পারতেন না?'

এবার মল্লিকা নিরবে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

সুবিকাশ উত্তেজিত। উঠে দাঁড়িয়ে মল্লিকার সামনে গিয়ে আবার বললো, 'কী জন্যে এ লজ্জা, এ অপমান আপনাকে সাধ করে নিতে হচ্ছে? হঠাৎ কেন এতো টাকার আপনার দরকার।'

মল্লিকা আর মুখ ফেরালো না। স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো, 'শুনুন, সত্যি কথাটা তাহলে শুনুন। আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে।'

'চলে যেতে হবে!'

'হ্যাঁ, চলে নয়, আমাদেরকে পালিয়ে যেতে হবে বলাই উচিত, আর যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। সব কিছু বলবার মতো মনের অবস্থা নয় আমার, শুধু—এইটুকু শুধু শুনে রাখুন যে, এমন একটা গ্লানির স্খলনের ইতিহাস ওঁর পেছনে আছে, যা মুছে ফেলতে উনি পারেননি। মনে করুন, সেটা চুরি, হ্যাঁ—চুরিই। মনে করুন, তার চেয়ে বেশি কিছু। তার জের আজো মেটেনি। হিংস্র অক্লান্তভাবে এখনো সন্ধান করে ফিরছে! তারই ভয়ে এই রকম পাড়ায় লুকিয়ে এসে থাকতে হয় আমাদের, পালিয়ে বেড়াতে হয় শিকারের পশুর মতো।'

সুবিকাশের কাছে কথাগুলো হয়তো নতুন কিছু নয়। মনের গভীরে অনেক আগেই বুঝি জানতো। তবু বিস্মিত কয়েকটা স্তব্ধ মুহূর্ত কাটলো। সুবিকাশ তারপর ধীরে-ধীরে বললো, 'কিন্তু এ-দায় তো আপনার নয়। আপনাকে টাকা চাইতে হয় কেন এর জন্যে?'

'চাইতে হয় ওঁকে মুক্তি দেবো বলে। যতো অসাধারণই একদিন হয়ে থাকি, আজ বুঝতে পারছি অনুরাগ বলে যাকে মনে করেছি, তার ষোলোআনাই ছিলো আমার অহঙ্কার। আশা যার নেই তাকে ধন্য করবার অহঙ্কার। কিন্তু ধন্য আমি ওঁকে করিনি, করেছি শুধু বিড়ম্বিত। আমার জন্যেই ওঁর জীবনে এতো গ্লানি, এতো কালি। আমার স্বপ্ন অক্ষুণ্ণ রাখবার করুণ ব্যর্থ চেষ্টাতেই ওঁর প্রথম স্খলন শুরু। কিন্তু আর ওঁকে অভিশপ্ত করে আমি রাখবো না। আমার বিড়ম্বনা থেকে ওঁকে মুক্তি দেবো একেবারে। আর—আর আমি পারছি না এ-জীবন সইতে।'

ভেঙে-পড়া এ-মল্লিকা, হৃদয়ের সমস্ত তার-ছেঁড়া চেতনার গভীর বিহ্বলতা।

সুবিকাশ হাতটা তার ধরে ফেললো। রক্তে আগুন ধরানো সেই উষ্ণ কোমলতার সুতীব্র অনুভূতি নিয়ে বললো, 'মুক্তি দিতে আর নিতে কোথায় যাবে, মল্লিকা! আসবে আমার কাছে? দেবে আমায় তোমাকে সব কিছু থেকে আড়াল করতে?'

'পারবে তুমি! পারবে আমায় নিয়ে যেতে?' কিন্তু তোমার ওই

মল্লিকা

বাঁধানো রাস্তার জীবনে নয়। দূরে, সব কিছু থেকে দূরে, এখানকার কোনো ডাক যেখানে পেঁাছায় না। পারবে আমায় নিয়ে এমন জায়গায় সব-কিছু ছেড়ে যেতে?'

মল্লিকার কোমল বাহুতে সুবিকাশের হাতের মুঠিটা শুধু আরো শক্ত হয়েছিলো সেদিন।

ত্রুটিহীন সব ব্যবস্থাই হলো ঝড়ের বেগে। যেদিন সকালে শ্রীপতিদের যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক, তার আগের রাত্রেই সুবিকাশ আর মল্লিকাকে দেখো গেল দূরযাত্রী একটি ট্রেনের নির্জন এক কামরায়।

জিনিসপত্র সব উঠেছে। ট্রেন ছাড়তে খুব বেশি দেরি নেই।

সুবিকাশ উদ্বিগ্ন হয়ে মল্লিকার দিকে তাকালো, 'কী হয়েছে, মল্লিকা? শরীর খারাপ লাগছে?'

মল্লিকা মধুর একটু হাসলো, 'না, মাথাটা হঠাৎ ধরেছে। কিছু নয়, ট্রেন চললেই সেরে যাবে।'

কিন্তু সুবিকাশ ব্যস্ত হয়ে উঠলো, সঙ্গে ওষুধ কিছু নেই জেনে বেরিয়ে গেল ওষুধের চেষ্টায়, মল্লিকার মৃদু আপত্তি না শুনেই।

ওষুধ নিয়ে সুবিকাশ সময় থাকতেই ফিরলো।

কামরায় মল্লিকা নেই।

তখনো ট্রেন ছাড়তে যা দেরী ছিলো, তাও শেষ হয়ে এলো।

মল্লিকার এখনও দেখা নেই। দেখা আর হবে না, তখনই সুবিকাশ বুঝেছিলো।

মুহূর্তের একটা চাঞ্চল্য। সব-কিছু যে হাত-বাক্সে ছিলো, সেটা?

হ্যাঁ, সেটা ঠিক আছে সীটের তলায়।

সেটা খুলে দেখবারও দরকার নেই, সুবিকাশ জানে। সব ঠিক আছে।

না, অতো ছোট ফাঁকি মল্লিকা তাকে দেয়নি।

স্টেশন কাঁপিয়ে আজানা দূরের যাত্রী ট্রেনের হুইসিল বাজলো।

বৌয়ের জন্মদিন

শিবরাম চক্রবর্তী

'ভারী মুস্কিলে পড়েছি, ভাই।' ছত্রপতি মুখ ভার করে এলো : 'বৌয়ের জন্মদিন আবার।'

আমার টনক নড়ে। ছত্রপতি ভট্টশালীর মুখ ভার? দেখে তো বটেই, কথাটা শুনেও টন্‌কো হতে হয়। সাবধানের বিনাশ নেই। তার ছত্রাকার ধারনের আগেই সতর্ক হতে হয়।

'আহা, তোমার কাছেই যাবো-যাবো করছিলাম! আমার কয়েকটা টাকার ভাই খুব—' আগেভাগেই ধারালো হয়ে উঠি।

'বাজে ভড়কাচ্চো, টাকা ধার চাইতে আমি আসিনি। টাকার আমার দরকার নেই।' ছত্রপতি জানায়—'বৌকে কোনো উপহার দিতে হবে না। এবার অন্য এক মুস্কিল—'

অন্য মুস্কিল শুনে আশ্বস্ত হলাম। 'কী মুস্কিল শুনি?'

'গোড়া থেকেই বলি, কেমন? তাহলে তুমি ললিতার চিন্তাধারাটা ধরতে পারবে। হাজার হোক লেখক মানুষ, পরের মনের হদিশ রাখো তোমরা।'

'পরের মন আর পরীর মন এক নয়। পরীর মনের হাড়-হদ্দ কেউ জানে না ভাই!' আমি জানাই।

'তা ঠিক। এতদিন ঘর করেও ললিতার মনের একটুকুও আঁচ যদি পাই! ওর থই পেলাম না আজো।' ছত্রপতি নিজের ছাতা খোলে—'এই যেমন, আজ সকালের কথাটাই বলি। রেসের বই খুলে শনিবারের ঘোড়া ঠিক করছি, হঠাৎ যেন আমার কানের পাশ দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেল। তাকিয়ে দেখি ললিতা।'

'ললিতা বুঝি ঝড়ের বেগে প্রবেশ করেছিলো?' আমি শুধাই।

'না। ঝড়টা তার দীর্ঘশ্বাস। ফোঁস করার পর সে বললো, আবার সেই সাতুই আশ্বিন আসছে। মাথা তুলে বললাম, পূজোটা এবার কোন্ তারিখে পড়েছে বললে? না, পূজোর কথা নয়, বললো ললিতা, আমার জন্মদিনের কথা বলছি। বেমালুম ভুলে গেছ বুঝি?'

'আশ্বিনের নয়ই না ছয়ই—কবে না যেন?' আমার কেমন গোলমাল ঠ্যাকে।—'না কি, পাঁচুই হবে?' আমি জিগ্যেস করি।

'কী সর্বনাশ! বৌয়ের জন্মতিথি নয়-ছয় করা?' বিবাহিত না হয়েও বন্ধুর বিপদটা আমি বুঝতে পারি।

'বেশি নয়-ছয় হয়নি। বলতে না-বলতেই আমার মনে পড়ে যায় যে, পাঁচুই নয়, তারিখটা হচ্ছে সাতুই?'

'আশ্বিনের সাত তারিখে যে একটা প্যাঁচ আছে, কোনো সাত-পাঁচে না থাকলেও সেটা তোমার মনে রাখা উচিত ছিলো। যাক্, তারপর সত্যি-সত্যিই ঝড়ঝাপটা গেল বুঝি এক চোট?'

'না, সামলে নিয়েছি খুব।....বললাম, তোমার জন্মদিন কি আমি কখনো ভুলতে পারি, ললিতা? সাতুই আশ্বিন আমার স্মৃতিপটে চিরতরে অঙ্কিত হয়ে আছে। এবার কী উপহার দেবো তোমায়, সেই কথাই তো ভাবছি—এই ক'দিন। ভালো কথা, তোমার-আমার বন্ধুদের কাকে-কাকে নেমন্তন্ন করা যায়, বলো তো?'

'কাউকে না। আমি বলি কি, এবার আমার জন্মতিথির উৎসবটা করে আর কাজ নেই।' বললো ললিতা, 'আমার জন্মদিনের কথাটা তুমি একেবারে ভুলে যাও।'

কানে আমি খাটো নই, তবু শুনে আমার খট্‌কা লাগলো—বলে কী! আমি শুধালাম—'তোমার জন্মদিনের কথাটা ভুলে যেতে বলছো, আমায়?'

তাকিয়ে দেখলাম ওর মুখে, না, সেখানে রাগের কি অভিমানের কোনো চিহ্ন নেই। আমার কান আর চোখ দুই-ই কি তবে আমার সঙ্গে ছলনা করছে?

'অমন কথা বলো না। তোমার জন্মদিন কি আমি ভুলতে পারি, ললিতা?' বললাম আমি—বুঝি একটু ক্ষুণ্ণস্বরেই।

'না, ভুলতেই হবে তোমাকে। আমি নিজেও তা ভুলতে চাই। সাতুই আশ্বিন, না, সাতুই আশ্বিনের আর কোনো উৎসব এ বাড়িতে নয়। এ জন্মে নয়। ও তারিখের কথাও যেন কেউ এখানে উচ্চারণ না করে।'

অভিমান বা রাগের বশে নয়, সিরিয়সলিই বললো ললিতা। ওর কথায় কোনো উষ্মা ছিলো না!

কিন্তু কথাটা সিরিয়স্। শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম বেশ। কোনো অসুখ-বিসুখ করলো নাকি ওর? নাকি, মাথাই বেগড়ালো শেষটায়? ওর মুখ-চোখ কিন্তু বেশ স্বাভাবিক। মুখের ভাব দেখলে মনে হয় না যে, কিছু হয়েছে। তবে চেহারা দেখে বৌদের কিছুই ধরা যায় না। ডাক্তার ডাকতে ছুটবো কি-না ভাবছি, কে-জানে কদ্দূর গড়িয়েছে ব্যায়রাম! পাড়ার ডাক্তারেই শানাবে, নাকি চৌষট্টি টাকার ভিজিটওয়ালা কাউকে আনাতে হবে—চিন্তা করছি, এমন সময়ে ও অর্তনাদ করে উঠলো—'উঃ! আবার সেই সাতুই আশ্বিন। ভাবতেও আমার মাথা ঘুরছে!'

কপালে হাত দিয়ে দেখলাম ওর, ঠাণ্ডা। 'কী কষ্ট হচ্ছে তোমার, বলতো? কোথায় যন্ত্রণা হচ্ছে?' আমি শুধোই।

জবাব পাই ললিতার—'কী যা তা বক্‌চো? অসুখ-বিসুখ কিচ্ছু করেনি। আমি···আমি শুধু ভাবছি···জানো, আমি এবার কতো বছরে পড়বো?'

'কতো বছরে? দাঁড়াও?' বলে আমি ভাবতে যাই, কিন্তু ভেবে হিসেবের কোনো কূল পাই না। 'কুল্লে তেত্রিশ, তাই না?'

'চল্লিশ! এবারে আমি চল্লিশে পা দেবো, জানো?' বলে আর-একটা ঝড় বইয়ে দিলো ললিতা, আমার নাকের ওপর দিয়ে।

'শরীর নয়, মন খারাপ হয়েছে তোমার বৌয়ের।' ছত্রপতিকে আমি তৎদণ্ডে জানাই।

'মন খারাপের ওষুধ তো আমার জানা নেই।' বললো সে, 'কোনো ডাক্তারও সারাতে পারবে কি-না কে-জানে।'

'ডাক্তার নয়, মনের চিকিৎসা যারা করে—সেই মনোবিকলকদের কাউকে ডাকতে হবে। পারলে তারাই সারাতে পারবে এই মন-খারাপি।' আমি বাতলাই।

'কি করে সারায় তারা?'

'মনোবিকলন করে। মনের কলকব্জা মেরামত করে। তোমার বৌয়ের মন বিকল হয়েছে তো? তারা এসে এ-কথা সে-কথা শুধিয়ে আরো বেশি বিকল করে দেবে, তখন তাতে করে বিষে বিষক্ষয় হয়ে যাবে মনের।'

'ও, তাই বুঝি?'

'তবে অদ্দূর না গিয়ে, আপাতত তুমিই ওকে সান্ত্বনা দিতে পারতে—ওর মন আর বেশি বিকলাঙ্গ না করেও।'

'দিইনি কি? বলেছি তো, চল্লিশ তো কী হয়েছে? চিত্রতারকারা ছাড়া সবাই একদিন না একদিন চল্লিশে পা দেয়। চল্লিশ তো জীবনের শুরু! লাইফ বিগিনস্ অ্যাট ফর্টি, শোনোনি কি? এইবার ফর্টিফায়েড্ জীবনকে চুটিয়ে উপভোগ করতে লাগো।'

শুনে সে খালি ঘাড় নাড়ে—'সে হচ্ছে ছেলেদের বেলা। মেয়েদের বেলা চল্লিশ পেরুলো কি ফুরোলো। তখন তারা বুড়ি। কেউ আর তাদের দিকে—' বলে ললিতা আর বলতে পারে না। কাতর চোখে চেয়ে থাকে।

'তুমি তার কি জবাব দিলে?'

বললাম, 'চিন্তার কী আছে? আর কেউ ফিরে না চাইলেও, আমি তো চাইবো। ফিরে-ফিরেই চাইবো।' এমন কি, ওর সত্তর বছরেও চাইতে ছাড়বো না—শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে—এমন কথাও বললাম। কিন্তু তবুও সে বোধ মানে না। যতই বলি, আমি চাইলেই তো হলো। আর কারো চাউনির তোয়াক্কা কী তোমার? কিন্তু তবু—তবুও মুখ গোঁজ করে থাকে।'

'ভুল পথ ধরেছিলে, ভায়া!' বলতে হলো আমায়—'মেয়েদের বুঝ দেবার পথ ও নয়। ও-কথা তোমার ঠিক হয়নি।'

'চিরকালই আমার বেঠিক হয়।' ছত্রপতি মেনে নেয়। 'ভুল পথেই

আমি চলে যাই গোড়ায়। আর, তারপরেই ভুল ধরতে পারি। ধরতে পেরেই অবশ্যি ঘুরে এলাম—বললাম যে, 'তোমাকে তো চল্লিশের মতো দেখায় না, ললিতা। আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখো একবার। পঁচিশ বছরের চেয়ে একটি দিনেরও বেশি যদি মনে হয় তোমাকে!'

তখন ললিতার মুখে হাসি ফুটলো। বললো, 'সত্যি বলছো?'

আমি রেসের বইয়ে হাত রেখে দিব্যি গাললাম—'এই সরস্বতী ছুঁয়ে বলছি—'

'উঁহু, রেসের দেবী সরস্বতী নয়, অশ্বরস্বতী। অলক্ষ্মীও বলতে পারো।'

'সে যাই হোক, গৃহলক্ষ্মীকে ঠাণ্ডা করতে বলে তো দিলাম—এখন, মা-লক্ষ্মীরা না রাগ করেন! তারপরে তোমার কাছে ছুটে এসেছি পরামর্শ নিতে—কী করা যায় এখন? জন্মতিথির উৎসব তো কিছুতেই সে করতে দেবে না। এ জীবনে নয়! বয়স যে বাড়ছে সে-কথা কাউকে জানাতে আর রাজি নয়। কিন্তু আমার দিক থেকে তো একটা কর্তব্য আছে? উৎসব না হোক্, সে দিনটিতে একটা-কিছু তো ওকে উপহার দিতে হয়? কী দেওয়া যায়?'

'আয়না তো দেওয়া যায় না? কী বলো? তাহলে···গয়না?'

'অনেক টাকার ধাক্কা।'

'তাহলে তোমার বায়নাটা কী, শুনি?'

'এমন কিছু দেওয়া, যা জন্মদিনের আনন্দ দেবে অথচ চল্লিশের কাঁটাটা ফুটতে দেবে না ওর মনে, যে দেশে কুড়িতে মেয়েরা বুড়ি হয়, সেখানে যে ওর দু'কুড়ি পার হয়েছে সে-কথা ওকে ভুলিয়ে দিয়ে—'

'বুঝেছি, ওর মনের কোণে কোনো খোঁচ রাখবে না। বিগত যৌবনের খোঁচা দেবে না। আগামী দিনের জরাজীর্ণতা ভুলিয়ে দেবে ওর মন থেকে···তা, আমি বলি কি, গ্ল্যাণ্ড-ভিটামিন ঘটিত কোনো টনিক দিলে কেমন হয়?' সেই সঙ্গে আমি কয়েকটি নামকরা স্নো-ক্রীম পাউডারের উল্লেখ করি। হিমানী, হেজলীন, পন্‌ড? যদিও আমার ধারণায় ওগুলো পণ্ডশ্রম ছাড়া কিছু নয়। বয়সের ছাপ ওতে যায় না। বরং যা চাপা রাখবার তাই খবর কাগজের মতন ছাপা হয়ে বের হয় আরো! সার্কুলেটেড্

হতে থাকে। ছড়িয়ে পড়ে বেশি করে। তবুও, মেয়েরা না-হোক বাজে কাজ করতে ভালোবাসে বলেই বললাম কথাটা।

'ঐ পণ্ড-শ্রম? সারাদিনই তো করছে। না, ও-সব না। আমি বলি কি, তুমি যদি একটা কবিতা লিখে দাও, যা পড়ে ওর মনের এই খচ্খচানি ঘুচবে—আমি সেই কবিতাটা কোনো শিল্পীকে দিয়ে আর্ট-পেপারে ভালো করে লিখিয়ে চমৎকার একটা সোনালী ফ্রেমে এঁটে ওর জন্মদিনটিতে দিই যদি—'

'মন্দ হয় না। দাঁড়াও দেখি। সে-রকম কোনো কবিতা আছে কি না আমার ষ্টকে।'

পুরোনো খাতাপত্তরের পাতা হাঁটকাই। ইষ্টকস্তূপ সরাতে থাকি। আঠারো ইঞ্চির অষ্টাদশপদী যদি একটা পাওয়া যায়। 'ললিতাস্থ' বলে সুললিত এমন কোনো কাব্যখণ্ড (কি খণ্ডকাব্য) মেলে যদি।

খুঁজতে-খুঁজতে মেলেও একটা : 'যদিও নওকো তুমি আগের রূপসী'। পড়েই তো ও আঁতকে ওঠে।—'বাবা, এটা দিলে আর দেখতে হবে না। কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে তক্ষুনি।'

তারপর ও নিজেই একটা খুঁজে বের করে। বেশি খুঁজতে হয় না। সেই পাতারই তলার দিকে ছিলো কবিতাটা। 'হ্যাঁ, এইটে চলতে পারে' বলে সে আবেগভরে আওড়াতে থাকে :

'হেরি যে তোমারে প্রিয়ে, আজো অষ্টাদশী,
সেদিনের নবোঢ়া রূপসী!
আঠারো বসন্ত এসে, না জানি কী স্নেহে,
ফিরে যেতে পারেনিকো, তোমার ও দেহে
বাঁধা পড়ে গেছে, হায়, কোন্ মায়া-ফাঁদে।
কি করে বাঁধিলে চির-পূর্ণিমার চাঁদে!
আজি তব জন্মদিনে,
আমায় নতুন করে নিলে ফের কিনে।'

'কেবল, আজি তব জন্মদিনের পরে 'এই সাতুই আশ্বিনে' কথাটা বসিয়ে দিলেই হয়ে যায়। খাসা হয়!'

'প্যাঁজের ওপর পয়জার!' আমি সায় দিই।

'সাতুই আশ্বিন বসিয়ে এইটে আমায় কপি করে দাও।'

'কপিকল একটু পরেই এখানে আসবে। আমার এক শিল্পী বন্ধু। তাকে দিয়েই করিয়ে দেবো—একেবারে ছাপা হরফের মতই হবে দেখতে। চাও তো তার ওপরেই ভার দিয়ে, জিনিসটা সুচারু ফ্রেমে বাঁধিয়ে সাতুইয়ের সকালে তোমাদের বাড়ি যাতে পেঁাছোয় তার ব্যবস্থাও করে দিতে পারি।'

'তাহলে তো খুব ভালোই হয়। তোমার বন্ধুটি কে, শুনি একবার?'

'কিরীট রায়। এখনকার প্রখ্যাত আর্টিসট। শোনোনি নাম?'

'শুনিনি আবার? হাড়ে-হাড়ে চিনি ওকে। আমি, ললিতা আর ও—এক কলেজেই পড়তাম তো। ওকে আর আমি জানিনে!' ছত্রপতির উৎসাহ, ছাতা মেলতে না মেলতেই, যেন মুড়ে আসে।

'এক সঙ্গেই পড়তে বুঝি? তাহলে তো ভালোই হলো।'

'মোটেই ভালো না। ললিতার ওপর ঝোঁক ছিলো ওর। ললিতার মন কাড়বার কি কম চেষ্টা করেছে নাকি। আমার কার্টুন এঁকে-এঁকে দেখাতো তাকে আর সে হেসে খুন হতো! বিচ্ছিরি, বিতিকিচ্ছিরি যতো ছবি। সে সব ছবির কোনখানেই আমার সঙ্গে মেলে না। ইয়া নাক, ভাঁটার মতো চোখ, ভূতের মতন চেহারা—'

'সে তো ভূতপূর্ব কাহিনী। এখনো কি সেই কথা ওর মনে আছে নাকি? বে থা করে ঘর সংসার করছে এখন। সেজন্যে তুমি ভেবো না। আমি বললে আমার খাতিরে এটুকু করতে সে রাজি হবে।'

ছত্রপতি চলে যাবার একটু পরেই এলো কিরীটি। বলতেই রাজি হয়ে গেল সে। কিন্তু আমার নয়, ললিতার খাতিরেই রাজি হলো মনে হয়। পরস্মৈপদী হলেও, অনেকদিনের পরে ললিতাকে একটা উপহার দেবার এই উপলক্ষ্য সে এড়াতে পারলো না। আমার খাতাটা ওর হাতে দিয়ে মার্কা-মারা পাতটার তলার দিকের আট লাইনের কবিতাটা ওকে দেখিয়ে দিলাম।

'সর্বনাশ হয়েছে!' সাতুই আশ্বিনের সকালে, সাড়ে সাতটাও হয়নি, হাঁপাতে-হাঁপাতে ছত্রপতি হাজির! সর্বনাশ মুখে করেই এসেছে।

'আবার কী সর্বনাশ হলো ?'

'সেই হতভাগা কিরীটি—'

'কেন, সে কি পাঠায়নি কবিতাটা ?'

'পাঠিয়েছে। একটু আগেই তো এসে পেঁছালো তার পার্শেল। ছবির মতই বাঁধিয়ে পাঠিয়েছে। হায় হায়, তখনি আমি জানতাম—'

'আবার হায় হায়ের কী হলো ? ললিতা কি সে উপহার পেয়ে খুশি নয় ?'

'খুশি ? হ্যাঁ, খুশিই বটে। দাঁড়াও, গোড়ার থেকে বলি—' বলে সে এগোয়।

তার বিবৃতি থেকে জানা যায়, এ ক'দিন ললিতা বেশ ফুর্তিতেই ছিলো। চল্লিশের কথা ভুলে গিয়ে শুধু তার জন্মদিনের খুশিতেই মশগুল ছিলো। ছত্রপতি তাকে বলেছিলো, সে একটা কবিতা লিখেছে তার ওপরে। কবিতাটা ছাপতে দিয়েছে, এক কপি মাত্র ছাপা হবে। আর সেই একটিমাত্র কপি শুধু কেবল তার ললিতার জন্যেই। জন্মদিনটিতে তার হাতে নিজের জীবনের প্রথম কাব্য-রচনাটি উপহার দিয়ে সে কৃতার্থ হবে। এই কথাই বলেছিলো ছত্রপতি। কৌতূহলে উদ্বেল হয়ে ফুলের মতই দুলছিলো ললিতা। তারপরে আজ সকালে একটু আগে কড়া নড়তেই ললিতা নিজেই ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছে, বেয়ারার কাছ থেকে কিরীটির পাঠানো ছবিটা নিয়েছে হাতে করে। আর, তার একটু পরেই বিকট এক চিৎকার ছেড়ে ছবিটাকে সে আছড়ে ফেলেছে মাটিতে, আর তার পরেই ট্যাক্সি ডেকে বেরিয়ে গেছে সে।

'কোথায় গেছে ?' আমি জিগ্যেস করি।

'দাঁড়াও, বলছি। ললিতা চলে যাবার পর ভাঙা ফ্রেম থেকে ছাড়িয়ে কবিতাটা পড়লাম।' বলে আর্ট পেপারে বিচিত্রিত রচনাটা সে আমার হাতে দিলো।—'এই সেই কবিতাটা।'

আমিও পড়লাম।—

'যদিও নওকো তুমি আগের রূপসী,
অস্ত গেছে যৌবনের শশী,

সেই মধু সে-মাধুরী নেই,
তবু ভালোবাসি জানবেই—
সেই-তোমাকেই ভেবে এই-তোমাকেই।
বসন্ত গেলে তো ফিরে আসে আরবার
আসে বার-বার,
বারেক যৌবন গেলে ফেরেনাকো আর।
জীবনে বসন্ত গেলে আসে পাতা-ঝরা
দারুণ শীতের দিন—আমরণ জরা।
দাঁত নড়ে আর বাত ধরে,
চুলে পাক ধরে,
তারপরে দাঁত পড়ে, গালে ফাঁক পড়ে ;
আর টাক পড়ে !
ক্রমে ক্রমে এসে
সব পড়া শেষ হলে—পরাক্রম-শেষে—
শেষ পড়া শুরু হয় কাঠে আর খড়ে।
শেষের সেদিনের সম্মুখে বসি
শেষ বোঝা-পড়া করি এসো গো প্রেয়সী ॥'

'কিরীটির হয়তো কোনো দোষ নেই।' সান্ত্বনাছলে আমি বলি, 'হয়ে গেছে মনে হয়। এক পাতাতেই ছিলো কবিতা দুটো। তলারটা না দেখে ওপর তলাটাই ওর চোখে পড়েছে। অতটা তলিয়ে দেখেনি। তাছাড়া শিল্পীদের নজর স্বভাবতই একটু উঁচুর দিকে। জানোই তো?'

'উঁচু দিকে? কিরীটির উঁচু নজর? ওর নজর শুধু আমার বৌয়ের দিকে। যদ্দূর নীচ হতে হয়। ওকে আর আমি চিনিনে? ইচ্ছে করেই সে এ-রকম করেছে, আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি। তুমি কবিতার পাশের ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো একবার।'

তাকিয়ে দেখি। হ্যাঁ, দেখবার মতই বটে—

কিরীটি খুব খেটেছে দেখা গেল। কবিতাটার প্রত্যেকটি ছত্র (ছত্রপতির মতে 'যাস্‌সে তাই') বেশ নিখুঁত করেই এঁকেছে। আগের

রূপসী ললিতার কলেজী বেণী দোলানো ললিত মাধুরী থেকে শুরু করে, ক্রমে-ক্রমে তার দাঁত-নড়া বাত-ধরা চেহারা ধরে চুলের পাক আর পাকা টাক পেরিয়ে নিমতলার কাঠে আর খড়ে এনে শেষ করেছে! তলাকার ছবিটার ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠেছে কবিতাটার কড়িকাঠে।

'নেহাৎ মন্দ আঁকেনি তো কিরীটি? আমার মনে হয় এইটেই তার শিল্পী-জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।' সমালোচকের চোখ দিয়ে বললাম।

'এতদিনে ওর মনস্কামনা পুরলো। হতভাগা কিরীটিটা যা চাচ্ছিলো অ্যাদ্দিন....ললিতা বাপের বাড়ি চলে গেছে! বলে গেছে আর এ-জন্মে ফিরিবে না।' বললো ছত্রপতি—'যেন ঘোড়ায় জিন্ দিয়েই বসে ছিলো ললিতা এইটে পেতেই না...' ছত্রপতি আর বলতে পারে না, ভেঙে পড়ে একেবারে।

দেবীরা অশ্ববেগে গেলে, শাস্ত্রমতে, যা হয়ে থাকে। 'ছত্রভঙ্গ স্তুরঙ্গমে।' ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, বলেই দিয়েছে পাঁজিতে।

বিষের বিষ

সৈয়দ মুজতবা আলী

আগা আহমদের প্রাণ অতিষ্ঠ। এক ফোঁটা মেয়ে তার বউ মালিকা খানমটা —ফুঁ দিলে উড়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু সেই যে সাত-সকালে ভোরবেলা থেকে ক্যাটক্যাট আরম্ভ করে তার থেকে আগা আহমদের নিষ্কৃতি নেই। 'মিনষে', 'হাড়হাভাতে', 'ড্যাকরা'—হেন গাল নেই যেটা আগা আহমদকে দিনে নিদেন পঞ্চাশবার শুনতে হয় না। আর গয়না-গাটি নিয়ে গঞ্জনা— সে তো নিত্যকার রুটি পনীর। এবং সেই সামান্য রুটি পনীরটুকুও যদি ভালো করে আগা আহমদের সামনে ধরতো তবুও না-হয় সে সব-কিছু চাঁদ-পানা মুখ করে সয়ে নিতো, কিন্তু সে রুটিও অধিকাংশ দিন পোড়া, এবং পনীরের উপরে যে ময়লা পড়েছে সেটা চেঁচে দেবার গরজও বীবীজানের নেই। আগা আহমদ দিন-মজুর; খিদে পায় বড্ডই।

ব্যাপারটা চরমে পৌঁছালো বিয়ের বিশ বছর পর একদিন যখন আগা আহমদ কি একটা খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করলো, মালিকা খানম নিজের খাবার জন্য লুকিয়ে রেখেছে মুড়মুড়ে রুটি, ভেজা-ভেজা কাবাব, টনটনে সেদ্ধ ডিম এবং তেলতেলে আচার।

সে রাত্রে আগা আহমদ খেলো না। বউ ঝঙ্কার দিয়ে বললো, 'ও আমার লবাব-পুত্তুর রে—রুটি পনীর ওঁয়ার রোচে না। কোথায় পাবো আমি কাবাব আণ্ডা আমার আগাজানের জন্যে—'

সেই কাবাব আণ্ডা! যা বউ নিজে খেয়েছে!

স্থির করলো, ওকে খুন করবে। নতুন করে তালাক দিয়ে লাভ নেই। অন্তত একশোবার দেওয়া হয়ে গিয়েছে।

মালিকা খানম মুখ বেঁকিয়ে আপন কাজে চলে যায়। ওরা থাকে

বনের পাশে—পাড়াপ্রতিবেশীও কেউ নেই যে, মালিকা খানমকে এসে বলবে, 'তোমার স্বামী যখন তোমাকে তালাক দিয়েছে তারপর ওর সঙ্গে সহবাস ব্যভিচার।' আর থাকলেই বা কি হতো? কেউ কি আর সাহস করে আসতো? আগা আহমদের মনে পড়লো গত পনেরো বছরের মধ্যে কেউ তাদের বাড়িতে আসেনি।

শুয়ে শুয়ে সমস্ত রাত ধরে আগা আহমদ প্ল্যান করলো, খুন করা যায় কি প্রকারে।

সকালবেলা বনে গিয়ে খুঁড়লো গভীর একটা গর্ত। তার উপর কঞ্চি কাঠ ফেলে উপরটা সাজিয়ে দিলো লতা-পাতা দিয়ে।

বিকেলের ঝোঁকে বউকে বললো, 'গা-টা ম্যাজ ম্যাজ করছে। একটু বেড়াতে যাবে?'

বউ তো খল-খলিয়ে হাসলো চৌচা দশটি মিনিট। তারপর চেঁচিয়ে উঠলো, 'কোজ্জাবো, মা—মিনষের পেরাণে আবার সোহাগ জেগেছে!'

আগা আহমদ নাছোড়বান্দা। বহু মেহন্নৎ করে গা-গতর পানি করে গর্তটা তৈরি করেছে।

বউ রাজী হলো। বেড়াতে নিয়ে গেল বনে। কৌশলে বউকে স্টিয়ার করে করে গর্তের কাছে নিয়ে গিয়ে দিলো এক মোক্ষম ধাক্কা। তারপর ফের বাঁশ-কঞ্চি লতাপাতা সহযোগে গর্তটি উত্তমরূপে ঢেকে দিয়ে আগা আহমদ তার পীর-মুরশীদকে 'শুক্‌রিয়া' জানাতে-জানাতে বাড়ি ফিরলো।

রান্না করতে গিয়ে বাড়িতে অনেক কিছুই আবিষ্কৃত হলো। হালুয়া, মোরব্বা, তিন রকমের আচার, ইস্তেক উত্তম হরিণের মাংসের শুঁটকি। পরমানন্দে অনেকক্ষণ ধরে আমাদের আগা রান্নাবান্না সেরে আহারাদি সমাপন করলো। ক্যাটক্যাটানি না শুনে আজ তার চোখে নিদ্রা আসবে—এ-কথাটা যতবার ভাবে, ততই তার চিত্তাকাশে পুলকের হিল্লোল জেগে ওঠে।

পরদিন কিন্তু আগা আহমদের শান্ত মনের এক কোণে কালো মেঘ দেখা দিলো। হাজার হোক্—তার বউ তো বটে। তাকে ও-রকম মেরে

ফেলাটা—? বিয়ের সময় হজরৎ মুহম্মদের নামে সে কি শপথ নেয়নি যে, তাকে আজীবন রক্ষণাবেক্ষণ করবে? কিন্তু ও-দিকে আবার সেই দুশ্‌মনটাকে ফের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে তো মন চায় না।

এ অবস্থায় আর পাঁচজন যা করে, আবা আহমদও তাই করলো। 'যাকগে ছাই, গিয়ে দেখেই আসি না, বেটী গর্তের ভেতর আছে কি রকম। সেই দেখে মনস্থির করা যাবে।'

গর্তের মুখের পাতা সরাতেই ভিতর থেকে পরিত্রাহি চিৎকার! 'আল্লার ওয়াস্তে রসুলের ওয়াস্তে আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।' কিন্তু কি আশ্চর্য! এ তো মালিকা খানমের গলা নয়। আরো পাতা সরিয়ে ভালো করে তাকিয়ে আবা আহমদ দেখে—বাপ্‌রে বাপ, এ্যাকড়া কালনাগ, কুলোপানা-চক্কর গোখরো সাপ। সে তখনো চেঁচাচ্ছে, 'বাঁচাও বাঁচাও, আমি তোমাকে হাজার টাকা দেবো, লক্ষ টাকা দেবো, আমি গুপ্তধনের সন্ধান জানি, আমি তোমাকে রাজা করে দেবো।'

সম্বিতে ফিরে আবা আহমদের হাসিও পেলো। সাপকে বললো, 'তা তুমি তো কতো লোকের প্রাণ নির্ভয়ে হরণ করো—নিজের প্রাণটা দিতে অতো ভয় কিসের?'

ঘেন্নার সঙ্গে সাপ বললো, 'ধ্যাত্তর তোর প্রাণ! প্রাণ বাঁচাতে কে কাকে সাধছে! আমাকে বাঁচাও এই দুশ্‌মন শয়তানের হাত থেকে। এই রমণীর হাত থেকে।' তারপর ডুকরে কেঁদে উঠে বললো, 'মা গো মা, সমস্ত রাত কী ক্যাটক্যাটিই না করেছে, কী বকাটাই না দিয়েছে। আমি ত্যাকরা, আমি নিমদে হয়ে একটা অবলা—হাঁ, অবলাই বটে—নারীকে কোনো সাহায্য করছি নে, গর্ত থেকে বেরোবার কোনো পথ খুঁজছি নে, আমি একটা অপদার্থ; ষাঁড়ের গোবর। আমি—'

আবা আহমদ বললো, 'তা ওকে একটা ছোবল দিয়ে খতম করে দিলে না কেন?'

চিল চাঁচানি ছেড়ে সাপ বললো, 'আমি ছোবল মারবো ওকে! ওর

গায়ে যা বিষ, তা দিয়ে সাতলক্ষ কালনাগিনী হতে পারে। ছোবল মারলে সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়তুম না ? সারাতো কোন্ ওঝা ? ওসব পাগলামো রাখো। এখন আমাকে তুমি গর্ত থেকে তোলো'। আমাকে অনেক ধনদৌলত দেবে। পশু-পক্ষী সাপ-বিচ্ছুর বাদ্‌শা সুলেমানের কসম !

রূপকথা নয়, সত্য ঘটনা বলে দেখা গেল, মালিকা খানমেরও অনেকখানি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে—এক রাত্রি সর্পের সঙ্গে সহবাস করার ফলে। কারণ, এতক্ষণ ধরে একটিবারও স্বামীকে কোনো কড়া কথা বলেনি সে। এটা একটা রেকর্ড। কারণ, ফুলশয্যার রাত্রেও নাকি সে মাত্র তিনটি মিনিট চুপ করে থেকেই ক্যাটক্যাটানি শুরু করে দিয়েছিলো।

মালিকা খানম মাথা নিচু করে বললো, 'ওরা গুপ্তধনের সন্ধান জানে।'

আমাদের আগা আহমদের টাকার লোভ ছিলো মারাত্মক। সাপকে সুলেমানের তিন কসম খাইয়ে গর্ত থেকে তুলে নিলো। বউকেও তুলতে হলো—সেও সুধরে গেছে জানিয়ে অনেক কিরে-কসম কেটেছিলো।

সাপ বললো, 'গুপ্তধন আছে উত্তর মেরুতে—বহু দূরের পথ। তার চেয়ে অনেক সহজের পথ তোমাকে বাৎলে দিচ্ছি। শহর কোতোয়ালের মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরবো আমি। কেউ আমাকে ছাড়াবার জন্যে কাছে আসতে গেলেই মেয়েকে মারতে যাবো ছোবল। তুমি আসা মাত্রই আমি সুড়সুড় করে সরে পড়বো—তোমাকে দেবে বিস্তর এনাম, এন্তার ধন-দৌলত। কিন্তু খবরদার, ঐ একবার। অতি লোভ করতে যেয়ো না।'

ভূতের মুখে রাম নাম ?

সাপের দ্বারা ভালো কাম ?

শহরে এমনই তুল-কালাম কাণ্ড যে, তিনদিন যেতে না যেতে সেই বনের প্রান্তে আগা আহমদের কানে পর্যন্ত এসে পৌঁছালো কতোয়াল-নন্দিনীর জীবন-মরণ সমস্যার কথা। তিনদিন ধরে তিনি অচৈতন্য। গলা জড়িয়ে কাল-নাগ ফোঁস-ফোঁস করছে। কোতোয়াল লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। তবু সাপুড়েরাও নাকি কাছে ঘেঁষছে না, বলছে—উনি মা মনসার সাপ।

প্রথমটায় তো আগা আহমদকে কেউ পাত্তাই দেয় না। আরে, ওঝা-বদ্যি হদ্দ হলো, এখন ফার্সী পড়বে আগা? কী বা বেশ, কী বা ছিরি!

কোতোয়ালের কানে, কিন্তু খবর গেল,

বন থেকে এসেছে ওঝা

পেটে এলেম বোঝা বোঝা।

ছবি-চেহারা দেখে তিনিও বিশেষ ভরসা পেলেন না। কিন্তু তখন তিনি শ্মশান চিকিৎসার জন্য তৈরি—সে চিকিৎসা ডোমই করুক, চাঁড়ালও সই।

তারপর যা হওয়ার কথা ছিলো তাই হলো। 'ওঝা' আগা আহমদ ঘরে ঢোকামাত্রই সেই কাল-নাগ কোথা দিয়ে যে বেরিয়ে গেল, কেউ টেরটি পর্যন্ত পেলো না। কোতোয়াল নন্দিনী উঠে বসেছেন, তাঁর মুখে হাসি ফুটেছে। ভীষণ-দর্শন কোতোয়াল সাহেবের চেহারা প্রসন্ন বদান্যতায় মোলায়েম হয়ে গিয়েছে। আগাকে লক্ষ টাকা তো দিলেনই, সঙ্গে-সঙ্গে তাকে করে দিলেন তার বাড়ির পাশের বনের ফরেস্ট্ অফিসার। এইবার আগা দু'বেলা প্রাণ ভরে বাচ্চা হরিণের মাংস খেতে পারবে।

আগা সুখে আছে, সোনাদানা পরে মালিকা খানমও অন্য ভুবনে চরছেন—ক্যাটক্যাট করে কে? তাছাড়া এখন তার বিস্তর দাসী-বাঁদী। ওদের তম্বী-তম্বা করতে-করতেই দিন কেটে যায় তার। কর্তাও বৈঠকখানায় ইয়ার-বক্সী নিয়েই থাকে।

ওমা! একমাস যেতে না-যেতে খবর রটলো, উজীর সাহেবের মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরেছে একটা সাপ। কোন্ সাপ?—সেই সাপটাই হবে, আর কোন্টা?

এবারে দশ লাখ টাকার এনাম, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে পাইক-বরকন্দাজ পেয়াদা-নফর ছুটেছে আগা আহমদের বাড়ির দিকে,

হাতের কাছে ওঝা

সহজ হলো খোঁজা।

কিন্তু আগা আহমদের বিলক্ষণ স্মরণে ছিলো, কাল-নাগ খবরদার করে দিয়েছে, অতি লোভ ভালো না—সাপ সরাতে একবারের বেশি যেন না যায়। সে যতই অমত জানায়, ইয়ার-বক্সী ততই বলে, হুজুরের কী কপাল! বাপ-মার আশীর্বাদ না থাকলে এমন ধারা কখনো হয়।'

আগাকে জোর করে পাল্কিতে তুলে দেওয়া হলো।

এবারে সাপ জ্বলজ্বল্ করে তার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোমার খাঁই বড্ড বেড়েছে—না? তোমাকে না পইপই করে বারণ করেছিলুম, একবারের বেশি আসবে না। তবু যে এসেছো? তা সে যাক্‌গে—তুমি আমার উপকার করেছো বলে তোমাকে এবারের মতো ছেড়ে দিলুম। কিন্তু এই শেষবার। আর যদি আসো, তবে তোমাকে মারবো ছোবল। তিন সত্যি।'

দশ লাখ টাকা এবং তার সঙ্গে পাঁচশো ঘোড়ার মনসব পেয়েও নওয়াব আগা আহমদ দিল-জান সাহারার মতো শুকিয়ে গিয়েছে। মুখ দিয়ে জল নামে না, পেটে রুটি সয় না। কাল-নাগ আবার কখন কোথায় কি করে বসে আর ছোবল খেয়ে মরে। স্থির করলো, ভিন্ দেশে পালাবে।

ঠিক সেই দিনই স্বয়ং কোতোয়াল সাহেব এসে উপস্থিত। বিস্তর আদর-আপ্যায়ন, হস্তচুম্বন-কণ্ঠালিঙ্গন। কোতোয়াল সাহেব গদগদ কণ্ঠে বললেন, 'ভাই নওয়াব সাহেব, তোমার কী কপাল! তামাম দেশের চোখের মণি, দিলের রোশনী রাজকুমারীর প্রাণ উদ্ধার করে তুমি হয়ে যাবে দেশের মাথার মুকুট। চলো শিগ্‌গির! সেই হারামজাদা কাল-নাগ এবার জড়িয়ে ধরেছে শাহাজাদীর গলা।'

নওয়াব আগা আহমদ জড়িয়ে ধরলো কোতোয়ালের পা। হাউ-হাউ করে কেঁদে নিবেদন করলো সে কোন্ ফাটা বাঁশের মধ্যিখানে পড়েছে।

কোতোয়ালের হৃদয় মাখন দিয়ে গড়া থাকে না। ব্যাপারটা বুঝে নিতেই শহর-দারোগাকে হুকুম দিলেন, 'চিড়িয়া বন্ধ করো পিঞ্জরামে।'

পাল্কিতে নওয়াব আগা আহমদ। দু'পাশের লোক তার জয়ধ্বনি

জিন্দাবাদ করছে। এক ঝারোকা থেকে কোতোয়ালনন্দিনী, অন্য ঝারোকা থেকে উজীর-জাদী তাঞ্জামের উপর পুষ্পমাল্য বর্ষণ করলেন।

আগা আহমদ মুদ্রিত নয়নে মুর্শীদমৌলার নাম আর ইষ্টমন্ত্র জপছে।

স্বয়ং বাদ্‌শা তাকে হাতে ধরে রাজকুমারীর দোরের কাছে নিয়ে এলেন।

আগা আহমদ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো।

কাল-নাগ হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, 'আবার এসেছিস, হতভাগা? এবারে আর আমার কথার নড়চড় হবে না। তোর ছুই চোখে ছুই ছোবল মেরে ঢেলে দেবো আমার কুল্লে বিষ।'

আগা আহমদ অতি বিনীত কণ্ঠে বললো, 'আমি টাকার লোভে আসিনি। তুমি আমাকে অগুণতি দৌলত দিয়েছো। তুমি আমার অনেক উপকার করেছো, তাই তোমার একটা উপকার করতে এলুম। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, শুনলুম, তুমি এখানে। ওদিকে সকালবেলা বীবী মালিকা খানম আমাকে বলছিলেন তিনি রাজকন্যাকে সেলাম করতে আসছেন। বোধহয় এক্ষুণি এসে পড়বেন। তুমি তো ওঁকে চেনো—হেঁ, হেঁ—তাই ভাবলুম, তোমাকে খবরটা দিয়ে উপকারটাই না কেন করি—তুমি আমার—'

'বাপ রে, মারে' চিৎকার শোনা গেল! কোন্ দিক দিয়ে যে কাল-নাগ অদৃশ্য হলো আগা আহমদ পর্যন্ত বুঝতে পারলো না।

এরপর আগা আহমদ শান্তিতেই জীবন যাপন করেছিলো।

গল্পটি নানা দেশে নানা ছলে, নানা রূপে প্রচলিত আছে। আমি শুনেছিলুম এক ইরানী সওদাগরের কাছ থেকে, সরাইএর চারপাঈ-তে শুয়ে-শুয়ে।

কাহিনী শেষ করে সওদাগর সুধোলেন, 'গল্পটার 'মরাল' কি, বলো তো?'

বললুম, 'সে তো সোজা। রমনী যে কি খাণ্ডারী হতে পারে তারই উদাহরণ। এ-ছুনিয়ার নানা ঋষি নানা মুনি তো এই কীর্তনই গেয়ে গেছেন।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সওদাগর বললেন, 'তা তো বটেই। কিন্তু জানো, ইরানী গল্পে অনেক সময় দুটো করে 'মরাল' থাকে। এই যে-রকম হাতির দু'জোড়া দাঁত থাকে। একটা দেখবার, একটা চিবোবার। দেখবার 'মরাল'টা তুমি ঠিকই দেখেছো। অন্য 'মরাল'টা গভীর :—খল যদি বাধ্য হয়ে, কিংবা যে-কোনো কারণেই হোক, তোমার উপকার করে তবে সে উপকার কদাচ গ্রহণ করবে না। কারণ, খল তার পরই চেষ্টায় লেগে যাবে, তোমাকে ধনে-প্রাণে বিনাশ করবার জন্যে, যাতে করে তুমি সেই উপকারটি উপভোগ না করতে পারো।

'অবশ্য তোমার বাড়িতে যদি মালিকা খানমের মতো বিষ থাকে তবে অন্য কথা।'

কিন্তু প্রশ্ন, ক'জনার আর আছে ও-রকম বউ ?

অলোকদৃষ্টি

সতীনাথ ভাদুড়ী

'কে ? বড়ো খোকা ?' কথাগুলো জড়ানো-জড়ানো।

কেউ সাড়া দিলো না।

'দরজার আড়ালে কে তুই ? সাড়া দিচ্ছিস না যে ? জিলিপির গন্ধ পাচ্ছি। নিশ্চয়ই তুই···কি যেন তোর নাম ?'

ঠাকুরমাকে চটাতে খুব ভালো লাগে অজয়ের। যতক্ষণ তার নাম না ডাকছেন, ততক্ষণ সে কিছুতেই উত্তর দেবে না।

'এই জিলিপিখেগো ! কথা কানে যাচ্ছে না ? কি নাম যেন তোর ? কিছুতেই মনে থাকে না তোর নামটা।'

অজয়ের মা চেচাঁলেন ওঘর থেকে, 'হচ্ছে কি অজয় ! তোর ঠাকুমা কি বলছেন, শুনতে পাচ্ছিস না ? দিন-দিন বেয়াড়া হয়ে উঠছে !'

'অজয়, অজয়। এই দেখ, মনে পড়লো এতক্ষণে। কেবল ভুলে যাই। পুরোনো কালের নাম-ধাম সব কথা মনে থাকে, তথচ আজকালকার কথা ভুলে যাই। হ্যাঁ রে, কিসের জিলিপি ? ত্রিকূটের নাকি ? ত্রিকূট কাকে বলে জানিস তো ? পানিফলের আটা দিয়ে যে জিলিপি তয়ের করা হয়, তাকে বলে ত্রিকূটের জিলিপি।'

'এর চেয়ে আমাদের ওখানকার অমৃতি খেতে অনেক ভালো।'

'বললেই হলো আর কি ? ত্রিকূটের জিলিপিরা গন্ধই আলাদা। আমার ভালো লাগে গন্ধটা। হ্যাঁ রে, এই সকালে জিলিপি ভাজছে কে ?'

'মা।'

'একটুখানি ভেঙে আমার সামনের জানলায় রাখ্ তো।'

'না, মা বকবে তোমার ঘরে এঁটো জিলিপি নিয়ে গেলে।'

'তোর মা বড়ো, না ঠাকুরমা বড়ো? তোর বাবাকে আমি পেটে ধরেছি, বুঝলি! আর আজ তুইও আমাকে হেনস্তা করিস। সবই আমার কপাল! বেশিদিন বাঁচলে এ-ই হয়। মরতে তো আমি চাই। মরবার জন্যেই তো তিরিশ বছর আগে কাশীতে এসেছিলাম। কিন্তু মরণ আমার হয় কই....।'

মরবার কথা একবার আরম্ভ হলে ঠাকুরমা থামতে জানে না। এ এখন চলবে বহুক্ষণ; তাই অজয় সেখান থেকে উঠে পালালো।

'ওরে, বড়ো খোকা উঠেছে?'

কথার কেউ উত্তর না দেওয়ায় বৃদ্ধা মোটা কাঁচের চশমাটা ঠিক করে নিয়ে একবার তাকিয়ে দেখলেন সেদিকে। পালিয়েছে ছোঁড়াটা।

'কি বলছেন, মা?'

ছোটো বউমা এসে দাঁড়িয়েছেন দোড়গড়ায়।

'বড়ো খোকা কোথায়?'

'বঠ্ঠাকুর এখনও ওঠেননি। তাঁকে ডেকে দিতে বলবো?'

'এখনও ওঠেনি? আমার গঙ্গাজলের ঘড়ার কাছে রোদ এসে পড়েছে; এখনও ওঠেনি? চিরকাল একই রকম থেকে গেল ছেলেটা! স্বভাব যায় না মলে, ইল্লত যায় না ধুলে।'

'বঠ্ঠাকুরকে ডেকে দিতে বলবো নাকি?'

'না না, দেখি কতক্ষণ ঘুমোতে পারে!'

'কিছু বলবেন, মা?'

'তোমাকে? না তোমাকে কি জন্যে বলতে যাবো? নিজের পেটের ছেলেদের কাছেই বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছি; তার আবার তোমরা! আর এখন মায়ের কদর নেই। বিয়ে ফুরোলে ছাঁদনায় লাথি, এ হয়েছে তাই। মায়ের কাজ ফুরিয়েছে। যেতে তো চাই; কিন্তু যমে যে নেয় না। কতো লোক দেখি কাশীতে এলো আর চোখ বুজলো। কতো যাত্রী দেখি এখানে —কলেরায় মরে, মায়ের কৃপায় মরে, গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে ডুবে মরে, আরতির ভিড়ে পিষে মরে, কিন্তু সে কপাল নিয়ে তো আমি আসিনি কাশীতে। তোমরাও চাও আমি যাই; আমারও আর বাঁচবার সাধ নেই

একদিনের জন্যেও। কিন্তু যমে ফিরে তাকালে তবে তো! ওকি ছোটো বউমা, চলে যাচ্ছো? শোনো। ছোটো খোকার চা খাওয়া হয়েছে?'

'এখনও ফেরেননি।'

'এখনও ফেরেনি! দেরি করে বেরিয়েছিলো নাকি আজ?'

'না।'

'তবে? তাহলে নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। কিছু বলে যায়নি?'

'না, বাড়ি থেকে বার হবার সময় আমি দেখিনি।'

'তা দেখবে কেন! কোন্ রাজকার্য করছিলেন তখন? তোমার ওই ছেলেটাকে বলো, একবার গলিতে বেরিয়ে দেখুক। বামুনঠাকরুণও যাক না একবার একটু খোঁজ নিতে।'

'বামুনঠাকরুণ স্নান করে এখনও ফেরেনি।'

'এখনও ফেরেনি? আমার গঙ্গাজলের ঘড়ার ওপর রোদ্দ্‌ুর পড়েছে, এখনও তার ঘাট থেকে ফেরার সময় হলো না! তোমরা দুই জায়ে রান্নাঘরে ঢোকো বলে সে মাগী হাত-পা এলিয়ে দিয়েছে। দাঁড়াও, ফিরতে দাও; ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দেবো আজ! কাজের সময় ডাকলে যে মানুষকে পাওয়া যায় না, তাকে মাইনে দিয়ে রাখবো কেন? আমি পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে ঘরের মধ্যে পড়ে রয়েছি, কাশীতে থাকতে গেলে ওর ওপর নির্ভর করতেই হবে। তাই এতো বাড়! ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি? এখানেই তো ঘাট! এখান থেকে যেতে-আসতে কতক্ষণ সময় লাগে? আমি নিজে আজ চার বছরের মধ্যে গঙ্গাস্নান করিনি, আর বামুনঠাকরুণ গঙ্গাস্নান করে দু'বেলা। কপাল! যে যেমন কপাল নিয়ে এসেছে! নইলে আমি না মরে এমনভাবে অপারক হয়ে পড়ে থাকবো কেন? দু'বার তো অসুখে মরবো-মরবো হয়েছিলাম। কিন্তু মরণ কপালে থাকে, তবে তো। দু'বারই বড়ো-খোকা, ছোটো-খোকা ছুটি নিয়ে এসেছিলো, তাদের বউ-ছেলেপিলেদের সঙ্গে নিয়ে। দু'বারই তাদের হতাশ করে, অসুখ থেকে সেরে উঠেছিলাম। মুখ চুন করে তারা ফিরে গিয়েছিলো, কাশী থেকে। স্বামী স্বর্গে গেছেন ষাট বছর আগে। এই ষাট বছর ধরে আমি বেঁচে রয়েছি—শুধু ছেলে-বউদের জ্বালাতন করবার জন্যে। মরণ

তো কারও হাত-ধরা নয়। ইচ্ছা-মৃত্যু হয় শুধু সাধু সন্যাসীদের। আমি বেঁচে আছি কেবল সকলের অভিসম্পাত কুড়োবার জন্যে!'

বৃদ্ধা হাউ-হাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। বিধবা হবার পর, কতো কষ্ট করে বড়ো-খোকা আর ছোটো-খোকাকে মানুষ করেছিলেন। ছেলেরাও চিরদিন মা বলতে পাগল। বউরাও ভালো, কাশীতে আসবার আগে কয়েক বছর তাদের নিয়ে ঘর করেছিলেন তো; ভালো করেই জানেন তাদের। তবে কেন এমন হলো? এমনভাবে বেঁচে থাকবার চাইতে মরে যাওয়া সহস্রগুণে ভালো!....

ছোটো বউমা কখন সেখানে থেকে চলে গিয়েছেন, সে-কথা তাঁর খেয়াল নেই। তিনি আপন মনে বকে চলেছেন।

বউমারা কেউ শাশুড়ির কথার প্রতিবাদ করেন না। তিনি যা মুখে আসে বলে যান; কিন্তু কেউ সে-কথা গায়ে মাখেন না। সকলে ভাবে, কী মানুষ ছিলেন—আর কী হয়েছেন আজ! ব্যারামে ভুগে ভুগে ইদানীং মাথায়ও একটু ছিট হয়েছে। বিশ্বাস করতে পারেন না কাউকে। যাদের সব চেয়ে বেশি ভালোবাসেন তাদেরই উপর অবিশ্বাস সব চেয়ে বেশি।

'ও কী! কিসের শব্দ? বড়ো বউমা!'

'কি বলছেন, মা?'

'কিছু পড়লো-টড়লো নাকি, তোমার ঘরে?'

'না, ও কিছু না।'

'কিছু না আবার কি। শব্দ শুনলাম, তবু বলবে কিছু না! হলেই বা তুমি বাড়ির গিন্নী, আমাকে বললে কি সংসারের গোপন কথা ফাঁস হয়ে যাবে? এখনও আমি মরিনি, বুঝলে। মরতে পারলেই তো বাঁচতাম, কিন্তু যমের অরুচি যে আমি।....'

আরম্ভ হয়ে গেল তাঁর বকুনি।

বাক্সর ডালা পড়বার শব্দতে বড়ো-খোকারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো। এই সাত-সকালে বাক্স গোছাবার কী দরকার পড়েছিলো? মা'র একটানা বকুনির আওয়াজ কানে আসছে। ও-ঘরে যাবার আগে একবার চোখে-মুখে জল দিয়ে নেওয়া দরকার। নইলে মা বিরক্ত হন।

'কে রে? ছোটো-খোকা?'

'হ্যাঁ।'

ছোটো-খোকা এসে দাঁড়ালেন দোরগোড়ায়। মাথার চুল পাকা। দাড়ি-গোঁফ কামানো?

'বেড়িয়ে ফিরছিস? এতো দেরি হলো কেন রে, আজ? রাস্তায় চা-বিস্কুট হেঁকে যাবার আগে থেকে আমি উঠে বসে আছি, তুই কখন বেরিয়ে গেলি বুঝতে পারলাম না তো। হাত-পা ধুয়েছিস? হাতে ও কি রে? কি কিনে আনলি!'

জবাব না দিয়ে উপায় নেই।

'কাঠের খেলনা।'

'খেলনা কি হবে?'

'নাতনীর জন্যে কিনে রাখলাম।'

বড়ো বউমা ডাকলেন ও-ঘর থেকে, 'ঠাকুরপো, চা খেয়ে যাও।'

'আসছি।'

আর এক মুহূর্তও দেরি না করে ছোটো খোকা চলে গেলেন সেখান থেকে।

মা বোঝেন যে, কেউ তাঁর সঙ্গে দরকারের বেশি কথা বলতে চায় না আজকাল। সময়ের অভাব নেই কারও; তবু তাদের কথা বলবার গরজ নেই। রাগও হয়, দুঃখও হয়। ছোটো বউমা, বড়ো বউমা দিনে দু'বার করে তাঁর গায়ে মহামাষ তেল মালিশ করে দেয়। সে সময় দুটো কথাও তো বলতে পারে। কিন্তু বলবে কেন? আমি যে মরে গিয়েছি! ঘাটের মড়ার সঙ্গে কেউ কথা বলে?

বড়ো-খোকা এসে ঘরে ঢুকলেন। সৌম্য চেহারা, গোঁফ-দাড়ি সাদা।

'মা, রাত্রিতে ভালো ঘুম হয়েছিলো?'

'ঘুম হলেই বা কি, না হলেই বা কি?'

'জপ সারা হয়েছে তো?'

'জপতপ সব চুলোর দুয়ারে গিয়েছে।'

'করলে মন ভালো থাকে।'

'সে কি আর আমি জানি না। ও-কথা তুই শেখাবি আমাকে? তুই আমার পেটে হয়েছিস, না আমি তোর পেটে হয়েছি? কাশীতে আসবার পর পঁচিশ বছর তো বেশ পূজো-আর্চা নিয়ে কাটিয়েছিলাম। ভাগবত, কথকতা, যাগ-যজ্ঞ, গঙ্গার ঘাটের ভজন-কীর্তন, কোথায় না আমি যেতাম নিত্য। এই প্রমীলা ঠাকরুণ না থাকলে, এখানকার যে-কোনো ধর্মকর্মের আসন খালি-খালি লাগতো পাড়ার লোকের। কীর্তনীয়া আমার চোখে জল দেখলে, তবে তার গাওয়া সার্থক মনে করতো। কাশীবাস করতে এসে নতুন লোকরা প্রথম এই প্রমীলা ঠাকরুণের কাছেই সলাপরামর্শ নিতে আসতো। কোন্ পাণ্ডা বদ, কোথাকার ঠাকুর ভালো, কোন্ মহিলার দলের সঙ্গে বদ্রিকাশ্রম যাওয়া নিরাপদ, কোন্ সত্রে কি খেতে দেয়, এ-সব খবর জানবার জন্যে মেয়েরা চার বছর আগে পর্যন্ত আমার কাছেই ছুটে আসতো। এখন আর কেউ এই ঘাটের-মড়ার ছায়াও মাড়ায় না! কী ছিলাম, আর কী হয়েছি! বাবা বিশ্বনাথের কাছে আমি দিন-রাত্রি বলি—আমার প্রাণটা তাড়াতাড়ি বার করে দাও, ঠাকুর; আর কিছু চাই না তোমার কাছে! কিন্তু সে-কথা তাঁর কানে যাচ্ছে? কেন আমাকে বাঁচিয়ে রেখে এ শাস্তি দিচ্ছেন, তিনিই জানেন।'

'মা মাথায় একটু মধ্যমনারায়ণ তেল দিয়ে দিই?'

'দে, তোর মতো করে দিতে কেউ পারে না। ছোটো-খোকাও না, বউমারাও না। তেল দিতে-দিতে আরামে একেবারে চোখ বুজে আসে।'

বোজা চোখ খুলতে হলো পায়ের শব্দ পেয়ে।

'কে, বামুনঠাকরুণ?'

ধরা পড়ে গেল বামুনঠাকরুণ।

'হ্যাঁ।'

'চৌকাঠে রোদ এসে গেল; এতো বেলা হলো স্নান করে ফিরতে? হাতে ও কী?'

'বাজার থেকে জিনিস কিনে নিয়ে এলাম।'

'জিনিসটা কী সেই কথাই তো জিগ্যেস করছি!'

বড়ো-খোকা তখন পিছন থেকে ইশারা করছেন বামুনঠাকরুণকে চলে যেতে।

'একটু জর্দা আর পাথরের বাটি গোটাকয়েক।'

'ছোটো বউমার বুঝি? পাথরের বাটি আবার কেন?'

বামুনঠাকরুণ কোনো উত্তর না দিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

'বামুনঠাকরুণ পর্যন্ত আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় না পারতপক্ষে। বেঁচে থাকতেই এই খোয়ার! মরলে পরে শ্মশানঘাটে না নিয়ে গিয়ে, পথের ওপর টেনে ফেলে দেবে নিশ্চয়। তাতে ক্ষতি নেই। মরবার পর যা ইচ্ছা হয়, তাই করো তোমরা; কিন্তু মরবার আগে যেন আমাকে ব্যাস-কাশীতে নিয়ে গিয়ে ফেলো না! তা হলেই ষোলোকলা পূর্ণ হয়! শত্রু, শত্রু! দুধ-কলা দিয়ে যাদের পুষেছেন, তারাই এখন উলটে ছোবল মারতে আসে! এ বাঁচা কি আর বাঁচা! কিন্তু এ বেড়ালের প্রাণ যায় কই? বেঁচে, বেঁচে একেবারে ঘেন্না ধরে গেল নিজের ওপর। কাশীতে বাস করে চার বছরের মধ্যে একদিন গঙ্গাস্নান করিনি?.......'

'মা, গঙ্গাস্নান করতে যাবে?'

'দেখ্, বড়ো-খোকা, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে আর দিসনি। ঠাট্টা করছিস আমার সঙ্গে?'

'ঠাট্টা কেন হতে যাবে। সত্যি বলছি।'

'আমি নড়ে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতে পারি না, আমি যাবো গঙ্গাস্নান করতে! সে যাবো একেবারে—তোদের কাঁধে চড়ে মনিকর্ণিকা ঘাটে! কিন্তু সেদিন আসছে কোথায়! যমের দয়া হয়, তবে তো।'

'আমি নিয়ে যাবো তোমাকে, গঙ্গাস্নান করাতে।'

'কাঁধে করে?'

'সে যেমন করেই হোক না; তোমার তা দিয়ে কি দরকার, তোমার তো স্নান করা নিয়ে কথা।....ছোটো-খোকা!'

'কি বলছো, দাদা?'

'মাকে একবার গঙ্গাস্নান করিয়ে আনতে হবে। রিকশায় সুবিধে হবে না, তুই কি বলিস?'

'মা কি পারবে ? ডুলি, পাল্কী যে আজকাল উঠে গিয়েছে।'

বামুনঠাকরুণ রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বললো যে, 'ওই মন্দিরে সামনে ডুলি, পাল্কী এখনও ভাড়া পাওয়া যায়।'

সাড়া পড়ে গেল বাড়িতে। মা গঙ্গাস্নানে যাবেন ; যতো বেশি লোক সঙ্গে থাকে ততই ভালো। বড়োবউ, ছোটোবউ সবাইকে যেতে হবে। গঙ্গাস্নানের নামে মা-ও বেশ উত্তেজিত হয়েছিলেন। অনর্গল অবান্তর কথা বলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন পাল্কী এসেছে শুনে।

তাঁর এই বাকসংযমে সকলে আশ্চর্য হলো। চোখ-মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, তাঁর সব উৎসাহ মিইয়ে গিয়েছে, হঠাৎ কি যেন মনে পড়ায়। বোধহয় যেতে অনিচ্ছা, কিন্তু এ বোধটুকু এখনও আছে যে, পুণ্য সঞ্চয় করতে রাজী না হওয়াটা দেখাবে অত্যন্ত খারাপ।

ছোটো-খোকা মা'র চোখ থেকে চশমাটী খুলে নিজের কাছে রাখলেন। কোলপাঁজা করে তুলে তাঁকে পাল্কিতে শোয়ানো হলো। চোখ বুজে পড়ে থাকলেন তিনি।

'এই যে, নমস্কার।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নমস্কার। আমরা বড়ো ব্যস্ত এখন। দেখছেন তো মাকে গঙ্গাস্নান করাতে নিয়ে যাচ্ছি।'

এমন সময়ে সব আসে! সকলে বিরক্ত হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছেন।

বাড়িওয়ালা বললেন, 'এঁদের নিয়ে এসেছিলাম ঘর দেখাবার জন্যে।'

ছোটো-খোকা বললেন, 'আর সময় পেলেন না ?'

বড়ো-খোকা ওষ্ঠের উপর তর্জনী রেখে সকলকে সঙ্কেত করলেন চুপ করবার জন্য।

বাড়িওয়ালা নাছোড়বান্দা। তিনি বড়ো-খোকাকে গলির মধ্যে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'আজকেই যাওয়া ঠিক তো ?'

যাতে ওঁদের কথাবার্তা মায়ের কানে না যায়, সেইজন্য ছোট-খোকা পাল্কী-বেহারাদের সঙ্গে জোরে-জোরে গল্প আরম্ভ করে দিয়েছেন। দুই-জায়েও নিজেদের মধ্যে গল্প করছেন কোন্ ঘাটে স্নানের সুবিধা হবে, সেই সম্বন্ধে।

বড়ো-খোকা অনুচ্চ স্বরে বাড়িওয়ালাকে জানালেন যে, আজই তাঁদের যাবার ইচ্ছা ; তবে এখনও সঠিক বলা যায় না। এই অনিশ্চয়তার জন্যই পুরো মাসের ভাড়া আগাম দেওয়া হয়েছে।

ঘড়েল বাড়িওয়ালা অপ্রস্তুতের একশেষ হবার ভাব দেখালেন : 'না না, ভাববেন না যে, আমার তর্ সইছে না। বাড়ি খালি করাবার জন্যে তাগিদ দিতে আমি আসিনি। আমি এসেছিলাম প্রমীলা ঠাকরুণের সঙ্গে একবার দেখা করবার জন্যে। এতকালের ভাড়াটে, আমাদের।'

'না না, মা'র সঙ্গে এখন দেখা হবে না। ওঁর শরীরের কথা জানেনই তো।'

একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেলেন বাড়িওয়ালা।

'কোন্ ঘাটে স্নান করবে, মা ?'

মা নীরব।

'অহল্যাবাঈ ঘাটে ?'

বৃদ্ধা নিরুত্তর।

'তবে দশাশ্বমেধে যাই ?'

কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। চোখ বুজে শুয়ে রয়েছেন তিনি। ভয়ে মুখ বিবর্ণ হয়েঁ গিয়েছে।

সকলে এ-ওর দিকে তাকালেন। চোখে প্রশ্ন। মা কেন এমনভাবে দাঁতে দাঁত চেপে কাঠের তক্তার মতো পড়ে রয়েছেন ?

দশাশ্বমেধ ঘাটের সিঁড়ির উপর একেবারে জলের কাছে তাঁকে পাল্কী থেকে বার করা হলো। ভয়ে ঠকঠক্ করে কাঁপছেন তখন তিনি। আর পুত্রবধূরা মিলে তাঁকে ধরলেন জলে নামাবার জন্য।

এতক্ষণে বৃদ্ধা কথা বলেছেন।

'তোমরা সব সরে যাও! তোমাদের স্নান করিয়েঁ দেবার দরকার নেই। স্নান করিয়ে দেবে, যাঁরা পাল্কী বয়ে এনেছে, তাঁরা।'

বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি ছেলেদের।

ছেলে আর বউরা একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

স্নানপর্ব কোনো-রকমে শেষ হলো।

বাড়িতে ফিরে, বৃদ্ধাকে সবে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছে, অজয় এসে খবর দিলো জ্যাঠামশাইকে দু'জন ভদ্রলোক বাইরে ডাকছেন।

নাছোড়বান্দা বাড়িওয়ালা আবার এসেছেন একজন হবু-ভাড়াটেকে সঙ্গে করে।

'আবার কি?'

'এই ইনি······'

'একটু আস্তে কথা বলুন।'

'ইনি ছাড়লেন না কিছুতেই। আমি বলছি যে, আপনারা এক মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে রেখেছেন; আজ চলে যাবেন কিনা সে-কথা জিগ্যেস করবার আমার কোনই অধিকার নেই। তবু ইনি শুনবেন না কিছুতেই। আচ্ছা, আজ যাওয়া কি সত্যিই অনিশ্চিত; না আমি এঁদের কথা দিতে পারি?'

'বিশ্বাস করুন আমাদের কথা; আমরা চাই যেতে; কিন্তু হবে কিনা বলতে পারি না। এই অনিশ্চয়তার ওপর আমাদের কোনো হাত নেই। এর কারণ অপনাকে বলবার মতো নয়। বললেও সে-কথা আপনার ওই হিসেবে-ভরা মাথায় প্রবেশ করবে না। সেইজন্যে হাতজোড় করে বলছি যে, আর জ্বালাতন করতে আসবেন না আমাদের!'

দড়াম্ করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে, বড়ো-খোকা বাড়ির ভিতর ঢুকে গেলেন।

'কে এসেছিলো রে, বড়ো-খোকা?'

'ওরাই দু'জন আবার এসেছিলো।'

'কারা?'

আর মিথ্যা না বলে উপায় নেই।

'পাল্কী-বেহারা।'

'কেন?'

'একটা আধুলি বদলে নিয়ে গেল। মা, এবার তোমার খাওয়ার সময় হয়ে গেল।'

'এখনই?'

'স্নানের পর তো তুমি না খেয়ে থাকতে পারো না আজকাল।'

'কে বললো, পারি না? বউমারা লাগিয়েছে বুঝি?'

'না না, বউমারা কেন লাগাবে।'

বৃদ্ধার খাওয়ার উপর লোভ ষোলো আনা; কিন্তু খেতে ভয় পান। বিশ্বাস হয় না বাড়ির লোকদের। ত্রিকূটের জিলিপি ভাজবার গন্ধ তাঁর নাকে আসছে। বুঝতে পারছেন তাঁরই জন্য ভাজা হচ্ছে। এইটাই তাঁর সব চেয়ে প্রিয় খাবার; কিন্তু আজকাল দাঁত না থাকায় চুষে চুষে খেতে হয়।

এখনও ঠাকুরকে উৎসর্গ না করে মা কিছু খান না। তাই সব জিনিস তাঁকে সাজিয়ে দিতে হয়; বারে বারে দেবার উপায় নেই।

মাকে খেতে দেওয়া হলো।

এরপর কি ঘটবে সে-কথা সকলের জানা।

আজকাল দু'বেলা এই কাণ্ড হয় খাওয়ার সময়।

বড়ো-খোকা, ছোটো-খোকা, বড়োবউ, ছোটোবউ—সবাই এসে দাঁড়িয়েছেন।

'বড়ো-খোকা, ছোটো-খোকা—তোরা তো খেলি না?'

'তুমি খেয়ে নাও আগে; তোমার শরীর খারাপ।'

'তোদের না খাইয়ে কি আমি খেতে পারি? অন্তত একটু-একটু খা।'

এর ব্যথা বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ করবার নয়। বাতিক আর পাগলামি বলে মা'র এই আচরণের ব্যাখ্যা করা যায় বটে; কিন্তু কথাটা বুকে বাজে ছেলেদের। সেই মা। এখনও সেই রকমই ভালোবাসে ছেলেদের। তবু নিজেদের খাবার থেকে ছেলেদের একটু-একটু খাইয়ে, আগে পরীক্ষা করে নিতে চান, খাবারে ওরা বিষ মিশিয়ে দিয়েছে কি না। তিনি যে ওদের বোঝা!

এই ব্যথা ছেলেদের গা-সওয়া হয়ে এসেছে। মায়ের জন্য অনেক রুটিন-বাঁধা কাজ করতে হয় প্রত্যহ। তার মধ্যে এটাও একটা।

কিন্তু আজ ব্যাপারটা আর একটু আলাদা। অষ্টপ্রহর যিনি যমের দুয়ারে মাথা কোটেন, খাবার সময় কেন তিনি মৃত্যু-ভয়ে পাগল, শাশুড়ির

আচরণের এই অসঙ্গতি নিত্য বউদের হাসির খোরাক জোটাতো। আজ তারা গম্ভীর। সাহস নেই শাশুড়ির ঘোলাটে চোখ দুটোর দিকে তাকাবার।

বড়ো-খোকা, ছোটো-খোকা দু'জনেই চাকরি থেকে পেন্‌সন্‌ নিয়েছেন। ছেলে-মেয়ে অনেক। কাশীতে একটা, আর বাড়িতে একটা, দু'জায়গায় দুটো সংসার চালিয়ে যাবার মতো আর্থিক সঙ্গতি আর তাঁদের এখন নেই। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাকে কাশী থেকে নিয়ে যাবার মনস্থ করেছেন তাঁরা।

'বড়োবউমা, পাথরের বাটি দুটো এনেছো? দাও। এদিকে নিয়ে এসো। সব জিনিস একটু-একটু করে দিই তোমাদের। বড়ো-খোকা, ছোটো-খোকা—তোরা খা!'

বড়ো-খোকা, ছোটো-খোকা দু'জনই তাকিয়ে মেঝের দিকে। আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দুই বউ। চারজনের মুখ-চোখেই একটা সন্ত্রস্ত, উদ্বেগবিহ্বল ভাব।

অপরাধ-চেতনার ক্ষীণদীপিকায় একটা জিনিস অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারছেন তাঁরা। যেটাকে নিছক পাগলামি বলে মনে হতো, তার মধ্যে সত্যের এক কণা লুকোনো ছিলো! পাগলামি নয়, অলোকদৃষ্টি।

ঘুমন্ত অবস্থায় ছাড়া, মাকে কাশী থেকে সরানো সম্ভব নয়। আজকের খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।

'খা! খেয়ে নে তাড়াতাড়ি!'

আচার্যিদের বউ

প্রবোধকুমার সান্যাল

ভূমিকা ফেঁদে আচার্য মহাশয়ের পরিবারের পরিচয় দেবার কিছু দরকার নেই। কিন্তু এ-কথা যদি বলি, নাস্তিত্ববাদ, অশ্রদ্ধা আর সংশয়ের এই যুগে এমন একটি পরিবার অভিনব, তাহলে অনেকেই হয়তো অবাক হবেন। মানুষ আজ আত্মরচিত বিজ্ঞান-সভ্যতায় উৎপীড়িত হচ্ছে, নিজের সৃষ্টি-করা মারণাস্ত্রের ভয়ে মাটির তলায় গিয়ে প্রবেশ করছে। অশান্ত জীবনের স্বস্তি ছিলো শূন্যময় ঈশ্বর; কিন্তু সেখানেও অসংখ্য যন্ত্র-শকুনের পাল ঈশ্বরকে ডানা দিয়ে ঢেকে মানুষকে মারছে তাণ্ডব-দাহনে! মেঘলোক থেকে বিদ্যুৎকে ছিনিয়ে যে-সভ্যতার আলো সে জ্বালিয়েছিলো ঘরে-ঘরে, দেশ-দেশান্তরে—সেই আলো প্রাণভয়ে নিবিয়ে সে ঢুকলো সুড়ঙ্গপথে। বিশ্ববিধানের ভার যাদের হাতে, আত্মদলনে আর আত্মাবমাননায় তারা মুমূর্ষু। এই অশান্ত জীবনে যদি কোনো ব্যতিক্রম দেখি, চমকে উঠি।

জানি, আচার্য পরিবারের আলোচনায় এ-কথার দাম নেই, তবু এই বিংশ শতাব্দীর বিষে জর্জরিত কলকাতা নগরের ঠিক মাঝখানে এমন একটি নিরুদ্বিগ্ন সম্ভ্রান্ত পরিবার বিস্ময়ের বিষয় বই কি! বাংলার একটি অতি প্রাচীন গুরুবংশের ধারা তাঁরা বজায় রেখে চলেছেন—যেমন ভগীরথ শাঁখ বাজিয়ে যান গঙ্গার আগে-আগে ঊষর জনপদ আর প্রান্তর পেরিয়ে। পৃথিবী প্রগতিশীল এ-সংবাদ তাঁদের জানা নেই; সংস্কৃত ছাড়া আর কোনো ঐশ্বর্যশালিনী ভাষা আছে, এ তাঁরা বিশ্বাস করেন না। আশ্চর্য বই কি! সকাল-সন্ধ্যা পূজাপাঠ, গঙ্গাস্নান, বেদমন্ত্রধ্বনি, আরতি, নারায়ণসেবা, পৌরাণিক আলোচনা—এ পরিবারের এইটিই নিত্যকর্ম বংশানুক্রমায়। এর মধ্যে কোনো ভাঙন নেই, ব্যতিক্রম নেই, সংশয় অথবা আলস্য ঢুকে

কোনদিন এখানে প্রশ্রয় পায়নি। কঠিন, নিরেট, নিরুদ্ধ দেওয়াল এই পরিবারকে পৃথিবীর কলরোল থেকে চিরকালের জন্য আড়াল করে রেখেছে। সর্বশেষ শিশুটি অবধি এই শিক্ষায় আর এই দীক্ষায় বনবল্লীর মতো নিভৃতে বেড়ে উঠেছে। অথচ সমস্তটাই সহজ, সাবলীল, প্রসন্ন—কোথাও শাসন নেই, সতর্কতা নেই। যেন কলকাতার তৃষাদগ্ধ মরুভূমির মাঝখানে অরণ্য-ছায়াময় একটি প্রাচীন সরোবর।

এমন একটি পরিবারে সেদিন যে বিবাহটা ঘট্‌লো সেটা কিছু অভিনব। বিবাহের ইতিহাসটুকু সামান্যই। আচার্য মহাশয়ের ছাত্র দেবগ্রামের কেশবচন্দ্রের কন্যা মল্লিকার সঙ্গে আচার্য তাঁর নাতির বিয়ে দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। কি কারণে এই প্রতিশ্রুতি, সে-কথা এখানে ওঠে না। প্রতিশ্রুতি—এই যথেষ্ট। কিন্তু এই সত্য আচার্যকে রক্ষা করতে হলো বহুমূল্যে—কারণ তাঁর পরিবারে বাল্য-বিবাহ যেমন চিরকালীন প্রথা, তেমনি পাত্রীর পক্ষে লেখাপড়া শেখাও তাঁদের বংশের সংস্কার-বিরুদ্ধ। সত্যাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ কিন্তু দ্বিরুক্তি না করে শিক্ষিত মেয়ের সঙ্গে নাতি হরিমোহনের বিয়ে দিলেন। মল্লিকার বয়স তখন বাইশ পেরিয়ে গেছে। হরিমোহনের পঁচিশ। সমগ্র পরিবার উৎকট অস্বস্তিতে স্তব্ধ হয়ে রইলো।

বলা বাহুল্য, যৌথ পরিবার হলেও আচার্যদের অবস্থা খুবই সচ্ছল। দাস-দাসী সমেত দুবেলা প্রায় দেড়শো পাত পড়ে। আগেকার আমলের গৃহসজ্জায় সমস্ত বাড়িটা পরিপূর্ণ। পুরোনো কালের পিতল-কাঁসার বাসনপত্রগুলো দেখলে বাঙালীর আদি ইতিহাস মনে পড়ে। বাড়িতে সবসুদ্ধ কতজন স্ত্রী-পুরুষ এবং কার সঙ্গে কি সম্পর্ক—মল্লিকা আজ অবধি তার থৈ পায়নি। সে ঘুরে-ঘুরে ঘরে-ঘরে বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলো। তাকে দেখে বৌ-ঝিরা অনেকেই মাথায় কাপড় টেনে দিলো, ছেলেরা আড়ালে চলে গেল এবং কুমারী মেয়েরা চেয়ে রইলো অবাক্ হয়ে। প্রথমটা মল্লিকা কৌতুক বোধ করলো। কারণ, কেউ তার সঙ্গে কথা বলতে এগিয়ে আসে না। পরে, অনেকক্ষণ বাদে, সে নিজের মহলে এসে আবিষ্কার করলো, পায়ে তার চটি-জুতো ছিলো—ওরা তাই শিউরে উঠে গা-ঢাকা দিয়েছে। মল্লিকা অস্বস্তিবোধ করতে লাগলো।

নতুন স্বামী-স্ত্রীর আলাপ কিভাবে আরম্ভ হয়, সে তারা নিজেরাই শেখে। সে অবস্থাটা দু'জনেই পেরিয়ে এসেছে। স্বল্পভাষী বিনয়ী হরিমোহন সেদিন ঘরে ঢুকতেই মল্লিকা বললো, 'স্নান করে আসা হলো, মাথা আঁচড়ানো হলো না?'

হরিমোহনের মুখখানি নধর, সুন্দর। এই পরিবারে প্রিয়দর্শন বলে তার খ্যাতি। হাসি-মুখ তুলে তাড়াতাড়ি সে হাত দিয়ে মাথার চুল বার-বার নিচের দিকে নামিয়ে দোরস্ত করতে লাগলো!

মল্লিকা বললো, 'ওকি, হাত দিয়ে কি মাথা আঁচড়নো যায়?'—এই বলে নিজের আলমারির ড্রয়ার থেকে চিরুণী আর ব্রাস বার করে দিলো।

হরিমোহন হেসেই অস্থির। বললো, 'না না, এখন আহ্নিকের সময়, চিরুণী ছুঁতে পারবো না। আমাদের বাড়ির ছেলেরা কেউ চিরুণী ছোঁয় না। তুমি জানো না বোধহয়—না?'

মল্লিকা বললো, 'সেইজন্যেই বুঝি সকলের কদমফুলের মতন চুল-ছাঁটা।'

'হ্যাঁ, তাই বটে।'—বলে হরিমোহন গরদের ধুতিখানা কোমরে জড়িয়ে মাথার টিকিটায় একটা ফাঁস বেঁধে নিলো। মল্লিকা হাসবে কিম্বা হাত-পা ছড়িয়ে চিৎকার করে কাঁদতে বসবে, ঠিক ঠাহর করতে পারলো না!

ঘরে স্ত্রীর কাছে বেশিক্ষণ থাকতে হরিমোহনের সাহস নেই, গভীর রাত্রি ভিন্ন স্বামী-স্ত্রীতে দেখাশোনা এ-বাড়ির বিধিবহির্ভূত। কোনো-রকমে কাজ সেরে হরিমোহন চুপি-চুপি পালিয়ে যাচ্ছিলো, মল্লিকা তাকে ডাকলো। বললো, 'সকালবেলা কি যে বলবে বলেছিলে?'

হরিমোহন ফিরে দাঁড়ালো। বললো, 'হ্যাঁ, বলছিলুম কি—মানে, কিছু মনে করো না, ওরাই বলাবলি করছিলো, তোমাকে নাকি বই পড়তে দেখেছে ওরা।'

'বই পড়া কি বারণ?'

হরিমোহন হেসেই অস্থির, হাসতে-হাসতেই সে বেরিয়ে চলে গেল এবং মল্লিকা জানে, সমস্তদিনে তার সঙ্গে দেখা হবার আর কোনো সম্ভাবনা নেই।

আমিষ-রান্নার বিন্দুমাত্র সংস্রব এ-বাড়িতে খুঁজে পাওয়া যায় না। তরকারীগুলো মধুর রসে এক-প্রকার অখাদ্য। শাড়ির সঙ্গে আটপৌরে জামা পরা এখানে মেয়েদের পক্ষে নিন্দার কথা। শেষ-রাত্রে উঠে স্নান না করলে সামাজিক অপরাধ। মল্লিকা দিনে-দিনে যেন হাঁপিয়ে ওঠে। এমন আবহাওয়ায় সে মানুষ হয়নি, সে দোষ তার নয়। প্রতিদিনই সে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে লাগলো, তার উপর একটা প্রকাণ্ড অন্যায় করা হয়েছে। আলো আর বাতাস থেকে তাকে ছিনিয়ে ফেলা হয়েছে এক অন্ধকূপে। এই রকম অদ্ভুত সংসারে চিরদিন তাকে বাস করতে হবে এই কল্পনা করতে গিয়ে মল্লিকার নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এলো।

হরিমোহন একদিন পা টিপে-টিপে এসে পিছন থেকে দু'হাতে স্ত্রীর দু'চোখ টিপে ধরলো। হরিমোহনের বলিষ্ঠ সুন্দর দু'হাতে ফুল-বেলপাতা আর চন্দনের মৃদু গন্ধ। মল্লিকা গম্ভীরভাবে তার হাত দুখানা সরিয়ে দিয়ে বললো, 'জানি, ছাড়ো!'

হরিমোহনের হাসি আর ধরে না। কিন্তু পলকের মধ্যে আয়নার ভিতরে চোখ পড়তেই দেখা গেল, স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি। একজনের সঙ্গে আর-একজনের কী বিচিত্র পার্থক্য। মল্লিকার মুখে রুজ-পাউডারের আভা, দুই আয়ত চোখে সুর্মা টানা, কপালে চুলের আঙট্ ঝুমকো-লতার মতো নামানো। আর তার পাশে আচার্যিদের নাতি, মাথায় টিকি, ছোটো-ছোটো ছাঁটা চুল, গলায় সামবেদী পৈতের গোছা—চোখে-মুখে বিদ্যাবুদ্ধি অপেক্ষা সারল্য আর সাত্বিক ভাব। রসবোধ অপেক্ষা কৌতুকবোধের দিকে ঝোঁক বেশি! সুশ্রী যুবক সন্দেহ নেই, একে ভালোবাসাও সহজ—কিন্তু শিক্ষার পালিশ আর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা না থাকলে মল্লিকার কেমন করে চলবে? এর সঙ্গে পারিবারিক জীবন অচল। কারণ, যৌথ-পরিবারের আওতায় থেকে এর কোনো স্বকীয়তা জন্মায়নি। এর সঙ্গে সামাজিক জীবনও অসম্ভব, কারণ, বাইরের জীবনযাত্রার গতিরহস্য এর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

হরিমোহন আস্তে আস্তে বললো, 'বৌ, রাগ করলে?'

মল্লিকা বললো, 'বৌ বলে ডাকো কেন? আমার নাম রানী।'

'নাম ধরতে নেই যে।'

'সেকি! তাহলে বলো আমিও তোমার নাম ধরে ডাকতে পারবো না?'

হরিমোহন অবাক হয়ে গেল। স্ত্রী স্বামীকে নাম ধরে ডাকতে চায়, এ তার কল্পনাতীত। পরিহাস মনে করে সে হাসিমুখে বললো, 'ও-কথা কি বলতে আছে?'

'বলতে আছে কিনা, সে আমি জানি। বলো যে, এখানে সে-রীতি চলবে না। যাক্গে। তুমি হাত-কাটা ফতুয়া আর উড়ুনি গায়ে দিয়ে পথে বেরোও কেন, বলো দেখি?'

তার গলার আওয়াজে এমন একটা কঠিন নির্দেশের চিহ্ন যে, হরিমোহন সহসা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালো। তারপর বললো, 'ওটাই যে আমাদের অভ্যেস। শীতকালে কেবল বালাপোশ গায়ে দিই।'

তীক্ষ্ণকণ্ঠে মল্লিকা বললো, 'বগলে পুরোনো ছাতা, কাঁধে উড়ুনি, গায়ে ফতুয়া—তোমার সঙ্গে নাপ্‌তের তফাত কি?'

রসিকতা করে হরিমোহন বললো, 'তফাত ঐ যে কেবল আমার মাথায় টিকি?'

'না, ও অভ্যেসটা তোমাকে ছাড়তে হবে। উড়ুনি নাও ক্ষতি নেই, কিন্তু পরনে ধুতি আর পাঞ্জাবী—আর পায়ে বিদ্যেসাগরী চটি ছেড়ে য়্যালবার্ট।'

'কিন্তু দাদু যে রাগ করবেন?'

মল্লিকা বললো, 'এতেই যদি তিনি রাগ করেন, তবে ঘুমের ঘোরে কাঁচি দিয়ে একদিন তোমার টিকিও কেটে দেবো। ছি-ছি, আমার বন্ধুরা কোনদিন তোমাকে দেখলে আমাকে গলায় দড়ি দিতে হবে!'

হরিমোহনের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, ভয়ার্ত মুখে সে চুপ করে রইলো। বৃদ্ধ আচার্য মহাশয়ের প্রতি যে অশোভন কটাক্ষ উচ্চারিত হলো, সে-আঘাত হরিমোহনের মর্মে গিয়েই বিঁধলো।

কিন্তু মল্লিকা সেইখানেই থামলো না। স্বামীর নত মুখের দিকে চেয়ে বললো, 'তুমি না কলকাতার ছেলে? আজকাল কতো-রকমের

চালচলন, কিছুই কি চোখে পড়ে না তোমাদের? ইংরেজি লেখাপড়া শেখেনি, এমন একজন ছেলেও তুমি দেখাতে পারো? না শিখেছো ম্যানার্স, না এটিকেট্। হাতে রুদ্রাক্ষের তাগা বেঁধেছো কেন? ওতে তোমার কি লাভ, বলতে পারো?'

অপরাধীর মতো মুখ করে হরিমোহন বললো, 'আমরা শৈব কিনা, তাই।'

'ছাই আর পাঁশ! ধর্মে মতি খুব ভালো, ভণ্ডামি কেন? তুমি আশা করছো, আমি তোমার মতন হবো, আমিও তো আশা করতে পারি, তুমি হবে আমার মতন? ঘণ্টা নাড়া আর পূজো আর চাল-কলা বাঁধা—লোকের কাছে আমার মুখ দেখাতেও লজ্জা করে!'

হরিমোহন সবিনয়ে বললো, 'আমি কি তোমার যোগ্য নই, বৌ?'

'সে-কথা হচ্ছে না'—মল্লিকা চাপা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো, 'তোমাদের রুচি আর শিক্ষা নিয়ে কথা হচ্ছে। মানুষ আর বনমানুষের প্রভেদ নিয়ে কথা হচ্ছে।'

হরিমোহন ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকালো। তারপর মৃদুকণ্ঠে—ঘরের বাইরে কেউ না শুনতে পায়—এনিভাবে বললো, 'আমাকে তুমি কি করতে বলো?'

'বলবো কাকে, আমার কথা যে বুঝতেই পারবে না? তুমি কি কোনদিন আমাকে চেনবার চেষ্টা করেছো?'

'না।'

'চেষ্টা করলে বুঝতে, এখানকার ছাঁচ আজকের দিনে কেউ সহ্য করতে পারবে না। চারিদিকে উঁচু পাঁচিল, সদর-দরজা বন্ধ—বাইরের হাওয়া আসে না, কথা আসে না। কেউ বাঁচতে পারে এখানে?'

হরিমোহন বললো, 'তুমি কি চাও?'

মল্লিকা বললো, 'তোমাকে বুঝে নিতে হবে। আমি ছিলুম ডিবেটিং ক্লাবের প্রধান বক্তা—'

'তা বুঝতে পারছি।'—হরিমোহন একটু হাসলো।

'যতই হাসো, সত্যিটা মিথ্যে হয়ে যায় না। অল্ ইণ্ডিয়া লেডিস্

কন্‌ফারেন্সের আমি ব্রাঞ্চ সেক্রেটারি, পর্দা-নিবারণী সমিতির আমি মেম্বর—তুমি বলতে চাও, সমস্তই ত্যাগ করে ভট্চায্যিদের পুজো নিয়ে থাক্‌বো? তুমি জানো, ভবানীপুর 'মহিলা-সমাজ' আমারই হাতের তৈরি? তুমি এও বোধহয় শোনোনি, আমার একটা পলিটিক্যাল ক্যারিয়ারও আছে!'—এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে মল্লিকা হাঁপাতে লাগলো।

ওদিকে নারায়ণের ঘরে সন্ধ্যারতির লগ্ন প্রায় আসন্ন। 'আসছি—' বলে হরিমোহন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যেতে-যেতে ভাবতে লাগলো, সর্বনাশ, এ কার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে? একে নিয়ে তার ভবিষ্যৎ?

জানলার ধারে মল্লিকা কঠিন হয়ে বসে রইলো। চারিদিকে এই অবরোধী আবহাওয়ার মধ্যে বসে তার মনে হলো বাইরেটাও যেন রুক্ষ, যেন তৃষ্ণার জিহ্বা মেলে ধরা। সহসা যতদূর দেখা গেল, তার জীবনটা ভয়ানক বিপন্ন। এ বিয়েতে বিন্দুমাত্রও তার তৃপ্তি হয়নি। সন্দেহ নেই, হরিমোহনের চেহারা আর প্রকৃতি ভালোবাসারই মতো, কিন্তু সে অন্ধ-গুহাবাসী। মল্লিকার বয়স কম হয়নি, সে জানে অগ্নিস্রাবী যৌবনের মাদকরস সহজেই একদিন ফুরিয়ে যাবে—কিন্তু তারপরে সর্বপ্রকারে তার জীবন হবে বিড়ম্বিত। এই পারিপার্শ্বিকতা সহ্য করা হবে তার পক্ষে কঠিনতম সমস্যা। একটু আগে নিজের আত্মাভিমান হরিমোহনের কাছে সে প্রকাশ করে ফেললো। জানে, এ প্রবৃত্তি অশোভন, নিতান্তই বাধ্য হয়ে তাকে এই আত্মহত্যা করতে হলো। কিন্তু তার নিজের পরিচয় যাই হোক, তার প্রাথমিক দাবিগুলো যদি পূর্ণ না হয়, তবে কি তার জীবন ব্যর্থ নয়? তার রুচি আর শিক্ষামতো কিছু যদি সে না পায়, তবে নিজেকে দৃঢ় করে দাঁড় করানো কি তার এতবড়ো সামাজিক অপরাধ? অনুকূল অবস্থা না পেলে স্নেহ-ভালোবাসা আসবে কোন্ পথ দিয়ে?

মাস-তিনেক এমনি করেই কাটলো।

কয়েকদিন আগে থেকেই মল্লিকার মন ভালো ছিলো না। বেশ বোঝা যায়, পারিবারিক এক চক্রান্ত চলেছে তার বিপক্ষে, এ বাড়িতে সে প্রিয় নয়। ফলে সকলের মাঝখানে থেকেও সে একা। তার স্নানাহার, তার সাজসজ্জা, তার চলন-ধরন সমস্ত এ পরিবারের ঐক্যপ্রণালী থেকে

বিচ্ছিন্ন একটা চড়া সুর, এখানকার হাওয়ায় সে যেন বিরূপতা অনুভব করতে থাকে।

এই একঘেয়ে অস্বস্তিতর উপর একদিন একটুখানি বৈচিত্র্যের ধাক্কা পড়লো।

দুপুরে এই সময়টায় রোজই হরিমোহন পুরাণপাঠ, শিষ্যসেবকের বিলিব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে বাড়িতেই ব্যস্ত থাকে, কিন্তু সেদিন সে বাড়িতে ছিলো না। তাদের টোলের পরীক্ষায় আচার্যের সঙ্গে তাকেও উপস্থিত থাকতে হয়েছিলো, তাছাড়া উপাধি-বিতরণ-সভার কাজকর্মও কিছু ছিলো। এমন সময় একদল অভ্যাগত স্ত্রী-পুরুষ বাগান পেরিয়ে বাড়িতে এসে ঢুকলো। খবর পাওয়া গেল, তারা মল্লিকার সাক্ষাৎপ্রার্থী। এ বাড়ির নিয়ম হলো, মেয়েরা নিচের তলাকার বৈঠকখানার দিকে কখনই অগ্রসর হবে না। কিন্তু আজ মল্লিকা অম্লানবদনে সেই বিধি লঙ্ঘন করে নিচের তলায় নেমে সোজা বৈঠকখানায় এসে হাজির হলো।

তিনটি যুবকের সঙ্গে চার-পাঁচটি তরুণী তাকে দেখে একসঙ্গে সোল্লাসে কলরব করে সারা বাড়ি মুখর করে তুললো। তাদের সেই সমগ্র মিলিত কণ্ঠস্বর এই প্রাচীন বনেদী এবং রক্ষণশীল বাড়ির সমস্ত ভিতগুলির সন্ধিস্থানে হাতুড়ি মেরে-মেরে যেন ধরাশায়ী করে দিতে লাগলো। কাছাকাছি কাউকে দেখা গেল না বটে, কিন্তু মল্লিকার মনে হলো—আতঙ্কে, উৎকণ্ঠায়, উদ্বেগে সারা বাড়ির মানুষরা একটি মুহূর্তেই স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

একটি পলক মাত্র, তারপরই হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে মিসেস রেবা রায় আর অলকা মিত্রের হাত ধরে অভ্যর্থনা জানিয়ে মল্লিকা বললো, 'এসো—আসুন অরিন্দমবাবু, আসুন বিজনবাবু। তারপর? হঠাৎ যে? কি মনে করে?—চলো ওপরে, আমার শোবার ঘরে। রতীনবাবু, আপনি সেই যে শিলং গেলেন, তারপর আর কোনো খোঁজ পেলুম না, কেন?'

অরিন্দম হাসি টিপে বললো, 'ও কি আর আমাদের মতন গরীবদের খবর রাখে? He was engaged elsewhere.'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে রেবা-অলকা-বিজনরা উচ্চহাস্যে ঘর-বাড়ি ভরিয়ে দিলো।

আপ্যায়ন আর অভ্যর্থনার ত্রুটি হওয়া তো দূরের কথা, আজ বরং তারই একটা চেষ্টাকৃত অতিশয়তা দেখা গেল। কোথাও স্খলন নেই, কোনো বিচ্যুতি নেই—আদ্যোপান্ত হিসাব-নিকাশ একেবারে সুসমন্বিত। মল্লিকা চঞ্চল হয়ে, উত্তেজিত হয়ে, উচ্ছ্বসিত হয়ে গা ঢেলে দিলো এই কোলাহল-মুখর আসরে। ওরা কেউ বোধহয় বুঝতে পারলো না, মল্লিকা নানা কথার কৌশলে শ্বশুর-বাড়ির আসল চেহারাটা ওদের কাছে ঢেকে রাখতে চায়, নানাবিধ ছলনায় হরিমোহনের প্রসঙ্গটা এড়িয়ে চলে। ওরা যখন বললো, 'মল্লিকা, একটা গান গাও, তোমর চমৎকার গলা অনেকদিন শুনিনি।' মল্লিকা তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল। বাবার দেওয়া যৌতুকের হার-মোনিয়মটা দ্রুত বার করে সে ধরলো 'গীতিবিতানের' একখানা গান। তার সেই দীর্ঘ মধুর মসৃণ কণ্ঠস্বরে শরৎ-শেষের মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল নীলাকাশ ক্ষণে-ক্ষণে শিউরে উঠতে লাগলো। হাস্যে, লাস্যে, কটাক্ষে আগেকার সেই মল্লিকাকে নতুন করে দেখে বিজন, অরিন্দম আর রতীন সমাধিস্থ হয়ে রইলো।

রেবা-অলকারা ধরে বসলো, আজ বেলা তিনটার শোতে মেট্রোয় যেতে হবে। অনেক-কাল পরে আজ এই সুযোগ।

এইমাত্র! প্রস্তাব শোনামাত্রই মল্লিকা নেচে উঠলো, বর্ষার মেঘের কটাক্ষে যেমন ময়ূরী নৃত্য করে ওঠে। সত্যি বলতে কি, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে তার কুমারীকালের মতো সুরুচিসম্পন্ন সজ্জায় এসে দাঁড়ালো। যেন দীর্ঘকাল থেকে সে উপবাসী, তৃষ্ণার্ত—সমস্ত প্রাণ, সমস্ত মন অদ্ভুত অধীর, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় চঞ্চলিত। তার দিকে তাকিয়ে তিনটি যুবকের ইহকাল ঝরঝরে হয়ে গেল।

মল্লিকা বললো, 'যাচ্ছি, কিন্তু একটি সর্তে। তোমরা আজ আমার অতিথি, আজকের সব খরচ আমার।'

সবাই বললো, 'বেশ বেশ, খুব ভালো।'—এই বলে তারা আবার সিঁড়ি দিয়ে বাড়িময় সাড়াশব্দ জাগিয়ে নেমে চললো।

মল্লিকাও নামবে, এমন সময় ধীরপদে দিদিশাশুড়ী এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'নাৎ-বৌ, ওঁরা কারা ?'

'ওঁরা ?'—মল্লিকা থমকে দাঁড়ালো। বললো, 'ওঁরা সবাই আমার কলেজের বন্ধু।'

'তুমি যাচ্ছ কোথায় ?'

'একটু বেড়াতে—সিনেমায়—'

'ওঁদের সঙ্গে ?'

'হ্যাঁ।'

'কর্তার মত নিয়েছো কি ?'

'তিনি তো বাড়ি নেই, আপনাকেই জানিয়ে যাচ্ছি ? ওঁদের বলবেন, সন্ধ্যে নাগাদ ফিরবো।'

গট্ গট্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে মল্লিকা দ্রুতপদে বন্ধুদের সঙ্গে চলে গেল। তার প্রতি পদক্ষেপে এই বংশের শিক্ষাদীক্ষার ধারা দলিত-মথিত হতে লাগলো। বিমূঢ় নিস্পদ দিদিশাশুড়ী নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলেন। মেয়েটার অদ্ভুত স্পর্ধা বটে !

সিনেমা থেকে বেরিয়ে মল্লিকারা গিয়েছিলো ইম্পিরীয়লে, সেখান থেকে হগ মার্কেট ঘুরে ময়দানের হাওয়া খেয়ে যখন তারা যে-যার বাড়ির দিকে চললো, মল্লিকা বিজনকে এস্‌কর্ট নিয়ে ট্রামে উঠে বসলো। অতঃপর শ্বশুর-বাড়ির ফটকের কাছে এসে সে যখন হাত তুলে বিজনকে 'চিয়ারো' বলে বিদায় দিয়ে ভিতরে ঢুকলো, আচার্যমহাশয় গীতার পৃষ্ঠা থেকে মুখ তুলে তার দিকে তাকালেন। সন্ধ্যা তখন সাড়ে সাতটা।

ভ্রূক্ষেপ না করে মল্লিকা অগ্রসর হচ্ছিলো, আচার্য গম্ভীর প্রশান্ত কণ্ঠে তাকে ডাক দিলেন—'নাৎ-বৌদিদি, আপনি একটু অপেক্ষা করুন বৈঠকখানায়।'

বৈঠকখানায় ! বিস্ময়জনক নির্দেশ বটে। মল্লিকা থমকে সেইখানেই দাঁড়ালো। আচার্য ভিতর থেকে উঠে বাইরে এসে দাঁড়ালেন—এবং অপ্রত্যাশিত, হরিমোহন এলো তাঁর পিছনে পিছনে।

দৃঢ় স্মিতকণ্ঠে আচার্য বললেন, 'ভেতরে কিম্বা ওপরে আপনার আর

যাবার দরকার নেই। আমি ইতিমধ্যেই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আপনার আসবাব-পত্র সবই ধর্মতলার বাসায় চলে গেছে। স্বামী-স্ত্রীতে সাবধানে ভদ্রভাবে থাকবেন। হ্যাঁ, খরচপত্র সমস্তই নিয়মিত যাবে—মানে, মাসে ছুশো টাকা। আমার কর্তব্য থেকে কখনো পশ্চাদ্‌পদ হবো না। অন্যান্য সকল কথাই হরিমোহনকে আমি বলে দিয়েছি, অসুবিধে কিছু হবে না। আপনার আর কিছু বলবার আছে কি?'

পা ছুটো থর-থর্ করে কাঁপছিলো মল্লিকার। ভূমিকম্পের একটা প্রচণ্ড নাড়ায় সে যেন কেমন বিকল হয়ে গেছে। নিজেকেই সে একটা চাবুক মেরে সজাগ করে তুললো। বললো, 'না।'

ফটকের কাছে মোটর গাড়ি এসে দাঁড়ালো। আচার্য বললেন, 'দেরি হয়ে যাচ্ছে, আর কিছু তোমার বক্তব্য আছে, হরিমোহন?'

অশ্রুকম্পিতকণ্ঠে হরিমোহন জবাব দিলো, 'আজ্ঞে, না।'

'স্ত্রীর প্রতি তোমার কর্তব্য, বিবেচনা, স্নেহ—এগুলোর অভাব যেন কোনদিন না হয়। তোমাদের প্রতি আমার নিত্য আশীর্বাদ রইলো। আচ্ছা, এবার তাহলে ছুর্গা বলে যাত্রা করো। সেখানে গিয়ে আবার রান্নাবান্না করতে হবে।'

মল্লিকা হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নেবার চেষ্টা করতেই আচার্য বললেন, 'থাক্, ছোঁবেন না আমাকে নাৎ-বৌদিদি, আমি আশীর্বাদ করছি।'

ছু'জনে অগ্রসর হলো। হরিমোহন বোধকরি দ্রুত আত্মগোপন করার জন্য গাড়িতে উঠে গিয়ে বসলো। মল্লিকা এতক্ষণ পরে সহসা তার গ্রীবা হেলিয়ে নিঃসঙ্কোচে পরিচ্ছন্ন কণ্ঠে বললো, 'দাদামশায়, পায়ের ধুলোও নিতে দিলেন না? দেখছি এটা তাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়—কিন্তু আমি এ বাড়ির বৌ—'

ঘাড় নেড়ে বাধা দিয়ে আচার্য বললেন, 'এ বাড়ির বৌ আপনি নন্ নাৎ-বৌদিদি, আপনি হরিমোহনের স্ত্রী, এই মাত্র। হ্যাঁ, কি বলছেন বলুন?'

অপমানিত মুখ তুলে ফস করে মল্লিকা বলে বসলো, 'ওঁর স্ত্রী না হলেও আমি ছুঃখিত হতুম না। এ কিন্তু বাড়ির বৌ আমি নয়—এ-কথা

আচার্যিদের বউ

শুনেও আমি আনন্দ পেলুম। থাক্‌গে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, আপনি যা খরচের বরাদ্দ করেছেন, কল্‌কাতা শহরে তা নিয়ে চলবে না।'

'চলবে।'—আচার্য বললেন, 'ধর্মতলার বাড়িটা আমার, সেখানে ভাড়া লাগবে না। আপনারা মাত্র দু'জন, ওতেই চলবে। তবু, আপনার শেষ দাবি যুক্তিহীন হলেও আমি পূর্ণ করবো। আড়াইশো টাকা করে আপনাদের মাসিক খরচ বরাদ্দ রইলো।'

মল্লিকা নীরবে গিয়ে গাড়িতে উঠলো। গাড়ি ছেড়ে দিলো। আচার্য উপর দিকে চেয়ে নিজের মনে বললেন, 'তোমারই নির্দেশ, প্রভু।'

মিনিট তিন-চার ধরে দ্রুতবেগে গাড়ি ছুটে চললো। আঘাতটা সামলে নিতে মল্লিকার দেরি হয়নি। শ্বশুর-বাড়ির প্রতি মমত্ববোধ কিছু থাকলে একটু কষ্ট হতো বই কি। তবু কয়েদখানা থেকে মুক্তি পেয়ে বাইরের আলোয় এসে দাঁড়ালেও পরিত্যক্ত কয়েদখানার জন্য ছোটো একটি নিশ্বাস পড়ে। মাত্র সেইটুকু, তার বেশি নয়। তার পাশে হরিমোহন বিষণ্ণ বালকের মতো বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে। পুরুষ সে নয়—কিশোরী বালিকা যেমন গ্রামের স্নেহশৃঙ্খলিত জীবন ত্যাগ করে অজানা শ্বশুর-বাড়ির পথে প্রথম যাত্রা করে, তেমনি নিঃশব্দ ব্যাকুল করুণ তার চাহনি। পথ, ঘাট, জনতা, নগরের অশ্রান্ত মুখরতা—ওদের কোনো অর্থ নেই। শত-সহস্র লক্ষ্যবস্তুর দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেও চোখ দু'টি তার ছিলো আচার্যের দিকে। প্রিয়তম পৌত্র সে, পিতা-মাতার একমাত্র পুত্র সে, পারিবারিক সংস্কৃতির সে-ই যোগ্যতম প্রতিনিধি, তাকে নিয়ে কতো আশা, কতো আশ্বাস।

তার হাতের উপর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সহসা মল্লিকা বললো, 'সোজা হয়ে বসো। কেমন করে গাড়িতে চড়তে হয়, তাও জানো না?'

হরিমোহন সোজা হয়ে বসলো। রাঙা দুটো চোখ ফিরিয়ে পরে সে বললো, 'আগে আমি কখনো মোটরে চড়িনি।'

সহসা ঝড়ের মতো মল্লিকা হেসে উঠলো—'কি যে করবো তোমাকে নিয়ে! চলো, খুব তোমাকে মোটরে চড়াবো এখন থেকে। আমার কথার বাধ্য থাকবে তো?'

অবাধ্যতা কাকে বলে, হরিমোহন জীবনেও জানে না। সে কেবল ঘাড় নেড়ে একান্ত নির্ভরতার সঙ্গে তার সম্মতি জানালো। মল্লিকা হঠাৎ খুশি হয়ে উঠলো। হরিমোহনের গলাটা জড়িয়ে ধরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে পুরুষের পাওনা বক্‌শিস চুকিয়ে দিলো।

'বাঁচলুম—হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম—!' মল্লিকা ফুক্‌রে উঠলো, 'আর কিছু না হোক, আমিষ রান্না খেয়ে বাঁচবো, অখাদ্য আর পেটে যাবে না। আড়াইশো টাকায় আমাদের যা-হোক চলে যাবে। বাড়ি ভাড়া লাগবে না।'

হরিমোহন গলাটা ছাড়িয়ে মুখ তুলে তার দিকে তাকালো। ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে বললো, 'তুমি কি মাছ, মাংস, পেঁয়াজ, ডিমের কথা বলছো? ও-সব তো আমাদের খেতে নেই, বৌ?'

দুরন্ত বালকের প্রতি বর্ষীয়সী নারী যেমন সস্নেহে চেয়ে থাকে, তেমনিভাবে কিয়ৎক্ষণ হরিমোহনের দিকে স্মিতমুখে তাকিয়ে সহসা মল্লিকা পুনরায় চলন্ত গাড়ির মধ্যে উচ্চ দীর্ঘ উল্লাসে হেসে উঠলো। তারপর বললো, 'কী বংশেরই মানুষ তোমরা, সব এক একটি পরমহংস! জীবে দয়া, অহিংসা, এতই যদি ছিলো, বনে যেতে পারোনি? বিয়ে করেছিলে কেন? এ-কথা শেখোনি, ষড়রিপুর প্রথমটা থেকেই আর সবগুলোর উৎপত্তি?'

কিন্তু তার সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনায় হরিমোহনের ঔৎসুক্য না দেখে মল্লিকা পুনরায় বললো, 'আচ্ছা, থাক; এ-সব কথা পরে হবে। আগে নিজের ইচ্ছে-মতন ঘরকন্না পাতিগে।'

ধর্মতলার বাড়িতে ঢুকে মল্লিকা দেখলো—আশ্চর্য, উপর তলাকার দুটো ঘরে তাদের সমস্ত আসবাবপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ গোছানো। পাচক, দাসী এবং একটি ছোকরা চাকর তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলো। আচার্য মহাশয় চার-পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে একেবারে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। মল্লিকা শোবার দুটো ঘর এবং বৈঠকখানায় বেড়িয়ে বেড়িয়ে তদারক করতে

লাগলো। রান্না, ভাঁড়ার, বাথরুম—সমস্তই হাল ফ্যাশানের। ভদ্র-লোকের রুচি আছে বটে?'

পাচক এসে দাঁড়ালো। বললো, 'কি রান্না হবে, মা?'

মল্লিকা অলক্ষ্যে একবার হরিমোহনের দিকে তাকালো। তারপর বললো, 'তুমি যাও ঠাকুর, আমি রান্নাঘরে গিয়ে দেখছি।'

সেদিনকার আহারাদির ব্যবস্থা কতদূর কি হলো বলা কঠিন, কিন্তু মল্লিকা সারাদিনের উত্তেজনার পর ঘুমিয়ে পড়তেই হরিমোহন সারারাত পথে-হারানো শিশুর মতো কেঁদেই ভাসাতে লাগলো।

পরদিন সকালে মল্লিকা বাইরে বেরোতেই চাকর খবর দিলো, ব্রাহ্মণ পচক তার চাক্‌রি ছেড়ে দিয়ে ভোর রাত্রেই চলে গেছে।

কোনো ক্ষতি নেই—মল্লিকা কোমর বেঁধে কাজে লেগে গেল। চাকরকে বাজারে পাঠিয়ে সে স্নান সেরে এলো। হরিমোহন ইতিমধ্যে তার পূজা-অর্চনা সেরে বইপত্র নিয়ে বসে গেছে।

প্রথম অবস্থায় একেবারে বিপ্লব বাধালে চলবে না। মল্লিকা স্থির করলো, তার দরকার মতো কিছু-কিছু আহার্য ধর্মতলার হোটেল থেকে আনিয়ে নিলেই চলবে। চাকরটার মাইনে সে বাড়িয়ে দেবে। তারপর ধীরে-সুস্থে দেখা যাক, হরিমোনের টিকির সঙ্গে তার আহারের সঙ্গতি থাকে কিনা। সেও কেশব মুখুজ্যের মেয়ে, ছাড়বার পাত্রী সে নয়।

হাতীবাগানের কোন্ এক টোলে হরিমোহন ছাত্রদের পড়াতে যায়। সপ্তাহে একদিন করে যায় ভাটপাড়ায়—সুতরাং মল্লিকার অবসর অখণ্ড, স্বাধীনতা অবাধ। এর উপর স্বামী যদি বাধ্য হয়, নিয়মানুবর্তী হয়, তবে সুখ এবং স্বস্তি দুই। মল্লিকা যে হাওয়ায়, যে শিক্ষায় মানুষ, তাতে পুরুষকে সন্দেহ করা তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু নীতিবিদ্ হরিমোহন সম্পর্কে তার কোনো উদ্বেগ নেই, জ্বালা নেই। আর তার যে স্বামী—টিকি, নামাবলী, চাদর, চটি এ-সব বাদ দিলে অবশ্যই ভদ্রসমাজের যোগ্য। কিছু ইংরেজি শিক্ষা থাকলে অবশ্য ভালো হতো, কিন্তু সংস্কৃতই বা কম কিসে? মেঘদূত, শকুন্তলা আর কুমারসম্ভব আবৃত্তি সে যদি করতে বসে, তার উদাত্ত কণ্ঠে অন্তত রেবা-অলকার দলকে নিশ্চয়ই চমকে দেওয়া যেতে পারবে। আর

ইংরেজি? স্বামীকে কাজ-চালানো ইংরেজি শেখাতে তার অসুবিধা হবে না! সেইদিন সে কয়েকখানা ইংরেজি রীডার নিজেই কিনে নিয়ে এলো। হায় অজ্ঞানাচার্য, তুমি নাতিকে পণ্ডিত করেছো, মানুষ করোনি!

অবসর যখন তার অখণ্ড, তখন তার বিগত কুমারী-জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে বাধা কি? স্বামী যখন তার করতলগত, স্বামী যখন নিরাপদ, তখন তার মনের গতিকে বিভিন্ন ধারায় পরিচালিত করা অসুবিধাজনক নয়। মল্লিকা অল্ ইণ্ডিয়া লেডিস কন্‌ফারেন্সের আগামী অধিবেশনের জন্য প্রস্তাব রচনা করতে বসলো, 'পর্দানিবারণী'তে খবর পাঠালো এবং ভবানীপুরের যে 'মহিলা সমাজের' আপিসে এখন আর বাতি দেবার কেউ নেই, সেই ঘরটায় নতুন আপিস বসাবার জন্য সে একদিন গিয়ে ঝাড়ামোছার বন্দোবস্ত করে এলো। বিয়ের পর যে-মেয়েরা আল্‌মারিতে বইপত্র তুলে রেখে কেবলমাত্র 'প্রসূতি-কল্যাণ' মুখস্থ করতে বসে, মল্লিকা সে-দলের মেয়ে নয়! স্বামী তার জীবনের সোপান, সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে। কে বলেছে, পুরুষকে খুশি করতেই মেয়েদের জন্ম? কে বলেছে, পায়ে পড়ে কান্না ছাড়া মেয়েরা আর কিছু জানে না? কে বলেছে, স্বামীর আদর্শ আর মতবাদ অনুকরণ করে চলাই স্ত্রীর ধর্ম? সত্যকার প্রতিভাকে চিনতে দেরি লাগে, সেইজন্য শক্তিশালী স্রষ্টা যখন জন্মায়, সমসাময়িক কাল তাকে বিদ্রূপ করে, গালাগালি দেয়। প্রতিভার পথ চিরকালই কণ্টকাকীর্ণ।

মল্লিকার অনেক কাজ। বিয়ের পর তাকে অহেতুক অবরোধ করা হয়েছিলো। অপরাধ ছিলো না, শাস্তি ছিলো। তার আধুনিক শিক্ষা, প্রগতিবাদী মন, তার কষ্টার্জিত বিদ্যা—সবগুলিকে অবমাননা আর উপেক্ষা করাই ছিলো তার শ্বশুর-বাড়ির কাজ। স্ত্রীলোককে ওরা মানুষ বলেনি, বলেছে দেবী—কারণ পদদলিত হয়েও তারা মার্জনা করবে এই সুবিধা। দেবীর সিংহাসনে বসিয়ে তাকে চলৎশক্তিহীন করে রাখলে সম্ভোগ-চক্রান্তের তৃপ্তি! পুরুষ লেলিয়ে দিয়ে তাকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখলে তার ধাত্রী-বিদ্যাকে কাজে লাগানো যায়! ধন্য হে রক্ষক!

একদিন সন্ধ্যার পর কোথা থেকে ঘুরে এসে মল্লিকা হাঁপাতে-হাঁপাতে বললো, 'এই যে, কখন এলে তুমি ? সন্ধ্যাহ্নিক সেরেছো ?'

হরিমোহন বললো, 'হ্যাঁ। বেড়িয়ে এলে বুঝি ?'

'না গো, বেড়াবার সময় নেই, অনেক কাজ। তোমাকে একটা খবর দিই। আসছে সতেরোই তারিখে আমার এখানে মহিলা-সমাজের একটা জরুরী সভা—অবশ্য রাত্রের দিকে। সেদিন ডিনারের ব্যবস্থাও করতে হবে। কিন্তু তোমাকে নিয়ে আমার যে ভয় করে!'

শান্তকণ্ঠে হরিমোহন বললো, 'ভয় কেন ?'

'তুমি যা জবু-থবু, লোকে না নিন্দে করে।'

'কি করতে হবে, বলো ?'

'করতে কিছুই হবে না, কেবল আমি যা বলবো তাই শুনবে। শুনবে তো ?'

'আমি কখনো তোমার অবাধ্য হইনি, বৌ ?

'আবার বৌ! একটুও স্মরণশক্তি যদি তোমার থাকে! বলো, বৌ-রানী!—' সহাস্য তিরস্কারে আর বিলোল চাহনিতে মল্লিকা পুরুষের আসক্তিকে খুঁচিয়ে তুলতে চাইলো।

হরিমোহন বললো, 'বলো, কি হুকুম বৌ-রানী!'

মল্লিকা তার পাশে এসে বসলো। আজ হরিমোহনের মুখের উপরে বিষাদের কোনো রেখা নেই, কেমন যেন নির্মল প্রসন্নতা। প্রসাধন সে কখনো করেনি, আয়নায় সে কখনো মুখ দেখেনি, সে স্বল্পাহারী ও ধার্মিক —কিন্তু আজ মল্লিকা ভালো করে চেয়ে দেখলো—ঘন পেশীসন্নিবিষ্ট দৃঢ় চোয়াল, মুখের উপরে স্বাস্থ্যের রক্তাভা, উন্নত কপাল, আয়ত শান্ত দু'টি চোখ। হরিমোহন সত্যকার রূপবান।

কানের মুক্তোর দুল দুলিয়ে মল্লিকা স্বামীর গলা জড়িয়ে বললো, 'তুমি নিজের ধর্ম-রক্ষাতেই ব্যস্ত রইলে; কিন্তু তুমি দেখলে না, যে তোমার আশ্রিত, তারো আছে কিছু সাধ, কিছু-বা কামনা ?'

কাথাটা খুব সত্য। আচার্য বলে দিয়েছিলেন, স্ত্রীর প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করবে না। স্ত্রী সহধর্মিণী, জীবনসঙ্গিনী। মল্লিকা এ বাড়িতে

আসার পর থেকে হরিমোহন মনে-মনে তার প্রতি বিরক্ত বোধ করেছে। সে তার আজীবনের আত্মীয়বন্ধন ছিন্ন করে এক নারীর হঠকারিতায় ঘর ছেড়ে এলো, এই অদ্ভুত অন্ধতার জন্য কয়েকদিন অবধি, সত্য বলতে কি, মল্লিকাকে সে ঘৃণা করেছে। কিন্তু এর তো কোনো কারণ নেই, স্বচ্ছন্দ পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করার জন্যই তো মল্লিকা ছেড়ে এলো সব। হরিমোহন আজ স্ত্রীর আলিঙ্গনে নতুন আস্বাদ পেলো। চোখ ভরে তার নেশা লাগলো।

মৃদুকণ্ঠে সে বললো, 'অনেক রকমের ভুল আমার ঘটে গেছে, আমি তার জন্যে লজ্জিত। এবার তুমি যা বলবে, তাই শুনবো।'

'কথা দিচ্ছো?'

'হ্যাঁ।'

'আমি যদি তোমার চাল-চলন আর খাওয়া-দাওয়ার চেহারা বদলাতেই চাই?'

স্পন্দিত নিশ্বাসে হরিমোহন বললো, 'আমিষ?'

স্বামীর গলায় জড়ানো হাতখানায় আর একটু জোর দিয়ে বললো, 'ধরো, যদি তাই হয়?'

'তুমি তাতে সুখী হবে?'

'আমি সুখী হবার চেয়ে তুমি এ-কালের যোগ্য হবে, সে-ই আমার আনন্দ। আমি ভাসতে চাই তোমাকে নিয়ে। এ যুগের নেশায় আচ্ছন্ন হতে চাই। তোমাকে আমি অনেক শেখাবো।'

হরিমোহন চুপ করে রইলো। মল্লিকা তার গলা ছেড়ে দিয়ে উঠে যাবার পর তার চমক ভাঙলো, কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগলো। এই নারীর সান্নিধ্য যেন ভাঙনের সুরে ভরা—কাছে এলে সন্ত্রস্ত, সতর্ক থাকতে হয়। কি যে সে বলতে চায়, জানা কঠিন। কিসে খুশি হয়, তাও অজ্ঞাত। কিন্তু তার দুরন্ত গতির সঙ্গে পদক্ষেপ মিলিয়ে না চলতে পারলে, তাকে যেন হারাতে হবে। ভালোবাসা বড়ো নয়, সংসারধর্ম প্রয়োজন নয় —কেবল একটা দুর্বার গতি, একটা অন্ধ-ভবিষ্যতের দিকে নিরুদ্দেশ যাত্রা, অকূলের দিকে অজানায় ভেসে চলা। এ মেয়ে কাছে এলে সব ভুলিয়ে দেয়। তার আক্রমণ থেকে নিজের দুর্গ রক্ষা করে থাকা বড়ো কঠিন।

ধর্মতলার ধারে বাসা বাঁধলে কলকাতা নগরকে হুকুমের মধ্যে পাওয়া যায়। মল্লিকার বাড়ির নিচের তলায় নানাবিধ বিপণি বেসাতি। হরিমোহনকে সেদিন সঙ্গে নিয়ে সে এক 'সেলুনে' গিয়ে উঠলো। অভিজাত নাপিত কাঁচি হাতে নিয়ে তাদের বসতে জায়গা দিলো। মল্লিকা বললো, 'এঁর চুলটা কেটে দাও ভালো করে। ক্লিপ্ লাগিয়ো সাবধানে—নিউ আমেরিকান কাট্ হবে।'

বড়ো একখানা আয়নার সামনে চেয়ারে হরিমোহন বসলো। দোকানের অদ্ভুত সাজ আসবাব। নাপিতের কাছে সে মাথা পেতে দিলো। নাপিত হরিমোহনের টিকির দিকে মল্লিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, 'এটা ?'

'ওটা কেটে দাও।'

নাপিত তার কাজ আরম্ভ করে দিলো। মল্লিকা সকালবেলার সংবাদপত্র নিয়ে বসে রইলো দোকানের একপাশে।

সমস্ত সকালটা সেদিন মল্লিকার বিশ্রাম রইলো না। এগারোটার পর স্বামী-স্ত্রীতে যখন ফিরলো, তাদের সঙ্গে মুটের মাথায় একরাশ জিনিসপত্র। তিনজোড়া জুতো, তার সঙ্গে মোজা। থান-পাঁচেক শান্তিপুরের ধুতি। অছেল মোল্লার দোকান থেকে কেনা হরিমোহনের জন্য ট্রাউজার, গেঞ্জি, শার্ট, কোট, নেকটাই—কি নয় ? জুয়েলারের দোকান থেকে সোনার বোতাম। হগ মার্কেট থেকে আইভরি সিগারেট কেস। মণিহারি থেকে সুগন্ধী সম্ভার।

সতেরোই তারিখের বিলম্ব বেশি নেই। স্বামীকে ভদ্রসমাজের উপযোগী করে তোলার জন্য মল্লিকা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করতে লাগলো। মল্লিকাকে যারা জানে তারা স্বীকার করবে, বহু বিষয়ে সে অভিজ্ঞ। কেবল মাত্র বই মুখস্থ-করা কলেজী তরুণী সে নয়, ফ্যাশনেবল্ পল্লীর সব খবর সে রাখে। নাচ-গান শিখিয়েছে সে বহু মেয়েকে, সে জানে ছবি আঁকতে, সূচীশিল্পে সে পারিদর্শিনী। অলঙ্কার নির্বাচনে তার জুড়ি কম—মণিপুরের কানের ঝুমকো থেকে গুজরাটি চুড়ির ডিজাইন তার করতলগত। জাপানী মেয়েদের পারিবারিক কুসংস্কার আর আমেরিকান্ তরুণীদের প্রণয়ালাপের

বিশেষ চং অবধি তার কণ্ঠস্থ। প্রণয়-প্রত্যাশিনী 'সোসায়েটি-গার্লস্‌রা' কেমন সরল যুবকদের 'ব্ল্যাকমেল' করে সেও তার অজানা নয়। সে জানে এটিকেট্‌ শিখতে হলে ইংল্যাণ্ড, উপন্যাস পড়তে হলে ফ্রেঞ্চ, আর রাষ্ট্র-ব্যবস্থা জানতে হলে রাশ্যা। সুতরাং হরিমোহনের মতো ছাত্র তার কাছে অতি সামান্য।

সত্তেরোই তারিখ নিকটবর্তী। তাদের 'মহিলা সমাজের' জরুরি অধিবেশনের সংবাদ কলকাতার কাগজগুলোতে ছাপা হয়ে বেরিয়ে গেছে। রবিঠাকুরের দু'লাইন ফিকে আশীর্বাদ তাঁর সেক্রেটারির মারফত তাকে মল্লিকার হাতে এসে পৌঁচেছে। আমন্ত্রণলিপি চলে গেছে সভ্যদের কাছে। বাংলায় মহিলা-নেত্রী নেই, সুতরাং মল্লিকার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। অল্‌-ইণ্ডিয়া থেকে বহু নেত্রীর শুভকামনা এসেছে পত্রযোগে।

'ইংলিশ এটিকেট্‌' নামক বইখানা আদ্যোপান্ত মুখে-মুখে অনুবাদ করে মল্লিকা হরিমোহনকে শোনালো। উৎসাহ ও উদ্যম কেবল নয়—প্রাণের অজস্রতা মল্লিকার অসামান্য। দীর্ঘ সাতদিন ধরে সে ইংরেজি ডিক্সনারীখানা হরিমোহনকে দিয়ে মুখস্থ করালো। শেষ দিন শেষ রাত্রের দিকে ঘুমে হরিমোহনের চোখ জড়িয়ে এলেও মল্লিকা তাকে ছাড়লো না। তার স্মরণশক্তি পরীক্ষা করতে লাগলো।

'আচ্ছা বলো, আঃ ঘুমিয়োনা বলছি! বলো, ফুল্‌ মানে কি?'

হরিমোহন বললো, 'বোকা।'

'ডগ্‌ মানে কি?'

'কুকুর।'

'হাসব্যাণ্ড্‌ মানে কি?'

'চাষা!'

'হলো না, হলো না—ঠিক করে বলো। হাসব্যাণ্ড্‌ মানে?'

'গাধা।'

'আঃ, কিছু মনে রাখতে পারো না তুমি! হাসব্যাণ্ড্‌ মানে, স্বামী। মনে থাকবে তো? আচ্ছা উইচ্‌ মানে কি?'

'স্ত্রী।'

মল্লিকা খিল-খিল করে হেসে বললো, 'ভাগ্যিস, এখানে কেউ নেই? সব ভুলে মেরে দিয়েছো? উইচ্ মানে ডাইনী, ওয়াইফ্ মানে স্ত্রী। মনে থাকবে? আচ্ছা, এবার ঘুমোতে পারো। রাত চারটে বাজে।'

এর পরে সাজসজ্জা শেখানর পালা। ভূতপূর্ব 'মহিলা সমাজের' কল্যাণে বহু সমাজে আর পার্টিতে মল্লিকার যাতায়াত ছিলো। তার মামার বিলেত যাওয়া উপলক্ষে সে পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানলাভ করেছিলো। দেখেছে পাশ্চাত্য সজ্জার সঙ্গে ওরিয়েন্টাল রং মেশালে আদর পাওয়া যায়। ফ্যাশন বস্তুটার বনেদী ভিত্তি কম, প্রগতিশীল কল্পনার সঙ্গে ওটা আসে, নতুন ধাক্কায় আবার সে মার খেয়ে পালায়। মোট কথা, দৃশ্যত আকর্ষণীয় হওয়া চাই, চল্‌তি যুগের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারলেই হলো। মল্লিকা হরিমোহকে সাহেবী পোশাকে দুরস্ত করে তুললো। বাঁ হাতে কাঁটা ধরতে হয়, ডান হাতে চামচ। খাবার প্রথম দফায় খেতে হবে সুপ—তারপরে যা কিছু। ফল-পাকড় যদি খেতে হয়, তবে শেষকালে। চুমুক দিয়ে যেন সুপ খেয়ো না—মল্লিকা সতর্ক করে দিলো—টেবল্ স্পুন্ থাকবে, ডান হাতে খেয়ো। আচ্ছা, স্পুন্ মানে কি?'

'চাম্‌চে।'

মল্লিকা সোল্লাসে হেসে লঠলো—'বাঃ, এবার তো ঠিক হয়েছে। এবার ঠিক পারবে তুমি। আর ভয় নেই, আমার ঠিক মুখ রক্ষে হবে। খুব সাবধান, আমার পুরুষ বন্ধুরা আসবে, তারা যেন হাসাহাসি না করে। তারা সব—'

হরিমোহন বিস্মিত হয়ে বললো, 'পুরুষ-বন্ধু?'

'হ্যাঁ, তারা সহপাঠী ছিলো। তাছাড়া দু'চারজনের সঙ্গে এমনি ভাব আছে। মিটিং ভাঙলে রাত্রে তো আর মেয়েরা একলা যেতো না—অনেকের এস্‌কর্ট থাকতো, অনেকের বন্ধুও থাকতো।'

'লোকে নিন্দে করতো না?'

'লোকনিন্দে!'—হাসিমুখে মল্লিকা বললো, 'গ্রাহ্য করতো কে?'

'পাপ মনে হতো না?'

'আঃ, কি যে বলো তুমি। ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে থাকলেই কি মন্দটা

ভাবতে হবে? মন্দ আছে মানুষের মনে, বাইরে সবটাই সুন্দর। এই তো বিজনের সঙ্গে আমি কতদিন কতো জায়গায় বেড়িয়েছি; বলো, আমার চরিত্র নষ্ট হয়েছে? নীতি আর দুর্নীতির সীমারেখা কেউ টানতে পারে? তাছাড়া ভালোবাসা যদি হয়ই, মেয়েদের সতীত্ব কি এতই ঠুন্‌কো?—' উজ্জ্বল কটাক্ষে হরিমোহনের প্রাণের দিগন্তব্যাপী বিদ্যুদ্দাম ছুটিয়ে মল্লিকা চলে গেল।

বিমূঢ় হরিমোহন আতঙ্কে, অস্বস্তিতে লজ্জায় আর অপমানে বসে-বসে কাঁপতে লাগলো।

সতেরোই তারিখ সকালেও মল্লিকার ছুটি ছিলো না। ছুটি না থাকলেও তার আনন্দ ছিলো। হরিমোহন তার সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এখন আর বিশেষ ভয় নেই, সভ্য-সমাজে তাকে নিয়ে অন্তত মানহানি আর ঘটবে না। আচার্যকে ধরে এনে আজকে যদি সে হরিমোহনের উন্নতিটা দেখাতে পারতো!

সকালবেলা চা খেয়েই মল্লিকাকে ছুটতে হলো। ভবানীপুরের এক মাঠে প্যাণ্ডেল তৈরি করে সেখানে আয়োজন করা হয়েছে। মফঃস্বল থেকে বহু মহিলা ডেলিগেট্ এসে উপস্থিত হয়েছেন। হাজার-দুই টাকা চাঁদা তুলতে মল্লিকার দলকে অনেক বেগ পেতে হয়েছিলো। সমস্ত বন্দোবস্ত নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করে মল্লিকা যখন ফিরলো, বেলা তখন বারোটা বাজে! সন্ধ্যা সাতটায় সভার উদ্বোধন। সভাপতিনী হবেন—মহীশূরের বিখ্যাত মহিলানেত্রী।

আজ তার একটা প্রকাণ্ড সৌভাগ্যের সূচনা। সভানেত্রীকে দিয়ে প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়ে নিতে হবে, বাংলাদেশের নেত্রীত্বের মুকুট মল্লিকা ব্যানার্জির মাথায় পরানো হোক। সমাজসেবায় আর জাতীয়তা প্রচারে বর্তমানে মল্লিকার দ্বিতীয় নেই। আজ সর্বসমক্ষে হরিমোহনকে স্বীকার করে আসতে হবে, স্ত্রীর গৌরবে সে গৌরবান্বিত।

পাঁচটার পরে মল্লিকা নিজের হাতেই হরিমোহনকে সাজাতে বসলো। কনকচাঁপা রঙের বিলেতি ট্রাউজার পরালো, ভিতরে সাদা রেশমের হাফ্ শার্ট, গলায় বো-নেকটাই, চোখে পাওয়ারলেস্ পাঁস-নে, পায়ে চকোলেট্

রঙের ফিতে-বাঁধা সু। বুক-পকেটে রেশমী রুমাল দিলো তু'ইঞ্চি তুলে। মাথায় ব্যারিস্টারী হ্যাট! তারপর বললো, 'নাম জিগ্যেস করলে কি বলবে, মনে আছে? বলো, মিস্টার হ্যারি বোনারজি। চমৎকার মানিয়েছে আজ তোমাকে। চলো না, অনেক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেবো। ঈর্ষার বুকের ওপর দিয়ে তোমাকে তুলে নিয়ে আসবো সগৌরবে। কেমন, ভালো লাগবে না? দেখো, আমার মাথা খেয়ো না যেন।'—এই বলে নিজে সাজগোজ করতে যাবার আগে মল্লিকা বার-বার আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে হরিমোহনকে হোটেলের রান্না পেঁয়াজ-রসুন-ভরা চপ, কাট্‌লেট, মাংস ইত্যাদি খেতে রাজী করালো। আর কিছু নয়, কুসংস্কার ভেঙে দিতে হবে।

যেন একটা কঠিন অগ্নিপরীক্ষা আসন্ন। ভয়ে-ভয়ে হরিমোহন চুপ করে রইলো। তার অস্থির বুকের ভিতরটা আজ সকাল থেকেই ধকধক্ করছিলো। কিন্তু প্রতিজ্ঞা তাকে পালন করতেই হলো, সে সত্যবাদী।

মল্লিকা আজ পরলো গৈরিকবর্ণের খদ্দরের শাড়ি, ভিতরে রেশমী জামা—রক্তলেখাঙ্কিত। চোখে সুর্মা-টানা, মুখমণ্ডল গোলাপী পরাগে মোহমদির, তুই কানে হীরার কুণ্ডল, হাতে আলপনা ডিজাইনের কঙ্কন, ঝলকে-ঝলকে মাথার রুক্ষ চুল হাওয়ায়-ওড়ানো, পায়ে হীল্‌-তোলা লেডিস সু। বয়সের ভারে সর্বাঙ্গ কিছু আনত, ভঙ্গিটি কিছু ক্লান্তির। বাঙালী নেত্রী মল্লিকা।

ঘণ্টাখানেক পরে সে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, একটি যুবক তাকে সোৎসাহে অভিনন্দন জানালো। বললো, 'আধঘণ্টা থেকে বসে আছি তোমার জন্যে, মল্লিকা।'

মল্লিকা বললো, 'কেন, মিস্টার ব্যানার্জিকে দেখোনি?'

'দেখেছি, তিনি আমাকে বসিয়ে ও-ঘরে গেলেন। আঃ, অদ্ভুত মানিয়েছে তোমাকে। স্‌প্লেণ্ডিড্‌!'

এমন সময় প্রশান্ত গম্ভীর মুখে হরিমোহন এসে দাঁড়ালো। তখন তার গা বমি-বমি করছে। হাত বাড়িয়ে একটি ছোটো চিঠি মল্লিকার হাতে দিয়ে বললো, 'এটা পড়ো এক সময়ে।'

'কিসের চিঠি?'

'কিছু না, এমনি।'

'আচ্ছা, পড়বো পরে। ওগো শোনো, এ আমার একটি বন্ধু, বন্ধুদের মধ্যে অন্তরঙ্গ—এর নাম সুব্রত সেন। আচ্ছা, বলো তো সুব্রত, ওঁকে এই পোশাকে কেমন মানায়?' খুব চমৎকার মানিয়েছে, তাই নয়? —মল্লিকা অধীর হয়ে উঠলো।

উচ্ছ্বসিত সুব্রত বললো, 'Oh, he's looking fine, কিন্তু তুমি—তুমি যে আজ এঞ্জেল, মল্লিকা? কেবল কি মিস্টার ব্যানার্জি? আজ অনেকের মাথা ঘুরে যাবে।'

বমির বেগ সামলে হরিমোহন মনে-মনে আওড়ালো, এঞ্জেল! এঞ্জেল মানে স্বর্গবাসিনী পরী, দেবদূত। এমন সময় নিচে ধর্মতলার রাস্তায় মোটরের শব্দ হতেই হরিমোহন ছড়িটা হাতে নিয়ে নেমে গেল। মল্লিকা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে একবার তাকালো। আজ যেন হরিমোহনকে কেমন রহস্যময় মনে হচ্ছে। কিন্তু যতই হোক, সুব্রতকে আর একটু তার সমাদর করা উচিত ছিলো বইকি। সামাজিক সৌজন্যটা তাকে শেখানো হয়নি বটে।

সুব্রত কেমন যেন একটু অবাক হলো তারপর জিগ্যেস করলো 'উনি যাবেন না সভায়, মল্লিকা?'

'যাবেন বই কি, নতুন পোশাক পরার আনন্দে গায়ে হাওয়া লাগাচ্ছেন একটু। মানুষটি একটু সেকেলে, সুব্রত।'

এমন সময় নিচে থেকে চাকর উঠে এলো। মল্লিকা তার বিরক্তি চেপে প্রশ্ন করলো, 'বাবু কোথায় গেলেন, রে?'

চাকর বললো, 'তিনি মোটরে উঠে চলে গেলেন।'

'কোথায়?'

'তা জানিনে, মা।'

সহসা চিঠির টুকরোর কথা মনে পড়তেই মল্লিকা হাতের মুঠো থেকে চিঠি খুলে পড়তে লাগলো। সুব্রত রইলো সামনে বসে, সে কিছু বুঝতেই পারলো না।

'কল্যাণীয়াসু,

তোমাকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। আমাকে ক্ষমা করিও। আমার খোঁজ-খবর লইও না। আমার সামাজিক ক্ষতি হইলেও তোমার হইবে না, এই আশা লইয়াই দূরে থাকিব। ইতি—

হরিমোহন।

'আসছি সুব্রত, তুমি একটু বসো'—বলে মল্লিকা নিচে নেমে গেল। কিন্তু পথে নেমে দুরন্ত অধীর উত্তেজনায় সে একখানা ট্যাক্সির সন্ধান করে উঠে বসলো। বললো, 'চোরবাগান।'

প্রতি মুহূর্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গে নিবিড় জীবন্ত। উল্কাপিণ্ডের মতো মল্লিকা ক্ষিপ্তোন্মত্ত ক্রোধে ছুটে চললো। ওদিকে সভা উদ্বোধনের সময় আসন্ন, এদিকে তার সমগ্র জীবনকে ধরে ভাগ্যদেবতা একটি কঠিন মোচড় দিলেন। দেখতে-দেখতে পাঁচ মিনিট—পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মল্লিকার মোটর চোরবাগানের আচার্যদের বাড়ির ফটকে এসে দাঁড়ালো।

গাড়ির ভিতর থেকে ছিট্‌কে পড়লো মল্লিকা, তারপর সোজা বাগান পার হয়ে আচার্য মহাশয়ের বৈঠকখানার দরজায় এসে দাঁড়ালো। স্তম্ভিত মূঢ়ের ন্যায় দেখলো, সাহেবী-পোশাক-পরা হরিমোহন আচার্য মহাশয়ের কোলে মাথা রেখে ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদছে—বিছানার চাদরের উপর একরাশ বমি। দুর্গন্ধে ঘর ভরে গেছে।

কঠোর কণ্ঠে মল্লিকা বললো, 'জানোয়ার মানুষ হয় না, আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ। আমাকে তুমি ত্যাগ করবে, এতবড়ো স্পর্ধা? ত্যাগ আমি তোমাকেই করে যাবো!'

হরিমোহন অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বললো, 'দাদু, ওকে চলে যেতে বলুন।'

আচার্য বললেন, 'না হরিমোহন, তোমার স্ত্রী! স্ত্রীর সকল ব্যবস্থা তোমারই হাতে।'

বিদীর্ণ কণ্ঠে মল্লিকা বললো, 'আপনাদের হাতে-তুলে-দেওয়া কোনো ব্যবস্থা আমি স্বীকার করবো না। কিন্তু আচার্য পরিবারকে আমি দেশের মাঝখানে কলঙ্কের মধ্যে টেনে নামাবো, তবেই আমার নাম।'

আশেপাশে দেখতে-দেখতে মল্লিকার চিৎকারে লোক জমে গেল। আচার্য মহাশয় হাত-জোড় করে মল্লিকার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ক্ষমা করুন, নাৎ-বৌদিদি....'

'ক্ষমা !'—মল্লিকা চেঁচিয়ে উঠলো, 'আপনিই সবচেয়ে অপরাধী। নিরপরাধ একজন মেয়ের জীবনকে নিয়ে আপনি ছিনিমিনি খেলছেন, মনে নেই ?'

বিপন্ন অপমানিত আচার্য ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আপনি চুপ করুন, ঝগড়া আমি মিটিয়ে দেবো। হরিমোহন, যাও তুমি, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে।'

'না।'—মল্লিকা তিরস্কার করে বললো, 'স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক মুছে দেবার জন্যেই আমি ছুটে এসেছিলুম। ক্ষমা আমি আপনাদের করবো না। আদালতে যেতে হবে, সেখানে গিয়ে আমার উপযুক্ত পাওনা আপনারা দিতে বাধ্য হবেন। এই চিঠি আমার কাছে রইলো।'

আগুনের শিখার মতো জ্বল্‌তে-জ্বল্‌তে মল্লিকা যেমন এসেছিলো, তেমনি আবার ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠে চলে গেল।

বৃহত্তর-মহত্তর

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের পাড়া থেকে উঠে যাওয়ার তিন বছর পরে একদিন নগেনের সঙ্গে পথে দেখা হলো। লোকটার চেহারার না হোক, পোশাকের খুব উন্নতি হয়েছে দেখলাম। মাথায় চকচকে টেরি, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, পরনে কোঁচানো শান্তিপুরী ধুতি, পায়ে চকচকে ডার্বি। হাতে আবার একটা রিস্টওয়াচ বাঁধা।

একগাল হেসে পরমাত্মীয়ের মতো বললো, 'রেস্টুর‍্যান্টে ঢুকতে যাচ্ছিলাম, পকেটে হাত দিয়ে দেখি, মানিব্যাগটা ভুলে এসেছি। এমন খিদে পেয়েছে, ভায়া!'

আশেপাশে শুধু দেশী খাবারের দোকান; বললাম, 'খাবার খাবেন!'

'অগত্যা!' বলে সে একটা বিড়ি ধরালো। সঙ্গে করে তাকে খাবারের দোকানে নিয়ে গিয়ে বসলাম। সে নিজেই এটা-ওটা ফরমাশ করলো, আমি তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়ে টাকা তিনটে আর একবার গুণে নিলাম। জিগ্যেস করলাম, 'দিদি কেমন আছে?'

'জানি না' বলে সে একটা রসগোল্লা গিলে ফেললো।

'জানেন না, মানে?'

'মানে, আমায় কলা দেখিয়ে শালী ভেগেছে চার মাস!'

আমি নীরবে উঠে দাঁড়ালাম। যারার জন্য পা বাড়াতেই সে ব্যাকুল হয়ে বললো, 'চললেন যে?'

'সে কৈফিয়তে আপনার প্রয়োজন?'

'এহেঃ, চটেন কেন! খাবারের দামটা দিয়ে যান। আমার কাছে একটাও পয়সা নেই। মাইরি বলছি। কালীর দিব্যি।'

'দাম? দাম আমি জানি না।' বলে পা বাড়ালাম।

সে উঠে এসে কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললো, 'এ কোন্-দেশী ঠাট্টা, ভাই? বিপদে ফেলে পালাতে চান কি রকম? প্রতিজ্ঞা করছি, আর খারাপ কথা বলবো না। খুব সম্মান করে কথা কইবো। কি জ্বালা, আপনার পায়ে পড়চি দাদা, হলো?'

আমি ফিরলাম। সে আবার খেতে আরম্ভ করে অনুযোগের সুরে বললো, রাগের মাথায় একটা বেফাঁস কথা বের হয়ে গেছে বলে কি এমন করতে হয় রে, দাদা! মাইরি আমার বুক কাঁপছে এখনো।'

'কাঁপুক। চট্ করে বলুন দিদির কি হয়েছে।'

সে অনেকক্ষণ ধরে যা বললো, তার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই: মাস-চারেক আগে একদিন সকালে উঠেই মমতাদি বললো, আমি বিদায় হলাম। এ জীবনের ক্ষুদ্রতা আমার সইচে না। আমি মহত্তর-বৃহত্তর জীবনে সার্থকতা খুঁজতে চললাম। বলে নগেনকে কথাটি কইবার (অর্থাৎ চুলের মুঠি ধরে আটকাবার) সুযোগ না দিয়েই ফস্ করে চলে গেল। নগেন প্রথমটা ভেবেছিলো, সে বুঝি আমায় ভর করেই অকুলে ভাসলো। (এইখানে সে হাত-জোড় করলো, পাছে আমি রাগ করি) শেষে শুনলো, তা নয়, কি একটা নারী সমিতিতে যোগ দিয়ে সে দেশের কাজে লেগেছে। চরকা ঘোরায়, ছোটো ছেলে-মেয়েদের পড়ায়, বাড়ি-বাড়ি মেয়েদের কাছে স্বদেশী প্রচার করে। এ-কথা জেনে আমাকে মিথ্যা সন্দেহ করার জন্য দুঃখে লজ্জায় অনুতাপে—

আমি চুপ করে বসে রইলাম, সে আমার কানের কাছে দুঃখ লজ্জা অনুতাপের জ্বলন্ত বর্ণনা করে চললো। আমি খানিক শুনলাম, খানিক শুনলাম না। শেষটা কিছুই শুনলাম না।

উদ্গারের শব্দে সচেতন হয়ে দেখলাম, তার খাওয়া ও বক্তৃতা শেষ হয়েছে। পুনরায় উদ্গার তুলে বললো, 'আর খাবো না, দামটা দিয়ে দিন।'

'দিচ্ছি। কিন্তু আপনি এতো ঘটা করে সাজ করছেন কেন বলুন তো? দিদির শোকে নাকি?'

কালো দাঁত বের করে সে হাসলো, 'আরে রামো, সে বৃহত্তর-মহত্তর

জীবনে সার্থক হতে গেছে, তার জন্যে শোক কি! আবার বিয়ে করে ফেলেছি কিনা—বুঝলেন না? দুটো পয়সা দিন তো, পান কিনবো।'

আমার হঠাৎ ইচ্ছা হলো, খাবারের দাম না দিয়ে চলে যাই; দোকানীর হাতের অনেক মিষ্টি খেয়েছে, একটু প্রহারও খাক্। কষ্টে সে সঙ্গত ইচ্ছা সংযত করে দাম মিটিয়ে দিলাম। পান খাবার পয়সা দিয়ে নারী-সমিতির নাম টুকে নিয়ে পথে নেমে গেলাম। পথে মানুষের ভিড়। আমার মনে হলো, একই পথ বেয়ে আমিও চলেছি আর এতো লোকও চলেছে, কিন্তু প্রত্যেকের মনোবেদনার উৎস কতো বিভিন্ন! এতগুলি চিন্তা-জগতের একটিতেও কি মমতাদির মতো কেউ নীরব দুঃখের পদচিহ্ন এঁকে চলেছে?

নারী-সমিতিটির খোঁজ করে সম্পাদিকার সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি জানালেন—মমতাদি মাঝে একমাস জেল খেটেছে এবং আবার জেলে যাবার জন্য বাড়াবাড়ি আরম্ভ করায় তাকে মফস্বলে কাজ করতে পাঠানো হয়েছে। এই সমিতির কাজ গঠমমূলক, ধ্বংস এর কর্মীদের ব্রত নয়, মমতাদিকে নিয়ে সম্পাদিকার বড়ো মুশকিল।

পরদিন আমি, মমতাদি যে গ্রামে ছিলো, সেখানে গেলাম। কলকাতা থেকে চার-পাঁচ ঘন্টার পথ।

বেশ বড়ো গ্রাম। গ্রামের পাশে একটা নদী। খোঁজ করে, শোভার প্রাচুর্যে নদীতীর যেখানে আপনাতে আপনি মুগ্ধ হয়ে আছে, সেইখানে একটি ছোট্ট টিনের বাড়িতে মমতাদির দেখা পেলাম। মমতাদি এবং তার সঙ্গিনীদের জন্য গ্রামের কে এক সদাশয় ব্যক্তি এই বাড়িখানা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তখন দুপুর। শরতের প্রথম হলেও রোদের তেজ ছিলো। সদরের বারান্দায় উঠে দাঁড়াতে চার-পাঁচটি চরকার শব্দ শুনতে পেলাম। মমতাদিকে ডাকতে চরকা থেমে গেল, সে বেরিয়ে এলো। হেসে বললো, 'এসেচো? আমি জানতাম খোঁজ পেলে তুমি আসবেই, দু'এক ঘন্টা তর্ক করবেই। তোমার প্রতীক্ষা করছিলাম, আমি।'

'তর্ক করবো, নিশ্চিত জানো?'

'জানি। যে কাণ্ড করেচি, তর্ক না করে তুমি ছাড়বে?'

'যদি না করি তর্ক?'

'বিস্মিত হব। ভেবে পাবো না বাঙালী হয়েও তর্কের এমন সুযোগ কি করে ত্যাগ করলে। কিন্তু তুমি করবে। তোমার চোখে-মুখে তর্ক উঁকি মারচে। অন্ততঃ আলোচনা।'

নদীতে নেমে মুখ-হাত ধুয়ে আমি বারান্দায় মাদুরে বসলাম। সেও বসলো—অর্ধেক মাদুরে অর্ধেক মাটিতে। মেয়েরা অমনিভাবে বসে, বিনয়ের লক্ষণ ওটা। কথা আরম্ভ হওয়ার আগে আমি একবার ভালো করে তার মুখ দেখে বুঝবার চেষ্টা করলাম, এ-জীবনে সে সুখী হয়েছে কিনা। কিছুই স্পষ্ট বোঝা গেল না। আগের জীবনে সে অসুখী ছিলো, কিন্তু মুখের একটু ম্লানিমা দেখে তার অসুখের পরিমাণ স্থির করা.যেমন সম্ভব ছিলো না, আজ সেই ম্লানিমার অন্তর্ধান এবং দেহে স্বাস্থ্য ও চোখে-মুখে একটা শান্ত-জ্যোতির আবির্ভাব দেখে বোঝা গেল না, সে কতখানি সুখী হয়েছে। বিশেষ, মাঝে-মাঝে তার দৃষ্টিতে ব্যথার বিকাশ দেখা যেতে লাগলো।

সে প্রশ্ন করলো, 'তুমি কি আমাকে সমর্থন করো না?'

আমি বললাম, 'ঠিক জানি না। ইচ্ছা হয় সমর্থন করি, কিন্তু বাধা পাই। তোমার সিদ্ধান্তে অনেক জটিলতা, সহজে মেনে নেওয়া কঠিন। তোমায় আমি চোখ বুজে সমর্থন করতাম, যদি—'

'যদি?'

যদি তোমার দেশ-প্রেম নিজের তেজে স্বামী-পুত্রের প্রেমকে ছাপিয়ে যেতো, যদি রাগ আর অভিমানের ভেজাল না থাকতো।'

সে হাসলো! বললো, 'তাপসী নই, মন নির্বিকার নয়। ভেজাল হয়তো আছে। কিন্তু তুমি যে রাগ আর অভিমানের কথা ভাবচো তার ভেজাল নেই। তুমি ভাবচো, আমি ঝগড়া করে ঝোঁকের মাথায় চলে এসেচি। তা সত্যি নয়। সে ভয় আমারও ছিলো। কতদিন ধরে চেষ্টা করে আমি বাড়ি ছাড়তে পেরেছি, জানো? ছ'সাত মাসের বেশি। রাগের মাথায় চলে এসেচি ভেবে পরে পাছে আমার অনুতাপ হয়, এই ভয়ে যখনি সে বেশি রকম খারাপ ব্যবহার করতো, আমি গৃহত্যাগের সময় পনেরোদিন

পিছিয়ে দিতাম। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, অন্ততঃ পনেরোটাদিন যখন রাগের কোনো কারণ উপস্থিত হবে না, তখনই বাড়ি ছাড়বো, তার আগে নয়। এই প্রতিজ্ঞা বজায় রাখতে গিয়ে, আসবার জন্যে পা বাড়িয়ে থেকেও ছ'সাত মাস আসতে পারিনি। শেষের দিকে তো হতাশ হয়েই পড়েছিলাম যে, একবারও খিটিমিটি বাধবে না, হয়তো এমন পনেরোটাদিন এ-জীবনে আর আসবে না। কিন্তু হঠাৎ তার কঠিন অসুখ হলো—'

'সেই সুযোগে চলে এলে!'

সে হাসলো।—'শোনো আগে, পরে মন্তব্য প্রকাশ করবে। তার তো অসুখ হলো, আমি নাওয়া-খাওয়া ঘুম সব ছেড়ে দিয়ে এমন সেবাটাই করলাম যে, অসুখ ভালো হওয়ার সঙ্গে সেও কিছুকালের জন্যে ভালো হয়ে গেল। ঠিক বিয়ের দিনগুলো যেন ফিরে এলো—এতো আদর, এতো সোহাগ, এতো ভালোবাসা! পনেরোদিন হঠাৎ সদয় অদৃষ্টের দান ভোগ করে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমি চলে এলাম। রাগ করে এসেচি আমি? ঝগড়া করে এসেচি? তা আর বলতে হয় না।'

'তবে এলে কেন?'

'না এসে চললো না, তাই।'

'তার মানেই তুমি হার মেনেচো। নগেনবাবুর সঙ্গে যে বাজি রেখেছিলে, তাতে তোমার হার হয়েচে।'

'কিসের বাজি?'

'মনে নেই? একদিন বলেছিলে সে নিছক স্বামী; বিধাতা নয়। চোখ বোজার আগে তোমায় বাড়ি-ছাড়া করার সাধ্য তার নেই, নেই, নেই।'

'নেই তো! আমায় কেউ বাড়ি-ছাড়া করেনি, আমি নিজে এসেচি। শুধু স্বামীকে সইতে না পেরে চলে আসবো, আমি কি তেমন মেয়ে? নই, নই, নই। এগারো বছর ধরে তার অবিচার-অত্যাচার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো—সেজন্যে নালিশ করতেও আমি ভুলে গিয়েছিলাম। তাছাড়া স্বামী কি সারাদিন অত্যাচার করে? চব্বিশ ঘণ্টায় দিন, ক'ঘণ্টা মানুষের নিষ্ঠুরতায় ধৈর্য থাকে? যদি কোনো বই-এ পড়ে থাকো অত্যাচারী স্বামীর কথা—জানবে, লেখক শুধু চব্বিশ ঘণ্টার গোটা একটা দিনের আধ ঘণ্টার

হিসেব দিয়েচে, বাকী সময়টা চালাকি করে রেখে দিয়েচে নেপথ্যে! অবশ্য ঐ বাকী সময়টা স্নেহ-ভালোবাসায় বোঝাই না-হয়ে একদম ফাঁক হতে পারে—কিন্তু ও-সব ফাঁক সংসারী মেয়েমানুষের সয়। শুধু স্বামী যার অবলম্বন, সপ্তাহে একটিও মিষ্টি কথা না শুনলে তার অসহ্য ঠেকতে পারে, আমার তো একমাত্র স্বামীই ছিলো না জীবনে অবলম্বন! শুধু স্বামীর হিসেবে অভাগিনী হলে অভাগিনী হয়েই আমি থাকতাম, ভাই। তার হীনতা যদি শুধু আমার প্রতি অন্যায় করে নিরস্ত থাকতো আমার বর্তমান জীবন এবং ভবিষ্যতে যে-জীবন পৃথিবীতে রেখে যাবো সেই জীবন যদি সমস্ত গ্রাস না করতো, আমি মুখ বুজে তার সংসার ঘাড়ে করে মরতাম। সুখ-শান্তির অভাব আমায় কাতর করতো না, অনাহার, অনিদ্রা, প্রহার, নির্যাতন, উপেক্ষা—কিছুই মুছে নিতে পারতো না আমার মুখের হাসি! জীবনের আংশিক সফলতা পেলেই আমি তুষ্ট থাকতাম। কিন্তু তা হলো না। কতক স্বামীর জন্যে, কতক পারিপার্শ্বিক অবস্থার অভিশাপে, সমগ্র-ভাবে আমি ব্যর্থ হয়ে গেলাম—সম্পূর্ণভাবে আমার জীবন হলো অকারণ, অর্থহীন। স্বামী নয়, দুঃখ-দুর্দশা নয়—ব্যর্থ বেঁচে থাকাটা আমার সইলো না। আমার আত্মা আর্তনাদ আরম্ভ করে দিলো।'

'সতীনের ভয়ে?'—বলে আমি খোঁচা দিলাম।

সে চমকে উঠলো।—'সতীনের ভয়ে আত্মার আর্তনাদ? সতীন? সতীন হয়েচে নাকি এর মধ্যে? স্ত্রী ছাড়া তার চলবে না জানতাম, কিন্তু এতো শিগগির! আমার পায়ের আলতার দাগ এখনো বোধহয় ঘরের মেঝে থেকে মুছে যায়নি। আমি কি তার ঘরের এতখানি স্থান জুড়ে ছিলাম যে, বিশাল ফাঁকটা সইলো না, তাড়াতাড়ি পূর্ণ করতে হলো?'

নালিশ! ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ অভিযোগ! মনে হলো, অভিমানও জেগেছে—ঈর্ষার বসন-পরা অবুঝ অভিমান। মুখে একটা কালো ছায়া ভেসে এসেছে, দু'চোখে ঘনিয়ে এসেছে ব্যথা। দেখে আমার বিশেষ ভালো লাগলো না। মুখে সমর্থন করি আর না করি, মনে-মনে তার মানবীত্ব ঘুচিয়ে তাকে দেবীর মতো জ্যোতির্ময়ী করে তুলেছিলাম—দধীচি থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত সংখ্যাহীন জ্যোতিষ্ক যে-জ্যোতির সঙ্গে পরিচয় করিয়েছে মানুষের।

মানবতার ছায়াপাতে মমতাদির সে ভাস্বর মূর্তি কল্পনার নেপথ্যে হঠাৎ যেন ম্লান হয়ে গেল।

বললাম, 'এবার আমার পুরো অসমর্থন মমতাদি! ছলনা করেচো নিজেকে। ভেবেচো কর্তব্য ত্যাগ বুঝি সত্যি ত্যাগ। দুঃখের কাছে হার মেনে তুমি পালিয়েছো কর্তব্য পেছনে ফেলে!'

সে বললো, 'কর্তব্য মানে? স্বামী-সেবা? তনুমন দিয়ে তনু পরিচর্যা? শিক্ষা তোমায় উদার করেনি দেখচি! এই নারী-বিদ্রোহের যুগে ওকি কথা বলচো, তরুণ? কোন্ যুগের মানুষ তুমি?'

'এ যুগের। আমায় টেনো না। আমার শিক্ষা অতি অনুদার। উদার শিক্ষা কোথায় পাবো? নচিকেতার মতো যমের বাড়ি না গেলে আর সে শিক্ষা জুটচে না। দুঃখ এই যে, যম আমায় বাড়ি ফেরার জন্যে ছেড়ে দেবে না। কিন্তু তনু-পরিচর্যার নালিশ পুরোনো, পচা। নিজেই বলেচো ওজন্যে বাড়ি ছাড়োনি। একটা অমানুষের মঙ্গল যে করতে পারলো না, নিজের লোকের অত্যাচার সইতে পারলো না, লক্ষ মানুষের মঙ্গল করবার শক্তি সে কোথায় পাবে, পরের অত্যাচার সয়ে কি ব্রতরক্ষা করবে?'

'লাখ মানুষের আশীর্বাদের জোরে। কিন্তু তোমার যুক্তিটা বেশ! লজিকের সেই ফ্যালাসির মতো—মানুষ অমর নয়, বানর অমর নয়, অতএব মানুষ বানর। একের সঙ্গে লাখের তুলনা চলে? যে বক আঁকতে পারলো না, সাহিত্যিক হয়ে সে মানুষের সৃষ্টি করতে পারবে না, এ-কথা বলা যায়? একটি মাত্র রত্নাকরের মঙ্গল করে গেলে সে একদিন বাল্মীকি হয়ে উঠবে, এমন আশা করা বোকামি। কিন্তু এ আশা অনায়াসেই করা যায় লাখের মধ্যে হাজার বাল্মীকি ঘুমিয়ে আছে! গণ্ডী ছোটো হলেই যে ভালো কাজ করা যাবে না, তার মানে নেই! বাড়ির বৌ সমস্ত বাড়ি পরিষ্কার পরিছন্ন রাখতে পারে—কিন্তু বাড়ির সব চেয়ে ছোটো ঘরটি পরিষ্কার করার জন্যে ডাকতে হয় মেথরকে। আমি চেষ্টা করিনি ভেবেছো? এগারো বছর চেষ্টা করেচি। কিন্তু ঘরের পাকা মেঝেতে আমার চেষ্টার লাঙল আঁচড় কাটতে পারেনি—ফসল ফলাবো কি! তাই এসে দাঁড়িয়েচি এই বিস্তীর্ণ মাঠে।

যতো আগাছা থাক, মাটি যতো শক্ত হোক, অল্প একটু স্থান পরিষ্কার করে আবাদ করতে পারবো না? বাকী জীবনের চেষ্টায় একটু সোনা ফলবে না? পারবো—ফলবে।' সে থামলো।

একটু ভেবে আবার বললো, 'এই কথাটা আমি ভাবতাম, রাত্রি-দিন ভাবতাম। স্বামী আমার কাছে ছোটো নয়—তুচ্ছ নয়—কিন্তু পর। সব স্বামীই পর—নিজের চেয়ে মানুষের আপনার কেউ নয়—প্রেমে নয়, স্নেহে নয়। প্রেম দু'টি আত্মাকে কাছে আনে, কিন্তু আত্মাগত আত্মার চেয়ে কাছে-আসা আত্মার দূরত্ব বেশি। তাই আমি ভাবতাম যে, শুধু পরের কল্যাণেই বেঁচে থাকবো, আমার আত্মার কল্যাণ নেই? আমার জীবন তাদের কল্যাণে ব্যর্থ হবে, যাদের কল্যাণ হয় না? সবাই পরের জন্যেই অবশ্য বেঁচে থাকে, কিন্তু নিজের জন্যে আহরণ করে ওই বেঁচে থাকার সার্থকতাটুকু? ওরই নাম নিজের আত্মার কল্যাণ। নিজেকে দিলাম, কিন্তু দেওয়াটা মিথ্যে হলো না, এইটুকু। অন্যায়ের বিনাশের জন্যে দধীচির আত্মদান—ইন্দ্র বজ্র নিয়ে খেলা করবে বলে নয়। আমি দধীচির মেয়ে এই। যদি হইও দধীচির মেয়ে, আমার অস্থির বজ্র নিবে গেচে। একটু তাপ শুধু আছে নেবা বজ্রের ভস্মে। সেইটুকু যদি বরফের ঘর গরম রাখতে ব্যয় করে যেতাম, মরবার সময় অপচয়ের স্মৃতিতে আমার আত্মা দগ্ধ হতো। আজীবন স্বামী-সেবার পুণ্যও পুড়ে হতো ভস্ম! কারণ, সারা-জীবন চোখ বুজে কাটিয়ে মরবার সময় আমি চোখ মেলে দেখতাম দুর্লভ-জীবন কার পূজোয় কাটলো। তখন জীবনব্যাপী দানব-পূজোর আপসোস নিয়ে আমায় পরলোকে যেতে হতো! আপসোস নিয়ে মানুষ কোন্ পরলোকে যায়, জানো? নরকে।'

আমি বললাম, 'এটুকু বুঝলাম। কিন্তু আসল কথা এখনো বলিনি। তোমার তো শুধু স্বামী নয়, দু'টি ছেলে।'

সে সংশোধন করে বললো, 'দু'টি না ছ'টি। চারটি স্বর্গে গেছে! দু'টি গর্ভের অন্ধকার থেকে, আর দু'টি পৃথিবীর আলো দেখে। না, দু'টিই আলো দেখে নয়, একটি অন্ধ হয়ে জন্মেছিলো।'

এ বারতায় ব্যথা ছিলো, আঘাত ছিলো। আমাদের শিশু-জগতে

যে স্থায়ী মড়ক আছে, সে-কথা শুনেছিলাম। শুনেছিলাম মানে, দৈনিক অথবা মাসিকে পড়েছিলাম। শুধু পড়েছিলাম। কখনো ভেবে দেখিনি, শিশুর মরণের শেষ শিশুর মরণের নয়, মমতাদির মতো অসংখ্য মাতার মর্ম-বেদনায়। জগতে যার বাড়া মর্মবেদনা নেই।

সে বললো, 'তুমি ভাবচো এতক্ষণ ব্রহ্মাস্ত্র তুলে রেখেছিলে, ছেলে দু'টির কথা তুলে আমাকে কাবু করবে। ছেলেই বটে! বড়ো ছেলের বয়েস বারো—মনের বিকৃতিতে বারোশো। সে চোর, তাড়িখোর, কুটিল, রোগী, বোকা, অলস। ছোটোটিও ওমনিভাবে গড়ে উঠচে—দু'জনেই একদিন বাপের মতো হবে।'

'অতো খারাপ?' বলে আমি জিভ কাটলাম।

সে বললো, 'জিভ কেটো না। সারা জীবন কথা কইতে হবে, এখন জিভ কাটা গেলে মুশকিল। নিজেই স্বামী-নিন্দে জুড়েচি, তোমার কথায় আর কতো ব্যথা পাবো? আমার ছেলে দু'টি বাপের মতো অতো খারাপ যদি নাও হয়, যেটুকু হবে তাতেই প্রকাণ্ড অমানুষ হবে। সদগুণে বোঝাই হয়ে করবে ত্রিশ টাকার কেরানীগিরি—তাতেই অধিকারী হবে স্ত্রী-পুত্র সংসারের! দশ বছরে দশটা কুকুরছানার বাপ হবে—অকালমৃত্যু এড়াতে পারলে যারা বড়ো হয়ে দশ-দশে একশোটা শূকরছানা পৃথিবীকে উপহার দেবে। অবিশ্বাস করচো? পৃথিবী এমনি করে ভারাক্রান্ত হয় ভাই—একটা গলিত আত্মায় হাজার-হাজার গলিত আত্মার বীজ কিলবিল করে। এই জন্যে যীশু বলেছিলেন, একটি পাপী স্বর্গের দিকে মুখ ফেরালে স্বর্গরাজ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। একটি মানুষ থেকে মানব জাতি হয়েচে—কে বলতে পারে একটি পাপী থেকে একদিন একটা বিরাট পাপীর জাতি পৃথিবীতে দেখা দেবে না? একটি অমানুষের মধ্যে সমগ্র মানব জাতির ভবিষ্যৎ ধ্বংসের সম্ভাবনা নিহিত আছে। ওমনি অমানুষ হয়ে উঠচে আমার ছেলেরা! দশ মাস দেহের মধ্যে বয়ে বেড়িয়েচি, নিজের রক্তে পুষ্ট করেচি, দিনের পর দিন বুকে নিয়ে পালন করেছি, স্নেহ করেচি, ভালোবেসেচি, জগতের দু'টি অভিশাপকে। জ্ঞানের আলোয় নিজের এই মহৎ দুষ্কর্ম চিনে আমি পালিয়ে এসেছি। পাপে আমার বিরাগ, ব্যর্থতায় অরুচি।

প্রাণপাত সেবায় দেশের বুকের পাথরকে পাহাড় করে তোলা পাপ।···· তোমার ছ'চোখে প্রতিবাদ কেন? সংস্কার কি তোমায় পাপ আর ব্যর্থতার স্বরূপ ভুলিয়ে দিচ্ছে?'

আমি বললাম, 'না। তোমার কথাগুলো এতো ছোটো-বড়ো কথার চুম্বক যে, হঠাৎ শুনে ঠিকমতো ধারণা করে উঠতে পারচি না।'

সে বললো, 'সেটা আশ্চর্য নয়। বিয়ের পর থেকে এগারো বছর শুধু তো জ্বলিনি—তিল-তিল করে চিন্তার হিমালয় সৃষ্টি করেচি। আমার কথা তোমার চিন্তাশক্তিকে পীড়ন তো করবেই। এগারো বছরের ভাবনা কি ছ'মিনিটে ভাবা যায়?'

আমি বললাম, বুদ্ধি থাকলে যায়, বোকা হলে যায় না। আমি সময়মতো ভাববো। তুমি বলে যাও, আমি আরও কিছু ভাবনার খোরাক সংগ্রহ করি।'

সে বললো, 'ভেবে। ভেবে দেখো আমি বাড়িয়ে বলিনি, অবস্থা বিশেষে মা হওয়া সত্যিই মহাপাপ, মহৎ ব্যর্থতা। তুচ্ছ পয়সা দিয়ে কেনা ছধ-কলা দিয়ে সাপ পোষা অন্যায়, ছুর্ভাগ্য;—শরীরের রক্ত খাইয়ে সাপ পোষা কতবড়ো অন্যায়, কতবড়ো ছুর্ভাগ্য? আবার, এই শোচনীয় কৌতুক একমাত্র মায়ের অদৃষ্টে! স্বামীর কাছে জীবনের একটি স্ফুলিঙ্গ ভিক্ষা পেয়ে তিল-তিল করে বাড়িয়ে জননীকেই জ্বেলে দিতে হবে একটি সম্পূর্ণ জীবনের চুল্লী—যদি সে চুল্লীতে জগতের কল্যাণে যজ্ঞ করা যায় গৌরব জননীর, যদি তার আগুনে গৃহদাহ হয় সে কলঙ্কও জননীর। মায়ের দায়িত্ব এতবড়ো, ভাই! তাই পৃথিবীর ছ'টি গলগ্রহ সৃষ্টি করে আজ আমার অসীম অনুতাপ। আমার মাঝে-মাঝে ভয় হয়, দেশ আমার সেবা নেবে না। অসুস্থ দেশের মুখে যে ছ'ফোঁটা বিষ ঢেলে দিয়েচি, সে অপরাধ ভুলবে না। এ চিন্তার দাহে আমার শুধু ক্ষেপে যাওয়া বাকী আছে। ভগবান আজ যদি ওদের কাছে টেনে নেন, তবে বোধহয়—তবে বোধহয়—'

ভগবানের নাম নিয়ে মা'র মুখে সন্তানের মৃত্যু কামনা! এই অস্বাভাবিক ভীষণ মহত্ত্বে আমি চমকে গেলাম। নিজের অসমাপ্ত উক্তির প্রহারে সেও কেঁদে ফেললো। আমি বুঝলাম, এ কান্নার অর্থ কী।

অভিশাপের প্রত্যাহার। মুখের কথা নয়, ভগবান যেন মনের কথাটাই কানে তোলেন এই নিবেদন।

সূর্যালোকে নদীতে ঢেউগুলি চমকাচ্ছিলো, তীর ঘেঁষে চলেছিলো একটি পানসি। বুড়ো মাঝি লগি ঠেলছে, ছেলে কোলে একটি মেয়ে তীরের শোভায় মুগ্ধ হয়ে বসে আছে, একটি দুরন্ত ছেলের হাত শক্ত করে ধরে। কিছুদূরে নদীর বাঁক, সে পর্যন্ত আমি নৌকোর জননীটিকে অনুসরণ করলাম। ততক্ষণ কাছের জননী শান্ত হয়েছে।

বললাম, 'এভাবে চরমে উঠলে এ আলোচনা আপনা থেকে বন্ধ হয়ে যাবে।'

সে ম্লান হেসে বললো, 'চরম কীর্তির আলোচনায় চরমে না উঠে উপায় ?'

বললাম, 'তুমি শুধু ইঙ্গিত করো, বাকীটা আমি অনুমান করবো। নরকের অন্ধকার আর স্বর্গের জ্যোতি টেনে আনলে দুটোই চোখকে খোঁচা দেবে, অসুস্থ করবে। আমরা পৃথিবীর মানুষ, আমাদের মাঝামাঝি রফা হওয়াই ভালো।'

'ভীরু !' বলে সে হাসবার চেষ্টা করলো।

আমি বললাম, 'নিঃসন্দেহ। কিন্তু আর সমালোচনা নয়। যতো রেখে-ঢেকেই বলো, অপমানিত হবো। তোমার কথাই হোক্। তুমি যা বললে তাতে একটা প্রকাণ্ড মুশকিল আছে। বোধহয় সে মুশকিলের অবসানও নেই।'

'কি মুশকিল ?'

আমার মতো ভীরু অকর্মণ্য থেকে আরম্ভ করে তোমার ছেলেদের মতো চোর-ছ্যাঁচোড়কে জন্ম দিতে সবাই যদি তোমার মতো অস্বীকার করে, দেশের সূতিকা-ঘরের সাড়ে তিনদিকের দেয়াল ভেঙে পড়বে। দেশটা তখন জন্মাবে কোথায় ?'

'জন্মাবে না !'

শুনে আমি থ বনে গেলাম। সে বললো, 'ভড়কে গেলে দেখচি। দুর্ভাবনার কারণ নেই। দেশের সূতিকা-ঘরে সাড়ে তিনদিকের দেয়াল কি

আমার মতো মায়েরা? দেশ কি জন্মায় কেরানী আর অপদার্থ ধনীর ঘরে? শহরের বিষপান করে যে ক'টি মানুষ জ্ঞান হারিয়েচে, তাদের বাড়িতে? কলকাতাতেই অগুনতি ডালিম বেদানা—আইন করে তাদের সকলকে হত্যা করলে কলকাতার নারী-সমাজের কি আসবে-যাবে? বরং লাভ হবে—ক্ষতি নয়। আমার মতো মায়েরা মা হতে অস্বীকার করলে, সূতিকাঘরের অনাবশ্যক ভিড় কমবে, দেশের উপকার হবে। গান্ধারীর সংযমে কুরুক্ষেত্রের কলঙ্ক রদ হবে। ঘরের মানুষের সঙ্গে লড়াই করে ধর্মকর্মের শক্তিক্ষয় হবে না;—জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম জগতে ছড়িয়ে পড়ার সময় পাবে, জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্মী জগতের স্বাধীনতা মুহূর্তে অর্জন করবে। দুর্যোধনকে মজুত রাখতেই যুধিষ্ঠির আর অর্জুনের সময় ও শক্তি ব্যয়িত হলে গান্ধারীর কি লজ্জা, ভাই? সহজ লজ্জায় কি মা হয়ে ছেলেকে বলেছিলো, তোমার নয়, ধর্মের জয় হোক।'

আমি বললাম, 'তবে বললে কেন—দেশ জন্মাবে না?' কথার সুরে মনে হলো, দেশ না জন্মালে ক্ষতি নেই?

সে বললো, 'ও যদির কথা। আমরা মা না-হলে যদি দেশের সূতিকাঘরের সাড়ে তিনদিকের দেয়াল সত্যি ভেঙে পড়ে। জন্মানটাই কি দেশের চরম সৌভাগ্য? না জন্মানটা দুর্ভাগ্য? কতো দেশ গেছে সমুদ্রের তলে, কতো জাতির চিহ্ন লুপ্ত হয়েছে। সেজন্যে কে তাদের দোষ দেয়? অবসানের দুঃখ কি? মৃত্যু যদি মানুষের লজ্জা না হয়, মানুষে-গড়া জাতির মৃত্যুতেও লজ্জা নেই। ক্রমাগত রোগে ভোগার চেয়ে বরং মরণ ভালো।'

আমি বললাম, 'এ-সব হতাশার বাণী, ভুল কথা। মৃত্যুতে মানুষের লজ্জা নেই। কারণ, মৃত্যু যবনিকা নয়, পট-পরিবর্তন। নিজের জীবন মানুষ পৃথিবীর মানুষের মধ্যে জমা করে রেখে যায়, স্বর্গে নিয়ে যায় না।'

'জমা করা জীবন যখন পচে যায়? একমাত্র Noahকে বাঁচিয়ে প্রলয়ের মধ্য দিয়ে যখন ভগবান ভ্রমসংশোধন করতে বাধ্য হন?'

'তখন ভগবান অত্যাচারী, খেয়ালী। প্রলয় যে এনে দিতে পারে সে সংস্কারে অক্ষম হবে কেন? জীবনের রোগ আছে, ফাঁসি ছাড়া আরোগ্য

নেই? ক্রমাগত রোগে ভোগার চেয়ে মরণ ভালো, কিন্তু রোগ সারিয়ে বেঁচে থাকা আরো ভালো।'

সে মৃদু হাসলো, 'তোমার হলো কি? আমি পূবে গা বাড়াচ্ছি, তুমি হাঁকচো পশ্চিমে যাত্রা নাস্তি। সুস্থ সবল হয়ে বাঁচা মন্দ, আমি তা বলিনি। বলেচি, লয় অপরাধ নয়, লয়ে লজ্জা নেই। এটা আমাদের আলোচনা-গণ্ডীর বাইরের অতিরিক্ত সত্যি। আমার সমস্যার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে ব্যাকুল হয়ো না। পাগল! হাজার হাজার মানুষের দেহের রক্ত আর জীবনের দিন দিয়ে অসুস্থ দেশের জন্যে ওষুধ তৈরি হচ্চে, আমি করবো তার প্রতিবাদ? অতিরিক্ত দার্শনিক তত্ত্বকথা থাক, আমার কথাটা নিয়ে আলোচনা চলুক। আমি বলেচি, অসুস্থ দেশের ওষুধের উপযুক্ত জীবন সৃষ্টি হোক। কিন্তু কুপথ্য আর বিষের সৃষ্টি যেন না হয়। তুমি প্রতিবাদ করো?'

আমি বললাম, 'ঠিক প্রতিবাদ নয়। বলতে চাই, সে তো তোমাদের হাতে।'

'মানে?'

'মানে, সব শিশুই আরম্ভ—পরিণিত নয়। জীবনের ভিত্তির মিস্ত্রীও তোমরা। তুমি ছেলে দু'টিকে মানুষ করে গড়ে তুললে না কেন? স্বামীর মঙ্গল করতে পারলে না, তার কারণ বুঝতে পারি, তার শিক্ষা-দীক্ষা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিলো, তোমার সঙ্গে পরিচয়ের আগে। কিন্তু তোমার ছেলেরা ভালো-মন্দ কোনো শিক্ষা নিয়েই জন্মায়নি। তাদের তুমি মানুষ করে গড়ে তুললে না কেন? নিজেই বললে, তোমাদের শক্তি সামান্য। সামান্য শক্তি এতবড়ো দেশে ছড়িয়ে দিয়ে কি লাভ হবে? দু'টি ঘুমন্ত দেশ-সেবককে জাগাতে পারলে সব চেয়ে বড়ো দেশসেবা হতো না? কেন তা করলে না?'

'কেন করলাম না? পারলাম কই? খাঁচার শিকে-শিকে বাধা পেলাম। কোলের ছেলে যখন এক বছরেরও নয়, গর্ভে ছেলে এলো। সকাল-সন্ধ্যে রান্নাঘরে কাটলো, বাকী সময় নানা কাজে। অভাবের খোঁচায় মাথায় ঘা হয়ে গেল, চিন্তার বিষে অবসন্নতা ও অবহেলা এলো। যেটুকু সময় ও সাধ্য হাতে রইলো, স্বার্থপর স্বামী তা ছিনিয়ে নিলো। তবু আমি পারতাম। অতি-মানুষ না করতে পারি, অমানুষ হতে দিতাম

না, যদি ওদের জীবন বিষাক্ত আবহাওয়ায় বিষিয়ে না যেতো। চব্বিশ ঘণ্টা পলে-পলে যাদের জীবন বিকৃত হয়, পাঁচ মিনিটের চেষ্টায় আমি তাদের কি করতে পারি? জন্ম থেকেই ওরা অভিশপ্ত। বাপের অসংযমে জন্মালো রুগ্ন হয়ে, খাদ্যের অপ্রাচুর্যে দেহ-মন কুঁকড়ে গেল, বিকাশ হলো না, জীবনী-শক্তির অভাবে ক্রমাগত রোগে ভুগলো, দোষে-বিনাদোষে বাপের ঠ্যাঙা খেয়ে কুটিলতা শিখলো, শিশু-মনের ক্ষুদ্রতম আকাঙ্ক্ষাটি অতৃপ্ত থাকায় চুরি শিখলো, বাড়ির ভয় ও নিরানন্দ আবহাওয়ায় মন না টেঁকায় বেশি সময় বাইরে কাটাতে ভালোবাসলো, যার-তার সঙ্গে মিশে অসৎ-সঙ্গের অশেষ দোষ সঞ্চয় করলো, পয়সা আর খাবারের লোভে বজ্জাত লোকের কাছে কামুকতার দীক্ষা পেলো। এ তো সংক্ষিপ্ত হিসেব, আরও কতো আছে! এবার বুঝলে, কেন পারলাম না?'

আমি কতক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। একি বর্ণনা, একি নালিশ! মনের জ্বালা কি শব্দের রূপ নিতে পারে? অত্যুক্তি মনে করার চেষ্টায় ব্যর্থ হলাম, আমার কোনো সান্ত্বনা রইলো না। শুধু মুখের কথা তো নয় যে, শোনার সঙ্গে হৃদয়ের যোগাযোগ কম-বেশি করে যতটুকু মানলে মনের স্বস্তি ততটুকু মানবো! সন্তান-হারা মা আমার সামনেই বসেছিলো। অত্যুক্তি যদি, ও কেন ছেলে ফেলে এলো! সন্তান হারানোর চরম প্রমাণেই যে ও প্রমাণ করছে অভিযোগ বাড়িয়ে বলা নয়!

সে বললো, 'অনেক দুঃখেই বাড়ি ছেড়েছি, ভাই। আমি অভিশপ্তা স্ত্রী ও জননী, আমার সন্তান দেশের অভিশাপ, জীবনের এমন অসামঞ্জস্য বরদাস্ত হলো না। আমি মুক্তি নিলাম। এ মুক্তি সময়-সময় পীড়া দেয়, এগারো বছরের চেনা খাঁচার ডাক আমি শুনতে পাই। আমার বুক ফেটে যায়। আমি যাতনায় ছটফট করি। কতক্ষণের জন্যে দেশের সেবায় দারুণ রাগ জন্মে। মনে হয়, গ্লাজ হয়ে পথের ধুলোয় চোখ বুলিয়ে চলতে দেশের মানুষ যদি ভালোবাসে, ভালোবাসুক; সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মুক্ত নীলাকাশের দিকে না তাকাতে চায়, না চাক্, আমার কি? আমি কেন মানুষের আত্মহত্যা দিয়ে এমন নিষ্ঠুর পূজো করে চলি? কিন্তু এ দুর্বলতা কেটে যায়, মুক্তির পীড়ন গর্ব ও আনন্দ হয়ে ওঠে।'

আমি বললাম, 'দেশে অসংখ্য পুরুষ, দিদি! তরুণ-তরুণীতে দেশ ভরা। তোমার মতো তারা মাটিতে শিকড়-বসা তরু নয়। নিজেকে উপড়ে তুলে এই অস্বাভাবিক ত্যাগ তোমায় করতে হবে কেন! তুমি ফিরে যাও।'

সে হাসলো, 'সংখ্যার গর্বে দেখি ফেটে পড়ছো! প্রমাণ কই? তুমি আমায় বুঝিয়ে দিতে পারবে যে, আমি আনাবশ্যক অতিরিক্ত বাহুল্য? যদি পারো, এখনি ফিরে যাবো। সতীনকে পর্যন্ত ভয় করবো না!' একটু থেমে বললো, তুমিও তো পুরুষ, না ভাই? শিকড়হীন পুরুষ! কেবল কলেজ ডিঙিয়ে শিকড়-গাড়বার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছো, এই যা আপসোস। একটি বাড়ি, টুকটুকে একটি বৌ, চাঁদের টুকরো একটি ছেলে। খাসা শিকড়! না? লোভী!'

আমি ক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম, 'অনেক আগে ঘাট মেনেচি, খোঁচাচ্চো কেন?'

'খোঁচাচ্চি? মাইরি না। কালীর দিব্যি।' স্বামীর ভাষাতে প্রতিবাদ করলে, 'আর রাগ করো না।' বলে সে হাসলো। আমি গম্ভীর হয়ে ভাবতে লাগলাম।

সেও গম্ভীর হয়ে বললো, 'সত্যি খোঁচাইনি, ভাই। খোঁচাবার অধিকার কোথা পাবো? যার যে অধিকার নেই, সে তা করলে ভেবে নিতে হয়—ঠাট্টা করেচে।'

'খোঁচাবার অধিকার তোমার আছে।'

'না, নেই! আমার দেশসেবা যে বাধ্যতামূলক।'

'সে সবারই। অধীনতা বাধ্য করে।'

'করে কি? অধীনতার দুঃখ না স্বাধীনতার লোভ করে তা কি করে জানলে? না ভাই, জবাব চাইনি। এ-কথার জবাব মানে আধ ঘণ্টা ধরে তোমার বক্তৃতা। আমি জানি জবাব। দুই কারণেই। কিন্তু ও-রকম দেশসেবা বাধ্যতামূলক নয়, ভাই। তাহলে মাতৃস্নেহকেও বাধ্যতামূলক বলতে হয়। আমার এই সেবা কিন্তু সত্যি বাধ্যতামূলক। সে জীবন সইলো না বলে আমি এ জীবনে আশ্রয় নিয়েচি—ঝড়ে ভাঙা তরী এনেচি বন্দরে বেশি নয়, একটা ছেলেকেও যদি মানুষ করতে পারতাম, আমি

সেখানকার মাটি কামড়ে থাকতাম। আকণ্ঠ নয়, ব্যর্থতায় একেবারে তলিয়ে গিয়ে দম আটকালো বলেই না এখানে নিঃশ্বাস ফেলতে এসেছি! আমি আজ সুখী দুঃখী দুই, কিন্তু এগারো বছর যে দেয়ালের অন্তরালে ছিলাম, সেখানে থেকে সন্তানের মধ্যে দিয়ে দেশের সেবা করতে পারলে আরও সুখী হতাম। কিন্তু এ কথাটাও বলি, আমার এ জীবন আমার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের বহু উর্ধ্বে—আমার এ জীবন তুলনাহীন। ছিলাম যন্ত্র—আজ আমি মানবী, যার আত্মা আছে, যার জীবনের অনেক মূল্য, অনেক প্রয়োজন, অনেক মানে। বেশি কি, আজ তোমার প্রণম্য!'

আমি নীরবে তাকে প্রণাম করলাম, পেলাম আশীর্বাদ। তারপর চুপ করে বসে রইলাম। সূর্য তখন নদীর অপর তীরে, তরুশ্রেণীর খানিক উর্ধ্বে। নদী দিয়ে একটা স্টীমার চলে গেল, তীরে আছড়ানো ঢেউ-এর শব্দ মৃদুভাবে কানে এলো। কয়েকটা বক নদীতীরে বসেছিলো, হঠাৎ উড়ে গেল।

মমতাদি বোধহয় ভাবেনি এতো শিগ্‌গির আমি তাকে রেহাই দেবো। স্পষ্ট অনুভব করলাম, সে আমার কথা বলার প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু আমি আর মুখ খুললাম না। কতো কথা তো বললাম, কিন্তু কথা বলে লাভ কি? সংসারের জ্বালায় কতো মানুষ গেরুয়া পরে পালিয়েছে, কতো মানুষ ক্ষেপে গেছে, কতো মানুষ আত্মহত্যা করেছে—মমতাদি যদি জগতের মধ্যে মহত্তম কর্মবৈরাগ্যে আধ-পোড়া মনের আগুন নেবাতে চায়, কথার বিনিময়ে কোনো কিছুর এদিক-ওদিক হবে না। পরিণয়ের যজ্ঞভস্মে ঘি ঢেলে চলা যতবড়ো কর্তব্য হোক, সেটা ঘিয়ের অপচয় নিশ্চয়ই, সে অপচয় বন্ধ করা যতবড়ো অকর্তব্য হোক, স্বাধীনতার হোমানলে ঘি ঢেলে চলা যে ঘিয়ের সবচেয়ে সদ্‌ব্যবহার তাও নিশ্চয়ই। সুতরাং নানাবিধ ধারণা ও সংস্কারে বোঝাই মন নিয়ে তর্ক করা কথারই অপচয়।

অতএব কথা বন্ধ করে আমি ভাবতে লাগলাম অধুনা-পরিত্যক্ত স্বামী-পুত্রের কল্যাণে এই নারীটি একদিন আমাদের বাড়ি রাঁধুনী হয়েছিলো—গভীর রাত্রে ঘুমের কবল থেকে ছিনিয়ে-নেওয়া কয়েক ঘণ্টা সময় ছাড়া এগারোটি বছর একটানা বেঁচেছিলো শুধু স্বামী-পুত্রের জন্য।

স্নেহ, প্রেম, মমতা, মানুষের নাগপাশ। নাগপাশের মূর্ছার তন্দ্রা। নাগপাশে আবদ্ধা থেকেও যে মোহনিদ্রা টুটিয়ে দিলো, বাঁধনসুদ্ধ যে বেরিয়ে পড়লো পথে, পাশবদ্ধ কর্মশক্তি নিয়ে যে সকলের জন্য যে-বিপুল কাজ পড়ে আছে তার নিজের ভাগটুকু শেষ করতে প্রবৃত্ত হলো, তাকে বোঝা যায় না। সে দুর্বোধ্য ; তাকে ঘিরে রহস্য। মমতাদির শান্ত ও গম্ভীর মুখ দেখে আমার মনে হলো, রাঁধুনীর কাজ নিতে এসে যে আমার শেষ শৈশবে স্নেহ-করার শক্তিতে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছিলো, আজ আমার প্রথম যৌবনে সে আবার স্নেহ অস্বীকার করার শক্তিতে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে।

সন্ধ্যার সময় বিদায় নিলাম—প্রদীপ জ্বালার আগে। সে বললো, 'তোমায় একটা কাজ দেবো।'

'কি কাজ ?'

'সপ্তাহে একখানা কার্ড লিখে ওদের খবর দেবে।'

'কি খবর ? কুশল ?'

'হ্যাঁ' বলে সে চোখ মুছতে-মুছতে হাসলো।

'বলচো, ওদের। ওদের মানে কি তোমার স্বামীরও ?'

'নিশ্চয়। আধখানা কুশল সংবাদ নিয়ে করবো কি ?'

'স্বামী-ভাগ একেবারে আধখানা! একটা স্পষ্ট কথা জিগ্যেস করচি। স্বামীকে তুমি ভালোবাসতে ?—ব্যস্!'

সে একটু ভাবলো, 'ভালোবাসা ? প্রেম ? কি জানি ভাই, ও-সব বুঝি না। এইটুকু বুঝি যে, না দেখলে মন কেমন করে, খবর জানতে ইচ্ছা হয়। এগারো বছর যার ঘর করা যায়, তার হীনতা বোধহয় স্নেহ-মমতাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।'

আজ ঠিক করতে পারি না, তার স্বামী-প্রেম ছিলো কি ছিলো না।

বন্দিনী

আশাপূর্ণা দেবী

কপালে সিঁথি-ঝাপ্‌টা, নাকে নোলক, গলায় সাতনরী হার। সর্বাঙ্গেই নতুন গিনিসোনার ছটা। পায়ে—ঘুঙুর-গাঁথা মলের নিচে আবার ভারী-ভারী পানকস্কা-বসানো চরণ-পদ্ম।

সভ্যদেশের লোকের চোখে পড়লে বলতো—অত্যাচার।

তবে আমরা এখনো প্রায় সভ্য হয়েও এ-সব বস্তুকে অলঙ্কারই বলি। ...তা সে যাই হোক—অলঙ্কারের ঘটা যতই থাক, গায়ে জামা-সেমিজের বালাইমাত্র নেই।...সোনালী জরির তেরছা ডুরে-টানা একখানা ঘোর-বেগুনী বেনারসী শাড়ি পরনে।

অবশ্য পরনে না বলে জড়ানো বললেই বেশি-ঠিক বলা হয়।

আট বছরের মেয়ের পক্ষে—সাঁচ্চা জরির ভারে ভারাক্রান্ত পুরোপুরি একখানা শাড়ি সত্যিই কি আর পরা সম্ভব? তাই ঝকঝকে আর মটমটে আঁচলটা মমতালেশহীন-চিত্তে গুটিয়ে-সুটিয়ে কোলের উপর জড়ো করে ধরে নববধূ ঊর্ধ্বমুখে আর বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ঠাকুর-দালানের উচ্চতা নিরূপণ করতে থাকে।

উঃ, কতো মোটা-মোটা আর কি ভয়ঙ্কর উঁচু-উঁচু থাম। থামের গায়েও আবার কতো বাহার, চিত্তির-বিচিত্তির করা! কার্নিশগুলোর বাহার দেখলে তো তাক লেগে যায়!....

অতো উঁচুতে উঠে অতো লতাপাতা আঁকলো কে? মিস্তিরি? কিন্তু কি করে?...খিলেনের পর খিলেন....দালানের ভিতর আবার দালান, ঠাকুরের বেদীটা কতো দূরে, ঈস্!...

দেওয়ালগুলোই বা এমন চকচকে হলো কি জন্য?

স্বর্ণকুমারীর নিজের বাপের বাড়িতে না-হয় মাটির দেওয়াল, কিন্তু পাকা দেওয়াল কি দেখেনি ? কেন ঠাকুর-দালানই তো দেখেছে মুখুজ্যেদের। ···মুখুজ্যেদের তো চাষাভুষোরা 'রাজাবাবু' বলে····উঃ, কী জোর ঘটা হয় তাঁদের বাড়িতে পূজোর সময়।

সব পূজোতেই হয়—কিন্তু সব থেকে বেশি দুর্‌গা পূজোয় পূরো চারদিন ধরে খালি বাজনা বাজে।····বাজনার আওয়াজে সব সময় যেন বুকের মধ্যে গুমগুম শব্দ হতে থাকে।···ঠিক ভয় করার মতো।···সেই কেমন এক আতঙ্কমিশ্রিত আনন্দময় মানসিক অবস্থা নিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি পূজোর দালানের আশপাশে ছেলে-বুড়ো, ইতর-ভদ্র, সাধু-ফকির, ঢাকী-ঢুলি, অনেকের ভিড়ের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে শুধু ঘুরে বেড়ানো··· কী অদ্ভুত মজা লাগে সেই চারটে দিন।

'পেসাদের' ডাক পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটার স্মৃতিটাও কম হৃদয়গ্রাহী নয়।···আঃ, মনে করলেই যেন 'তিলপিটুলী বেগুন ভাজার' গন্ধ নাকে এসে লাগে। বুকের মধ্যে বাজনার শব্দ গুমগুম করে ওঠে।·· সকলেই জানে 'রাজাই' কাণ্ড মুখুজ্যেদের।

কিন্তু তাও এ-রকম চকচকে দেওয়াল তো নেই তাঁদের ? একটু হাত ঘষে দেখবার লোভ অনেক কষ্টেই সংবরণ করে স্বর্ণকুমারী। নেহাত নববধূ এবং সঙ্গে মেজো-ননদ শ্যামা রয়েছে বলে। . কি জানি, কি বলে বসে— দেখলে! বিয়ের আগে তাকে উঠতে-বসতে যতো সাবধান করা হয়েছে, তার কোনো কথাটাই স্পষ্ট মনে না থাকলেও একটা অপরাধী আর আতঙ্কিতভাবে শিকড় গেড়ে গেছে মনের মধ্যে! কোনো-কিছু—নির্দোষ কিছু করতে গেলেও ভয় করছে, কাল এদের বাড়ি আসা থেকে।

শুধুই তো শ্বশুর-বাড়ি নয়—বড়োলোক শ্বশুর-বাড়ি যে।

স্বর্ণকুমারী শুনেছে সব, কতো কথা—পিসিমা আর মা'তে যতো গল্প হচ্ছিলো সেদিন।···খুব নাকি বড়োলোক এরা।····মুখুজ্যেদের চাইতেও অনেক—অনেক বেশি ; ধেৎ, তাই কি আর হয় ? কে জানে, হবেও বা !···· এই তো গয়না আর চকচকে সব কতো কাপড় দিয়েছে এরা স্বর্ণকুমারীকে।···

স্বর্ণকুমারী ফরসা বলে আর অনেক বেশি চুল আছে বলেই নাকি বৌ করলো এরা। নইলে করতো নাকি? স্বর্ণদের তো মোটে তিনটে মাটির ঘর।··যাকগে, মরুকগে····দৈত্যপুরীর মতো বড়ো একটা বাড়ি আর গাদা-গাদা লোক দেখে তো হাঁপিয়েই উঠেছে স্বর্ণ কাল থেকে।···কোথায় ঘর, কোন্‌দিকে দালান, ক'টা সিঁড়ি বুঝতেই পারা যায় না।

তার থেকে এই পুজোর দালানই ভালো!

ভালোর মতো ভালো। দেখলে সমস্ত শরীর যেন আনন্দে অবশ হয়ে আসে।

হ্যাঁ, বিশ্বাস হচ্ছে বটে বড়লোক!

মুখুজ্যেদের চাইতে অনেক বেশিই বড়লোক!

'—ঠাকুরঝি, শোনো ভাই'—নববধূ-জনোচিত ফিসফিস স্বরে সোৎসুক প্রশ্ন করে স্বর্ণ—'ওপরে, ছাতে সারি-সারি অতো লোহার বালা ঝুলছে কেন?'

'ঠাকুরঝি' না বলেও উপায়ও নেই, কাল আসামাত্রই শাসিয়ে রেখেছে শ্যামা—খবরদার নামটাম করো না বলছি, আমি তোমার চেয়ে এক বছরের বড়ো হই, বুঝলে? 'ঠাকুরঝি' বলবে।

'—বালা কি গো, বৌ?' শ্যামা হেসে ওঠে—'ঝাড় লণ্ঠনের আঙটা ওগুলো।····ঝাড়ের আলো দেখোনি বুঝি কখনো?···দেখেছো? তবে? একশো বাতির সব ঝাড় ঝুলিয়ে দিতে হয় ওখানে। আর এই সামনে যে দুটো দেখছো, টানা-পাখা ঝোলায় ওতে।··টানা-পাখা দেখেছে তো?'

ঝাড় লণ্ঠন! ওঃ।

মুখুজ্য-বাড়িতে অলে বটে—একটা।···

যাত্রার আসরের ঠিক সামনে নাটমন্দিরে। কিন্তু—দালানে এতো আলো! উঃ, সবগুলো একসঙ্গে জ্বেলে দিলে কী মজাই হয়! লোকে বুঝতেই পারবে না নিশ্চয় দিন না রাত্তির।

এদের কি সবই অদ্ভুত?

দেউড়ির মাথায় দিব্যি একখানা ঘর বানিয়ে রেখে দিয়েছে, নহবত-

ওলারা নাকি ওর উপর চড়ে বসে সানাই বাজাবে। শোনো দিকিন কথা? উঠবে কি করে? মই দিয়ে?…

নাঃ, দালান বটে!

পায়ের পাতাটা মেঝেয় চেপে চেপে শ্বেতপাথরের শীতলত্বটুকু অনুভব করবার চেষ্টা করে স্বর্ণ।

অভিভাবিকা শ্যামা এ-সব ভাববিলাসের ধার ধারে না, সে নববধূর একটা হাতে টান মেরে রীতিমতো গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলে—'হাঁ ক'রে ওপর-মুখো হয়ে দেখছো কি? বেদীতে পেন্নাম করে যাই চলো তাড়াতাড়ি। মা বকবেন যে দেরি হলে।'

খিলেনের পর খিলেন গাঁথা…থামের পর থামের সারি….চারখানা দালান পার হয়ে শেষটায় দেবীর আসন গাঁথা।…প্রায় দু'হাত উঁচু প্রকাণ্ড লম্বা-চওড়া মার্বেল পাথরে গড়া বেদী· তার উপর চড়ানো রয়েছে বহু কারুকার্যখচিত কাঠের 'কাঠরা'। কী বিরাট! কী প্রাণ-ভরা! উঃ! এই কাঠরায় যখন প্রতিমা সাজানো হয়?

শ্যামা নিজেই তাড়াড়াড়ি বেদীর গায়ে মাথাটা একবার ঠেকিয়ে নিয়ে তাড়া দিয়ে ওঠে—'নাও—করো পেন্নাম? কাঠরাখানাও দেখতে হবে হাঁ করে? আদেখলে ঘরের মেয়ে কিনা!'

ন'বছরের মেয়ের মুখে এই কথা! না, অবিশ্বাস করবার কিছু নেই। শ্যামার মাত্র ন'বছর বয়স বলে সংসারের কোনো কথা কেউ তার সামনে রেখে-ঢেকে বলবে তা তো নয়?

তা, স্বর্ণ অবশ্য এতবড়ো অপমানেও বিশেষ বিচলিত হয় না। তেমনি উৎকণ্ঠিত ব্যাকুল স্বরে বলে—'একি কাণ্ড, ঠাকুরঝি? কতবড়ো 'পিরতিমে' হয়, ভাই? দালানের ছাতে ঠেকে যায় না তো?'

শ্যামা ঠোঁট উল্টে বলে—'পূজোই হয় না, তা পিরতিমে।'

'—পূজোই হয় না!'

স্বর্ণ একটা মানে ঠিক করে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে বলে—'ছি, ঠাকুরঝি; ও-রকম ঠাট্টা করতে আছে নাকি?'

'—ওমা, ঠাট্টা আবার কি? জিগ্যেস কর গিয়ে সবাইকে। হ্যাঁ,

আগে পূজো হতো শুনেছি, খুব ধুমধাম করেই হতো। সাত-গাঁয়ের লোকে নেমন্তন্ন খেতে আসতো। বাজনাবাদ্যির শব্দে নাকি কালা হয়ে যেতো অনেকে।...সে তখন আমি জন্মাইনি।...এখন উঠে গেছে।'

'—পূজো উঠে যায় ?'

বিস্ফারিত দৃষ্টি আর রুদ্ধ নিশ্বাসের সঙ্গে প্রশ্ন করে স্বর্ণ।

'—তা, উঠে যাবে না ? খুঁত হয়ে গেলো যে !'

'—খুঁত ? সে কি ঠাকুরঝি ?'

'—আঃ, তাও জানো না, নেকি। কেউ মরে গেলেই খুঁত হয়ে যায়।...আমি জন্মাবার আগের বছরই অষ্টমী পূজোর দিন সকালবেলা নাকি সব্বাই এসে দেখলো, আমার যে বড়ো ভাই ছিলো—কেষ্টগোপাল—সে ওই দালানে ঠাকুরের সামনে মরে রয়েছে !'

'—অ্যাঁ ! সে-কি ঠাকুরঝি ? কি করে হলো ?'

'—তবে আর বলছি কি।..কি করে হলো, তা কে জানে। কবরেজে নাকি বলেছিলো 'সন্ন্যিসী রোগ' না কি। মা কেঁদে-কেঁদে বললেন, পূজোয় অপরাধ হয়েছে—আর কখনো পূজো করবো না।'

জন্মাবধি শতাধিকবার শোনা কাহিনী স্বচ্ছন্দেই বলে যায় শ্যামা। কোনো ভাবলক্ষণই প্রকাশ পায় না তার মুখে। কিন্তু স্বর্ণ ? শুনে স্বর্ণরই যে সন্যাস রোগ হবার যোগাড় !

'—মরে গেল ছেলেটা ! তাইতো। কিন্তু 'প্রমাই' ফুরেলেই তো মানুষ মরে যায়, ঠাকুরঝি ; তাই বলে 'পূজো করবো না' বলতে আছে ? অ্যাঁ ! তাতে বুঝি পাপ হয় না ?'

'—কি জানি বাবা, পাপ-পুণ্যি বুঝি না। যা শুনেছি, তাই বলছি। ....পূজোয় চারদিন ধরে শুধু কাঠরার ওপর একটা ঘিয়ের পিদিম জ্বলে, রাত-দিন।...আর কিছু না।'

বেনারসীর আঁচল জড়ো হতে-হতে ক্রমশ কোল-আঁচলে টান ধরে... অতো খেয়াল নেই স্বর্ণর, নিতান্ত শূন্য মনে সে আবার ফ্যাল-ফ্যাল করে চারদিকে তাকিয়ে দেখে।...কিন্তু সে আনন্দ, সে ঔৎসুক্য কই....

পূজো হয় না ! পিরতিমেই আসে না !

প্রতিমাহীন এই শূন্য বেদীখানা খাড়া করে রাখার অর্থ কি তবে?

হঠাৎ কাণ্ডজ্ঞানহীনা বালিকা একটা কাণ্ড করে বসে—কাঠরায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে উঠে রীতিমতো জোরের সঙ্গে বলে ওঠে—'আমি বড়ো হয়ে আবার পিরতিমে আনবো—পূজো করবো। করবো করবো করবো—তিন-সত্যি।'

'—বৌ!…'

ক্ষুদে শ্যামার কণ্ঠেও যে আগুন ঝরে পড়ে—'কী সর্বনাশ করলি? অ্যাঁ?…বেদী ছুঁয়ে তিন-সত্যি করলি? পাপে ডুবে নরকে যাবি যে।'

স্বর্ণর স্বরটা এবারে একটু দুর্বল শোনায়—'বাঃ, 'তিন-সত্যি' করে না রাখলেই তো নরকে যায় মানুষ! রাখলে পরে দোষ হবে কেন?'

'—রাখবি কি করে, শুনি? এ দালানে আর পূজো হবে নাকি কখনো?'

'—বাঃ, কেন হবে না? মানুষ বুঝি মরে যায় না? ঠাকুরের কি দোষ হলো?'

'—দোষ-গুণ বুঝি না, বাবা—চলো তোমার কীর্তি বলে দিচ্ছি সবাইকে।—অ্যাঁ! নতুন কনের আস্পদ্দা দেখো! উনি বড়ো হবেন—হয়ে পূজো করবেন! গিন্নী হবার শখ এখনি।—কী ঘেন্নার কথা, বাবা! …এই জন্যেই বলে ছোটো-ঘরের মেয়ে আনতে নেই।'

স্বর্ণ এবারে একটু আহত হয়; বোধকরি 'ছোটো-ঘর' কথাটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় বলেই।….কিছুক্ষণ পূর্বের ভীতভাব ছেড়ে দৃপ্তভঙ্গীতে মাথা উঁচু করে বলে—'বেশ, আমরা গরীব আছি—আছি। আমাকে বউ করার কী দরকার ছিলো তোমাদের, শুনি?…ভারী তো বড়লোক! দুগ্‌গা-পূজো হয় না, আবার বড়লোক!…'

'শ্বশুর-বাড়ি নামক ভীতিকর স্থানটি সম্বন্ধে বহু হিতৈষিণীর বহু উপদেশ আর শিক্ষা বিস্মৃত হয়ে স্বর্ণকুমারী বধূ-জীবনের প্রারম্ভেই একটি রেকর্ড রেখে বসে থাকে।

আট বছরের মেয়ের পক্ষে অপরের মুখের পাকা কথাগুলো আয়ত্ত করা যতো সহজ—ততো সহজ নয় সদুপদেশগুলোকে আয়ত্তে রাখা।

শ্যামাও রাগে গরগর করে দালান থেকে নেমে পড়ে—'বেশ-বেশ, আমি এই চললাম, বলে দিতে।...ওমা-ওমা, কাণ্ড দেখো—কাপড়টা খুলে যাচ্ছে কোমর থেকে।...হি-হি-হি।...ভালো করে কাপড় পরতে পারে না, এখনি গিন্নী হওয়ার শখ!'

'বলে দেওয়া'র নামে ভয়ে বুক দুড়দুড় করে উঠলেও তেজস্বিনী নববধূ অনুনয় করতে যায় না।....আরক্ত মুখে সেই দশ-হাত শাড়িখানা সামলে পরবার বৃথা চেষ্টা করতে-করতে তার পিছন-পিছন ছোটে।....

জনশূন্য এই বিরাট দালানে—শূন্য বেদীর সামনে একলা দাঁড়িয়ে থাকার সাহস তা-বলে তার নেই।

সত্যবদ্ধের ইতিহাস এই।

বিয়েবাড়িতে অজস্র লোকের মুখে-মুখে সেদিন যা ঝড় উঠেছিলো ছোট্ট এই মেয়েটার ঔদ্ধত্যের পরিচয়ে, সে-কথা আজও মনে আছে স্বর্ণকুমারীর।...বধূর শিক্ষাদীক্ষার অভাবে তার আমন্ত্রিত পিতাকেও কম গঞ্জনা খেতে হয়নি।...রূপের জন্য ছোটো-ঘরের মেয়ে এনে যে কতো নির্বুদ্ধিতার কাজ করেছেন, সে-কথা বাড়ির কর্তাকেও ধিক্কার দিয়ে জানানো হয়েছিলো।

নতুন কনের এতবড়ো কথা! এতো দুঃসাহস!

স্বর্ণকুমারীর বয়স যে মাত্র আট, এই কথাটাই শুধু মনে পড়েনি কারুর।

অনেক কাণ্ড, অনেক কথা, অনেক 'ছিছি'কারের পর শ্বশুর ভগবতীচরণ এক সময় বৌকে ডেকে বলেছিলেন—'শোনো বৌমা, ঠাকুরের বেদী ছুঁয়ে যে প্রতিজ্ঞা করেছো তুমি, তা-পালন তোমাকে করতেই হবে—কখনো না কখনো। কিন্তু আমরা বেঁচে থাকতে এ-দালানে পূজো হবার উপায় নেই। তবে তোমাকে অনুমতি দিয়ে যাবো—আমরা দু'জনে মরে গেলে প্রতিমা এনে পূজো করো। না করলে অনন্ত নরক।'

সেই আট বছর থেকে আটচল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত 'অনন্ত নরক

ভোগের' আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে কাটিয়ে এসেছেন স্বর্ণকুমারী। পক্ষাঘাত-গ্রস্ত শাশুড়ী মারা গেলেন বৈশাখে—সেই শ্রাবণেই শ্বশুর গেলেন রক্তাতিসারে ভুগে।

আটচল্লিশ বছর বয়স তখন স্বর্ণকুমারীর।

তখন স্বর্ণকুমারীর সাত-আট ছেলে-মেয়ে···কারুর বিয়ে হয়েছে, কারুর হয়নি।—মেয়ে-জামাই নাতি নাতনীতে এলাহী সংসার। ব্রতকথার মতো—'ঢেঁকি পড়ন্ত গাই বিয়ন্ত উনুন জ্বলন্ত'।

জীবনের উপর দিয়ে যেন ঝড় বইছে রাত্রি-দিন।

শ্বশুর-শাশুড়ীর কালাশৌচের বছর পার করে—প্রতিমা এনে পূজো করবার দৃঢ় সংকল্প ভেস্তে দিয়ে গেল মেজো ছেলে নবীন—ভাদ্রের শেষে হঠাৎ মারা গিয়ে।—বিয়ে হয়েছিলো বছর দুই।

এদিকে অবস্থায় ভাঙন ধরেছে আস্তে-আস্তে।

অপদার্থ স্বামী—অনেক রকম নেশার তাড়নায় অলক্ষিতে স্বর্ণকুমারীর ভাগ্যের ঘরে সিঁদ কেটে-কেটে সংসারের সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করেছেন তিনি ধীরে-ধীরে।

যখন ধরা পড়লো, তখন বেশি কিছু অবশিষ্ট নেই।

জমিদারী নেই, নাম আছে।

শূন্যগহ্বর লোহার সিন্দুকের মতো অন্তঃসারহীন সেই নামের ভার বহন করে-করে দীর্ঘপথ এগিয়ে চলা কী কষ্টকর। কী সেই সব দিন স্বর্ণকুমারীর!—সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত রুক্ষ-কঠোর হৃদয়! তবু উপরে আনতে হবে কোমলতার আবরণ, রাখতে হবে চাকচিক্য!

প্রজারা আসে····কুটুম্বসাক্ষাৎ আসে···আসে দুঃস্থ অভাবগ্রস্ত আত্মীয়-বর্গ··আগের আশা নিয়ে।····কেবলমাত্র মুখের কথা, কেবলমাত্র হাসির প্রলেপে, কেবলমাত্র অদূর ভবিষ্যতের আশ্বাস দিয়ে কতদিন আর ভোলানো চলে তাদের?

অবশেষে···নামও গেল।

রইলো শুধু নিতান্ত অভাবগ্রস্ত বিরাট একটি সংসার, পতনোন্মুখ বিরাট এই অট্টালিকা আর অসাধ্যসাধনের দুশ্চর তপস্যা।

একটি-একটি করে পয়সা জমিয়ে টাকায় পরিণত করতে কম দিন লাগে কি ?

সাত গাঁয়ের লোক নেমন্তন্ন করে হাজার-বাতির ঝাড় ঝুলিয়ে পূজো করবার মতো অবস্থাই বা এলো কই স্বর্ণকুমারীর জীবনে ?

কি করবেন স্বর্ণকুমারী ? কি করবেন ?

প্রায় শৈশবের পরিণামহীন নির্বুদ্ধিতার বশে একদা যে বেদীতে মাথা ঠেকিয়ে তিন-সত্যি করে বসেছিলেন···আর তিন-হাজার-বার সেই পাষাণে মাথা ঠুকলেও কি কিছু ফল হবে ?

দেবতা এমনিই কঠিন ? এমনি এক-চোখো ?

বুদ্ধিহীন বালিকার অর্থহীন প্রতিজ্ঞার অর্থ আছে তাঁর কাছে—নেই সারা-জীবনের প্রার্থনার ? তবে কি এ স্বর্ণকুমারীর অনধিকার চর্চা ? অসঙ্গত সাধ ? তাই বারেবারেই তাঁর সাজানো ব্যবস্থা চূর্ণ হয়ে যায়—? তা নয়তো কেন প্রতিটি বছর এই একই নাটকের অভিনয় দেখে আসছেন স্বর্ণকুমারী। ···যেই শরতের হাওয়া ওঠে, মনের মধ্যে বেজে ওঠে আগমনীর বাঁশী ··সেই সঙ্গে ঘটতে থাকে অভাবিত সব ঘটনা।····

রোগ শোক···অর্থাভাব····আকস্মিক বিপদ। ··

একটি-দু'টি করে জমানো অর্থের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যেতে দেরি লাগে না।

কিন্তু এততেও সংকল্পই বা ছাড়েন না কেন স্বর্ণকুমারী ?

কিসের এই বন্ধন ?—সংস্কারের ? প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পাপের ?···না প্রায় আজন্মের উগ্র আকাঙ্ক্ষার ? এই বিরাট শূন্য বেদীতে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করলে কেমন দেখায় একবার চোখ-ভরে দেখবার সাধই কি অবিরত খোঁচা দিয়ে আসছে না স্বর্ণকুমারীকে ?

কিন্তু পঞ্চাশ বছর ধরে আলেয়ার পিছনে ছুটে ছুটে যে ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন ! নিশ্চিন্ত হয়ে সংসারই বা কবে করলেন তিনি ?

হায় ! স্বর্ণকুমারীর শরীরটা যে ভেঙে পড়ছে ক্রমশ।

আর কি পারবেন তিনি দুর্গোৎসবের ধাক্কা সামলাতে ? ঘটা না থাক—ল্যাঠা তো থাকবেই ?···লোকবল নেই, নেই অর্থবল। সেজো

ছেলে—সুরেশ, কেবলমাত্র যে ছেলে মোটা মাইনের চাকরি করে, সেই তো আজ দশ বছর বাড়ি-ছাড়া। কেউই থাকে না কাছে। অন্য ছেলেরা ছুটি-ছাটায় আসে-যায় কেবল।

প্রতি বছর পূজোর আগে চিঠি লিখে-লিখে হয়রান হয়ে যান স্বর্ণকুমারী।…নিজের ক্ষমতা নেই লেখবার—তাই প্রত্যেকবার একই লোককে দিয়ে লেখাতে লজ্জা করে…বারে-বারে লেখক বদলান—পাড়ার ছেলেদের খোসামোদ করে-করে তবে লেখাতে হয়।

এবারে অনেক বলা-কওয়ায় পাঁচশো টাকা দিতে স্বীকৃত হয়েছিলো সুরেশ….সে টাকা খরচ হয়ে গেল তাদের পিতৃশ্রাদ্ধে।—তবে? সুরেশেরই বা অপরাধ কি?

এবারেও হলো না।

সাদা ধবধবে নতুন থান-পরা স্বর্ণকুমারী সপ্তমীর সকালে বেদীতে সিঁদুর চন্দনের ফোঁটা আর প্রদীপ জ্বেলে দিতে এলেন।

পুরানো আমলের প্রকাণ্ড ভারী পিতলের প্রদীপ—ভর্তি করে ঘি দেবার অবস্থা আর নেই এখন।….হাতে করে বয়ে উঁচুতে তুলে দেবার ক্ষমতাই কি আছে আর?

বার্ধক্যের সমস্ত লক্ষণের সঙ্গে-সঙ্গে কোমরটাও যে ভেঙে গেছে।

নতুন থানের খসখসে আঁচলটা দিয়ে চোখ মুছতে গিয়ে হঠাৎ একখানা নতুন বেনারসী শাড়ির খসখসে আঁচলের ঝলক যেন বিদ্যুতের মতন খেলে গেল চোখের সামনে।….না; চোখের নয়—মনের সামনে।….

সেই শাড়ি-পরা ছোট্ট মেয়েটাকে হাতে পেলে ধরে একবার আছাড় মারেন না কি স্বর্ণকুমারী? ··যে হরণ করেছে স্বর্ণকুমারীর দীর্ঘ জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি! অহরহ দংশন করছে মনের মধ্যে! যে আজ অতি-আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুকেও ডাকতে দিচ্ছে না সাহস করে!

চারিদিক তাকিয়ে দেখলেন স্বর্ণকুমারী।

স্বর্ণকুমারী দেহের মতো—দালানেও ঘুণ ধরেছে।…

সামনের দুখানা দালানের একটা দিক খসে ইটের স্তূপ জমা হয়ে পড়ে আছে ওদিকে। নহবতখানার চিহ্ন মাত্র নেই, দেউড়ির ইটগুলো

স্তূপ হয়ে পড়ে থাকার কুদৃশ্য দেখতে না পেয়েই বোধহয় প্রতিবেশীরা দয়া করে ইঁটগুলো তুলে নিয়ে গিয়ে-গিয়ে সাফ করে ফেলেছে জায়গাটা একেবারে।…উঠোনে আগাছার ঘাস!…থামগুলো যেন দাঁত বার-করা… ঝাড়লণ্ঠন টাঙাবার সেই আঙটাগুলো—বালির আস্তর আর ছাদের টালিগুলোসুদ্ধ নিয়ে খসে পড়েছে অনেকেই…মরচে-ধরা এক-আধটা এখনো আছে আটকে।

শ্বেতপাথরের মেজেটা বিবর্ণ খসখসে…পঙ্খের কাজ-করা চকচকে সেই দেয়ালগুলো পুরোনো পালিশের কিছু চিহ্ন আর বিবর্ণ রং নিয়ে যেন কোনো রকমে দাঁড়িয়ে আছে মাত্র।

চিত্র-বিচিত্র-করা কাঠের কাঠরাখানা ইঁদুরে কেটে একেবারে কুটিকুটি করেছিলো সে বছর—এবারে দেখা যাচ্ছে ঘুণে আর বাকি রাখেনি কিছু সেটির। দেয়ালের কার্নিশের প্রত্যেকটি খোপে-খোপে হয়ে উঠেছে পায়রার বাসা, চামচিকের আস্তানা।

অথচ আজও সত্য রক্ষা হয়নি স্বর্ণকুমারীর।

প্রতিমাহীন শূন্য বেদী আজও অপেক্ষা করছে সার্থক হবার আশায়। অপেক্ষা করছে ঐশ্বর্যময়ী মহাশক্তির আবির্ভাবের!

পরের বছর বৈশাখ থেকেই শয্যা নিলেন স্বর্ণকুমারী।

আর দিন নেই—আর দেরী নেই।

সারাজীবনের সমস্ত সঞ্চয় ছাপিয়ে ভারী হয়ে উঠেছে সেই কণ্টকিত আশঙ্কা। এই দীর্ঘদিন এতো পরিশ্রম, এতো সংগ্রামের শেষে স্বর্ণকুমারীর জন্য কিনা তোলা আছে অনন্ত নরক?

ভাদ্রের শেষে ছেলে-মেয়ে সকলেই দেখতে এলো। উনসত্তর বছরের হিসাব-নিকাশ শেষ করে এবার তাহলে চললেন স্বর্ণকুমারী!

'—কিন্তু মরেও যে আমার শান্তি নেই, বাবা।…'

ছেলেদের হাত ধরে-ধরে কাতর প্রার্থনা করলেন স্বর্ণকুমারী—আর একটা মাস টায়ে-টোয়ে বেঁচে থাকবো, বাবা—শেষ অনুরোধ রাখ, বাবা আমার। একবার 'পিরতিমে' এনে পূজো কর্ ওই দালানে, নিজের চক্ষে দেখে যাই আমি।'

ছেলেরা উড়িয়ে দিয়ে বললো—'ক্ষেপেছো।'

জানছে বড়ো-জোর আর এক সপ্তাহ টিকবে বুড়ী।

'—পেটের ছেলে হয়ে আমার পরকালের সদ্গতির চিন্তা করবি না, তোরা? চিরদিন তোদের জন্যে জীবনপাত করলাম।'

'—সে তো সকলেই করে থাকে মা, কিন্তু সে-কথা নয়!—কথা হচ্ছে, পরকালে স্বর্গ তোমার আটকায় কে?···অনর্থক বাজে একটা কুসংস্কার—'

'—থাক্ বাবা, ও-কথা বলো না। আচ্ছা, আমি মা—আমার হুকুম বলেই করো তবে।—কখনো তো কোনো হুকুম করিনি।'

'—বুঝলাম তো করনি—কিন্তু দেশের অবস্থা জানো এখন! খবর রাখো কিছু?···একখানা কাপড় পাওয়া যায় না—একমুঠো চাল মেলে না। ···চার পয়সার জিনিস চার টাকায় কিনতে হয়।···'

'—যেমন-তেমন করে কর্! চিরদিনের আকিঞ্চে আমার।'

'—যেমন-তেমনও সোজা নয়, মা—' মেজো বৌ টানা টানা সুরে বলে। '—ভালো সময়েই বা আপনি নিজে পেরে উঠেছিলেন কই?'

স্বর্ণকুমারীর কোটরগত চক্ষুতেও একবার পূর্বকালের আগুনের আভা ঝলসে ওঠে। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন—'থাক্ মেজো বৌমা, তোমাকে সাউখুরি করতে বলিনি, বলছি—আমার ছেলেদের। তোমরা পারবে কিনা বলো?···সুরেশ? দীনেশ? জগদীশ? খোকা?···পারবে না?··· আচ্ছা, বেশ।···'

ছেলেদের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিলেন স্বর্ণকুমারী। আশ্চর্য! সপ্তাহের মধ্যে টেঁসে যাওয়া তো দূরের কথা—বরং একটু ভালোই হয়ে উঠলেন। অগত্যা যে যার কর্মস্থলে যাবে না, কি করবে?···

স্বর্ণকুমারীকে কে দেখবে?

সে তো পুরোনো আমলের নাপিত-বৌ রয়েইছে।

পূজো পর্যন্ত স্বর্ণকুমারী বেঁচেই রইলেন।

বোধনের বাজনা বেজে উঠলো চারিদিকে—কিন্তু বিসর্জনের যে আর দেরি নেই, সেটা হৃদয়যন্ত্রের বৈকল্যে অনুভব করছেন ক'দিন।

কি হবে? কি হবে?

হে মা দুগ্‌গা, কি করলে!

আবার সুদিনের আশায় একটি বছর অপেক্ষা করার সময় কই? হঠাৎ মহালয়ার পরদিন ঘুম ভেঙে উঠে নাপিত-বৌকে ডেকে বললেন—'রতন কুমোরকে ডাকতে পারিস, মা?'

'—রতন কুমোর? কেন মা?'

'—কাজ আছে, তুই ঝট্‌ করে যা। কোনো ওজর শুনিস না।'

কুমোর এলো, বিনা ওজরেই এলো। পুরোনো দিনের প্রজা। ছেলেবেলায় কতো খেয়েছে এ বাড়িতে।

কিন্তু প্রস্তাব শুনে তার চোখ কপালে উঠে গেছে।

অবাক্ হয়ে বলে—'তাই কি হয়, মা-ঠাকরুন? বোধন বসে গেছে, তিনদিন বাদে পূজো, এর মধ্যে পিরতিমে গড়া হয় কখনো? এ যে একেবারে অসম্ভব কথা, মা!'

'—গড়া নেই, রতন? ছোটো-খাটো একটু পিরতিমে?'

হাহাকারের মতো শোনায় স্বর্ণকুমারীর কণ্ঠস্বর।

'—না, মা! যে ক'খানা বায়না ছিলো, তাই নিয়েই হিমশিম। ত[illegible] এক কাজ করুন না···ঘটে-পটে—'

'—না বাবা, পিরতিমে আনতেই হবে আমাকে—'

রতন আর নাপিত-বৌ মুখ-চাওয়াচাওয়ি করে।···আহা, মাথাট[illegible] একেবারেই গেছে বুড়ীর। আশ্চর্য বা কি! সত্তর-বাহাত্তর কি আর ন[illegible] হলো এতোদিনে?

মুখে বলে—'আচ্ছা মা, সন্ধান করে দেখি—যদি কারুর ঘরে থাকে[illegible] ···এ গাঁয়ে নেই, অন্য গাঁ দেখতে হয়।'

আগ্রহের আতিশয্যে বিছানায় উঠে বসেন স্বর্ণকুমারী।—'তাই দে[illegible] বাবা, তাই দেখো···মরণকালে আশীর্বাদ করছি, ভালো হোক তোমার।'

ব[illegible]

রাত্রি কাটে, দিন যায়···কোথায় বা রতন, আর কোথায় বা তার প্রতিমা। ভীমরতি বুড়ীর হাত এড়িয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে সে।···কিন্তু স্বর্ণকুমারীর যে মরবারও উপায় নেই···পঞ্চমী, ষষ্ঠী····সব হয়ে গেল যে।··· কি করবেন স্বর্ণকুমারী? কি করবেন?

সপ্তমীর ভোরবেলা নাপিত-বৌ এসে বিছানায় রুগী না দেখে অবাক··· রোজই রাত্রে থাকে সে, কালকেই শুধু বারোয়ারিতলায় নারকেল কুরে দেবার বরাত ছিলো!···কী সর্বনাশ! ঠিক আজকেই শয্যাগত বুড়ী গেল কোথায়!···ভীমরতির খেয়ালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল? কিন্তু কি করে? তিন পা হাঁটতে পারেন না যে স্বর্ণকুমারী!

সারা বাড়ি খুঁজতে-খুঁজতে নিতান্তই অন্যমনস্ক হয়ে পূজোর দালানে এসে পড়লো সে।···অবশ্য অকারণেই এলো! বিরাট উঠোন পার হয়ে, ষোলোটা সিঁড়ি ভেঙে ঠাকুর-দালানে উঠতে যাবেন তিনি, এ-কথা ভাবেনি! তবু—দেখবে তো সর্বত্র!

কিন্তু ও কি? ভিতর-দালানের মাঝখানে পড়ে কে? স্বর্ণকুমারীই না?··· চারিদিকে খড় ছড়ানো আর তাল তাল ভিজে মাটি? আড়ষ্ট কঠিন দুখানা হাতেও শুকিয়ে-ওঠা কাদার চিহ্ন! কোথা থেকে এই মাটি সংগ্রহ করেছেন স্বর্ণকুমারী? কোথায় পেয়েছেন এই খড়ের বোঝা?

কী নিদারুণ ক্লেশের চিহ্ন ফুটে রয়েছে শিরাবহুল শীর্ণ মুখে!

মৃত্যুতেও সে চিহ্ন মুছে ফেলতে পারেনি।

কিন্তু কেন? কেন, আজীবন একটা যুক্তিহীন অর্থহীন কল্পিত কারাগারের কঠিন বেষ্টনীর মধ্যে থেকে বন্দিত্বদশা ভোগ করে গেলেন স্বর্ণকুমারী? 'অনন্ত নরকের' ভয়াবহ আশঙ্কা? সে আশঙ্কাকে কি সত্যই উড়িয়ে দেওয়া যেতো না? বুদ্ধি দিয়ে? যুক্তি দিয়ে?

কে জানে—চিরদিন সেই এক অবোধ আশঙ্কার বন্ধনে নিজেকে বন্দিনী করে রেখেছিলেন স্বর্ণকুমারী, না অবোধ এক বাসনার বন্ধনে?

গৃহিণী

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

ব্যাপারটা সামান্যই, কারুর টের পাবার কথাও নয়। যে লোকটি দীর্ঘকাল শুধু নিচে, বাইরের দিকের কোণের ঘরে নিঃশব্দে বসে তামাক খেয়ে কাটিয়ে দিলেন, যাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যেতো শুধু একদিন—প্রতি মাসের শেষের দিকে যখন মনোরমার হাতের টাকা ফুরিয়ে আসতো, তখন কোনো অজানা সঞ্চয় থেকে টাকা বের করে দিতে হতো তাঁকে—সে সময়ও সেই লোকটি যদি তেমনি নিঃশব্দে ভাত খেয়ে উঠে তামাক টানতে-টানতে মারা যান তো এমন একটা কিছু সাড়া পড়বে চারিদিকে, এটা আশা করা উচিত নয়। মহেশবাবু যেমন নিভৃতে নিঃশব্দে বাস করতেন, তেমনই একদা সকলের অজ্ঞাতে সরে পড়লেন—কারুর সেবা নিলেন না, কাউকে হা-হুতাশ করতে দিলেন না, ডাক্তার ডাকারও অবসর হলো না।

মনোরমাও বিশেষ বিচলিত হলেন না, হবার উপায়ও ছিলো না। বিরাট সংসার, বড়ো দুই ছেলে বিবাহিত, তাদেরও চার-পাঁচটি করে ছেলে-মেয়ে, এছাড়া চারটি মেয়ে বিবাহিতা, তাদের মধ্যে জন-দুই করে ক্রমান্বয়ে মায়ের কাছে থাকতই—সেইসঙ্গে কতকগুলি নাতি-নাতনি। এর উপর ছোটো ছেলে বাপি এখনও কলেজে পড়ছে, তার ঝঞ্চাট কম নয়। এক কথায় তাঁর নিশ্বাস ফেলবারই সময় নেই, এর ভিতর স্বামীর জন্য শোক করবার ফুসরত কৈ? আর সত্যি কথা বলতে কি, স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘকাল তাঁর কোনো সম্পর্কই ছিলো না। মহেশবাবু পেনশন নেওয়ার পর থেকেই প্রায় ঐ কোণের ঘরটি আশ্রয় করেছিলেন, ঐখানেই সকালে তাঁর কাগজ আর চা আসতো; দু'একজন বন্ধুবান্ধবও জুটতো আগে-আগে, কিন্তু যেদিন দেখা গেল যে, তাঁদের জন্য বার-বার চা চেয়ে পাঠিয়েও পাওয়া যাচ্ছে না এবং

মনোরমা একদিন স্পষ্টই বলে দিলেন, 'তোমার ঐ যতো-রাজ্যের বেকার বাউণ্ডুলে বন্ধুদের জন্যে কে একশোবার চা করবে, তাই শুনি? একটা তো ঠাকুর, এই ছেলেপুলের ঘরকন্না, সকলের অফিস-আদালত আছে—একশোবার যদি ভাতের হাঁড়ি দুধের কড়া নামিয়ে চা করতে হয়, তাহলে কি সময়ে রান্নাই হবে, না ঠাকুরই টিকবে? তোমার বাপু যতো অনাসৃষ্টি কাণ্ড!' তখন মহেশবাবু এক-রকম তাদের ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিষেধই করে দিলেন আসতে। একাটি বসে থাকতেন, লাইব্রেরী থেকে নিয়মিত একটা করে বই আসতো, কাগজ শেষ হলে সেটা পড়তেন। কি ভাগ্যি ছোটো ছেলে বাপি এটা রোজ বদলে এনে দিতো সন্ধ্যাবেলা, নইলে যে কি করতেন—হয়তো সত্যই কড়িকাঠ গুণতে হতো!

আর একটি কাজ ছিলো তাঁর, উঠে-উঠে তামাক সাজা। আগে চাকরই এটা করে দিতো, কিন্তু সেখানেও একদিন মনোরমার অসন্তোষ ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো, 'তোমার সংসারে কাজ বাড়ছে বৈ কমছে না তো, সে তুলনায় ঝি-চাকর তো আর বাড়েনি। তামাক খাওয়াটা একটু কমাও। অতো মুহুর্মুহু কে তামাক সাজে বলো দিকি!' সেদিন থেকে ও কাজটা মহেশবাবু নিজেই করে নিতেন। স্নানাহারের কোনো তাড়া ছিলো না যেমন তাঁর—স্বাধীনতাও ছিলো না। ঠাকুর সময় মতো এসে বলতো, 'বাবু, চান করে নিন। অনেক বেলা হয়েছে।' তখনই উঠে স্নান করতে হতো। একটু গড়িমসি করলেই মনোরমার বিরক্তি ধ্বনিত হতো,—'তিনপোর বেলা অবধি যদি হাঁড়ি-হেঁশেল নিয়ে বসে থাকতে হয় তো ঠাকুরের চলে কি করে বলো দিকি। সেই কোন্ ভোরে লেগেছে! আবার আড়াইটে না বাজতে-বাজতে উনুনে আঁচ পড়বে, একটু বিশ্রাম করার সময় দেবে না?' অগত্যা ও-পাট চুকিয়ে ফেলতে হতো। কোনো-কোনদিন চৌবাচ্চায় জল থাকতো না—যেদিন থাকতো না—সেদিন স্নানটা বাদ দিতেন, কাউকে কিছু বলতেন না, কাকেই বা বলবেন? পনেরো-ষোলোটি ছোটো ছেলে-মেয়ে যে বাড়িতে—সে বাড়িতে জল বেহিসেবী খরচ করার জন্য কাউকে দায়ী করা চলে না।

আবার চলতো সেই বই আর তামাক। বেলা তিনটেয় চা আসতো। রাত্রের খই-দুধ গৃহিণীই নিয়ে আসতেন এক-একদিন। কারণ, এই সময়টা

ছিলো তাঁর সংসারের খরচ-বৃদ্ধির ইতিহাস শোনানো এবং বাড়তি কিছু টাকা দাবী করার অবসর। কর্তা ঠাকুর-ঘরে উঠতেন না। এই ঘরেই কুলুঙ্গিতে একটু গঙ্গাজল থাকতো—ফুরিয়ে গেলে আগে হাঁকডাক করতেন, ইদানীং ব্যাপারটা বৃথা জেনে নিজেই উঠে গিয়ে ঠাকুর-ঘরের দোরে হাজির হতেন। ঐটুকু ছিলো বাড়ির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক! আগে-আগে রাত্রে একবার শুতে যেতেন দোতলার ঘরে, কিন্তু তাও শেষ পাঁচ বছর ত্যাগ করেছিলেন। গৃহিণীর সবাইকে নিয়ে 'গ্রুপ' ফটো তোলার শখ হতে যখন চারটি মেয়েই জামাইসুদ্ধ এসে হাজির হলেন, তখন মনোরমা বললেন, 'একটা ঘর তুমি ছাড়ো, বাপু। একটা মানুষ দুটো ঘর জোড়া করে থাকলে চলে কি করে?' তখন তিনি উপরের ঘরটাই ছেড়ে দিলেন—সেই সঙ্গে খাট বিছানাও, একটি ছোটো তক্তাপোশ কিনে এনে পৃথক শয্যা তৈরি হলো। মহেশবাবু হেসে বলেছিলেন, 'আমার মৃত্যু-শয্যা!' কিন্তু সেটাও ঠিক না, কারণ, ইজিচেয়ারে শুয়ে তামাক খেতে-খেতেই কখন যে তাঁর মৃত্যু হলো, তা যেমন কেউ টের পায়নি, বোধহয় তিনি নিজেও তেমনি বুঝতে পারেননি।

সম্পর্ক থাক বা না থাক, বাঙালী হিন্দুর ঘরে কর্তার মৃত্যু অতো সহজ নয়। সিঁড়ির আড়ালে ঐ কোণের ঘরটা চোখের বাইরে থাকতে-থাকতে মনেরও বাইরে চলে গিয়েছিলো সকলের—মহেশবাবুর অস্তিত্ব এক-এক সময় মনোরমাই ভুলে যেতেন। কিন্তু ভদ্রলোক মারা যাবার পর তাঁর কথাটা একটু বেশি রকমই মনে পড়লো। মনোরমা কাঁদলেন—এটিও জীবনের অঙ্গ। ছেলে-মেয়ে সবাই কাঁদলো। তারপর ঘর-বাড়ি ধোওয়া-মোছা, হবিষ্যির যোগাড়—নানা-রকম ব্যাপারে বিরাট হৈ-চৈ-তে কাটলো পরের দিনটাও। তার পরের দিন বেলা তিনটের সময় বড়ো দুই ছেলে একটু গম্ভীর মুখে মায়ের কাছে এসে বসলো।

সংসারের পাট সেরে আর একবার স্নান করে আবার নিজের হবিষ্যির যোগাড় করা—মনোরমার খেয়ে উঠতেই তিনটে বেজেছে। তিনি মেঝেতে শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন, এমন সময় দুই ছেলেকে একত্রে আসতে দেখে উঠে বসে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন।

মেজো ছেলে রাজেন সরকারী চাকরি করে—সে দাদার মতো

গৃহিণী

মুখফোঁড় নয়। কিন্তু বড়ো ছেলে অনঙ্গ হচ্ছে উকীল, তার সময়ের মূল্য আছে। রাজেনকে ইতস্তত করতে দেখে সে-ই কথাটা পাড়লো সোজাসুজি, 'তাহলে শ্রাদ্ধের কী-রকম কি করা যাবে, মা?'

মনোরমা এটা তাঁর প্রাপ্য বলেই মনে করেন। সমস্ত সংসার তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়, চিরকালই হয়ে আসছে। চিরকাল সকলেই তাঁর মতে চলে। এ ক্ষেত্রেও স্বাভাবিক নিয়মেই এ প্রশ্ন করা হয়েছে, তবু তিনিই বা আর এ দায়িত্বে থাকবেন কেন? উদাসীনভাবে বললেন, 'সে আর আমি কি বলবো বাছা, তোমরা বড়ো হয়েছো, যা করলে ভালো হয়, ওঁর সম্মান বাঁচে—সেই রকমই করো।'

অসহিষ্ণুভাবেই অনঙ্গ বললো, 'সে-কথা তো হচ্ছে না, আসল কথাটা বলো—টাকার কথা। হাতে কি-রকম আছে বলো, সেই বুঝে তিল-কাঞ্চন হবে, না বৃষ হবে ঠিক করবো।'

মনোরমা আকাশ থেকে পড়লেন, 'টাকা! টাকার কথা আমি কি জানি, বাবা। উনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, পেনশনের টাকাটা হাতে তুলে দিতেন, খরচ করেছি। এছাড়া তোমরা তো দিয়েছো কেউ কোনো মাসে চল্লিশ, কেউ পঞ্চাশ। তাতে তো কখনই চলতো না—মাসের শেষে হাত পাততুম, কতো ঝগড়া করে তবে আর কিছু-কিছু বার করতেন। কোথা থেকে দিতেন, কি ছিলো তাঁর, তা তো কোনদিন খোঁজ করিনি। আলমারির মধ্যে একটা হাত-বাক্স ছিলো, তাই থেকেই বের করতেন দেখেছি। তা সে চাবি তো তুমিই নিয়েছো ওঁর পকেট থেকে বের করে।'

'সে তো রাজেনের সামনেই খুলেছি, মা। একশো ত্রিশটি টাকা নগদ, দশখানা গিনি আর পোস্ট আফিসের খাতা একটা, তা তাতেও দেখেছি নব্বইটি টাকা পড়ে আছে। ওঁর ইন্‌সিওরেন্সের টাকাটা পেয়ে জমা করেছিলেন, মধ্যে-মধ্যে তুলেছেন—এই তো দেখলুম। তা বাকী?'

মনোরমা ওর বলবার ভঙ্গীতে আহত হলেন, 'বাকী কোথায়, আমি কি করে জানবো, বাবা। আমাকে কি তিনি কোনো কথা বলতেন, না আমিই জিগ্যেস করেছি? আমার সে সময়ই বা কোথায়? বলে এক দণ্ড মরবার ফুসরত নেই!'

'তবে এ-সব হবে কি করে?' একটু রুষ্টভাবেই বলে রাজেন।

'সে-কথা কি আমি বলবো? তোমরা তাঁর উপযুক্ত ছেলে—শ্রাদ্ধ করবে—কী করবে, তা তোমরাই জানো, যা পারবে তাই করবে।'

অনঙ্গ ওকালতি-বুদ্ধির শরণ নিলো, 'না—সে তো বটেই। বলছিলুম, তুমি তোমার টাকা থেকে যদি কিছু দিতে—'

মনোরমা আরও বিরক্ত হয়ে উঠলেন, 'আমার টাকা? আমি কি সংসার খরচ থেকে বাঁচিয়ে টাকা জমিয়েছি! যখন চাকরি ছিলো ওঁর, তখন দু'একটা টাকা জমিয়েছিলুম যা—তা এক-একবার মেয়েদের এক-এক হিড়িকে সব বেরিয়ে গেছে। নাতি-নাতনিদের অন্নপ্রাশন—এটা-ওটা তার এক পয়সাও নেই।'

রাজেন রাগ করে বললো, 'বেশ, তাহলে ঐ কালীঘাটে গিয়ে শুদ্ধ হয়ে আসি, আমরা কোথায় কি পাবো?'

অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে থেকে মনোরমা বললেন, 'তোমরা কি আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ওঁর শ্রাদ্ধ করবে এই ভরসায় ছিলে? তা ওঁর মতো লোকের শ্রাদ্ধ যদি কালীঘাটে গিয়ে করতে চাও তো করো, কী বলবো। তোমরা উপযুক্ত ছেলে।'

'উপযুক্ত তো কতো! দাদা নতুন উকীল, সবে এই দশ-বারো বছর বেরোচ্ছে, কতো রোজগার ওর? আর আমার চাকরি তো বাবাই করে দিয়েছিলেন। কতো মাইনে পাই তা তো জানই। ছেলে-মেয়েদের দুধের টাকা আলাদা দিয়ে, কাপড়-জামা সব করে তোমাকে সংসার খরচের টাকা ধরে দিয়ে কি থাকে? টাকার কি গাছ পোঁতা আছে আমাদের কাছে যে, নাড়া দিলেই পড়বে!'

মনোরমার খুব ঝাপসা-ঝাপসা অস্পষ্টভাবে মনে পড়লো যে, এমনি কথা এর আগেও কার কাছ থেকে শুনেছিলেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়ছে, যেবার সব ক'টি মেয়ে-জামাই এসে রইলো প্রায় এক মাস, সেবার উনি বাড়তি খরচ করেছিলেন পুরো পাঁচশো টাকা। সেইবারই মহেশবাবু কথাটা বলেছিলেন। তার জন্য কী লাঞ্ছনাই না করেছিলেন মনোরমা তাঁর। ওঁর বাক্যবাণে বিব্রত হয়ে মহেশবাবু যখন টাকাটা বার করে দিয়েছিলেন, তখনও

রেহাই দেননি তাঁকে, বলেছিলেন, 'আমি চাইলেই অমন করো কেন, বলো তো! ঘেন্না করে আমার এমন করে হাত পাততে। এ কী আমি নিজের কোনো শখ করব বলে নিই? তোমারই সংসারে লাগে বলে নেওয়া!'

তখন মহেশবাবুও কিছু বলতে পারতেন, বলতে পারতেন যে, এই এতগুলো লোককে তিনি শখ করে ডেকে আনেননি—তাঁর গরজে সংসারের কলেবর এবং ব্যয় বাড়েনি—কিন্তু কিছুই বলেননি তিনি, শুধু একটা নিশ্বাস ফেলেছিলেন মাত্র।

শ্রাদ্ধটা কোনো-রকমে তিলকাঞ্চন করেই হয়ে গেল। পাড়ার লোকে কেউ-কেউ মনোরমাকে শুনিয়েই বললেন, 'অতবড়ো বাড়ি—পাঁচশো টাকা করে তো পেনশনই পেতো—তার কাজ এমন করে সারা তোমার উচিত হয়নি, ভাই। তারই তো সব—অথচ তার কাজটাও ভালো করে করলে না? না-হয় কিছু ভাঙতেই পুঁজি থেকে। এই তো শেষ কাজ!'

অপমানে মনোরমার দুই কান জ্বালা করছে, দু'চোখ এসেছে ঝাপসা হয়ে, তবু কিছু বলতে পারেননি। সব কথা তো সব সময়ে বলা যায় না। কিন্তু সবচেয়ে আঘাত লাগলো, যখন শ্রাদ্ধের পর বড়ো ছেলেকে ডেকে বলতে গেলেন, 'খরচ-পত্তর তো হাতে কিছুই নেই, বাবা; টাকা কড়ি দে কিছু-কিছু, তোরা।'

অনঙ্গের মুখের হাঁ কিছুক্ষণ বুজলই না, 'টাকা! টাকা কোথায় পাবো? এই যার একগাদা টাকা খরচ হয়ে গেল, শ্রাদ্ধ করতে গিয়ে। এখন আর কিছুদিন ও-কথা মুখে উচ্চারণ করো না।'

'ওমা, না করলে চলবে কিসে? এই রাবণের সংসার—এর খরচা কি কম?'

'রাবণের সংসার রাখলে চলবে কেন, বলো। বাবার টাকা ছিলো যা খুশি করেছিলেন—এখন হয় খরচা কমাও, না-হয় নিজের পুঁজি ভাঙো!'

আবারও সেই সংশয়।

মনোরমা ঝনাৎ করে চাবিটা আঁচল থেকে খুলে ফেলে দিয়ে বললেন,

'সব খুলে দেখে এসো বাবা, কোথায় কি পুঁজি রেখেছি। থাকে বের করে নাও।'

অনঙ্গ একটু অপ্রতিভই হলো, 'সে-কথা তো হচ্ছে না, আমাদেরও ছেলেপুলে আছে—ধার করে তো সর্বস্বান্ত হতে পারি না। যা-হয় করে চালাও। দেখো, রাজি কিছু দেয় কিনা—ঐ বা কোথায় পাবে তা তো জানি না। তবে অফিসে কো-অপারেটিভ্ থেকে ধার পেতে পারে।... শ্রাদ্ধ তো মিটেই গেছে, এখনও মেয়েদের বসিয়ে রেখেছো কেন?'

মনোরমার চোখে জল এসে গেল, 'তোমরাই ঘাড় ধরে পাঠিয়ে দাও, বাবা। আমার পেটের মেয়ে আমি কি করে বলি যে, বেরিয়ে যাও। এই শোক-তাপের সময়, আমি একটু ভুলে থাকবো বলে ওরা আছে, নইলে কি তোমাদের অচ্ছেদ্দার ভাত খাবার জন্যে পড়ে থাকতো?'

অনঙ্গ বিরক্ত হয়ে বলে, 'ঐ তোমার বড়ো দোষ, মা; সব কথা বাঁকাভাবে ধরো, আমি কি তাই বলছি।....এই অবস্থা তো দেখতে পাচ্ছো। আজকালকার বাজার—খরচ-পত্র তো কম নয়, বাবা ছিলেন মাথার ওপর, তিনি কি করে চালাতেন, তিনিই জানতেন। এখন আমরা পেরে উঠবো কি করে, বলো? আয়টা তো রবারের জিনিস নয় যে, ইচ্ছে করে টেনে বাড়াবো। আর বাবাকেও তো ঐ করেই সর্বস্বান্ত করেছো—তখন যদি একটু বুঝে চলতে, তাহলে এই ব্যাপারটা হতো না। অতবড়ো একটা লোক মারা গেল—অথচ তার ছেলেরা এক পয়সা পেলো না, উল্টে ধার করে শ্রাদ্ধ করতে হলো!'

মনোরমার মনে পড়লো মহেশবাবুও একবার মেয়েদের নিয়ে তাঁকে খোঁটা দিয়েছিলেন। ছেলেদের সংসার ছাড়াও একশো সাতাশ টাকা দুধের বিল দেখে বলে উঠেছিলেন 'কী সর্বনাশ! এ কি করেছো?'

তাতে মনোরমা ঝঙ্কার দিয়ে বলেছিলেন, 'দুধ কি আমি খাই এক ফোঁটা যে, আমাকে শোনাচ্ছো? তোমার তিন মেয়ের দরুণ, বলতে নেই, সতেরোটি নাতি-নাতনি!'

কর্তা হেসে বলেছিলেন, 'এর চেয়ে ঘর জামাই রাখা যে ভালো ছিলো, সে তবু জামাইদের মাইনের টাকাগুলো হাতে আসতো!'

তার ফলে মনোরমা রাগ করে দু'দিন খাননি—কান্নাকাটি, অভিমান—কর্তা হাতে-পায়ে ধরে মিটিয়ে নিতে বাধ্য হন।

আজ কেমন করে মনের মধ্যেই বুঝতে পারেন মনোরমা যে, এদের কাছে সে অভিমানের কোনো মূল্য নেই।....

দীর্ঘশ্বাসটাও ফেলতে লজ্জা করে, কোনো-মতে চেপে গিয়ে বললেন, 'তা, এখন কি করবো বলে দাও, এক টুকরো কয়লা নেই, রেশন আনতে হবে—ধোপা হিসেব চাইছে, রকমারি খরচা। অথচ আমার হাতে তো মোটে তিন-চারটি টাকা পড়ে আছে....'

'বলো কি। না—না এমন করলে চলবে না। এই তো বাবা মরবার পরে দেখলুম পাঁচ মণ কয়লা এলো—! না, তুমি দেখছি হিসেব করে চলা কাকে বলে কিছুই জানো না। আজ সন্ধ্যেবেলা রাজেনের সঙ্গে বসতে হবে—আয়-ব্যয় বুঝতে হবে, এমন করলে চলবে কি করে, সে কতো দেয়, আমি কতো দিতে পারি—বুঝে চালাতে হবে। আর সত্যি কথা বলতে কি—আমাদের খরচ, কাপড়-জামা, দুধ, ওষুধ, ডাক্তার সব তো নিজেরাই করছি, তার ওপর শুধু ডাল-ভাতের জন্যে একগাদা করে টাকা দেবেই বা কেন, আর পাবেই বা কোথায়? ওকালতির যা আয়!'

ওকালতির এই আয়েই বড়ো বৌমা গত মাসেও নতুন গয়না গড়িয়েছেন। শালীর বিয়েতে তার আগের মাসে অনঙ্গ আড়াই ভরির কঙ্কণ দিয়েছে। তাছাড়া তিনটে ইনসিওরেন্স আছে মোটা টাকার। কিন্তু সে-সব কথা মনে করিয়ে দিতে ঘৃণা বোধ হলো তাঁর, তিনি শুধু বললেন, 'তাই ভালো বাবা, তোমরা সংসারের ভারটা বুঝে নাও, আমি বাঁচি তাহলে।'

রুষ্ট কণ্ঠে অনঙ্গ বললো, 'ওভাবে এলিয়ে দিলে তো চলবে না। সবাই মিলে পরামর্শ করে খরচ কমাতে হবে। মেয়েদের ওপর তোমার অহেতুক টান। আজ না-হয় শ্রাদ্ধের জন্যে এসেছে, শোক-তাপের সময়—কিন্তু চিরকালই তো দেখছি দু'টি-তিনটি মেয়ে তোমার কাছে রাখা চাই-ই। কেন রে বাপু, তাদের বিয়ে-থা হয়েছে, ঘরকন্না আছে নিজেদের, জামাইরা কেউ অক্ষম নয়—বাবা দস্তুরমতো খরচ করেই মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন সৎপাত্র দেখে, সে-সব টাকা আজ থাকলে আমাদের অভাব কি?—তাদের

এনে এখানে জিইয়ে রাখার দরকারটা কি ? এর জন্যে বাবাকে কি কম দুঃখটা দিয়েছো তুমি ?'

আড়ষ্ট হয়ে যান মনোরমা, এখনও ষোলোটি দিন কাটেনি কর্তা গেছেন—এরই মধ্যে এতো কথা শুনতে হবে, তা কি স্বপ্নেও ধারণা করেছিলেন ? ঐ তো সকলের চোখের আড়ালে বসে তামাক খেতেন—আছেন কিনা কেউ খোঁজও করেনি—নাতি-নাতনিদের থেকেও বেচারি সাড়া পেতেন না—তবু তাতেই মনোরমার যে প্রতাপ ছিলো আজ আর তার কিছুই নেই। গৃহিণী বলতে যা বোঝায়, তাই ছিলেন তিনি—সমস্ত কিছু হতো তাঁর মত আর নির্দেশমতো, খাওয়া-দাওয়া, বাজার-হাট, লোক-লৌকিকতা সব কিছু। কাদের জন্য করেছেন তিনি এ-সব ? সে কি নিজের কোনো লাভের জন্য ? উদয়-অস্ত খাটুনি খেটেছেন, এক মিনিট স্বামীর কাছে পর্যন্ত যাবার ফুরসত পাননি—তার আজ ভালো পুরস্কারই পেলেন বটে !

নিঃশব্দে চোখের জল গড়িয়ে পড়লো মনোরমার। তাড়াতাড়ি মুছে ফেললেন তিনি—কেউ না দেখে !

সন্ধ্যাবেলা পরামর্শ-সভায় রাজেন বললো, 'এস্টাব্লিশমেন্ট কমাও। একটা ঝি, একটা ঠাকুর, আবার একটা চাকর—এতো কেন ? চাকরটা ছাড়িয়ে দাও। বোনেরা যদি কেউ না থাকে তো ঘর-দোর মোছার কাজ ঝিই করতে পারবে। বাজার আমরা পালা করে করে দেবো। আর রেশনটা বাপি আনতে পারবে না ? বাপিকে বলো বরং একটা টুইশ্যানি খুঁজে নিতে, ওর নিজের হাত-খরচটাও যদি চালাতে পারে সেটাও তো কম নয়।'

বাঃ ! মনোরমা হাসলেন মনে-মনে। বিধাতার বিচার ঠিকই নেমে আসে—কিছুমাত্র ভুল হয় না। বাজার আগে ছেলেরাই করতো—রাজেনের চাকরি হবার পরই সে ছেড়ে দিলো। সকালে বাজার করে দাড়ি কামিয়ে আফিস করবে কখন ! চাকর তখনই রাখা হলো। মনে আছে, পেনশন পাবার পর কর্তা প্রস্তাব করেছিলেন চাকর ছাড়িয়ে দেবার—মনোরমাই

ঝগড়া করেন, 'তোমার যেমন কথা! এতবড়ো সংসারের বাসন নিয়েই তো ঝিয়ের দিন কেটে যায়। ধোয়া-মোছা করে কখন? তাছাড়া বাজার, হাট, দোকান—কী নেই?···অনঙ্গের মক্কেলরা আসে সকালে, রাজেন অতো তাড়াহুড়ো করতে পারে না—বাপিরও পাড়াশুনো, চাকর না-হলে চলে কখনও?'

আরও মনে হলো, এই নতুন চাকরটা একবার মহেশবাবুর কথা শোনেনি, উল্টে আবার মুখের উপর কি বলেছিলো, মহেশবাবু বলেছিলেন ওকে জবাব দেবার কথা। সেদিনও মনোরমা কম কটু কথা বলেননি স্বামীকে ঃ 'তোমার কি ভীমরতি হয়েছে নাকি? আজকালকার দিনে চাকর পাওয়াই দায়, নতুন লোক বলেই অতো কম মাইনেতে পেয়েছি। ও গেলে কি আর ঐ টাকায় লোক পাবো ভেবেছো? এই রাবণের সংসার, তোমার কথায় লোক ছাড়িয়ে দিয়ে সবাই মিলে লোক খুঁজতে বেরুই। বেশ বুদ্ধি তো তোমার!'

সেই বোধহয় মহেশবাবুর শেষ বিদ্রোহ। আর কখনও কাউকে কিছু বলেননি। ঝি-চাকর, নাতি-নাতনি—ইদানীং কেউ তাঁর কথা শুনতো না, একমাত্র বাপি এটা-ওটা করে দিতো তাঁর। হায় রে! সেদিন যদি সংসারের চেহারাটা চোখে পড়তো!

কানে গেল অনঙ্গ বলছে, 'কাগজ-কলম নিয়ে নিখুঁত এস্টিমেট কষো—কে কতো টাকা দিতে পারবে সেটাও ফেলো। আমি তো দুশো টাকার বেশি এক পয়সাও কন্ট্রিবিউট করতে পারবো না।'

রাজেনের কণ্ঠস্বর উষ্ণ হয়ে ওঠে, 'বা রে, তা বললে চলবে কেন? আমার তো গোণা টাকা মাইনে। তোমার বরং নানাদিকে আয়···'

ক্রমশ আবহাওয়া অপ্রীতিকর হয়ে ওঠে! মনোরমা আস্তে-আস্তে উঠে যান নিঃশব্দে।

উপরে তখন তিন মেয়ে বসে জটলা করছে।

মনোরমার কানে গেল বড়ো মেয়ে বলছে, 'সত্যি, বাপের-বাড়ি থেকে কতো মেয়ের দেখো মোটা-মোটা মাসোহারা যায়, আমরা তো কখনও কণা-রত্তি পেলুম না। এসেছি, খেয়েছি ভাত-হাঁড়ির ভাত—এই

পর্যন্ত। শ্বশুর-বাড়ি যাবো, সবাই বলবে অতো বড়োলোক বাপ মরলো, তোমরা কি পেলে ?…'

আর আসাও তো ঘুচলো। ভায়েদের যা কথার ধরণ এ-মুখো হতে হচ্ছে না। মায়ের হাতে দু'এক পয়সা থাকলে তবু জোর হতো—এই শেষ আসা বাপের বাড়িতে, ধরে রাখো। ভাইপোদের বিয়ে পৈতেয় যে ডাকবে তাও মনে হয় না।'

সেজো মেয়ে বললো, 'মা-তো কখনও হিসেব করে চলেনি, এন্তার এলোপাতাড়ি খরচা করেছে। নইলে লক্ষপতি বাপ আমাদের, তাঁর শ্রাদ্ধ করার পয়সা থাকে না!'

বড়ো মেয়ে বলে, 'আর তাই নিয়ে বাবার সঙ্গে কী ঝগড়াটাই করতো! সত্যি কথা বলবো বাপু, এদান্তে মা একটা দিনের জন্যেও বাবাকে শান্তি দেয়নি! বাবা চুপ করে থাকতেন মনে হলেও বুক ফেটে যায়!'

মনোরমা আর শুনতে পারেন না, পায়ের নিচে সমস্ত মাটিটা যেন কাঁপছে তাঁর। কোনো মতে হাতড়ে-হাতড়ে উপরে উঠে ঠাকুর ঘরে গিয়ে আছড়ে পড়েন। ঠিকই হয়েছে তাঁর, এইটুকু শুধু বাকী ছিলো, যাদের জন্য সকলের কাছে কলঙ্কভাগী হলেন, তাদেরই উপযুক্ত কথা বটে।

মহেশবাবু একদিন বলেছিলেন, 'একদিন বুঝবে নতুন-বৌ, সংসার-সংসার করে অস্থির হচ্ছো—সংসারের শেষ পাওনাটা পেলে তখন বুঝবে!'

এই কি শেষ পাওনা ?

এর মধ্যে একদিন হঠাৎ দেখলেন, নিচে কোণের ঘরটা থেকে তাঁর স্বামীর জিনিস-পত্রগুলো টেনে বাইরে ফেলা হচ্ছে।

'এ কী ব্যাপার, রাজি ?'

'ঘরটা ভাড়া দিতে হবে, মা। এইটেই একটেরে আছে—ভেতরের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। এক কবিরাজ ভাড়াটে জুটেছে, চল্লিশ টাকা করে দেবে।…তা নইলে তো আর পেরে ওঠা যাচ্ছে না। অন্তত বাপির খরচাটাও যদি চলে—'

বাপি কালই বলছিলো, সে পড়া ছেড়ে চাকরি খুঁজবে। কিন্তু সে-কথা আর মনোরমা তুললেন না। জঞ্জালের গাদা থেকে মহেশবাবুর টিকে-তামাকের বাক্স আর হুঁকো-কলকেটা তুলে নিয়ে উপরে গিয়ে বাপিকে বললেন, 'ওঁর ঐ বসবার ইজিচেয়ারটা আমার ঘরে দিয়ে যাবি, বাবা ?'

'কী হবে, মা ? ও তো ভেঙেই গেছে—'

'তা হোক, ওটা এনে দে, বাবা।'

তখনও চাকর ছিলো, সে আর বাপি ধরাধরি করে চেয়ারটা মনোরমার ঘরে তুলে দিলো। বড়োবৌ দেখে-শুনে মুখ টিপে হেসে বললো, 'তবু ভালো ! মরবার পর শ্বশুর-ঠাকুরের একটু কদর হলো এ বাড়িতে !'

কথাটা মনোরমার কানে যেতে কোনো বাধা ছিলো না, তাঁকে ভয় করার আর কোনো কারণ নেই, এ বাড়িতে ! এখন বড়োবৌ-ই গিন্নী।

চেয়ারটা রেখে ওরা চলে যেতে মনোরমা অনেকক্ষণ কাছে এসে দাঁড়িয়ে স্বামীর শূন্য আসনটার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর সেইখানে মেঝের উপর বসে পড়ে চেয়ারের একটা পায়া জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কেঁদে উঠলেন, 'ওগো, তুমি আমাকে মাপ করো ! আমাকে মাপ করো !'

থির বিজুরি

সুবোধ ঘোষ

চিত্রা রায়ের স্বামী নিখিল রায়। লোকে বলে, হ্যাঁ, তা তো বটেই। বিয়ে যখন হয়েছে তখন স্বামী না বলে আর উপায় কি? কিন্তু আসলে নিখিল রায় হলো একটা সাইফার।

মাত্র চার বছর হলো বিয়ে হয়েছে নিখিলের। বিয়ের মাত্র এক মাস পরেই নিখিলের সঙ্গে চিত্রা যেদিন ধানবাদের কাছে এই কলোনিতে কেরানী কোয়ার্টার্সে এই ছোটো বাড়িটার ভিতরে এসে ঢুকলো, সেদিন কলোনির সকলেই বলেছিলো, হেড-ক্লার্ক নিখিল রায়ের বউ এসেছে, বড়ো সুন্দর বউ।

নিখিল রায়ের স্ত্রী বেশ সুন্দরী, সংবাদটা রটে যেতে বেশি দেরি হয়নি। অফিসেও কাজের ফাঁকে নানা মুখের খোস-গল্পের মধ্যে মাঝে মাঝে এই প্রসঙ্গটা ঝিলিক দিয়ে উঠতো। 'বাস্তবিক, সত্যিই নিখিল রায় একটা বিদ্যুৎ নিয়ে এসেছে। একেবারে একটি অথির বিজুরি, মাইরি।'

'—নিয়ে এলো কোথা থেকে?'

যারা জানে তারাই উত্তর দেয়—'কলকাতা থেকে।'

'—কলকাতার দয়া তো খুব, এমন জিনিস এমনিতেই ছেড়ে দিলো?'

'এ-সব তো ভাই দয়া-টয়ার ব্যাপার নয়। এ-সব হলো ভাগ্যির ব্যাপার। খুব ভাগ্যি করেছিলো নিখিল রায়।'

সেদিন হেড-ক্লার্ক নিখিল রায়ের ভাগ্যকে অফিসের খোস-গল্পগুলি হিংসে করলেও নিখিল রায়ের ভাগ্য তাতে একটুও বিচলিত হয়ে ওঠেনি। পথে বেড়াতে বের হতো নিখিল আর চিত্রা। যারা নিখিলকে চেনে, কিন্তু চিত্রাকে কখনো দেখেনি, তারাও দেখেই বুঝে ফেলতো, এই সুন্দরী মহিলাই হলো হেড-ক্লার্ক নিখিল রায়ের স্ত্রী।

ছ'মাস যেতে না-যেতেই সারা কলোনিতে আর একটা সংবাদ রটে গেল খুব ভালো করেই এবং তারপর কলোনি ছাড়িয়ে ধানবাদেরও নানা মহলের আসরে ও কোয়ার্টারে। 'বেশ সুন্দর গলা, খুব ভালো গান গাইতে পারে হরিনগর কলোনির নিখিল রায়ের স্ত্রী।'

'—কি নাম যেন, ভদ্রমহিলার ?'

যারা শুনেছে নাম, তারাই উত্তর দেয়—'নাম হলো, চিত্রা রায়।'

গানের খ্যাতির সঙ্গে-সঙ্গে চিত্রা রায় নামটাও খ্যাত হয়ে গেল।

তারপর, চারটি মাস যেতে না-যেতে, নানা জলসা আর সভা সমিতির আহ্বানে আসতে-আসতে আর উদ্বোধন সঙ্গীত গাইতে-গাইতে চিত্রা রায়ের মুখটাও চিত্রিত হয়ে গেল ছেলে-মহল মেয়ে-মহল থেকে শুরু করে শিশু-মহলের মনে পর্যন্ত। পথে চিত্রা রায় যদি একাই বেড়াতে বের হয়, তবুও কেউ আর চিনতে ভুল করে না।—'ঐ, উনিই হলেন চিত্রা রায়, নিখিল রায়ের স্ত্রী—চিত্রা রায়।'

সেদিন এই রকমেই ছিলো চিত্রা রায়ের পরিচয়। সে পরিচয় নিখিলের নামের সঙ্গেই বাঁধা। কিন্তু এক বছর যেতে না-যেতেই উল্টে গেল সেই পরিচয়।

সন্ধ্যাবেলা মার্কেটের আলোয় ঝলমলে একটা দোকানের ভিতরে এসে দাঁড়ায় চিত্রা। জিনিসের দাম নিয়ে দর-দস্তুর করে সে, আর নিখিল দাঁড়িয়ে থাকে ওর পাশে। দোকানের শো-কেশের কাচের উপর চিত্রা রায়ের সুন্দর চেহারার প্রতিচ্ছায়া ঝক্‌মক্ করে।

দোকানের ভিতরেই হোক, আর দোকানের বাইরে পথের উপরেই হোক, চিত্রাকে আর নিখিলকে দেখতে পেয়ে লোকের মুখে আলোচনা চলে।
—'ঐ ভদ্রলোক কে, মশাই ?'

'—ঐ তো, উনিই হলেন চিত্রা রায়ের স্বামী নিখিল রায়। সরকার এণ্ড সিন্‌হার হেড-ক্লার্ক নিখিল রায়।'

হ্যাঁ, এক বছরের মধ্যেই উল্টে গেল পরিচয়, চিত্রারই নামের ছায়ায় ঘুরে বেড়ায় নিখিলের নাম। চিত্রাই হলো আসল অস্তিত্ব। তার পাশে আছে নিখিল। চিত্রারই নামের গৌরব মানুষ করে রেখেছে নিখিলকে।

তবু তো মানুষ হয়েই ছিলো, আর চিত্রার পাশেই ছিলো নিখিল। কিন্তু এক বছর আগের সেই পরিচয়ও একেবারে অন্য রকম হয়ে গেল আর তিন বছরের মধ্যে। তাইতো আজ লোকে বলে, নিখিল রায় একটা সাইফার।

চিত্রার পাশে আর নেই নিখিল। এখন চিত্রার পিছনে পড়ে গিয়েছে সে। সিনেমা দেখতে, বেড়াতে, সভা-সমিতিতে বা মার্কেটে, যেখানে যখন যায় চিত্রা, তখন নিখিল তার সঙ্গে-সঙ্গেই থাকে, কিন্তু পিছনে। নিখিলের সঙ্গে যখন কথা বলে চিত্রা, তখন পিছনে মুখ ফিরিয়ে তাকাবারও কোনো দরকার হয় না চিত্রার। চিত্রা যেন তার সম্মুখের পথের বাতাসকে উদ্দেশ্য করেই কথা বলে—'সঙ্গে টাকা এনেছো তো?'

ঠিক শুনতে পায় নিখিল। শুনতে একটু ভুলও হয় না। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়—'এনেছি।'

এতদিনে, ধানবাদের কাছে এই হরিনগরে এসে চার বছরের মধ্যেই চিত্রা তার জীবনের সম্মুখের পথ একেবারে অবাধ করে নিয়েছে। অথচ, চার বছর আগে একদিন এক সকালবেলায় হরিনগর কলোনির সব বাড়ির জানলাগুলিতে থরে-থরে সাজানো কৌতূহলী চোখগুলি দেখতে পেয়েছিলো, হেড-ক্লার্ক নিখিল চলেছে আগে-আগে, তার পিছনে মাথা হেঁট করে আস্তে-আস্তে হেঁটে চলেছে বড়ো সুন্দর ও শান্ত আর একটু গম্ভীর একটি মুখ নিয়ে একটি বউ। আর আজ? আজ আর সেই বউ-এর মুখটি দেখতে ঠিক সেই রকম শান্ত তো নয়, সেই একটু গম্ভীরতার একটুও আজ আর নেই। বউ-এর মাথার কাপড় যেন এই চার বছরের মধ্যেই কোন্ এক ঝড়ের ঝাপটা লেগে খসে পড়ে গিয়েছে ঘাড়ের উপর। পড়েছে তো পড়েই গিয়েছে, আর উঠতে পারছে না। আজ চিত্রা রায়ই চলে আগে-আগে, আর নিখিল চলে পিছনে।

পিছনে হোক্, তবু তো চিত্রার সঙ্গেই আছে নিখিল। তবে লোকে বলে কেন, একেবারে সাইফার হয়ে গিয়েছে সে?

লোকে বুঝতে একটু ভুল করেছে। সামান্য একটু বাড়িয়ে বলেছে। সত্য কথা হলো, সাইফার হয়ে যেতে চলেছে নিখিল। তাছাড়া, এবং

লোকে না জানুক, আজ অফিস যাবার সময় যখন চিত্রার হাত থেকে একটা চিঠি সচ্ছন্দে হাত বাড়িয়ে নিয়েছে নিখিল, তখন আর কোনো সন্দেহ নেই যে, এইবার সত্যিই সাইফার হয়ে যাবে সে।

অফিস যাবার জন্য তৈরী হয়ে প্রতিদিনের নিয়মের মতো চিত্রার কাছে এসে দাঁড়ায় নিখিল।—'তাহলে আসি।'

চিত্রা বলে—'শোনো।'

খামে বন্ধ একটি চিঠি রয়েছে চিত্রার হাতে। হয়তো পোস্ট করতে হবে এই চিঠি। নিখিল বলে—'চিঠি পোস্ট করতে হবে?'

চিত্রা—'না।'

নিখিল—'তবে?'

হাত কাঁপে না চিত্রার, বোধহয় মনও কাঁপে না। শুধু অন্যমনস্কের মতো অন্য দিকে তাকিয়ে কি-যেন ভাবে। তারপরেই প্রশ্ন করে—'ভুল করবে না তো?'

নিখিল বলে বসলো—'ভুল হবে কেন? কি এমন কঠিন কাজ করতে বলছো যে, ভুল হবে?'

চিত্রা বেশ গম্ভীর হয়েই বলে—'তবে শোনো।'

বলতে গিয়ে চিত্রার গলার স্বর একটুও কাঁপে না।

নির্দেশের প্রতীক্ষায় ব্যগ্রভাবেই চিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নিখিল। কিন্তু চিত্রা তাকায় না নিখিলের মুখের দিকে। তাতে কি হয়েছে? এটা নতুন কিছু নয়। আজ চার বছরের মধ্যে এই ঘরের ভিতর ক'দিনই বা নিখিলের মুখের দিকে তাকিয়েছে চিত্রা? সেজন্য কোনো দুঃখ ও দুশ্চিন্তা জাগেনি নিখিলের মনে। আজ নতুন করে হঠাৎ জাগবারও কথা নয়।

চিত্রা বলে—'তোমাকে বিশ্বাস করি বলেই বলছি।'

নিখিল হাসে—'আমাকে বিশ্বাস করবে না তো কাকে করবে?'

নিখিল একটু আশ্চর্যই হয়। আজ একেবারে এ-রকম নতুন একটা প্রশ্ন কেন করছে চিত্রা? আজ পর্যন্ত তার ব্যবহারে এমন কোনো ভুল কি দেখতে পেয়েছে চিত্রা, যার জন্য বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা উঠতে পারে!

মনে তো পড়ে না নিখিলের, কখনো একটা প্রতিবাদ করে, কোনো অভিযোগ করে, কিংবা কোনো কথার উত্তর দিতে একটু দেরি করে চিত্রার মনে কষ্ট দিয়েছে নিখিল।

চিত্রা বলে—'তবে চিঠিটা নিয়ে…।'

বলতে গিয়ে কেন জানি না চুপ করে যায় চিত্রা। বিদ্যুৎ খেলে যায় যে সুন্দর চোখের দৃষ্টিতে, সেই চোখ দুটো যেন হঠাৎ একটা ছায়ায় ঢাকা পড়ে যায়। কিন্তু তার পরেই আর কিছু নয়। ঝক্ঝক্ করে চিত্রার চোখ দুটো। সে বলে—'এই চিঠিটা নিয়ে মিস্টার সরকারের হাতে দিতে হবে।'

নিখিল—'দেবো।'

চিত্রা—'মিস্টার সরকারের টেবিলের ওপর ফেলে রেখে আসলে চলবে না কিন্তু, বুঝলে?'

নিখিল—'না, তাঁর হাতেই দেবো।'

চিঠি নিয়ে চলে গেল নিখিল।

এইবার, আর বেশি দেরি হবে না। বোধহয় আজ সন্ধ্যা ফুরোতে না-ফুরোতে সত্যই সাইফার হয়ে যাবে নিখিল।

প্রস্তুত হয় চিত্রা। সন্ধ্যা আসতেই বা আর কতক্ষণ! চিঠি নিয়ে চলে গিয়েছে নিখিল, এবং চিত্রাও জানে, ও চিঠি খুলে পড়বার জন্য মনে একটু কৌতূহলও যে জাগবে সে-রমক কোনো সন্দেহের বস্তু দিয়ে তৈরিই নয় লোকটা। আর য়দি কৌতূহল হয়, চিঠিটা পড়েই ফেলে নিখিল, তবুও কি কিছু বুঝবে বা মনে করতে পারবে ঐ মানুষ? কখনই না। 'ভেবে দেখলাম, আপনি আমার আপনজনের চেয়েও বেশি। আমি যাবো।' এইটুকু একটা লেখা পড়ে কি-ই বা বুঝবে, আর বুঝলেই বা কি করতে পারে নিখিল? এতদিন ধরে সবই দু'চোখে দেখেও যে কিছু বোঝেনি, সে ঐ সামান্য লেখা কয়েকটা কথা পড়ে ছাই বুঝবে!

আর বুঝলেই বা? নিখিল চিত্রার বাধাই যে নয়! বাধা না হয়েই সে ধন্য হয়ে আছে। বাধা দেবে না নিখিল, বাধা দিতে জানে না সে।

নিঃশব্দে স্থির হয়ে ঘরের ভিতর একা দাঁড়িয়ে ভাবতে-ভাবতে ঝক্-ঝক্ করে চিত্রার চোখ, দুরন্ত বিদ্যুতের জ্বালার মতো সেই বেদনাটাই মনের ভিতর ছটফট করে ওঠে। চার বছর আগে হঠাৎ বাড়ির লোকের এক নিষ্ঠুর ঝোঁক আর সদিচ্ছার আঘাতে যেদিন চূর্ণ হয়ে গেল তার মনের স্বপ্ন, সেই দিনটার স্মৃতি আজও জ্বলছে তার মনের মধ্যে। সেদিনের আক্ষেপ আর ঘৃণা একসঙ্গে মিলে যে ক্ষত সৃষ্টি করেছিলো তার জীবনের একমাত্র কল্পনার বুকে, সেই ক্ষতের জ্বালা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই অশান্ত হয়ে রয়েছে জীবন। কে বলেছিল ও-রকম না বলে-কয়ে আর হঠাৎ ধরে-বেঁধে একটা বিয়ে দিয়ে দিতে? কি দরকার ছিলো? আর যদি বিয়েই দেওয়া হলো, তবে চিত্রার মতো মেয়ের জন্য পৃথিবীতে কি আর কোনো মানুষ ছিলো না? যেন আড়ালে-আড়ালে হঠাৎ একটা ষড়যন্ত্র এঁটে ফেললেন জ্যেঠামশাই ও জ্যেঠাই-মা। একটি-বারের মতো একটি কথাতেও কোনো আভাস দিলেন না যে, বাপ-মা মরা মেয়েকে পার করে দেবার জন্য তাঁরা একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। যদি বিয়ের পিঁড়িতে বসবার এক মিনিট আগেও বুঝতে পারতো চিত্রা, ধানবাদের কাছে এক দেশী কোম্পানির এক ক্লার্ক এসেছেন বরের সাজ পরে, তবে পৃথিবীতে কারও সাধ্য ছিলো না যে, চিত্রাকে সেই পিঁড়ির উপর বসিয়ে দিতে পারে। সেদিনই, সেই মুহূর্তে জ্যেঠামশাইয়ের সব চক্রান্তের উৎসব ভেঙে দিতো চিত্রা, যেমন করেই হোক।

সেই-সন্ধ্যাতে লগ্ন ঘনিয়ে আসবার একটু আগে বরং মিথ্যা কথাই বলেছিলেন জ্যেঠাই-মা। ছেলে নাকি খুব ভালো। যে শুনেছে এই সম্বন্ধের কথা, সে-ই নাকি খুশি হয়েছে।

চিত্র জানে, কেন অমন কাণ্ড করলেন জ্যেঠামশাই, জ্যেঠাই-মা এবং আর সকলেই। লোকের অভিযোগ শুনতে-শুনতে আর ভয় পেয়ে-পেয়েই এ-রকম একটা ষড়যন্ত্র করে ফেললেন জ্যেঠামশাই। এ মেয়েকে বেশিদিন ঘরে পুষে রাখবেন না, ধীরেনবাবু—বন্ধুদের আর প্রতিবেশীদের এই অভিযোগের ভয়েই সারা হয়ে গেলেন জ্যেঠামশাই আর জ্যেঠাই-মা। তাঁরা যদি বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত না হয়ে উঠতেন, তবে কোনো ক্ষতি হতো না

কারও; জ্যেঠামশাইয়ের না, প্রতিবেশীদেও না, আর আত্মীয়দেরও না। চিত্রারও না। চিত্রা নিজেই পৃথিবীতে খুঁজে নিতো তার জীবনের সঙ্গীকে।

বেশি খুঁজতে হতো না চিত্রাকে। পারুল আর প্রীতির মতো মেয়ে যখন নিজের চেষ্টায় মনের মতো সঙ্গী খুঁজে নিতে পেরেছিলো, তখন চিত্রার মনের আশা ও কল্পনাগুলিকে সেটুকু সুযোগও দিলেন না জ্যেঠামশাই।

সুযোগ বড়ো বেশি করেই আসছিলো, তাই তো দুশ্চিন্তিত হয়ে পড়লেন জ্যেঠামশাই। অদ্ভুত মন ওঁদের। চিত্রার বাক্স নানারকম সনামী আর বেনামী চিঠিতে ভরে উঠলো যে, শুনতে পেয়ে আর জানতে পেরে আতঙ্কিত হলেন জ্যেঠাই-মা। কিন্তু সে কি চিত্রার অপরাধ? চিত্রা কি জীবনে কোনদিন চেয়েছিলো এই সব চিঠি? চিত্রার সুন্দর মুখ দেখে মানুষ পাগল হয়ে যায়, সে দোষ চিত্রার নয়। বরং জেনে নিশ্চিন্ত হওয়াই উচিত ছিলো জ্যেঠাই-মা'র, কোনো চিঠিরই উত্তর দেয়নি চিত্রা। কারণ, চিঠিদাতাদের কাউকেই একটাকেও মানুষ বলে মনে করতে পারেনি চিত্রা।

বিয়ের পর হরিনগরের এই কলোনিতে প্রথম এসে চুপ করে বসে ভাবতে-ভাবতে মনের যন্ত্রণায় একদিন হেসেই ফেলেছিলো চিত্রা। সেইসব চিঠির মানুষগুলি যে এই হেড-ক্লার্ক ভদ্রলোকটির চেয়ে অনেক—অনেক বড়ো মানুষ, আজ তারা হয়তো মুখ টিপে হাসছে। শুনে অবাক হয়ে গিয়েছে পারুল আর প্রীতি, শেষে এটা কি একটা কাণ্ড করে বসলো চিত্রা! সন্দীপের মতো গুণের, রূপের ও টাকার মানুষ, এতবড়ো একজন চীফ অফিসারের ব্যাকুলতাও যে চিত্রার মন টলাতে পারেনি, সে চিত্রা বিয়ে করেছে এক দেশী কোম্পানির বড়ো কেরানীকে, যার মাইনে দুশো টাকা। প্রেম হলে না-হয় বোঝা যেতো। কিন্তু প্রীতি আর পারুল জানে, চিত্রা কি সেই মেয়ে যে, প্রেমের আবেগে কাঙালের গলায় মালা দেবে? যে-সে একটা লোকের মুখ দেখে মনে প্রেম জাগবে, এমন মনই করেনি চিত্রা।

চার বছর আগে চিত্রার জীবনের আকাঙ্ক্ষা যে ব্যথা পেয়েছিলো, সেই ব্যথা মুছে যেতে পারেনি এক মুহূর্তের মতও, বরং দিন-দিন আরও মত্ত এবং আরও দুঃসাহসে শাণিত করে তুলেছে চিত্রার বিদ্রোহ।

জীবনে কি চেয়েছিলো চিত্রা? আজ এখন নিজের মনকে পরীক্ষা

করলে, আর স্মৃতি সন্ধান করলে ঠিক বুঝতে পারবে না চিত্রা, বিয়ের আগে কি-ধরনের সুখী-জীবন কামনা করেছিলো চিত্রা। আজ শুধু মনে হয়, এই কলোনিরই মালিক সরকার এণ্ড সিন্‌হা কোম্পানির বারো আনা স্বত্বের অধিকারী বিনায়ক সরকারের মতো মানুষের পাশে যদি ঠাঁই পাওয়া যেতো, তবে ধন্য আর সুখী হতো চিত্রার জীবন।

তবে কি বিনায়ক সরকারের টাকার পুঁজির পরিচয় জানতে পেরে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে চিত্রা? না, ঠিক টাকার জন্য তো নয়। বিনায়ক সরকারের চেয়ে বেশি টাকার মানুষ কি ধানবাদের এই বিরাট কয়লা আর শিল্প-রাজ্যের কোনো অট্টালিকার মধ্যে নেই? টাকার জন্য নয়। বিনায়ক সরকার শুধু টাকার জন্যই বড়ো মানুষ নয়। বিনায়ক সরকার বড়ো সুন্দর ও বড়ো উজ্জ্বল এক বড়ো জীবনের মানুষ। ঐ রকমই এক জীবনের আলো হাসি ও উল্লাসের মধ্যে দাঁড়াবার জন্য চিত্রার মন স্বপ্ন দেখে এসেছে। নইলে বড়ো-মানুষ তো কতোরকমেরই আছে।

কিন্তু বিনায়ক সরকারের মতো মানুষ পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কিনা, জানে না চিত্রা। আজ মনে হয়, এই মানুষটি তার প্রসন্ন জীবনের সকল দীপ্তি নিয়ে এইখানে যেন চিত্রারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিলো। সরকার এণ্ড সিন্‌হার বারো আনা মালিক, এতগুলি ফ্যাক্টরি যার দৌলত সৃষ্টি করছে দিন-রাত, সেই মানুষও স্পষ্ট মুখ খুলেই তার শূন্য মনের একটা হাহাকার প্রকাশ করেছে চিত্রারই কাছে। এইসব দৌলতই সার্থক হতো, যদি চিত্রার মতো মেয়ের ভালোবাসার একটু ছোঁয়া লাগতো বিনায়কের জীবনে।

তাই, জীবনে যাকে দেখে আর যার মুখের হাসি আর ভাষা শুনে প্রথম মুগ্ধ হয়েছে চিত্রা, তারই কাছে চিঠি দিলো এই প্রথম। বিনায়কের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার পরেও তিনটি বছর কেটে গিয়েছে, কিন্তু বিনায়কের আহ্বানে এতো স্পষ্ট ভাষায় সাড়া দিতে পারলো চিত্রা, এই প্রথম।

চিঠি দিতে হাত কাঁপবার কথা নয়। চিত্রার হাতের সব দ্বিধা ও ভীরুতা মুছে গিয়েছে অনেকদিন আগেই। বিনায়কের গাড়ি আসবার আগে যে হাত দিয়ে নিজেকে এতদিন সাজিয়ে এসেছে চিত্রা, সে হাত আজ

একটা চিঠি দিতে কাঁপবে কেন? শুধু একবার নিশ্বাসটা কেমনতর হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু কেন, কিসের জন্য? চিত্রা নিজেই জানে না, কেন।

নিশ্চয়ই নিখিলের কথা ভেবে নয়, যে নিখিল চিত্রার জীবনে একটা অস্তিত্বের বস্তুই নয়। বোধহয় বিনায়কেরই কথা ভেবে। স্ত্রী আছে বিনায়কের, বিবাহিতা স্ত্রী। সেই স্ত্রীকে বর্জন করবার সাধ্য নেই বিনায়কের। বিনায়কই বলেছে, এইখানেই তার জীবনের দুঃখ একটু জটিল ও গ্রন্থিল হয়ে গিয়েছে। বিনায়কের স্ত্রী মৃদুলা সরকার জীবনে স্বামী ছাড়া আর কিছু বোঝে না। সে এক অদ্ভুত বিস্ময়ের নারী। দশ বছর হলো বিয়ে হয়েছে বিনায়কের, য়ুরোপ থেকে ফিরে আসার পরেই। বোম্বাইয়ের এক হোটেলে প্রথম দেখা হয়েছিলো বিনায়কের সঙ্গে মৃদুলার। সেই যে দেখা, সেই দেখাই মৃদুলার জীবনের পরিণাম রচনা করে দিলো। মৃদুলার ভালোবাসা বুঝতে সেদিন যদি ভুল করতো বিনায়ক, তবে আজ আর পৃথিবীতে থাকতো না মৃদুলা। এ কাহিনী নিজেই চিত্রার কাছে অকপটভাবে বলতে কোনো কুণ্ঠা হয়নি বিনায়কের। যে মৃদুলা নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসার সম্পদ বলে মনে করে বিনায়ককে, সেই মৃদুলাকে অস্বীকার করবার মতো শক্তি নেই, এবং সে-রকম নির্মম হবার মতও শক্তি নেই বিনায়কের। তাই, শুধু তাই বিনায়কের ইচ্ছা এই যে···।

হ্যাঁ, বিনায়কের সেই ইচ্ছাই ভালো। বিনায়কের সঙ্গে চিত্রার বিয়ে হতে পারে বটে; কিন্তু হতে অনেক বাধা, আর আইনের ঝঞ্ঝাটও অনেক। এতো সব ঝঞ্ঝাট আর ঝড়ের মধ্যে যাবারই বা দরকার কি? তাই বিনায়কের সেই ইচ্ছাই জীবনে বরণ করে নিতে আর মনের মধ্যে কোনো কুণ্ঠা নেই চিত্রার। নাই বা হলো বিয়ে; তবু বিনায়কের আপনজন হয়ে যাবে চিত্রা। চিত্রার যে হাত কতবার কতো আগ্রহে ধরবার জন্য হাত বাড়িয়েছে বিনায়ক, চিত্রার সেই হাত আজ শেষ কুণ্ঠা চিরকালের মতো দূরে ছুঁড়ে ফেলবার জন্য সঙ্কল্পে কঠিন হয়েই উঠেছে।

নিখিল আছে, চিত্রার স্বামী নিখিল। নিখিল থাকবে, ঠিক যেমন-ভাবে সুখী-মন নিয়ে আর ধন্য হয়ে সে আছে। কিন্তু চিত্রার সঙ্গে-সঙ্গে আর যেতে হবে না। চিত্রার পিছনে-পিছনে থাকতে হয় নিখিলকে, এই বৃথা

সাথীপণার মিথ্যাকে স্পষ্ট করেই মিথ্যা করে দেওয়া ভালো। বস্তুহীন ছায়ার মতো মানুষটাকে পিছনে-পিছনে আসতে দিয়ে লাভ কি? যে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও গিয়ে দাঁড়ালে কোনো গর্বের আনন্দ নেই, সেই মানুষকে একটা ছায়ার মতো সঙ্গে রেখে লাভ কি? না, আর নয়। বিনায়কের মতো মানুষের এতবড়ো মনের ভালোবাসাকে আর ব্যথা দিতে পারবে না চিত্রা। চিত্রার মন আজ নতুন প্রতিজ্ঞার দীক্ষা নিয়ে এতদিনের মিথ্যা কুণ্ঠার পাথরটাকে ছু'পায়ে মাড়িয়ে ধুলো করে দেবার জন্য তৈরি হয়েছে! এইবার, আজ থেকে জগতের যে-কোনো নিভৃতে আর উৎসবের আসরে বিনায়কের চোখের সামনে একাই এসে ধরা দেবে চিত্রা। বিশ্রী লোকচক্ষুর প্রশ্নগুলিকে আর ভয় করে চলবার কোনো দরকার নেই। চিত্রার জীবনের একটা ভুয়া অস্তিত্ব শুধু পড়ে থাকে এই কেরানীর নীড়ে, কিন্তু জীবন পড়ে থাকবে বিনায়কের কাছে।

এইভাবেই আজ একেবারে সাইফার হয়ে যেতে চলেছে নিখিল অফিসের নানা মুখের খোস-গল্পও আজকাল উত্তপ্ত হয়ে ওঠে—'এই অবস্থার জন্যে দায়ী স্বয়ং নিখিল রায়। একটা নির্বোধ। স্বচক্ষে সব দেখেও এতদিনে সাবধান হতে পারলো না, তাইতো···তাইতো, স্বামী হয়েও সাইফার হয়ে গিয়েছে নিখিল।'

বড়ো-সাহেব বিনায়ক সরকারের চকচকে টুরারের পিছনের সীটে যদি চুপ করে বসে থাকে স্বামী নিখিল রায়, আর স্ত্রী চিত্রা রায় বসে থাকেন সামনের সীটে বড়ো-সাহেবের পাশে, তবে কি এ সন্দেহ না করে থাকতে পারে হরিনগর কলোনির সাধারণ ভদ্রলোক আর অফিসের সাধারণ কেরানীর দল?

বাধা? কে বাধা দেবে চিত্রাকে? বাধা দেওয়া যার কথা, সেই যে সবচেয়ে বেশি বাধ্য। সরকার এণ্ড সিন্‌হার হেড-ক্লার্ক নিখিল রায় যেন স্ত্রী-গরবেই গরবী হয়ে রয়েছেন। ভগবান জানে, লোকটার চোখ কি ধাতুতে তৈরি, আর মনটাই বা কি-রকমের প্রশান্ত মহাসাগর!

চার বছর আগে কেরানীর বউ হয়ে যে নারী একটু গম্ভীর মুখ নিয়ে অথচ শান্তভাবেই এসেছিলো এই কলোনির একটি টালি-ছাওয়া চালের

ক্ষুদ্র গৃহে, আজ সেই নারী এ রাজ্যের যতো চোখ বিস্ময়ে ধাঁধিয়ে দিয়ে সরকার এণ্ড সিন্‌হার বড়ো-সাহেবের পাশে রাজেশ্বরীর মতো বসে থাকে। চকচকে টুরারের ইঞ্জিনের গুরু-গুঞ্জন ছাপিয়ে ওঠে চিত্রার মুখের খল্‌-খল্‌ ফোয়ারা-হাসির কলনাদ। সরকার-ভিলার ফটকে ইউক্যালিপটাসের ছায়া থেকে সোজা নীল পরেশনাথের পায়ের কাছে তোপচাঁচির লেক পর্যন্ত, বিনায়কের টুরার চিত্রার মুখের মিষ্টি কলরব বুকে নিয়ে ছুটে যায় আর আসে। পিছনের সীটে বসে নিখিলও মাঝে-মাঝে হেসে ওঠে।

অফিসের নানা-মুখে নানা খোস-গল্প মাঝে-মাঝে নানা ধিক্কারেও তিক্ত হয়ে ওঠে।—'মেয়েটার আর দোষ কি? এ-রকম বেকুবের হাতে পড়লে সব মেয়েই ও-রকম হয়ে যায়।'

অফিসের মধ্যেই একজন মাদ্রাজী কেরানীর সঙ্গে একজন বাঙালী কেরানীর একদিন হাতাহাতি হয়ে গেল। মাদ্রাজী কেরানী বলেছিলো, 'বাঙালীরাই এ-রকম হয়।' এই ধরনের মাত্র একটা কথা সহ্য করতে না পেরে টেম্পোরারী মহিম সেই মাদ্রাজীর সঙ্গে সেদিন যে মারামারি কাণ্ড করে বসলো, সেটা স্বচক্ষে দেখেও, আর কারণটা বুঝতে পেরেও হেড-ক্লার্ক নিখিলের মনে কোনো উত্তাপ জাগেনি। কথাগুলি যেন কথাই নয়, একেবারে বাজে মিথ্যা ও কুৎসিত কতকগুলি ছোটো কল্পনার আক্রোশ। যতো ছোটো মনের পরিচয়।

নিখিলই যখন এ-সব চায়, তখন কে আর বাধা দেবে চিত্রার মতো মেয়েকে, চোখে যার বিদ্যুৎ খেলে, আর শাড়ি পরার ও বেণী বাঁধবার ভঙ্গীতে ফ্যাশান উথলে পড়ে। হরিনগর কলোনির সকলের চোখেই ভর্ৎসনা জাগিয়ে দিয়েছে চিত্রা নামে এক নারীর এই ভয়ানক অভ্যুত্থান। কিন্তু কোনো তিক্ততা বিরাগ ও ভর্ৎসনা নেই শুধু একজনের চোখে, চিত্রার স্বামী নিখিল রায়ের চোখে।

লোকে আলোচনা করে, অফিসের নানা মুখে একটা হতভম্ব অবস্থাও মাঝে-মাঝে ফুটে ওঠে।—এ-রকম হয়ে গেল কেন নিখিল রায়? কোনো-রকম প্রমোশন বা লিফ্‌টও তো পাচ্ছে না নিখিল। সরকার এণ্ড সিন্‌হার বারো আনা প্রভু বিনায়ক সরকার যদি ইচ্ছা করেন, তবে নিখিলকে এই

অফিসের অন্তত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট করে দিতে পারেন। কিন্তু সে-রকম কিছুর আঁচ-আভাসও তো পাওয়া যায় না।

তাই টেম্পোরারী মহিম বলে—'সব দোষ হচ্ছে ঐ ভয়ঙ্কর বড়ো সাহেবটির। এই রকম কীর্তি করা ওঁর অভ্যেস আছে। অনেক করেছেন উনি, আপনারা কোনই খবর রাখেন না।'

সত্যিই কেউ খবর রাখেন না। টেম্পোরারী মহিম কোথা থেকে এতো খবর জানলো কে জানে! হয়তো একেবারে বাজে কথা। ছাঁটাইয়ের লিস্টে নাম চড়েছে বলে রাগের মাথায় যা-তা বলছে মহিম।

মহিম বলে—'ওঁদের যে একটি ক্লাব আছে, আর সেই ক্লাবে কি হয়, সে খবর আপনারা কেউ জানেন না।'

তা কেউ জানে না ঠিকই। ক্লাব আছে, এইটুকু সকলেই জানে।

মহিম বলে—'কারা সেখানে আসে, তাও আপনারা কিছু জানেন না।'

আসে কতো গাড়ি-চড়া মানুষ; এইটুকু সকলেই জানে। পায়ে-হাঁটা মানুষ সেখানে কখনো আসে না, আসতে পারে না, আসবার নিয়মও নেই।

মহিম বলে—'কতকগুলো হোমরা-চোমরা অফিসার আসে, আর আসে কতকগুলো সাহেব, কতকগুলো লেডি। আর পিপে-পিপে মদ।'

'—থামো-থামো, মহিম। বড়ো বেশি রং চড়াচ্ছো তুমি।'

মহিম বলে—'আমি সত্যি কথা বলছি কিনা, সেটা নিখিলবাবুই জানেন। আমি নিজের কানে শুনেছি, বড়ো-সাহেব সেই ক্লাবে নিখিলবাবুকে সস্ত্রীক যাবার জন্যে বলেছেন।'

'—অ্যাঁ?'

সকলে চমকে ওঠে আর বুঝতে পারে, আসল দোষ তাহালে নিখিলেরই।

কিন্তু যার জীবনের পরিণাম নিয়ে এতো আলোচনা, সেই চিত্রা রায়ের মন এই সব খুঁটিনাটির আর বিচারের অনেক উপরে চলে গিয়েছে। আজও তো ভুলে যায়নি চিত্রা, সেই একটা ঘটনার কথা। বিয়ের পাঁচ মাস আগে দার্জিলিং-এ বেড়াতে গিয়েছিলো চিত্রা, জ্যেঠাই-মা'র বোন জয়া মাসিমার সঙ্গে। লেবং-এর মঠে চিত্রাকে দেখতে পেয়ে অপলক চোখে

তাকিয়েছিলো কোনো এক স্টেটের রাজকুমার। আর সত্যই, এক ভদ্রমহিলা এসে জয়া মাসিমাকে ইংরেজী ভাষায় জিগ্যেস করেছিলেন, ঐ মেয়ের বাপ কোন্ স্টেটের চীফ ?

এই পৃথিবীর এক স্টেটের রাজকুমারী বলে মনে হয়েছিলো যে মেয়েকে, সেই মেয়ের শাড়ি পরার স্টাইল দেখেই ভয় পেয়ে গেলেন জ্যেঠামশাই। সে-মেয়ের মনের স্টাইলের কোনো খবর নিলেন না। খবর নিলে বুঝতে পারতেন জ্যেঠামশাই, চিত্রাকে এভাবে একজন যে-সে লোকের হাতে ধরিয়ে দেওয়া কি ভয়ানক নিষ্ঠুরতা।

সেই নিষ্ঠুরতাকে ক্ষমা করতে পারেনি চিত্রা। সেই চক্রান্তের দান নিখিল রায় নামে এই ভদ্রলোকটিকে জীবনে আপন বলে মনে-মনে গ্রহণ করতে পারেনি চিত্রা! আর এই জন্য মনে কোনো দুঃখ নেই চিত্রার। দেখে আরও সুখী হয়েছে চিত্রা, এই ভদ্রলোকের মনেও কোনো দুঃখ নেই। চিত্রা ডাক দেওয়া মাত্র কাছে এসে দাঁড়ায়, বলা মাত্র চলে যায়, আর আসতে বললেই সঙ্গে আসে নিখিল।

স্বামী নামে পরিচিত এই মানুষটিকে একদিনের জন্য একটি রূঢ় কথা বলতে হয়নি চিত্রার। ভদ্রলোকই সে সুযোগ দেননি চিত্রাকে। নিখিল যেন চিত্রারনীরব চিন্তার বেদনাগুলিকেও শুনতে পায় এমনই প্রখর তার কান।

ভোরে, টালি-ছাওয়া চালের ক্ষুদ্রাকায় এই বাড়ির ভিতরে বারান্দায় চেয়ারের উপর বসে আর সামনের ছোটো টেবিলের উপর এক পেয়ালা চা রেখে যখন চুপ করে বসে থাকে চিত্রা, তখন যেন ঘরের ভিতরে থেকেও চিত্রার চোখ দুটোকে দেখতে পায় নিখিল। চিত্রার চোখ দুটো যেন উদাস হয়ে কুয়োতলার পেয়ারা গাছটার ছায়ার দিকে তাকিয়ে আছে। ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে দেখতেও পায় নিখিল, তার ধারণা মিথ্যা নয়। চিত্রার চা জুড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু চায়ের কাপের দিকে চোখ নেই চিত্রার। আনমনা হয়ে কি-যেন ভাবছে চিত্রা।

নিখিল তার নিজেরই হাতের চায়ের কাপে চুমুক দিতে পারে না।—'তোমার চা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

নিখিলের কথায় চিত্রার স্তব্ধ হাতটার শুধু চমক ভাঙে। চায়ের কাপ

হাতে তুলে নেয় চিত্রা। কিন্তু একজন মানুষ যে হঠাৎ এসে চা খাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিলো, সেটা চিত্রা বুঝতেও পারে কিনা সন্দেহ। নিখিলের মুখের দিকে তাকায় না চিত্রা। একটা কথা বলবার জন্যও কোনো সাড়া জাগে না চিত্রার দুই ঠোঁটে, রক্ত-গোলাপের অভা দিয়ে আঁকা দু'টি ঠোঁট।

এক-একদিন মাঝ-রাতেই নিজের ছোটো ঘর থেকে ব্যস্তভাবে চিত্রার ঘরে ঢোকে নিখিল। দেখে ঘুমিয়ে আছে চিত্রা, কিন্তু যেন একটা দুঃখের স্বপ্ন দেখে বিড়বিড় করছে চিত্রা। অস্পষ্ট সেই স্বপ্নাতুর ভাষার মধ্যে যেন অভিমানের মতো একটা বেদনা বিড়-বিড় করে। পাখা হাতে নিয়ে ঘুমন্ত চিত্রার মাথায় কিছুক্ষণ বাতাস দিয়ে চলে যায় নিখিল।

পরদিন কথায়-কথায় নিখিল তার মনের উদ্বেগ প্রকাশ না করে পারে না—'কাল ঘুমের মধ্যে তুমি বড়ো কষ্ট পেয়েছো।'

চুপ করে থাকে চিত্রা, কোনো উত্তর দেয় না আর নিখিলের মুখে এই ধরনের কথাগুলি শুনতে ভালোও লাগে না।

বোধহয় স্বপ্নের কথাগুলিই মনে পড়ে যায়, তাই। যেন ঘুমের মধ্যেই বড়ো স্পষ্ট করে দেখতে পায় চিত্রা, নিজেকে আর নিজের মনটাকেও। শাড়িতে আর বেণীতে স্টাইল আছে, মনের সখ-সাধ আর কল্পনাগুলির মধ্যেও স্টাইল আছে, কিন্তু এই স্টাইলগুলিই কি তার জীবনের একমাত্র কাম্য ছিলো? না বোধহয়। ঘুমের মধ্যেই নিজের লুকোনো মনটাকে যেন দেখতে পায় চিত্রা, আর বুঝতে পারে, মনের মতো স্বামীর গর্বে গরবিনী হবার একটা আকাঙ্ক্ষা শুধু আঁকা আছে সেই মনে। সেই আকাঙ্ক্ষারই বেদনা বিড়-বিড় করে তার পাঁজরের আড়ালে এক কোণে।

নিখিলের কথা শুনে চুপ করে থাকে চিত্রা। বলতে ইচ্ছা করলেও বলে না কথাটা—আমার স্বপ্নের খোঁজ নেবার জন্য তোমার আবার এতো গরজ কেন?

স্বামীর পরিচয় চিত্রার জীবনে কোনো গর্ব আনেনি, আনবেও না কোনদিন। তার জীবনের এই শূন্যতা একটা চিরকেলে শ্মশানের মতো মনের মধ্যে জ্বলতো, যদি বিনায়ক সরকারের সঙ্গে দেখা না হতো একদিন,

এক গানের সভায়। চিত্রা জানে, ভাগ্য তাকে অন্তত এইটুকু কৃপা করেছে, অন্তত এইটুকু গর্ব এনে দিয়েছে চিত্রার মনে, বিনায়কের মতো মানুষও দুঃখ পায় মনে-মনে, চিত্রার মতো মেয়েকে জীবনে সঙ্গিনী করতে পারেনি বলে। গর্ব তো বটেই। মৃদুলা সরকারের মতো লেডি যার স্ত্রী, সেই বিনায়কও আজ চিত্রাকে পাশে নিয়ে ইউক্যালিপটাসের ছায়ায় দাঁড়াতে পারলে সুখী হয়ে যায়। হরিনগর কলোনিতে এসে চার বছরের মধ্যেই চিত্রার চোখের বিদ্যুৎ জয়ী হয়েছে। যে-মানুষকে দেখে হাজার মানুষ প্রতিদিন সেলাম আদাব ও নমস্তে জানায়, যে মানুষের মুখের দিকে অনেক লেডিই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে, যে মানুষের সঙ্গে সস্ত্রীক অন্তরঙ্গ হবার জন্য অনেক কন্‌ট্রাক্টর অনেক চেষ্টা করে, সেই বিনায়ক সরকার শুধু বলে—'এইবার শুধু তুমি আর আমি, চিত্রা—আর কেউ নয়; মাঝে-মাঝে এই আলো আর ধোঁয়ার ভিড় থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে শালবনের কিনারায় ছোট্ট একটি জলস্রোতের কাছে··· ।'

হ্যাঁ, তাই হবে। তাই বিনায়কের চিঠির উত্তর দিয়েছে চিত্রা। অনেকবার এই আহ্বানের ভাষা বুকে লুকিয়ে নিয়ে চিত্রার কাছে এসেছে বিনায়কের অনেক চিঠি। আজ প্রথম উত্তর দিলো চিত্রা। কারণ, চিত্রার মনে আর কোনো প্রশ্ন নেই।

সন্ধ্যার জন্য বিকাল থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিলো চিত্রা। আর সন্ধ্যা হবার আগেই বিনায়কের কাছ থেকে চিঠির উত্তর নিয়ে অফিস থেকে বাসায় ফিরলো নিখিল।

জানিয়েছে বিনায়ক, 'সুখী হলাম চিঠি পেয়ে। আজ আমার সরকার এণ্ড সিন্‌হার সিল্‌ভার জুবিলী। কিন্তু তুমি বুঝবে চিত্রা, আজ আমার জীবনের এক তৃপ্তির জুবিলী। কারণ, চিঠিতে তোমার মন চিনতে পারলাম, এই প্রথম। গাড়ি যাবে।'

চিঠি পড়ার পর চিত্রার চোখে পড়ে, নিখিলের হাতে আর একটি চিঠি রয়েছে। সোনালী অক্ষরে ছাপানো একটি কার্ড।

চিত্রা—'ওটা কি ?'

নিখিল—'নেমন্তন্নের কার্ড।' নিখিল হাসে—'মিস্টার ও মিসেস নিখিল রায়ের।'

চিত্রার গলার স্বরে হঠাৎ একটা জ্বালা যেন কেঁপে ওঠে—'তার মানে ?'

নিখিল—'সরকার এণ্ড সিন্‌হার সিলভার জুবিলী আজ। সরকার ভিলাতে ককটেল পার্টি আছে। নেমন্তন্ন করছেন মিস্টার সরকার।'

চিত্রা—'তোমাকেও ?'

নিখিল—'হ্যাঁ, তাই তো নিয়ম।'

চিত্রা চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তার পরেই যেন নিজের মনেই বিড়বিড় করে—'নিয়ম তো আছে জানি। কিন্তু...'

কিন্তু এই নিয়মের অর্থ খুঁজে বের করার কোনো অর্থ আজ আর নেই। বেশিক্ষণ অপেক্ষাও করতে হয় না চিত্রাকে। বড়ো-সাহেবের চকচকে টুরার পৌঁছে যায় হেড-ক্লার্কের কোয়ার্টারের সম্মুখে। একই সঙ্গে পাশাপাশি হেঁটে গাড়ির ভিতর গিয়ে উঠে বসে নিখিল আর চিত্রা, মিস্টার ও মিসেস রায়, স্বামী আর স্ত্রী।

গাড়িতে শান্তভাবেই বসে রইলো চিত্রা, কিন্তু রাগ হয় বিনায়কের উপর। আজ এতো স্পষ্ট করে জানতে পেরেও এ-রকম ব্যবস্থা করলো কেন বিনায়ক ? চিত্রা রায়ের জীবনে প্রথম প্রণয়ের অভিসারে নিখিল রায় নামে লোকটিকে চিত্রার সঙ্গে কেন যেতে বললো বিনায়ক ? বিনায়ককে চিঠি দেবার সময় হাত কাঁপেনি যার, সেই শক্ত-মনের চিত্রা রায়ও তার পাশের এই তুচ্ছ একটা অস্তিত্বকে সহ্য করতে অস্বস্তি বোধ করে। দুঃসহ এই অস্বস্তি।

কিন্তু অস্বস্তি মুহূর্তের মধ্যে দূর হয়ে গেল। ইউক্যালিপটাসের পাশে মস্তবড়ো সামিয়ানা টাঙানো আর আলোয় আলোকিত আসর। চকচকে টুরার যেন একেবারে এক নতুন জগতের সিংহদ্বারে নিয়ে এসে পৌঁছে দিলো চিত্রাকে। এগিয়ে এলো বিনায়ক, আর বিনায়কের অভ্যর্থনার হাতে হাত দিতেই ঝিলিক দিয়ে হেসে উঠলো চিত্রার চোখের বিদ্যুৎ।

যেন ছোটো-ছোটো কুঞ্জ দিয়ে সাজানো একটা জগৎ। প্রতি কুঞ্জের

ফুলের স্তবকের মধ্যে বিদ্যুতের রঙীন বাতি জ্বলে। প্রতি কুঞ্জে একটি করে টেবিল আর দু'টি করে চেয়ার। একদিকে নাচের আসর তৈরি করা হয়েছে। ছোটো একটি ডায়াস, তার দু'পাশে বসে জ্যাজ বাজায় কলকাতার বিলেতী হোটেল থেকে ভাড়া করে আনানো গোয়ানীজ বাদকের দল।

বিনায়ক সরকার তার হাসি-ভরা মুখ চিত্রার কানের কাছাকাছি এনে তার জীবনের পরম তৃপ্তির সিলভার জুবিলীর অর্থ বুঝিয়ে দেয়। '—আজ এই উৎসবের এক কোণে এক টেবিলের পাশে শুধু তুমি আর আমি। আজ পৃথিবী জানবে, তুমি আমার আপনজন হয়ে গিয়েছো, চিত্রা।'

চিত্রার হাসিতে বিদ্যুৎ খেলে যায়—'তাই বলো। আমি ভুল বুঝে তোমার ওপর রাগ করেছিলাম।'

বিনায়ক হাসে—'আমাকে এখনো ভুল বুঝবে তুমি?'

চিত্রা—'না, আর কখনো না।'

জ্যাজ বাজে মত্ত হয়ে। গেলাসে-গেলাসে শেরি আর হুইস্কির পেগ ট্রের উপর সাজিয়ে নিয়ে ছুটোছুটি করে বয় আর বাটলার। সরকার এণ্ড সিন্‌হার সিলভার জুবিলীর মদিরতা বিহ্বল ও উচ্ছল হয়ে ওঠে। গেলাস হাতে নিয়েই কোনো সজ্জন উঠে পড়েন আর টলতে-টলতে অন্য এক টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ান। ওয়েলকাম্ জানিয়ে সেই টেবিলের সজ্জনও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। আর সেই চেয়ারের লেডি খিল-খিল করে হেসে ওঠেন।

জ্যাজ বাজে আরও প্রমত্ত হয়ে। অভ্যাগতা লেডিদের শেরিসিক্ত ওষ্ঠে লিপস্টিকের রঙও লাস্যে তরল হয়ে ওঠে। এক একটি টেবিলে বিহ্বল যুগলমূর্তি। মিসেস ফর্দুনজীর টেবিলের কাছে উঠে এসে বসেন মিস্টার চৌধুরী। মিসেস চৌধুরী এই টেবিল আর সেই টেবিলের এক-এক দম্পতির সঙ্গে হাস্যালাপ বিনিময় করতে-করতে শেষে গিয়ে বসেন মিস্টার পাত্রের পাশে শূন্য চেয়ারে। দেখা যায়, আসরের ঐদিকে মিস্টার চ্যাটার্জির সঙ্গে আলাপ করছেন মিসেস পাত্র।

আর চিত্রা বসে থাকে আসরের প্রায় মাঝখানে নীল আলোকের এক স্তবকের নিচে একটি টেবিলের কোলের কাছে, বিনায়কের পাশে।

এই নতুন জগতের ভিড়ের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল চিত্রা রায়ের স্বামী নিখিল রায় ?

জানে না চিত্রা, দেখতেও চায় না সে, আজ তার এই জীবনান্তরের শুভক্ষণে পিছনের কোনো মিথ্যা ছায়ার বাধাও আর রাখতে চায় না চিত্রা। পৃথিবীর সব চোখের সামনেই বিনায়কের পাশে বসে চিত্রা আজ অকুণ্ঠচিত্তে জানিয়ে দিতে চায়, সে আজ বিনায়কেরই জীবনের সবচেয়ে আপনজন, নিকটের মানুষ।

পরিশ্রান্ত জ্যাজ থামে কিছুক্ষণের জন্য। তার পরেই শোনা যায় সারা আসর যেন সম্মিলিত কণ্ঠে হুর্‌রে জানিয়ে অভ্যর্থনা করছে এক অতি মাননীয়া আগন্তুকাকে।

বিনায়কের কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে চিত্রা জিজ্ঞেস করে—'ইনি কে ?'

বিনায়ক হাসে—'মৃদুলা !'

চমকে ওঠে চিত্রা—'মৃদুলারও কি এখানে আসবার কথা ছিল ?'

বিনায়ক—'ছিলো বৈ-কি।'

চিত্রা—'আমাকে তো বলনি যে, মৃদুলা আসবে এখানে।'

বিনায়ক—'এর মধ্যে বলবার কি আছে ? এটা তো সাধারণ নিয়ম।'

এই টেবিল থেকে ওই টেবিল, তারপর আর এক টেবিল, শেরিতে উৎফুল্ল এক-একটি মুখের আনন্দধ্বনিকে যেন বিনম্র ভঙ্গীতে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে আপ্যায়িত করে ঘুরতে থাকেন মৃদুলা সরকার। বিরাট একটি জড়োয়া নেকলেস মৃদুলার গলা জড়িয়ে রয়েছে। ব্রোকেডের একটি স্কার্ফ এলোমেলো হয়ে লুটিয়ে রয়েছে মৃদুলার কাঁধ আর পিঠের উপর। পা টলছে মৃদুলা সরকারের। মৃদুলার এতো জমকালো করে সাজানো চেহারাটা কেমন যেন আলুথালু আর উদ্‌ভ্রান্ত। শুধু একজোড়া ডাগর চোখ এদিক-ওদিক তাকিয়ে মাঝে-মাঝে কট্‌কট্‌ করে হেসে ওঠে।

নিজের কানেই শুনতে পায় চিত্রা, তার কাছের টেবিলের এক অতিথি তার পার্শ্ববর্তিনীকে বলছেন—'মৃদুলা সরকার আজ সকাল থেকে শেরিতে ভাসছেন বলে মনে হচ্ছে ?'

চিত্রা তাকায় বিনায়কের মুখের দিকে, 'মৃদুলার কি হয়েছে, বলতো? ও-রকম করছে কেন?'

বিনায়ক বলে—'চিরকাল যা করে এসেছে, তাই করছে।'

চিত্রা—'কি?'

বিনায়ক—'টি্পসি, মাত্রা বেশি হয়ে গিয়েছে।'

আলোর আসরের মধ্যে একটা অন্ধকার যেন ধুকপুক করে উঠলো। একি কথা বলছে আজ বিনায়ক তার নিজের মুখে? এই কি বিনায়কেরই গল্পের সেই পতিব্রতা প্রেমিকা স্ত্রী, মৃদুলা সরকার!'

চিত্রা বলে—'তোমার কথা শুনে মৃদুলার সম্বন্ধে আমার অন্য-রকম ধারণা হয়েছিলো।'

বিনায়ক—'কি ধারণা হয়েছিলো?'

চিত্রা—'মনে হয়েছিলো এই সব শেরিটেরির মানুষ নয় মৃদুলা।'

বিনায়ক—'শেরি সম্বন্ধেই তোমার মনে ভুল ধারণা রয়েছে ডিয়ার'

চিত্রার মুখের দিকে অদ্ভুত এক অলস ভঙ্গীতে তাকিয়ে কথা বলে বিনায়ক। হাসে চিত্রা রায়; রক্ত-গোলাপের আভা দিয়ে গড়া ঠোঁট দুটো যেন একটা বিস্ময় সহ্য করার জন্য জোর করে হাসতে থাকে। অদ্ভুত ভীরু-ভীরু হাসি। বিনায়কের অনুরোধে শেরির গেলাস দুই ঠোঁটের ভীরু হাসির কাছে তুলে নিতে গিয়েই হঠাৎ হাত থামায় চিত্রা। মৃদুলার রঙীন মূর্তিটার দিকেই আবার চিত্রার দু'চোখের দৃষ্টি ছুটে চলে যায়। মনে হয় চিত্রার, শেরির নেশায় টলমল দু'টি চোখের দৃষ্টি দিয়ে আর বাঘিনীর মতো দুর্দান্ত একটা আগ্রহ নিয়ে কি-যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে মৃদুলা সরকার। কটকট্ করে হেসে উঠছে মৃদুলার দু'চোখ।

দেখতে নেহাত অসুন্দর তো নয় মৃদুলার মুখ। নিজের রূপ সম্বন্ধে চিত্রার মনের ধারণায় যথেষ্ট অহংকার থাকলেও মৃদুলাকে সুন্দর বলেই স্বীকার করতে পারে চিত্রা।

যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলো চিত্রা। জ্যাজের শব্দে চমক ভাঙে আর দেখতে পায়, দূরে দাঁড়িয়ে আসরের মাঝখানে এই টেবিলের দিকেই তাকিয়ে কটকট্ করে হাসছে মৃদুলার দু'চোখ।

থর-থর করে কেঁপে ওঠে চিত্রা। প্রশ্ন করে চিত্রা—'মৃদুলা এখানে এসে বসবে নাকি ?'

বিনায়ক—'ওগো না, না, না।'

কিন্তু একটা ভয়ের শিহরণ যেন ধীরে-ধীরে চিত্রার শরীরের রক্তে ঠাণ্ডা সাপের মতো সিরসির করে ঘুরে বেড়ায়। বিনায়ক সরকারের পরিণীতা স্ত্রীর একি জীবন ? বেশ তো অদ্ভুত রকমের উজ্জ্বল জীবন ! আলোর মেলার মধ্যে দাঁড়িয়ে কটকট্ করে হাসছে ওর চোখ দুটো।

এদিকে আসে না, ওদিকেই ঘুরে বেড়ায় মৃদুলা। তবু দেখতে ভয় করে চিত্রার, বিনায়কের মতো মানুষের পরিণীতা প্রেমিকা হয়েও ও-রকম হয়ে গেল কেন মৃদুলা ? এই-ই কি এই রঙীন আর উচ্ছল জগতের নিয়ম ?

কি যেন সন্ধান করে ফিরছে মৃদুলা এবং টেবিলের পর টেবিলের ছায়া পার হয়ে চলে যাচ্ছে আসরের একেবারে শেষে, একেবারে সামিয়ানার রঙীন ঝালরের গা-ঘেঁষা ছায়া-ছায়া নিভৃতের একটি টেবিলের কাছে।

পাথরের চোখের মতই স্তব্ধ আর অপলক হয়ে তাকিয়ে থাকে চিত্রার চোখ। নিশ্বাস বন্ধ করে দেখতে থাকে চিত্রা, সুন্দর ব্রোকেডে জড়ানো এক বাঘিনীর কৌতূহল যেন এতক্ষণে শিকারের সন্ধান পেয়েছে। সেই টেবিলের পাশে বসে আছে একা একজন, তারই পাশে গিয়ে বসলো মৃদুলা ? টিপ করে একটা শব্দ যেন হঠাৎ বেজে উঠলো চিত্রার বুকের ভিতর। ওখানে কেন মৃদুলা ? ঐ নিরীহ নির্বোধ মানুষটার কাছে কেন মৃদুলা ? হেড-ক্লার্ক নিখিল রায়ের সঙ্গে আলাপ করে কি লাভ হবে মৃদুলার ?

বিনায়ক ডাকে—'চিত্রা।'

শুনতে পেয়েও মুখ ফিরিয়ে বিনায়কের দিকে তাকায় না চিত্রা। যেন সুদূর এক সংসারের রঙ্গমঞ্চের দিকে এক অদ্ভুত অদৃষ্টের খেলা দেখবার জন্য তাকিয়ে আছে চিত্রা। দেখতে পায় চিত্রা, বয়ের হাতের ট্রে থেকে দু'টি গেলাস তুলে নিলো মৃদুলা। একটি নিজের কাছে রেখে, আর একটি গেলাস নিখিলের হাতের কাছে সমাদরের ভঙ্গীতে এগিয়ে দেয় মৃদুলা।

—সাবধান ! যেন মুহূর্তের অসাবধান মনের এক নতুন দুর্বলতার সুযোগ পেয়ে চিত্রার মুখে চমকে উঠেছে ছোটো একটা অস্ফুট আর্তনাদ।

বিনায়ক বলে—'তুমি এদিকে ঘুরে বসো, চিত্রা।'

জ্যাজ বাজে মত্ত হয়ে। নাচের আসরে দশ-জোড়া মূর্তি দুলে-দুলে পা ফেলে। কিন্তু চিত্রার মনের চাঞ্চল্য যেন হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়েছে, কোনো ভাষা আর বাজনার স্বর কানে আসছে না। চিত্রার মনে হয় শুধু, আসরের শেষ দিকে সামিয়ানার ঝালরের কাছে একটা শিশুর অসহায় বুক একা দেখতে পেয়ে এক বাঘিনী গিয়ে সম্মুখে বসেছে লুব্ধ হয়ে। শেরির নেশায় তৃপ্ত হয়নি মৃদুলা, আরও কিছু খুঁজছে সে।

'—নো লাইট, ওয়ান মিনিট!' কে যেন চেঁচিয়ে ফুর্তির মাথায় হাঁক দিলো, সঙ্গে-সঙ্গে আসরের সব আলোক যেন একটি ফুৎকারে নিভে গেল।

'—একি!' সেই মুহূর্তে চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল চিত্রা। হঠাৎ ভীত একটা পাখির আর্তনাদের মতো করুণ চিত্রার গলার সেই শব্দ। হঠাৎ অন্ধকার যেন চিত্রার বুকের উপর তীক্ষ্ণ একটা ছুরির আঘাতের মতো লাফিয়ে পড়েছে। রঙীন ব্রোকেডে জড়ানো এক ভয়ংকরীর শেরিসিক্ত ঠোঁট এইবার হিংস্র হয়ে কোন্ সর্বনাশ করে দেয় কে জানে? চেয়ার থেকে উঠে, যেন এই অন্ধকারের মধ্যেই দূরের সেই টেবিলের দিকে ছুটে যাবার জন্য ছটফট করে চিত্রা।

বিনায়ক হেসে ওঠে—'আঃ, বসো চিত্রা।'

পথ না পেয়ে, আর যেতে না পেরে অন্ধকারের মধ্যেই থমকে দাঁড়িয়ে আসরের শেষ প্রান্তের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে চিত্রা। হঠাৎ চমকে ওঠে চিত্রা। ঝন্ করে আর্তনাদ করে সশব্দে একটা কাচের গেলাস যেন চূর্ণ হলো কোথাও। ফুরিয়েছে এক মিনিট, দপ্ করে জ্বলে ওঠে আলো।

এই কয়েকটি মুহূর্তের অন্ধকারে আসরের মধ্যে যেন একটা নাটক চমকে উঠেছিলো, তারই চিহ্ন দেখা যায় আসরের দু'জায়গায়। আসরের সব মানুষ আশ্চর্য হয়ে আর ভুরু কুঁচকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে, ব্যাপার কি? এদিকে, ভীত ও উদ্‌ভ্রান্ত দুটো চোখ নিয়ে বিনায়কের টেবিলের কাছে চিত্রা রায় পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে, আর তাকিয়ে আছে আসরের শেষ প্রান্তের এক টেবিলের দিকে। আর ওদিকে, শেষ প্রান্তের টেবিলের

কাছে একটি চেয়ার থেকে যেন হঠাৎ এক রূঢ় আঘাতে উল্টে পড়ে গিয়েছে মৃদুলা সরকার। মৃদুলারই গেলাস হাত থেকে ছুটে গিয়ে দূরে পড়েছে, আর চূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

তাকিয়ে থাকে চিত্রা রায়ের পাথরের মতো স্তব্ধ দু'টি চোখ। তার পর ধীরে-ধীরে বিচিত্র এক হাসির জ্যোৎস্না যেন ফুটে উঠতে থাকে সেই চোখে। আসরের সব চোখ তাকিয়ে দেখে, সত্যই এক গরবিনী রাজেশ্বরীর মতো ভঙ্গী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক নারী।

হ্যাঁ, গর্ব ছাড়া আর কি? বাঘিনীর আগ্রহ অন্ধকারের সুযোগে মত্ত হয়ে ছুঁতে গিয়োছিলো চিত্রা রায়ের স্বামীকে। ভুল করেছে মৃদুলা, বুঝতে পারেনি মৃদুলা, চিত্রা রায়ের স্বামী বড়ো কঠিন স্বামী।

বিনায়ক ডাকে—'দাঁড়িয়ে আছো কেন? বসো, চিত্রা।'

'—হ্যাঁ, বসছি।' হেসেই বিনায়কের আহ্বানে সাড়া দেয় চিত্রা।

যেন চিত্রার বুকের ভিতর থেকেই অদ্ভুত একটা বিদ্রূপ হাসির ঝরনা হয়ে ঝরে পড়ছে। থামতে চায় না হাসি। এই অন্ধকারে-ভরা কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে নতুন কোন্ গর্ব পেয়ে গেল চিত্রা, যার জন্য এমন করে বিনায়কের দিকে করুণার চোখে তাকিয়ে স্বচ্ছন্দে অবাধে নিঃসঙ্কোচে আর মধুর হেসে চলেছে সে?

বোধহয়, চিত্রাই তখনো বুঝতে পারেনি যে, তার জীবনের সকল ক্ষোভের গভীরে লুকোনো বেদনার বিদ্যুৎ আজ জ্বালা হারিয়ে একেবারে স্থির হয়ে গিয়েছে।

আবার জ্যাজ বাজে মত্ত হয়ে, নাচের আসরে জোড়া-জোড়া নৃত্যপর মূর্তির ছায়া দোলে। চুপ করে, নিজের বুকের ভিতরের অদ্ভুত এক প্রসন্নতার ভারে অলস ও স্নিগ্ধ হয়ে চেয়ারের উপর বসে থাকে চিত্রা।

আবার নো লাইট। নিভে গেল সব আলোক।

স্থির হয়ে, শক্ত হয়ে, চুপ করে বসে থাকে চিত্রা। পর মুহূর্তে চমকে ওঠে। শেরির গন্ধ-মাখানো একটা নিশ্বাসের সরীসৃপ যেন চিত্রার মুখের কাছে এগিয়ে আসছে।

ঝন্‌ন্! সঙ্গে সঙ্গে একটা কাঁচের গেলাস চূর্ণ হয়ে যায় অন্ধকারে।

একটি চেয়ার উল্টে পড়ে যায়। অন্ধকারের স্পর্ধাকে দুই হাতের ঘৃণা-কঠিন ধাক্কায় ধুলিসাৎ করে দেয় চিত্রা রায়।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, থরথর করে কাঁপতে থাকে চিত্রার দেহ। যেন তার দুঃস্বপ্নমুক্ত জীবনই এক গর্বের আবেশে কাঁপছে।

দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে আলো। সারা আসরের চোখ দেখাতে পায়, বিনায়ক সরকার চেয়ার থেকে উল্টে পড়ে গিয়েছেন, আর তাঁরই হাতের গেলাস ছিটকে পড়ে গিয়ে চূর্ণ হয়েছে।

আসরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সামিয়ানার শেষ প্রান্তের ঝালরের দিকে ছায়া-ছায়া এক নিভৃতে দাঁড়ানো একটি মূর্তির দিকে তাকিয়ে হাত তুলে আহ্বান জানায় চিত্রা—'এসো।'

ব্যস্তভাবে এগিয়ে এসে নিখিল রায় চিত্রারই পাশে দাঁড়ায়। খপ্‌ করে নিখিলের একটা হাত ধরে ফেলে চিত্রা—'চলো।'

সারা আসরের চোখ কিছুক্ষণের জন্য বিস্মিত অভিভূত ও একটু বিরক্ত হয়েই দেখতে থাকে, আসর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন এক ভদ্রলোক আর এক মহিলা। কি-রকম যেন ওদের দু'জনের চলবার আর তাকাবার ভঙ্গী। মনে হয়, একেবারেই ম্যানার্স জানে না।

নতুন নায়িকা

ভবানী মুখোপাধ্যায়

চেয়ারটা আর-একটু সরিয়ে নিয়ে ভালো হয়ে বসলো স্থলোচনা। চিরদিনই এই ষ্টার থিয়েটার তার বিশেষ প্রিয়। থিয়েটার জগতের কতো ইতিহাস এই নামটির সঙ্গে বিজড়িত, ড্রপসিনের গায়ে লেখা বিজ্ঞাপনগুলি পড়া শেষ হলো, তারপর ষ্টলের দর্শকদের লক্ষ্য করলো স্থলোচনা। আগের মতো এখন আর তেমন কনসার্ট নেই, তার বদলে বাজে মাইকের মাধ্যমে রেকর্ড-সঙ্গীত। মনে পড়লো, ঐক্যতানবাদন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাদ-প্রদীপের আলো জ্বলে উঠতো, রঙ্গমঞ্চের সকল কলরব এক নিমেষেই স্তব্ধ হয়ে যেতো, তারপর শুরু হতো অভিনেতা-অভিনেত্রীর অগ্নি-পরীক্ষা। কতদিন গান গায়নি স্থলোচনা। আজ সেও একজন সাধারণ দর্শক মাত্র। তবু তার বুকের ভিতরে কাঁপন শুরু হয়।

আজ রাত্রে এই অভিনয় দেখার জন্য সে বিশেষ চেষ্টা করেই এসেছে, হয়তো আগামীকালই কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হবে, ঐক্যতানবাদন নেই, তবু আছে স্থরের মাদকতা। এই মর্জিনার ভূমিকায় একদা স্থলোচনার খ্যাতির অন্ত ছিলো না, সেদিন বোধ-করি সারা শহর ভেঙে পড়তো তার নাচ-গান-অভিনয়ের আকর্ষণে। এখন নাকি নতুন কায়দায়, আধুনিক ঢঙে অভিনয় হবে, মর্জিনার পার্ট করছে একটি গ্র্যাজুয়েট মেয়ে, স্থতরাং আজকের অভিনয়ের আবেদনও শ্রোতাদের কাছে কম নয়। আর একটু পরেই যবনিকা উঠবে তখন বোঝা যাবে, সেদিনের সঙ্গে এ-দিনের কোথায় প্রভেদ! অসহিষ্ণু আগ্রহে প্রায় নিশ্বাস রোধ করে বসে আছে স্থলোচনা।

স্থলোচনার মনে হচ্ছে, এতক্ষণে সবাই জেনে গেছে বক্সের কোণে যে স্থূলাঙ্গী মহিলাটি বসে আছে—সেই-ই স্থলোচনা, একদিন নৃত্য-কলাকুশলা

উপর চলে আসতো সেদিনের মুকুলিকা বালিকা-বয়সী সুলোচনা, সে যেন তখন অন্য জগতে চলে গেছে, আরব্য-রজনীর পৃষ্ঠা থেকে কেটে আনা এক জীবন্ত নায়িকা।

হাত-বদল হরয়ার পর নতুন কর্তৃপক্ষ রঙ্গমঞ্চটির সংস্কার করেছেন—আলোর কায়দা বিশেষ করে লক্ষ্য করার মতো। ধীরে-ধীরে সেই আলো কেমন যেন ম্লান হয়ে এলো, যবনিকা উঠছে, প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের সেট দেখে সুলোচনার অন্তর অতীতের বেদনায় আকুল হয়ে উঠলো। ফতিমা, সাকিনা বেগম—সবই কেমন ম্লান ভূমিকা, চিরদিন এই পার্টগুলো অবজ্ঞা করে এসেছে সুলোচনা, আলিবাবার পরেই আবদাল্লা। শুধু পরে কেন, আবদাল্লা সবাইকে কেমন ঠাণ্ডা করে দেয়। যে দীর্ঘদেহ ছেলেটি আবদাল্লা করছে, মন্দ নয়, তাকে দেখে হাসি পায় সুলোচনার। ছেলেটি সুন্দর বটে, গলাটাও বেশ, ওদের সময় অভিনয় নৈপুণ্যের সঙ্গে সু-চেহারার একটা মূল্য ছিলো। এদিকে কি অবস্থা কে জানে, বোধহয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীটাই মাপকাঠি। দুঃখ হয় সুলোচনার। কুড়ি বছর আগে হলে এই ছোকরার মুখের গানে প্রাণ আনতে পারতো সুলোচনা। কথাটা ভাবতেও তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

আজকের এই নতুন নায়িকাকে দেখে কি আবদাল্লার প্রাণে সেই স্বর্গীয় প্রেরণা জাগবে? নতুন মেয়েটিকে চোখে না দেখলেও তার গুণাগুণ সম্পর্কে সুলোচনার জানতে এতটুকু বাকী নেই। সুলোচনা কেমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। কি নিদারুণ অস্বস্তি!

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে মেদবহুল হাতের হীরকখচিত ব্রেস-লেটটি অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করে সুলোচনা। অনেকদিন আগে প্রতাপচাঁদ এই ব্রেসলেট-জোড়া দিয়েছিলো তাকে। সেদিন সুলোচনার বয়স অনেক কম ছিলো, খ্যাতি কিন্তু কম ছিলো না। প্রতাপচাঁদের ভারী ঝোঁক ছিলো থিয়েটারে, পয়সাও ছিলো। রামচন্দ্রপুরের বড়ো তরফ—শুধু

দেব বর্মা। সুলোচনা অবশেষে এক সময় বুঝেছিলো, তার মনের মানুষ হওয়ার যোগ্যতা এর আছে।

চমৎকার গলা ছিলো লোকটার, প্রথম দিকটায়, কথায় একটা আঞ্চলিক টান ছিলো, পরে সেটাও মুছে গেল। তারপর নাটক সম্পর্কে ছিলো তার অসাধারণ জ্ঞান, নাট্যরসবোধ প্রবল, তাই সহজেই থিয়েটারে তার প্রভাব বিস্তারিত হলো—শুধু সুলোচনা ছাড়া আর সবাইকে ম্লান করে দিলো দেববর্মা। এক জায়গায় মিল ছিলো দু'জনের মধ্যে, উভয়ের মনে ছিলো প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা, আর ছিলো অসামান্য সঙ্গীত-রসপিপাসা।

খানিকটা কূটনীতি হিসাবেই তাকে স্বপক্ষে টানার চেষ্টা করলো সুলোচনা, ওর উদ্দাম এবং স্বার্থপর প্রকৃতির সঙ্গে কোথায় যেন একটা যোগসূত্র ছিলো সুলোচনার। এস সপ্তাহের ভিতরই জানা গেল—সুলোচনা আর দেববর্মা দু'জনেই প্রেমের পরশে আচ্ছন্ন।

এ এক অদ্ভুত আত্মীয়তা—সুলোচনার এতো সুচিন্তিত পরিকল্পনা কোথায় বানচাল হয়ে গেল। জীবনে যেন সে এই সর্বপ্রথম প্রেমের পুলক-স্পর্শ অনুভব করলো। দলের সকলেই ব্যাপারটি জানলো এবং লক্ষ্য করতে লাগলো এখন কি প্রতিক্রিয়া ঘটে। তবে সকলের মনেই একটা সংশয় রয়ে গেল—দেববর্মাও কি সুলোচনাকে ভালোবাসে? রঙ্গমঞ্চে ওদের অভিনয়ের মধ্যে ছিলো এক উন্মাদ ঈর্ষা—তবু সুলোচনার তাতেই আনন্দ। এদিকে ভাবজগতে যাই ঘটুক না, একটি বিষয়ে কেউ কারো কাছে এতটুকু নতি স্বীকার করলো না, দু'জনের অদম্য উচ্চাভিলাষ যেন অদৃশ্য প্রাচীরের মতো দুর্ভেদ্য হয়ে উঠছিলো। দু'জনেরই মেজাজ চড়াসুরে বাঁধা—ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা আর রিহার্সেলের ব্যবহার মাঝে-মাঝে সুলোচনাকে বিশেষ উৎপীড়িত করে তুল্‌তো, সে বুঝলো—তার গানের গলা হয়তো এর জন্য নষ্ট হতে বসেছে।

সুলোচনা তার অতীত জীবনের এই পর্যায়টুকু চিন্তা করতে পারতো না, তার জীবনের অনেক অন্যায়, অনেক নিষ্ঠুর কর্ম, অনেক হঠকারিতা সে করেছে, কিন্তু এই অংশটুকু যেন আজো তার বিবেককে দংশনে জর্জরিত করে তোলে, এ তার কিছুতেই সয় না।

তৈরি, এক-রকম ভালোই হয়েছে, তার ফলে মঞ্চের আর সকলের চাইতে দৃষ্টিটা ওর উপরই বেশি করে পড়ছে। কালো চুলের উপর সাদা ফুল, কি চমৎকার চুল! নিশ্চয়ই নকল চুল, তাচ্ছিল্যভরে পানের কৌটো থেকে একটি পান মুখে ফেলে দেয় সুলোচনা।

কিন্তু আবদাল্লা আর মর্জিনার প্রথম গানখানা বেশ জমে গেল, গানের ভিতরের বৈচিত্র্য এবং সুরের বৈশিষ্ট্য বিস্ময়কর মনে হলো।

এই চরিত্রটি গত ত্রিশ বছর ধরে একইভাবে অভিনীত হচ্ছে, মর্জিনা চপল, দুষ্ট প্রকৃতির, তবু পুরুষরা তার উপর আকৃষ্ট হয়, তার মধ্যে একটা দুর্নিবার আকর্ষণ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। তার হৃদয়ে মানবীর প্রেম ও করুণা আছে, এই দু'টি সদ্গুণ গোপনে সুলোচনা নিজের মধ্যেও আবিষ্কার করেছে —তার ধারণা, এতে রাশি-রাশি পাপ তুলোর মতো উড়িয়ে দেওয়া যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝলো সুলোচনা, যেমনটি ভেবেছিলো—এ তো তা নয়, অতীতের অক্ষম অনুকরণ-মাত্র নয়—যে ভূমিকার রূপদানে সুলোচনা তার জীবনের সব-কিছু শক্তি ঢেলে দিয়েছিলো, এই নতুন মেয়েটির অভিনয়ের সঙ্গে তার মিল নেই, তবু কোথায় যেন একটু যোগ রয়েছে, কোথায় মিল রয়েছে, কিন্তু তা ধরা যাচ্ছে না। দর্শকরাও বোধ-করি ঠিক ধরতে পারছে না, তারা বুঝছে না যে, এই মেয়েটি সম্পূর্ণ নতুন—আজই সে সর্বপ্রথম নায়িকার ভূমিকায় নেমেছে। সে যেন চিরদিনের চিরপরিচিত মর্জিনা।

চুপ করে বসে আছে সুলোচনা, রাগে দুঃখে তার বুক ফেটে যাচ্ছে। তবু মেয়েটির অভিনয়ে সে মুগ্ধ না হয়েও থাকতে পারছে না। চমৎকার অভিনয়, ভঙ্গিমাও অপূর্ব। সব যেন অতি পরিচিত, রঙ্গমঞ্চের ঐ নতুন নায়িকা যেন সুলোচনার অতীত যৌবন।

পরবর্তীর দৃষ্টিতে সুলোচনা।

দ্বিতীয় অঙ্কের পর কি প্রচণ্ড হাততালি। সুলোচনা বুঝলো এইবার তার অতীত গৌরব, অভিনয়-খ্যাতি, সব মুছে যাবে, নতুন নায়িকা রীতিমতো সাক্‌সেস্।

এ যে অতি নির্মম অপমান! কিন্তু দাম্ভিক সুলোচনা চুপ করে বক্সে বসে আছে। তার অনুকৃতির এই সাফল্যের ফলে সে যদি এখন উঠে চলে

যায়, তাহলে যে সবাই হাসবে। দৃঢ়চিত্ত স্থলোচনার। আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অসীম ক্ষমতা তার, তাই সে শেষ অঙ্ক পর্যন্ত দেখে যাওয়ার জন্য চুপ করে বসে রইলো।

শেষ অঙ্কে—চাঁদ ও চকোর গান হচ্ছে, সারা হাউস স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। এই কলকাতা শহরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরও সেই পুরাতন আলিবাবা! দর্শকজন অত্যন্ত পরিতৃপ্ত। স্থলোচনার কেবল মনে হয়—ঐ যেন সেই মর্জিনা।

একদিন প্রতাপচাঁদের কাছ থেকে অনেক টাকার বিনিময়ে বিয়ের গাঁটছড়া থেকে তাকে সে মুক্তি দিয়েছিলো।

দেববর্মাকে অকারণে পথে বসিয়েছে, শুধু নিজের রঙ্গমঞ্চের জীবন, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায়। এই তার জীবনের শেষতম প্রেম-লীলার শেষ অঙ্ক।

একদা বাংলাদেশের বাইরেও যার স্থনাম ছিলো, আজ সে নগণ্য রমণী মাত্র।

যবনিকা পড়লো, সেই সঙ্গে আবার হাততালি। বিলেতি কায়দায় সমস্ত নট-নটী যবনিকার পাশে থেকে অভিনন্দন গ্রহণ করে অভিবাদন জানালেন। বার-বার মর্জিনার নাম উচ্চারিত হলো। হাত দু'টি জোড় করে মেয়েটি ব্রীড়ানম্র ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে—আর তার সে চাপল্য নেই।

গ্রীন-রুমের পথে ষ্টেজের ভিতরে ঢুকে পড়লো স্থলোচনা, দরজার সামনে অটোগ্রাফের খাতা হাতে কয়েকটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, বুড়ো দারোয়ান স্থলোচনাকে চিনতো, সসম্ভ্রমে একটা সেলাম দিয়ে পথ ছেড়ে দিলো। সে-সব লক্ষ্য করার মতো অবশ্য তার মনের অবস্থা নেই।

যে ড্রেসিং-রুমটায় স্থলোচনা দীর্ঘদিন বসে মেক্‌আপ করেছে, আজকের এই নতুন নায়িকা সেই ঘরেই এসে বসেছে। বাইরে থেকেই ঘরের ভিতরের উল্লাস আর অট্টহাস্য শোনা যাচ্ছে, দরজাটা খুলতেই কলরব আরো চড়া স্থরে কানে বাজলো।

ঘরের ভিতর রঙ্গজগতের অসংখ্য হোমরা-চোমরা সমালোচক এবং পৃষ্ঠপোষক দাঁড়িয়ে। এঁরা অনেকেই সুলোচনার পরিচিত। সুলোচনা তাঁদের দিকে তাকিয়ে হাসলো, সেই পুরাতন মিষ্টি হাসি। আর সকলের মতই কয়েকটা অভিনন্দনের বাণী তার মুখেও প্রতিধ্বনিত হলো।

সত্যই, সেও তো খুশি হয়েছে। এমন সাক্‌সেস্‌, প্রথম রজনীর সাফল্য। তার মতো খুশি আর কে হবে, এটুকু ঔদার্য তার আছে।

এতো রূপ ও টাকা সত্ত্বেও থিয়েটারের অন্দর-মহলে সুলোচনার জনপ্রিয়তা ছিলো না, বহুজনে তার সংস্পর্শে এসে ঠকেছে—আঘাত পেয়েছে সুতরাং সুলোচনার শত্রুর সংখ্যা অসংখ্য। সুলোচনা হাসলো, কথা—শুধু গণ্যমান্যদের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ হয়ে আলোচনা করলো, অপরিচিত আর অল্প পরিচিতদের উপেক্ষা করলো। সুলোচনা ভাবে, অপরিচিতদের মধ্যে ক'জনই বা তাকে জানে, ক'জন তার অভিনয় দেখেছে।

সুরকার রাধানাথ বাগচী সুলোচনার গলা এবং সুরজ্ঞানের যেমন প্রশংসা করতেন, মনে-মনে তাকে তেমনই ঘৃণা করতেন।

সুলোচনার চোখের আগুন দেখে যদি ওর মনের ভাব উনি বুঝে ফেলেন, আজকের এই পরাজয়ের গ্লানি কি ওর মুখে ফুটে ওঠেনি—উনি যদি তা বোঝেন—কি লজ্জার কথা, কি অপমানের কথা! তাই সুলোচনা হাসছে—মনের ভাব চাপার চেষ্টা করছে—যদি এইভাবে চতুর রাধানাথ বাগচীর চোখে ধুলো দিতে পারে। প্রশান্ত মুখভঙ্গীতে তাই প্রসন্নতার ছাপ আনার জন্য সে সচেষ্ট।

তবু আত্ম-বিশ্বাস নেই, তাই তাঁকে অতিক্রম করে 'দৈনিক দেশমাতা'র কলা-সমালোচকের কাছে এগিয়ে গেল। কলা-সমালোচন স্মিতহাস্যে সুলোচনার পানে তাকালেন, বললেন—'আপনি তো আজকাল ভুবনেশ্বরে আছেন, না?'

'না, অনেকদিন ফিরে এসেছি।' বলে অকারণে হাসলো খানিকক্ষণ সুলোচনা।

সুলোচনার চাপা ঈর্ষা ওঁর চোখে ঠিক-মতো ধরা পড়েছে। কারণ, ষ্টেজের ব্যাপারে সুলোচনার দুর্দান্ত ঈর্ষার কথা সকলেই জানে। এমন কর্ম

নেই, যা সুলোচনা তার সু-সময়ে করেনি, অপরকে বধ করতে তার বাধেনি কোনদিন!

সেই জনবহুল ঘরটিতে সেই সময় যে অভিনয় করলো, সুলোচনা তার সমগ্র অভিনেত্রী জীবনে, এমন কি রঙ্গমঞ্চেও সে কাজ সে করতে পারেনি কোনদিন। ভীড় ঠেলে যাওয়ার সময় সুলোচনা বললো—'গতানুগতিক পথ ছেড়ে নতুনভাবেই তো এখন সব কিছু করতে হবে। প্রযোজকের ব্যক্তিত্ব আছে, নতুন মেয়েকে নিয়ে এতবড়ো দুঃসাহসিক কাজে নেমেছেন।

যাকে সুলোচনা খুঁজছিলো, সে ড্রেসিং-টেবলের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটির গায়ে এখনও ষ্টেজের পোশাক—এখনও মর্জিনা। একটি বৃদ্ধলোক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, তার সঙ্গেই একমনে কথা বলছে। বৃদ্ধ স্নেহভরে তার কাঁধে হাত রেখে সব শুনছেন।

সুলোচনা গভীর ঘৃণাভরে মেয়েটির দিকে তাকালো, প্রতাপচাঁদের মতো দেখতে মেয়েটিকে, প্রত' পর সৌন্দর্য নেই, নেই সুলোচনার মতো কণ্ঠস্বর, তবু যেন কোথায় একটা দীপ্ত মর্যাদামণ্ডিত ভঙ্গী রয়েছে, সুলোচনার বিবাহিত জীবনের শ্রেষ্ঠতম দুর্ঘটনা। এই তার মেয়ে, তা ই—

নতুন নায়িকা মুখ তুলে চায়, জ্ঞানে হয়তো কখনো দেখেনি, তবু ভীড় ঠেলে মহিলাটিকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে তার মুখটি কাগজের মতো সাদা হয়ে যায়। মেকআপের প্রলেপেও সেই পাণ্ডুরতা চাপা থাকে না।

ভয় যতই হোক, সুলোচনার শান্ত আলিঙ্গনে কি যে স্বস্তি ছিলো, কে জানে, নতুন নায়িকার চোখের কোণে জল এলো। মেয়ের পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন প্রযোজক, সুলোচনা অন্যমনস্ক ভঙ্গীতে তাঁর প্রশংসা করলো—কিন্তু পাছে আবার ভেঙে পড়ে সে, পাছে ধরা পড়ে তার মনের নীচতা, তাই সে তাড়াতাড়ি চলে যাবার উদ্যোগ করে।

ঘর থেকে বেরোবার সময় সত্যিই তার পা কাঁপছে। যে লোকটি ড্রেসিং-রুমের দরজা খুলে দিলো তার পানে তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো তাকালো

নতুন নায়িকা

সুলোচনা—এই সেই ম্যানেজার, আজকের নাটকের নতুন প্রযোজক, সুলোচনা তাড়াতাড়ি দরজাটা আঁকড়ে ধরে, সে যে পড়ে যাবে, পায়ের নিচের মাটি সত্যই কি সরে যাচ্ছে ?

পাকা চুল আর কুড়ি বছরের বিবিধ বিপর্যয় সত্ত্বেও এই পরিচিত মানুষটি ভুল হওয়ার নয়, সুলোচনা তাঁকে চিনতে পেরেছে।

এই সেই দেববর্মা !

দারোয়ান নীরবে লক্ষ্য করলো—অতি ধীরে-ধীরে জরাগ্রস্তের মতো চলে যাচ্ছে সুলোচনা, এবার তার সেলাম আর চোখে পড়লো না !

যখন ভিতরে গিয়েছিলো তখনও কি এমনই প্রাচীন মনে হয়েছিলো ? কে জানে, দরোয়ানেরও বয়স অনেক হলো।

রেলগাড়িতে

লীলা মজুমদার

আমাদের পারিবারিক জীবনের পক্ষে নিতান্ত আটপৌরে হয়ে যাওয়া অসম্ভব বলে আবার কেউ যেন না মনে করেন যে, আমরা সবাই অস্বাভাবিক আর অসাধারণ। মানে, অসাধারণ যদি বা খানিকটা হয়েও থাকি, অস্বাভাবিক নই মোটেই। আর তাই যদি বলেন, কোন্‌টা যে স্বাভাবিক আর কোন্‌টা যে অস্বাভাবিক তার গণ্ডি টানা হবে কোন্‌খানে? এমন বহু লোকও আছে, অস্বাভাবিক আচরণ করাটাই যাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

বেঁচে থাকলে কতো-রকম মানুষের সঙ্গেই যে দেখা হয়, তার ঠিকানা নেই। দিল্লি থেকে ফিরছি, সঙ্গে আমার মেয়ে। মেয়েদের কামরায় উঠেছি, চারটি বার্থ, দু'জন ছাড়া একজন মোটাসোটা ভদ্রমহিলা আর একজন আধাবয়সী মহিলাকে দেখলাম, দেখে বেশ কড়া প্রকৃতির মনে হলো, কাঠ-কাঠ গুরু-গম্ভীর চেহারা।

আমরা ঢুকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছি, এমন সময় মোটা ভদ্রমহিলা বললেন, 'উই বড়া ঝড়িমে কেয়া মণ্ডামেঠাই লে যাতা নাকি? মাটিমে রাখলে পিঁপড়া লাগে গা।'

ভাবলাম বোধহয় হিন্দুস্থানী, শীতের সকালে আপাদমস্তক মোটা একটা ভুস্কো রঙের আলোয়ান দিয়ে জড়ানো, ঠিক ঠাওর করতে পারলাম না। সংক্ষেপে বললাম, 'হ্যাঁ।'

তারপর হুকের উপর মিষ্টির ঝোড়া ঝুলিয়ে একটু আরাম করে বসতেই বললেন, 'কি মেঠাই মোলা? এই পোড়া দেশ কো মেঠাই আচ্ছা লাগতা?' হাত বাড়িয়ে ঝোড়াটা একটু ফাঁক করে আবার, 'আরে বাবা! কেৎনা ভাও লিয়া?'

আমি বললাম, 'আড়াই রূপিয়া সের।'

'এতো সের মোলা কাহে? বাড়িমে বহুৎ লোকজন নাকি?'

আমি বললাম, 'কী জ্বালা! আপনিও বাঙালী আমিও বাঙালী, আবার হিন্দী বলছেন কেন? বোঝাই যাচ্ছে যে, আমি কেন, আপনিও হিন্দী জানেন না।'

বললেন, 'কী করে বুঝবো বাছা, কোট গায়ে দিয়ে, মাথা খালি করে চলেছো, বাঙালী বলে তো চেনবার জো নেই। তা কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

'কলকাতায়।'

'বাড়ি কোথায়?'

'কলকাতায়।'

'দিল্লীতে কেন আসা হয়েছিল, এই শীতে?'

'মিটিং করতে।'

'ও বাবা! বাড়িতে বুঝি শাশুড়ী ননদ নেই? সিঁদুর পরেছো, বিয়ে তো হয়েছে দেখছি।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তেইশ বছর হলো বিয়ে হয়েছে। শাশুড়ী ননদ সঙ্গে থাকে না।'

'উটি কে?'

'উটি আমার মেয়ে।'

'বিয়ে হয়নি কেন?'

'লেখাপড়া শেষ হলে হবে।'

'সে আবার কবে হবে, তদ্দিনে যে চুল পেকে যাবে।'

কোনও উত্তর দিলাম না।

ভদ্রমহিলা মিনিট-দুই চুপ করে থেকে নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে আমার কাছ ঘেঁষে বসে কানে-কানে ফিসফিস করে বললেন, 'সাবধান, ওই ভদ্রমহিলা গুপ্তচর।'

'কার আবার গুপ্তচর? আপনার কথা কি উনি শুনতে পাচ্ছেন না, ভেবেছেন?'

'আর শুনলেও বুঝতে পারছে না। মাদ্রাজী-টাদ্রাজী হবে, বাংলাও জানে না, হিন্দীও জানে না, অনেক প্রশ্ন করেছি, কোনও জবাব দেয় না। আচ্ছা, তোমার স্বামী কি করেন?'

'ডাক্তার।'

'আয় কতো?'

'বলতে পারলাম না। আমার মেয়ের আঠারো বছর বয়েস। বি. এ. পড়ে। ছেলের বাইশ বছর, ডাক্তারি পড়ে। আমার উনপঞ্চাশ বছর বয়েস, ওজন দুঃখের বিষয় একমণ ত্রিশ সেরের কাছাকাছি।'

ভদ্রমহিলা দুঃখিত হয়ে বললেন, 'রাগ করলে ভাই? আচ্ছা, তোমরা কী জাত?'

আমি বললাম, 'আমরা জাতটাত মানি না। আমরা ব্রাহ্ম।'

ভদ্রমহিলা টুক করে উঠে নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে বললেন, 'ব্রাহ্ম মানে? ব্রাহ্ম হয়েছেন কোন্ দুঃখে? ব্রাহ্ম মেয়েদের তো সিঁদুর পরবার কথা নয়।'

আমি চুপ করে রইলাম। ভাবলাম, বাঁচা গেল, এবার গল্পের বইটা শুরু করা যাবে।

একটুক্ষণ চুপচাপ, এতো চুপচাপ যে, চোখ তুলে চেয়ে দেখি— আধবয়সী ভদ্রমহিলা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন, একটু-একটু সুড়ুৎ-সুড়ুৎ নাকও ডাকছে, আর বুড়ী ভদ্রমহিলা নির্বিকারভাবে তার বেতের বাক্সটি খুলে তার মধ্যে কী আছে না-আছে দেখছেন। সেটি বন্ধ করে পাশের টিফিন-ক্যারিয়ারে যেই হাত দিয়েছেন চাপা গলায় বললাম, 'ছিঃ!'

বিরক্ত হয়ে আবার উঠে এসে আমার পাশে বসে বললেন, 'ছিঃ মানে! আমি বামুনের মেয়ে, আমি ছুঁলে কোনো দোষ হয় না। তাই বলে আবার আপনি ছোঁবেন না। তাছাড়া ওরা নিরামিষ খায়। আপনারা কি মুরগি খান?'

জোর গলায় বললাম, 'সব খাই।'

ভদ্রমহিলা উঠে আবার স্বস্থানে ফিরে গেলেন। কিন্তু কতক্ষণ থাকবেন? একটু বাদেই বললেন, 'ও বোধহয় টিকিট কাটেনি।'

অবাক হয়ে বললাম, 'কি করে জানলেন?'

'অন্তত ওর ব্যাগে তো নেই।'

হঠাৎ সেই আধাবয়সী ভদ্রমহিলা চোখ খুলে স্পষ্ট বাংলায় বললেন, 'ব্যাগে টিকিট নেই, কিন্তু সুটকেসে পাস আছে। সুটকেসটা অতো পরীক্ষা করলেন আর খোপটা দেখলেন না?'

'ওঃ, তুমিও বাঙালী। তা, পাস কেন? রেলে চাকরি করো?'

'না।'

'ও, ভাই বুঝি রেলে চাকরি করে?'

'আজ্ঞে না।'

'কেউ একটা তো করে?'

'না।'

'আচ্ছা, ওই গোল বাক্সে কী আছে?'

'দেখুন, অতো বেশি কৌতূহল ভালো নয়। বরং জানলা দিয়ে বাইরে প্রকৃতির শোভা দেখুন, মন উদার হবে। আমার বাক্সে কী আছে না-আছে দেখতে হবে না।'

বুড়ী ভদ্রমহিলা চুপ করে গেলেন। সত্যি কথা বলতে কী, একটু খুশি না হয়ে পারলুম না, কিন্তু খুশিটি ক্ষণস্থায়ী। তারপরই তিনি ওই মহিলার দিকে দেখিয়ে-দেখিয়ে পিঠ ফিরিয়ে আমাকে বললেন, 'ভাই, আমাকে ক্ষমা করো।'

'কী মুশ্‌কিল, আবার ক্ষমা কেন?'

'মেয়ের কেন এদ্দিন বিয়ে হয়নি বুঝলাম।'

'সে কী।'

'হ্যাঁ ভাই, আমার কাছে লুকিও না। ও মেয়ে কালা বোবা। ওদের ইস্কুলে কথা বুঝতে পারবে, বলতে না-পারলেও ইশারা করে শিখবে।'

আমার মেয়ে বললো, 'ইস্, কী সাজ্ঘাতিক!'

অমনি বুড়ী ভদ্রমহিলা ওর দিকে ফিরে বললেন, 'পাশে সিঁথি কেটেছো কেন? এক হাতে চুড়ি, অন্য হাতে ঘড়ি কেন? আচ্ছা, ওই কাপড়টা কি সত্যি সিল্ক, না নকল?'

'দেরি আবার কোথায়? মেঘে-মেঘে বেলা বাড়ে। মেয়ের জন্যে বিয়ের সম্বন্ধ আসে না?'

আমিও এই পর্যন্ত শুনে মেয়ের দেখাদেখি চোখ বুজে ঘুমের ভান করতে লাগলাম।

এমন সময় আমার হ্যাণ্ডব্যাগের কাছে একটা উস্‌খুস্‌ শব্দ শুনে সেটিকে কাছে টেনে নিলাম। তবুও উস্‌খুস্‌ থামে না। চোখ খুলে দেখি, বুড়ী ভদ্রমহিলা এলার্ম-সিগ্‌নেলের চেনটা পরীক্ষা করছেন। বললাম, 'সাবধান, ওটাকে আবার যেন টেনে দেখতে যাবেন না কী হয়।'

আধা-বয়সী ভদ্রমহিলা আবার কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'হবে আবার কী? পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হবে। ঠিক হবে।'

বুড়ী সীটের উপর বসে পড়ে বললেন, 'কিন্তু ওটা টানলে গাড়ি থামবে কেন? ইঞ্জিনে বুঝি ঘন্টা বাজে?'

'না না, এই গাড়ির চাকায় ব্রেক লেগে যায়, তাই গাড়ি থেমে যায়। এবার খুশি হলেন তো?'

বুড়ী ওঁর কথা যেন শুনতেই পেলেন না। আমাকে বললেন, 'কলকাতায় যাচ্ছো, টিকে নিয়েছো?'

'হ্যাঁ।'

'জল ফুটিয়ে খাও?'

'হ্যাঁ!'

'কলকাতায় বাড়ি করেছো?'

'না।'

'আচ্ছা, গরুর দুধ খাও, না গুঁড়ো দুধ?'

'বোতলের দুধ।'

'মন্ত্র নিয়েছো? বয়েস তো হয়েছে। পরকালের কথা ভাবো তো?'

আধা-বয়সী ভদ্রমহিলা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কী জ্বালা, শুনলেন ব্রাহ্ম, ওঁদের মন্ত্র নেবার দরকার হয় না।'

'তুমি বাছা একটু মন্ত্র নিজে নিলে পারো, স্বভাবটা হয়তো শুধরে যাবে। যদিও আশা কম।'

'কেন, আপনার কথায় মনে হচ্ছে আপনি নিশ্চয় মন্ত্র নিয়েছেন। নিয়েছেন ? কই আপনার স্বভাবটি তো শুধরোয়নি। সেই সকাল থেকে আমাদের হাড় ক'খানি ভাজা-ভাজা করে এনেছেন। ওই ছেলেমানুষ মেয়েটা কোথায় গাড়ির মধ্যেই একটু নেচে-কুঁদে বেড়াবে, না আপনার প্রশ্নের জ্বালায় সারাটা পথ বাধ্য হয়ে ঘুমিয়ে কাটাচ্ছে। আর দেখুন, টুণ্ডলায় আমি নেমে ডাইনিং কারে খেতে যাবো, সেই সুযোগে খবরদার আমার গোলবাক্সে হাত দেবেন না, এই আপনাকে বলে গেলাম।'

বুড়ী বললেন, 'তুমি নিশ্চিন্দি মনে নেবো বাছা, তোমার গোলবাক্সে হাত দিতে আমার ভারি বয়ে গেছে।'

ভদ্রমহিলা টুণ্ডলায় নেমে খেতে গেলেন, আমরা তিনজন গাড়িতে রইলাম। আমাদের দু'জনের খাবার গাড়িতেই দিয়ে গেল। বুড়ী ভদ্রমহিলা ছোটো একটা কৌটো খুলে লুচি তরকারি সন্দেশ আর অজস্র পান খেলেন। তারপর মুখ ধুয়ে হঠাৎ বললেন, 'দেখলে আদিখ্যেতা, আবার খাবার ঘরে গিয়ে এক কাঁড়ি পয়সা না ঢাললেই নয়। সঙ্গে দিব্যি সুন্দর টিফিনকারি রয়েছে। দেখো তো মা, ওতে কী আছে ? খেলো না কেন ? তোমরা ব্রাহ্ম, তোমরা দেখলে তো আর জাত যাবে না।'

আমার মেয়ে অস্বীকার করাতে, একটু বিরক্ত হয়ে নিজেই দেখলেন। 'দেখেছো ঢং, ওখানে গেলেন অখাদ্য খেতে, আর সঙ্গে নিয়েছেন ফলমূল বাদাম কলা এই সব।' বলেই একবার গোলবাক্সের দিকে তাকালেন।

এমন সময় একজন বুড়ো ভদ্রলোক দোরগোড়ায় এসে বললেন, 'কই গো, এখানেই নামতে হবে। জামাই ছাড়ছে না।' বলে জিনিসপত্র নামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

বুড়ো ভদ্রলোক প্লাটফর্মে নেমে পড়েছেন, এমন সময় বুড়ী একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে ছুটে গিয়ে গোলবাক্সটা খুলে ফেললেন। অমনি তার মধ্যে থেকে একটা ভীষণ রাগী আর অদ্ভুত রকমের বুড়ো কাঠবিড়ালী না বেজী, না কি যেন জানোয়ার বেরিয়ে এসে লাল লাল চোখ করে বুড়ীর দিকে একবার তাকিয়ে গায়ের লোম ফুলিয়ে দ্বিগুণ বড়ো হয়ে গিয়ে তেড়ে তাঁর নাকে কামড়ে দিলো।

সবাই আহা-হা করে উঠলো, ভদ্রমহিলা উঠি-পড়ি করে গাড়ি থেকে নামলেন—ডাক্তার কই, জল কই, ব্যাণ্ডেজ কই? ঠিক সেই সময় সেই আধা-বয়সী ভদ্রমহিলাও এসে হাজির।

'মানা করলাম তবু বাক্স খুললেন তো? বলেছিলাম না, অতোটা কৌতূহল ভালো নয়। কোন্‌দিন কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরুবে! আয় মিমি, মিমি, আয়, বাদাম খাবি! দেখুন দিকি ফ্যাসাদ! এখন যা তা কামড়ে, খেয়ে আমার মিনুসোনার না পেটের অসুখ করে!'

পাথেয়

জ্যোতির্ময় রায়

গৃহলক্ষ্মীর আসর থেকে নেমে এসে শিক্ষয়িত্রীর আসনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো লসিতা। চেষ্টা ও অর্থের কাঠ-খড় পুড়িয়ে কোনো প্রকারে 'য়্যালমা-মিটারে' বিদ্যার তাপকে বি. এ. কি এম্. এ. ডিগ্রি পর্যন্ত তুলে জীবন-ভর প্রলাপ বকবার একটা ব্যবস্থা করে নেওয়া।

জীবিকা হিসাবে কোনো ব্যবস্থাকে মেনে নেবার প্রয়োজন লসিতার জীবনে হয়নি—হবেও না। পুরুষানুক্রমে ঐশ্বর্য বস্তুটা লসিতার পিতৃ-পরিবারের অঙ্গে যেন পুলিশের ছাতার মতো এঁটে আছে, সুখের ছায়াকে ধরে রাখবার জন্য প্রচেষ্টার কোনো প্রয়োজন হয় না। সম্পত্তির সেই পুরুষানুক্রমের উপরে পুরুষের একচেটিয়া দাবির অঙ্গহানি করেও দক্ষিণাবাবু যে কন্যার জন্য একটা সুব্যবস্থা করে যাবেন, এই কথাটা পরিবারের সকলে স্পষ্ট করেই জানে। তথাপি বিদ্যা বিতরণের উদ্দেশ্যে বিদ্যা আহরণে লসিতার এ প্রয়াস শুধু নিজের বিস্তৃত ভবিষ্যতে নিজেকে ব্যাপৃত রাখবার একটা পথ করে নেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। কৃতিত্বের সঙ্গে আই. এ. পাশ করার পর পড়বার আগ্রহ তার কম ছিলো না, কিন্তু মুখের উপর অমন দুর্লভ শ্রী নিয়ে কলেজে দু'ধাপের ঊর্ধ্বে ওঠা সম্ভবপর হয়নি। কারণ, ছাত্রীর চেয়ে পাত্রী হিসাবেই কোনো-কোনো অধ্যাপকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বসলো বেশি ; তন্মধ্যে দক্ষিণাবাবুর অনুমতিক্রমে লসিতাকে 'বিশেষরূপে বহন' করে ঘরে তোলবার অধিকার পেলো অর্থনীতির অধ্যাপক সুপ্রকাশ সোম। কলেজের সমগ্র আবহাওয়াটাকে ক্ষুব্ধ করে লসিতা যেদিন পাঠ্যজীবন শেষ করলো, ভাবতেও পারেনি—চার বছর পর একদিন ব্যর্থ ও অভিশপ্ত জীবন নিয়ে পুনরায় সেখান থেকেই তাকে শুরু করতে হবে।

পাথেয়

বি. এ. পরীক্ষার আর তিন মাস বাকী। দিন-রাত লসিতা পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত। কিন্তু এ-ব্যস্ততার সঙ্গে তার কুমারী জীবনের ব্যস্ততার যেন মস্ত একটা পার্থক্য আছে, এর মধ্যে ব্যাপ্তিটাই বড়ো, গভীরতা কম, পড়তে বসে কেবলই সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। দোতলায় শোবার ঘরের জানলার পাশে একটা আরাম-কেদারায় লসিতা বসে আছে। কোলের উপর একখানা খোলা বই। বইয়ের সঙ্গে মনের যোগসূত্রটা বহুক্ষণ ছিন্ন হয়ে গেছে; দূরে একটা নারকেলগাছ নাগরিক স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রেখে দুটো বাড়ির মাঝ দিয়ে মুক্ত পরিসরে মাথা মেলে দাঁড়িয়েছে—এলোমেলো চিন্তা নিয়ে তারই দিকে লসিতা তাকিয়ে ছিলো। নুয়ে-পড়া লম্বা পাতাগুলো ধীর হাওয়ায় আন্দোলিত হচ্ছে, কোনটা মানুষেরই মতো অর্থহীন গাম্ভীর্য নিয়ে কেবলই মাথা নাড়ছে, কোনটা সোহাগ-ভরে ঢলে পড়ছে অন্যটার গায়, সেটা হয়তো যাচ্ছে তফাতে সরে—পাতাগুলোর অর্থপূর্ণ এই ভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে একটানা অনেকটা সময় কেটে যায় লসিতার।

পরদা সরিয়ে দক্ষিণাবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। হাতে একখানা চিঠি। পুরু পেবল্‌সের চশমার ভিতর দিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লেফাফার উপরের লেখাটার দিকে তাকিয়ে বললেন—'লসিতা, তোর একখানা চিঠি। দেখতো মা, কে লিখেছে।'

চিঠি এলে সাধারণত ভৃত্যই পৌঁছে দিয়ে যায়, বাবা নিজে নিয়ে এসেছেন দেখে লসিতা তরস্তে উঠে এসে চিঠিখানা হাতে নিলো। ঠিকানার হস্তাক্ষরের দিকে দৃষ্টি পড়তেই মুহূর্তের জন্য সে স্তব্ধ হয়ে গেল। কন্যার মুখের দিকে চেয়ে দক্ষিণাবাবু বললেন—'সুপ্রকাশের লেখা মনে হচ্চে।'

'—হ্যাঁ, তারই।'

'—কি লিখলো আবার সে।' বলে বৃদ্ধ খাটের একটা কোণ ঘেঁষে বসেলেন। সুপ্রকাশের নাম শুনলেও অন্তর তাঁর ঘৃণায় ভরে ওঠে। প্রায় দু'বছর হতে চললো, এযাবৎকাল খবর দেবার বা নেবার দায় থেকে উভয়-পক্ষই মুক্ত বলে নিশ্চিত জানা হয়ে গেছে, হঠাৎ এতদিন পর এ অবাঞ্ছিত লোকটির কাছ থেকে কি সংবাদ এলো জানবার জন্য দক্ষিণাবাবু উৎকণ্ঠিত আগ্রহে অপেক্ষমান দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন লসিতার মুখের দিকে।

এক লাইনে সমাপ্ত চিঠিখানা প্রয়োজনাতিরিক্ত অনেকটা সময় কঠোর দৃষ্টির সুমুখে মেলে রেখে লসিতা পিতার হাতে তুলে দিলো। চিঠিতে লেখা রয়েছে, আমার প্রথম সন্তানের জন্য তোমার কাছ থেকে শুভেচ্ছা কামনা করে এ চিঠি দিচ্ছি।—ইতি, নিরপরাধ সুপ্রকাশ।

দক্ষিণাবাবু লাইনটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে কাগজটা বিছানায় ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। একটু চুপ করে থেকে তিক্ত ও ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন—'নিরপরাধ! আর কাউকে যদি স্পর্শ না করতো, ওকে অভিশাপ দিতাম।' বলে, একখানা হাত লসিতার মাথার উপর রেখে মৌন হয়ে রইলেন। পিতা হয়ে আজ তিনি আশীর্বাদ করতে অক্ষম—এর চাইতে বড়ো বিড়ম্বনা আর কি থাকতে পারে! দক্ষিণাবাবুর চোখ সিক্ত হয়ে আসে। যে-কোনো অবস্থায়ই হোক, প্রতিকারের কোনো পথই খোলা থাকবে না, সাত-পাকের এই এক-তরফা বাঁধন—অচ্ছেদ্য এই প্রসিতির বিপক্ষে, এমন কি নিজের সুদৃঢ় সংস্কারের বিরুদ্ধে মন তাঁর বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

দক্ষিণাবাবু চলে গেলে লসিতা স্তব্ধ হয়ে আরাম-কেদারটায় বসে রইলো। 'নিরপরাধ' কথাটা যেন আগুনের হল্‌কা দিয়ে তার বুকের মধ্যে লিখে দেওয়া হয়েছে। কথাটার সত্যকারের তাৎপর্য দক্ষিণাবাবু জানেন না—জানবেনও না! লসিতাকে লাঞ্ছনা দিয়ে বাড়ির বার করে দিয়ে পুনর্বার দারপরিগ্রহ করেও নিজেকে যে সুপ্রকাশ অপরাধী মনে করে না, এটা দম্ভ-ভরে জানিয়ে দেবার জন্যই যে কথাটা সে লেখেনি, সে-কথা জানে একমাত্র লসিতা নিজে।—কারণ, শব্দটা তারই শেষ-কথার জবাব।

বিয়ের পর কিছুদিনের মধ্যেই সুপ্রকাশের মা'র শাশুড়ী-সুলভ উৎপীড়ন থেকেই লসিতার বিবাহিত জীবনে অশান্তির প্রথম সূত্রপাত। স্বামীর সঙ্গেও তেমন যে একটা মনের মিল ছিলো, তা বলা চলে না। প্রকাশিত হয়ে পড়বার মতো মোটা-রকমের গরমিল না হলেই বাঙালী দাম্পত্য-জীবনের পক্ষে যথেষ্ট—লসিতার দিন এক-রকম কেটে যাচ্ছিলো। গরমিলের প্রধান কারণ সুপ্রকাশের খিটমিটে মেজাজ, যেটা বাড়ির বাইরে সর্বত্র চাপা পড়ে থাকে ভদ্রাবরণের নিচে। সামাজিক জীবনে ভদ্রতা ও সৌজন্যের দিক দিয়ে সুপ্রকাশের সুনাম প্রচুর, যা দেখে একদিন দক্ষিণাবাবুও

মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তার স্বভাবের আটপৌরে দিকটা নিকটতমদের পক্ষে শান্তিজনক নয় মোটেই।

সুপ্রকাশের সঙ্গে লসিতার প্রথম বিরোধ রুচির। লসিতা সংযত ও স্বল্পভাষিণী, সুপ্রকাশ ঠিক তার উল্টো, এমন কি রাগত অবস্থায় তার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী হয়ে ওঠে রীতিমতো আপত্তিকর। বিশেষ করে লসিতা সম্পর্কে তার ভিতরে একটা দৈন্যবোধ ছিলো; লসিতার ব্যক্তিত্ববোধকে মনে করতো সে বড়োলোকি, সংযত ভাবকে মনে করতো অহঙ্কার। তাই সেখানটায় আঘাত করবার একটা হীন প্রবৃত্তি তার ভালোবাসাকে আচ্ছন্ন করে রাখতো। লসিতা জানতো—মেনে তাকে না নিলেও মানিয়ে তাকে চলতেই হবে, সেই জন্য সব কিছুই নীরবে সয়ে যেতো। বছর-দুই পেরিয়ে যেতেই শাশুড়ী বধূ-নিগ্রহের এক নতুন অস্ত্র হাতে পেলেন। বংশে বাতি দেবার উত্তরাধিকারীর আবির্ভাব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে কথায়-কথায় শুরু করলেন খোঁটা দিতে। চতুর্থ বছরে খোঁটাটা হয়ে উঠলো কর্কশভাবে স্পষ্ট। শুরুতে সুপ্রকাশ কথাটা শুনেই গেছে, যোগও দেয়নি, প্রতিবাদও করেনি। কিন্তু ক্রমাগত প্রসঙ্গটা কানে এসে একটা অভাব-বোধ জাগিয়ে তুলেছিলো বলেই হোক্ বা নিছক আঘাত করবার জন্যই হোক্—শেষ পর্যন্ত রাগ হলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেও এদিক দিয়ে ইঙ্গিত করতে লাগলো। অন্তরের বড়ত্ববোধ দিয়ে দৈনন্দিন সকল অশান্তিকেই লসিতা তুচ্ছজ্ঞানে পার হয়ে আসছিলো, কিন্তু এ আঘাতের কাছে ক্রমশই যেন নিজেকে বোধ করতে লাগলো দুর্বল ও নিরুপায় এবং অক্ষমতার আভাস পেয়ে দিনের পর দিন আকাঙ্ক্ষাটা তার নিজের মধ্যেও দেখা দিতে লাগল তীব্র হয়ে।

এ অবস্থায় একদিন সামান্যএকটা বিষয় নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর কলহটা একটু বেশিদূর গড়িয়ে গেল। লসিতার মেজাজও সেদিন তেমন ভালো ছিলো না, সুপ্রকাশের একটা আপত্তিজনক ইংরেজী-গালির বিপক্ষে তীক্ষ্ণ মন্তব্য করে সসম্মানে কথা বলবার দাবী জানাতেই সুপ্রকাশ হঠাৎ অসঙ্গত ভাষায় অত্যন্ত নগ্নভাবে সেদিন জানিয়ে দিলো, 'যে স্ত্রীলোকের মা হবার ক্ষমতা নেই, সে শুধু পুরুষের ভোগ্য বস্তু—স্ত্রীর সম্মান দাবী করবার অধিকার তার নেই।'

সবচেয়ে দুর্বল স্থানে অমন নির্মম আঘাত পেয়ে লসিতাও আত্মবিস্মৃত হয়ে জবাব দিলো, 'এর জন্যে অপরাধী যে তুমি নও, তাই বা জানলে কি করে!'

'কী, যা মুখে আসছে তাই বলছো…বেরোও বলছি ঘর থেকে!' সুপ্রকাশ লাফ দিয়ে উঠে লসিতার সুমুখে গিয়ে বাইরের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিলো। লসিতা একটু ভীত বা সন্ত্রস্তভাব দেখালেই হয়তো সুপ্রকাশ সরে যেতো, কিন্তু এমনি স্থির ও নিশ্চল হয়ে রইলো যে, ততো বীরদর্পে উঠে গিয়ে চুপচাপ ফিরে আসতে সুপ্রকাশ পারলো না। একটা হাত ধরে জোর করে লসিতাকে ঘরের বার করে দিয়ে বললো, 'যাও….বেরোও বাড়ি থেকে—'

এ ঘটনার পর সত্য-সত্যই সেদিন লসিতা ও-বাড়ি পরিত্যাগ করে চলে এলো তার বাবার কাছে।

লসিতা বাপের-বাড়ি চলে আসবার তিন মাস পর সংবাদ পেয়েছিলো তার শেষ কথার প্রতিক্রিয়ার, আজ পেলো প্রত্যুত্তর! কিছুক্ষণের জন্য মনটা তার নিঃসাড় হয়ে গেল। সুপ্রকাশ পুনর্বার বিয়ে করে পুনর্মিলনের পথে পূর্ণচ্ছেদ টেনে লসিতার নারীত্বকে করেছে লাঞ্ছিত, কিন্তু তার এ দম্ভোক্তি করলো অপমানিত। ধীরে-ধীরে লসিতার মনে এ প্রশ্নটাই তীব্র হয়ে দেখা দিলো, তবে সত্যই তার সর্বাঙ্গীনতায় অজ্ঞাত কোনো ত্রুটি রয়ে গেছে! কিন্তু নিজের পূর্ণতায় অবিশ্বাস করতে মন তার কিছুতেই চাইলো না।—দেহটাকে ব্যবচ্ছেদ করে একবার যদি সে দেখতে পারতো!… চার বছর জীবনের কতটুকু, তাই দিয়ে সমস্ত ভবিষ্যৎকে বিচার সে কেন করবে! এও তো হতে পারে, এ বিশেষ সংযোগের ফলে তারা দু'জনেই হয়ে ছিলো নিষ্ফল। আজ সুপ্রকাশের অন্তরে স্বার্থকতার আনন্দ…. লসিতার মাথায় যেন আগুন ধরে গেল।

লসিতার বৌদি নমিতা মেয়েটি বড়ো ভালো। দোষের মধ্যে কথায়-কথায় চোখ দিয়ে তার জল এসে পড়ে। লসিতা ঠাট্টা করে কতদিন ব্যবস্থা দিয়েছে,

মোটরের গ্ল্যাস-ওয়াইপারের মতো দু'গালে দুটো ইলেকট্রিক ওয়াইপার জুড়ে নিতে। বিকেলের দিকে এক মাসের শিশুর জন্য তৈরি এক-পাতা একটা ফর্দ হাতে নিয়ে নমিতা সিক্ত চোখে এসে দাঁড়ালো লসিতার দরজায়।— ছেলের চেয়ে আড্ডাই হলো বড়ো, চায় না সে ওঁর সাহায্য। এই কেনাকাটিটুকু সে নিজেই করতে পারে—নেহাতই অতটুকু শিশু ফেলে বাইরে যেতে মন সরে না বলে। লসিতার পছন্দেও তার আস্থা আছে, ঘরে ঢুকে অনুরোধ করতে গিয়ে লসিতার মুখের দিকে তাকিয়ে সে থেমে গেল।

নমিতার চোখের জল কারুর মনেই প্রশ্ন জাগায় না, লসিতা জিজ্ঞেস করলো—'কি বৌদি, কিছু বলবে?'

নমিতা ভরসা পেয়ে অনুনয়ের সুরে বললো—'লক্ষীটি ঠাকুরঝি, একবার মার্কেটে ঘুরে আসবে?....গাড়ি বের করতে বলেছি।'

লসিতার মুখের অস্বাভাবিক ভাবটা নমিতার সরল চোখেও ধরা পড়েছে, তবে কিনা নিজের বাইরে কৌতূহলটা তার খুবই কম। সেদিক দিয়ে কোনো প্রশ্ন না করে, পাছে লসিতা 'না' বলে বসে তাই শ্রম বাঁচানোর একটা পন্থা আবিষ্কার করে বললো—'অরুণকে না-হয় সঙ্গে নিয়ে যাও, দরদস্তুর করবার হ্যাঙ্গামটা সে-ই পোয়াবে, তুমি শুধু পছন্দ করে দিও।'

অরুণ? হ্যাঁ, অরুণ বলে তাদের গ্রামের একটি দরিদ্র যুবক এখানে থেকে এম. এ. পড়ে বৈ কি। শান্ত লাজুক ছেলে। দাতার গৃহে দৈন্য নিয়ে নিচের তলার একটা কোণে পড়ে থাকে; তার সঙ্কীর্ণ সত্তা ভালো করে কোনদিন লসিতা অনুভবও করেনি। কি একটু চিন্তা করে লসিতা বললো —'রেখে যাও ফর্দটা।'

ফর্দ ও টাকা রেখে নমিতা চলে গেল। স্বল্পক্ষণের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে লসিতা নিচে নেমে এলো। একপাশের ছোট্ট একটা কামরায় অরুণ থাকে, লসিতা এসে ঢুকলো সেই ঘরে। অরুণ টেবিলে ঝুঁকে পড়ে কি যেন লিখছিলো, হাই-হিলের ঠুক্-ঠুক্ শব্দ শুনে পিছনে তাকিয়ে সসম্মানে উঠে দাঁড়ালো।

'—কিছু কাজ করছো?' লসিতা জিজ্ঞেস করলো।

চোখ না তুলে অতি নম্রভাবে অরুণ জবাব দিলো—'না, এক বন্ধুর

কাছে চিঠি লিখছিলাম।' বলে আধাআধি লেখা কাগজটা কুঁচ্‌কে-মুচ্‌কে হাতের মুঠোয় একটা ডেলা পাকিয়ে ফেললো।

'—বন্ধু, না বান্ধবী?' লসিতা প্রশ্ন করে।

লসিতাকে বাড়ির সবাই ভয় করে চলে; যদিও তার সংস্পর্শে আসার সুযোগ অরুণ কোনদিন পায়নি, তবু অন্যান্যের মনোভাবের সংক্রামকতা তার মনকেও স্পর্শ করেছিলো। তাই সন্ত্রস্ত হয়ে অমন একটা অন্যায় কাজ যে সে করছিলো না, অনেকটা যেন সেটাই প্রমাণ করতে কোঁচকানো কাগজটা খুলে ধরে বললো—'না, এই যে…' আবার কুঁচ্‌কে ছুঁড়ে দিলো জানলার দিকে। শিকে বেধে ফিরে সেটা ঘরের মধ্যেই এসে পড়লো।

লসিতা হেসে বললো—'ফাঁক লক্ষ্য করে ফেললে শিকে বেধে যায়, শিক লক্ষ্য করে ফ্যালো, ঠিক দেখো—ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাবে।'

অরুণও হাসলো।

লসিতা বললো—'তোমাকে আমার প্রয়োজন আছে…।' কথাটা নিজের কানেই কেমন ঠেকলো, একটু থেমে বললো, 'একবার বেরুতে হবে, আমার সঙ্গে।'

অরুণ সার্টটা গায়ে চড়িয়ে নিয়ে বললো—'চলুন।'

বাইরে-ঘরে লসিতার দাদা বিমলের সান্ধ্য-মজলিশ বেশ জমে উঠেছে। বাড়ির সুমুখে দাঁড়ানো বন্ধুদের সব চোখা, চ্যাপ্টা, বেঁটে, লম্বা,—হরেক রকমের নাকওয়ালা গাড়ি। বন্ধু-মহল লসিতার বিয়ের পরও যেমন নিরাশ হয়েছিলো, বিচ্ছেদের পরও তেমনি নিরাশ হয়েছে। নিজেদের বোন, নমিতা, দু'একটা বিবাহিত বন্ধুর স্ত্রী, সুবিধামতো সান্ধ্য-বৈঠকে এসে যোগ দেয় অনেকেই—দেয় না শুধু লসিতা। গান শোনবার নাম করে যদিই বা লসিতাকে ধরে আনা হয়, অনুরোধ রক্ষা করে পড়াশোনার অজুহাতে একটু পরেই সে উঠে যায়।

দরজায় দাঁড়িয়ে লসিতা বিমলকে বললো—'দাদা, আমি গাড়ি নিয়ে বেরুচ্ছি, ফিরতে রাত হবে।'

'—আচ্ছা, দরকার হলে যে কারুর একটা নেবো'খন, তুই নিয়ে যা।'

আর সবার সত্তিত্বকে অস্বীকার করে লসিতা গিয়ে গাড়িতে উঠে

বসলো। অরুণ বসতে যাচ্ছিলো ড্রাইভারের পাশে, লসিতা ডেকে এনে পাশে বসালো।

গাড়ি চলছে। কোনো একটা কথা বলবাল জন্যই অরুণ প্রশ্ন করলো—'পরীক্ষার জন্যে কেমন তৈরি হলেন?'

'—মোটেই না। সরস্বতীর স্বাজাতি-প্রীতিটা কম, আধুনিকাদের মতো বড়ো পুরুষ-ঘেঁষা।

অরুণ হেসে বললো—'কেন, আপনার আই. এ. র রেজাল্ট তো শুনেছি খুবই ভালো হয়েছিলো। তাছাড়া মেয়েরা আজকার পড়াশোনায় তো খুবই এগিয়ে গেছে।'

'—জাত-ধর্ম খোয়ালে কিছুটা হয় বৈ কি। শুধু পড়াশোনায় কেন, বাধ্য হয়ে চাকরী-বাকরী অনেক কিছুতেই তারা এগিয়ে যাচ্ছে।'

লসিতা যেন অনেকটা আপন মনেই বলে চললো—'এ এক মস্ত কৌতুক! লতা গাছ হতে গিয়ে লতাত্ব হারায়, গাছও হতে পারে না, মাঝখান থেকে হয়ে দাঁড়ায় ডাঁটা; যার মধ্যে লতার শ্রী, গাছের শক্তি কোনটাই থাকে না।'

লসিতা নিজে কেন লেখাপড়া নিয়ে আছে অরুণ তা জানে, তাই সেদিক দিয়ে কোনো প্রশ্নই করলো না। লসিতার সঙ্গে কথা বলে মেয়েদের সম্পর্কে অরুণের অনভিজ্ঞ মনের ধারণাটা যেন বদলে গেল। লসিতাদির বিদ্যা-বুদ্ধির প্রতি মন তার হয়ে উঠলো শ্রদ্ধাবান।

কোথায় সহজ হতে পারা যায়, মানুষের সহজ অনুভূতির মধ্যেই তা ধরা পড়ে। বাহ্যিক সঙ্কোচ না ঘুচলেও অরুণের মনের সঙ্কোচ এতটুকুতেই অনেকটা কেটে এসেছিলো। সে বললো—'একদিন এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে অলোচনা করবো।'

ছুটোছাটা কথা বলে পথটা কেটে গেল। হগমার্কেটে নেমে লসিতা ফর্দটা দিলো অরুণের হাতে, বললো—'বৌদির হুকুম, সব তোমাকে করতে হবে, অমার ওপর ভার শুধু পছন্দের।'

হাসি-গল্প করে ছু'জনে মার্কেট ঘুরে জিনিস কিনতে লাগলো। বৌদির ফর্দ শেষ করে লসিতা এটা-ওটা দেখে বেড়াচ্ছিলো। একটা সো-

কেসের ভিতরে কতকগুলো কলম পাশাপাশি সাজানো রয়েছে, অরুণ একটা জেনটস্-পেন দেখিয়ে বললো—'এ পেনটা ভারি সুন্দর না, লসিতাদি ?'

'—পছন্দ হয় তোমার ?' দোকানদারকে বললো, 'দেখি কলমটা।'

শীফারের কলম, দাম পঁচিশ টাকা। ভ্যানিটি-ব্যাগ থেকে টাকা ক'টা গুণে দিয়ে কলমটা বাড়িয়ে ধরলো অরুণের দিকে ! অন্যান্য জিনিসের মতো অরুণ কলমটা হাতে নিলো।

লসিতা বললো—'এটা তোমার।'

আশ্চর্যের সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে অরুণ বললো—'আমার ! এতো দামী কলম দিয়ে কি করবো আমি !'

'—লিখবে। দামী কলম কেনবার ক্ষমতা না থাকলেও তা দিয়ে লেখবার ক্ষমতা তোমার আছে, পরখ করে দেখো।—দাঁড়িও না, চলো।'

অরুণ অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগলো। ভয়ে-ভয়ে ছাড়া-ছাড়া কথার মধ্য দিয়ে আপত্তি জানাতেও চেষ্টা করলো।

লসিতা মার্কেট থেকে বেরিয়ে ঢুকলো গিয়ে রেষ্টুরান্টে। একটা কেবিনে বসে বয়কে ডেকে বেশ সমারোহের সঙ্গে দিলো চা'এর আজ্ঞা। অরুণের ভয় ও জড়তা অপসারণের উদ্দেশ্যে লসিতা হাল্‌কা কথার অবতারণা করলো, জিজ্ঞেস করলো—'তুমি সিগারেট খাও ?'

'—না।'

'—আচ্ছা, সত্যিই তোমার কোনো বান্ধবী নেই ?'

'—না, লসিতাদি ; সত্যি নেই। জীবনে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বাইরে কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপই আমি করিনি।····সিগারেটও আমি খাইনে। আপনাদের দয়ায় মানুষ হচ্ছি, তাছাড়া আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, আপনার কাছে মিথ্যে আমি বলবো না ! এ-সব ব্যাপারে ছাত্র-মহলে আমার সুনামও আছে।'

অরুণ মনে করেছিলো লসিতাদি তাকে যাচাই করে দেখছে এবং তার কথা শুনে নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হবে। লসিতা উল্টো-রকমের জবাব দেবে, সে আশা করেনি।

লসিতা বললো—'নাম কেনার সস্তা পথটা বেশ চিনে নিয়েছো দেখছি। মানুষ হিসেবে গর্ব করবার মতো বস্তু যাদের মধ্যে থাকে না, তারাই বেছে নেয় প্রবৃত্তি নিরোধের পথ।'

অরুণ যেন একটু কেমন হয়ে গেল, বললো—'আপনি কি ওগুলোকে ভালো বলেন ?'

'—আমি কি বলি, পরে বলবো। তুমি তোমার পুঁথিপত্তর আজই আমার ঘরে নিয়ে আসবে, দু'জনে একত্র বসে পড়বো।'

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পরিদৃশ্যমান সব-কিছুর রং এমনভাবে বদলে যেতে পারে, অরুণ কোনোকালে ভাবতেই পারেনি। তার জীবনে এ এক অভিনব দিন, নিজের সত্তাকে যেন সে আজ নূতন করে অনুভব করলো।

দিন-দু'এর ভিতর লসিতা কথাবার্তা ও ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অরুণের মনে এনে দিলো বন্ধুত্বের সাহস ও সহজ ভাব। সুমুখে খোলা বই রেখে দু'জনে গল্প করছে। লসিতা কাত হয়ে কনুই-এ ভর করে আড়া-আড়ি-ভাবে বিছানায় শুয়ে, অরুণ বসেছে খাটের গা ঘেঁষে একটা চেয়ারে। কথার মাঝে কিছুক্ষণ চুপ করে লসিতার মুখের দিকে তাকিয়ে অরুণ বললো—'আমি ভাবি, সুপ্রকাশবাবু আপনার মতো…'

'—রত্নকে কেন চিনতে পারলো না, এই তো বলবে ? তোমার মতো জহুরীর চোখ হয়তো তার নেই।' বলে লসিতা হাসলো।

সুপ্রকাশ সম্পর্কে এই প্রথম আলোচনা। অরুণ বললো—'এমন একজন শিক্ষিত লোক হয়ে সুপ্রকাশবাবু এ-কাজ কি করে করলেন বুঝতে পারিনে।'

'—যা করবার শিক্ষিত প্রথায়ই করেছেন। একটা জীবনের শান্তিকে কিভাবে চেপে মারা হয়, সে তোমরা বুঝবে না, বুঝবে আমার মতো আধুনিক মেয়েরা।····অবশ্য পরের স্তরটায় ও একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।'

অরুণের মুখে ঘৃণার ভাবটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো। ভ্রূ কুঞ্চিত করে এমনভাবে চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে সে বসলো, মনে হলো সুপ্রকাশ

সম্বন্ধে অনেকগুলো কঠোর মন্তব্য তার ঠোঁটের কাছে এসে আটকে আছে।

লসিতা সেটা লক্ষ্য করে ঠোঁটের কোণে একটু বিজ্ঞতাসূচক হাসি টেনে বললো—'তা বলে বাড়ির আর সকলের মতো তুমিও ভেবে নিও না, সে আস্ত একটা জানোয়ার। অন্ধের হাতি চেনার মতো করে মানুষ চিনতে গেলে ভুল করবে। এই আমি না-হয়ে অন্য মেয়ে হলে হয়তো মানিয়ে নিয়ে জীবনটা বেশ কাটিয়ে দিতো···তাই আমার মনে হয়, মেয়েদের মানুষ করে না গড়ে মেয়ে করে গড়াই ভালো।'

কিছুক্ষণ উভয়েই রইলো চুপ করে। সুপ্রকাশের প্রসঙ্গকে চাপা দেবার জন্য অরুণ প্রশ্ন করলো—'আচ্ছা লসিতাদি, বি. এ. পাশ করে এম. এ. পড়বেন তো?'

'বি.এ'ই পাশ করবো কিনা ঠিক কি। পড়তে আমার ভালো লাগে না ··জীবন-মরুভূমিটা পাড়ি দিতে মনকে শুধু উটের পা করে তুললেই হয় না, জমার ঘরেও কিছু থাকা দরকার—যা নিয়ে বাঁচা যায়।····আচ্ছা অরুণ, সুপ্রকাশবাবু না-হয় আমাকে চিনতে পারেনি, তুমি তো চিনেছো; আমার মতো কাউকে পেলে তুমি খুব সুখী হও, না?'

'—যান্, কি যে বলেন।' অরুণ লজ্জিত হয়ে জবাব দিলো।

লসিতা মাথাটাকে একটা বালিশের উপর চিত করে ছাতের দিকে দৃষ্টি রেখে বলতে লাগলো—'তোমাকে কিন্তু আমার ভারী ভালো লাগে···· যদি এবটা পথও চোখের সুমুখে খোলা থাকতো—'

ভয়, আনন্দ, লজ্জা ও গর্ব সংমিশ্রিত এক জটিল অনুভূতি নিয়ে অরুণ স্তব্ধ হয়ে চেয়ারে বসে রইলো। নিজের কানে শুনতে পাচ্ছিলো সে নিজের বুকের স্পন্দন। অনেকটা সময় কেটে গেল কোনো কথা কেউ না বলে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, ঘরের মধ্যে হাল্‌কা অন্ধকার, অরুণের কম্পিত শীতল একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে লসিতা বললো—'আইন গড়বার ক্ষমতা না থাক, আইন অমান্য করবার ক্ষমতা আমাদের আছে—

অদ্ভুত এই পরিস্থিতির মধ্যে বসে লসিতার মনে হলো পুরুষের ব্যাঙ্গাকৃতির হাত ধরে সে আজ কদর্য এক অভিনয় করে চলছে।

লসিতার প্রবল অপরাজেয় আকর্ষণের কাছে অরুণ তৃণের মতো ভেসে গেল। নিজের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা যেন তার একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে। প্রাণে তার ভয়, মনে তার উচিত-অনুচিতের একটানা দ্বন্দ্ব। বন্ধুত্বের সাহস ও স্বাচ্ছন্দ্য আতিশয্যের গণ্ডিতে এসে সে যেন একেবারেই হারিয়ে ফেললো। চূড়ান্ত শারীরিক প্রশ্রয়ের মধ্যেও লসিতা এমন একটা স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখে চলে, যার কাছে অরুণ নিজের অস্তিত্বকে বোধ করে পুতুলেরই মতো তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর। 'লসিতাদি'র 'দি' শব্দটা ছেঁটে ফেলা দূরে থাক অনুরুদ্ধ হয়ে পর্যন্ত 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' উচ্চারণ করতে সে পারেনি। দিনের পর দিন শান্তি-তৃপ্তিহীন মন তার নিরন্তর একটা পালাবার পথ খুঁজে ফিরতে লাগলো।

সেদিন ঘরে ঢুকে অরুণ দেখলো, লসিতা আরাম কেদারায় বসে নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। অরুণ এসে পাশে দাঁড়ালো। তার উপস্থিতি টের পেয়েও কথা বলা দূরে থাক, লসিতা একবার চোখ ফিরিয়েও দেখলো না। লসিতার মুখের ভাব লক্ষ্য করে কোনো কথা উচ্চারণ করতে অরুণ ভরসা পেলো না, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ধীরে-ধীরে ঘর ছেড়ে সে বেরিয়ে গেল।

নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা দ্বারা সমাচ্ছন্ন ছিলো যে সমস্যা, আজ তা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সমস্তটা দিন লসিতা তারই সমাধানের পথ খুঁজে বেড়াতে লাগলো।—হয়তো এ কিছুই নয়, এ শুধু একটা সম্ভাবনা! কিন্তু সম্ভাবনা যদি সত্য হয় তার জন্য প্রস্তুত তাকে হতেই হবে। এরই মধ্যে রয়েছে তার জীবনের স্বার্থকতা, ভবিষ্যতের সম্বল। শুধু সম্ভাবনার উপরই সে তার দম্ভ, মান, পরিস্মৃত ভবিষ্যৎ, সব কিছু পণ করে বসবে। বিরাট এক পরীক্ষায় প্রবেশ করবার সঙ্কল্প নিয়ে লসিতা উঠে দাঁড়ায়। এ পরীক্ষায় প্রেরণার উদ্ভব শুধু তার অক্ষমতার লজ্জা থেকে নয়, এ প্রেরণা নিবিড়ভাবে মিশে আছে তার প্রাণ-শক্তির প্রতি বিন্দুতে-বিন্দুতে।

কাগজ-কলম টেনে নিয়ে লসিতা বসে গেল চিঠি লিখতে।

পরের দিন সন্ধ্যায় দক্ষিণাবাবু বৈঠকখানায় বসে কাগজপত্র দেখছেন,

এমন সময় সুপ্রকাশ এসে প্রণাম করে জড়সড়ো হয়ে একপাশে দাঁড়ালো। প্রথমটা দক্ষিণাবাবু চিনতে পারেননি, একটু লক্ষ্য করে চিনতে পারার পরও যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না। কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো সুপ্রকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বসতে বলা দূরে থাক, কি প্রয়োজনে সে এসেছে তাও জানতে চাইলেন না।

সুপ্রকাশ কিছুটা সময় একভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে-ধীরে বললো —'লসিতা সকালে একখানা চিঠি পাঠিয়েছিলো দেখা করার জন্যে···বিশেষ নাকি জরুরী দরকার—'

দক্ষিণাবাবু চমকে উঠে বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন—'লসিতা! লসিতা চিঠি পাঠিয়েছে····কই আমাকে তো সে-কথা বলেনি!'

ভৃত্যকে ডেকে দক্ষিণাবাবু খবর পাঠালেন লসিতার কাছে।

ভৃত্য ফিরে এসে জানালো—'দিদিমণি জামাইবাবুকে ওপরে ডেকে পাঠিয়েছেন।'

দক্ষিণাবাবু কিছুই না বুঝেতে পেরে বললেন—'যাও, ওপরে যাও—'

লসিতা সংক্ষিপ্ত ও সংযত অনুরোধের মধ্য দিয়ে সুপ্রকাশকে জানালো যে, মাস-কয়েকের জন্য সে পশ্চিমে যাবে মনস্থ করেছে, সুপ্রকাশকে তার সঙ্গে যেতে হবে। তার এই আকস্মিক খেয়ালের কারণ সম্পর্কে কারুর কোনো প্রশ্নই বড়ো একটা প্রশ্রয় পেলো না—শুধু জানা গেল, তুচ্ছ একটা স্বপ্নের সঙ্গে সামান্য একটু সংযোগ নাকি এর আছে; তবে সেটা কিছুই নয়, খেয়ালটাই বড়ো। সুপ্রকাশের অনুগমনের একটা প্রয়োজনীয়তা আছে, সেটা পরে সে সুপ্রকাশকে জানাবে।

এতদিন পর অকস্মাৎ লসিতার তরফ থেকে এ অনুরোধই যথেষ্ট, তার কারণ খোঁজ করবার বা ঔচিত্যানৌচিত্ব বিচার করবার মতো আগ্রহ সুপ্রকাশের মধ্যে দেখা গেল না। মানসিক কোন্ সঙ্ঘাতের ফলে লসিতার এ পরিবর্তন এবং আগ্রহ, তা অবহিত হবার মতো অবসর সুপ্রকাশ এখন পাবে, সে জানে। জেদের বসে সুপ্রকাশ যা-ই করে থাক, মন তার অনুক্ষণই কামনা করছিলো লসিতার সঙ্গ। তার সঙ্গে রূপ-গুণ বিদ্যা-বুদ্ধি কোনদিক দিয়েই সুপ্রকাশের দ্বিতীয় স্ত্রীর কোনো তুলনাই চলতে পারে না। দৈনন্দিন

জীবনে প্রতিপদে লসিতার তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করে সুপ্রকাশ তার প্রাক্তন ব্যবহারের জন্য প্রতিনিয়তই নিজেকে আজকাল ধিক্কার দেয়।

পরের দিনই সুপ্রকাশ নিলো চার মাসের ছুটি।

লসিতার সেই দুর্বোধ্য খেয়াল আঘাত করেছিলো দক্ষিণাবাবুকেই সব চাইতে বেশি। রওনা হবার মুখে লসিতা যখন তাঁকে প্রণাম করলো, দুঃখ এবং অপমানের মধ্যেও এতদিন পরে কন্যাকে একবার আশীর্বাদ করবার সুযোগ পেয়ে বৃদ্ধের অন্তর যেন তৃপ্তিতে ভরে উঠলো।

সুপ্রকাশ যখন প্রণাম করতে এগিয়ে গেল, দক্ষিণাবাবু মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মীমাংসাতীত সমস্যায় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে কন্যাকে তিনি বিদায় দিলেন।

তিন মাস পরের কথা।

ক্লান্তিকর বিতৃষ্ণা ও বিস্বাদের মধ্য দিয়ে লসিতা পেলো মাতৃত্বের প্রথম আস্বাদ—মন তার স্বার্থকতার আনন্দে ভরপুর হয়ে গেল। সে আজ আর প্রেয়সী রমণী নয়, আজ সে মহীয়সী নারী, দেহময় তার মাতৃত্বের বিরাট মহিমা! একটা অবলম্বন, একটু শান্তি খুঁজে বার করবার জন্য আর তাকে বিশ্বময় হাতড়ে বেড়াতে হবে না, তারা আজ ধীরে-ধীরে মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে তার আত্মসত্তার অন্তঃস্থলে!

লসিতা কলকাতা ফিরে আসবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলো। সুপ্রকাশের ইচ্ছা ছিলো, ছুটিটা পুরোই কাটিয়ে যায়, কিন্তু লসিতা রাজি হলো না কিছুতেই। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই রওনা হয়ে পড়বার জন্য সুপ্রকাশকে প্রস্তুত হতে হলো।

লসিতাকে নিয়ে পুনরায় সংসার পাতবার যে প্ল্যানটা সুপ্রকাশ করেছে সেই একাধিকবার বলা প্ল্যান সম্পর্কে লসিতার কি মত, স্পষ্ট করে তা জানবার সময় এসেছে, তাই সারাটা পথ সুপ্রকাশ কেবল সেই আলোচনাই করলো। লসিতা ওখানেও যেমন 'দেখা যাবে,' 'করা যাবে একটা কিছু' বলে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছে, সমস্ত পথটাও ঠিক তেমনি করেই কাটিয়ে দিলো।

বাড়ির গাড়ি অপেক্ষা করছিলো ষ্টেশনে, দু'জন গিয়ে তাতে চেপে বসলো। গাড়ি চলেছে, সুপ্রকাশ বললো—'কই, কিছুই তো বললে না, সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা তো আমাকে করতে হবে।'

এক পাশের অপস্রিয়মান বাড়িগুলোর দিকে চোখ রেখে লসিতা জবাব দিলো—'সময় তো পালিয়ে যাচ্ছে না, বলবো বই কি।'

গাড়ি এসে থামলো লসিতাদের গেটের সুমুখে। লসিতা নেবে সুপ্রকাশকে গাড়ির ভিতরে রেখেই দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিলো। বললো—'আর একটা মেয়ের ওপর এতবড়ো অন্যায় করতে সাহায্য তোমাকে আমি করবো না…ড্রাইভার, বাবুজীকো কোঠি পৌঁছা দেও।…'

সুপ্রকাশকে কোনো কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে বাড়ির ভিতর গিয়ে প্রবেশ করলো লসিতা।

নমিতা হাসি-ভরা মুখে এগিয়ে আসতেই কথা প্রসঙ্গে জিগ্যেস করলো লসিতা অরুণের খবর—খবর নিয়ে জানলো, অরুণ চাকরীর অজুহাতে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।

লসিতা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লো। নিজের ঘরে ঢুকে আরাম কেদারাটায় গা ঢেলে দিয়ে চোখ বুজে সে বসে পড়লো।

পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

রেবার মুখ কালো হয়ে গেল।

মেয়েটার গলার শব্দ শুনে রেবার ইচ্ছা হলো, আজই যদি সে এই ফ্ল্যাট ছেড়ে দিতে পারতো। কিন্তু তা তো আর হয় না। অনেক খোঁজাখুঁজি হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছে এই বাড়ি যোগাড় করতে। কিন্তু কে জানে, উল্টো-দিকের ফ্ল্যাটে তার জন্যে এক শত্রু বাস করছে। শত্রু ছাড়া কি! মেয়েটাকে দেখলেই রেবার কেমন গা জ্বলতে থাকে।

না, রেবার চেয়ে ওর গায়ের রং অনেক বেশি ফরসা, নাকটা উঁচু, দেখতে লম্বা, চোখ দুটো বড়ো এবং ভুরু দুটো টান-টান বলে যে রেবা ওকে ঈর্ষা করে, সে একটা কথাই নয়। ঢের সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ইস্কুলে বন্ধুত্ব করে এসেছে রেবা। কৈ—ওদের দেখলে, ওদের সঙ্গে কথা বললে কখনও তো রেবার মনে ঈর্ষা হিংসা জাগতো না।

আসলে এই মেয়েটাকে, উল্টোদিকের ফ্ল্যাটের জলধরবাবুর মেজো মেয়ে কুন্দকে ভালো না বাসার, ওকে ভালো না লাগার সবচেয়ে বড়ো কারণ হলো, মেয়েটা ভীষণ বাজে বকে। যতক্ষণ এ-ঘরে থাকবে রেবাকে জ্বালাতন করে মারবে। এই প্রশ্ন সেই প্রশ্ন। এক-এক সময় এমন সব আলোচনায় রেবাকে ও টেনে নিতে চায় যে, রেবার ইচ্ছা করে মেয়েটাকে তখনি ঘাড় ধরে বার করে দেয়।

কিন্তু, রেবা নিজেও অবাক হয়, তা সে পারে না কেন! ঘাড় ধরে ঘর থেকে বার করে দেবে দূরে থাক, একদিন, আজ এই এক বছরের মধ্যে রেবা বেশ কড়া করে একটা কথাও তো ওকে বলতে পারলো না! কুন্দ সামনে এসে দাঁড়ালে রেবা কেমন যেন হয়ে যায়, ওর রসালো ঠাট্টা-ইয়ার্কি

মজাদার সব গল্প রেবা অদ্ভুত মনোযোগ সহকারে শুনে যায়, সহ্য করে, এমন কি হেসে পর্যন্ত একটা-ছুটো কথার উত্তর দেয়, একটা-ছুটো কথা নিজে থেকে যোগ করে।

কাজেই কুন্দ প্রশ্রয় পায়, দিন-দিন ওর ঠাট্টা-ইয়ার্কি মজাদার গল্পের পরিমাণ পরিধি বেড়ে চলেছে। মেয়েটা চলে যাওয়ার পর ওর সুন্দর মুখ শরীর চাউনী এমনকি ভ্রূভঙ্গিটা পর্যন্ত রেবার চোখের সামনে ভাসতে থাকে। কিন্তু কতক্ষণ ? তারপর একটা কথা মনে পড়তে রাগে বিতৃষ্ণায় বিদ্বেষে রেবার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত আচ্ছন্ন হয়ে যায়। কিছুতেই সে ক্ষমা করতে পারে না জলধরবাবুর মেজো মেয়েকে। কেন পারবে ? পারা উচিত নয়। রেবা কেন, কোনো বিবাহিতা মেয়ের উচিত নয় ওর সঙ্গে মেশা, ওকে প্রশ্রয় দেওয়া। কিন্তু উপায় কি, রেবা তো একদিনও ওকে ডাকে না। ও নিজে থেকে আসে। একবার না, দিনের মধ্যে হাজারবার।

রেবার নতুন বিয়ে হয়েছে। ছেলেপুলে হয়নি। স্বামী আর ওর ছোট্ট ছিমছাম সংসার। কাজ কম। ঘরে তৃতীয় আর একটি মানুষ নেই যে, তার সঙ্গে একটা-ছুটো কথা বলবে রেবা। স্বামী কলেজে পড়াতে চলে গেলে সারাদিনের জন্য ওর অবসর। আর সেই অবসরের সুযোগ নিতে দরজায় এসে দর্শন দেয় রূপসী কুন্দ। বলে, 'বৌ, কি হচ্ছে, বর বুঝি চলে গেল ? আমি দেখলাম তোমার বর বাস ধরতে লাইটপোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে আছে। বোধ করি বাস আসতে দেরি দেখে হাতের বইটা খুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে। হ্যাঁ, মাইরি। ওদিক থেকে যে একটা ষাঁড় শিং বাগিয়ে আসছিলো তার কি খেয়াল ছিলো পণ্ডিত মানুষটার! ভাগ্যিস চিনেবাদামওয়ালাটা চিৎকার করে উঠলো। দেখো ভাই, কি কাণ্ড!'

ভয়ে বিস্ময়ে রেবার চোখ বড়ো হয়ে ওঠে। রুদ্ধশ্বাস হয়ে এক মিনিটেরও বেশি সময় কুন্দকে দেখে কুন্দর কথা শোনে। তারপর প্রশ্ন করে, 'ওকে কিছু করতে পারেনি তো ষাঁড়টা, ও সরে যেতে পেরেছিলো তো ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।' এবার কুন্দ মুখ টিপে হাসে। 'ষাঁড় ওঁকে কিছু করতে পারলো না, কিন্তু তিনি, তোমার পণ্ডিত মানুষটি চিনেবাদামওয়ালার টিনের কাঁচ ভেঙে চুরমার করে দিলেন। ফলে ছুটো টাকা দণ্ড।'

এবার রেবা ঠোঁট টিপে হাসে।

'কখন হলো এমন কাণ্ড ?'

'এই তো, এই মাত্তর! আমাদের জানলা থেকে ওধারের সবটা রাস্তা তো দেখা যায়, আমি বাবার চানের জল তুলে দিয়ে সবে গিয়ে দাঁড়িয়েছি একটু জানলায়। দেখলাম তোমার বিদ্বান লোকটি ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে থেকে চমৎকার বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে আছেন, তারপর, তখনই তো এই কাণ্ড, হি-হি-হি।'

এবার আর রেবা হাসলো না।

কিন্তু তাতে কি আর সেই মেয়ে মুখ বুজে থাকে।

'হ্যাঁ ভাই, রাত্তিরে মানুষটাকে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দিও। বাইরে রাস্তায় ঘাটে ও এমন বইয়ের ভেতর চোখ-মুখ গুঁজে রাখলে কোন্‌দিন না গাড়ি চাপা পড়বে? বলবে, তুমি আমার মণি, যদি গাড়ি চাপা পড়ে কেটে থেঁতলে যাও তো আমি চিরজীবনের জন্যে অন্ধ হয়ে যাবো। বলবে, বলতে পারবে না?'

রেবা আবার হাসে। কিন্তু কথা বলে না।

'ও কি, হাসছো যে কেবল!' কুন্দ এবার থুতনি ধরে নাড়া দেয়, 'কি, বলতে পারবে না, আমি যেমনটি শিখিয়ে দিলাম? পারবে না? সত্যি পারবে না? আমার গায়ে হাত রেখে বলো, পারবে কি না?'

'না, পারবো না। তেমনটি, তেমন করে বলা যায় নাকি?' রেবা এবার কথা বললো, 'তুমি তোমার বরকে বলো, ভাই। আমি অতো আহ্লাদ দেখাতে পারিনে।'

শুনে কুন্দ হঠাৎ চুপ করে যায়। কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে কি একটু ভাবে। রেবা দেখে মেয়েটার কপালে ছোট্ট রেখা জেগেছে। দেখতে-দেখতে সে রেখা মিলিয়ে যায়। পরমুহূর্তে মুখ-চোখ হাসির আভায় ঝলসে ওঠে। বলে, 'হ্যাঁ ভাই, এমন সুন্দর খোঁপা বেঁধেছো! রাত্রে খোঁপা ঠিক থাকে?'

'কখন?' রেবা চমকে ওঠে। 'কেন থাকবে না।'

এবার কুন্দ মুখে আঁচল চাপা দেয়। কিন্তু তাতে হাসি বারণ মানে না। হাসতে-হাসতে ও বসে পড়ে। মেঝেয় দেয়ালে গড়াগড়ি যায়।

'আমি ঠিক বলতে পারি, রাত্রে কক্ষনো মেয়েদের খোঁপা ঠিক থাকতে পারে না, ভেঙে যায়, খুলে যায়, হি-হি-হি।'

রেবা একটু আগে পরিপাটি করে চুল বেঁধেছে। ভোমরার চাকের মতন বিশাল সুন্দর খোঁপা করেছে একখানা। সেই খোঁপা হাত দিয়ে ছুঁয়ে রেবা জলধরবাবুর মেয়ের হাস্য-বিচ্ছুরিত ঘাম চকচকে লাল মুখখানার দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। আর ভাবে, রাত্রে খোঁপা ঠিক থাকবে না কেন! ভাবতে ভাবতে এক সময় কি মনে হতে রেবার মুখখানাও লাল ওঠে। এবার ও অন্যদিকে তাকাতে চেষ্টা করে। বলে, 'কেমন, ঠিক কিনা—ও কি, এদিকে তাকাও বৌ'—কুন্দ চেঁচায়। কিন্তু রেবা কাজের ছুতো করে টেবিলের কাছে সরে যায়। এটা-ওটা গুছোয়। আর মনে-মনে ভাবে, কী নির্লজ্জ মেয়েটা, কেমন সব আলোচনা নিয়ে মেতে থাকতে ভালোবাসে!

সেদিন ঘর থেকে ও বেরিয়ে যাবার পর রেবা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলো, আর ওকে এ-ঘরে ঢুকতে দেবে না। মনে-মনে বলেছিলো, সত্যি, মেয়েটা বাজে-টাইপ। এবং পরক্ষণেই আর একটা কথা মনে পড়ে রাগে বিতৃষ্ণায় তার সমস্ত মন আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। সত্যি তো, ওকে এখানে আসতে দেওয়া রেবার অনুচিত। এ-সব মেয়ে যে-কোনো সময় আগুন জ্বালাতে পারে, সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। না, না—রেবার মনে পড়ে যায়, পাশের ফ্ল্যাটের ঝি—মিনার মা'র মুখে কুন্দ সম্পর্কে যে কাহিনী সে এখানে এসেই শুনেছিলো। ছি-ছি! এই মেয়ের জীবনে এমন এক কলঙ্কের ইতিহাস লুকোনো রয়েছে, আর রেবা কিনা ওর সঙ্গে, কেবল কথা না, এমন সব আলোচনার যোগ দিচ্ছে, অথবা যোগ দিতে পা বাড়িয়েছে—না, আর একদিনও না, কখনো না; আসুক, আর একবার এই দরজায় এসে উঁকি দিলে রেবা ওর মুখে থুথু ছিটিয়ে যদি না দেয়—

এতো সব মনে মনে ঠিক করে রাখে রেবা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার মনের কঠোর প্রতিজ্ঞা কোথায় ভেসে যায়।

'হ্যাঁ ভাই, বৌ; ওকি, এখনি উনুনে আঁচ—ও, বুঝতে পারি, বুঝতে পারলাম। দু'টিতে বুঝি সিনেমায় যাওয়া হবে, রাত্তিরের শো?'

ধোঁয়া থেকে মুখ সরিয়ে এনে রেবা কুন্দর মুখের দিকে তাকায়।

আর সঙ্গে-সঙ্গে তার বুক ধক্ করে ওঠে। কখন এসে পা টিপে ও রেবার পেছনে দাঁড়িয়েছে টের পেলো না !

'এতো সকাল-সকাল রান্না—?'

'এমনি।' রেবা আবার উনুনের দিকে মুখ ফেরায়।

'আমি ভাবলাম, সিনেমায় যাচ্ছো বুঝি—' কুন্দ মেঝের উপর রেবার গা ঘেঁষে বসে পড়লো।

রেবা গম্ভীর হয়ে বললো, 'ও সিনেমা দেখে না, আমারও সিনেমা ভালো লাগে না।'

'তবে ?' প্রশ্ন করতে-করতে কুন্দ থেমে যায়। একটু ভেবে নিয়ে পরে বললো, 'ও, এখন বুঝেছি, হি-হি—'

কুন্দ মুখে আঁচল চাপা দেয়।

'কি হলো ?' কথাটা জানতে পারছে না বলে রেবা ছটফট করে। 'সকাল সকাল উনুনে আগুন দিলাম আর অমনি তোমার মুখে হাসির তুফান জাগলো ! শুনি না ?'

'না ভাই, বললে তুমি রাগ করবে।'

'না না, রাগ করবো কেন, কি ভাবছো ?'

'এখন বুঝেছি, হি-হি।' হাসিটা একবার ঘরময় ছড়িয়ে দিয়ে পাশের ফ্ল্যাটের রূপসী কুন্দ দুলতে থাকে, কাঁপতে থাকে। দেয়ালের গায়ে পিঠ ছেড়ে দিয়ে শরীর সোজা রাখে। না-হলে হাসির ধমকে আবার ও মেঝেয় গড়িয়ে পড়বে।

রেবা ভেবেই ঠিক করতে পারে না, কোন্ কথা ওর বুকে রসের ফোয়ারা ছুটিয়েছে- হাসির ঢেউ জাগিয়েছে। রেবা ছটফট করে। বলে, 'কি ভাই, কথা না কয়ে কেবল হাসছো ?'

'হুঁ, ছোটো রাত।' কুন্দ একটুখানি বললো।

রেবা বললো, 'হ্যাঁ, রাত ছোটো, আষাঢ় মাস—'

কুন্দ বললো, 'বাতি নিভতে না-নিভতে রাত ফরসা—'

'সত্যি ভাই, চোখের ঘুম আর সরে না—এতো ছোটো রাত, সকালে বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না।'

'হি-হি-হি, সেই তো বলছি, সন্ধ্যে-বাতি জ্বলতে না-জ্বলতে খেয়েদেয়ে বিছানায় যাও, তবু হু'ঘণ্টা হাতে পাওয়া যাবে, তাই না বেলাবেলি রান্নাবান্না শেষ করতে চাও ?'

রেবা চুপ করে রইলো।

'তাই কলে জল না আসতে উনুনে আগুন—হি-হি-হি—তাই বলছিলাম, মনে কি আর অন্য-কিছু আছে, সিনেমা তো ছেলে ভুলোনো ছড়া, এ-সময় সিনেমা সার্কাস কেউ দেখে ? এখন কোনো রকমে এদিকের কাজ মিটিয়ে ঘরের আলো নেভানো, তারপর বিছানায় ঢোকা, হি-হি-হি।'

রেবার হু'কান এখন লাল হয়ে উঠলো।

'কথা বলছো না কেন, ভাই ? আমার দিকে তাকাও।' কুন্দ রেবার পিঠে খোঁচা দেয়, 'মনের কথা বলে দিলাম কিনা ?'

রেবার একবার ইচ্ছা হলো বলে, তোমার কি এ-সব ছাড়া আর কথা নেই, মেয়ে ? কিন্তু বলতে পারলো না। মিনার মা'র মুখে শোনা কথাটাই তার আজ বার-বার মনে পড়ছিলো। একবার ইচ্ছা হলো জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ ভাই, বাপের বাড়ি আর ক'দিন কাটাবে— ; কিন্তু চিরকাল কাটাতে হবে, এটা রেবার চেয়ে ও বেশি জানে, মনে হতে রেবা মুখ নিয়ে কথাটা বার করতে পারলো না। মেয়েটার আপাদমস্তক করুণার দৃষ্টি বুলিয়ে রেবা নিজের কাজে মন দেয়।

'বৌ, শোনো একটা কথা।'

'কি কথা ?' রেবা ওর দিকে তাকায়।

'আমার কাছে এসো।'

'ওখান থেকে বলো, আমি শুনবো।'

'না, কানে-কানে বলতে হবে।' কুন্দ এবার শব্দ না করে হাসে। 'শুনলে তুমি অবাক হবে, আকাশ থেকে পড়বে।'

কৌতূহল মেয়েদের মজ্জাগত। রেবা ওর সামনে এসে দাঁড়ায়। কুন্দ ওর কানের কাছে গলা বাড়িয়ে দিয়ে ফিসফিসিয়ে কথা বলে। শুনে রেবা সত্যিই যেন আকাশ থেকে পড়লো—কথাটার জন্যে নয়, এমন কথা ও মুখ দিয়ে বার করলো কি করে! ছি-ছি-ছি! লজ্জায় ঘৃণায় রেবার

মরে যেতে ইচ্ছা হলো। বোধ-করি আজ এই প্রথম ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, 'তুমি আর আমার ঘরে এসো না ভাই, আমি পায়ে ধরে বলছি। আমি তোমার মতন মেয়ে নই, আমার রুচি অন্য-রকম।'

এবার কুন্দ আকাশ থেকে পড়লো।

কেননা, পৃথিবীতে একমাত্র এই মানুষটি তাকে ভালোবাসে, তার সঙ্গে যখন-তখন কথা বলে, রাগ করে না, বিরক্ত হয় না, চিন্তা করে কুন্দ আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে। এমন সঙ্গিনী পেয়ে চিরকাল বাপের বাড়ি কাটাবার দুঃখ সে ভুলে থাকতে পারবে, মনে-মনে ধরে রেখেছিলো। আজ কিনা বৌটি এমন রূঢ় অপ্রিয় কথা শুনিয়ে দিলো! কতক্ষণ গম্ভীর থেকে কুন্দ বললো, 'আমি তো ভাই আর কারোর কথা বলিনি, তোমার আর তোমার বরকে নিয়ে—'

'থাক থাক।' রেবা মুখ ঝামটা দিলো, 'এ-সব কথায় তোমার দরকার কি, আমাদের প্রাইভেট ব্যাপারে কোন্ লজ্জায় তুমি নাক ঢোকাতে আসো—যাক, অতো কথায় কাজ নেই, তুমি আর আমার ঘরে এসো না।'

বিষণ্ণ ম্লান মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা।

রাত্রে সব কথা রেবা স্বামীকে বললো। অধ্যাপক শুনে হাসলেন। 'এই হয়। ওর অবদমিত কামনা আকাঙ্খার বহিঃপ্রকাশ এগুলো। তোমার আমার গোপন কথা টেনে এনে নিজের অতৃপ্ত ইচ্ছাকে রসিয়ে রাখতে চাইছে ও।'

রেবা বললো, 'আসলে মেয়েটা খারাপ। না-হলে এমন বিদ্বান সুপুরুষ যার স্বামী, তার কাছে ও থাকতে পারলো না কেন! মিনার মা বলে—বিয়ের ছ'মাস পরে ওকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছেন ভদ্রলোক।'

অধ্যাপক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'জানি না, কে খারাপ কে মন্দ। আবার জলধরবাবুরা এই বলে দুঃখ করেন যে, লেখাপড়া জানা সত্ত্বেও লোকটা দুশ্চরিত্র মাতাল, বিনা দোষে মেয়েটাকে তাড়িয়ে দিলো।'

'আসলে মেয়েটাই খারাপ।' রেবা বললো, 'ওর কথাবার্তা শুনে-শুনে আমার তো এই ধারণা হয়েছে। ছি-ছি-ছি! কেবল খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ওইসব জানাতে চাওয়া—আজ আমার ইচ্ছা করছিলো, ঘাড় ধরে…'

অধ্যাপক কথা বললেন না। রেবা চুপ করে গেল। তারপর এক সময়ে দু'জনে ঘুমিয়ে পড়লো।

খুব ভোরে রেবার ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা থেকে নেমে সে মাটিতে পা দিয়েছে কি শিয়রের দিকের জানলার একটা পাল্লার খুট্‌ করে শব্দ হলো। রেবা চমকে উঠলো। তাড়াতাড়ি ছুটে সে জানলার কাছে ছুটে গেল। তারপর? ঘৃণায় লজ্জায় রেবার মনের সে কি অবস্থা। কেমন যেন খোঁড়াতে-খোঁড়াতে এদিকের অন্ধকার কড়িডোর পার হয়ে মেয়েটা ওদিকের প্যাসেজের দিকে ছুটে সরে গেল। কুন্দ। আবছা অন্ধকারে রেবার চিনতে কষ্ট হলো না। কিন্তু এখন আর ঘুমন্ত স্বামীকে ডেকে কথাটা বলতে রেবার আটকালো। মনের রাগ মনে চেপে সে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলো।

সারাদিন পার করে কুন্দ দেখা দিলো বিকেলের দিকে। মুখখানা মলিন। চোখের কোল বসে গেছে। ডান পায়ের গোড়ালি ব্যাণ্ডেজ করা।

দেখে রেবার আপাদমস্তক জ্বলে উঠলো।

কিন্তু কুন্দ যেন তা ভ্রূক্ষেপ করে না। খোঁড়াতে-খোঁড়াতে ভিতরে এসে ঢোকে তারপর বলা কওয়া নেই রেবার চিবুক ধরে সোহাগ করে, 'ইস্‌—বেলা না পড়তে চুলটুল বেঁধে আলতা পরে পরী সেজে আছো, বৌ!'

রেবা নিরুত্তর। বেহায়া নির্লজ্জ মেয়েটা আজ আবার কতটা অগ্রসর হয় তাই দেখতে সে ধৈর্য ধরে আছে।

কুন্দ বললো, 'সারাদিন আসতে পারিনি ভাই, পা'টার যন্ত্রণায়··· সকালবেলা—'

বলতে-বলতে হঠাৎ কুন্দ থামলো।

রাগে রেবার মুখখানা থমথম করছে।

আরো কাছে সরে এসে কুন্দ ফিসফিসিয়ে বললো, 'যেমন চুরি করে দেখতে এসেছিলাম, শাস্তিও পেয়েছি—এতবড়ো একটা ভাঙা কাঁচের টুকরো বিঁধে পায়ের কি অবস্থা হয়েছে দেখো—'

তীব্র তাচ্ছিল্যে রেবা সরে যেতে চেয়েছিলো। কুন্দ হাসলো। বললো, 'আমি না হয় চুরি করে দেখতে এসে অপরাধ করেছিলাম, ভাই। তোমারও মস্ত ভুল হয়েছে, ঘুম ভেঙে বিছানা ছেড়ে ওঠার সময় স্বামী-

দেবতার পা-ছুঁয়ে তবে মাটিতে পা দিতে হয় বৌ, তা কি তোমার জানা নেই !'

রেবা চমকে উঠলো।

কুন্দর ঠোঁটে ম্লান হাসির রেখা।

রেবা এই প্রথম বললো, 'বসো বোন।'

'না, পা-টা কেমন যন্ত্রণা কচ্ছে, যাই একটু শুয়ে পড়িগে—' কুন্দ এবার হাসলো না। সত্যি, ওর পায়ে যন্ত্রণা হচ্ছে বুঝতে রেবার কষ্ট হলো না। ব্যস্ত হয়ে বললো, 'কাঁচটা বেরিয়ে এসেছে তো, আইডিন-ফাইডিন কিছু লাগিয়েছিলে ?'

'তা, অতো ভাবতে হবে না, বৌ—সেরে যাবে। পায়ের কাটা-ঘা ক'দিন আর থাকে, ঘা শুকোয় না মনের।' বলতে-বলতে কুন্দ ডান পা-টা টেনে-টেনে ঘর থেকে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেল।

অসতী

বিমল মিত্র

আজো এক-এক সময়ে পদ্মার কথা ভেবে মনে হয়, ছোটো সংসারের নির্মম আবেষ্টনীতে চার-পাঁচটি ছেলে-মেয়ের মা হওয়ার চেয়ে হোটেলের দক্ষিণের সেই সাজানো ঘরটাতেই যেন পদ্মাকে মানিয়েছিলো ভালো! কিন্তু তবু এখনও আমার দ্বিধা যায়নি। পদ্মার সমস্ত কাহিনীটাই এক-এক সময় রহস্য মনে হয় আমার। পদ্মার আত্মত্যাগটা কেউ বোধহয় কল্পনাও করতে পারে না। না পারে ইন্দুবাবু, না পারে চণ্ডীদাস, না আমি! পদ্মার ছেলে-মেয়েরা, তারাও হয়তো কেউ না।

ঘটনাটা গোড়া থেকেই বলি।

মাস এগারো একটা অফিসে চাকরি করেছিলাম। সেই এগারো মাসেই যেন এগারো বছরের ঘনিষ্ঠতা জন্মে গিয়েছিলো সহকর্মীদের সঙ্গে। তা, সে খানিকটা আমার আড্ডাপ্রিয় স্বভাবটার জন্যেও বটে আর খানিকটা বোধহয় 'খরচে' স্বভাবের জন্যেও।

সিগ্রেট দিয়েছি ডাইনে-বাঁয়ে। ঠিক কেরানির পোশাকও পরিনি কোনও দিন।

ইন্দুবাবু বলতেন—'আপনি কেন চাকরি করতে আসেন, মশাই?'

অফিসে আসবো তা-ও ঠিক সাড়ে দশটার মধ্যে আসতে পারবো না। রোজই লেট। আর রোজই বেপোরোয়া। এমন সহকর্মী বোধহয় আগে এরা কখনও দেখেনি।

যাহোক, সে অফিসে চাকরি এখন আর করিনে। এখন সেই সাত-

আটজন সহকর্মীদের সঙ্গে দেখাও আর হয় না। তাদের কথা মনেও পড়ে না আমার।

হঠাৎ দেখা হয়ে গেল ইন্দুবাবুর সঙ্গে একদিন। রাস্তায়।

ইন্দুবাবু নমস্কার করে দাঁড়ালেন, বললেন—'কেমন আছেন, আমাদের যে আর চিনতে পারেন না!'

বললাম—'সে কি!'

আমাদের সেই ইন্দুবাবু। কিছু না-হোক, দিনের মধ্যে তিরিশবার অকারণে টিফিন-রুমে গিয়ে ঘুরে আসতেন। আর সেই গুঁফো বটব্যাল—। সেই চণ্ডীদাস—পানের বাদ্‌শা। বিনা পয়সায় কিছু পেলেও নেবে না। অদ্ভুত সংযম আর ভদ্রতা জ্ঞান। সকলকে এক-এক কাপ চা খাওয়াচ্ছি, সেই সময় যদি বলতাম—চণ্ডীদাস, চা হবে নাকি? চণ্ডীদাস একটা পান বার করে মুখে পুরে বলতো—না ভাই, আমার এই পানই ভালো। আর সেই ভাগবত ঘোষ কথায়-কথায় বলতো—কই, ছাড়ো তো একটা সিগ্রেট। আর বসন্ত—বাঁ-হাতটা কাটা—চব্বিশ ঘণ্টা একটা চাদর জড়িয়ে থাকতো অফিসে।

'—কেমন আছেন? আর সকলের খবর কী?'

ইন্দুবাবু বললেন—'আবদুল সাহেব মারা গেলেন, আর আমিই তারপর থেকে হেড-ক্লার্কের চেয়ারে।'

বললাম—'খুব সু-খবর, শুনে সুখী হলাম।'

ইন্দুবাবু তারপর বললেন—'আর গুঁফো বটব্যালের গোঁফজোড়া আরো জবর হয়েছে···আর ভাগবত ঘোষ, তার দারিদ্র্য আর এ জীবনে ঘুচলো না!'

ইন্দুবাবু বাকী সকলের পরিচয়ও দিলেন।

শেষে বললেন—'কিন্তু চণ্ডীদাসকে চিনতেন তো?'

বললাম—'খুব চিনি, সেই যে পান খেতো, মরে গেলেও একটা পয়সার জিনিস কারো কাছে নিতে চাইতো না—ভারী সংসারী মানুষ, অফিস-ফেরতা বাজার করে ফিরতো—গোছানো মানুষটি।'

ইন্দুবাবু বাধা দিয়ে বললেন—'সে চণ্ডীদাস একেবারে বসে গেছে মশাই, একেবারে গোল্লায় গেছে।'

'—বলেন কী? আমাদের চণ্ডীদাস, আপনার ঠিক মনে আছে তো?'

ইন্দুবাবু বললেন—'হ্যাঁ, আমাদের সেই চণ্ডীদাসই; এখন মদে একেবারে দিন-রাত চুর হয়ে থাকে।'

ঠিক নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যেন। সেই চণ্ডীদাস। ব্রাউন কেড্স জুতো পায়ে, মালকোঁচা-মারা কাপড়, হাত-কাটা টুইল শার্টের ওপর একটা কোটও পরে আসতো। অল্প মাইনেতে বেশ পরিপাটি ছিলো চণ্ডীদাস, অপব্যয়ের মধ্যে ছিলো শুধু পান আর একটু দোক্তা। কিন্তু ছোটো একটি এলুমিনিয়মের খাবার-কৌটোতে থাকতো কোনও দিন পরোটা বেগুনভাজা। আবার মাসের শেষাশেষি প্রায়ই থাকতো মুড়ি-মুড়কি জাতীয় জিনিস। সেই চণ্ডীদাস!

ইন্দুবাবু বলতে লাগলেন—'এখন একেবারে বদলে গেছে, মশাই। অফিসে প্রায়ই এক মাস দেড় মাস কামাই, আমি সামলে-সুমলে রেখেছি চাকরিটা। আর তাছাড়া জানেন তো, রেলের চাকরি—ও যায় না। তাই সেটা এখনও আছে, কিন্তু ওর বউ ছেলেপুলে বোধহয় খেতে পায় না।'

হু'জনের মুখেই খানিকক্ষণ কথা বেরুলো না।

খানিক পরে ইন্দুবাবু বললেন—'আপনাকেই একটু শ্রদ্ধা করতো চণ্ডীদাস, আমাদের মধ্যে। তা, সে যা হোক, এ-রকম বেলেল্লাগিরি যে চণ্ডীদাস করতে পারে, ভাবাও যায় না। আমরাও সে যুগে একটু-আধটু যে ও-সব না খেয়েছি তা নয়, কিন্তু ডুবিনি তো কখনও; বলুন হ্যাঁ—কি না?'

আমি তখনও অবাক হয়ে ভাবছি। কী আর বলবো। ঠিক যে এটা সহানুভূতি—তা নয়, কিন্তু এমন বিচিত্র ঘটনার জন্যে মানুষের মনে কৌতূহলও তো হয়।

ইন্দুবাবু চলে যাচ্ছিলেন। যাবার আগে বললেন—'একদিন যাবেন চণ্ডীদাসের বাড়ি, একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলে আসবেন; আপনার কথা হয়তো শুনতেও পারে।'

তারপর আরো হু'একটা কথার পর চলে এলাম। একি বোঝাবার জিনিস, কেউ বোঝালে বোঝে! বুঝিয়ে কাউকে শোধরানো যায় না সংসারে। কিন্তু ঘটনাটা শুনে পর্যন্ত তাজ্জব হয়ে গেলাম।

—চেতলার বড়ো রাস্তাটা বাজারের কাছে যাবার আগেই বাঁদিকের গলির ভেতরে চণ্ডীদাসের বাসা। যাবো না মনে করেও কেমন করে যে চণ্ডীদাসের ঠিকানায় গিয়ে পড়লাম, নিজেও জানিনে তা।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। নম্বরটা মিলিয়ে নিয়ে কড়া নেড়ে ডাকলাম—'চণ্ডীদাস, বাড়ি আছো?'

ভেতরে ছেলে-মেয়েদের গলা শুনতে পাচ্ছি।

মেয়েলী গলায় কে যেন বললো—'পুঁটি, বলে দে, বাবা বাড়ি নেই।'

একটি ছোটো মেয়ে দরজা খুলে দিলো।

মেয়েটি কিছু বলবার আগেই বললাম—'তোমার নাম বুঝি পুঁটি! তাই না, খুকু?'

মেয়েটি অবাক হয়ে গেল। বললো—'আপনি আমার নাম জানলেন কেমনে করে?'

'—কার সঙ্গে কথা বলছিস্ রে, পুঁটি?'—রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে সন্ধান করতে গিয়ে একেবারে সামনাসামনি পড়ে গিয়ে যিনি এঁটো হাতে ঘোমটা দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন, তাঁকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এই-ই চণ্ডীদাসের স্ত্রী। অন্ধকারেও বুঝতে পারলাম, এমন রূপ গরীবের ঘরে কদাচিৎ দেখা যায়। চণ্ডীদাসটা সত্যিকারের হতভাগা।

নমস্কার করে বললাম—'আমি চণ্ডীদাসের বন্ধু।'

'—আপনাকে তো আমি কাল বলেছি।' একটু সামলে নিয়ে মহিলা বলতে আরম্ভ করলেন—'আপনাকে তো আমি কাল বলেছি, এ সময়ে তার দেখা পাওয়া যায় না।'

প্রতিবাদ করতে হলো। বললাম—'কাল তো আমি আসিনি, আপনি বোধহয় অন্য কাউকে ভুল করছেন।'

আরো সব ছেলে-মেয়েরা সামনে এসে তখন ভিড় করেছে। আমার প্রতিবাদ শুনে বিশ্বাস করলেন কি না, কে জানে। রান্নাঘরের কী একটা কাজে আবার ভেতরে ঢুকে গেলেন।

ততক্ষণে ছোটো ছেলেটা পকেটের মধ্যে গোটা হাতটা পুরে দিয়েছে। বললো—'পয়সা আছে, তোমার পকেটে?'

বলতে-বলতে সত্যিই পকেট থেকে গোটা-দুই খুচরো টাকা বের করে নিয়ে চোঁ-চোঁ দৌড় দিয়েছে।

ভেতর থেকে আমার কথার উত্তর এলো—'ও পুঁটি, বলে দে, টাকা আপনি পাবেন না, জেনেশুনে অমন মাতাল মানুষকে টাকা ধার দেন কেন?'

টাকা যে আমি ধার দিইনি, তা বলবার অবসর দিলেন না। দুটো টাকা নিয়ে তখন কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে। একটা চুল ধরেছে আর একটার, আর একটার জামা ধরেছে আর একজন। একটা হট্টগোল বেধে গেলো। কান্না, চড়-চাপড়, কিল।

রান্নাঘর থেকে এবার বেরিয়ে এলেন তিনি। এসেই কাণ্ড দেখে ধমক দিলেন—'পল্টু, তুমি না বড়ো হয়েছো, বুদ্ধি হয়েছে না তোমার, দেখতে পাচ্ছো না, পুঁটিকে যে মেরে ফেললো ছোটো খোকা!'

হঠাৎ পেছনে ফিরে আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বুঝতে পারেননি এখনো আমি আছি। শাড়িটা সামলে নিয়ে বোধহয় দরজার পাল্লা দুটো বন্ধ করবার জন্যেই এগিয়ে এলেন। কিন্তু আমি দরজার পাল্লা দুটোর মধ্যে দাঁড়িয়ে। আমি না সরে দাঁড়ালে দরজা বন্ধ হয় না, সরেই চলে আসতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মহিলা বলে উঠলেন—'আপনারা মানুষ না কি, আমি তো আপনাদের বলছি ওকে টাকা দেবেন না। টাকা চাইতে আপনাদের লজ্জা হয় না? যদি বিশ্বাস না হয় তো দেখে যান।'

তারপর এক কাণ্ড করে বসলেন। প্রায় আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে-টানতে নিয়ে যাবার মতই।

সোজা নিয়ে গেলেন রান্নাঘরের সামনে। বললেন—'কী রাঁধছি দেখেছেন, মাছের ঝোল না মাংসের কালিয়া—বলুন, কি দেখছেন—পাঁচটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে ওই আমরা খাবো; আজকে আমাদের ভাত হবে না।'

কচুর শাক, তাই সেদ্ধ করে রান্নার বন্দোবস্ত হচ্ছে একটা কড়ায়।

'—দেখলেন তো, এবার আসুন—' বলে মহিলাটি শোবার ঘরে গেলেন। একখানাই বোধহয় ঘর। বললেন—'আলমারি ক'টা, আর ক'টা খাট, ক'টা সিন্ধুক দেখছেন বলুন।'

একটা উঁচু প্যাকিং কেস ছিলো, তারই ওপর বসে পড়লুম।

বললেন—'তিনটে ঘর ভাড়া ছিলো, বাড়িওয়ালা দুখানা নিয়ে নিয়েছে, এখানাও নিলে বাঁচে ; ছ'মাসের বাড়ি ভাড়া বাকী থাকলে তার দোষ কী ? এ-সব জেনেশুনেও আপনারা কেন অমন মানুষকে টাকা ধার দেন ! আমাদের মেরে ফেললেও যে টাকা পাবেন না।'

যেন এতক্ষণেও সম্পূর্ণ প্রমাণ হলো না। তারপর বললেন—'আমার দিকে চেয়ে দেখুন তো।'

সোজা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ চেয়ে দেখলাম।

'—ক'গাছা চুড়ি দেখছেন আমার হাতে ? এ শাঁখা দু'গাছা, তা এই বা আর থাকে কেন ?'

হঠাৎ হাত দুটো দেয়ালের গায়ে ঠুকে শাঁখা দুটোও পট্‌-পট্‌ করে ভেঙে পা দিয়ে মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে দিলেন।

আমি আর দেখতে পারছিলাম না। ওঠবার উদ্যোগ করছিলাম।

'—পল্টু, আবার বিছানা ময়লা করছে, পুঁটি দেখতে পাচ্ছো না, তোমার না বুদ্ধি হয়েছে, তুমি না···আপনি উঠছেন নাকি ?'

'—হ্যাঁ, কিন্তু আমি চণ্ডীদাসকে টাকা ধার দিইনি, আপনি ভুল বুঝেছেন। এমনি ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম, চলি আমি—' চলতে-চলতেই বললাম।

এতক্ষণ পরে যেন মহিলাটি আমার দিকে ভালো করে নজর দিয়ে দেখলেন। বললেন—'এই টাকা দুটো আপনার নিয়ে যান। হ্যাঁ, আর কাকেই বা বলি, নিজেরা খাই না-খাই, আপনাদের—পাওনাদারদের জ্বালায় তো আর পারিনে। যাই, তরকারি বোধহয় পুড়ে গেল।'

অন্ধকার গলি। ক'ফুট রাস্তা পার হলেই বড়ো রাস্তা। বড়ো রাস্তায় আলো পাওয়া যাবে। এতো সরু গলি, পাশাপাশি দু'জন যাওয়া যায় না। গলিটার শেষ প্রান্তে এসে পড়েছি, হঠাৎ সামনেই যেন মনে হলো চণ্ডীদাস্‌ আসছে। চিনতে পারলাম। চিনতে না পারলেই বোধহয় ভালো করতাম। কিন্তু তখন অতো বুঝিনি।

ডাকলাম—'চণ্ডীদাস।'

চণ্ডীদাস মাথা উঁচু করে আমার দিকে চাইলো। যেন অনেক কষ্টে চিনতে পারলো। বললো—'চেনা লোক যেন—'

মাতালের কাণ্ড। চিনতে পেরেই একেবারে জড়িয়ে ধরেছে বুকে। বললো—'আর ছাড়ছিনে তোমায়, ভাই। শুনেছি ব্যবসা করে বড়োলোক হয়েছো খুব। তা, হওগে বড়োলোক, এসো আমার বাড়ি।'

হিড়হিড় করে টানতে-টানতে নিয়ে গেল একেবারে নিজের বাড়ির সামনে। কিছু কথা বলবার অবকাশ দিলো না, দরজা খুলে দিতেই চিৎকার করে ডাকলো—'পদ্ম, পদ্ম—পদ্মাবতী।'

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন স্ত্রী। চুপ করে দেখতে লাগলেন চণ্ডীদাসের কাণ্ড।

'—ভাগ্যিস আজ সকাল-সকাল বাড়িতে ফিরে এলাম। তা, খুব বড়োলোক বন্ধু আমার, বুঝেছো পদ্মা। ব্যবসাদার, খাতির করো গো—' বলে পকেট হাতড়াতে লাগলো চণ্ডীদাস। সিকি একটা বেরুলো শেষ পর্যন্ত পকেট থেকে।

বললো—'পল্টু কোথায়, যা তো বাবা, একটা রসোগোল্লা আর এক কাপ চা নিয়ে আয় তো কিনে। হ্যাণ্ডেলওয়ালা চায়ের কাপ নিবি, এই নে! চলো, বসি গিয়ে ঘরে। আমাদের অফিসের খবর শুনেছো তো, ইন্দুটা মাইরি বড়োবাবু হয়ে গিয়েছে, বড়ো জ্বালায়। কেবল উপদেশ দিতে আসে! আরে, যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাবণ!'

পল্টু সিকিটা নিয়ে খাবার আনতে দৌড়োচ্ছিলো। পদ্মা নিমেষে তার হাত খপ্ করে ধরে ফেলেছে। তারপর এক মুহূর্তে আমার একেবারে সামনে সরে এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললো—'আমার মাথার দিব্যি রইলো, যদি আপনি ঐ রসগোল্লা খান। বলুন, এতো শোনার পরেও অপনার খেতে রুচি হবে; বলুন, বলুন আপনি?'

চণ্ডীদাস হঠাৎ মাথা খাড়া করে একবার আমার মুখের দিকে একবার পদ্মার মুখের দিকে চাইলো! কিছুই সে বুঝতে পারলো না।

তারপর স্ত্রীকে লক্ষ্য করে হয়তো একটা কটূক্তি করতে যাচ্ছিলো

চণ্ডীদাস। আমি থামিয়ে দিলাম। বললাম—'এই তো চা খেয়েই আসছি চণ্ডী, থাক না এখন, অন্যদিন বরং—'

হঠাৎ যেন ভারী মিইয়ে গেল চণ্ডীদাস! আমাকে টানতে-টানতে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসলো। বললো—'দেখলি ভাই, দেখলি তো? এই রকম বউকে নিয়ে ঘর করতে হয় আমাকে। কেউটে সাপের সঙ্গে সংসার করা—সাধ করে কি আমি মদ খাই রে!'

রান্নাঘরেই চলে গিয়েছিলো পদ্মা। কথাটা কানে যেতেই আবার ফিরে এসেছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললো—'সংসার আর করতে হবে না তোমার, এই দেখো।'

ভাঙা শাঁখার টুকরোগুলোকে মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে সেগুলোকে আরো টুকরো-টুকরো করে বললো—'শাঁখাটা ছিলো হাতে, তাও আজ ভাঙলাম, এই শনিবার সন্ধ্যেবেলা। সংসার করা এবারে তোমার ঘুচবে, ঘুচবে, ঘুচবে।'

তালে-তালে শাঁখার টুকরোগুলোর ওপর পদ্মা ডান পা দিয়ে আঘাত করলো তিনবার! তারপর আবার রান্নাঘরে চলে গেল।

ছেলে-মেয়েগুলো যে অতো দুষ্টু—তারাও চণ্ডীদাস বাড়িতে আসার পর থেকেই সবাই যেন ভয়ে কুঁকড়ে আছে।

চণ্ডীদাস একটা বালিশ এগিয়ে নিয়ে বললো—'ভালোভাবে আয়েস করে বস্ না, ভাই। তারপর, তোর খবর কী বল্। চাকরিতে আর সংসারে ঘেন্না ধরে গেছে ভাই, আর সংসার তো দেখলি চোখের সামনে। বাবা রূপসী মেয়ে দেখে বিয়ে দিলো। আমায় বলে—তোমার হাতে না পড়লে রাজরানী হয়ে থাকতুম। তবে যা না, দেখি না কোন্ রাজা তোকে পোষে!'

তারপর হঠাৎ আদরের সুরে ডেকে উঠলো চণ্ডীদাস—'পদ্ম, ও পদ্মা, পদ্মাবতী।'

সুরের পরিবর্তনে আমিও যেন চমকে উঠলাম। পদ্মাও বেশ আশ্চর্য হয়েছিলো। ছেলে-মেয়েদের খাওয়াতে-খাওয়াতে উঠে এসে দাঁড়ালো দরজার সামনে। বললো—'কি বলছো?'

মদ খেয়ে চণ্ডীদাসের কী কাণ্ডজ্ঞান থাকতে নেই? বললো—'এই

দেখছো, একে ? রাজার ছেলে, রাজা-রাজা করেছিলে, রাজা এনে দিয়েছি ; এখন রাজরানী হও।'

ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পদ্মা চলে গেল নিজের কাজে। নিজের যেন কেমন লাগলো ইঙ্গিতটা। প্রসঙ্গ এড়াবার জন্যে বললাম—'মদটা তুমি ছাড়োই না, চণ্ডীদাস।'

হঠাৎ খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইলো চণ্ডীদাস আমার দিকে। তারপর কোঁচাটা জড়িয়ে গলবস্ত্র হয়ে বললো—'তুইও উপদেশ দিচ্ছিস ভাই, আমাকে! তাহলে কোথাও নিস্তার নেই দেখছি।'

আমার মুখ থেকে উপদেশ শুনে যেন ক্ষোভে দুঃখে ঘৃণায় হঠাৎ মা-মা বলে চিৎকার করে উঠলো চণ্ডীদাস। তারপর লজ্জায় যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে চায় এমনিভাবে বিছানায় চিৎপাৎ হয়ে শুয়ে পড়লো, আর উঠলো না।

চুপচাপ চণ্ডীদাসের পাশে বসে রইলাম একলা। পদ্মার বিছানাটার ওপরই বসে ছিলাম। বাইরের ফালি বারন্দায় পাঁচটি ছেলে-মেয়েকে নিয়ে খাওয়াতে বসেছে পদ্মা, কী এতক্ষণ খাচ্ছে ওরা! খেতে বুঝি দু'একজন আপত্তি করছে। গুম্-গুম্ করে কয়েকটা কিল পড়লো তাদের পিঠে। কান্না জুড়লো কয়েকজন।

তারপর হিড়হিড় করে টানতে-টানতে এনে ঘরে পুরলো সবাইকে।

সকলকে জায়গা করে দেবার জন্যেই বললাম—'এবার আমি উঠি, রাতও অনেক হলো ; আসবো আর একদিন।'

পদ্মার মুখ থেকে কোনো সম্ভাষণ বেরুলো না। আমি একলা বাইরে এসে জুতো পরে গলির অন্ধকারে পা বাড়ালাম।

'—শুনুন।'

অন্ধকারেও অনেকখানি চলে গিয়েছি। মনে হলো, পেছন থেকে যেন পদ্মা ডাকলো। সমানে এগিয়ে এসে পদ্মার মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

শাড়িটা গায়ে ভালো করে জড়ানো। ফরসা মুখের দিকে চাইতে গিয়ে একটা প্রকটা প্রচণ্ড আঘাত পেলাম। দেখি নিরাভরণ ডান হাতটা এগিয়ে দিয়েছে সামনের দিকে।

বললাম—'কী ওটা ?'

পদ্মা বললো—'আপনার মানি-ব্যাগটা আমার মাথার বালিশের আড়ালে ফেলে রেখে গিয়েছিলেন, নিন।'

নিতে গিয়েও কেমন দ্বিধা হলো। সত্যি-সত্যিই তো এমন করে ধরা পড়বো ভাবতে পারিনি।

পদ্মা যেন ধমকের স্বরে বললো—'সোজাভাবে দিলেই পারতেন। এ ছলার তো কোনো প্রয়োজন ছিলো না! আমার অভাব, এ তো কারো অজানা নেই। নিন, দেরি করবেন না, আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।'

হঠাৎ পদ্মার হাতটা চেপে ধরলাম। বললাম—'কিছু মনে করবেন না কিন্তু, এতে যে-ক'টা টাকা আছে, তা নিতেই হবে আপনাকে, একান্ত অনুরোধ আমার।'

দশখানা পাঁচ টাকার নোট উপুড় করে দিতেই এক নিমেষে পাঁচখানা নোট ফেরত দিয়ে বললো—'টাকা আমার দরকার, সে-কথা অস্বীকার করিনে, কিন্তু এতো টাকা একসঙ্গেও দরকার নেই। দেখেছেন তো, বাক্সটার তালা ভাঙা, একে-একে সবই তো কেড়ে নিয়েছে। আপনি যদি আর কখনো না-ই আসেন, এই টাকাতেই তো একটা মাস চালিয়ে নিতে হবে।'

কিছু একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম। বাধা দিয়ে পদ্মা বললো—'তাছাড়া আমার হাতে প্রকাশ্যে টাকা দিলে আপনার লজ্জা পাওয়াটাই তো লজ্জাকর। আপনারাই ওকে এই পথে নামিয়েছেন, কতো টাকা ও ব্যয় করেছে আপনাদের জন্যে, এখন তার সিকিও শোধ হলো বলে ধরে নেবেন না হয়।'

গলির এই গহন অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে দোষারোপের একটা উত্তর দেবো বলেই প্রস্তুত হচ্ছিলাম! কিন্তু এক মুহূর্তে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিলো পদ্মা। বললো—'আচ্ছা, অনেক রাত হয়ে গেল, আপনি এখন বাড়ি যান।'

বলে মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে দরজার পাল্লা দুটো দড়াম করে বন্ধ করে দিলো।

বেশিদিন অপেক্ষা করতে পারিনি। পূজোর জন্যে নিজের সংসারের কিছু কেনাকাটা করতে হচ্ছিলো, সেই সঙ্গে চণ্ডীদাসের কথা মনে পড়লো।

কয়েকটা ফ্রক পেটিকোট প্যান্ট আর পদ্মার জন্যে একখানা ভালো শাড়ি আর ব্লাউজ নিয়ে একদিন চেতলার বাজারের গলিতে গিয়ে হাজির হলাম বাইরে থেকেই বোঝা গেল ভেতরে তুমুল কাণ্ড।

কড়া নাড়তেই পল্টু এসে দরজা খুলে দিলো। বললো—'ওমা, কাকাবাবু যে!'

কিন্তু ভেতরে দৃষ্টি দিতেই মনে হলো, এমন সময় আমার আসা ঠিক হয়নি বোধহয়।

উঠোনের মধ্যেই চণ্ডীদাস প্রায় অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় শুয়ে আছে। আর পদ্মা বালতি-বালতি জল ঢালছে মাথার ওপর। জল ঢালতে-ঢালতেই একবার বললো—'দেখুন, আপনার বন্ধুর কাণ্ডটা দেখুন!'

চণ্ডীদাসের জ্ঞান নেই, উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। পদ্মার মুখের ভাব আর ছেলেপিলেদের হাবভাব দেখে মনে হলো, এ যেন এ-বাড়িতে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

অনেকক্ষণ ধরে জল ঢালবার পর চণ্ডীদাস একবার পাশ ফিরে শুলো।

পদ্মা বললো—'একটু হাত লাগাতে পারবেন? পাঞ্জাবির আস্তিনটা গুটিয়ে নিন, আপনার বন্ধুকে ঘরে তুলে নিয়ে যেতে চাই'—বলে শাড়ির আঁচলটা কোমরে শক্ত করে জড়িয়ে নিলো।

পদ্মা বললো—'আপনি পায়ের দিক ধরুন, আমি এদিকে আছি।'

অতি যত্নে পদ্মা চণ্ডীদাসের আপাদমস্তক শুকনো গামছা দিয়ে মুছিয়ে দিলো। তারপর দু'জনে মিলে প্রায়-অচৈতন্য চণ্ডীদাসকে ঘরে তুলে নিয়ে গিয়ে পদ্মা জিগ্যেস করলো—'এখন কেমন আছো?'

চণ্ডীদাস কী বললো, কানে এলো না। পদ্মা একটা পাখা নিয়ে বাতাস করতে লাগলো মাথার কাছে। আর এক হাতে মাথার চুলগুলোর ভেতর আঙুল চালিয়ে-চালিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলো। বললো—'এবার বুকের কষ্টটা একটু কমেছে? একটু ঘুমোতে চেষ্টা করো দিকি।'

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। ছেলে-মেয়েগুলো ছুটোছুটি করছে। এক-একবার পকেটে হাত পুরে দেয়। কিন্তু প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার পর পকেটে আর কিছু রাখিনি।

অনেকক্ষণ পরে পদ্মা আস্তে-আস্তে স্বামীর পাশ থেকে উঠলো। ছেলে-মেয়েদের যার-যার বিছানায় শুইয়ে দিলো। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললো—'আপনি যেন অবাক হয়ে গেছেন, মনে হচ্ছে।'

প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। চণ্ডীদাসের মদ খেয়ে বেহুঁশ হওয়া, না পদ্মার এই স্বামী-সেবা—কোনটা পদ্মা বলতে চায়?

আমার উত্তর দেবার আগেই বললো—'এই এখানে পিঁড়িটাতে বসুন একটু, আমি পাঁচ মিনিটে দুটো ছাই-পাঁশ মুখে দিয়ে নিই।'

রান্নাঘরের মধ্যে গিয়ে খেতে বসলো পদ্মা। আমার চোখের আড়ালে।

খেতে-খেতে বললো—'লোকটা লম্পট হলে কী হবে, যখন ভালো থাকে, তখন আবার অতো ভালোও কেউ নয়। জানেন, সেদিন আপনার বন্ধু কি বলছিলো জানেন?'

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

'—বলছিলো, মাতালেরা মদকে যতো ঘেন্না করে এমন আর কেউ না। কিন্তু ঐ মানুষটাই মদ খেলে এমন হয়ে যায় কেন, এ আমায় কে বলে দেবে। লোকটার জন্যে ভারী মায়া হয় আমার, জানেন। মাঝে-মাঝে মনে হয়, লোকটাকে বুঝি ভালোইবাসি; সাত-পাক দিয়ে মঙ্গলঘট সাক্ষী রেখে বিয়ে হয়েছে বলেই নয়, মনে হয় লোকটা বুঝি বড়ো দুর্বল, বড়ো অসহায় ও।'

কথা বলতে-বলতে এক সময় খাওয়া শেষ করে কয়েকখানা বাসনও মেজে নিলো। তারপর এসে বসলো আমার পাশের একটা উঁচু পিঁড়িতে। আশেপাশে উঁচু-উঁচু দোতলা-তিনতলা বাড়ির পাহাড়! একতলা বাড়ির নিচু খোলা বারান্দায় বসে আছি। ঘর থেকে চণ্ডীদাসের প্রচণ্ড নাক ডাকার শব্দ আসছে। টিপ্-টিপ্ করে বৃষ্টি এলো। চারদিকে ভনভন করছে ভীষণ মাছি।

পদ্মা বললো—'ঐ মোষের মতন নাক-ডাকা শুনতে পাচ্ছেন, অসহ্য লাগছে বটে, কিন্তু তা লাগুক, তবু তো মানুষটা বাড়িতে রয়েছে। হোক মরা মানুষ, তবু ধরুন না কেন, ওরই তো স্ত্রী আমি, এখন এই যে দুপুরবেলা একজন পর-পুরুষের সঙ্গে বসে-বসে গল্প করছি, ওর তো সে খেয়ালও নেই।'

তারপরই একটু থেমে বলতে লাগলো—'সুন্দরী বলে আমার নাম আছে, বাপের বাড়িতেও ছিলো, শ্বশুর-বাড়ির পাড়াতেও আছে। আপনার মতো ওর বহু বন্ধুই এসেছে এককালে বাড়িতে, দু'দণ্ড বসে আমার সঙ্গে আলাপ করতেও চেয়েছে, কিন্তু মানুষটার মনটা কি আলাদা ধাতুতে তৈরি, আমাকে বাড়িতে একলা ফেলে রেখে চার-পাঁচদিন বাড়িতেই এলো না হয়তো!...থাকগে বাজে কথা, আমার জন্যে কী আনলেন দেখি—' পদ্মা কাপড়ের বাণ্ডিলটা নিয়ে খুলতে লাগলো। তারপর বললো—'ভালোই করেছেন, এদের জামা-কাপড় এনে। মাপ ঠিকই হবে মনে হচ্ছে।'

নিজের শাড়িটার পাট খুলে দেখলো খানিকক্ষণ। বললো—'মনে হচ্ছে এটা পরে আজই আপনার সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাই। তাই চলুন, যাবেন?'

অল্প-অল্প বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ কালো হয়ে এসেছে। পদ্মার এ হলো কী আজ!

'—নিয়ে যাবেন? সাহস হবে তো বলুন, এখনি বেরিয়ে পড়ি; সবাই তো ঘুমুচ্ছে এখন। কতদিন, কতো বছর যে রাস্তায় বেরোইনি!'

ছোটো কুমারী মেয়ের মতো চঞ্চল হয়ে উঠলো পদ্মা।

তারপর আমার সম্মতির অপেক্ষা না করেই ঘরের ভেতর গিয়ে শাড়িটা জড়িয়ে, চুলটা আঁচড়ে পরিপাটি হয়ে বেরিয়ে এলো! বললো—'কী হলো, চলুন; ভাবছেন কী?'

বললাম—'কাজটা ভালো হচ্ছে কিনা একবার ভেবে দেখুন। আমি দু'দিনের চেনা, বলতে গেলে আমি আপনার কাছে অজ্ঞাতকুলশীল তো!'

পদ্মা বললো—'তা বলে আপনি তো আর আমায় খেয়ে ফেলবেন না, আর খেয়ে ফেললেও ওই ছেলে-মেয়েগুলোরই যা একটু কষ্ট হবে। ওই মাতালটার যে হাড় জুড়োবে, তা আমি দিব্যি করে বলতে পারি।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে বললাম—'কোথায় যাবেন?'

'—কাশীপুরে, আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি, অনেকদিন যাইনি।'

বাসে উঠলাম দু'জনে। বৃষ্টিটা আরো জোরে এলো। পাশাপাশি দু'জনে বসেছি। পদ্মার সমস্ত শরীরটা আমার শীরেরর সঙ্গে ঠেকে রয়েছে

বাসের ঝাঁকুনি বৃষ্টি আর এই পাশাপাশি বসা। হঠাৎ পদ্মা যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল। ছোটো মেয়ের চিড়িয়াখানা দেখতে যাওয়ার মতো আনন্দ ওর চোখে-মুখে। বাড়িতে অসুস্থ স্বামী আর পাঁচটি ছেলে-মেয়েকে রেখে এমন উজ্জ্বল হওয়া বুঝি পদ্মার পক্ষেই স্বাভাবিক। সামনে দিয়ে এক-একটা বাস সোঁ-সোঁ শব্দ করে চলে যায়। পদ্মা চমকে উঠে। বলে—'বাসে-বাসে অনেক সময় ধাক্কা লাগে, জানেন ; আজ যদি লাগে বেশ হয়, না?'

কাশীপুরে যখন পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যে হচ্ছে। পদ্মা বললো—'নামুন, এখানে নেমে আসুন।'

পদ্মাকে পাশে নিয়ে চলতে লাগলাম। পদ্মাই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলতে লাগলো। বড়ো রাস্তার পাশে বাঁ-হাতি একটা ছোটো গলির মধ্যে ঢুকেছি। সেই গলি দিয়ে আর একটা গলির ভেতরে এসে পড়লাম। তারপর আর একটা মাঝারি রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে এসে আবার বড়ো রাস্তায় পড়েছি।

বললাম—'আর কতদূরে ?'

'—কাছেই—' বলে পদ্মা চলতে লাগলো।

তারপর অনেক ঘুরে-ঘুরেও যখন আবার সেই প্রথম গলিটার মুখেই এসে পড়লাম তখন যেন কেমন একটা সন্দেহ হলো। বললাম—'ঠিকানটা মনে আছে তো ?'

'—মনে আছে, কিন্তু আজ আর যাবো না, অন্যদিন বরং আসবো'খন। চলুন, ফিরে যাই—' বলে পদ্মা আবার বাস রাস্তার দিকেই পা বাড়ালো।

আবার সেই ফিরতি-বাসে ওঠা। কী হলো পদ্মার।

বাসে উঠে একটা কথাও বললো না। মনে হলো—এ আবার কি কৌতুক আমাকে নিয়ে। বাসটা চৌরঙ্গীর কাছে আসছে। হঠাৎ ধর্মতলার মোড়ে আসতেই পদ্মা উঠলো। বললো—'নামুন শিগগির।'

'—এখানে কোথায় ?'

'—কোনও হোটেল নেই আপনার জানাশোনো, যেখানে রাত্রের

মতো থাকতে পাওয়া যায়, এমন জানাশোনা কোনো হোটেল। কোনো মেয়েকে নিয়ে কখনও রাত কাটাননি কোনও হোটেলে ?'

হঠাৎ একি প্রস্তাব! কেমন যেন হতবাক হয়ে গেলাম। ভাবছিলাম কী উত্তর দেবো। পদ্মার সংসার, ছোটো হলেও তো সংসার। স্বামী সেখানে মদে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাককেও তো স্বামী। একটি নয়, পাঁচটি ছেলে-মেয়ের আকর্ষণ। সব কি ভাসিয়ে দিতে চায় নাকি পদ্মা!

'—সাহসে কুলোচ্ছে না বুঝি? প্রথমেই তো আপনাকে জিগ্যেস করেছিলাম, সাহসে কুলোবে কিনা।'

উজ্জ্বল আলোর নিচে দাঁড়িয়ে আমার মুখের ওপর মুখ রেখে প্রশ্ন করছে পদ্মা। পদ্মার মুখের দিকে চেয়ে তার মনের কথার অর্থোদ্ধার করবার চেষ্টা করলাম। মাথার সামনের কয়েকটা চুলের টুকরো উড়ছে চোখের ভুরুর ওপর। চৌরঙ্গীর রাত বড়ো মায়াবী হয়ে উঠলো।

শেষ পর্যন্ত নিয়ে গেলাম একটা হোটেলে। খাবার দিতে বললাম। নিরিবিলি একটা কোণের টেবিলে বসে দু'জনে একসঙ্গে খাওয়া। পদ্মার দিকে চেয়ে দেখলাম। পদ্মার দু'কূল বেয়ে যেন বর্ষার ঢল নেমেছে। আর বুঝি পদ্মাকে ঠিক রাখা যাবে না। পদ্মা উপচে পড়বে, ভেসে যাবে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে আমাকে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সব কিছু!

যে ঘরখানায় শোবার বন্দোবস্ত হলো তার দক্ষিণ দিক খোলা। শোবার খাটখানা বেশ বড়ো! আরও কতো কি দিয়ে সাজানো, তা কি তখন দেখবার অবসর আছে। ঘরে ঢুকে পদ্মা চারিদিকের আবহাওয়া দেখে যেন মুগ্ধ হয়ে গেছে। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো একবার। শহরের বুঝি শ্রেষ্ঠ বাড়িটার সর্বশ্রেষ্ঠ ঘরের বিলাস আজ পদ্মার আয়ত্তে। পদ্মা নিজের শরীরটা নিয়ে গিয়ে বেঁকে দাঁড়ালো ড্রেসিং আয়নার সামনে। নিজেকে দেখছে পদ্মা, না দেখাচ্ছে? কে জানে। পদ্মা ক্লান্তিতে যেন আচ্ছন্ন হয়ে এলো। সোজা সেখান থেকে উঠে গিয়ে বিছানায় কাত হলো একবার, চোখ দুটো বুজে আসছে নাকি। বললো—'দরজাটা বন্ধ করে দাও তো।'

দুটো হাত মাথার তলায় পেতে চিত্ হয়ে শুয়ে আছে পদ্মা।

বললো—'কাছে এসো, বহুদিন কারো হাঁটুতে মাথা রেখে শুইনি।'

মাথার পাশে গিয়ে বসলাম। পদ্মা বললো—'আজ যদি বাইরে ঝম্-ঝম্ বৃষ্টি হতো তো ভালো হতো, না গো?'

'—কেন?'

'—বাড়ি যাবার কথা মনে আসতো না!' পদ্মা চোখ বুজিয়ে বললো।

'—বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে নাকি?'

'—সব বাড়িই তো বাড়ি নয়, জানো। তোমরাই আমার ঘর ভেঙেছো। এখন তোমরাই আমার স্বামীকে দোষ দাও, বলো লোকটা মাতাল। থাকগে ও-কথা, আজ রাত্তিরটা যদি এখানেই কাটাই তো খারাপ লাগবে না তোমার? অনুতাপ করবে না পরে?'

'—কেন?'

'—না, এমনি জিগ্যেস করছি, অনেক মেয়ের সঙ্গেই বোধহয় এখানে ····হয়তো এই ঘরেই রাত কাটিয়ে গেছো···এমনি শাড়ি অনেককেই কিনে দিয়েছো।'

'—তার মানে?'

'—তার মানে জিগ্যেস করো না, উত্তরটা অপ্রিয় লাগবে তোমার, তার চেয়ে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ো। কিন্তু না, ক'টা বেজেছে বলতো তোমার ঘড়িতে, আটটা?'

পদ্মা স্থির শান্ত হয়ে এলো এক নিমেষে। বললো—'চলো, ফিরেই যাই, তোমাকে এমনি একটু পরীক্ষা করছিলাম।'

হঠাৎ কথাটা বলেই পদ্মা নিমেষে সোজা হয়ে উঠলো। বললো —'সেই ভালো, চলো ফিরেই যাই।'

তারপর যেন স্বগতোক্তি করতে লাগলো—'এখন মোটে রাত আটটা। চলো, আমার স্বামী আমার স্বামীই, আর তুমি তুমিই, তোমরা আমার স্বামীর পায়ের ধুলোর যোগ্যও নও। তোমার বন্ধুর মতো পারবে অমন বেপরোয়া হতে? পারবে আমার সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে সমস্ত রাত····?'

তারপর নিজেই গিয়ে দরজার ছিটকিনি খুললো। বললো—'চলো, ফিরেই যাই, কিছু মনে করো না, তোমায় শুধু একটু পরীক্ষা করছিলাম।'

রাস্তায় চৌরঙ্গীর আলোতে নেমে জিগ্যেস করলাম—'আচ্ছা পদ্মা,

এতক্ষণ শুধু পরীক্ষাই করলে তাহলে, আর কিছু নয়? কিন্তু যদি পরীক্ষাই হয়, তবে কিসের পরীক্ষা বলতে হবে।'

পদ্মা যেন কেমন কৃপাদৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে চাইলো। বললো—'সে যাহোক, তুমি পরীক্ষায় পাসও তো হতে পারোনি—' বলে সেই রাস্তার ভিড়ের মধ্যেই হো-হো করে হেসে উঠলো। সে হাসির আঘাতে কেমন যেন ম্রিয়মাণ হয়ে গেলাম। বললাম—'কেন?'

'—উত্তর শুনতে চাও?' কেমন যেন নিষ্ঠুর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো পদ্মা।

'—হ্যাঁ, শুনতে আমাকে হবেই—' আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম।

পদ্মা বললো—'শুনতে যদি হয়ই, তো শোনো। আমার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখো, আমার এই শাড়ি, সেমিজ, ব্লাউজ হাজার দামী হলেও, হাতে একটা শাঁখাও নেই, গলা আর কানও ফাঁকা, আসল ঘটনা যাই হোক, লোকে তো আমাকে তোমার স্ত্রী বলেই ভাবছে। তা তোমার পাশে আমার এই নিরাভরণ আমি, এতে তো তোমারই অগৌরব। সারা রাস্তা আমাকে নিয়ে তোমার যে বিড়ম্বনার শেষ নেই, তাও তো লক্ষ্য করছি। অস্বীকার করো না, মিথ্যাচার হবে।'

'—এ তোমার ভুল, পদ্মা; লোকের কথার মুখ চেয়ে…'

'—ভুল? এসো, এখনি প্রমাণ করে দিচ্ছি—' বলে সোজা আমার হাত ধরে একেবারে চৌরঙ্গীর রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো পদ্মা। দু'পাশে সোঁ-সোঁ করে মোটর-বাস্ আসছে-যাচ্ছে। সন্ত্রস্ত হয়ে পথ পার হতে হয়। সেই চলমান যন্ত্রের ভিড়ের মধ্যে বেপরোয়া পদ্মা আমাকে নিয়ে গিয়ে ঠিক রাস্তার কেন্দ্রস্থলে দাঁড়ালো। বললো—'লোকের কথার মুখ চেয়ে নাকি তুমি চলো না, কিন্তু এই চৌরঙ্গীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাকে চুমু খাওয়ার সাহস তোমার হবে? প্রমাণ দাও।'

তারপর খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো। মনে হলো চণ্ডীদাস যেন একলাই মদ খায় না, পদ্মাও আজ অপ্রকৃতিস্থ। ফুটপাথে উঠে এসে বললো—'আসলে আমার স্বামীই মানুষ, আর তোমারা লোকলজ্জার ভয়েই মদ খাও না, নইলে… কিন্তু থাকগে, এখনও সময় আছে, চলো! ওরা হয়তো কান্নাকাটি লাগিয়েছে এতক্ষণ।'

মাঝে মাঝে পদ্মার বাড়িতে যাই। চণ্ডীদাস যেন আজকাল ঘন-ঘন বাড়ি আসছে, আজকাল দু'বেলার খাওয়াটা সারে বাড়িতেই।

পদ্মা বললো—'তুমি খাও আপত্তি নেই, কিন্তু বাড়িতে বসে খাও।'

চণ্ডীদাস বাড়িতে বসেই খায়। পদ্মা দোকান থেকে আনিয়ে দেয় মদ। খেতে-খেতে এক সময় জ্ঞান হারায়। তখন আবার ধরে বিছানায় উঠিয়ে দিতে হয়। দুপুরবেলা চণ্ডীদাস যখন অঘোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়, ছেলে-মেয়েদের ঘুম পাড়িয়ে পদ্মা আমার পাশে বসে গল্প করে তখন।

পদ্মা বলছিলো—'আপনার বন্ধু কাল সকালে কী বলছিলো জানেন, বলছিলো আপনাকে একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে।'

'—আমাকে? কেন?'

'—মাতাল হলেও বুঝতে পেরেছে বোধহয়, আপনার টাকাতেই সংসার চলছে, ছেলে-মেয়েদের গায়ে জামা উঠেছে, আমার গায়ে ব্লাউজ। কয়েকদিন মাংসও তো খাইয়েছি। ঠিক সময়ে খাওয়া, ঠিক সময়ে নাওয়া পল্টু ইস্কুলে ভর্তি হলো, বাড়িওয়ালার বাকী ভাড়া শোধ হয়ে গেছে, তাই বোধহয় আপনাকে একদিন নেমন্তন্ন করে খাইয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়।'

পদ্মা তারপর হাসতে-হাসতে বললো—'অবস্থা যে এ-বাড়ির ভালো হয়েছে, তা যেন কাক-পক্ষীতেও জানতে পেরেছে। আগে এ-বাড়িতে উঠোনে কাকের উপদ্রব ছিলো না। তাছাড়া জানেন, আশেপাশের বাড়ির থেকে আজকাল প্রায়ই কেউ সরষের তেল, কেউ নুন, কেউ মশলা ধার চাইতে আসে।'

বললাম—'সে যাকগে। চলো, আজকে সিনেমায় যাই।'

'—সিনেমায়? হঠাৎ?' পদ্মা দেয়ালে হেলান দিয়ে আমার দিকে চাইলো।

বললাম—'এই টিকিট দুটো কিনে এনেছিলাম, ইচ্ছে হলে যেতে পারো। আর না-হয় তো থাক; নষ্ট হবে, এই যা।'

'—তা, দুখানা কিনে আনলেন কেন? ছেলে-মেয়েদের সকলকে নিয়েই একদিন যাই চলুন না। আপনার বন্ধুকেও না-হয় সঙ্গে নেওয়া

যাবে···আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। জানেন, কালকে আপনার বন্ধুকে খাইয়ে-দাইয়ে অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।'

অবাক হলাম একটু। বললাম—'তাই নাকি? তারপর?'

'—অফিসে গেল ও। একটা কৌটোতে করে পরোটা আর বেগুন-ভাজাও দিলাম দুপুরবেলার জন্যে। সমস্তদিন মা-কালীকে ডাকলাম, আগেই রাত থেকে উপোস করেছিলাম, মানত করেছিলাম, যদি অফিস থেকে ভালোয়-ভালোয় ফেরে তো মায়ের পুজো দিয়ে তবে ভাত খাবো।'

কথা বলতে-বলতে পদ্মা উঠলো—'ক'টা বাজে আপনার ঘড়িতে দেখুন তো, চারটে? একটু বসুন, উনুনে আগুনটা দিয়েনি, আপনার চা করে দি, তারপর ওরা সবাই ইস্কুল থেকে অফিস থেকে ফিরবে; একটু জলখাবার করি, আপনি পিঁড়িটা রান্নাঘরের সামনে সরিয়ে আনুন, জলখাবার করতে করতে আপনার সঙ্গে গল্প করবো।'

পদ্মার নৈপুণ্য দেখলে কিন্তু অবাক হতে হয়। এক হাতে কতো সহজে, কতো তাড়াতাড়ি যে সংসারের সব কাজ সারে! কড়ায় লুচি ভাজতে-ভাজতে বললো—'আমার বাবাও ছিলেন মাতাল। মায়ের সারা-জীবনে কী কষ্টটাই না গেছে, তা আমি জানি, সেই থেকেই মাতালদের ওপর আমার ভারী ঘেন্না। মনে-মনে প্রার্থনা করি, ভগবান—মাতাল স্বামী যেন কারো না হয়, এ সংসারে।'

লুচি তরকারি হবার পর চা তৈরি করে নিলো পদ্মা।

দু'কাপ চা নিয়ে রান্নাঘরে শেকল দিয়ে বললো—'চলুন, ঘরে বসে চা খাবো। চেয়ার-টেবিল কিনে দিয়েছেন ছেলে-মেয়েদের পড়ার জন্যে, আর আপনিই একদিন বসলেন না চেয়ারে!'

শোবার ঘরে গিয়ে বসলাম। চেয়ারে বসে মুখোমুখি দু'জনে চা খাচ্ছি।

পদ্মা বললো—'কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন না, ঘরে?'

বললাম—'কই, কিসের পরিবর্তন!'

চারিদিকে চাইতে লাগলাম। কিছুই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নজরে পড়লো না। এক-জোড়া তক্তাপোশ, তারই ওপর বিছানা পাতা। ও তক্তাপোশ তো আমিই কিনে দিয়েছিলাম।

পদ্মার দিকে চাইতে দেখি, পদ্মা হাসছে। হাসিটা খুব নতুন-রকমের লাগলো। স্নিগ্ধ লজ্জা মেশানো হাসি। হাসি থামিয়ে বিছানার দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো পদ্মা। হাসতে-হাসতে বললো—'আপনার বন্ধুর কাণ্ড দেখুন না। ক'দিন থেকে কেবল কী খেয়াল যে হয়েছে, আমাকে ওর পাশে শুতে হবে....ছেলে-মেয়েদের বিছানা পাশে সরিয়ে দিয়েছে। দেখুন, সারারাত গরমে হাত-পা ছড়িয়ে শুতে পারবো না—একজন ধুমসো মানুষের পাশে গরমে কষ্ট হয় না আমার....বলুন, আপনার বন্ধুর যতো বয়েস বাড়ছে, ততো ছেলেমানুষীও যেন...'

কথাটা বলে হাসতে গিয়ে চায়ের কাপ থেকে চলকে শাড়ির ওপর চা পড়ে গেল।

'—আর একটা কথা শুনেছেন, ইতিমধ্যেই পাড়ায় বেশ কানাঘুষো শুরু হয়ে গেছে, আপনাকে নিয়ে—' পদ্মা আমার দিকে চাইলো।

বললাম—'কী-রকম ?'

'—আপনার বন্ধুকে বলছিলাম সেদিন, উনি বললেন, পাড়ার লোকের কথায় কান দিও না।'

জিগ্যেস করলাম—'উত্তরে তুমি কী বললে ?'

'—কিছুই বললাম না, আজো এ-কথা তুলতাম না আপনার কাছে, কিন্তু সেদিনকার কথা মনে আছে আপনার, চৌরঙ্গীতে আমাকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন, আমার কানে গলায় হাতে একটা গয়নাও ছিলো না, পাছে লোকে আমাকে আপনার স্ত্রী ভেবে আপনার আর্থিক অবস্থার সম্বন্ধে ভুল ধারণা করে এই ভেবে আপনার অস্বস্তির সীমা ছিলো না, মনে আছে ?'

আর কথা জমলো না। অফিস থেকে চণ্ডীদাসের আসার সময় হয়ে এলো, চলে এলাম।

নানান কারণে কয়েকদিন যাওয়া হয়নি চণ্ডীদাসের বাড়ি। কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিলো কিছুদিনের জন্যে। সেদিন সকালবেলায় কলকাতায় ফিরেছি। ভোরবেলা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম।

পেছন ফিরতেই দেখি পদ্মা। আমার দিকে চেয়ে-চেয়ে হাসছে। কী একটা উপলক্ষে একটা লালপাড় শাড়ি দিয়েছিলাম পদ্মাকে, সেইটেই পরনে। মাথায় ভিজে চুল এলো করা। ডান হাতে একটা পেতলের ঘটিতে গঙ্গাজল উপচে পড়ছে; আর দু'হাত ভর্তি কাঁচের চুড়ি-শাঁখা। নতুন করে এখনি পরা মনে হলো যেন। শাঁখার গায়ে এখনও টাটকা সিঁদুর আরো তীক্ষ্ণ। যেন চোখ ঠিক্‌রে দেয়।

বললাম—'কোথায় গিয়েছিলে, এদিকে?'

'—মায়ের মন্দিরে পূজো দিতে গিয়েছিলাম, কিন্তু আপনি আর আসেননি যে, আপনার বন্ধু খোঁজ করছিলো ক'দিন।'

'—আর তুমি?'—পদ্মার মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলাম।

পদ্মাও হাসলো। বললো—'আপনার বন্ধু আর আমি আলাদা নাকি?'

'—তা বটে, আলাদা কেন হতে যাবে, আমারই ভুল। বাড়ির সব খবর ভালো? ছেলে-মেয়েরা....'

'—রাস্তায় দাঁড়িয়ে কিছু বলবো না। আপনাকে যেতে হবে, কবে যাবেন বলুন?'

'—সন্ধ্যেবেলা যাবো।'

কিন্তু সন্ধ্যেবেলাও ঠিক যেতে পারলাম না পদ্মার বাড়ি। কাজের তাগিদে এমন আটকে পড়লাম যে, কিছুতেই রাত সাড়ে ন'টার আগে সেখান থেকে উঠতে পারলাম না। পদ্মার বাড়িতে যখন এসে পৌঁচেছি, তখন দশটা বেজে গেছে আমার ঘড়িতে।

আকাশে মেঘ ছিলই, আমি পৌঁছাবার সঙ্গে-সঙ্গে বৃষ্টি নামলো।

দরজা খুলে দিলো পদ্মা। বললো—'এতো রাত্তিরে!'

কানে যেন কেমন খট্‌কা লাগলো। কই, এমন সময়ে কিম্বা এর পরেও তো কতদিন এসেছি, কোনওদিন পদ্মা তো এমন স্বরে এমন প্রশ্ন করেনি! পদ্মার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। রান্না, খাওয়া, খাওয়ানো, বাসন মাজা, সবই হয়ে গেছে। সবাই শুতে গেছে। পদ্মাও কি তবে বিছানায় শুয়ে পড়েছিলো? পান খেয়ে রাঙা করেছে মুখ। হয়তো আমার ডাকেই চণ্ডীদাসের পাশ ছেড়ে উঠে আসতে হয়েছে।

ঝম্‌-ঝম্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে। বারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

আজকালকার বৃষ্টি একবার আসে আবার খানিক পরেই শুকনো।

পদ্মারা কি আজকাল সকাল-সকাল সংসারের কাজ সেরে শুয়ে পড়ে? তবে বুঝি এখন সংসারে সুখ এসেছে। সময়নিষ্ঠা এসেছে। আজকাল সব রাত্রেই তো চণ্ডীদাস বাড়ি থাকে। চণ্ডীদাসের পাশে শোওয়ার ঐশ্বর্যে পদ্মা কি ভারী হচ্ছে দিন-দিন। কেমন যেন মোটা দেখাচ্ছে ওকে এখন—এই রাত দশটার সময়।

পদ্মা আবার বললো—'এতো রাত্রিতে যে, হঠাৎ?'

'—তুমিই তো আসতে বলেছিলে, কাজের জন্যে একটু দেরি হয়ে গেল, তুমি কি শুয়ে পড়েছিলে?'

'—না, শুয়ে পড়বো কেন, সকাল পাঁচটার সময় উঠে যাকে ইস্কুল-অফিসের ভাত দিতে হবে, তাকে এই রাত বারোটা পর্যন্ত জেগে থাকতে হবে বৈকি? রাত ক'টা হলো, খেয়াল আছে?'

'—দশটা পনেরো—' ঘড়ি দেখে বললাম।

পদ্মা যেন ছিট্‌কে উঠলো। বললো—'আপনার তো ঘড়িটা আপনারই মতন, কখনও ঠিক পথে চলবে না।'

'—তার মনে?'

'—তার মানে বলবো? তার মানে কোনও ভদ্রলোক কোনও ভদ্রলোকের বাড়িতে এতো রাত্রে আসে? আপনার ঘড়ি দেখে কতবার ঠকেছি, পরিচয় তো আমাদের আজকের নয়।'

'—আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে কেবলই ঠকেছো বৈকি, পদ্মা!'

'—না, ঠকিনি তো শুধু উপকারই পেয়েছি বলতে চান? বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন একদিন, তারপর এখানে কিসের আকর্ষণে সেদিন মানি-ব্যাগটা ফেলে গিয়েছিলেন শুনি, কিসের আকর্ষণে শাড়ি-জামা কিনে দিয়েছিলেন বন্ধুর স্ত্রীকে, কিসের আকর্ষণে মাসের পর মাস বন্ধুর সংসার চালিয়ে এসেছিলেন শুনি, শুধু বন্ধুর উপকার, না তার সর্বনাশ, কোন্‌টা চেয়েছিলেন? কথা বলছেন না কেন, বলুন কথা, উত্তর দিন।'

স্তম্ভিত হয়ে পদ্মার কথাগুলো শুনতে লাগলাম।

পদ্মা বলতে লাগলো আবার—'এতবড়ো স্পর্ধা আপনার, আপনি কিনা আজ উপকারের খোঁটা দিলেন, এ-সংসারের পেছনে যেন অকারণে টাকা ব্যয় করেছেন, যেন প্রতিদান কিছুই পাননি, তবু বড়ো-গলা করে বলছেন, আমি ঠকিনি। আপনি মিথ্যেবাদী, আপনার মুখ দেখলে পাপ হয় ; আপনি বেরিয়ে যান আমার বাড়ি থেকে, বেরিয়ে যান।'

এ আবার পদ্মার কী রূপ! ঝম্-ঝম্ করে বৃষ্টি হচ্ছে। তবু পদ্মার প্রখর চিৎকার যেন আশেপাশে সকলের কানে পোঁচেছে। হু'চারটে বাড়ির দোতলার জানলা খুলে গেল। চণ্ডীদাসের হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে সে উঠে এসে হাজির হলো। বললো—'কী ব্যাপার ভাই, কী হলো পদ্মা?'

পদ্মা হঠাৎ চণ্ডীদাসকে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। কাঁদতে-কাঁদতে বললো—'তুমি যদি মানুষ হতে তো আমার ভাবনা, তোমার বাড়িতে এসে তোমার স্ত্রীকে বাইরের লোক অপমান করে যায় এতেও তোমার চৈতন্য হয় না! এমন স্বামীও হয় মানুষের'—বলতে-বলতে কথা আর শেষ করতে পারলো না পদ্মা। নিজের আঁচলে মুখ ঢেকে অঝোরে কাঁদতে লাগলো।

বৃষ্টি থেমে আসছিলো। বললাম—'আসি, চণ্ডীদাস।'

চণ্ডীদাসও কোঁচার খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে সঙ্গে-সঙ্গে আসতে লাগলো। বললো—'তুমি কিছু মনে করলে নাকি, পদ্মা ওই রকম, কখন কাকে কী কথা বলতে হয় জানে না, সম্প্রতি মেজাজটা আরো খিটখিটে হয়ে গিয়েছে…'

আমি চুপচাপ চলতে লাগলাম।

'—আর তাছাড়া'—চণ্ডীদাস বলতে আরম্ভ করলো—'তাছাড়া ক'মাস ধরেই ওর শরীরটা খারাপ যাচ্ছে কিনা। তুমি জানো না তো—কাল সকালে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম ওকে, সাত-মাস কিনা এখন, তাই খিটখিটে হয়ে গেছে আরো…আর বলো কেন ভাই, খরচের ওপর খচরান্ত… তবে এই শেষ…এই নাককান মোলা দিলাম।'

দাঁত বার করে হাসতে লাগলো চণ্ডীদাস। যেন ভারী রসিকতার বিষয় পেয়েছে একটা। চণ্ডীদাস আরো কী-সব বকতে লাগলো, কিন্তু সব কথা শেষ হবার আগেই বড়ো রাস্তায় পা বাড়ালাম।

দ্বিচারিণী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

'অ বউ-ঠাইরেন, শোনেন, এইডা কি তেত্রিশ নম্বরের বাড়ি ?'

কোলের ছেলেকে ঘুম পাড়াবার জন্য তার পিঠে চাপড়াবার সঙ্গে-সঙ্গে গুন-গুন করতে-করতে মমতা সদর দরজা পর্যন্ত এসেছিলো, ডাক শুনে বাইরেব দিকে মুখ ফেরালো। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটি বউ তাদের একেবারে দোরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পরনে নীলপেড়ে খাটো শাড়ি। আঁচলে মাথার সবটুকু ঢাকেনি। সিঁথিতে মোটা সিঁদুরের দাগ, কপালে ছোট্ট সুগোল ফোঁটা। দু'হাতে দু'গাছা মোটা-মোটা শাঁখা, আর গাছা-দুই করে কাঁচের চুড়ি। দেখলেই বোঝা যায় নিম্নশ্রেণীর গৃহস্থঘরের বউ। গায়ের রং ময়লা, চেহারাও একটু রোগা বটে। কিন্তু ওরই মধ্যে বেশ একটু লক্ষ্মীশ্রী আছে। নাক চোখ তেমন চোখা চোখা না হলেও মুখের গড়নটুকু ভারী মোলায়েম, কথা বলবার ধরনটুকুও বেশ মিষ্টি।

মমতা একটু এগিয়ে গিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, এ বাড়ির নাম্বার তেত্রিশই। কেন বলো তো ?'

সে কথার জবাব না দিয়ে বউটি আবার জিগ্যেস করলো, 'আর এ বাড়ির কর্তার নাম বুঝি নীরদবরণ মুখুজ্যে ?'

'হ্যাঁ। কেন, তাঁকে দরকার নাকি তোমার ?'

বৌটি এবার ঠোঁট টিপে একটু হাসলো, বললো, 'না, তাঁকে না, তাঁর পরিবারের নামেই চিঠি দিছেন, বউদিদি। আপনার কাছেই পাঠাইয়া দিছেন। এই নেন্ চিঠি।'

নিজের নাম-ঠিকানা লেখা ভাঁজ-করা এক টুকরো কাগজ বউটির কাছ থেকে হাত বাড়িয়ে নিতে-নিতে মমতা আবার একটু মুচকি হাসলো,

'আমিই যে তাঁর 'পরিবার' কি করে বুঝলে? এ-বাড়িতে আরো তো ভাড়াটে আছে।'

বউটি মৃদু হেসে বললো, 'আমারে ভোলায়েন ক্যান্, বউ-ঠাইরেন; আপনারে দেইখাই বোঝতে পারছি আমি, আপনি কেডা।'

মমতা ততক্ষণে চিঠির ভাঁজ খুলে পড়তে শুরু করেছে।

'ভাই মমতা, সেদিন সিনেমা দেখতে গিয়ে তুমি একটি ঝিয়ের কথা বলেছিলে। কিন্তু নতুন কোনো ঝি অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পেলাম না; তোমার অসুবিধের কথা ভেবে আমাদের তরঙ্গকেই শেষ পর্যন্ত পাঠালাম। পুরোপুরি নয়, আধাআধি; মাস-দেড়েক হলো আমাদের বাসায় ও কাজ করছে। কিন্তু এক জায়গায় কাজ করে ওর পোষাবে কেন। আর একটা কাজ ওকে জুটিয়ে দেবার জন্যে ক'দিন ধরেই আমাকে ভারী ধরাধরি করছে। এদিকে তোমারও ঝিয়ের দরকার। ভাবলাম, ভাগ যদি কাউকে দিতেই হয়, তোমাকে দেওয়াই ভালো। তরঙ্গেরও ইচ্ছা, আমাদের জানাশোনা ও 'আমাদের মতো ভদ্রলোকের' বাড়িতেই ও আর একটা কাজ পায়। আমি তাকে বলেছি, 'কেবল আমাদের মতো নয়, আমাদের চেয়েও বেশি ভদ্রলোকের বাসায় পাঠাচ্ছি তোমাকে'। কথাবার্তা বলে ঠিক করে নিয়ো, আমরা বারো টাকা করে দিচ্ছি। বাসন মাজা জল তোলা, বাটনা বাটা, কয়লা ভাঙা—সবই করে। স্বভাব-চরিত্র বেশ ভালো। দু'দিন দেখলেই বুঝতে পারবে। ইতি—অসীমা মৈত্র।'

চিঠি পড়া শেষ করে মমতা উৎফুল্ল স্বরে বললো, 'ও, তাই বলো! অসীমা পাঠিয়েছে তোমাকে? এসো, ভেতরে এসো। কাণ্ড দেখো অসীমার। এখান থেকে এখানে, তার জন্যে আবার মুন্সিয়ানা করে একটা লম্বা চিঠি পাঠিয়েছে! আচ্ছা চিঠিলেখার বাতিক ওর। এসো তরঙ্গ।'

নতুন ঝিকে নিয়ে মমতা বাসার ভিতর ঢুকলো। মনটা ভারী খুশি হয়েছে মমতার। অনেকদিন ধরে ঝিয়ের খোঁজ করছে, কিন্তু পছন্দমতো কিছুতেই মিলছিলো না। এই নিয়ে স্বামী-দেবতার সঙ্গে মমতার ঝগড়া পর্যন্ত হয়ে গেছে। তার ফলে দু'একটি বুড়ি ঝিকে তারা ধরেও এনেছে দু'একবার, কিন্তু তাদের চেহারা আর চাল-চলন দেখেই সঙ্গে-সঙ্গে তাদের

বাতিল করে দিয়েছে মমতা। কী দেমাকের কথাবার্তা! ঝি তো নয়, যেন রাজার ঝি। তাছাড়া, পনেরো-ষোলো টাকার কমে কেউ রাজীও হয়নি। অতো টাকা কি ঝিয়ের পিছনে খরচ করা যায়। সেদিন 'রূপশ্রী' সিনেমায় বন্ধু অসীমার সঙ্গে দেখা। কথায়-কথায় তার কাছে নিজের কষ্টের কথাও বলেছিলো মমতা, ঝি-চাকরের অভাবে দুর্ভোগের সীমা নেই তার। অসীমা তাকে ভরসা দিয়েছিলো, 'আচ্ছা, ঝি তোমাকে যেমন করে পারি, একটা জুটিয়ে দেবো'।

সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতে নিজের বাসার ঝি পাঠিয়ে কথা রেখেছে অসীমা। সত্যি, এমন বন্ধু আর হয় না।

বারান্দায় একটা ছোট্ট মাদুর পেতে তরঙ্গকে বসতে দিলো মমতা।

কিন্তু তরঙ্গের ভারী কুণ্ঠা। সঙ্কোচের সঙ্গে একপাশে বসে বললো, 'অবার মাদুর ক্যান্, বউ-ঠাইরেন; আমাগো বসবার মাদুর লাগে নাকি, মাটিতেই তো বসতে পারতাম।'

মমতা বললো, 'কেন, মেঝেয় বসবে কেন; ভালো হয়ে উঠে বসো। কোথায় থাকো তুমি? কে কে আছে?'

নারকেলডাঙার রেফিউজি ক্যাম্পে থাকে তরঙ্গরা। স্বামী আছে। কিন্তু থাকলে কি হবে, ছ'মাস যাবত শয্যাধরা। রোগ কি আর একটি-দু'টি —হাঁপানি আছে, অম্বলের দোষ আছে। তারা ক্যাম্পে বাবার কাছেই থাকে। ক্যাম্প থেকে রেশন দেয়, বাজার-খরচ দেয়, কিন্তু রোগীর খরচ, ফাই-ফরমাস তো তাতে মেটে না। তাছাড়া, ভবিষ্যতের কথাও ভাবতে হয়। সেই জন্যই তরঙ্গ কাজে বেরিয়েছে। স্বামী কুঞ্জ দাস প্রথমে খুঁত-খুঁত করেছিলো। কিন্তু তরঙ্গ মোটেই আমল দেয়নি; বলেছে, 'তুমি সাইরা ওঠো, রোজগার-পত্তর করো, আমি তখন আর বাইর হবো না। কিন্তু এখন মানের ভয়ে চুপ কইরা বইসা থাকলে চলবো ক্যাম্নে। তোমার দুধটুকু চাই, কমলাডা চাই, বেদানাডা চাই, তা তো আর ক্যাম্পে দিবে না। টাকার দরকার না তার জৈন্য?' কথাগুলো বলে একটু থামলো তরঙ্গ। তারপর সে মমতাকে জিগ্যেস করলো, 'কি বলেন বউ-ঠাইরেন, ঠিক কই নাই?'

মমতা ঘাড় নেড়ে জানালো, 'ঠিক কথাই বলছো, তরঙ্গ।'

তারপর আরো বহু খবর সংগ্রহ করলো মমতা। ফরিদপুর জেলার খড়িসার গাঁয়ে তরঙ্গদের বাড়ি। জাতে তাঁতী, কিন্তু বাপের বাড়ি কি শ্বশুর-বাড়ির কাউকে সে তাঁত বুনতে দেখেনি। বাপের বেনেতির দোকান ছিলো, আর স্বামী হাটে-বাজারে গামছা বিক্রি করতো। কিন্তু রোগে-রোগে শরীর এতো খারাপ হয়ে পড়লো তার যে, গামছার মোট মাথায় করবার শক্তি রইলো না। বসে থাকলে খাওয়াবে কে। এদিকে ধানের মণ বিশ টাকা পঁচিশ টাকা। লোকের মুখে-মুখে খবর গেল, কলকাতা শহরে নাকি গরীব-দুঃখীদের থাকা খাওয়ার সরকারী ব্যবস্থা হয়েছে। সেই ভরসায় পাড়াপড়শীদের সঙ্গে-সঙ্গে তরঙ্গরাও এসে পড়েছে শহরে। কিন্তু পরের পয়সায় বসে-বসে খাওয়া ভালো লাগে না তরঙ্গের। স্বামী একটু সুস্থ হয়ে কাজকর্ম করতে পারলেই সে ক্যাম্প ছেড়ে দেবে। ভদ্রলোকের মতো স্বাধীনভাবে থাকবে আলাদা বাসা করে।

বলতে-বলতে হঠাৎ যেন খেয়াল হলো তরঙ্গের। অপ্রতিভ স্বরে বললো, 'ওমা, গল্পে-গল্পে বেলা তো মাইরা ফেললাম, বউ-ঠাইরেন। আসল কাজের কথা কিছু শোনলাম না! কি-কি করতে হবে, কয়েন। মানুষ কয়জন আপনারা?'

মমতা বললো, 'কাজের জন্যে ভেবো না। অসীমাদের বাসায় যে কাজ, এখানেও তাই। লোকের মধ্যে, যে মুখুজ্যেমশায়ের নাম মুখস্থ করে এসেছিলে সেই ভদ্রলোক, তাঁর ভাই, আমি, আর আমাদের এই দোলন।'

ঘরের মধ্যে দোলনায় ঘুমন্ত ছেলেকে দেখিয়ে দিয়ে মমতা বললো, 'এবার গুণে দেখো তরঙ্গ, ক'জন হলো!'

তরঙ্গ লজ্জিত স্বরে বললো, 'কি যে কয়েন, বউ-ঠাইরেন! মানুষের মানুষ নি আবার গোণে? কাজের সুবিধার জৈন্যই জিজ্ঞাস করছিলাম কথাডা। ভালো কথা, আগে আপনাগো বাসায় কাজ করবো, না ওনাগো বাসায় কাজ সাইরা তারপর আসবো আপনাগো এখানে?'

মমতা বললো, 'তোমার যেমন সুবিধে হবে, তেমনি করো।' তারপর একটু হেসে বললো, 'অসীমারা পুরোনো মনিব। তাদের কাজই তো আগে করা ভালো।'

তরঙ্গ বললো, 'না, বউ-ঠাইরেন ; তানারা তেমন মানুষ না। আমি নিজের ইচ্ছামতো যাই-আসি, কাজকর্ম করি, কেউ কোনো কথা কয়েন না। দাদাবাবুর মতো এমন মানুষ আর হয় না। একেবারে মাটির মানুষ। আর দিদিমণি, কলেজে পড়লে হবে কি, কোনো দেমাক নাই, অহংকার নাই—'

মমতা বললো, 'দিদিমণি, সুধাংশুবাবুর পিসতুতো বোন ইলা বুঝি?'

তরঙ্গ বললো, 'হ, তিনিই, বউ-ঠাইরেন। ভারী সাদাসিধা, মেজাজও খুব ঠাণ্ডা। এদিকে ফুর্তিও আছে। প্রথম যেদিন কাজ আরম্ভ করি, ঠিক আপনার মতই নামধাম, কে আছে না আছে—সব খুঁইটা-খুঁইটা জিজ্ঞাস করলেন। নাম শুইনা বললেন, ভারী চমৎকার নাম। আমি লজ্জায় মরি।'

মমতাও হাসলো, 'সত্যি, তোমার নামটি বেশ সুন্দর। তরঙ্গ না হয়ে ক্ষেন্তী, পাঁচী, যশোদা, মানদা হলেই হয়েছিলো আর কি। তাহলে নাম বদলে রাখতাম, সহজে ছাড়তাম না। নামের ব্যাপারে আমার ভারী খুঁতখুঁতি, তরঙ্গ। ছেলের নাম তিনবার বদলেছি। হ্যাঁ, ইলা খুব ফুর্তিবাজ মেয়ে বটে। আমার ঠাকুরপোও তাই। মেজাজটা অমনিতে ভারী কড়া। কিন্তু হাসি-ঠাট্টা আমোদ-ফুর্তির বেলায় যেন আর এক মানুষ।'

পরদিন থেকে মমতাদের বাসায়ও কাজ শুরু করলো তরঙ্গ। বাথরুম আর মমতাদের রান্নাঘর একেবারে পাশাপাশি, জল তোলায় তেমন কোনো কষ্ট নেই। খুব বেশি বাসনপত্র ব্যবহার করে না মমতারা। এদিক থেকেও ভারী বিবেচনা তাদের। কিন্তু সবচেয়ে বেশি বিবেচনা তরঙ্গের নিজের। কাজে কোনো রকম গাফিলতি নেই তার। নিখুঁতভাবে কাজ করে। তার কাজ, তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখে কেবল মমতা নয়, নীরদ-নির্মল দু'ভাইও খুব খুশি। এমন ঝি আর হয় না। তরঙ্গ কেবল বাইরের কাজই করে না, অবসর পেলেই ঘরের ভিতর ঢুকে তাকগুলো গুছিয়ে রাখে। ঝেড়েপুঁছে পরিষ্কার করে দু'খানা ঘরের মেঝে। দেয়ালের কোথাও একটু মাকড়সার জাল জমবার জো নেই, তরঙ্গের চোখে পড়লেই নারকেলের সলা দিয়ে সে তা ফেলে দেবে।

মমতা একদিন বললো, 'দূর থেকে দেখলে তোমাকেই কিন্তু ঘরের বউ বলে মনে হয়। যেন নিজের ঘরই সাজাচ্ছো-গোচাচ্ছো।'

তরঙ্গ লজ্জিত হয়ে জবাব দিলো, 'কি যে কয়েন, বউ-ঠাইরেন! কাজেরে ডরাইলে, পরের কাজ ভাবলে কি আর কাজ কইরা সুখ পাওন যায়। সব কাজই নিজের কাজ মনে কইরা করলে কাজে আর কোনা কষ্ট থাকে না, বউ-ঠাইরেন।'

নির্মল পাশের ঘর থেকে বলে উঠলো, 'শোনো বউদি, শুনে শেখো। বছর ছ'সাত বিয়ে হয়েছে তোমার। এতদিনেও শ্বশুর-বাড়িকে নিজের বাড়ি বলে ভাবতে শিখলে না, অফিস-বাড়ির মতো দায়-সারা কাজ করো। আর তরঙ্গ দু'দিনেই কেমন—'

মমতা হাসি চেপে জবাব দিলো, 'আচ্ছা-আচ্ছা, কলেজে-পড়া পাশ-করা বউ এসে কেমন কাজকর্ম করে, দেখবো তখন—।'

তরঙ্গ ফিস্-ফিস্ করে বলে, 'ও বাসার ইলা দিদিমণির সঙ্গে কিন্তু আমাগো ছোটদাদাবাবুরে চমৎকার মানায়! কলেজে পড়লে হবে কি, কোনো দেমাক-টেমাক কিছু নাই তার।'

মমতা হাসে, 'আমার কাছে কেন, যাও, ওই ছোট্‌দাদাবাবুর কাছে গিয়েই বলে এসো কথাটা।'

তরঙ্গও হাসে, কিছু উত্তর দেয় না আর।

সপ্তাহখানেক বাদে অসীমা জিগ্যেস করলো, 'ও তরঙ্গ, নতুন মনিব-বাড়ির কাজকর্ম কেমন লাগছে, কেমন লোক তারা, বললে না তো?'

লজিকের পাতা ওলটাতে-ওলটাতে অসীমার ননদ ইলা জবাব দিলো, 'না, বলে না আবার! আমাদের তরঙ্গ ও-বাসার প্রশংসায় দিন-রাত একেবারে পঞ্চমুখ।'

তরঙ্গ বললো, 'মিথ্যা তো কই না, বউদি। ও-বাসার বউ-ঠাইরেন সৈত্যই ভারী চমৎকার মানুষ, একেবারে আপনজনের মতো ব্যবহার। আর দাদাবাবুরাও খুব সু-নজরে দেখেন আমারে। ছোটো দাদাবাবু তো সেদিন চা পর্যন্ত খাইলেন আমার হাতের। বললেন কি, আমরা জাত-বিচার মানি না তরঙ্গ, চা ক্যান্ তোমার হাতের ভাতও খাইতে পারি। ভারী ফুর্তিবাজ মানুষ। ঠিক আমাগো দিদিমণির মতো। চমৎকার মানায় দুইজনরে।'

মুখ লাল করে ইলা উঠে গিয়ে লজিক নিয়ে বসলো। অসীম হাসতে

লাগলো মুচকে-মুচকে। প্রস্তাবটা একেবারে অসম্ভব নয়। মমতারা রাঢ়ী আর অসীমারা বারেন্দ্র। আজকাল তাতে বিয়ে আটকায় না। তাছাড়া মমতার দেবর নির্মল টেলিগ্রাফ অফিসে ভালো চাকরি করে। অসীমা ভাবলো, পিসি-শাশুড়ির কাছে একবার লিখবে কথাটা।

কিন্তু কেবল ছোট্‌দাদাবাবুর প্রশংসাই নয়, মমতারও খুব সুখ্যাতি করলো তরঙ্গ। গায়ের ব্লাউসটা ছিঁড়ে গেছে দেখে মমতা তাকে নিজের গায়ের একটা ব্লাউস দিয়েছে সেদিন।

অসীমা কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এলো, 'কই, দেখি-দেখি—'

মমতার দেওয়া ব্লাউসটাই গায়ে দিয়ে এসেছে তরঙ্গ। ইলা আর অসীমা দু'জনেই লক্ষ্য করে দেখলো, সত্যি, প্রায় নতুন একটা ব্লাউসই তরঙ্গকে দিয়েছে মমতা। হাতা আর গলার কাছে এমব্রয়ডারির সূক্ষ্ম কাজ-করা সুন্দর একটি ব্লাউস, এমন জিনিস সত্যিই বাড়ির ঝিকে কেউ সাধারণত দেয় না।

ইলা আর অসীমা দু'জনে পরস্পরের চোখের দিকে একবার তাকালো।

তারপর দিন-তিনেক বাদে অসীমা চওড়া-পেড়ে খয়েরী রঙের পুরোনো একখানা তাঁতের শাড়ি দিলো তরঙ্গকে।

তরঙ্গ বিস্মিত হয়ে বললো, 'একি বউদি, শাড়ি আবার ছান ক্যান্‌, আমারে? শাড়ি দিয়া কি করুম আমি?

অসীমা বললো, 'করবে আবার কি, পরবে। তোমার ওই খাটো ময়লা শাড়ির সঙ্গে তো অমন সুন্দর ব্লাউস মানায় না। এই শাড়িখানা ওই সঙ্গে পরবে, বেশ মানাবে।'

শাড়ি দেখে লোভ যে একটু তরঙ্গের না হলো তা নয়, কিন্তু কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বললো, 'না না, বউদিদি, এ-রকম শাড়ি পরবার মতো মানুষ নাকি আমরা!'

অসীমা একটু ধমকের সুরে বললো, 'আহা, নাও না। অমন ফ্যাশান-ওয়ালা ব্লাউস পরতে পারলে, আর শাড়ি পরতে পারবে না?'

শেষে বললো, 'না নিলে আমি কিন্তু অসন্তুষ্ট হবো, তরঙ্গ।'

তরঙ্গ বললো, 'তাইলে ছান্।'

পরদিন নিজের দেওয়া শাড়িখানা তরঙ্গের পরনে না-দেখে অসীমা আবার একটু বিরক্তি প্রকাশ করলো, 'শাড়িখানা কি করলে, তরঙ্গ?'

'তুইলা রাখছি, বউদিদি। ভালো শাড়ি। এক জায়গায় যাওনের-আসনের কালে পইরা বাইরন যায়।'

ইলা বললো, 'আচ্ছা, তেমন শাড়ি তোমাকে আমি আর একখানা বরং দেবো। কিন্তু ওই নোংরা খাটো শাড়িটা তুমি আর পরে বেরিয়ো না, তরঙ্গ। বড়ো বিশ্রী লাগে চোখে। তার চেয়ে বউদির দেওয়া শাড়িটাই পরো। বেশ মানাবে তোমাকে।'

তরঙ্গ অগত্যা বললো, 'আইচ্ছা।'

পরদিন তরঙ্গের পরনে খয়েরী রঙের শাড়ি দেখে মমতা একটু অবাক হয়ে গেল, 'ব্যাপার কি, শাড়ি কিনলে নাকি, তরঙ্গ?'

তরঙ্গ মাথা নেড়ে বললো, 'কি যে কয়েন, বউ-ঠাইরেন। এমন ভালো শাড়ি কেনার সাইধ্য আছে নাকি আমাগো। ও-বাসার বউদিদি দিছেন। আমি নিবো না কিছুতেই। পুরা ছুই মাস হয় নাই কাজে ঢুকছি, এইর মধ্যেই কি আস্ত একখান শাড়ি নেওয়া যায়, আপনিই কন্? কিন্তু বউদিদি কিছুতেই ছাড়লেন না। কি বললেন, জানেন? না নিলে রাগ করবো। শোনেন কথা! বলবো কি বউ-ঠাইরেন, একেবারে দেব্‌তার মতো মন তানাদের। এমন মানুষ আর হয় না।'

মমতা গম্ভীর হয়ে বললো, 'হুঁ।' তারপর তরঙ্গের পরনের শাড়িখানির এক দিকের আঁচল ধরে একটু পরীক্ষা করে বললো, 'সাবধানে পরবে তরঙ্গ, পুরোনো শাড়ি কিনা, ছু'তিন ধোপের বেশি টিঁকবে বলে মনে হয় না। আচ্ছা, সামনের মাসে তোমাকে আমি নতুন একখানা শাড়ি কিনে দেবো। রংচঙে নয়, কিন্তু বেশ শক্ত ভালো জমিনের, পরে কাজকর্ম করতে সুবিধে হবে।'

তরঙ্গ বাধা দিয়ে বললো, 'না বউ-ঠাইরেন, আর শাড়ির দরকার নাই আমার, দিদিমণিও আমারে একখান দেবেন কইছেন। এতো শাড়ি দিয়া কি করুম আমি?'

মমতা আরো গম্ভীরভাবে বললো, 'হুঁ।'

তারপর দিন-চার-পাঁচ বাদে মমতা হঠাৎ একদিন প্রস্তাব করে বসলো, 'হ্যাঁ তরঙ্গ, কাল বেলা গোটা-দু'য়ের সময় আসতে পারো একবার? স'দুটোতে এলেও হবে।'

তরঙ্গ বললো, 'ক্যান্, বউ-ঠাইরেন?'

মমতা বললো, 'দরকার আছে। সিনেমায় যাবো একটু, তুমি দোলনকে কোলে নিয়ে সঙ্গে যাবে। সিনেমা দেখেছো কোনদিন? ছবিতে কথা বলে।'

তরঙ্গ বললো, 'না, বউ-ঠাইরেন। কোনদিন দেখি নাই। কিন্তু যাবো ক্যাম্নে কন্ তো। বউদিদির কাজ-কর্ম আছে, আপনাগোও তো জল তোলতে হবে, বাসন মাজতে হবে বিকালে।'

মমতা বললো, 'সে একবেলার ব্যবস্থা যেভাবে পারি করে নেবো।'

তরঙ্গ বললো, 'কিন্তু ও-বাসার বউদিদির যে কষ্ট হবে?'

মমতা ঠোঁঠ বাঁকিয়ে বললো, 'ভারী তো কষ্ট। একবেলা দু'বালতি জল তুলে নিতে পারবে না, ননদ-ভাজে? এতই বড়লোক নাকি তারা?'

তারপর সুর পাল্টে মমতা মিষ্টি হেসে বললো, 'ভেবো না, তোমাকে তো খুব ভালোবাসে তারা। তুমি একটু বুঝিয়ে বললেই একবেলার জন্যে তারা তোমাকে নিশ্চয়ই ছুটি দেবে। তোমারো তো সাধ-আহ্লাদ আছে, একটু দেখতে-শুনতে ইচ্ছে করে? বুঝিয়ে বলবে, তাহলেই ছেড়ে দেবে। আমার নাম করে বলবে, কোনো আপত্তি করবে না।'

তরঙ্গ তবু আমতা-আমতা করতে লাগলো, 'না বউ-ঠাইরেন। আমার কেমন জানি লজ্জা-লজ্জা করে। অসুখ না, বিসুখ না; মিছামিছি কাজে কামাই করবো—'

মমতা অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে বললো, 'একদিন বইতো নয়, তাতে আর কি হবে। আমার দরকার বলেই বলছিলাম। এদিকে তোমারো একটা নতুন জিনিস দেখা হয়ে যেতো।'

তরঙ্গ বললো, 'আইচ্ছা, বইলা দেখি ও-বাসার বউদিদিরে।'

তরঙ্গ গিয়ে প্রস্তাবটা পাড়লো।

প্রস্তাবটা একটু অদ্ভুতই, তবু নানা-দিক ভেবে-চিন্তে অসীমা শেষ পর্যন্ত রাজী হলো। রাজী না-হলে অনুদার মানুষ বলে প্রমাণিত হতে হয়, মমতার কাছে। তাছাড়া, ছ'মাস ধরে কাজ করছে তরঙ্গ, এর মধ্যে বৃষ্টি-বাদল, অসুখ-বিসুখের অজুহাতে একটা বেলাও কামাই করেনি। একটা বেলার ছুটি মঞ্জুর করে দাক্ষিণ্য দেখাতে না পারলে, তার কাছেও মান থাকে না। অসীমা ভেবে দেখলো, ঠিকে ঝিকে নিয়ে বড়লোকিয়ানা করে সিনেমা দেখতে চললেও এতে ছোটো হতে হবে মমতাকেই। কারণ, একবেলা ছুটির জন্যে হাত পাততে হলো তো অসীমার কাছেই। অসীমা দয়া করে ছুটি মঞ্জুর করলো বলেই তো ঝিয়ের কোলে ছেলে আর হাতে ফীডিং বোতল তুলে দিয়ে সেজেগুজে মমতা সিনেমায় যেতে পারলো। এ তো কেবল দেখা নয়, দেখানও।

তরঙ্গ সে-বেলাও ঠিক কামাই করলো না। সন্ধ্যার সময় এসে উপস্থিত হলো অসীমাদের বাসায়। মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল!

অসীমা কয়লা ভাঙতে আরম্ভ করেছিলো, তরঙ্গ তার হাত থেকে কাজ কেড়ে নিয়ে বললো, 'ওকি, বউদিদি। আপনে আবার কয়লা ভাঙা ধরলেন ক্যান্। ছান্, আমারে ছান্।'

তরঙ্গ যে আজ আসবে, অসীমা আশা করেনি, একটু খুশি হয়ে বললো, 'দেখলে সিনেমা?'

তরঙ্গ উল্লসিত হয়ে উঠলো, 'দেখলাম, তাজ্জব জিনিস, বউদিদি। ছবিতে কথা কয়, গান গায়। আহাহা, সেকি গান! তারপর দিদিমণির মতো বয়সী একজন সুন্দরী অবিয়াত মাইয়ার সঙ্গে—' তরঙ্গ মুখ টিপে একটু হাসলো, 'আর পুরুষ মানুষটা ঠিক আমাগো ও-বাসার ছোট্‌দাদাবাবুর মতো। তারপর দুইজনে মিলা হাত ধরাধরি কইরা—'

ইলা কৃত্রিম ধমকের সুরে বললো, 'আঃ, থামো, তরঙ্গ।'

কিন্তু তরঙ্গ থামলো না, সিনেমা-পর্বের আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়ে ছাড়লো। মুখুজ্যেদের বাসার বউ-ঠাক্‌রুণের মতো মানুষ হয় না, একেবারে দেবতার মতো মন। আর রূপ ঠিক অবিকল লক্ষ্মীঠাকরুণের মতো। বেরুবার আগে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজ-সজ্জা

করেছে মমতা। কেবল নিজেই সাজেনি, তরঙ্গকেও সাজিয়েছে। হাল-ফ্যাশানের শাড়ি পরবার ধরন শিখিয়ে দিয়েছে, উঁচু খোঁপাটাকে আর একটু নামিয়ে দিয়েছে নিজের হাতে। পুরোনো এক-জোড়া স্যাণ্ডাল ছিলো মমতার, তরঙ্গকে দিয়েছে পরতে। লজ্জায় আর বাঁচে না তরঙ্গ। কোনদিন কি জুতো পায়ে হেঁটেছে যে, আজ হাঁটবে! পায়ে পা জড়িয়ে যায়। মনে হয়, এই বুঝি হোঁচট খাবে। কিন্তু হোঁচট ঠিক খায়নি তরঙ্গ। বউ-ঠাকরুণের স্যাণ্ডাল পায়ে দিয়ে হাঁটতে তার ভালোই লেগেছিলো। বেশ আরাম আছে জুতো পায়ে হাঁটতে। তারপর গদি-আঁটা চেয়ারে একেবারে মমতার পাশে বসে সে সিনেমা দেখেছে। এমন কি কেউ কাউকে বসায়? বাড়ির ঝিকে কেউ এতো সমাদর করে? মাঝখানে দু'গ্লাস সরবৎ নিয়েছে মমতা। আপত্তি সত্ত্বেও তরঙ্গকে খাইয়েছে। সাধারণ নয়, বেশ দামী সরবৎ। তেমন জিনিস তরঙ্গ জীবনেও কোনদিন খায়নি। মুখে যেন এখনো স্বাদ লেগে রয়েছে। সরবতের পর পান, চমৎকার সব মশলা দেওয়া। সে পানের স্বাদই আলাদা। স্যাণ্ডাল-জোড়া মমতা ফিরিয়ে নেয়নি, তরঙ্গকে দিয়ে দিয়েছে। বলেছে, কোনো জায়গায় যেতে-আসতে হলে পায়ে দিয়ে বেরুতে পারবে।

বউদিদির মতো মানুষ আর হয় না।

অসীমা সব শুনলো, তবে বন্ধুর মহত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কোনো মন্তব্য করলো না। সায়ও দিলো না, প্রতিবাদও করলো না।

কাজ সেরে সন্ধ্যার পর ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার সময় মানদা আর ক্ষ্যান্তমণির সঙ্গে দেখা হলো তরঙ্গের। তারাও ঝি-গিরি করে। অসীমাদের বাসার কাজ মানদাই তাকে করে দিয়েছিলো।

মানদা বললো, 'কি লো, এতো রাত করে ফিরছিস যে, খুব খাটাচ্ছে বুঝি!'

তরঙ্গ জবাব দিলো, 'আমারে আবার খাটাবে কেডা রে! আমি নিজে ইচ্ছায় খাটি। এইতো, এক বউ-ঠাইরেন আজ সিনেমা দেখাইয়া আনছেন, আর এক বউদিদি সেদিন শাড়ি দিলেন একখানা, ঝির মতো কোথাও কাজ করি নাকি আমি? যতক্ষণ থাকি, বাড়ির মাইন্‌ষের মতো থাকি, বউ-ঠাইরেনরা এক্কেবারে আসল-ননদের মতো ছ্যাখেন অমারে।'

ক্যান্তমণি মিশি-দেওয়া দাঁতে হাসলো, 'আ মরণ, কথা শোন্ আমাদের তরুঙ্গির। এ-সব হলো ওদের খাটিয়ে মারবার কায়দা। এখনো আপন বুঝে চলতে শেখ, ফাঁকি দিতে শেখ, নইলে খেটে-খেটে মুখে রক্ত উঠে মরে যাবি, আবাগী।'

এ-সব কথা ক্ষ্যান্তরা আগেও তরঙ্গকে অনেকবার বলেছে। কিন্তু তরঙ্গ মোটেই কানে তোলেনি, এরা যা বলে বলুক। তরঙ্গ তাদের মতো পেশাদার ঝি নয়। সে গৃহস্থঘরের বউ, অভাবে পড়ে ভদ্র গৃহস্থবাড়িতে কাজ নিয়েছে। তাঁরাও কেউ তাকে ঝিয়ের মতো দেখেন না, বাড়ির লোকের মতই আদর-যত্ন করেন। দুই বাসাতেই তরঙ্গের খাতির। এমন সমাদর সম্মান কোনো ঝি কোনো বাড়িতে পায় না।

কেবল সম-ব্যবসায়িনী ঝিদের কাছেই নয়, ক্যাম্পে ফিরে এসে রুগ্ন স্বামী আর বৃদ্ধা শাশুড়ির কাছেও তরঙ্গ দুই মনিব-বাড়ির গল্প করে। বউ-ঠাকরুণ আর বউদিদি রূপে-গুণে একজন লক্ষ্মী আর একজন সরস্বতী।

কুঞ্জ বিছানায় শুয়ে কমলালেবুর কোয়া ছাড়াতে-ছাড়াতে রোগ-শীর্ণ মুখে হাসে, 'আর তুমি একজনের পেঁচা আর একজনের হাঁস?'

কিন্তু মুখে যতো তামাশাই করুক, স্ত্রীর গুণে কুঞ্জ মুগ্ধ। এমন লক্ষ্মী বউ আর হয় না। দু'জায়গায় কাজ করে দুই মনিবের মন রক্ষা করে তরঙ্গ তাকে রুটি, মাখন, বেদানা, কমলালেবু এনে খাওয়ায়। এদিকে সুখ্যাতিও পায় দুই মনিবের বাসায়। ক্যাম্পের আরো কতো বউ-ঝিই তো বাবুদের বাসায়-বাসায় ঝি-গিরি করে, কতো-জনের নামে কতো অভিযোগ, কতো খিচ-খিচ! কেউ কাজে গাফিলাতি করে, কারও হাত-টানের দোষ আছে, বাসার সোমত্ত ছেলেদের সঙ্গে কেউবা ফষ্টি-নষ্টি করবার দোষে ধমক খায়, কতো কেচ্ছা কেলেঙ্কারি। শুয়ে থাকলেও সবই কানে যায় কুঞ্জ দাসের। কিন্তু তার স্ত্রী তরঙ্গবালার নামে কেউ কোনদিন কোনো নালিশ করতে আসেনি। কাজে কামাই করেছে বলে ছুটে আসেনি কোনো বাড়ির বুড়োকর্তা কি কোনো ছোকরা বাবু, অকারণে কিংবা তুচ্ছ কোনো কাজের অছিলায় খোঁজ নিতে আসেনি তরঙ্গের। ক্যাম্পের সবাই তরঙ্গের মনিব-ভাগ্যের প্রশংসা করে, আর কুঞ্জ দাসের স্ত্রী-ভাগ্যের।

সিনেমা দেখে আসার পরদিন, যতো সকালে সাধারণত ওঠে তার চেয়েও বেশি ভোরে উঠে হরমোহন ঘোষ লেনে অসীমাদের বাসায় কাজ করতে এলো তরঙ্গ। জল তুললো, বাসন মাজলো, ঘর ঝাঁট দিয়ে উনুন ধরিয়ে দিলো। তারপর বললো, 'আমি এবার চললাম, বউদিদি।'

অসীমা বললো, 'সে কি কথা, তরঙ্গ! এখনো তো সাতটা বাজেনি। আমার এই মাছটা একটু কুটে দিয়ে যাও।'

তরঙ্গ বললো, 'ও-বাসায় আবার ভাড়াটে বেশি কিনা, একটা কল-চৌবাচ্চা। সকাল-সকাল গিয়া জল তুইলা না দিয়া আসলে ভারী অসুবিধা হয়, বউ-ঠাইরেনের।'

অসীমা হাসি মুখেই বললো, 'সুবিধে-অসুবিধে তো সবারই দেখতে হয়, তরঙ্গ। তাছাড়া, অন্যদিন তো বলি না, আজ তোমার দাদাবাবুর দু'জন বন্ধুকে খেতে বলা হয়েছে, তাই একটু কাজকর্ম বেশি। কাল কয়লা ভাঙতে গিয়ে হাতে ফোসকা পড়েছে, নইলে আমিই কুটতাম মাছটা। তাছাড়া, তোমরা মাছের দেশের মানুষ। বড়ো মাছ-টাছ কুটতে ভালোবাসো, জানোও ভালো। তাই ভাবলাম—'

সুধাংশু গালে সাবন মেখে আয়নার সামনে দাড়ি কামাচ্ছিলো, বললো, 'হ্যাঁ, তরঙ্গ; তুমিই কুটে দিয়ে যাও মাছটা, এতবড়ো পোনা, তোমার বউদি দিশে পাবে না। নষ্ট করে ফেলবে।' তারপর স্ত্রী আর বোনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললো, 'মাছ তোমাদের চাইতে আমাদের তরঙ্গ কোটে ভালো। সেদিন চেতল মাছ কোটবার ধরন দেখেই বুঝতে পেরেছি। কোটা খারাপ হলে মাছের অর্ধেক স্বাদ চলে যায়। কেবল লেখা-পড়া শিখলেই হয় না, মাছ-কোটা একটা আলদা আর্ট। তরঙ্গ ছাড়া এতো দামী মাছ আমি ভরসা করে আর কারো হাতে দিতে পারিনে।'

অসীমা বললো, 'ওই শোনো, শুনলে তো?'

প্রশংসায় খুশি হয়ে তরঙ্গ মাছ কুটতে বসলো। কুটতে ধুতে প্রায় ঘণ্টা-খানেক লেগে গেলো। তারপর সুধাংশুর অনুরোধে নুন মসলায় মেখেও দিতে হলো মাছ। তাতেও গেল খানিকক্ষণ।

প্যারীমোহন সুর লেনে মমতাদের বাসায় এসে যখন পৌঁছালো তরঙ্গ

তখন বেলা সাড়ে সাতটা। তার আগেই মমতাদের জল তোলা দরকার, এখন অন্য ভাড়াটেদের বউরা কল-ঘরে গিয়ে ঢুকেছে।

মমতা বললো, 'আজ এতো দেরি করলে যে, তরঙ্গ? জানো তো, সকালে না এলে জল তোলার কতো অসুবিধে। পাঁচজনের বাড়ি—'

তরঙ্গ বললো, 'ও-বাসায় আবার দাদাবাবুর দু'জন বন্ধু খাবেন কিনা। তাই মাছ-টাছ কুটে আসতে হইলো।'

মমতা বললো, 'হুঁ, তুমি ওদিকে মাছ কোটো, আর এদিকে জল টেনে-টেনে আমার হাত ব্যথা হোক! কেবল একজনের সুখ-সুবিধে দেখলেই তো চলে না, তরঙ্গ; সকলের সুবিধে-অসুবিধেই দেখতে হয়।'

এতটুকু কড়া কথাও কোনদিন শোনেনি তরঙ্গ, একটু চুপ করে থেকে বললো, 'আইচ্ছা বউ-ঠাইরেন, আমি বাইরের থিকা জল আইনা দিমু আপনারে।'

রাস্তার কল থেকে দু'বলতি জল এনে দিয়ে মমতাকে খুশি করে তরঙ্গ বাসায় ফিরলো।

বিকেল বেলায় মমতাদের বাসায় আগে কাজে আসে তরঙ্গ। আজও তিনটে বাজতে না-বাজাতে এসে উপস্থিত হলো। কিন্তু অন্যদিন যেমন সাড়ে চারটের সময় যায়, আজ তা যেতে পারলো না। জল তোলা, কয়লা ভাঙা, বাসন মাজা সব শেষ হলেও মমতা হঠাৎ মিষ্টি হেসে বললো, 'ও তরঙ্গ, চললে নাকি? শোনো।'

'কি, বউ-ঠাইরেন?'

মমতা বললো, 'দাঁড়াও একটু। তোমার দাদবাবুর পাশ-বালিশটা কেমন ছিঁড়ে গেছে দেখো। কাল সারা বিছানাময় তুলোয় একেবারে মাখামাখি। গোটা-দুই ফোঁড় দিয়ে ঠিক করে দিয়ে যাও না—'

রবিবার। নীরদ বিছানায় আড় হয়ে শুয়ে হাতের তেলোর উপর মাথা রেখে কি-একটা নভেল পড়ছিলো, তরঙ্গের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললো, 'কাল সারারাত ঘুমোতে পারিনি, তরঙ্গ। গায়ে তুলো। একেবারে তুলোময় হয়ে ছিলাম আর কি। বালিশটা তুমি যদি একটু ঠিক করে না দিয়ে যাও, আজও সেই দশা হবে। তোমার বউদির ভরসায়

থাকলে এ জন্মেও বালিশটা আর ঠিক হবে না। তুমিই যা-হয় ব্যবস্থা করে দিয়ে যাও।'

এ-সব ছোটোখাটো বাড়তি কাজ নিজেই যেচে নিয়েছিলো তরঙ্গ। দাদাবাবুরা তো শুধু মাইনে দেন না, মাইনে ছাড়াও উপরি হিসাবে শাড়ি দেন, সায়া ব্লাউস দেন, সিনেমা দেখান, বাসায় ভালো জিনিস-টিনিস কিছু এলে তরঙ্গের রুগ্ন স্বামীকে তার ভাগ না দিয়ে খান না। বাড়তি একটু-আধটু কাজ না করে দিতে পারলে নিজেরই কেমন-কেমন লাগে। লজ্জা-লজ্জা করে। তাই বিছানা ঝাড়া, বালিশ রোদে দেওয়া এ-সব ছোটো-খাটো কাজও তরঙ্গ নিজের হাতে নিয়েছিলো।

দাদাবাবু যখন অমন করে বললেন, তখন বালিশটা নিয়ে বসতেই হলো তরঙ্গকে। বালিশের কিছু ছিলো না, আর একটা বালিশ ভেঙে খানিকটা তুলো বার করতে হলো। তারপর দুটো বালিশ ঠিক করে মুখ সেলাই করতে-করতে অনেক সময় লেগে গেল তরঙ্গের।

সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আসীমাদের বাসায় গিয়ে হাজির হতেই অসীমা মুখ ভার করে বললো, 'ব্যাপার কি, আজও কি তুমি সিনেমায় গিয়েছিলে নাকি, তরঙ্গ?'

'না বউদিদ, ও-বাসায় দাদাবাবুর কোল-বালিশটা ঠিক কইরা দিয়া আসলাম! কি ছিরিই কইরা রাখছিলেন বালিশের!'

অসীমা বললো, 'হুঁ, তা তো করবেই, এদিকে জল চলে যায় আমার, উনুনে আঁচ ওঠে না। তুমি যদি রোজই এমন করো, তরঙ্গ—'

তরঙ্গ লজ্জিত হয়ে বললো, 'না বউদিদি, আর এমুন হবে না। আইজই একটু দেরি হইয়া গেল—'

সন্ধ্যার পরও ঘণ্টাখানেক কাজ করতে হলো তরঙ্গকে। কয়লা ভাঙতে হলো, জল টানতে হলো আজ বেশি। তবু যেন অসীমার মুখখানি ভার-ভারই রইলো।

কেবল একদিন নয়, তারপর থেকে রোজই এমন হতে লাগলো। সকাল বেলায় অসীমার রোজই প্রায় কাজ বেশি থাকে। প্যারীমোহন সুর লেনে পৌঁছাতে রোজই দেরি হয় তরঙ্গের। জল তোলা নিয়ে সেই হাঙ্গামা

আর ঝগড়াঝাঁটি লাগে ! মমতা রাগ করে বলে, 'টাকা তো তুমি আমাদের কাছ থেকেও নাও, তরঙ্গ। এমন তো নয় বিনি-পয়সায় কাজ করো আমাদের, না কি এখানকার টাকাগুলো অচল ?'

বিকেলের দিকে হরমোহন ঘোষ লেনে পেঁছাতে রোজই প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসে তরঙ্গের। মমতার নানা-রকম কাজ থাকে তখন। সহজে তরঙ্গ ছুটি পায় না। তরঙ্গের হাতে ছাড়া মমতার ছেলে দোলন শান্তভাবে দুধ খায় না। তরঙ্গের হাতের চুল বাঁধা মমতার স্বামী ভারী পছন্দ করে। তরঙ্গ ব্যস্ততা দেখালে মমতা বলে, 'এসেই যদি এমন যাই-যাই করো, তাহলে চলে কি করে, তরঙ্গ। আমি তো ঘড়ি ধরে দেখি, এ-বাসায় তুমি কতক্ষণ কাজ করো।'

তরঙ্গ ঠিক এই ধরনের কথারই প্রতিধ্বনি শোনে অসীমার মুখে, 'ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখো দেখি তরঙ্গ, ক'টা বাজে। মাস গেলে মাইনে আমরাও তোমাকে দিই। বরং ও-বাসায় যেখানে সাত-আট তারিখের আগে মাইনে পাও না, এ-বাসায় সেখানে দোসরা তারিখেই তোমার সব পাওনা চুকিয়ে দিই। সে-কথাও তো একটু বিবেচনা করতে হয়। এমন একচোখোমি করলে চলবে কি করে। ঝি আমিও রেখেছি, মমতাও রেখেছে। দু'জনেরই ঠিকে ঝি তুমি। এমন তো নয় যে, সারা দিন-রাতের বাঁধা ঝি তুমি, মমতার। এমন করলে আমি পারবো কি করে ?'

ঝি ! কথাটি এর আগে অসীমার মুখে কোনদিন শোনেনি তরঙ্গ। চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে। কানের মধ্যে 'ঝিঁ-ঝিঁ' করতে থাকে তরঙ্গের।

একটু চুপ করে থেকে তরঙ্গ বললো, 'বউ-ঠাইরেন আমারে ঝির মতো দেখেন না, বউদিদি।'

অসীমা বিকৃত মুখে বললো, 'তা কেন, একেবারে গুরু-ঠাকরুণের মতো দেখেন, তোমাকে। বেশ তো, এতই যদি ভালো তারা, সেখানকার গুরু-ঠাকরুণগিরি করলেই পারো, নিষেধ করছে কে। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব আছে নাকি আজকাল।'

মমতাও যে ঠিক আগের চোখে দেখে, তা নয়। তারও মধুর ব্যবহার, কথা বলবার মিষ্টি ধরনটুকু একেবারে বদলে গেছে !

সেদিন বিকেলের কাজ সেরে তরঙ্গ চলে যাচ্ছে, মমতা বললো, 'ও কি, চলে যাচ্ছো যে ; কয়লা ভেঙে দিয়ে যেতে হবে, বলিনি তোমাকে ?'

তরঙ্গ বলে ', 'আজকের মতো কয়লা তো আছে, বউ-ঠাইরেন। কালই আইসা ভাঙ া। ও-বাসায় আবার দেরি হইয়া যাবেনে—'

মুখ-ঝামটা দিয়ে বললো মমতা, 'এসেই কেবল ও-বাসা আর ও-বাসা। এ-বাসায় বুঝি আর মন টেঁকে না, না তরঙ্গ ? আমার কাজকে আর কাজ বলে গ্রাহ্য হয় না ? বেশ তো, অসীমাদের বাসায় যদি এতই মধু, সেখানে দিন-রাত লেগে থাকলেই পারো। তোমায় তো জোর করে আটকে রাখেনি এখানে কেউ। যদি না পোষায়, কাজ ছেড়ে দিলেই তো হয়। মাসে-মাসে বারোটা করে টাকাও গুণবো, আর এদিকে কাজে তুমি দিনের পর দিন গাফিলতি করবে, তা আমি সইতে পারবো না।'

একটু চুপ করে থাকার পর মমতা আবার বললো, 'টাকা বড়ো চীজ, তরঙ্গ। বড়ো কষ্ট করে ঘরে আনতে হয় টাকা। চোদ্দ হাত মাটি খুঁড়লে একটা পয়সা বেরোয় না, জানো তো ?'

তরঙ্গ একটু চুপ করে থেকে তারপর বললো, 'আপনি এ-সব বলছেন, ও বাসার বউদিদি কিন্তু—'

রাগে আরো জ্বলে উঠলো মমতা, 'শুনেছি-শুনেছি, ও-বাসার বউদি দুধ দিয়ে মুখ ধুয়ে দেয় তোমার। তিনি একেবারে ভালো-মানুষের গোড়া !'

তরঙ্গ ক'দিন ধরেই লক্ষ্য করছে এ-বাসার বউ ঠাকরুণ ও-বাসার বউদিদির সুখ্যাতি ঠিক আগের মতো শুনতে পারে না ! ও-বাসার বউদিদিও যে এ-বাসার বউ-ঠাকরুণের প্রশংসা শুনলে খুশি হয়, তাও নয়।

'বউ-ঠাইরেন।' তরঙ্গ বললো, 'আমি তা বলছিলাম না, বলছিলাম, আপনার এখান থিকা, যাইতে একটু দেরি হইয়া গেছিলো দেইখা কি গাইলটাই না লাগাইলেন তিনি। আপনার বাসায় নাকি আমি বেশি কাজ করি, তাঁর কাজে ফাঁকি দেই—'

মমতা বললো, 'তাই নাকি ? এ-সব কথা বলেছে নাকি, অসীমা ? তা তো বলবেই। চিরকালই ওর ওই রকম কুঁদুলে স্বভাব, আর কথা একেবারে চাঁছাছোলা ! কোনো রকম মিষ্টত্ব নেই মুখে।'

তরঙ্গ লক্ষ্য করলো, বেশ একটু সহানুভূতি আর অন্তরঙ্গতার ভাব এতক্ষণ বাদে মমতার মধ্যে ফের আবার দেখা যাচ্ছে। তাই সে উৎসাহিত হয়ে বললো, 'মিষ্টি কথা দূরে যাউক, এমন মুখ খারাপ কইরা গাইল্ দিলেন যে, কবো কি বউ-ঠাইরেন—সেই সব কথা ভদ্দরলোক ক্যান, আমাগো মতো ঝি-চাকরের মুখ দিয়াও বাইর হয় না।'

মমতা বললো, 'ভদ্র-অভদ্র জাতের মধ্যে লেখা থাকে না, তরঙ্গ; মানুষের স্বভাব ব্যবহার চালচলনেই তা বোঝা যায়। অসীমার মুখ যে কি একখানা বস্তু, তা আমার জানতে বাকী নেই।'

ফেরার সময় মনটা একটু খচ্-খচ্ করতে লাগলো তরঙ্গের। এর আগে একজনের কথা আর একজনের কাছে সে লাগায়নি। কাজটা ভালো নয়। আজ বড়ো মুখ-আলগা করেছে, বড়ো বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে সে। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে পড়লো, অনেকদিন বাদে মমতা তার সঙ্গে ভালোভাবে মন খুলে কথা বলেছে। আর কথায়-কথায় কয়লা না ভেঙে চলে আসায়ও কোনো বাধা দেয়নি বা ওজর-আপত্তি করেনি।

সামান্য দেরি হওয়ায় অসীমা যখন আজও তাকে বকুনি দিলো, খোঁটা দিলো কাজ ফাঁকি দেওয়ার জন্য তখন মন আর ভালোবাসা পাওয়ার নতুন অস্ত্রটি এখানেও প্রয়োগ করলো তরঙ্গ, 'কি করুম কয়েন, বউদিদি। কাজ হইয়া গেলেও নানান ছল-ছুতায় ও-বাসার বউ-ঠাইরেন আটকাইয়া রাখেন আমারে। ইচ্ছা কইরা-কইরা দেরি করাইয়া দেন।'

অসীমা বললো, 'তা তো দেবেই! আমি তাকে নিজে সেধে ঝি জোগাড় করে দিয়েছি যে—তার শোধ নেবে না? মানুষের উপকার করতে নেই, তরঙ্গ। অনেক মেয়ে দেখেছি, কিন্তু মমতার মতো এমন হিংসুটে মেয়ে আমি আর দু'টি দেখিনি, জিলিপির প্যাঁচ ওর মনের মধ্যে।'

তরঙ্গ বললো, 'আর যা মুখ, বউদিদি; কবো কি আপনারে। কাজ তো আপনার বাসায়ও করি, দোষ-তিরুটি হইলে আপনিও তো ধমক-টমক দেন। কিন্তু এ যা মুখ! আউ-আউ-আউ, এমন মুখ-খারাপ করতে আমরাও পারি না, বউদিদি।'

অসীমা বললো, 'মুখ মমতার চিরকালই খারাপ।'

তরঙ্গ সাহস পেয়ে বললো, 'আর কেবল কি আমারে? আপনারে জড়াইয়া জড়াইয়া বউদিদি, আপনারে জড়াইয়া-জড়াইয়া—। যাউক, ও-সব কথায় কি দরকার আমার।'

অসীমা বললো, 'না-না, কানে যখন একবার গেলই, সব শুনি। চিনে রাখা ভালো, মানুষকে। কি-কি বলছে মমতা আমার বিরুদ্ধে, সব খুলে বল্, তরঙ্গ। ভাবিসনে, কোনো ভয় নাই তোর। এর একটা কথাও এক কান থেকে আর এক কানে যাবে না।....থাক্ থাক্, ওটুকু হলুদ আমি নিজেই বেঁটে নেবো।'

তক্তাপোশের তলা থেকে পানের বাটাটি এগিয়ে আনলো অসীমা, বললো, 'আয়, পান খা।'

অনেকদিন এমন আদর করে, এমন অন্তরঙ্গ সুরে তরঙ্গকে ডাকেনি অসীমা। তরঙ্গ কি সে ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে?

তারপর ধাপের পর ধাপ এগিয়ে চললো তরঙ্গ। উপায়টা ভারী চমৎকার। একজনের নিন্দা দিয়ে আর-একজনকে যে বন্দনা করা যায়, সহানুভূতি সহৃদয়তা আকর্ষণ করা যায়, পেঁাছানো যায় মনের কাছাকাছি, দিনের পর দিন তা আবিষ্কার করে আনন্দিত হতে লাগলো তরঙ্গ। মাইনে ছাড়া বাড়তি উপহার ইদানীং একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। আবার তা শুরু হলো।

অসীমা পান খাওয়ায়, মমতা জরদার কৌটো এগিয়ে দেয়। অসীমা তরঙ্গের স্বামীর জন্য বাজারের নতুন-ওঠা টাকায় তিনটে করে কেনা ফজলী আমের আধখানা কেটে দিলো একদিন। আর জলপাইগুড়ির বাপের-বাড়ির পাঠানো চারটি আনারস থেকে পুরো একটি আনারসই তরঙ্গকে দিয়ে দিলো মমতা। কুঞ্জ দাস খেয়ে ভারী খুশি। কেবল নিজেই খেলো না, দু'চার টুকরো স্ত্রীর মুখেও পুরে দিলো। বেশ মিষ্টি আনারস। এমন জিনিস কলকাতায় মেলে না। সুতরাং আরো স্বাদু, আরো মুখরোচক জিনিস মমতাকে দেওয়ার জন্য মুখ চুলবুল করতে লাগল তরঙ্গের।

'কালই কি কাণ্ডটা হইছে জানেন, বউ ঠাইরেন?'

মমতা বললো, 'না বললে কি করে জানবো।'

তরঙ্গ বললো, 'বড়ো-ঘরের সব বড়ো কথা। কিন্তু এতো কেচ্ছা কেলেঙ্কারি আমাগো ছোটলোকের মধ্যেও হয় না, বউ-ঠাইরেন। যাউক দরকার কি ও-সব কথার মধ্যে যাইয়া।'

কৌতূহলে একেবারে যেন ফেটে পড়লো মমতা, 'আহা, বল্ না। ওই তো হচ্ছে তোর দোষ।'

বলবে কি। বলবার মতো কি আর কথা। ঘটনাটা এই : অসীমা গিয়েছিলো বরানগরে, বাপের বাড়িতে। ফেরবার কথা ছিলো না। কিন্তু ফিরে এসে দেখে, সেই ফাঁকে ইলা দিদিমণিকে নিয়ে দাদাবাবু সিনেমায় চলে গেছে। তারপর রাত প্রায় বারোটার সময় মোটরে করে ফিরে এসেছিলো। রাত্রের ঘটনাটা পরদিন সকালে কাজ করতে গিয়ে শুনেছিলো তরঙ্গ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তাই নিয়ে কি তুমুল ঝগড়া! ইলা দিদিমণি মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে রইলো। মুখ দেখলেই বোঝা যায় ও মেয়ের মনে পোকা ঢুকেছে। ও মেয়ে ঠিক নেই।

মমতা বললো, 'ছি ছি ছি! সম্পর্কে শত-হলেও তো মামাতো-পিসতুতো ভাই-বোন। ভাগ্যি ঠাকুরপোর সঙ্গে বিয়ের কথাটা পাড়িনি!'

পাশের ঘরে নির্মল কবিতা লিখছিলো, লেখা ফেলে সে উৎকর্ণ হয়ে উঠলো তরঙ্গের কথা শোনবার জন্য।

'সুধাংশু দাদাবাবু প্রথম-প্রথম একটু আমতা-আমতা করলেন। তারপর একেবারে হাটের মধ্যে ভেঙে দিলেন হাঁড়ি।' বেশ রসালো স্বরেই বলতে লাগলো তরঙ্গ, 'অসীমাই বা এমন কোন্ সতীলক্ষ্মী! আর তার কীর্তি-কাণ্ডের কথা কি ভুলে গেছে নাকি সুধাংশু। তার নিজের বন্ধু বিনয়কে সেদিন ঘাড় ধরে বের করে দিতে হয়নি? কিন্তু দোষ তো কেবল বিনয়েরই ছিলো না। এক কাঠিতে কি আর ঢোল বাজে?'

মমতা গালে হাত দিয়ে বললো, 'বলিস কি, অ্যাঁ! আজ চার-পাঁচ বছর তো বিয়ে হয়ে গেছে। এখনো দোষ গেল না! ছি-ছি-ছি, শুনলে কানে আঙুল দিতে ইচ্ছা হয় যে রে, তরঙ্গ। একি স্বভাব, একি প্রবৃত্তি!'

তরঙ্গ মৃদু হেসে বললো, 'ফাঁক পাইলেই এখনো বিনয়বাবু আসেন কিন্তু, বউ-ঠাইরেন। তারপর ঘরের মধ্যে গুজ-গুজ, ফিস্ ফিস্—'

মমতা বললো, 'ও-সব দোষ এখনো গেল না ? ছি-ছি !'

পরম অনুকম্পায় তরঙ্গ হাসলো, 'ও দোষ কি আর যাওয়ার, বউ-ঠাইরেন ? ও দোষ মাইয়া-মানুষরে যদি একবার পাইয়া বসে, চিতায় ওঠবার আগে ছাইড়া দেয় না।'

তরঙ্গ অকৃতজ্ঞ নয়। পক্ষপাতিত্ব নেই তার মনে। অসীমার ফজলী আমের স্বাদটুকুও ভালোই ছিলো। সুতরাং তাকেও বঞ্চিত করলো না। বিকালের কাজ সেরে বাসায় যাওয়ার আগে অসীমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললো, 'এমন কেলেঙ্কারী কাণ্ডও যে ভদ্দরলোকের ঘরে—'

অসীমা উৎসুক স্বরে বললো, 'ব্যাপার কি রে, অতো চেপে-চেপে কথা বলছিস কেন ?'

তরঙ্গ বললো, 'না বউদিদি, যাই। দরকার কি আমাগো বড়ো ঘরের কথায় থাইকা। চললাম, বউদিদি।'

অসীমা হাত টেনে ধরলো তরঙ্গের, 'কি জ্বালা, খুলেই বল্ না !'

তরঙ্গ শুরু করলো, 'বলবো কি, বউদিদি। বলবার মতো কি আর কথা ? বয়স হইছে, ছাওয়ালপান হইয়া গেছে, এখনো এই সব পিরবিত্তি —ছি-ছি-ছি !'

বলবার মতো কথা নয়, তবু বলবো-না বলবো-না করে অসীমার অনুরোধে সবই খুলে বললো তরঙ্গ। আজ বিকালে কাজ করতে গিয়ে তরঙ্গ দেখে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দারুণ ঝগড়া। সে ঝগড়ায় কান-পাতা যায় না। বড়দাদাবাবু আর ছোট্দাদাবাবুর মধ্যে কথাবার্তা মুখ-দেখাদেখি বন্ধ। হবে না ? পুরুষ মানুষে কি এ-সব সহ্য করতে পারে ? দিন-রাত কেবল সোমত্ত দেবরকে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি। আর কেবল কি হাসি-তামশা— একেবারে ঢলাঢলি ! কতদিন তরঙ্গের নিজেরই চোখে পড়ে গিয়েছে। চোখ পেতে তাকানো যায় না।

অসীমা থুতনিতে আঙ্্ল ঠেকিয়ে বললো, 'বলিস কি তরঙ্গ, ছেলেপুলে হয়েছে, এখনো এই প্রবৃত্তি অসীমার ! আর নির্মল, তাকে তো ভালো ছেলে বলেই জানতাম ?'

তরঙ্গের হাসিতে মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে অগাধ অভিজ্ঞতা উদ্ভাসিত হয়ে

উঠলো, 'ভালো সবাই, বউদিদি! আমি দেইখাই বোঝতে পারছিলাম, মনের মইধ্যে যদি কু থাকে বউদিদি, চোখ-মুখ দিয়া আপনিই তা ছুইটা বাইর হয়। কিন্তু মাইয়া-মানুষের কাছে আগে যদি আস্কারা না পায় বউদিদি, পুরুষের সাইধ্য কি—'

অসীমা বললো, 'বড়ো বেঁচে গেছি, তরঙ্গ। ভাগ্যিস্ নির্মলের সম্বন্ধে পিসীমাকে তখন আমি চিঠি লিখিনি। তাহলে আর রক্ষে ছিলো না!'

কলেজ থেকে ফিরে এসে পাশের ঘরে বইগুলো টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখছিলো ইলা, আর কান পেতে ছিলো তরঙ্গের কথায়, হঠাৎ পরম অধীর হয়ে রবীন্দ্র-রচনাবলীখানাসুদ্ধ আরো খানকতক বই একেবারে ঠেলে ফেলে দিলো টেবিলের তলায়, চেঁচিয়ে উঠে বললো, 'আমার টেবিলে তোমার চুলের কাঁটা আর সিঁদুরের কৌটোটা কেন এনে রেখেছো, বউদি? আর কি জায়গা নেই?'

অসীমা তার দিকে তাকিয়ে বললো, 'বড়ো বাঁচা বেঁচে গেছিস, ভাই!'

তরঙ্গের যাওয়ার সময় কাঁঠালের এক টুকরো ইঁচড় অসীমা তার হাতে তুলে দিয়ে বললো, 'নে। রেঁধে খাস, দু'জনে। আমাকে তুই রক্ষে, করেছিস, তরঙ্গ।'

দিন-দুই পরে অসীমা বললো, 'কাল কিন্তু একটু সকাল-সকাল আসিস, তরঙ্গ। আমার বাবা-মাকে খেতে বলেছি। অনেক কাজ বাড়িতে।'

খবরটা মমতাকে দিতেই সে বললো, 'খবরদার, যেন আমার এখানে আসতে দেরি করিসনে! মামা আর মামীমাকে অনেকদিন ধরেই বলবো বলবো ভাবছি। আজই বলে পাঠাবো। কাল রবিবার, কালই সুবিধে। আগে আসবি আমার এখানে।'

তরঙ্গ ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললো, 'আইচ্ছা, বউ-ঠাইরেন।'

পরদিন ভোরে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে বকুল গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তরঙ্গ একবার ভাবলো কোন্ বাসায় আগে যায়। যেখানে যাবে সেখানেই আট্‌কা পড়বে। ডাঙায় ব্যাঙ, জলে কুমীর।

মানদা আর ক্ষ্যান্তমণি কাজে চলেছে। তরঙ্গকে দেখে থেমে গেল।

মানদা বললো, 'কি লো তরঙ্গ, কামাই করবার মতলবে আছিস নাকি?'

ক্ষ্যান্ত বললো, 'আ-হা-হা, কাকে কি বলছিস তুই, মানু। ও কি আর ও-সব কিছু জানে? আমাদের তরঙ্গ হলো ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পরিবার, খড়দর মা-গোসাঁই।'

মানদারা চলে যাচ্ছিলো, হঠাৎ তরঙ্গ তাদের পিছন থেকে ডেকে বললো, 'ও ক্ষ্যান্ত-দিদি, শোনো।'

ক্ষ্যান্ত বললো, 'কি রে, কি বলছিস?'

তরঙ্গ একটু ইতস্তত করে বললো, 'বলছি কি, একটা উপকার করবা তোমরা, আমার?'

'কি উপকার?'

তরঙ্গ বললো, 'আমার মনিবগো বাসা তো দুইজনেই চেনো? একজন যাও হরমোহন ঘোষ লেন আর একজন প্যারীমোহন সুর লেন। যাইয়া বলবা কি, তরঙ্গ আইজ কাজে যাইতে পারবে না, কলেরায় সে মরো-মরো। বেছানা ছাইড়া ওঠতে পারে না।...কাজ উদ্ধার কইরা দ্যাও, দিদিরা। পান-তামুক খাওয়ামু।'

কিন্তু পান-তামাক খাওয়াবার আগেই মানদা আর ক্ষ্যান্ত উল্লসিত হয়ে উঠলো, 'বলিস কি, তরুঙ্গি! এতদিনে সুবুদ্ধি হলো তোর। ক'মাস আগে যদি বুদ্ধিটা খেলতো, তাহলে কি আর তুই খেটে-খেটে এমন হাড্ডি-সার হতিস?'

যাওয়ার সময় তরঙ্গের মুখের কাছে মুখ নিয়ে ক্ষ্যান্ত তার গালে ছোট্ট একটু চুমু খেয়ে বললো, 'বড়ো ভাবনা ছিলো রে, তোকে নিয়ে। এবার বাঁচবি তুই।'

ক্ষ্যান্তরা চলে গেলেও তরঙ্গ আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো বকুল গাছের নিচে। ভারী দুর্গন্ধ ক্ষ্যান্তর মুখে। হাতের তেলোয় নিজের গালটা মুছে ফেলতে আঙুলে মিশির দাগ লেগে গেল। আর হঠাৎ দেখতে না-দেখতে দু'চোখ জলে ভরে উঠলো তরঙ্গের। ঠিক এমন তো সে হতে চায়নি। কেন এমন হলো?

ভুল

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

চিবুক বরাবর ঘোমটা, তবু সরমার মনে হলো, সারা কোর্ট-ঘরের সকলের দৃষ্টি যেন তার ত্বকে এসে বিঁধছে। তীক্ষ্ণ, কৌতূহলী কটাক্ষ। শুধু কৌতূহলী হলেও উপেক্ষা করা যেতো, কিন্তু সে কটাক্ষে সমবেদনার মিশেল। এইখানেই সরমার অপত্তি।

মাস-চারেক আগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা একবার সমবেদনা জানিয়েছে। ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করার ফাঁকে-ফাঁকে যতদূর সম্ভব করুণ করে তুলেছে ভাষা, এমন একটা শোকাবহ ব্যাপারে কি করে সরমাকে সান্ত্বনা দেবে, ভেবেই কূল পায়নি। আইন বাঁচিয়ে, নিরপেক্ষতার ভান করে ওরই মধ্যে ফোঁটা-কয়েক চোখের জল মিশিয়েছে। তাকে ধৈর্য ধরতে উপদেশ দিয়েছে। বলেছে—মাভৈঃ, আইনের চাকা ঘুরতে একটু বিলম্ব হয় বটে, কিন্তু যখন ঘোরে অধার্মিককে, দুষ্কৃতকারীকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলে।

পড়শীরা এসেছে উপদেশ দিতে। ইনিয়ে-বিনিয়ে সহানুভূতি জানাতে, কিন্তু এর যে সবটুকুই ছলনা, বুঝতে সরমার একটুও দেরি হয়নি। ওরা শুধু দেখতে এসেছে, সরমার মধ্যে কি পায়নি প্রিয়তোষ, রূপ-গুণ, বিদ্যা-বুদ্ধি—কি ছিলো না বলে এভাবে সে পরের বাগানে ঢুকেছিলো বেড়া ভেঙে। এখানে যা পায়নি, পাবার আশা ছিলো না, তেমন কি জিনিস ছিলো আইভির মধ্যে ? নিজের সংসারের চালে আগুন ধরিয়ে কেন প্রিয়তোষ আর একজনের জমিতে কামনার ইট গেঁথে বাড়ি তৈরি করতে গিয়েছিলো।

পাশে একেবারে গা ঘেঁষে বসে পড়শীরা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখেছে সরমাকে। সরমার মনের চেহারা দেখবার চেষ্টা করেছে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে।

কি ভাবছে সরমা ; প্রিয়তোষকে মনের আয়নায় কিভাবে বিম্বিত করছে। সোহাগের রং ঝরে গেছে, খসে গেছে প্রীতির পালিশ ; দেহের, মনের চেকনাইটুকুও নিঃশেষ। তাহলে আর কি থাকে! শক্ত করে বাঁধা গাঁটছড়া কবে ঢিলে হয়ে গেছে। অনুরাগের পেখমের একটিও অবশিষ্ট নেই।

পড়শীদের সেই দৃষ্টির প্রতিচ্ছায়া কোর্টে-বসা লোকগুলিরও চোখে। সার্কাস দেখতে ভিড় করে যে লোকের পাল, এরা সে জাতের নয়। এরা তারিয়ে তারিয়ে সংবাদপত্র পড়ে, বিশেষ করে মুখরোচক খবর, হয়তো কেসের ফলাফল নিয়ে বাজিও ধরে নিজেদের মধ্যে। ফাঁসি হবে, না আসামী বেকসুর খালাস? দশ বছর, না দ্বীপান্তর? তাছাড়া মিলিয়ে-মিলিয়ে দেখে আসামীকে। নিজেদের মন-গড়া মূর্তিটুকু মেলে। যা সত্য, তারও উপর রং ফলিয়ে প্রজাপতির ডানার মতন বিচিত্র চিত্র আঁকে। মনের কালি ঢেলে কখনও অন্ধকারের রং ধরে সে ছবি, কখনও অবচেতন মনের ছায়া মেখে স্তিমিত গোধূলি।

এ-সব কেসে উপরি-পাওনাও থাকে! সকাল দশটা থেকে কোর্ট-ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পিঠ সোজা করে একভাবে বসে থাকার খেসারত। সার্কাসের বাঘের খেলা কিংবা বাঘিনীর। একদিকে মৃত প্রিয়তোষের সদ্য শোকাচ্ছন্না স্ত্রী সরমা, অন্যদিকে আসামীর গৃহিণী আইভি, যার স্বামীর জীবনও ক্ষীণ তারের উপর ঝুলছে। হয় নিষ্কৃতি, নয় নিষ্ক্রমণ পৃথিবী থেকে। কিংবা বলাও যায় না, তিনশো ধারার উদ্যত অক্টোপাস-বাহু থেকে রক্ষাও পেয়ে যেতে পারে। জুরিদের কল্যাণে বছর-ছয়েকের কারাবাস। তা হলেও আইভির সান্ত্বনা কোথায়। প্রাণই না হয় বাঁচলো মানুষটার, কিন্তু মান মর্যাদা, সম্ভ্রম তার ছিটে-ফোঁটাও যে বাকি রইলো না। ফণা গুটিয়ে আইভিকে কেঁচোর মতন ছোট্ট ফাটলে লুকিয়ে রাখতে হবে নিজেকে।

এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা, সন্দেহ পরস্পরকে হীন প্রতিপন্ন করার খেলা দেখার জন্যই কোর্ট-ঘরে ক'দিন ধরে এতো ভিড়। হাকিম হাতুড়ি ঠুকে-ঠুকে হয়রান। অবস্থা আয়ত্তে আনা যাচ্ছে না। বিশেষ করে সরমা আর আইভির প্রবেশের পর থেকে।

দ্রুত এগিয়ে সরমা সরকারী উকিলের পাশের চেয়ারে বসলো। সরকারী উকিল ছাড়াও প্রাণধন মিত্র রয়েছেন, বাঘা অ্যাডভোকেট। ওঁর এক-এক হুঙ্কারে সাক্ষীরা জন্মদাতার নাম বিস্মৃত হয়। শেখানো বুলি টাগরায় আটকায়। প্রয়োজন হয়তো ছিলো না, তবু সরমা প্রাণধনবাবুকে সঙ্গে রেখেছে। একশো একান্ন টাকার কমে প্রাণধনবাবু হাঁ করেন না, সওয়াল-জবাব যেদিন করতে হয়, সেদিন তো বিশ জি এম। এর জন্য সরমার গয়নার সেট গেছে পোদ্দারের দোকানে, তা যাক। প্রাণধন-বাবুকে না আটকালে আইভি হয়তো ব্রিফ তুলে দিতো তাঁর হাতে। সে চেষ্টাও হয়েছিলো।

আরও অনেক রকমের চেষ্টা হয়েছিলো। লোক এসেছিলো সরমার কাছে। শোকের অভিনয় করে করুণ সুরে কাঁদুনি গেয়েছিলো, মানুষটা তো আর ফেরবার নয়। এমন নয় যে, আইভির স্বামী অপরেশের গলায় ফাঁসির দড়ি আটকালেই প্রিয়তোষ বেঁচে উঠবে। আবার ফিরে আসবে সরমার কাছে। তা যখন হবার নয়, তখন সরমার কি উচিত নয়, সব ব্যাপারটা ভুলে যাওয়া। উচিত নয় জল দিয়ে মুছে-মুছে নোংরা দাগ তুলে ফেলার মতন, এ ঘটনাটা বিস্মৃত হওয়া, সম্পূর্ণভাবে? ক্ষমাই পরম ধর্ম। ক্ষমা করার এই সুযোগ হেলায় হারানো কি উচিত হবে, সরমার? আজন্ম বাঁদী হয়ে থাকবে আইভি, অপরেশ চিরকৃতজ্ঞ।

কথাগুলি অর্ধেক শুনেই সরমা সেই ঘর থেকে চলে গিয়েছিলো। ভাইকে দিয়ে লোকটাকে যেতে বলেছিলো।

লোকটা সহজে ওঠেনি। সাতটা শকুন মরলে একটা উকিলের মহুরী হয়। সহজে ওঠবার নয়। পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ছেড়ে-যাওয়া কথার খেই ধরেছে। ছিঁড়ে-যাওয়া কথার সুতোয় যুক্তির-গিঁট দেবার চেষ্টা করেছে।

মরিয়া হয়ে সরমা বেরিয়ে এসেছিলো। খোলা চুল তার সারা পিঠে ছড়ানো। ঘোমটার চিহ্নও নেই, দু'চোখে আগুনের ফুল্‌কি।

না, কোনো দয়া নেই। আমি কারুর কোনো কথা শুনবো না। যান আপনি। শোনেওনি কারো কথা। যখনই কেউ এসেছে, সরমা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। হাজার কাকুতি-মিনতিতেও দরজা খোলেনি সে।

আইভি মুশ্‌কিলেই পড়েছিলো। উকিলের পরামর্শ মতো পুলিসের কাছে এজাহার দিয়েছিলো যে, স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে স্বামীর বন্ধু প্রিয়তোষ তার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেছিলো, মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার প্রয়াস, স্বামী হঠাৎ বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে এই অত্যাচার, এই অপমানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তবলা বাঁধা হাতুড়ি দিয়ে আততায়ীর মাথায় আঘাত করে। প্রিয়তোষের মৃত্যুর জন্য দায়ী প্রিয়তোষের লালসা, তার অন্যায় লোভ।

নিজের উকিলের মুখে এই কাহিনী শুনে সরমা পরের দিন লাল ফিতেয় বাঁধা স্তূপীকৃত চিঠি এনে রেখেছিলো প্রাণধন মিত্রের টেবিলে। সে চিঠির ভাষা পড়তে-পড়তে অতবড়ো ঝানু উকিল প্রাণধনবাবুর দুটো কান লাল হয়ে উঠেছিলো। অনেকক্ষণ মুখ তুলে সরমার দিকে চাইতেই পারেননি।

চিঠিগুলো আইভির লেখা। কালি দিয়ে নয়, বুঝি বুকের কামনা দিয়ে। প্রতি ছত্রে আমন্ত্রণ। নির্জন দুপুরে প্রিয়তোষকে তার দেহের তটে যাবার আহ্বান। সমাজ-নীতি, বিবেক সব দু'হাতে সরিয়ে মনের মানুষকে কাছে টানার ইশারা!

প্রাণধনবাবু মুখ তোলেননি, কিন্তু সরমা মুখ খুলেছিলো।

এগুলো পড়ে কি মনে হয় ওরা যা বলেছে সেটাই ঠিক?

না, মা। প্রাণধনবাবু ঘাড় নেড়েছিলেন, এ চিঠির তাড়া কোর্টের সামনে হাজির করলে তাদের ডিফেন্স টিঁকবে না। আইভি মজুমদারের সাফাই ধুলোয় লুটোবে। কিন্তু একটা কথা—প্রাণধনবাবু পেন্সিল দিয়ে টাক চুলকোতে চুলকোতে বলেছিলেন, হঠাৎ যেন মনে পড়েছে এমনিভাবে, ওই ব্যাপারটার পরে বাড়ি খানাতল্লাসী করেছিলো না? তখন তো এ-সব কিছু পায়নি।

পায়নি, তার কারণ তখন এগুলো বাড়িতে ছিলো না। আমি সরিয়ে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম এগুলো লুকোতে পারলে স্বামীর সম্মানের কিছুটা বাঁচাতে পারবো। শুধু স্বামীর কেন, আইভিরও, কিন্তু দেখলাম তা হবার নয়। ওরা নিজের ধুলো-কাদা নিঃশেষে মুছে সব ময়লাটুকু এদিকেই ছোঁড়ার চেষ্টা করছে। সেটা সহ্য করি কি করে?

প্রাণধনবাবু কথা বাড়ালেন না। শুধু বললেন, এগুলো যে আইভি

মজুমদারের হাতের লেখা, এও প্রমাণ করতে হবে। অবশ্য সেটা প্রমাণ করা খুব কষ্ট-সাপেক্ষ নয়। হস্তলিপি-বিশারদকে সাক্ষী মানলেই চলবে।

সরমা আঁচলের আড়াল থেকে আরও কতকগুলি চিঠি বের করলো। সামনের টেবিলে রেখে বললো, এগুলোও আইভির লেখা। আমাকে লেখা চিঠি এ-সব। এগুলোতে অবশ্য তেমন উত্তাপ নেই, অতো নির্লজ্জও নয়। জানেন তো, আইভি প্রথমে আমারই বন্ধু ছিলো। এক কলেজে আমরা পড়েছি। দু'বছর বসেছি পাশাপাশি।

ঠিক এই কথাগুলিই বসে-বসে সরমা ভাবছিলো। কারুর দিকে দৃষ্টি ফেরায়নি, শুধু আইভি এসে ওদিকের চেয়ারে বসতে মুখ তুলে দেখেছে। না দেখে পারেনি।

কোথায় যেন মিল রয়েছে সরমার সঙ্গে। দু'টি চোখের একই নিষ্প্রভ ভাব, রক্তহীন পাংশু মুখ, বিবর্ণ ওষ্ঠ। যে আঘাতে সরমা সব হারিয়েছে, সে আঘাতের কিছুটা গিয়ে পড়ছে আইরিভও উপর। বেশ কিছুটা। সরমার সব কিছু শেষ। আশা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা। আইরিভও সব কিছু যাবে। যাতে না যায়, তার জন্যই প্রাণপণ চেষ্টা চলেছে। দড়ি টানাটানি। দু'দিকে দু'জন। আইভি আর সরমা। কার জোর বেশি সেই পরীক্ষাই চলেছে। কে কাকে টেনে আনতে পারে নিজের কোঠায়। কে কাকে কেন্দ্রচ্যুত করতে পারে।

ভাইভি নিজে সরমার কাছে আসেনি। বার-বার লোক পাঠিয়েছে। উকিলের মুহুরীকে, জ্ঞাতি ভাইদের। চিঠিগুলি ফেরত চেয়েছে, পুরোনো প্রীতি ফেরত চেয়েছে, শেষকালে টাকার লোভ দেখিয়েছে। আজন্ম পেন্সন কিংবা ওই জাতের কিছু।

সরমা শোনেনি। আইভি নিজে এলে কি হতো, বলা যায় না। অনেকদিনের বন্ধুত্ব। সুখ-দুঃখের অনেকগুলো মুহূর্তের সাক্ষী দু'জনে। ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা করছে পার্কের নির্জন বেঞ্চে বসে, জনাকীর্ণ কমনরুমের কোণে। তখন কে আর ভেবেছিলো, সরমার ভবিষ্যৎ আইভিই চূর্ণ করে দেবে একদিন।

চেয়ে-চেয়ে সরমা আবার দেখলো। চওড়া লাল-পাড় শাড়ি

ব্লাউজের বর্ডারেও লালের ছোপ, যে আইভি সিঁথির ফাঁকে শীর্ণ সিঁদুরে বিন্দু দিতো শুধু, সে আজকাল চওড়া লাল রেখা টানে সিঁদুরের। এ-সবের অর্থ বোঝে সকলে। মরণোন্মুখ স্বামীর স্ত্রীকে প্রতিবেশীনীরা এইভাবেই সাজায়। গ্রাসে-গ্রাসে আমিষ তুলে দেয় মুখে।

প্রায় বছর-চারেক, তার বেশি নয়। সেই দিনটার কথা সরমার স্পষ্ট মনে আছে। আইভির সিঁথির সিঁদুরের মতনই উজ্জ্বল সেই দিনটি।

বিয়ের সময় আইভিরা আসতে পারেনি। বাইরে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলো। দেখা করতে এলো অনেক পরে। আইভির স্বামী নয়, আইভি একা। প্রিয়তোষের সঙ্গে সরমা আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো। ওদের দু'জনকে বসিয়ে সরমা যখন চা নিয়ে ফিরলো, তখন আইভি আর প্রিয়তোষের মধ্যে তুমুল তর্ক শুরু হয়েছে, স্ত্রী-স্বাধীনতার স্বরূপ নিয়ে। সরমা ব্যাপার দেখে হেসেছে। বলেছে, বাবা, দুই তর্কবাগীশ এক সঙ্গে হয়েছে। গলাটা দু'জনে একটু নামাও দিকিনি। পাশের ফ্ল্যাটের লোকেরা ভাববে, স্বামী-স্ত্রীই বুঝি ঝগড়া আরম্ভ করেছে। মাঝ থেকে আমারই বদনাম হবে।

দু'জনে হেসেছিলো, কিন্তু বক্তব্য থামায়নি। এরপর সরমা স্বামীকে নিয়ে আইভিদের বাড়িতে গেছে। আইভির স্বামী অপরেশের সঙ্গে তার আগে থেকেই আলাপ ছিলো, প্রিয়তোষের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। অপরেশ মোটা মাইনের চাকরি করে, শৌখিন মানুষ। গান-বাজনা খুব ভালোবাসে। কোথাও গানের আসর বসেছে শুনলে প্রায় অন্ন-জল ত্যাগ করে সেখানে ছোটে। সারারাত কাটিয়ে ভোরবেলা গুন-গুন করতে-করতে বাড়ি ফেরে।

এ পর্যন্ত স্বাভাবিক। দুই পরিবারের এ-রকম ঘনিষ্ঠতা অলিতে-গলিতেও দেখা যায়। সন্দেহের কুৎসিত ছায়া কোথাও ছিলো না, জল ঘোলা হবার কোনো অবকাশ নয়।

প্রথম সন্দেহ জাগলো অনেক পরে। বাড়িতে ভালো লাগছিলো না সরমার। একটা বই নিয়ে কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করলো। আলমারির জিনিসপত্রগুলো গোছালো, তারপরই হঠাৎ মনে পড়লো, প্রিয়তোষ বলে গেছে—ফিরতে একটু রাত হবে। অফিসের পরে অন্য কোথায় যাবে।

শাড়িটা পাল্টে অল্প একটু প্রসাধন সেরে বুড়ি ঝিটাকে সাবধান হয়ে থাকতে বলে সরমা বেরিয়ে পড়লো। পথে এক দোকান থেকে আইভির ছেলের জন্য একমুঠো চকোলেট কিনে নিলো।

অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর আইভি এসে দরজা খুলে দিলো। অবিন্যস্ত চুল অসম্বৃত পোশাক, সবে সামলে নিয়েছে।

কি, ঘুমিয়ে পড়েছিলে এই অবহেলায় ?

দু'এক মিনিট। ইতস্তত ভাবটা চেপে আইভি হেসে উঠলো, ঘুমোতে যাবো কেন ? দুপুরে কি আমি ঘুমোই ? বসে-বসে তোমার কর্তার সঙ্গে গল্প করছিলাম।

কর্তার সঙ্গে ? প্রথম সন্দেহের গাঢ় কালো ছায়াটা দুলে উঠলো সরমার চোখের সামনে, মনের সামনে। এই সময় প্রিয়তোষ এ-বাড়িতে ? অপরেশের থাকার সময় এটা নয়। তার ফেরার অবশ্য কোনো ঠিক নেই। কিন্তু ঠিক দুপুরবেলা এ বাড়িতে প্রিয়তোষ বসে আছে কেন ?

গল্প করছিলো আইভি ? এই কি গল্প করার পোশাক। এমন আলুথালু বেশে কেউ যায় বাইরের লোকের সামনে ?

আইভির পিছন-পিছন সরমা বাইরের ঘরে এসে দাঁড়ালো।

কৌচে হেলান দিয়ে প্রিয়তোষ। হাতে খবরের কাগজ।

বেশ অনুভব করতে পারলো সরমা। সারা দেহের রক্ত মুখে এসে জমলো। দু'টি চোখে অসহ্য দাহ। সমস্ত শরীরটা অল্প-অল্প কাঁপছে। দেয়ালে ভর দিয়ে কিছুটা সামলে নিয়ে বললো, কি ব্যাপার, অফিস পালিয়ে এখানে বসে ?

প্রিয়তোষের মুখের দিকে চেয়েই সরমা বুঝতে পারলো তার অবস্থাও সরমারই মতন। কেবল সরমার মুখে যেমন সারা দেহের রক্ত এসে জমেছিলো, প্রিয়তোষের মুখ থেকে পলকের মধ্যে কে যেন সব রক্তটুকু তেমনি নিঙড়ে নিয়েছিলো। হাতের মুঠোয় ধরা কাগজের মতই মুখের রং। বহুকষ্টে মুখে হাসি ফুটিয়ে প্রিয়তোষ বলেছিলো, একটা গানের জলসার খবর এনেছি, অপরেশবাবুর জন্যে। অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়েছিলাম, অন্য জায়গায় যাবো বলে। ভাবলাম, পথে নেমে খবরটা একবার দিয়ে যাই।

প্রিয়তোষের একটা কথাও বুঝি সরমার কানে যায়নি। সে শুধু মনে-মনে হিসাব করছিলো, কবে থেকে দু'জনের মধ্যে এতো অন্তরঙ্গতা হলো, এতো হৃদ্যতা। অফিস কামাই করে স্ত্রীকে মিথ্যা বলে প্রিয়তোষকে যার জন্য নিভৃত দুপুরে এ-বাড়িতে এসে বসে থাকতে হয়, ভদ্রতা শালীনতা সব বিসর্জন দিয়ে—কতদূর গভীরতা এ সৌহার্দের ?

এর পর গোটা সাতদিন ধরে মন কষাকষির পালা চললো সরমা আর প্রিয়তোষের মধ্যে। সরমার অনুযোগের উত্তরে কখনও উত্তপ্ত হয়ে উঠতো প্রিয়তোষ, কখনও তুহিনশীতল। সেতুবন্ধনের চেষ্টায় প্রিয়তোষ নিজেকে অনেকটা নামিয়ে আনলো। সিনেমায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করলো সরমাকে, এক ছুটির দিনে তাকে নিয়ে ডায়মণ্ডহারবার বেড়িয়ে এলো। সরমা ধীর শান্ত হয়ে এলো এক সময়ে। মনকে বোঝালো, ঈর্ষার নীল বিষে সব নীলাভ ঠেকেছিলো, সন্দেহের দূরবীনে বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন।

সময়ের পলিমাটি পড়ে-পড়ে পুরোনো ক্ষয়টা যখন প্রায় ঢেকে এসেছে, তখনই অফিসের ফাইলের মধ্যে থেকে চিঠির টুকরোটা সরমার হাতে ঠেকলো।

অফিসের কাগজপত্র সরমা সাত-জন্মে ছোঁয় না। টেবিলের উপরই দিনের পর দিন পড়ে থাকে। ওলোট-পালোট হয়ে যাবার ভয়ে সরমা তার ধারে-কাছে ঘেঁষে না, হঠাৎ সেদিন দুপুরে কোথাও কিছু নয়, আচমকা তুমুল বর্ষণ শুরু হলো। ফাল্গুন মাসের পক্ষে একেবারে অস্বাভাবিক ব্যাপার। খোলা জানলা দিয়ে জলের ছাঁট এসে টেবিল ভিজিয়ে দিলো। বিছানা ছেড়ে সরমা উঠতে-উঠতে জবজবে হয়ে গেল অফিসের ফাইল।

ফাইলটা তুলে নিয়ে শাড়ি দিয়ে মুছতে গিয়েই হঠাৎ চিঠিটা মেঝেয় পড়ে গেলো। নীল রঙের একখানা কাগজ, তাড়াতাড়ি সেটা তুলে চোখের সামনে ধরতে সরমার মুখও নীল হয়ে গেল। সম্বোধন নেই, লেখিকার নাম নয়, কিন্তু দু'টি ছত্রের এই চিঠির মধ্যে সম্বোধনের নিবিড়তা লুকোনো রয়েছে। পত্র-লেখিকার নাম হয়তো নেই, কিন্তু তার মন রয়েছে। কোনো এক চৌরাস্তায় অপেক্ষা করতে হবে সামনের রবিবার বেলা চারটে থেকে চারটে পনেরো পর্যন্ত। শুধু পনেরো মিনিটের প্রতীক্ষা, কিন্তু সরমার

মনে হলো যুগযুগান্ত একজন আর একজনের অপেক্ষায় থাকবে, এতে যেন তারই আভাস।

কি করে সরমা নিজেকে সংবরণ করলো, তার কাছেই বিস্ময়কর ঠেকেছিলো! একটু উত্তেজনা নয়, চেচাঁমেচি নয়, মুখের ভাবেরও বুঝি কোনো পরিবর্তন নয়। চিঠিটা ফাইলের মধ্যে রেখে রান্নাঘরে ঢুকলো বিকেলের জলখাবারের যোগাড় করতে। স্বামী ফিরতে এক হাতে গরম চায়ের কাপ, অন্য হাতে লুচির থালা নিয়ে তার সামনে দাঁড়ালো। হাত একটু কাঁপলো না, কাপের গা বেয়ে এক বিন্দু চা প্লেটে পড়লো না। এমন কি, ঠোঁটের কোণে হাসির রেখাটুকু ফোটাতেও সরমার অসুবিধা হয়নি।

কেবল রবিবার সাড়ে তিনটে বাজতেই বাথরুমে ঢুকে সরমা গা ধুয়ে নিলো। চুলটা আগেই বেঁধেছিলো। বেছে-বেছে মানানসই শাড়ি পরে, মুখে স্নো-পাউডার মেখে একেবারে তৈরি হয়ে স্বামীর সামনে এসে দাঁড়ালো। প্রিয়তোষ বিছানা ছেড়ে উঠি-উঠি করছিলো। হাতে খবরের কাগজ ছিলো বটে, কিন্তু চোখ ছিলো ঘড়ির কাঁটার দিকে।

সরমাকে দেখে বললো, কি ব্যাপার—অভিসারে নাকি?

হুঁ। সরমা বললো, তোমার সঙ্গে।

আমি তো নিহত। আমার ওপর আর খাঁড়ার ঘা কেন? তার চেয়ে নতুন মানুষ খুঁজে নাও।

কে বললে, তুমি পুরোনো? প্রতি মুহূর্তে তোমায় নতুন করে নিচ্ছি। নাও, উঠে পড়ো।

এবার প্রিয়তোষ অবাক হলো, কোথায়?

মঞ্জুদের বাড়ি যাবো। অনেকদিন থেকে বলছে। এতো ছুটি-ছাটা গেল, দুনিয়ার সব কাজ হলো, ওর বাড়িতে আর যাওয়া হলো না!

মঞ্জু সরমার ছোটো বোন। আপন নয়, খুড়তুতো। বেলঘরিয়ায় থাকে। সত্যিই অনেকদিন থেকে যেতে বলছে সরমাকে।

মাথা খারাপ, আজ আমার কোথাও যাওয়া চলবে না। নিজের দরকারী কাজ রয়েছে। বালিশটা হাত দিয়ে ঠিক করে নিয়ে প্রিয়তোষ আবার শুয়ে পড়লো।

এতক্ষণ পরে ফেটে পড়লো সরমা। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে চূরমার হয়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে খাটের বাজু ধরে টান হয়ে দাঁড়ালো সে। একেবারে যুদ্ধং দেহি ভাব !

দরকারী কাজটা কি তোমার পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে বুঝি ? বেলা চারটে পনেরো।

চাবুক-খাওয়া ঘোড়ার মতন প্রিয়তোষ লাফিয়ে উঠলো। সরমার দিকে নয়, চোখ ফেরালো টেবিলে রাখা ফাইলটার উপর। চিঠিটা অবশ্য আর ওখানে নেই। একদিন শুধু প্রিয়তোষ চিঠিটা ওর মধ্যে রেখেছিলো। ওই একদিনেই সর্বনাশটা হয়েছে।

সরমা ভেবেছিলো, শেকড়-শোঁকা সাপের মতন প্রিয়তোষ নেতিয়ে পড়বে। ফণা গুটিয়ে বিবরে মুখ লুকোবে, কিন্তু ভুল করেছিলো সরমা। তার দিকে আড়-চোখে চেয়ে প্রিয়তোষ দাঁতে দাঁত চেপে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলেছিলো, গোয়েন্দাগিরিও শুরু করেছো, চমৎকার ! যদি ভেবে থাকো তোমার ভয়ে আমি কেঁচো হয়ে থাকবো, নিজেকে বেঁধে রাখবো তোমার শাড়ির আঁচলে, তাহলে ভুল করেছো। যে জাতের পুরুষ দাঁড়ে বসে পরিবারের হাত থেকে সোহাগের দানা খুঁটে-খুঁটে খায় আর তারই শেখানো ঘরোয়া বুলি বলে, আমি অন্তত সে জাতের নই, এটুকু জেনে রাখো। তোমাকে আমার ভালো লাগে না, কোনদিনই লাগেনি।

কথা শেষ করে আর অপেক্ষা করেনি প্রিয়তোষ। দ্রুতহাতে বেশবাস বদলে বেরিয়ে গিয়েছিলো। এতো দ্রুত যে, সরমা তার কথার প্রত্যুত্তর দেবারও অবকাশ পায়নি। অনেক বাছা-বাছা কথা ঠিক করে রাখা সত্ত্বেও !

শুধু এটুকু বুঝতে সরমার কোনো অসুবিধা হয়নি, প্রিয়তোষ ভেবেছে চিঠির মর্মটুকুই সরমা জেনেছে, কার মর্মের কথা সেটুকু বুঝি জানে না। আইরিভ লেখা অনেক চিঠি যে মজুত আছে সরমার ভাণ্ডারে, সেটা প্রিয়তোষের জানা নেই, কিংবা জানা থাকলেও উত্তেজনার মুখে বিস্মৃত হয়েছিলো।

কিন্তু সরমা প্রমাদ গুণলো। ব্যাপারটা শুধু যে চোখের নেশা, সাময়িক ঘোর—এমন মনে হলো না। এ রঙের উৎস হৃদয়ের গভীরে।

কেবল যে বৃষ্টির জল জমে জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছে, তাই নয়—এর মধ্যে স্রোতস্বিনীর ইঙ্গিত রয়েছে, সমুদ্রগামিনীর বেগ।

তাই পরের দিনই পাড়ার এক ডাক্তারখানা থেকে সরমা অপরেশকে ফোন করলো। ঘনিষ্ঠ পরিচয় অবশ্য ছিলো সরমার সঙ্গে, তবে সরমার ফোন পেয়ে অপরেশ বেশ একটু অবাক হলো। জিগ্যেস করেছিলো, কি ব্যাপার? কি মনে করে?

বিকেলের দিকে একবার দেখা হতে পারে? অনেক চেষ্টা করেও সরমা নিজের গলার স্বর আয়ত্তে আনতে পারলো না।

বেশ তো, যাবো আপনাদের বাড়িতে। প্রিয়তোষবাবু ভালো আছেন তো?

আছেন। কিন্তু শুনুন, বাড়িতে কিছুতেই নয়, অন্য কোথাও দেখা করতে হবে।

এবার অপরেশ সত্যি চমকেছে, কী ব্যাপার বলুন তো? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

দেখা হলেই পারবেন, কথার সঙ্গে-সঙ্গে কঠিন হয়ে উঠেছিলো সরমার স্বর, সাড়ে পাঁচটার পর পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে আপনার অপেক্ষায় থাকবো। ঠিক আসবেন।

পার্ক স্ট্রীটের কথাটা কেমন করে সরমার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়লো, তা সে নিজেই জানে না।

আসবো। হতবাক অপরেশ কথা দিয়েছে।

পার্ক স্ট্রীটের মোড় থেকে দু'জনে ময়দানে গিয়ে বসেছে মুখোমুখি। ঘাসের দিকে চেয়ে সরমা একটু-একটু করে বলেছে তার সন্দেহের কথা। অপরেশ প্রথমে আমলই দেয়নি, বিশ্বাস করেনি নিজের স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী, বিশেষ করে যখন সে সন্তানের জননী। বলেছে, আপনি কোথায় একটা ভুল করেছেন, মিসেস সেন। নিজের সন্দেহটা রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছে আপনার সামনে। অযথা ভেবে নিজের সংসার, নিজের মন নষ্ট করছেন।

একটি কথাও না বলে সরমা চলে এসেছে। দিন-সাতেকের মধ্যে চাবিওয়ালা ডেকে প্রিয়তোষের স্যুটকেসের বাড়তি একটা চাবি তৈরি

করেছে। তারপর সুটকেস খুলে চিঠির তাড়া বের করেছে। সব আইভির লেখা চিঠি। চিঠিগুলো পড়তে-পড়তে দুঃসহ ঘৃণা আর রাগে শুধু যে শরীরটা পুড়ে গিয়েছে সরমার এমন নয়, প্রিয়তোষের উপর অনুকম্পাও জেগেছে। প্রেমের জালে আটকা পড়লে সব মৌমাছি বুঝি এমন বোকা-মাছি হয়ে যায়। কি দরকার ছিলো কামনার এই স্তূপটা সযত্নে সঞ্চয় করে রাখবার। নিজের ঘরের মধ্যে বারুদ রাখারই সগোত্র। বিস্ফোরণের ভয় নেই লোকটার? নাকি অমৃতলোকে পৌঁছে ছোটো-খাটো ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করতে সে নারাজ?

আবার টেলিফোন অপরেশকে। আবার দেখা করলো ময়দানের এক পাঁকুড় গাছের তলায়। শনিবারের বিকেল। এবার যথেষ্ট আলো ছিলো। চিঠির প্রত্যেকটি অক্ষর পড়তে কোনো অসুবিধা হলো না অপরেশের। বললো, চিঠিগুলো দিন, আমায়। খুব চাপা স্বর অপরেশের কিন্তু তার উত্তাপটুকু সরমার কান এড়ালো না।

বাণ্ডিলটা রুমালে বাঁধতে-বাঁধতে সরমা ম্লান হাসলো, এগুলো যে আইভির লেখা, এটা বুঝতে নিশ্চয় আপনার অসুবিধে হচ্ছে না? এই ধরনের চিঠি বিয়ের পরে আপনিও হয়তো পেয়েছিলেন। এগুলো এখন আমার কাছেই থাক। যদি আইভি অস্বীকার করে, জানাবেন, নিজে এগুলো দিয়ে যাবো তার সামনে। আর চিঠিটা যে আমার স্বামীকে লেখা, এটা কোথাও লেখা না থাকলেও বুঝতে নিশ্চয় আপনার কষ্ট হচ্ছে না। আমার স্বামীকে যে লেখা, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ এগুলো বুকে করে আমি আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। নিজের বুকের তন্ত্রী অপারেশন করতে যে নিজে এগিয়ে আসে, তার মর্মদাহটা উপেক্ষার নয়, সন্দেহজনক তো নয়ই। আপনি আপনার স্ত্রীকে এ সর্বনাশের পথ থেকে ফেরান। দুটো সংসার একসঙ্গে ছাই করে ফেলার মধ্যে হয়তো কৃতিত্ব আছে, কিন্তু মানবিকতা নেই।

এই কথাগুলো বলার সময় সরমার চোখ দিয়ে জলের বড়ো-বড়ো ফোঁটা গড়িয়ে পড়েছিলো। বিচারপতি পর্যন্ত ভ্রূ কুঁচকে অনেকক্ষণ চেয়েছিলেন সরমার দিকে।

সরকারী উকিল রিমলেস চশমাটা সযত্ন অবহেলায় টেবিলের উপর আছড়ে উদাত্ত গলায় বলেছিলেন, তারপর, মিসেস সেন ?

অপরেশ মাথা নিচু করেছিলো। মুখ তোলেনি। সরমা শুধু দেখেছিলো নিজের শার্টটা অপরেশ শক্ত-হাতে চেপে ধরেছিলো। মুঠো সরাতে জামার সেই জায়গাটা কনেকখানি কুঁচকে গিয়েছিলো। মাকড়শার জালের মতন অনেকটা জায়গা জুড়ে হিজিবিজি ভাঁজ। ঠিক তখনই ভয়ের গাঢ় কালো ছায়াটা সরমার মনের সামনে নেমে এসেছিলো। মনে হয়েছিলো, অপরেশের মনের চেহারাটা যেন ওই ভাঁজগুলোর মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিলো। সব কিছু ভুলে সরমা তার দুটো হাত চেপে ধরে আকুল কণ্ঠে বলেছিলো, অপরেশবাবু !

হাত ছাড়িয়ে অপরেশ উঠে দাঁড়িয়েছিলো। বাড়ির দিকে নয়, ময়দানের মাঝখানে, যেখানে গাছের ঘন জটলা, সেইদিকে চলে গিয়েছিলো দ্রুত পায়ে।

তার কয়েকদিন পরেই ব্যাপারটা ঘটে। আইভি কোর্টে একটি কথাও স্বীকার করলো না। চিঠিগুলো একটার পর একটা তার সামনে ধরতে একবার শিউরে উঠেই মাথা নিচু করেছিলো। সরকারী উকিলের জেরার কোনো উত্তর দেয়নি, অন্তত যুক্তিগ্রাহ্য কোনো উত্তর। না, এ চিঠি নিয়ে তাকে কোনো কথা বলেনি অপরেশ। কোনো ঝগড়াঝাটি নয়, কথা কাটাকাটিও না। বাড়ির ঝি-চাকরও সেই কথা বললো। বাবুর সঙ্গে মায়ের কোনো চেঁচামেচি তারা শোনেনি। প্রিয়তোষবাবুর এ-বাড়িতে আসার খবরও তারা জানে না। কারণ, দুপুরের দিকে তারা দু'জনেই বাড়ি থাকে না।

আসল কথা বললো লিলি ষ্টোর্সের মালিক, গিরিজাবাবু। লিলি ষ্টোর্স অপরেশবাবুর বাড়ির গায়েই। এ-পাড়ায় তার দোকান পনেরো বছরেরও বেশি। হ্যাঁ, ঘটনার দিনের সব কথা তার বেশ মনে আছে। দুপুরের দিকে অপরেশবাবু দোকানে এসে ঢুকেছিলো। অসময়ে তাকে দেখে গিরিজাবাবু একটু অবাক হয়েছিলো, কি ব্যাপার, অফিস নেই ?

গিরিজাবাবুর পাশে বসতে-বসতে অপরেশবাবু বলেছিলো, আছে,

যাবো না। সন্ধ্যের দিকে একটা গানের আসর আছে। খিদিরপুরে। সেইখানে যাবো ভাবছি।

অপরেশবাবুর এই নেশার সঙ্গে পরিচয় ছিলো গিরিজাবাবুর। কারণ, তার নিজেরও একটু গান-বাজনার শখ ছিলো। অবসর সময়ে সেতারের তারে আঙুল ছোঁয়াতো। এসরাজেও ছড়্ টানতো সময়ে-সময়ে।

মাথাটা বড্ড ধরেছে, একটা সারিডন দিন তো। একটা নয়, ছুটোই দিন।

সরকারী উকিলের প্রশ্নের উত্তরে একটু ভেবে নিয়ে গিরিজাবাবু বলেছে, হ্যাঁ, একটু যেন উত্তেজিতই মনে হচ্ছিলো অপরেশবাবুকে। এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারছিলো না! পায়চারি করছিলো এধার থেকে ওধার। মাঝে-মাঝে নিজের মাথার চুলগুলো ধরছিলো মুঠো করে।

সারিডনের ছুটো বড়ি খেলো। পর-পর ছু'গ্লাস জল। কিন্তু দোকান ছাড়লো না। গিরিজাবাবুর দিকে ফিরে বললো আপনার এখানে একটু বসি গিরিজাবাবু, কোনো অসুবিধে হবে না তো!

অসুবিধে? গিরিজাবাবু হাঁ-হাঁ করে উঠেছিলো, খদ্দের লক্ষ্মী, তার উপর অপরেশবাবুর মতন খদ্দের—যার মাস-কাবারী বিল হয় প্রায় চল্লিশ টাকার কাছাকাছি। অপরেশবাবুকে নিজে উঠে গদি-আঁটা চেয়ারটা গিরিজাবাবু ছেড়ে দিয়েছিলো।

বেশিক্ষণ অপরেশ বসেনি। সব সময় রাস্তার দিকেই চেয়েছিলো। হঠাৎ তার বাড়ির সামনে একটা রিক্সা এসে দাঁড়াতেই অপরেশ উঠে পড়েছিলো, খুব সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে রাস্তার উপর এসে দাঁড়িয়েছিলো।

এই সময় সরকারী উকিল প্রশ্ন করেছিলেন, অপরেশবাবুর আচরণ আপনার কাছে অস্বাভাবিক ঠেকেনি?

প্রশ্নের সঙ্গে-সঙ্গেই আসামী পক্ষের উকিল সুধাংশু বসাক লাফিয়ে উঠলেন। টেবিল চাপড়ে প্রায় আর্তনাদ করলেন, Rape of justice-এর নমুনা দেখে। এভিডেন্স অ্যাক্ট খুলে সরকারী উকিলের অন্যায় অবৈধ প্রশ্নের প্রতিবাদ জানালেন।

হাকিম আপত্তি নাকচ করে সরকারী উকিলের পক্ষে সায় দিলেন।

থেমে-থেমে জিভ দিয়ে ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিয়ে গিরিজাবাবু ঘাড় নেড়েছিলো, হ্যাঁ, অস্বাভাবিক ঠেকেছিলো। দুটো হাত খুলছে আর বন্ধ করছে। কপালে ঘামের ফোঁটা, গলার শিরাগুলো দড়ির মতন শক্ত হয়ে উঠেছিলো।

এরপর দু'দিন ধরে জেরা চলেছিলো। শকুন যেমন বাঁকানো ঠোঁট দিয়ে অন্ত্রের জট ছাড়ায়, সুধাংশু বসাকও তেমনি একটি-একটি করে ধারালো কথার ঘা দিয়ে গিরিজাবাবুর জবানবন্দী চিরে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন। দু'বছর আগে বার্লির কৌটো নিয়ে তার সঙ্গে অপরেশের যে ছোটো-খাটো মন-কষাকষি হয়েছিলো, সেটাকে মূলধন করে বৈরিতা প্রমাণ করার চেষ্টাও হলো।

ইদানীং অপরেশ যে লিলি ষ্টোর্স থেকে জিনিস না কিনে মোড়ের মহামায়া ভাণ্ডার থেকে সব কিছু কেনে, তার জন্য অপরেশের উপর গিরিজাবাবুর কি মনোভাব হতে পারে, গিরিজাবাবুর মুখ থেকে তার একটা জুতসই উত্তর বের করার আপ্রাণ প্রয়াস চললো। কিন্তু গিরিজাবাবু আঁকা-বাঁকা সওয়ালের এলোমেলো ঝাপটায় একটুও কাত হলো না।

আরো মারাত্মক সাক্ষ্য দিলেন ডাক্তার নিখিল সিংহ। খুব সূক্ষ্ম তন্তুতে ঝুলছিলো অপরেশের পরমায়ু। আইভির জবানবন্দীর গিঁট দেবার মিহি চেষ্টা একটা হয়েছিলো বটে, কিন্তু ডাক্তার সিংহের সাক্ষের পরে সে তন্তু ছিঁড়ে খান্‌খান্‌ হয়ে গেল। যেটুকু রক্ত আইভির মুখে অবশিষ্ট ছিলো, ডাক্তার সিংহের এভিডেন্সের পরে সেটুকুও নিঃশেষে মিলিয়ে গেল। চেয়ারের হাতল দুটো আঁকড়ে ধরে নিজেকে সে সামলালো। বিরাট একটা প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর ল্যাজের ঝাপটায় যেন সে অতলে তলিয়ে যাচ্ছে, মুখ-চোখের এমনি ভাব তার।

আসামীর উকিল হাল ছাড়লেন না। ওঁদের দস্তুরই আলাদা। নৌকোর পাটাতন, দাঁড়, পাল সব চুরমার হলেও ওঁরা হাল ধরে থাকেন। আশ্বাসের হাল। ঠিক আছে, এখানে সুবিধা না হয়, উপরের আদালত আছে। আইনের বই-এর অভাব? খুঁজে-খুঁজে, ভেবে-ভেবে, উইকলি রিপোর্ট হাতড়ে-হাতড়ে ঠিক কিছু বের করে ফেলবেন। জজের চোখ ধাঁধানো

কোনো আইনের প্যাঁচ। বক্তৃতার চোটে বেসামাল করে ফেলবেন কোর্টকে। বেনিফিট অফ ডাউটের তীক্ষ্ণ কাঁটা বিঁধিয়ে কাজ হাসিল করবেন।

ডাক্তার বললেন, আঘাতটা মাথার পেছনের দিকে। অকসিপিটাল লোবে। তার অর্থ, নিহত ব্যক্তিকে কেউ পেছন থেকে আক্রমণ করেছে। সম্পূর্ণ অতর্কিত অবস্থায়। আইভির জবানী, প্রিয়তোষও আক্রমণ করেছিলো অপরেশকে। দু'জনে অনেকক্ষণ ধরে জাপটা-জাপটি হয়েছিলো। শেষকালে প্রিয়তোষ আইভির স্বামীর সজোরে গলা টিপে ধরাতে আত্মরক্ষার জন্য অপরেশ ধাক্কা দিয়েছে প্রিয়তোষকে। প্রাণপণ শক্তিতে। দেয়ালে আঘাত লেগে প্রিয়তোষ মেঝের উপর পড়ে গিয়েছিলো, আর ওঠেনি।

সুধাংশু বসাক শেষ চেষ্টা করলেন। মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্সের কুটিল সব প্রশ্ন করে ডাক্তার সিংহকে কাবু করার মতলব। ক্ষতস্থানের গভীরতা নিয়ে মারাত্মক সওয়াল। হাতুড়ি না দেওয়াল, কিসে চোট খেয়ে খুলি ফাটলো, তার সন্তোষজনক জবাবদিহি। খুব সুবিধা হলো না। সুধাংশু বসাকের কয়েকটা প্রশ্ন কোর্ট অগ্রাহ্য করলেন। বললেন, এ-সব কেবল সাক্ষীকে হয়রানি করা।

তারপর শুরু হলো আর্গুমেন্ট। সরকারী উকিল টানা দু'দিন ধরে বললেন। গোটা-দশেক আইনের বই খুললেন আর বন্ধ করলেন। ইতিমধ্যে একটু ঝিমিয়ে আসতেই পাশ থেকে প্রাণধন মিত্র খোঁচাতে লাগলেন, নিবে আসা উনোনে লোহা দিয়ে খোঁচাবার মতন। কাজ হলো। সরকারী উকিল আবার তেতে লাল হলেন। গরম কথার ফুলঝুরি শুরু হলো। আকস্মিক উত্তেজনাবশত মোটেই নয়, নিহত ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে চিঠিগুলো দেখার পর থেকেই আসামী মনে-মনে মতলব ভাঁজছিলো। সুযোগ-সুবিধে খুঁজছিলো প্রিয়তোষবাবুকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার। স্বীকার করি, প্রিয়তোষবাবু নির্দোষ নন, যে-কাজে তিনি লিপ্ত ছিলেন, তা শুধু ঘৃণ্যই নয়, সমাজ-বিরোধীও। কিন্তু তার জন্যে আইন ছিলো, আদালত ছিলো, ধর্মাবতার ছিলেন, যিনি দুষ্টের দমনকারী। এভাবে আইন নিজের হাতে নেবার অধিকার অপরেশবাবুর কেন, কারুরই নেই। তাহলে পৃথিবী অরাজক হতো, ন্যায়-শৃঙ্খলা হতো অর্থহীন। প্রিয়তোষবাবু আসামীকে আক্রমণ

করেছিলেন, এমন একটা বড়ি, যদিও আমার বন্ধু আমাদের খাওয়াবার চেষ্টা করেছেন, রীতিমতো বৃহৎ, কণ্ঠনালীর পক্ষে সহজগম্য নয়। আঘাত নিহত ব্যক্তির মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগে, সুতরাং আক্রমণের কাহিনী আসামীর স্বকপোলকল্পিত, আত্মরক্ষার বিকল্প ব্যবস্থা। যে আঁচড়ের চিহ্ন আসামী তাঁর গলায় এঁকেছেন এবং আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন যে, নিহত ব্যক্তির আঙুলের চাপেই তার সৃষ্টি।—সেটা যে অসত্য, ভিত্তিহীন, এটারও আমরা প্রমাণ পেয়েছি ডাক্তারের সাক্ষ্যে। আঙুলের দাগ প্রিয়তোষবাবু নিহত হবার অনেক পরের সৃষ্টি। সুতরাং জুরিরা এ বিষয়ে বিচার করবেন। আসামী ভারতীয় দণ্ডবিধির তিনশো দু'ধারা অনুযায়ী দণ্ডনীয় কিনা, আপনারা তা স্থির করুন।

সুধাংশু বসাক নিলেন আড়াই দিন। যুক্তি-তর্কের চেয়ে আবেগের ধার ঘেঁষে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। জুরিদের বললেন, নিজেদের অসামীর জায়গায় বসাতে। ধর্মপত্নীর সঙ্গে একজন ব্যভিচারে লিপ্ত, শুধু শোনা কথা নয়, প্রকৃষ্ট প্রমাণও দেখছেন চোখের সামনে, তখন যে-কোনো স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষও উন্মাদ হয়ে যায়। বিচার-বিবেচনা সব লোপ পায়। মানুষ বুঝি আর মানুষ থাকে না। তবু আসামী অদ্ভুতভাবে আত্মসংবরণ করেছেন। নিহত প্রিয়তোষবাবুকে বোঝাতে গিয়েছিলেন শান্তভাবে, এ-ধরনের অনাচারের বিষময় ফল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করতে গিয়েছিলেন, ফলে প্রিয়তোষবাবু হিংস্রভাবে তাঁকে আক্রমণ করেছিলেন। নিজের প্রাণ রক্ষার্থে আততায়ীকে আঘাত করার নজির আইনে আছে। এ অপরাধ ক্ষমার্হ।

পাথরের মূর্তির মতন নিশ্চল নিথর হয়ে সরমা বসে-বসে শুনলো প্রত্যেকটি কথা। ভাব দেখে মনে হলো, নিশ্বাসও যেন স্তব্ধ। রক্ত-স্রোতও বুঝি মন্দীভূত।

আইভিও এসেছিলো, কিন্তু সে সরমার মতন একভাবে বসে থাকতে পারেনি। রুমাল দিয়ে চোখ ঢেকে মাঝে-মাঝে সামনের টেবিলে মাথা রেখেছে। সময়ে-সময়ে কোর্ট-ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে টেনে-টেনে ফুসফুস ভরে বাতাস নিয়েছে, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারেনি বাইরে, আবার ফিরে এসেছে বন্ধ কোর্ট-ঘরে। তার মনে হয়েছে,

স্বামীর কাছ থেকে সরে গেল, তাকে চোখের আড় করলেই বুঝি বিপর্যয় ঘটবে। যে অদৃশ্য ফাঁস অপরেশের কণ্ঠের চারপাশে দুলছে, সেটা আঁট হয়ে বসবে। পৃথিবীর আলো-বাতাস সব মুছে দেবে নিষ্করুণ পেষণে।

রায় বেরোবার দিন সরমা খুব সকালে এসে পৌঁছালো, এজলাস শুরু হবার আধ ঘণ্টা আগেই। সরকারী উকিল কিছু বলেননি, তবে প্রাণধনবাবু বারণ করেছিলেন। তাঁর অফিস-রুমে বসলেই পারতো সরমা, মিছিমিছি এমন দিনে কোর্টে আসবার কি প্রয়োজন? খবর তো ঠিক সময়েই যাবে কানে।

সরমা নিষেধ শোনেনি। প্রাণধনবাবুর মুহুরীর সঙ্গে কোর্টে চলে এসেছে। এসে দেখলো তার আগেই আইভি এসে পৌঁচেছে। কোর্ট-ঘরে ঢোকেনি, বারান্দায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখান দিয়েই অপরেশকে নিয়ে আসবে। তাকে দেখবার জন্যই আইভি দাঁড়িয়ে আছে। ভালো করে কাছ থেকে দেখবে বলে।

সরমার মনে হলো, পাশ দিয়ে আসার সময় আইভি যেন আড়-চোখে তার দিকে চেয়ে দেখলো পলকের জন্য। পাড়হীন কাপড়, আভরণহীন দু'টি হাত, সাদা সিঁথির উপরই বুঝি চোখ বোলালো। সেই সঙ্গে একটু শিউরে উঠলো কিনা, কে জানে। ভারী দীর্ঘশ্বাসের একটা শব্দ সরমার কানে এলো। কিংবা হয়তো দীর্ঘশ্বাসের শব্দ নয়, বাতাস লেগে বটপাতার কাঁপনেরই আওয়াজ।

সরমা ভিতরে এসে সরকারী উকিলের পাশে বসলো। আইভি ঢুকলো না। বারান্দায় হেলান দিয়ে তেমনই দাঁড়িয়ে রইলো। নিস্পন্দ নিথর।

আজও কোর্ট-ঘরে জমাট ভিড়। উকিল-ব্যারিষ্টারও অনেক এসে জুটেছেন। এতদিন সংবাদপত্রের কল্যাণে কেসের বিবরণ ফলাও হয়ে বেরিয়েছে। রোজ সকালে চায়ের সঙ্গে পরম উপভোগ্য, স্বাদু, মুখরোচক। জনতার চোখ ঘুরছে। আসামীর দিক থেকে সরমার উপর, মাঝে-মাঝে বারে দাঁড়ানো আইভির দিকে। এ নাট্যের পঞ্চমাঙ্কে বুঝি এই তিনটি চরিত্রই এসে ঠেকেছে, যবনিকা পড়া পর্যন্ত তিনটিই থাকবে কিনা, সেটাই লোকেরা ভাবছে।

আশ্চর্য, সরমার কেবল প্রিয়তোষের কথা মনে পড়তে লাগলো। তার অনুরাগের কথা নয়, আইভি তার জীবনে আসার আগের টুকরো-টুকরো ঘটনা নয়, শুধু প্রিয়তোষের অশরীরী উপস্থিতি। একবার সত্যিই চমকে উঠলো সরমা। কে যেন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, কঙ্কাল-হাত তার কাঁধের উপর রেখেছে। কি চায় প্রিয়তোষ? তাকে দেবার মতন কি আছে সরমার। যা ছিলো, সবই তো উজাড় করে দিয়েছিলো তাকে, যৌবনের সমস্ত উপকরণ সাজিয়ে নৈবেদ্য তৈরি করেছিলো, কিন্তু তা অনাদরে, উপেক্ষায়, অবহেলায় প্রিয়তোষ দূরে সরিয়ে দিয়েছিলো। তবে আর কি দেবার আছে? বিশেষ করে এখন? মার্জনা চায় প্রিয়তোষ? না, তা সম্ভব নয়। মুহূর্তে সরমা কঠিন হয়ে উঠলো। তার বসার ভঙ্গীতে ইস্পাতের দৃঢ়তা।

ঠিক সেই সময়ে হাকিম রায় দিতে শুরু করলেন। টাইপ করা প্রায় ছত্রিশ পাতা। শুনতে-শুনতে ক্লান্তি এলো সরমার। এমন একটা স্পষ্ট অপরাধ, সাক্ষীদের নিশ্ছিদ্র এজাহারের বজ্র গাঁথুনি, এর বিচার করতে এতো ভণিতার কি প্রয়োজন! দোষী, দোষী, দোষী। আর কোনো শব্দ ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই।

আসামী দোষী। হাকিমও সেই কথাই বললেন। জুরিরা আগেই এই কথা বলেছিলো, হাকিম তারই পুনরুক্তি করলেন, আইনের ভাষায়, অক্ষরের উপর অক্ষর সাজিয়ে ছত্রিশ পাতা ধরে যুক্তির মালা গেঁথে-গেঁথে। আত্মরক্ষার ওজর তিনি সরাসরি নাকচ করে দিলেন। আসামীর প্রাণদণ্ডের হুকুম দিয়ে উঠে পড়লেন চেয়ার থেকে।

অনেকগুলি বোল্‌তা কেমন করে সরমার মাথার মধ্যে ঢুকে পড়েছিলো। অশ্রান্ত গুঞ্জনে পাগল করে তুলবে মানুষকে। চেয়ার থেকে টলতে-টলতে সরমা উঠে পড়লো। এই ক'মাস ধরে তিল তিল করে এমনই এক ইচ্ছা, এমনই এক পরিণতিকে সরমা সযত্নে লালন করে আসছিলো, কিন্তু সঙ্কল্প পূর্ণ হওয়ার দিন কিছুতেই উৎফুল্ল হতে পারলো না সরমা। মনে হলো, আরও কিছুদিন চলতে পারতো এমন জমাট জীবন-নাট্য। জীবন-মরণের কানামাছি খেলা। দ্বন্দ্ব আর দ্বিধার কাঁটায় তাহলে ক্ষতবিক্ষত হতে পারতো আইভি।

উকিলে-উকিলে কথা হচ্ছে। আপীলের কথা। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই দরখাস্ত দেবার জল্পনা। কাঠগড়ায় মাথা রেখে নির্জীবের মতন বসে রয়েছে অপরেশ।

অপরেশের দিকে চেয়েই সরমা বাইরের বারান্দার দিকে চোখ ফেরালো। নিশ্চয় আইভি ঢুলে পড়েছে মেঝের উপর। লোকেরা হয়তো জলের ঝাপটা দিচ্ছে চোখে-মুখে। এই সময় একবার তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে সরমা? এতদিন আইভি এই নাটকের নায়িকা ছিলো, সুয়োরানী; আজ তার পোশাক খোলার সময় এসেছে। সরমার আবরণ আর আভরণের সঙ্গে মিলিয়ে রিক্ততার পরিচ্ছদ জড়াতে হবে সর্বাঙ্গে এবার।

প্রাণধন মিত্র ঝুঁকে পড়ে সরমার কানে কানে কি বললেন। অস্পষ্ট গলার স্বর। কিছু সরমার কানে গেল, অনেকখানিই শুনতে পেলো না। আপীলে কিছু হবে না। ফাঁসি অপরেশের হবেই, এই রকমই কিছু একটা যেন বললেন।

কোর্ট-ঘরের চৌকাঠ বরাবর গিয়েই কিন্তু সরমা অবাক হলো। না, মূর্ছা যায়নি আইভি, ঢুলেও পড়েনি মেঝের উপর। দরজার একটা পাল্লায় হাত রেখে এক-দৃষ্টে সে চেয়ে রয়েছে অপরেশের দিকে। সুধাংশু বসাক অপরেশের সঙ্গে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। অপরেশ উত্তর দিচ্ছে নিচু গলায়।

চেয়ে-চেয়ে দেখলো সরমা। এই ক'দিন বরং নিস্তেজ, নির্জীব মনে হয়েছিলো আইভিকে, কিন্তু আজ যেন অনেকটা সুস্থ, অনেক প্রদীপ্ত। বিস্ফারিত উজ্জ্বল দু'টি চোখের দিকে চেয়েই কারণটা বুঝতে পারলো সরমা।

এক অবস্থা মোটেই নয় দু'জনের। কি নিয়ে বাঁচবে সরমা। লম্পট, চরিত্রহীন স্বামীর স্মৃতি সম্বল করে বাঁচতে পারে কোনো মেয়ে? প্রতি মুহূর্তে মনে হবে স্বামীর আলিঙ্গনের বেষ্টনে শুধু সে-ই ধরা পড়েনি, আরও একজন পড়েছিলো। আরও একজন আছে তার স্বামীর ভালোবাসার অংশীদার। না, অংশীদার নয়, পুরো দখল করেছিলো স্বামীকে। শেষদিকে অন্তরের ঘৃণাটুকু প্রিয়তোষ নির্বিচারে ছুঁড়ে দিয়েছিলো সরমার দিকে।

আর আইভি! স্বামীর স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে থাকবে তার মনে। স্ত্রীর মর্যাদা, সম্মান, দেহের শুচিতা রক্ষা করার জন্য যে স্বামী প্রতিপক্ষকে চরম আঘাত হেনেছে। যা স্বামীর কর্তব্য। বীর্যবান এমন স্বামীর কথা চিন্তা করবে তন্ময়চিত্তে। স্বামীর প্রতিকৃতি বুকে জড়িয়ে নিজের স্তূপীকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে বাকী জীবনটুকু।

এ-কি করলো সরমা? কেন এ ভুল করলো? ভেবেছিলা জীবন থেকে এটুকু কেড়ে নিতে পারলেই বুঝি আইভি নেমে আসবে সরমার পাশে। স্বামীর ভালোবাসা না পাওয়ার ক্ষোভ সরমার কিছুটা মিটবে আইভিকে স্বামীহীনা করে।

কিন্তু না, আঁচলে মুখ ঢেকে সরমা সরে এলো। স্বখাত সলিলে নিজেকে ডুবিয়েছে সরমা। হাতছানি দিয়ে ডেকে এনেছে নিজের সর্বনাশ।

তার চেয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিলেই তো ভালো। যদি পুড়িয়ে ফেলতো চিঠির স্তূপ, হাত পেতে আইভির দেওয়া টাকাগুলো নিয়ে আঁচলে বাঁধতো, তাহলে অপরেশ বেঁচে যেতো, আর মরতো আইভি, কিংবা দু'জনেই থাকতো জীবন্মৃত হয়ে। প্রতি পদে অপরেশ ভাবতো ব্যাভিচারিণী, অসতী স্ত্রী। তার সেবা নিতে, যত্ন নিতে, ভালোবাসা নিতে সর্বশরীর কুণ্ঠায় শিউরে উঠতো, ঘৃণায় ভরে উঠতো অন্তর। আবার আইভিও মনে করতো, এমন একটা মানুষের সঙ্গে সে ঘর করছে, সংসার করার অভিনয় করে চলেছে, যে খুনী। তিলে তিলে একটা মানুষকে হত্যা করার অভিসন্ধি এঁটেছে মনে-মনে। নিষ্ঠুর আঘাতে একজনকে মুছে দিয়েছে পৃথিবী থেকে।

এই অবস্থায় কতদিন কাটাতে পারতো দু'জনে। একদিন ক্ষতবিক্ষত হয়ে দু'জনেই ফণা তুলে দাঁড়াতো। ছোবল দিতো পরস্পরকে। দু'চোখে নীল হিংসা বিচ্ছুরিত হতো, খণ্ডিত জিহ্বায় তীব্র হলাহল।

এই দুর্বিসহ অবস্থা থেকে এদের মুক্তি দিয়েছে সরমা। নিজের দম্ভ আর জেদের বশে আরো একটা সংসার ছারখার করার এমন সুযোগ হেলায় নষ্ট করেছে।

দুর্ঘটনা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কেবিনের সামনে ডেক-চেয়ারে বসে পড়তে-পড়তে মানোযোগটা বারেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিলো। স্টিমার চলতে শুরু করে দিয়েছে, কাঠের চাকায় উঠছে তার ক্রুদ্ধ গর্জন। কচুরির ঝাঁক ছিন্ন-ভিন্ন করে আর জলে সমুদ্রের ঢেউ জাগিয়ে স্টিমার এগিয়ে চলেছে। সকালের রোদে নদীর জল কাচের গুঁড়োর মতো জ্বলছে, ইলিশ মাছের সন্ধানে লম্বা জাল ছড়িয়ে নেচে চলেছে জেলে-ডিঙির বহর।

হাতের ডিটেকটিভ উপন্যাসে তখন ঘটনার ভয়ঙ্কর আবর্ত। তিনটে খুন করে আর দুর্মূল্য পান্নার ড্রাগনটা হস্তগত করে দস্যু সর্দার ক্যাং চু পলাতক, বাঙালি ডিটেক্‌টিভ সমুদ্র রায় তাকে ধরবার জন্যে ইরাবতী নদী দিয়ে লঞ্চ ছুটিয়েছে পূর্ণবেগে। এমন সময় জলের তলায় প্রলয়ঙ্কর শব্দে কী ফাটলো! চুম্বক মাইন? কিছু বোঝা গেল না। কিন্তু মুহূর্তে ডিটেক্‌টিভ সমুদ্র রায় লঞ্চ থেকে—

উত্তেজনায় লোমগুলো যখন দাঁড়িয়ে উঠতে যাবে, ঠিক সেই সময় ইন্দিরা চৌধুরী অন্যমনস্ক। বইটা মুখের সামনে ধরে কান খাড়া করে শোনবার চেষ্টা করতে লাগলো কথাগুলো। স্টিমারের অবিশ্রাম গর্জনের মধ্যে দিয়েও সেই কল-কাকলি বেশ স্পষ্টভাবেই কানে আসতে লাগলো।

ওরা দু'জনে দাঁড়িয়েছে ফ্রন্ট-ডেকের রেলিং ধরে—ইন্দিরার দিকে পিঠ দিয়ে। সুন্দর ছেলেটি, আরও সুন্দর সঙ্গের ওই মেয়েটি। বিশৃঙ্খল হাওয়ায় ওদের চুল উড়ছে, শাড়ি উড়ছে, উড়ছে পাঞ্জাবির প্রান্ত। বাতাসে ভাসছে একটা মৃদু-মধুর সুরভি। ওরা এখন নিজেদের মধ্যেই নিমগ্ন।

'—সত্যি, বড্ড খিদে পেয়েছে।'—ছেলেটির গলা।

মেয়েটি ধমক দিলো : 'তুমি বড্ড পেটুক, বিভাস। স্টিমারে ওঠবার আগে অতো খেয়ে এলে না, এখন আবার খেলে অসুখ করবে যে।'

'—না, কিছুতেই না—' ছেলেটি জোর গলায় প্রতিবাদ করলো : 'জানো, আমি ডাক্তার? আমাদের কখনো অসুখ করে না। সত্যি ইলু, তোমার টিফিন-ক্যারিয়ারের গল্‌দা-চিংড়িগুলো—'

'—আবার?'—ইলু অথবা ইলা এবার কড়াভাবে শাসন করে দিলো : 'ফের গল্‌দা-চিংড়ির নাম করেছো কি, টিফিন-ক্যারিয়ারসুদ্ধ নদীতে ফেলে দেবো। দশটার আগে এক টুকরো কিছু খেতে পাবে না। ডাক্তার! ছাই ডাক্তার তুমি! এম্‌-বি পাশ করেছো খালি মানুষ মারতে।'

শাসিত হয়ে বিভাস চুপ করে রইলো। বোঝা গেল, গল্‌দা-চিংড়ির ব্যাপারে সে নিরাশ এবং মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে।

ইলা কোমল স্বরে বললো, 'সত্যি, লক্ষ্মীটি, রাগ করো না। তোমার জন্যে খাবার আনা হয়েছে, তুমিই তো খাবে। আমি বলছিলাম—'

স্টিমার বাঁক ঘুরছে একটা। অসতর্ক নৌকোগুলোকে জানান-দেবার জন্যে প্রচণ্ড গভীর রবে বাঁশি বাজিয়ে দিলো দু'বার। কয়েকটা কথা তার মধ্যে হারিয়ে গেল, বাকী কথাগুলো তেমনি অখণ্ড মনোযোগে শুনে যেতে লাগলো ইন্দিরা। নিজের ব্যর্থ শূন্য জীবনটা পরিপূর্ণ যৌবন-সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে এখনো মাঝে-মাঝে লোলুপ হয়ে হঠে।

ইলা বলে যাচ্ছে : 'আচ্ছা, একটুও কি রোমান্স নেই তোমার? বিয়ের পরে হনিমুন করতে চলেছো, তোমার ভালো-ভালো কবিতা মনে পড়বে, তা নয় গল্‌দা-চিংড়ি আর গল্‌দা-চিংড়ি!'

'—বোঝো না, মানুষ কেটে-কেটে ভয়ানক রিয়ালিস্টিক হয়ে গেছি। এখনো কবিগুরুর কবিতা মনে পড়ে বই কি, কিন্তু সে হচ্ছে :

'পাক-প্রণালী'র মতে কোরো তুমি রন্ধন,
জেনো ইহা প্রণয়ের সব সেরা বন্ধন।
চামড়ার মতো যেন না দেখায় লুচিটা,
স্বরচিত বলে দাবী নাহি করে মুচিটা,
পাতে বসে পতি যেন নাহি করে ক্রন্দন—'

'—ওরে অকৃতজ্ঞ, কবে তোমাকে চামড়ার মতো লুচি খাইয়েছি?'

'—অনেকদিন।'

'—মিথ্যেবাদী, ছোটোলোক'—ইলার ঝঙ্কার তারপর খানিকটা দাম্পত্য কলহ, এক ঝলক মিষ্টি হাসি। সকালের রোদ, নদীর জল, নীলাঞ্জন আকাশ, স্টিমারের চাকায় জলের গর্জন, সব মিলে যেন অপরূপ এক টুকরো লিরিক্ কবিতা।

স্কুল মিস্ট্রেস কুরূপা মিস্ ইন্দিরা চৌধুরীর বুকের ভেতরটা অকারণে পুড়ে যাচ্ছে। রক্তের মধ্যে একটা চাপা আক্রোশ—স্টিমারের পাড্‌লের মতো অশ্রান্ত ঘাত-প্রতিঘাত। গালে-মুখে যেন একবার রক্ত-কণিকা এসে ঝিঁ-ঝিঁ করছে। কোন্ ফাঁকে হাত থেকে রোমাঞ্চকর ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসটা খসে পড়লো।

ওদের কাছে এখন সমস্ত পৃথিবীর রংই আলাদা। আকাশ-বাতাস নদীর জল আর স্টিমারের বাঁশিতে যেন সানাইয়ের সুর উঠছে। শরতের রোদে দিগন্তটা যেন বাসন্তী রঙের শাড়ি পরে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো এসে দাঁড়িয়েছে ওদের দৃষ্টির সামনে। স্টিমারের চাকায় তারই জল-তরঙ্গ। আর শুধু পৃথিবীই নয়—ওদের এই মিলনোৎসবে চারদিককার সমস্ত মানুষও যেন এসে যোগ দিয়েছে। যে সমস্ত নিদ্রাতুর যাত্রী এই দিন-দুপুরেই ডেকের ওপর লম্বা হয়ে পড়েছে, অথবা মুর্‌গীর ঝোলের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে যারা ঘোরাঘুরি করছে বাটলারের ঘরের সামনে, কিংবা এঞ্জিনের খোপরে ঢুকে যে-সব কালি-মাখা খালাসী কয়লা ঠেলছে বয়লারের গোলাপী আগুনে—তারা আর কেউ নয়, এই আনন্দিত বর-যাত্রীরই সঙ্গী। তাই পোড়া-মুখ কুৎসিত ইন্দিরা চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করে নিতেও দেরি হলো না ইলার।

ডেকে তিনজন। গল্প জমে গেল। কোথায় যাচ্ছেন, কী পরিচয়, কী করেন। বাড়িতে কে-কে আছেন। কবে বিয়ে হলো। আশা করি, দাম্পত্য-জীবন মধুময় হয়ে উঠেছে। আপনাদের দেখে ভারী ভালো লাগলো—একেবারে আইডিয়াল কম্বিনেশন যাকে বলে।

বিকেল হয়ে এসেছে। নদীর জলে ছড়িয়ে পড়েছে রাঙা আলো। ইলার সুন্দর মুখে সেই আলো এসে অপরূপ মায়া ছড়িয়ে দিলো। সেইদিকে

একবার চোখ বুলিয়ে গল্প শুরু করলো ইন্দিরা : 'জানতে চেয়েছেন আমর মুখটা এমনভাবে পুড়লো কী করে। ওটা নিতান্ত অ্যাক্সিডেন্ট। কিন্তু ও-কথা থাক। একটি মেয়ের গল্প বলি শুনুন। মনে করে নেবেন এটা সত্যি-সত্যিই গল্প—এর মধ্যে বাস্তব কিছু নেই।'

বিভাস আর ইলা একবার দৃষ্টি বিনিময় করে নিলো। অর্থাৎ নিজের জীবনের কথাই বলতে যাচ্ছে ইন্দিরা। আত্ম-চরিত অথবা বাস্তব ঘটনা বলবার রেওয়াজই এই, গোড়াতেই তাকে অস্বীকার করে নিতে হবে।

ইন্দিরা বললো : 'হ্যাঁ, নিতান্তই গল্প। স্টিমারে এর শুরু, স্টিমারেই এর শেষ। সুতরাং এর কিছুই বিশ্বাস করবেন না। মনে করবেন শুধু সময় কাটানো ছাড়া এর আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।'

ইলার চোখ জ্বল্‌জ্বল্‌ করে আগ্রহে। বিভাসের সকৌতুক দৃষ্টি। দু'জনেই সমস্বরে জবাব দিলো, 'আচ্ছা, বলুন আপনার গল্প।'

স্টিমার চলেছে পূর্ণবেগে। আকাশে ম্লান হয়ে আসছে আলো। দু'পাশের গ্রামগুলো যেন স্বপ্নের এক এক টুকরো ছবির মতো দেখাচ্ছে—উড়ে চলেছে গাং-শালিকের ঝাঁক, মাছরাঙারা পান্নায়-গড়া হাল্‌কা দেহ নিয়ে ঝুপ্‌-ঝুপ্‌ করে ছোঁ মারছে জলে। জেলেদের জালে রুপোর মতো ঝলকাচ্ছে ইলিশ মাছ। নিচের থেকে আসছে স্টিমের আর খালাসীদের রান্নার একটা মিষ্টি মিশ্র গন্ধ।

ইন্দিরা বলতে শুরু করলো : 'একটি মেয়ের গল্প। সাধারণ মেয়ে। পথে-ঘাটে যাদের দেখা যায়, সংসারে যাদের সঙ্গে প্রত্যেকদিন সাক্ষাৎ, তাদেরই একজন। তাকে দেখলে কারো চোখ তার ওপরেই আটকে পড়ে না—অথবা চোখ ফিরিয়ে নেবারও দরকার হয় না। গ্রামে যারা তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালায় এবং শহরে এসে যারা লেখাপড়া শিখেও সহজভাবে একা-একা পথ চলতে পারে না, এ মেয়েটি তাদেরই দলে।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এ-সব কালো মেয়ের মুখে একটা চমৎকার লাবণ্যের আলো থাকে—অন্তত প্রথম বয়সে। ঝক্‌ঝকে ফর্সা রং সেই আলোকে ম্লান করে রাখে, কিন্তু শান্ত শ্যামলতার ভেতর দিয়ে তা ঠিকরে পড়ে প্রাণের আলোর মতো। ঘনিষ্ঠভাবে না মিশলে একে দেখা যায়

না—যারা দেখে, তারা আর ভুলতে পারে না। একটা জিনিস মনে রাখবেন। উজ্জ্বল গৌরাঙ্গী মেয়ের প্রেমে যারা পড়েছে তাদের আত্ম-রক্ষার সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু কালো মেয়েকে যারা ভালোবেসেছে, তাদের উদ্ধারের বিন্দুমাত্র আশা নেই।

আমি যে মেয়েটির কথা বলছি—ধরুন তার নাম লক্ষ্মী—এই লাবণ্যের আশীর্বাদ সে-ও পেয়েছিলো। লেখাপড়া মন্দ করেনি, থার্ড ইয়ার পর্যন্ত পড়েছিলো। তারপরে তার বিয়ে হয়ে গেল, যেমন করে এই সব মেয়েদের হয়। প্রেমে পড়ে নয়—সিভিল ম্যারেজ নয়, বাপ-মায়ের পছন্দ করা একটি সাধারণ বাঙালি ছেলের সঙ্গে। তার নাম মনে করুন, সত্যেন। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে চাকরি করে, কলকাতায় নিজের একখানা দোতালা বাড়ি আছে, আছে বাপ-মা ভাই-বোন। গল্পের নায়ক হবার মতো কোনো গুণ নেই, না রোমিও, না ডন-জুয়ান। কলো রঙের একটি ছেলে, মাঝারি ধরনের বি-এ পাশ করে ঢুকেছিলো চাকরিতে।

কিন্তু লক্ষ্মী সুখী হয়েছিলো—সুখী হয়েছিলো সত্যেনও। অফিস পালিয়ে দুপুরে সত্যেন আসতো বাড়িতে, স্ত্রীকে নিয়ে যেতো বিলিতী বায়স্কোপে ম্যাটিনীর ছবি দেখতে। সন্ধ্যেয় লেকের ধারে বসে 'হ্যাপি বয়' আইসক্রীম খেতো, আউটরাম ঘাটের পাশে ছায়া-ঘেরা লোহার বেঞ্চিতে বসে বসে দেখতো রেঙ্গুনের জাহাজ আর গঙ্গার জলে দিনান্তের আলোর ঝলক। সূর্য ডুবে যেতো ; হাওড়ার আকাশে উঠতো চাঁদ, গুন্-গুন্ করে লক্ষ্মী গান গাইতো : যেতে যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে চাঁদ উঠেছিলো গগনে—

বেশ কাটছিলো, কিন্তু কাটলো না। সত্যেনের দেখা দিলো প্লুরিসি—তারপর প্লুরিসি থেকে যক্ষ্মা।'

ইন্দিরা চশমার কাচ মুছে নেবার জন্যে এবার চুপ করলো এবারে। নদীর পূর্ব পাড়ে গ্রামগুলোকে অস্পষ্ট করে দিয়ে নেমেছে সন্ধ্যে।—পশ্চিম আকাশে এখনো জ্বলন্ত তামার রক্তরাগ। স্টিমারের আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। সার্চলাইটের আলো দূরে নারকেল বীথি সমাকীর্ণ নদীর বাঁকটাকে উদ্ভাসিত করে দিলো। এদিকে ইলা আর বিভাস নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ইন্দিরার মুখের দিকে।

ইলার স্বরে বেদনা প্রকাশ পেলো : 'যক্ষ্মা ?'

ইন্দিরা চশমাটা পরে নিলো। কাচের ওপরে ইলেট্রিকের আলো পড়ে যেন ইন্দিরার চোখ দুটোই জ্বলতে লাগলো : 'হ্যাঁ, যক্ষ্মা। এ-সব কাব্যের এ-রকম বিয়োগান্ত পরিণতিও মাঝে-মাঝে ঘটে থাকে। কী করা যাবে, উপায় নেই।

চিকিৎসা চলতে লাগলো। ব্যাঙ্কে সঞ্চিত যা কিছু দিয়ে—লক্ষ্মীর গয়না বন্ধক দিয়ে। কিন্তু কোনো লাভ নেই—সকলেই বুঝতে পারছিলো যা অনিবার্য, তাই ঘনিয়ে আসছে। লক্ষ্মীর মনের অবস্থা আপনারা অনুমান করতে পারেন, সে সম্বন্ধে কোনো কথাই আমি বলবো না। তবু যখন একবিন্দু আশা থাকে না—তখনো আশা করতে ছাড়ে না মানুষ। হয়তো লক্ষ্মীর ক্ষেত্রেও তাই হয়ে থাকবে।

কিন্তু আশ্চর্য, সবাই যখন ভরসা ছেড়ে দিয়েছে, তখন আরো বেশি করে ভরসা পাচ্ছে সত্যেন। এ রোগের নাকি ধর্মই এই। তার ধারণা, সে সম্পূর্ণ সেরে গেছে, এখন আর ভয়ের কোনো কারণ নেই। বাস্তবিক, আগের চাইতে তার বাইরের স্বাস্থ্য সেরেও গিয়েছিলো অনেকটা। সত্যেন খুঁত-খুঁত করতে লাগলো : এভাবে আমাকে আলাদা করে রাখবার দরকার নেই, আমি সকলের সঙ্গে মিশবো, সকলের সঙ্গে খাবো। লক্ষ্মীই বা এমন করে দূরে থাকবে কেন ? আমার কাছে সে স্বচ্ছন্দেই আসতে পারে এখন।

শেষ কথাটাই সত্যেনের আসল লক্ষ্য। কিন্তু বাড়ির নতুন ডাক্তার —ধরা যাক তার নাম বিভাস—'

বিভাস আর ইলা একসঙ্গে চমকে উঠলো।—বিভাস !

ইন্দিরা হেসে উঠলো : 'মনে করুন কাল্পনিক নাম। সামনে যাকে পাওয়া যায়, তাকে মডেল করে নিলে গল্প বলতে সুবিধে হয় না ? তাছাড়া বিভাস নামে আর একজন ডাক্তার থাকলেই বা ক্ষতি কি ?'

ইলার মুখে প্রতিবাদ ঘনিয়ে এলো, কিন্তু বিভাস কৌতুক বোধ করছিলো। বললো, 'না-না, ক্ষতি নেই। আপনি বলে যান।'

'—কী বলছিলাম'—কৌতুকময় স্মিতহাস্যে ইন্দিরা একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো ইলার দিকে : 'লক্ষ্মীকে কাছে পাওয়ার জন্যে সত্যেন যেন

দিনের পর দিন উন্মাদ হয়ে উঠতে লাগলো। এটাও নাকি এ রোগের আরো একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। ভেতরে যতো ক্ষয়ে আসে, অতৃপ্ত খিদেগুলো ততো বেশি তীব্র হয়। কিন্তু তরুণ ডাক্তার বিভাসের—' ইন্দিরা একটু থেমে বললো : 'বিভাসের কড়া নিষেধ—যে-কোনো রকম উত্তেজনা রোগীর পক্ষে মারাত্মক। সুতরাং লক্ষ্মীর স্বামী-সম্ভাষণের অধিকার ছিলো না।

তাছাড়া আরো একটু ব্যাপার ছিলো—যা আর কেউ কিছু বুঝতে না পারলেও লক্ষ্মীর দৃষ্টি এড়ায়নি। দিনের পর দিন রোগীর চিকিৎসায় নিঃস্ব হয়ে আসা এই পরিবারটির প্রতি জেগে উঠছিলো বিভাসের একটা অহেতুক সমবেদনা। শেষ পর্যন্ত সে দু'বেলা যাতায়াত করতে শুরু করলো। ফী চাওয়া তো দূরের কথা, সে সম্বন্ধে কোনো কথা উঠলেই জিভ কেটে তিন হাত পিছিয়ে দাঁড়াতো। বলতো—না না, টাকা আর কেন, এ তো আমার কর্তব্যই—

দরিদ্র পরিবারটি তাতে অপমানিত হলো না, বরং স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

কিন্তু নতুন ডাক্তার—বিশেষ করে তরুণ ডাক্তারদের কর্তব্য-বোধ ক্ষেত্র বিশেষে মাঝে-মাঝে মারাত্মক হয়ে ওঠে। না····না বিভাসবাবু, কিছু মনে করবেন না, এ কটাক্ষ আপনাকে নয়। এটা আমি সাধারণভাবেই বলেছি—একেবারে দায়িত্বহীন উক্তি বলেই আপনি এটাকে উড়িয়ে দিতে পারেন।

যাই হোক, কর্তব্যের তাগিদেই নতুন ডাক্তার একদিন এক-ঝুড়ি ফল নিয়ে এলো। লক্ষ্মী তখন দাঁড়িয়েছিলো বারান্দার পাশে—ম্লান বিষণ্ণ চোখ মেলে তাকিয়ে দেখছিলো, সামনের বড়ো বাড়িটার মাথার ওপর রক্ত মাখিয়ে সূর্য অস্তে নামছে। হয়তো তার মনে পড়ছিলো আউটরাম ঘাটের সেই সন্ধ্যে, সেই ঝল্‌মলে জল—সেই ঘাট ছেড়ে যাওয়া দূরের পথিক কালো-কালো জাহাজগুলোর গম্ভীর উদাস বাঁশির সুর।'

বিভাস বললো, 'আপনাকে ভারী সুন্দর লাগছে, দেখতে—যেন একখানা আঁকা ছবির মতো।'

লক্ষ্মী চমকে পেছন ফিরে তাকালো। বিকেলের আলোয় বিভাসের

চোখে যে আগুন সে দেখলো, সে আগুন মেয়েদের অত্যন্ত বেশি চেনা—যেমন পাখি মাত্রেই বন্দুকের নল দেখলে চিনতে পারে।

বিভাসের মুখ কালো হয়ে উঠছিলো। হঠাৎ সে তীব্রভাবে বলে ফেললো, 'থাক, আপনার গল্প আর ভালো লাগছে না, মিস চৌধুরী—মাপ করবেন।'

কিন্তু ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় ইলার মুখের চেহারাটাই যেন বদলে গেছে আশ্চর্যভাবে। তেমনি তীব্রভাবেই ইলা বললো, 'না-না, বেশ লাগছে। বলে যান আপনি।'

বিভাস কিংবা ইলা কারো কথাই যেন শুনতে পায়নি, এইভাবে ইন্দিরা বলে চললো: 'বিদ্যুৎগতিতে চলে যাচ্ছিলো লক্ষ্মী, কিন্তু বিভাস তার পথ আটকালো। বললো, আপনার স্বামীর জন্যে এই ফল—

—মাকে দেবেন—তীক্ষ্ণ গলায় জবাব দিয়ে লক্ষ্মী চলে গেল।

শাশুড়িকে বিভাস কী বলেছিলো কেউ জানে না, কিন্তু আড়ালে তিনি লক্ষ্মীকে খানিকটা গালি-গালাজ করলেন। বললেন, বৌমা, সতু যেমন, ও-ও তো তেমনি, ঘরের ছেলে। এই দুঃসময়ে কতো কী করছে—তুমি ওকে অপমান করলে কেন?

লক্ষ্মী জবাব দিলো না, জবাব দেবার কিছু ছিলও না। বিভাসের উপকারের জালে এই দুঃস্থ পরিবারটি কেমন করে দিনের পর দিন জড়িয়ে যাচ্ছে—কেমন অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করছে, এ তো সে নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছিলো। বিভাসের বিরুদ্ধে একটি মন্তব্য করলে শ্বশুর-শাশুড়ী যে একসঙ্গেই তার ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠবেন, এ কথাটা বুঝতে তার বাকী ছিলো না।

ওদিকে সত্যেন দিনের পর দিন কেমন হয়ে উঠছে। তার মনের মধ্যে আগুনের মতো জ্বলে যাচ্ছে লক্ষ্মীকে কাছে পাওয়ার কামনায়। খাবারের বাটি ছুঁড়ে ফেলে দেয়, আছড়ে ভেঙে ফেলে ওষুধের গ্লাস। জাগরণক্লান্ত রাত্রিতে জানলায় বসে-বসে লক্ষ্মী শুনতে পায় খাঁচায় আটকানো একটা বুনো জানোয়ারের মতো সত্যেন ঘরের মধ্যে পায়চারী করে বেড়াচ্ছে।

সেদিন জ্যোৎস্নায় বান ডেকে গিয়েছিলো। নিশীথরাত্রে কলকাতায় মাঝে-মাঝে অদ্ভুত চাঁদ ওঠে। দিনের সমস্ত শব্দ আর সমস্ত কুশ্রীতা যায় তলিয়ে। শান্ত, স্তব্ধ, কোমল ঘুমের ওপরে জ্যোৎস্না যেন ফুলের পাপড়ির মতো ঝরে পড়তে থাকে। কিন্তু ঘরের মধ্যে মানুষ তখন ঘুমে কাতর—জ্যোৎস্নার সেই ফুল তারা কুড়িয়ে নিতে পারে না। আর লক্ষ্মীর মতো যারা সেই সব রাত্রিতে প্রহর জাগে, তাদের চোখে সে জ্যোৎস্না যেন দেখা দেয় কঙ্কালের খানিকটা হাসির মতো—আসন্ন বৈধব্যের নির্মম নিষ্ঠুর শুভ্রতার মতো।

রেলিং ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলো লক্ষ্মী। গালের দু'পাশ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিলে। এমন সময় তার ঘাড়ে আগুন ছুঁইয়ে গেল তীব্র একটা নিশ্বাসের হল্‌কা। চকিত হয়ে পেছন ফিরতেই কে তাকে সমস্ত শক্তি দিয়ে বুকে চেপে ধরলো। বুনো জানোয়ারের চোখ জ্বলছে ধক্‌ধক্‌ করে—সত্যেন!

লক্ষ্মী বললো, একি, তুমি!

সত্যেন জবাব দিলো না। তেমনি লোহার মতো কঠিন দুটো হাতে তাকে আঁকড়ে ধরে ঘরে টেনে নিয়ে চললো। তার মধ্যে বহুদিনের উপবাসী পশুটা জেগে উঠেছে।

লক্ষ্মী প্রণপণে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো—কী করছো, কী করছো তুমি, পাগলের মতো? সর্বনাশ হয়ে যাবে যে। পায়ে পড়ি তোমার, আজ ছেড়ে দাও। তোমার শরীর সেরে উঠুক—

সত্যেন তবুও জবাব দিলো না। তার গায়ে যেন পাঁচটা হাতীর বল এসেছে। লক্ষ্মীর কান্না, মিনতি কিছুই তার কানে গেল না, সে পাগল হয়ে গেছে। স্ত্রীকে দু'হাতে তুলে ধরে সত্যেন ঘরে নিয়ে এলো।

ফলাফল রাতারাতিই টের পাওয়া গেল। শেষবারের মতো এক ঝলক রক্ত তুললো সত্যেন। লক্ষ্মীর কাছ থেকে এ জন্মের শেষ পাওনা আদায় করে সে চলে গেল—বিধবা হলো লক্ষ্মী।'

ইন্দিরা থামলো। নদীর বুকে গাঢ় অমাবস্যার রাত্রি। হুহুঃ করে হাওয়া আসছে। সার্চলাইটের আলো তেমনি চমক ফেলছে নিশীথের

তরঙ্গিত খরধারায়, দুই তীরের মর্মরিত সুপোরি আর নারকেলের বীথিতে। বিভাসের মুখ বিরক্তিতে কুঞ্চিত—ইলার মুখে সমবেদনার ম্লান রেখা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইলা বললো 'গল্প শেষ হলো আপনার?'

'—না, হলো আর কই। এ-সব সাধারণ গল্প—প্রতিদিনের সংসারের গল্প। এর আরম্ভ নেই, শেষও নেই। যেমন করে প্রত্যেকদিনের জীবন চলে, এ গল্পও তেমনি খাওয়া-বসা, চলা-ফেরায় এগিয়ে চলতে থাকে। তবু আর একটুখানি বলেই আমি গল্পটা শেষ করবো, আপনাদের আর ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবো না।'

ইন্দিরা বলতে লাগলো: 'লক্ষ্মী বিধবা হলো। বাঙালির ঘরের শাশুড়িরা ছেলের শোকে যেভাবে চিৎকার করে কাঁদেন, সত্যেনের মাও তেমনি করে কাঁদতে লাগলেন, তেমনি করেই গাল-মন্দ দিতে লাগলেন ছেলের অলক্ষণা বউকে। বিয়ের এক বছরের মধ্যেই যে রাক্ষসী জলজ্যান্ত স্বামীকে এমন করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারে, তাঁর সাজানো সংসারে এমনভাবে আগুন ধরিয়ে সব পুড়িয়ে শেষ করে দিতে পারে, তাকে তিনি যে একবিন্দুও ক্ষমা করতে পারেন না, এর মধ্যে অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক কিছুই নেই।

গালাগালি সহ্য করেও লক্ষ্মী পড়ে রইলো স্বামীর ভিটে আঁকড়ে ধরেই, দুর্ভাগ্যের বোঝা মাথায় বয়ে বাপের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার প্রবৃত্তি সে বোধ করলো না। দিন-কয়েক—দিন কয়েক কেন, মাস-কয়েক কাটলো একটা বিরাট শোকোচ্ছ্বাসের খণ্ড প্রলয়ের মধ্যে। কোনো ক্ষতিই কারো অপূর্ণ থাকে না—এক্ষেত্রেও রইলো না।

এদিকে সংসারের অবস্থা ক্রমেই অচল হয়ে আসবার উপক্রম করছে। ব্যাঙ্কে পুঁজি যা ছিলো, সত্যেনের চিকিৎসাতেই তা শেষ হয়েছে। ঋণের বোঝাও ভারী হয়ে উঠেছে নেহাত মন্দ নয়। শ্বশুর যা পেন্সন পান, তা নামে-মাত্র, ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। দেনার কিস্তি শোধ না করলে শেষ সম্বল বাড়িখানাও চলে যায়—আর বাড়ি বাঁচাতে গেলে মাসের দশদিন পরে উপোস দিতে হয় গুষ্ঠিসুদ্ধ সকলকে।

লক্ষ্মীর আই-এ পাশ করা বিদ্যেটা কাজে লাগলো এতদিনে।

পাড়ায় একটা স্কুলে ছোটো মতন একটুখানি চাকরি সে যোগাড় করে নিলো। কাদায় আটকে-বসা পারিবারিক চাকাটা নড়ে উঠলো, চলতে শুরু করলো একটু-একটু করে। সংসারে অলক্ষণা বিধবা বউয়ের প্রতি গালিবর্ষণটা কমে এলো, তার মূল্য বাড়লো, এমন কি খানিকটা আদরও জুটলো বলা যায়। কোনো-কোনদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখতো বুড়ী শাশুড়ী উনুনের আঁচে বসে তার জন্যে খাবার তৈরি করছেন।

দিন কাটছিলো, হয়তো এমনি করেই কেটে যেতো। লক্ষ্মী ভুলে যেতো নিজেকে, শ্বশুর-শাশুড়ী ভুলে যেতেন সংসার থেকে সত্যেনের ক্ষত-চিহ্নটাকেও। তারপরে দূর ভবিষ্যতে হয়তো এও দেখা যেতো যে, এক রকম করে নিজের মধ্যেই লক্ষ্মী সুখী হয়ে উঠেছে। জীবনের ধর্মই মানিয়ে চলা, স্বীকার করে নেওয়া—লক্ষ্মীর বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হতো না।

কিন্তু যা হতো, তা হলো না। এলো রাহু। কর্তব্যপরায়ণ ডাক্তার বিভাস সত্যেনের মৃত্যুর পরেও এ-বাড়িতে তার কর্তব্যকে আর ভুলতে পারলো না!

সত্যেনের জন্যে আর ফলের বুড়ির দরকার নেই, কিন্তু শাশুড়ির জন্যে আছে। বুড়ো বয়েসে মিষ্টি খাবার লোভ হয় মানুষের, বিভাস বাক্স-বোঝাই করে ভালো-ভালো সন্দেশ আমদানি করতে লাগলো। বিজয়ার দিনে অকারণে দশ টাকার নোট দিয়ে শ্বশুরকে প্রণাম করে গেল। তিনি আপত্তি করতে বিভাস ম্লান মুখে বললো, আমাকে এমন পর করে দেখছেন কেন? সত্যেন আমার বন্ধু ছিলো, তার সেই শূন্য জায়গাতে আমার কি এতটুকু দাবি নেই?

বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে বিভাস। শ্বশুরের চোখে জল এলো। তিনি বললেন, না বাবা, একজন গেছে, তার জায়গায় তোমাকে পেয়েছি, খানিকটা অন্তত····। তোমাকে কি পর ভাবতে পারি কখনো?

কিন্তু সত্যেনের সব শূন্য স্থানেই বিভাস নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করতে লাগলো, এমন কি লক্ষ্মীর ক্ষেত্রেও!

শ্বশুর-শাশুড়ী কিছু বুঝতে পারছিলেন কিনা তা কে জানে। যদিও বুঝে থাকেন, তা হলেও বোধহয় তখন তাঁদের করবার কিছু ছিলো না।

দারিদ্র্য আনে অপরিহার্য ক্ষুদ্রতাকে বহন করে—আনে লোভ। আরো বিশেষ করে সে দারিদ্র্য যখন অসহায়—নতুন আশ্বাস আর নতুন উৎসাহে বুক বেঁধে চলবার ক্ষমতা যার নেই, সে চোখ বুজেই কোনো একটা অবলম্বনকে আশ্রয় করতে চায়। সেটা দড়ি কিংবা সাপ একটা কিছু হলেই হলো—সাময়িক আশ্বাসটাই তার পক্ষে বড়ো কথা। লক্ষ্মী তখন শোনেনি, পরে জেনেছিলো, বিভাস শ্বশুরকে নাকি তিনশো টাকা ধার দিয়েছে এবং সে টাকা ফেরত পাবার জন্যে তার কিছুমাত্র তাগিদ নেই।

এমন হয়তো হতে পারে যে, এই পরিবারটির ওপরে বিভাসের খানিকটা মায়া বসে গিয়েছিলো। কিন্তু দিনের পর দিন তা থেকে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিলো তার লক্ষ্মীর প্রতি লোভ, একটা অপরিসীম লোলুপতা। আচম্‌কা ঘরে ঢুকে বলে বসতো, বৌদি অমন করে বসে আছেন কেন? আসুন না, একটু গল্প করি।

খানিকটা পরিমাণে স্বীকার না করে উপায় ছিলো না, বিভাসকে। সে এখন এ-বাড়িতে ছোটো ছেলের মর্যাদা লাভ করেছে, লক্ষ্মীর পরম স্নেহ-ভাজন দেবর। এবং দেবর হিসেবে খানিকটা বাড়াবাড়ির প্রশ্রয় সে নিশ্চয় পেতে পারে, এ সম্পর্কে কোনো অনুযোগ জানাতে গেলে খানিকটা গাল-মন্দই লাভ হবে।

সেদিন রবিবারের ছুটি।

শ্বশুর-শাশুড়ী গেছেন গঙ্গাস্নান করতে। ছোটো ছেলে-মেয়েরা বাইরের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে পাশের বাড়িতে ভালুক-নাচ দেখছিলো। আর স্নান শেষ করে এসে দোতলায় আয়নার সামনে চুল বাঁধছিলো লক্ষ্মী।

এমন সময় আয়নায় ছায়া পড়লো। চোরের মতো নিঃশব্দ পায়ে বিভাস ঘরে চলে এসেছে। বললো, বৌদি!

রাগে লক্ষ্মীর চোখ মুখ রাঙা হয়ে গেল।

আপনি এমনভাবে আমার ঘরে এলেন কেন?

কেন, আসতে নেই?—বিভাস বেশ আরাম করে লক্ষ্মীর খাটের ওপরে জাঁকিয়ে বসলো: সত্যি, যতো দিন যাচ্ছে—বৌদির রূপ ততো বেশি খুলছে, যেন তপঃকৃশা পার্বতী।

অসহ্য ক্রোধে লক্ষ্মী বললো, আপনার স্তুতি আমার দরকার নেই। এমন অসময়ে আপনি আমার ঘরে আসবেন না—পাড়ার লোক দেখলে কী ভাববে বলুন তো ?

কী ভাববে ?—বিভাসের মুখে শয়তানের হাসি দুলে উঠলো : কী ভাববে বলো না, লক্ষ্মীটি ? সত্যি, লক্ষ্মী নামটা তোমার সার্থক।

লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলো—জবাব দিলো না।

সত্যেনের জায়গা এ-বাড়িতে আমি পেয়েছি। তার লক্ষ্মীকেই বা পাবো না কেন ?—বলতে-বলতে বিভাস উঠে দাঁড়ালো তারপর আল্‌গা একটা টান দিয়ে লক্ষ্মীকে একেবারে বুকের ওপরে নিয়ে এলো।

মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ্মীর সমস্ত শরীরটা আড়ষ্ট হয়ে গেল, মুখ দিয়ে একটা শব্দও বেরুলো না। পলকের জন্যে মনে হলো, সে যেম মরে গেছে। কিন্তু মুহূর্তের জন্যেই। পরক্ষণেই একটা প্রবল ধাক্কায় বিভাস ছিটকে দেওয়ালের দিকে চলে গেল, সশব্দে ঠুকে গেল তার মাথাটা।

বিমূঢ় হয়ে বিভাস তাকিয়ে রইলো খানিকক্ষণ, বড়ো-বড়ো নিশ্বাস পড়তে লাগলো তার। চাপা কঠিন গলায় জবাব দিলো, বেশ।

সেই যে বিভাস লক্ষ্মীর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—এক মাসের মধ্যে এ বাড়িতে আর পা দিলো না। আর লজ্জায়-অপমানে বিছানায় লুটিয়ে-লুটিয়ে কাঁদতে লাগলো লক্ষ্মী। এ-কথা কাউকে বলবার নয়, কেউ বিশ্বাস করবে না। বরং বৈধব্যের অপরাধে কলঙ্কের সমস্ত বোঝাটা তারই ঘাড়ের ওপরে চেপে বসবে।

কিন্তু বিভাসেরও দিন আসছিলো। এলো যথা সময়ে।

পাড়ায় ভয়ঙ্কর হাম হচ্ছে। বাড়িতে ছেলেপিলের হয়েছে, লক্ষ্মীরও হলো। যেমন তীব্র জ্বর, তেমনি তীব্র যন্ত্রণা ; তিনটি দিন সে চোখ মেলেও তাকাতে পারলো না—দেখতে পেলো না, তার চারদিকে কী ঘটছে বা না ঘটছে !

সেই সময়ে নিরুপায় শ্বশুর বিভাসকে ডেকে নিয়ে এলেন।

নতুন ডাক্তার, কর্তব্যপরায়ণ। সে ভালো ওষুধই এনে দিলো। প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন করে নয়, নিজের হাতেই ওষুধ নিয়ে এলো। বললো, এইটে

মুখে মাখিয়ে দেবেন, হামগুলো তাড়াতাড়ি উঠে যাবে, কোনো স্পট্‌ও থাকবে না।

মুখে ওষুধের তুলি পড়তেই আচ্ছন্ন অচেতন লক্ষ্মী অসহ্য যন্ত্রণায় উঠে বসলো। সমস্ত মুখে কে যেন খানিকটা তরল আগুন বুলিয়ে দিয়েছে। আঙ্‌ুল লাগতেই সঙ্গে-সঙ্গে পোড়া চামড়া উঠে আসতে লাগলো, বেরিয়ে পড়লো লাল টকটকে দগদগে ঘা। চিরদিনের মতো বীভৎস ভয়ঙ্কর হয়ে গেল লক্ষ্মী।'

স্টিমারের বাঁশি হঠাৎ উচ্চকিত হয়ে উঠলো। সামনে একটা বন্দরের ওপরে সার্চলাইটের দীপ্তি পড়েছে। ইন্দিরা উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'এই স্টেশনে আমি নামবো। ধন্যবাদ, অনেক আনন্দ পাওয়া গেল আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে।'

ইলা ব্যাকুল হয়ে বললো, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান। ঘাটে লাগতে তো আরো কয়েক মিনিট দেরী আছে। তারপরে কী হলো, বলুন।'

সুটকেশটা তুলে নিয়ে ইন্দিরা হাসলো: 'কী আর হবে। বিভাসের নামে কেশ করা যেতো। কিন্তু প্রমাণ তো করা চাই। ওষুধের শিশিটা যে সেই এনে দিয়েছিলো কী করে বলা যাবে। তাছাড়া শ্বশুর-শাশুড়িও কি চাইতেন ঘরের কেলেঙ্কারী নিয়ে খবরের কাগজে টানাটানি হয়? তাঁদের না ছিলো টাকা, না ছিলো সহায়।'

নীচে খালাসীদের চিৎকার—'হাফিজ, হাফিজ।'

স্টিমার ঘাটে ভিড়েছে, শোনা যাচ্ছে মানুষের কোলাহল। ইন্দিরা বললো, 'আচ্ছা, নমস্কার।'

'নমস্কার।'

দোতলার সিঁড়ির মুখে কী ভেবে আবার থেমে দাঁড়ালো ইন্দিরা। মুখ ফিরিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, আর একটা কথা। লক্ষ্মী শেষ খবর পেয়েছে বিভাসের সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে। বেশ সুন্দর একটি মিষ্টি মেয়ের সঙ্গে—এই আপনার মতই অনেকটা।'

সিঁড়ি দিয়ে তর্‌-তর্‌ করে নেমে গেল ইন্দিরা। বিভাস শুকনো হাসি হাসলো। বললো, 'দেখছো ইলু, কী চমৎকার একটা গল্প বানিয়ে—'

কিন্তু ইলা কোনো জবাব দিলো না। হু'চোখে তীক্ষ্ণ অবিশ্বাসের আগুন জড়িয়ে কেবিনে ঢুকে সজোরে দরজা বন্ধ করে দিলো। কাতর বিভাস ডাকতে লাগলো ঃ 'ইলা, শোনো, শোনো—'

স্টিমার থেকে নেমে ইন্দিরা হেঁটে চলেছে পথ দিয়ে। সত্যিই বানিয়ে বলা গল্প। নিজের সব ভেঙে গেছে বলেই যা-কিছু সুন্দর দেখতে পায়, তাকেই কি তার ভাঙতে ভালো লাগে। তার মুখখানা পুড়ে গিয়েছিলো কোনো ডাক্তারের অ্যাসিডে নয়, একটা ষ্টোভ দুর্ঘটনাতেই।

দাহ

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

এখন দক্ষিণ কলকাতার শহরতলিতে আর কোনো শব্দ নেই। ছোটো রাস্তা কাঁপিয়ে শেষ বাসটা চলে গেছে প্রায় আড়াই ঘণ্টা আগে আর তারও আগে থেকে তালের ভেঙে পড়া বড়ো-বড়ো পাতা রাতের সব ক্লান্তি নিয়ে গাছের গায়ে সেঁটে আছে।

এখন যতদূর দেখা যায়, ততদূর শুধু মিশ-কালো, বোবা পশুর মতো নিস্তব্ধ অন্ধকার আর অনেক দূর থেকে থেমে-থেমে শেয়ালের একটানা ডাক —হুক্কা—হুয়া! ইচ্ছে না থাকলেও মাত্র একটি মানুষ অসহ্য যন্ত্রণা বুকে নিয়ে সেই ডাক শুনছে।

হয়তো দক্ষিণ কলকাতার শহরতলিতে শেষ চৈত্রের নিঝুম থরো-থরো মাঝ-রাত্তিরে একটি মানুষই জেগে আছে তখন। তার নাম রুচিরা রায়। তার ডান হাতটা কপালের ওপর। বাঁ হাতের ছুটো আঙুল মশারির কোণ ছুঁয়েছে। চোখ ছুটো খোলা। মাঝে-মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে সে। কিন্তু আশ্চর্য, একবারও নড়ছে না—কখনও দেখছে না নিরঞ্জনকে।

হ্যাঁ, আর একজনও আছে রুচিরার পাশে। তার স্বামী নিরঞ্জন রায়। ঘুমে অচেতন। এ-পাশ ফিরে না তাকালেও রুচিরা শুনতে বাধ্য হচ্ছে নিরঞ্জনের নাক ডাকার মৃছ ধ্বনি, আত্মতৃপ্তির স্পষ্ট সঙ্কেতের মতো। আজ রাতে ওর ঘুম কিছুতেই ভাঙবে না।

কাল ভোরে সূর্য যখন গড়িয়ে-গড়িয়ে উঠে যাবে অনেকদূর, আর ফাঁকা শহরতলিতে রোদের তেজ একটু বেশি-রকম প্রখর হয়ে উঠবে, তখন চোখ রগড়ে বিছানার ওপর উঠে বসবে। ঘুমের ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে রুচিরাকে জিগ্যেস করবে, 'কটা বেজেছে?' উত্তর শুনে চোখ কুঁচকে বলবে, 'এতো

বেলা হয়ে গেল।' মুখ ধুয়ে খুব তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নেবে নিরঞ্জন। তারপর খবরের কাগজে চোখ বুলোতে বুলোতে বলবে, 'একটু সকাল-সকাল বেরুতে হবে আজ—কাজ আছে।' কিংবা 'ফিরতে রাত হবে—ব্যবসায়ীদের বড়ো মিটিং আছে।' না হয়, 'সন্ধ্যেবেলা তৈরি থেকো, আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাবো—ঘোষালের ওখানে নেমন্তন্ন আছে।' তোতাপাখিকে শেখানো বুলির মতো রোজই ওই এক কথা।

অন্ধকারের কাঁপা-কাঁপা ম্লান আলোয় এতক্ষণ পর রুচিরা একবার দেখে নেয় নিরঞ্জনকে। গম্ভীর গর্বিত একটা মুখ। ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার প্রতীক—অলস বেহিসেবী যৌবন কোনো প্রশ্রয় পায় না যার কাছে। কাজের সময় ক্লান্তিতে তার চোখ বুজে আসে না কখনও। কিন্তু এখন তার পূর্ণ বিশ্রাম। হাওয়া যদি হঠাৎ শব্দের একটা সূক্ষ্ম তরঙ্গ তোলে—নিরঞ্জন জাগবে না। তালের বড়ো-বড়ো পাতা যদি দারুণ চঞ্চল হয়ে তার ঘুম ভাঙাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে—ব্যর্থ হবে। রুচিরার শরীর-জোড়া রূপ-যৌবন আর ক্ষুধা কোনদিনও নিরঞ্জনকে একটা পুরো রাত জাগিয়ে রাখতে পারবে না।

কিন্তু তবু এখনি—এই মুহূর্তে হঠাৎ একটা বৈদ্যুতিক আঘাত দিয়ে নিরঞ্জনকে খাট থেকে মাটিতে নামিয়ে দিতে পারে রুচিরা। কিছু না। চাবিটা নিয়ে একবার আলমারির কাছে গেলেই হলো। ক্যাঁচ-ক্যাঁচ—ছোটো ছুটো শব্দ। ব্যাকুল একটা প্রশ্ন তখনি ভেসে আসবে মশারির ভেতর থেকে, 'কে?' যদি রুচিরা সাড়া না দেয় তবুও বিচলিত নিরঞ্জনের খেয়ালে আসবে যে, সে পাশে নেই। ব্যগ্র হাতে মশারি সরিয়ে লাফিয়ে খাট থেকে নামবে নিরঞ্জন। টুক করে আলোর সুইচ টিপবে। আর ভয়ঙ্কর বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবে রুচিরার দিকে।

'তুমি! সাড়া দাওনি যে?'

নীরস কঠিন সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'দেখছিলাম।'

'কি?'

'নতুন নেকলেসটা।'

'এত রাতে?' ত্রস্ত নিরঞ্জন দ্রুত চাবি ঘুরিয়ে আলমারি খুলবে।

হাতড়ে-হাতড়ে দেখবে গয়নার সব ক'টা বাক্স ঠিক আছে কিনা। তারপর বিরক্তির কয়েকটা রেখা ফুটে উঠবে তার কপালে, 'এমন করে যখন-তখন আলমারি খুলো না।' চাবি ঘুরোতে-ঘুরোতে সে বলবে, 'জানো না, কতো-রকম কাণ্ড হয় আজকাল কলকাতা শহরে?' ভয়ে-ভয়ে সে একবার এদিক-ওদিক তাকাবে। না, কেউ কোথাও নেই। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে আলো নিবিয়ে দেবে নিরঞ্জন। আবার গড়িয়ে পড়বে বিছানায়। কিন্তু আলমারির চাবিটা এবার নিজের বালিশের তলায় রাখবে। আর যদি জেগে রাত ভোর হয় রুচিরার—তার রাত জাগার খবর জানবার কোনো আগ্রহ থাকবে না নিরঞ্জনের।

কিন্তু সত্যি, এই নির্বিকার রাতের মুহুর্মুহু ঈর্ষা আর ফোঁসফোঁসানি আক্রোশের একটা কঠিন আঘাতে রুচিরাকে খাট থেকে ঠেলে নামিয়ে আলমারির কাছেই নিয়ে আসতে চায়। আর অলঙ্কার নয়, কর্তব্য-পরায়ণ স্বামীর এক-একটি খনিজ দম্ভকে সে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলতে চায়, তাজা সবুজ ঘাসের ওপর। যার খুশি সে নিয়ে যাক। তখন তাকে দেখে বিমূঢ় হয়ে যাক নিরঞ্জন। রূপের জ্যোতিতে চমকে উঠুক। তার অলঙ্কারের দম্ভ টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ুক।

এখনও বুক-ভাঙা একটা নিশ্বাসের সঙ্গে দেহটা জ্বলে ওঠে রুচিরার। সে-চোখ নেই তার স্বামীর। সোনা-চাঁদির পালিশ ছাড়া জীবনে অন্য কোনো রং লাগাবার সূক্ষ্ম কৌশলের কথা সে কল্পনাই করতে পারে না। টুকরো-টুকরো অর্থহীন কথা, বেহিসেবী যৌবনের আবছায়া কল্পনা, কাঁপা-কাঁপা আলো আর এলোমেলো হাওয়ার সঙ্গে বোঝাপড়ার দুর্দম ইচ্ছা অন্য যার জন্যেই হোক—নিরঞ্জনের জন্যে নয়।

কথাটা বুঝতে খুব বেশি দেরি লাগেনি রুচিরার। আর সব বুঝে গেছে বলেই শোবার ঘরের লাগালাগি কালো লম্বা বারান্দা এখন তার কাছে মূক পাষাণ ছাড়া আর কিছুই নয়। সেখানে দাঁড়িয়ে দূরে ঘন ঝাউ-এর ফাঁকে-ফাঁকে আকাশের নতুন রূপ খোঁজবার কোনো চেষ্টাই করে না সে। আর নিরঞ্জনের হাত টেনে শহরতলির নির্জনতায় হঠাৎ উড়ে-আসা নীল-হলুদ রঙের পাখিও দেখায় না।

বিয়ের পর প্রথম-প্রথম ছুটির ভিজে-ভিজে দুপুরে হাতটা অনেক দূর মেলে দিতো রুচিরা, 'দেখো-দেখো!' প্রায় নিরঞ্জনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সে দেখতো, 'ওদিকে একদিন বেড়াতে যাবে?'

'ওদিকে জঙ্গল।' নিরঞ্জন বলতো, 'তাছাড়া অনেক দূর—'

'হোক না জঙ্গল, হোক না দূর—আমাকে নিয়ে অনেক দূরে যেতে তুমি বুঝি ভয় পাও?'

কিন্তু প্রকৃতির শোভার দিকে নিরঞ্জনের চোখ নেই তখন আর। এক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকতো রুচিরার হাতের দিকে। তার হাতটা এক সময় কাছে টেনে নিতো নিরঞ্জন। মুখের কাছে তুলে আনতো। দেখুক। চাপা খুশির আভা ছড়িয়ে পড়তো রুচিরার মুখে। হাতের এমন অপূর্ব শ্রী ও আর দেখেছে কখনও!

'এই বালা-জোড়া কে দিয়েছে, তোমায়?'

শাণিত অস্ত্রের একটা খোঁচায় রুচিরার হাত যেন খসে পড়তো মাটিতে, 'কেন?'

'বড়ো পাতলা।' নিরঞ্জনের গম্ভীর স্বর বিবর্ণ করে তুললো রুচিরার মুখ, 'এক-জোড়া ভারী বালা গড়িয়ে নিয়ো তাড়াতাড়ি—'

খুব আস্তে রুচিরা বলতো, 'নেবো।'

কর্তব্যপরায়ণ স্বামীর কথার এদিক-ওদিক হয় না। কথা রাখতো নিরঞ্জন। রুচিরাকে নিয়ে যেতো গয়নার দোকানে। যেটা খুশি বেছে নিক সে। এখন পছন্দ না হলে ইচ্ছেমতো একটা বানাতে দিয়ে যাক। দামের কথা যেন না ভাবে রুচিরা। সেটা নিরঞ্জনের ভাবনা। তারপর একদিন সন্ধ্যেয় সাবধানে সেই অর্ডার দেওয়া বালা-জোড়া পকেটে নিয়ে বাড়ি ফিরতো নিরঞ্জন। দুই ঠোঁটের ফাঁকে গর্বিত হাসির ঝিলিক। যন্ত্রের মতো খোলা বাক্সটা এগিয়ে দিতো রুচিরার সামনে, 'পরে দেখো—'

তবুও বালা-জোড়া ঠেলে-ঠেলে পরতো রুচিরা। আয়নার সামনে হাত মেলে নিজেই দেখতো। কৌশলে দেখাতো নিরঞ্জনকে। একবার ও বলুক, অপূর্ব! কাছে এগিয়ে এসে চোখের উত্তাপ ছড়িয়ে দিক, 'কী সুন্দর মানিয়েছে!'

কিন্তু বোবা নিরঞ্জন। অন্ধ। কাছে এগিয়ে আসতে জানে না। ঠোঁট কাঁপিয়ে-কাঁপিয়ে দম্ভের চোখা-চোখা তীর ছুঁড়ে মারতে জানে শুধু, 'পুরো পাঁচ ভরি' খুক্‌খুক্‌ করে সে হাসতো, 'একদিন দেখিয়ে এসো, তোমার ছোটো মামাকে—আমি নাকি ব্যবসা করে শুধু টাকা ওড়াই, আর কিছু করি না—এখন সোনার দাম উনি জানেন নিশ্চয়ই। এই পাঁচ ভরির বালা আমারই টাকায়—'

সেইদিন প্রথম রুচিরার মনে হয়েছিলো, কোনো দাম নেই তার রূপের। কেন সে এই পৃথিবীর সবচেয়ে কুৎসিত মেয়ে হলো না! এই মুহূর্তে জরা আর বার্ধক্য নেমে আসুক তার শরীরের ওপর। দৃষ্টি নিবে যাক। শিথিল হোক শ্রবণ। আর তাল-তাল সোনা দিয়ে স্থূল নিরঞ্জন তার শ্লথ বিকল দেহটা মুড়ে দিয়ে আত্মতৃপ্তির ক্রূর হাসি হাসুক। কিন্তু তবু আর একজনের সব দম্ভ ভেঙে নিজের স্বাধীন খেয়ালে বেঁচে উঠতে চেয়েছিলো রুচিরা—যতো উত্তাপ জড়ো করে দৈনন্দিন জীবনের এই স্থূল ধারাটা ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছিলো। পূজোর ঠিক আগে-আগে। আশাতীত উপার্জনের অহঙ্কারে বিভোর নিরঞ্জন। নতুন অলঙ্কারের কথা প্রায়ই বলে রুচিরাকে। একাধিকবার প্রশ্ন করে তার পছন্দ-অপছন্দের কথা জেনে নিতে চায়।

'শুধু সোনা আর শোনা!' শরীরের শিথিল একটা ভঙ্গি করে রুচিরা এগিয়ে আসে নিরঞ্জনের কাছে, 'কে চায় অতো সোনা? তুমি কি মনে করো, আমি এতই সাধারণ যে, শুধু গয়না ঝম্‌ঝম্‌ করে খুশি থাকবো?'

'তবে!' কৌতূহল ফুটে ওঠে নিরঞ্জনের চোখে, 'গিনি কিনে রাখতে চাও?'

'না-না।' রুচিরা মাথা ঝাঁকায়, 'দূর! ও-সব কিছু না—'

'তাহলে?' হঠাৎ যেন বড়ো বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে নিরঞ্জন, 'বলো শিগ্‌গির। নগদ টাকা বেশিক্ষণ কাছে রাখা ঠিক নয়। যা-তা করে খরচ হয়ে যেতে পারে—'

'যায় যাক।' তখনও হাসির পাতলা রেখাটা একেবারে মিলিয়ে যায় না রুচিরার ঠোঁট থেকে, 'চলো, এবার দু'জনে কোথাও ঘুরে আসি।'

'কোথায় ?' তার কথা যেন বুঝতে পারে না নিরঞ্জন।

'পুরী, রাঁচি কিংবা দার্জিলিং।' নিরঞ্জনের আরও কাছে সরে এসে রুচিরা বলে, 'যেখানে হয়—'

কিন্তু নিরঞ্জনের হাসির দমক যেন বিপুল একটা ধাক্কা দিয়ে রুচিরাকে দূরে সরিয়ে দেয়, 'হাওয়া খেয়ে টাকা ওড়াবার সময় কোথায় আমার? আর কোন্ এমন রোগ ধরেছে আমাদের যে, এখুনি হাওয়া-বদলের দরকার ?'

'হ্যাঁ।' দৃঢ়স্বরে রুচিরা বলে, 'কঠিন রোগ ধরেছে আমার। কিন্তু তুমি তা কোনদিনও ধরতে পারবে না। আচ্ছা, আমার কোনো ইচ্ছাকে তুমি কি কখনও প্রশ্রয় দেবে না ?'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে নিরঞ্জন তাকায় তার দিকে, 'প্রশ্রয় ?'

ধরা গলায় চিৎকার করে ওঠে রুচিরা, 'আমার কথা তুমি বুঝবে না—বুঝবে না—'

বিরক্ত হয়ে নিরঞ্জন বিড়-বিড় করে ওঠে, 'আশ্চর্য!' আরও কিছু হয়তো বলতে যায় নিরঞ্জন, কিন্তু তার বাকি কথা শোনবার ধৈর্য রুচিরার নেই বলে সে আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে না।

কিন্তু রুচিরার ধৈর্য না থাক, ধৈর্য আছে নিরঞ্জনের—একটা মানুষের মনের কপাট পুরোপুরি বন্ধ করে তাল-তাল সোনার স্তূপ গড়ে তোলার অসীম ধৈর্য। একটা পুরুষের এমন সাঙ্ঘাতিক সঞ্চয়লিপ্সার কথা কোনো দিনও কল্পনা করতে পারেনি রুচিরা। কিন্তু কার জন্যে আলমারির তাকে-তাকে এতো রকম গয়নার বাক্সের ভিড়! কার জন্যে মূল্যবান ধাতুর নিঃশব্দ শোভা-বিকিরণ? আর নিরঞ্জনের ঠোঁটের ফাঁকে চাপা হাসির ঝিলিক? সব কিছুই তার অসহ্য এক দম্ভ—যেখানে রুচিরার কোনো প্রশ্রয় নেই। সোনার কঠিন জাল দিয়ে তাকে যেন পাকে-পাকে বেঁধে রেখেছে নিরঞ্জন। হাত মেলা যায় না। পা দোলানো যায় না। বয়সের খুশির উত্তাপে ভেঙে পড়বার উপায় নেই। একটু নড়াচড়া করতে গেলেই আগুনের কড়া তাপের মতো সোনার জালটা ঝাপ্‌টা মারে রুচিরার মুখে। আর তখন শহরতলির হুহুঃ হাওয়া ব্যঙ্গ করে যায়

তাকে। রাতের আকাশে জ্বল্‌জ্বলে তারা যন্ত্রণায় হঠাৎ নিষ্প্রভ হয়ে যায়। শুধু মাঝে-মাঝে রুচিরার হাতের চুড়িগুলো ঠুনঠুন শব্দের তরঙ্গ তোলে জেলখানার সর্দার-প্রহরীর সতর্কীকরণের ঘণ্টার মতো। আর এই শৃঙ্খল ঝনঝনা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়ার জন্যে হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে ওঠে রুচিরা। নিরঞ্জনের দম্ভে অন্ধ চোখ দুটো কঠিন আঙুলের খোঁচায় খুলে দেবার জন্যেই প্রায় আভরণহীন হয়ে যায় এক নিমন্ত্রণের আসরে। কিন্তু জোড়া-জোড়া চোখ ফিরে-ফিরে দেখে তার সুঠাম দেহ। অলঙ্কারের আভা যেন ম্লান হয়ে যায় তার রঙের দ্যুতিতে। এমন দেহকে দিয়ে কী প্রয়োজন রাশি-রাশি অলঙ্কারের বোঝা বহন করাবার! অসংখ্য অতিথি সপ্রশংস দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে-কথাটা বুঝিয়ে দিলেও বাড়ি ফিরে উত্তেজনার প্রবল দাহে নিজেকে সংযত করতে পারে না নিরঞ্জন।

'ছি-ছি, ছি!' যেন লজ্জায় আকণ্ঠ দেহ কেঁপে ওঠে নিরঞ্জনের, 'এমন দুঃস্থের মতো পাঁচজনের সামনে কেন তুমি যাও? গয়নাগুলো তোমাকে কি আলমারিতে সাজিয়ে রাখবার জন্যে গড়িয়ে দেওয়া হয়েছে?'

ঝাঁজের বিপুল একটা তোড় যেন বেরিয়ে আসে রুচিরার উষ্মায় বিকৃত মুখ থেকে, 'গয়না পরে কারুর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার কথা আমার বাড়ির কেউ কখনও আমাকে শেখায়নি—'

রূঢ়স্বরে নিরঞ্জন বলে, 'সব বাড়ির নিয়ম-কানুন এক নয়। এখানকার ধরন একটু আলাদা। বোকার মতো নিজের গোঁ বজায় রাখবার চেষ্টা করলে সুখে ঘর করা যায় না—আর তাতে আমার মানই শুধু—'

স্থির দৃষ্টিতে বোধহয় রুচিরা এক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখে নিরঞ্জনকে। তারপর যেন সংযমের শেষ ধাপের ওপর দাঁড়িয়ে থেমে-থেমে বলে, 'বেশ। এবার থেকে আমি সুখেই তোমার ঘর করবো।'

মাটিতে পা ঠুকে খট্‌ করে একটা শব্দ তুলে নিরঞ্জন বলে, 'অনেক আগে থেকেই তা করা উচিত ছিলো—আশ্চর্য!'

আর কারুর মুখে কোনো কথা নেই। কিন্তু হঠাৎ যেন আলমারির মধ্যে থেকে খনিজ পদার্থের গোপন একটা সঙ্কেত ভেসে আসে। আর একমাত্র নিরঞ্জনই বোধহয় তা অনুভব করে। অন্যজন হাঁফায়। হার

স্বীকার করে নেয়। তাকেও যেন তুলে আনা হয়েছে কোনো খনির গভীর গহ্বর থেকে। সতর্ক প্রসাধনের প্রলেপ বুলিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে শহরতলির ঠাণ্ডা নির্জনতায়। আর মাঝে-মাঝে দম দেওয়া পুতুলের মতো ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এখান থেকে ওখানে। তাই দেওয়া হোক। রূপের চেয়ে, জীবনের চেয়ে, প্রাধান্যের গৌরব নিয়ে নিরঞ্জনের মনে ঝলসাক স্থূল খনিজ পদার্থের সূক্ষ্ম কারুকাজ।

তাই জীবনের সূক্ষ্মতম পাওনার কথা ভেবে আর চোখের জল ফেলে না রুচিরা। মনটা যেন পুড়ে-পুড়ে পাহাড়ে শ্যাওলা-পড়া হিম-পাথরের মতো কঠিন হয়ে উঠেছে। শুধু অনেক রাত অবধি তার ঘুম আসে না। চোখ দুটো কটকট করে। আর মাথার মধ্যে সে যেন একটা ভারী জিনিসের চাপ অনুভব করে। তখন তার একটা হাত আপনি এসে পড়ে কপালের ওপর। আর পাতলা মশারি অল্প-অল্প কাঁপিয়ে পাখার হাওয়া তার গায়ে লাগে কিনা—সে বুঝতে পারে না।

কিন্তু আজ সন্ধ্যেয় আবার হঠাৎ কয়েক মুহূর্তের জন্যে বাঁচবার উদ্দীপনায় মনের একটা ক্ষিপ্র গতি অনুভব করেছিলো রুচিরা। হাঁপাতে-হাঁপাতে কাঁচা রাস্তা কাঁপিয়ে এক-একটা বাস যাচ্ছে। অপরাহ্ণের গৈরিক রং সবুজ-ফ্যাকাশে আভা বুলিয়ে দিচ্ছে ফাঁকা মাঠ আর ক্লান্ত গাছের শুকনো-হলুদ পাতার ওপর। মাঝে-মাঝে দম্‌কা হওয়ার ঝাপটায় তামাটে ধুলোর ঘূর্ণি শহরতলির আলস্যের ক্লান্তি ভাঙছে। ঠিক তখন নিরঞ্জন এলো। এতো আগে আসবার কথা ছিলো না। আজ কোথাও যাবার কথাও নেই রুচিবার। তাই আশঙ্কার একটা হিম ইঙ্গিত সে যেন হঠাৎ অনুভব করে।

'খুব অবাক হয়ে গেছো, না?' হাসিতে যেন উথলে পড়ে নিরঞ্জন, 'বলো তো, কেন আজ এতো তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম?'

'কেন?' প্রশ্ন করেই পাথরের মূর্তির মতো ওপরে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ায় রুচিরা।

'না, তোমার কিছুই মনে থাকে না।' হা-হা করে হাসে নিরঞ্জন, 'আজ আমাদের বিয়ের দিন না?'

আকস্মিক চমকে মুহূর্তে মুখ নামায় রুচিরা। উত্তেজনায় দেহটা কেঁপে ওঠে একবার, 'ও।'

'এই যে।' সন্তর্পণে ত্রিকোণ নীল একটা বাক্সের ডালা খুলে নিরঞ্জন বলে, 'এই নেকলেসটা নিয়ে এলাম, তোমার জন্যে—'

যন্ত্রের মতো হাত বাড়িয়ে সেটা নেয় রুচিরা। কাছের ছোটো গোল কাশ্মীরী টেবিলটার ওপর রেখে দেয়। দেখে না, শূন্য চোখে বাইরে তাকিয়ে থাকে।

'পছন্দ হয়নি ?'

'হয়েছে।'

'পরবে না ?'

ঝুঁকে পড়ে নেকলেসটা তুলে নিয়ে এক মিনিটে গলায় ঝুলিয়ে দেয় রুচিরা। একটু দূরে সরে যায়। ঘরের মধ্যে তখন অল্প অন্ধকার জমা হয়েছে। আরও ঘন হোক। তার চোখের দিকে, গলার দিকে, সারা শরীরের দিকে এখন যেন কিছুতেই না তাকায় নিরঞ্জন। তার দৃষ্টি সহ্য করতে পারবে না রুচিরা। হয়তো ভেঙে পড়বে—কান্নার উত্তেজনায় লুটিয়ে পড়বে মাটিতে।

কিন্তু নিরঞ্জন আলো জ্বেলে দেয়। এগিয়ে আসে। তার ছোঁয়া বাঁচিয়ে স্পর্শ করে সেই নেকলেস, 'দেখো, কি সুন্দর কাজ। আমার একার পছন্দ কিন্তু এবার—তা প্রায় হাজারের কাছাকাছি দাম। পরশু গজেন গোস্বামীর বাড়িতে বিরাট ভোজ। সেদিন এটা পরেই যেয়ো তাহলে ওখানে—'

এক-পা এক-পা করে রুচিরা এগিয়ে আসে টেবিলের কাছে। দ্রুত হাতে খুলে ফেলে নিরঞ্জনের দেওয়া নবতম অলঙ্কার। কোনো কান্না নেই এখন পৃথিবীর কোথাও। মূক পাষাণ বারন্দায় পালিয়ে এসে সে যেন তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে।

চিৎকার করে নিরঞ্জন, 'আশ্চর্য, এটা এমন করে এখানে ফেলে গেলে! এতো দামী জিনিস—তুলে রাখো—'

বারান্দা থেকে একটা যন্ত্র যেন বিকল হয়ে যাবার আগের মুহূর্তে

নড়ে ওঠে, 'আলমারির চাবি ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে আছে—তুমিই তুলে রাখো—'

হাওয়া নেই। রুক্ষ অন্ধকার চিরে-চিরে মাঝে-মাঝে গাড়ির আলো ঝলসাচ্ছে। তীক্ষ্ণ কর্কশ হর্ন। তাও বোধহয় রুচিরার কানে যায় না। ক্লান্ত নিরঞ্জন। কিন্তু তার জন্যে চায়ের ব্যবস্থা করবার কথাটাও হঠাৎ খেয়ালে আসে না রুচিরার। সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ।

রাতের আয়োজন—ক্লান্তি ঘুচিয়ে দেবার জন্যেই বোধহয় চৈত্রের থমথমে শেষ প্রহর হঠাৎ মুখর হয়ে ওঠে। হুহুঃ হাওয়ার ক্ষিপ্র বেগ আছড়ে পড়ে হেলানো তালের দেহে, আর ভেঙে-পড়া শুকনো পাতা আর্তনাদ করে ওঠে, খড়াস—খড়াস। কিন্তু এখনও নিথর নিরঞ্জন—এখনও স্থূল তৃপ্তির রেখা তার মুখে।

গতির শিহরণ রুচিরাকেও কঠিন একটা নাড়া দিয়ে যায়। খণ্ড-খণ্ড হয়ে যাক তার দেহ। ছাই হয়ে যাক। আর অলঙ্কারের স্তূপ জড়ো করে একা-একাই পড়ে থাক তার স্বামী নিরঞ্জন রায়।

কিন্তু হঠাৎ চমকে বিছানার ওপর উঠে বসে রুচিরা। দপ্-দপ্-দপ্! সাপের মতো লিকলিক করে ওঠে রঙের ঝিলিক! হাওয়ার দাপটে উত্তাপের কঠিন স্পর্শ গায়ে লাগে। রাঙা হয়ে ওঠে পাতলা নেটের মশারিটাও। নিরঞ্জনকে ব্যঙ্গ করবার জন্যেই যেন জ্বলতে-জ্বলতে ঝপ করে এখনি খুলে পড়বে তার মুখের ওপর।

দিশেহারা জ্বলন্ত কয়েকটা মুহূর্ত! 'আগুন'—বলে চিৎকার করে নিরঞ্জনকে জাগিয়ে দেবার আগেই যেন একটা হিংস্র কুমীর লেজের ঝাপটা মেরে রুচিরাকে ঠেলে নিয়ে আসে কয়েক গজ দূরে আলমারিটার কাছে, আর নিরঞ্জন কোথায় হারিয়ে যায়—সে বুঝতে পারে না।

জ্বলন্ত একটা গতি পাল্লা দেয় হাওয়ার সঙ্গে। সোঁ-সোঁ একটানা শব্দ, ধোঁয়ার উৎকট গন্ধ। তাপের এক-একটা ঝিলিক ধাঁধা লাগিয়ে দেয় চোখে। অন্য কিছু দেখা যায় না, দেখা যায় শুধু দাউ-দাউ আগুনের ভয়ঙ্কর রূপ।

হঠাৎ নিরঞ্জনের অসহায় ডাক আছড়ে পড়ে, 'রুচিরা—'

'এই যে'। হাওয়া আর আগুনের ধোঁয়াটে আবরণ ভেদ করে তৎপর রুচিরা সতেজ উত্তর দেয়, 'আমি আলমারি খুলেছি—'

আর্তস্বরে চিৎকার করে নিরঞ্জন, 'তুমি কোথায়? রুচিরা! শিগ্‌গির বেরিয়ে এসো—উঃ!'

ধক! ধক! ধক! উত্তাপের প্রচণ্ড উল্লাস ফণা মেলে নাচানাচি করে রুচিরাকে ঘিরে, 'নেকলেস! বালা! এই যে পেয়েছি। কিন্তু আর বাক্সগুলো কোথায়! পাচ্ছি না। ওগো, সব জ্বলে গেল—পুড়ে গেল'—কঠিন তাপের মুহুর্মুহু ছোবল সহ্য করতে পারে না রুচিরা। মাটিতে গড়িয়ে পড়ে গুমরে ওঠে। কিন্তু সমস্ত শক্তি দিয়ে তখনি আবার উঠে দাঁড়াতে যায়।

'রুচিরা!' তীক্ষ্ণ আকুল আর একটা ডাক।

উগ্র আলোর বিদ্যুৎ-রেখায় রুচিরার চোখের সামনে ঝলসে ওঠে নিরঞ্জনের উত্তেজনা-থর্‌থর্ লালচে মুখ। দু'জনেই মুহূর্তের জন্যে দেখতে পায় দু'জনকে। আর অন্ধ উন্মত্ত নিরঞ্জন আগুনের মতই যেন ছুটে আসে রুচিরার কাছে। প্রাণপণ শক্তিতে তার দৃঢ় মুঠি শিথিল করে দূরে ছুঁড়ে দেয় ধিকি-ধিকি জ্বলা-নেবা ছোটো-বড়ো বাক্স। তারপর আগুনের কড়া আঁচের মধ্যেই দুঃসাহসের বিপুল উন্মাদনায় কাঁধে তুলে নেয় রুচিরার পোড়া-পোড়া উষ্ণ দেহ।

বাইরে বেরিয়ে আসে নিরঞ্জন। একবার এদিকে তাকায়। একবার ওদিকে। ফেনা-ওঠা অশ্বের গতিতে সে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। তর্‌তর্ করে নিচে নামে।

কিন্তু নিরঞ্জন বুঝতে পারে না যে, আগুনের ভয়ঙ্কর তাপ ছাড়িয়ে আর এক মধুর উত্তাপের স্বাদ জীবনে প্রথম পায় রুচিরা। আর সে দেখতে পায় না, সব যন্ত্রণা তুচ্ছ করে তার ঠোঁটে হাসির একটা রেখা ফুটে ওঠে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে নিরঞ্জন শুধু রুচিরার অস্ফুট গুঞ্জন শোনে, 'আমাকে বাঁচাও!'

সেলিম চিশ্‌তির কবর

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মফঃস্বল শহরের একপাশ দিয়ে গঙ্গার ধার-ঘেঁষা রাস্তার একটা মাথা এসে থেমেছে মেয়ে-স্কুলের সামনে। উঁচু বাঁধানো রাস্তা। নিচে গঙ্গা। একটু দূরে-দূরে এক-একটা অতি বৃদ্ধ বট-অশ্বত্থ ডালাপালা ছড়িয়ে মাঝে-মাঝে গঙ্গাকে আড়াল করেছে।

সকাল ন'টা না বাজতে রাস্তাটার ভোল বদলায়। ছোটো-ছোটো মেয়েদের পায়ের ছোঁয়া পেয়ে এতক্ষণের ঝিমুনি-ভাব কাটিয়ে যেন সজাগ হয়ে ওঠে। কিশোরী মেয়েদের কল-মুখরতায় লাল গঙ্গা আর লালচে অশ্বত্থ-বটের শান্ত উদাসীনতায় বেশ একটা ছেদ পড়ে কিছুক্ষণের জন্যে। দলে-দলে মেয়েরা যায় বই বুকে করে, বইয়ের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে, অথবা বই-ভরা ছোটো টিনের বাক্স দোলাতে-দেলাতে। রাস্তা জুড়ে চলে তারা। এরই মধ্যে সাইকেল-রিকশোর ভেঁপু কানে এলে দু'পাশে সরে আসে। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখে কে যায়।

মাস-ভাড়া সাইকেল-রিকশোয় ঠাসাঠাসি হয়ে চলেছেন মীরাদি আর প্রভাদি। সাইকেল-রিকশোয় ওটুকু বসার যায়গা ওই দু'জনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বড়ো মেয়েরা টিপ্পনী কাটে আর হাসে। ছোটো মেয়েরা তাদের হাসির কারণ বুঝতে চেষ্টা করে।

একটু বাদে বাদে আবার শোনা যায় সাইকেল-রিকশোর ভেঁপু। কে আসে? প্রতিভাদি আর শোভাদি। তাদের দু'জনের মাঝখানে আবার একটা ছোটো মেয়েকে অন্তত বেশ বসিয়ে নিয়ে যাওয়া চলে। রাস্তার মাঝখানে আবার জড়ো হয়ে চলতে-চলতে বড়ো মেয়েরা এক-একদিন সেই গবেষণায় বেশ মেতে ওঠে। উল্টে-পাল্টে ঠিক করলেই তো পারে

সাইকেল-রিকশো—মীরাদির সঙ্গে প্রতিভাদি আর প্রভাদির সঙ্গে শোভাদি। নয়তো, মীরাদি আর শোভাদি, আর প্রভাদি আর প্রতিভাদি। চিরাচরিত সিদ্ধান্তেই এসে থামতে হয় আবার। অর্থাৎ, যার সঙ্গে যার ভাব।

আবার কে আসে?

ও বাবা, মালতিদি আর স্মৃতিদি! হেড-মিসট্রেস আর সহকারী হেড-মিসট্রেস। সর্, সর্! রাস্তার দু'পাশ ঘেঁষে চলে মেয়েরা। একটানা ভেঁপু বাজিয়ে সাইকেল-রিকশো তরতরিয়ে চলে যায়।

এদিক থেকেই আসেন মেয়ে-স্কুলের বেশির ভাগ টিচার। শেয়ারে মাস-ভাড়া সাইকেল-রিকশো ঠিক করা আছে। সকালে নিয়ে আসে আর বিকেলে পৌঁছে দেয়।

শুধু একজন ছাড়া। অর্চনা বসু।

তিনি হেঁটে আসেন আর হেঁটে ফেরেন। পৌনে দশটা নাগাদ যে মেয়েরা স্কুলের কাছাকাছি এসেছে, নিজেদের অগোচরে মাঝে-মাঝে পিছন ফিরে তাকাবে তারা। দেখতে পেলে অস্বস্তি, না পেলে উসখুসুনি। ঠিক সময় ধরে এলে এক জায়গায় না এক জায়গায় হবেই দেখা। হেঁটে আসেন। তবু সামনের মেয়েরা ঘাড় না ফিরিয়েই বুঝতে পারে তিনি আসছেন। কারণ, যেখান দিয়ে আসেন তার আশপাশের প্রাণ-তারুণ্য হঠাৎ যেন থেমে যায় একটু।

কান সচকিত-করা ভেঁপু নেই সাইকেল-রিকশোর—তবু সরার পালা। পথের মাঝখান থেকে ধারে সরে আসা নয়। ধারের থেকে মাঝখানে বা ওধারে সরে যাওয়া। যিনি আসছেন, গঙ্গার দিকের রাস্তার ধারটা যেন তাঁর খাস্‌দখলে!

ফ্যাকাশে সাদা গায়ের রং, ধপধপে সাদা পোশাক, সাদা চশমা, সাদা ঘড়ির ব্যাণ্ড, পায়ে সাদা জুতো—সব মিলিয়ে এক ধরনের সাদাটে ব্যবধান। মেয়েদের আভরণে যে সাদা রিক্ত দেখায়, তেমন নয়। যে সাদা চোখ ধাঁধায়, প্রায় তেমনি।

আজ দু'বছর হলো অর্চনা বসু এসেছেন এই স্কুলে। দু'বছর ধরে ঠিক এই এক-রকমটি দেখে আসছে মেয়েরা। কোনদিকে না চেয়ে রাস্তার

ধার ঘেঁষে সোজা হেঁটে আসেন। ঠিক কোনদিকে না চেয়েও নয়। মাঝে-মাঝে গঙ্গার পাড়ের দিকে চোখ পড়ে। জলের ধারে ছোটো কোনো ছেলে-মেয়ে দেখলে থম্‌কে দাঁড়ান। স্কুলের মেয়ে কিনা দেখেন লক্ষ্য করে। অনেক চঞ্চল মেয়ে স্কুলে আসবার পথে খেলার ছলে উঁচু রাস্তা থেকে দৌড়ে গঙ্গার পাড়ে নেমে যেতো, জলের ধার ঘেঁষে ছুটোছুটি করতে-করতে স্কুলের পথে এগোতো। বেশি দুরন্ত দু'একটি মেয়ে অনেক সময় জুতো আর বই হাতে করে জলে পা ভিজিয়ে চলতে গিয়ে আছাড় খেয়ে ভিজে ফ্রক, বই আর ভিজে জুতো নিয়ে স্কুলে এসে হাজির হতো। আজকাল সেটা বন্ধ হয়েছে। হেড-মিসট্রেস বা সহকারী হেড-মিসট্রেসের তাড়নায় নয়, অর্চনাদির ভয়ে। যাকে একবার নিষেধ করা হয়েছে, তাকে দ্বিতীয়বার নিষেধ করতে হয় না আর। ছোটো-বড়ো সব মেয়েই জানে, অর্চনাদির বিষম জলের ভয়। কিন্তু তাঁর চোখে পড়ার ভয়ে জলের দিকেও এখন আর পা বাড়ায় না কেউ।

চোখে পড়লে কি হবে? অর্চনাদি রাগ করবেন না বা কটূক্তিও করবেন না কিছু। শুধু কাছে ডাকবেন। শুধু বলবেন, 'জলের ধারে গেছলে কেন? খেলার তো এতো জায়গা আছে। তোমাদের দেখাদেখি আরো ছোটোরাও যাবে জলের ধারে। আর যেও না।'

এটুকুর মুখোমুখি হতেই ঘেমে ওঠে মেয়েরা। অথচ অন্য টিচারদের গঞ্জনাও গায়ে মাখে না তারা। অর্চনাদির বেলায় এটুকুতেই কেন এমন হয়, বুঝে ওঠে না।

মেয়েদের চোখে মেয়েটির এই জল-ভীতির পিছনে অবশ্য ছোটোখাটো ঘটনা আছে একটা। স্কুলের পিছনেই গঙ্গার বাঁধানো ঘাট। বাইরের অনেকেই চান করে সেখানে। বিশেষ করে আশপাশের খড়ো-ঘরের মেয়ে-পুরুষেরা। দুপুরে টিফিনের সময় স্কুলের ছোটো মেয়েদের খেলার এবং বড়ো মেয়েদের বসার জায়গা ওই ঘাট।

ঘাটের দু'পাশের উঁচু-উঁচু ধাপগুলোর উপর লাফিয়ে-লাফিয়ে ওঠা-নামা করে ছোটো মেয়েরা। শীতকালে জল অনেক নিচে থাকে। কিন্তু বর্ষায় ঘাটের সিঁড়ির অর্ধেকটা তো ডোবেই, ওই উঁচু ধাপগুলোরও

দু'দিক ছাপিয়ে জল উঠে আসে। গেল-বারের বর্ষায় এক দুপুরে একটি আধ-বয়সি মেয়ে তার ছোটো ছেলে নিয়ে ওই ঘাটে চান করছিলো। ছেলেটি নতুন সাঁতার শিখছিলো। বর্ষার ভরা-গাঙের বিষম স্রোতে টেনে নিয়ে গেল তাকে। মায়ের বুক-ভাঙা কান্নায় আর চিৎকারে গোটা স্কুলটা যেন ভেঙে পড়েছিলো এই ঘাটে। তখন অনেকেই লক্ষ্য করেছিলো, ওই শোকার্ত মায়ের দিকে চেয়ে দু'গাল বেয়ে নিঃশব্দে ধারা নেমেছিলো আর একজনেরও।

সেদিন আর ক্লাস নিতে পারেননি অর্চনা বসু।

এর পরে গঙ্গার দিকে চেয়ে হঠাৎ যেন শিউরে উঠেছেন তিনি। বর্ষার লাল জলে শিশুদেহ-গ্রাসী লালসার বিভীষিকা দেখেছেন। মেয়েরা দৌড়োদৌড়ি করে, ছুটোছুটি করে ওই ধাপগুলোর উপর। পা ফসকে বা টাল-সামলাতে না পেরে একবার ওপাশে পড়লে—

আতঙ্কে অস্থির হয়ে অর্চনা বসু দৌড়ে গেছেন হেড-মিসট্রেসের কাছে। টিফিনে মেয়েদের ঘাটে যাওয়া বন্ধ করতে হবে। বড়ো মেয়েরা গেলে ছোটো মেয়েরাও যাবে—সেটা ভয়ানক ভয়ের কথা।

হেড-মিসট্রেস অবাক! বললেন, 'কিন্তু ওই ছেলেটা তো চান করতে গিয়ে ডুবেছে। মেয়েদের আটকাবো কেন?'

ভয়ের কি আছে এবং কেন আটকানো দরকার, অর্চনা বুঝিয়ে দেন। তাঁর সেই বোঝানর আকুতি দেখে মনে হবে, যেন আর একটি ছোটো মেয়েকেই বোঝাচ্ছেন তিনি। হেড-মিসট্রেস চুপচাপ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন খানিক। পরে বলেন, 'আচ্ছা, আমি তাদের সাবধান করে দেবো।'

কিছু বলার জন্যই বলা। নইলে কিছুই তিনি করবেন না, জানা কথা। উদার-মত-পন্থিনী প্রধান শিক্ষয়িত্রী কোনো কল্পিত ভয়ে মেয়েদের স্বাধীনতা খর্ব করতে রাজি নন।

কিন্তু অর্চনা বসুর চোখে এ ভয়টা ভয়ই। কাজেই যা করার নিজেই তিনি করতে বসলেন। একদিন-দু'দিনে কাজ হলো না, কিন্তু চার-পাঁচ দিনের মধ্যে হলো। অর্চনা বসু তো মাস্টারী করে বাধা দেননি কোনো

মেয়েকে। তাঁর নিষেধের মধ্যে অব্যক্ত অনুনয়ের সুরটুকুও বাধা হয়ে উঠেছিলো বড়ো মেয়েদের কাছে। অবশ্য একবারেই ঘাটের মায়া ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি তারা। কিন্তু অর্চনাদির চোখে চোখ পড়তে কেমন যেন লজ্জা পেয়ে গেছে? অনুযোগ-ভরা ওই ঠাণ্ডা হু'চোখের অস্বস্তি তারা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ঘাটে আসা ছেড়েছে আর নিচু ক্লাসের ছোটো মেয়েদেরও আগলে রেখেছে। ফলে টিফিনের সময় ঘাট খাঁ-খাঁ করে এখন।

মেয়েরা জেনেছে, অর্চনাদির জলের ভয় খুব। কিন্তু সহ-শিক্ষয়িত্রীরা মুখ টিপে হেসেছেন। কানে-কানে ফিস-ফিস করেছেন মীরাদি আর প্রভাদি, প্রতিভাদি আর শোভাদি। এই বাৎসল্যজনিত আতঙ্কের পিছনে অন্য কিছুর আভাস পেয়েছেন তাঁরা। সেই পুরোনো কিছুর।

অর্চনা সবে নতুন এসেছেন তখন? তাঁর এই ধপধপে সাদা সাজসজ্জা সত্ত্বেও এমন সাদাটে ব্যবধান গড়ে ওঠেনি তখনও। মেয়েদের সঙ্গে তো নয়ই। বিশেষ করে খুব ছোটো মেয়েদের সঙ্গে। স্কুলের মধ্যেই খপ্ করে এক-একটা ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েকে কোলে-কাঁধে তুলে নিতেন। ক্লাসের মধ্যে একটা বাচ্চা মেয়েকে টেনে কোলে বসিয়েই হয়তো ক্লাসের পড়া শুরু করে দিতেন। ছোটো-বড়ো হু'পাঁচটা মেয়েকে তো রোজই বাড়ি নিয়ে যেতেন। চকোলেট দিতেন, লজেন্স দিতেন, বিস্কুট দিতেন।

রকম-সকম দেখে অন্যান্য টিচাররাও হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। নীরব কৌতূহলে চেয়ে-চেয়ে দেখেছেন তাঁরা। চেহারা-পত্র, চালচলন বা পুওর-ফণ্ডএ মোটা চাঁদা দেওয়ার বহর দেখে তো বড়োলোকের মেয়ে বলে মনে হয়। এম. এ. পাস, দেখতে সুশ্রী। শুধু সুশ্রী নয়, বেশ সুন্দর। কিন্তু বয়স তো তিরিশের ওধারে গড়িয়েছে। বিয়ে হয়নি কেন? তাঁর অন্তরঙ্গ হতেও চেষ্টা করেছিলেন হু'একজন। কিন্তু ভিতরের কৌতূহলটুকু বড়ো হয়ে উঠেছিলো বলেই হয়তো বন্ধুত্ব জমেনি। উল্টে বিচ্ছিন্নতাই এসেছে এক ধরনের। আড়ালে কানাকানি করেন তাঁরা, হাসাহাসি করেন। মেয়েদের নিয়ে এ-সব কি কাণ্ড! বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কি।

এই বাড়াবাড়িটাই তাঁদের চোখে চরমে উঠেছিলো একদিন। শুনে

বিস্ময়ে কৌতুকে প্রায় বিভ্রান্তই হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা। তারপর বেদম হেসেছেন। এ ওর গায়ের উপর পড়েছেন।

আসলে এই ব্যাপার!

শিক্ষয়িত্রীদের কাছে ব্যাপারটা বেশ অস্বাভাবিক মুখরোচক হয়ে উঠেছিলো সন্দেহ নেই। কিন্তু আসল খবরটাই শুধু শুনেছিলেন তাঁরা, সবটা জানেন না। মাঝারি ক্লাসের একটি মেয়ে তার তিন বছরের ছোটো ভাইকে নিয়ে অর্চনাদির বাড়ি গিয়েছিলো। কাছেই বাড়ি, গেলে অর্চনাদি খুশি হন, জানে। আরো খুশি হন ছোটোদের নিয়ে গেলে, তাও জানে। অর্চনা খুশি হয়েছিলেন। দু'হাত বাড়িয়ে কোলে টেনে নিয়েছিলেন ছেলেটাকে। ঢলঢলে শিশু এভাবে আক্রান্ত হয়ে ড্যাবড্যাবে চোখ মেলে চেয়ে ছিলো তাঁর দিকে। তাই দেখে খুশি ধরে না। তাঁর আদরের ঠেলা সামলে ছেলেটি গম্ভীর মুখে প্রায় যেন কৈফিয়তই তলব করেছিলো, 'তুমি কে?'

তার দিদি বলে দিতে যাচ্ছিলো, কে। অর্চনা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়েছেন। পরে ছেলেটিকেই আর এক প্রস্থ আদর করে ফিরে জিগ্যেস করেছেন, 'বল্ তো, আমি কে?'

ছেলেটি বলতে পারেনি। কিন্তু আদর ভালো লেগেছিলো তার। জবাব দিয়েছে, 'তুমি দুষ্টু।'

ছেলের দিদি হাঁ হয়ে তাদের অর্চনাদিকেই দেখছিলো। এমন যেন আর দেখেনি। কিন্তু তারপর কানে যা শুনলো, এগারো-বারো বছরের মেয়ের তাতে বিস্ফারিত হয়ে ওঠারই কথা। অর্চনাদি তার ভাইকে ঝাঁকিয়ে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। বলছেন, 'আমি মা। বল্ দেখি মা?'

শিশুটি বলতে চায় না। বলবে কি করে। তার যে বাড়িতে আর একটা মা আছে। কিন্তু যাঁর হাতে পড়েছে, নিষ্কৃতি নেই বুঝেই শেষে বলতে হলো, 'তুমি মা।'

'হ্যাঁ।' অর্চনা বসু সেই এক মুহূর্তের জন্য সমস্ত দুনিয়াটাকেই বিস্মৃত হয়েছিলেন বোধ-করি। তারপর হুঁশ ফিরেছিলো, সচকিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। মেয়েটা ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে আছে তাঁর দি

প্রায় ভয় পেয়ে গেছে যেন। সচকিত হয়ে শিশুকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন অর্চনা। শুধু চকোলেট লজেন্স বিস্কুট নয়, রসোগোল্লা সন্দেশ আনালেন। দু'গাল-ভরে সব চিবিয়ে খুশি-মনে ভাইকে নিয়ে বাড়ি চলে গেল মেয়েটি। তারপর মাকে বললো অর্চনাদির কাণ্ড। ভাইকে মা ডাকতে বলেছিলো, সেই কাণ্ড।

মেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মা কতটা জানলেন, তা তিনিই জানেন। তারপর প্রথমে আচ্ছা করে ধমকালেন মেয়েকে। মফঃস্বল শহর, মহিলা সমিতির কল্যাণে অনেক শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় আছে। অর্চনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না থাকুক, দেখেছেন অনেক। সমবয়সী একজন শিক্ষয়িত্রীর কাছে সেই রাতেই মা চুপি-চুপি ব্যাপারটা বললেন। বললেন, 'কেমন ধারা টিচার ভাই, আপনাদের—বিয়ে-থা করলেই তো পারে।'

শিক্ষয়িত্রী কোনো-রকমে সে রাতটা কাটিয়ে পরদিন স্কুলে গোপনে আর দু'একজনের কানে তুললেন কথাটা। এমনি গোপনে-গোপনে ব্যাপারটা শুনলেন সহকারী হেড-মিসট্রেস এবং হেড-মিসট্রেসও। অর্চনা বসু তার পরদিন স্কুলে এসেই সহকর্মিনীদের প্রচ্ছন্ন উত্তেজনাটুকু উপলব্ধি করেছেন। তাঁদের মুখ টিপে হাসা এবং আড়ে-আড়ে চাউনিও দেখেছেন। শেষে হেড-মিসট্রেস তাঁকে ঘরে ডেকে যখন বেশ সাদাসিধেভাবে বললেন, মেয়েদের বড়ো বেশি প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, অতটা করা ভালো নয়—তখন অর্চনা বসুর বুঝতে বাকি রইলো না গত দিনের ব্যাপার কতটা গড়িয়েছে। ক্লাসে সেই মেয়েটির দিকে চোখ পড়তে আরো স্পষ্ট হয়ে গেল সব।

মনে-মনে অর্চনা বসু নিজের মৃত্যু কামনা করে কাটালেন ক'টা দিন।

কাজেই, একটি অজানা-অচেনা ছেলে জলে ডুবে মরার দরুন অর্চনা বসু অমন উতলা হয়ে উঠেছিলেন কোন্ অনুভূতির ত্রাসে, সেটা মেয়েরা না বুঝুক, শিক্ষয়িত্রীরা বুঝেছিলেন। বুঝে হেসেছিলেন, কিন্তু অবাকও হয়েছিলেন।

বাড়িতে সেই ঘটনার পর থেকেই অর্চনা নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন সম্পূর্ণ। আর কোনো মেয়েকে বাড়িতে ডাকেননি, আর কাউকে কোলেও তোলেননি। গঙ্গার ঘাটের দুর্ঘটনার পর কয়েকটা দিন

মাত্র সকলে অস্থির হতে দেখেছিলেন তাঁকে। তারপর আবার যেইকে সেই। যেমন স্থির, তেমন শান্ত। ও-রকম শান্ত বলেই যেন সাজ-সজ্জার শুভ্রতা আরো বেশি করে চোখে পড়ে। আরো দূরে ঠেলে দেয় সকলকে। শুধু মেয়েরা নয়, কাছাকাছি হলে শিক্ষয়িত্রীরাও কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করেন।

অর্চনা বসু স্কুলে আসেন, পড়ান, বাড়ি যান।

বাড়িতে একটি বুড়ি ঝি আছে শুধু। সব ভার তার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। মন বুঝে যখন-তখন চা করে খাওয়ায় বলে খুব খুশি তার উপর। বাড়ি ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে চা খেতে-খেতে মেয়েদের খাতা দেখতে বসে যান। রাত্রিতে বই পড়েন, নয়তো ছোটো বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকেন চুপচাপ। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারেন না। ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়েন। বুড়ির রান্না দেখেন, বয়স-কালে তার রান্নার হতযশ কেমন ছিলো সাগ্রহে শোনেন। নয়তো, বই নিয়ে বসেন আবার।

রাতে খাওয়ার পরেই আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েন। চোখে ভাত-ঘুম আসে, কিন্তু এক-একদিন আসে না। আসবে না বুঝলেই তাড়াতাড়ি উঠে ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়েন আবার। শিশি-ভরতি ঘুমের বড়ি মজুত থাকে বারো মাস। ঘুম আসে। কিন্তু এক-একদিন তাও আসে না। বিবরাশ্রয়ীরা নড়ে-চড়ে সজাগ হয়ে উঠতে চায় তখন, স্মৃতিপথে ভিড় করে আসতে চায় চোখের সামনে। প্রথম খানিকটা যোঝাযুঝি করে ঘুমোতে চেষ্টা করেন। কিন্তু নিজেও জানেন, সে চেষ্টা পণ্ডশ্রম। তারা আসছে, তারা আসবে। এবারে হারিয়ে যাবার পালা। রাতের অন্ধকারে দু'চোখ টান করে ওরই মধ্যে এক নারীর বোবা আকুতি দেখার পালা। তার সঙ্গে এক হয়ে যাবার পালা—ওরই ভিতরে রাজ্যের আশা নিয়ে বসে আছে যে নারী, তার সঙ্গে। তিলে-তিলে পুড়ে ছাই হচ্ছে সব আশা, কিন্তু তবু আশার শেষ নেই।

শেষ হবে কেমন করে? সেই জ্যোতির্ময়ের আশীর্বাদ মিথ্যে হবে কেমন করে? সে আশীর্বাদের অমৃত-ধারা যে সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করে এসেছিলেন অর্চনা বসু! অন্তস্থলে কার যেন পদধ্বনি শুনেছিলেন মুহূর্তের

জন্য। একটা সম্ভাবনার ধুক-ধুক স্পন্দন নিজের বুকের স্পন্দনের সঙ্গে এক হয়ে মিলেছিলো। সেই সম্ভাবনার সম্পদ আঁকড়ে বসে আছেন সেদিনের সেই অর্চনা বসু।

আজকের মেয়ে-স্কুলের শিক্ষয়িত্রী অর্চনা বসু জানেন, কোনো কালে সত্যি হবার নয় তা। বার-বার নিজেকে বোঝান, ভ্রূকুটি করেন, চোখ রাঙান। শেষে হাল ছাড়েন। স্মৃতিপথে যারা আসছে, আসবেই তারা। খরখরে দু'চোখ মেলে অর্চনা বসু দেখতে বসেন তাদের।

—কি কাণ্ডই না হয়েছিলো সেদিন! বাড়িতে যেন সাড়া পড়ে গিয়েছিলো একটা। ভাইদের উত্তেজনা, ছোটো বোনের উত্তেজনা, মায়ের উত্তেজনা, আর সব দেখে অর্চনার নিজেরও। দাদা তো পারলে তক্ষুনি আর একটা বিয়ে দিয়ে দেন। হাতের কাছে তেমন পাত্র কি মজুত নেই নাকি?

আছে, সকলেই জানে। এমন একটা দিনে তিনিও এসেছেন বইকি। ঘরের এক কোণে চুপচাপ বসে আছেন, আড়ে-আড়ে তাকাচ্ছেন অর্চনার দিকে। তাঁর ফর্সা মুখ একটু বেশি লালচে দেখাচ্ছে আজ। ননিমাধব, দাদার ব্যবসায়ের পার্টনার—ছোটো বোন বরুণা আড়ালে যাঁকে মুখ ভেঙচাতো, ননির পুতুল বলে।

মাত্র দু'ঘণ্টা আগেও অর্চনা বসু ছিলেন অর্চনা মিত্র। মিত্রকে বরাবরকার মতো জীবন থেকে ছেঁটে ফেলে আবার বসু হয়েছেন। কোর্টে রায় বেরিয়েছে। এ রায় বেরুবে সকলেই জানতো। কারণ, দু'পক্ষেরই সমর্থনে এই বিচ্ছেদ, কোথাও কোনো ঝামেলা নেই। তবু ঘোষণাটা পাকাপাকি হওয়া-মাত্র বাড়িতে যেন সাড়া পড়ে গেল একটা। শুধু বাড়িতে কেন, শুভার্থী আত্মীয়-পরিজনেরাও এলেন। আজকালকার দিনে এটা যে এমন-কিছু ব্যাপার নয়, বার-বার সে-কথাই বলে গেলেন তাঁরা।

বাড়ির মধ্যে বাবাই শুধু চুপচাপ। তাঁর সমর্থন ছিলো না, অর্চনা জানতেন। সবাই জানতেন। কিন্তু তাঁকে আমল দিচ্ছে কে। হুট্ করে মেয়ের এ-রকম একটা বিয়ে দিয়ে বসেছিলেন বলেই তো এ-রকমটা ঘটলো। মায়ের অমত ছিলো, দাদারও আপত্তি ছিলো। কিন্তু ভদ্রলোক তাঁর সঞ্চয়ের তবিল জানতেন বলেই কারো কথায় কান দেননি। স্ত্রীকে আশ্বাস

দিয়েছেন। বলেছেন, 'কলেজের প্রোফেসার, বিদ্বান ছেলে, মেয়ে ভালো থাকবে, দেখো।'

স্ত্রী ঝাঁপিয়ে উঠেছিলেন, 'কিন্তু মাইনে যে মাত্র চারশো টাকা!'

তিনি জবাব দিয়েছেন, 'চারশো টাকাই বা ক'জন পায়, তাছাড়া কালে আরও বাড়বে।'

'দু'হাজার টাকায় যাদের মাস চলে না, চারশো টাকায় কেমন করে চলবে?' স্ত্রী তাই নিয়ে অনেক তর্ক করেছেন। বলেছেন, 'মেয়ে কুৎসিত নয় যে, সাত-তাড়াতাড়ি এ-রকম একটা বিয়ে দিয়ে দিতে হবে।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাধাও দেননি। তেমন পাত্র আনতে হলে টাকা কতো লাগে নিজের ভাইয়ের মেয়েদের বিয়ের সময় সেটা তিনি দেখেছেন।

অর্চনা এম. এ. পড়তেন তখন। মেয়েদের ধরন-ধারণ মায়ের মতো হলেও বয়সোচিত উদারতা ছিলো খানিকটা। অদেখা কলেজ-মাস্টারটির প্রতি খানিকটা যেন করুণা বশেই বিয়েতে আপত্তি করলেন না অর্চনা। বিয়ে হয়ে গেল।

কিন্তু ক'টা দিন না-যেতেই উপলব্ধি করতে লাগলেন, মানুষটি করুণার পাত্র নন খুব। ছেলেবেলা থেকে সংসারে মায়ের প্রভাবটাই বড়ো দেখে এসেছেন। নিজের সংসারে সেটা বাতিল করে চলার পাত্রী নন অর্চনাও। চারশো টাকা মাইনের কলেজের মাস্টারের নিজস্ব সত্তার জোরটাকেই যেন বরদাস্ত করতে পারলেন না অর্চনা। প্রায় স্পর্ধার মতো লাগতো তাঁর। অসন্তোষ প্রকাশ পেতে লাগলো। সুখেন্দু মিত্র—কি নামের ছিরি! কার মাথা থেকে এলো এমন নাম! নাকের নিচে এক-পোঁচ কালির মতো ও কি! আজকাল ও-সব ছাই-ভস্ম রাখে কোনো ভদ্রলোক—কি টেস্ট! পরিষ্কার করে কামিয়ে ফেলতে পারে না? প্যান্ট-কোট পরে কলেজ না করতে পারো না-ই করলে, তাই বলে এ-রকম ধুতি আর এ-রকম পাঞ্জাবী!

সুখেন্দু মিত্র প্রথম-প্রথম চেষ্টা করেছেন সামঞ্জস্য বজায় রাখতে। স্বল্পভাষী, গম্ভীর মানুষ। তর্কের ব্যাপার উপস্থিত হলেই বই নিয়ে আসতেন। কিন্তু কিছুকাল না-যেতে এ-সব ছোটোখাটো ব্যাপার ছাড়িয়ে একটা বড়ো রকমের ঘা খেলেন তিনি। সুন্দরী এবং বিদুষী স্ত্রী লাভের

মোহ তাঁর ছিলো না, এমন নয়। এক রাতের উষ্ণ প্রগল্‌ভ মুহূর্তে অর্চনা ছন্দপতন ঘটালেন। পরিষ্কার জানালেন, এই আয়ে সংসারে নতুন ঝামেলা যেন না বাড়ে—বিয়ে হয়েছে বলেই সে-রকম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা উনি বরদাস্ত করবেন না।

স্বখেন্দু মিত্র নিজেকে গুটিয়ে নিতে লাগলেন আস্তে-আস্তে। অর্চনা মিটিং করেন, ক্লাবের শৌখিন থিয়েটারে নামেন, মায়ের সঙ্গে পার্টিতে যান। তাঁর খাতিরে সর্বত্রই নিমন্ত্রণ থাকে স্বখেন্দুবাবুরও। কিন্তু তাঁকে আর দেখেন না কেউ। অর্চনার কৈফিয়ত দিতে হয় বলেই বাড়ি এসে কৈফিয়ত নিতে ছাড়েন না। স্বখেন্দুবাবু বই নামিয়ে অভিযোগ শোনেন। শুনে আবার বই তুলে নেন। এমন কি, বাপের বাড়ির কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানেও তাঁর দর্শন পান না কেউ। পাঁচ-কথা ওঠে। রাগে জ্বলতে-জ্বলতে বাড়ি আসেন অর্চনা। ইচ্ছে করে, বইয়ের রাশি ভস্ম করে ফেলতে। মাস্টার জাতটার উপরেই ক্ষেপে ওঠেন তিনি। চেঁচামেচি করে ওঠেন কখনো। কখনো বা গুম্ হয়ে থাকেন। কিন্তু মনে-মনে উপলব্ধি করেন, ঝগড়া-ঝাঁটি না করলেও মানুষটি গোঁয়ার ধরনের, নিজস্বতা আছে একটা। ওই চুপচাপ বই পড়ার মধ্যে একটা অবজ্ঞা-মিশ্রিত হুল ফোটানর স্পর্ধা দেখেন অর্চনা।

এমনি করে বছর না-ঘুরতে বাপের বাড়ির সবাই, বিশেষ করে অর্চনার মা জানালেন, মেয়ের জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে। এই জানাকে তিনি চেপে না রেখে বরং বড়ো করে তুললেন সকলের চোখে। মায়ের ক্ষোভ পুষ্ট হতে লাগলো আরো। ওদিকে উপরওয়ালার কারসাজি এমনি যে, অর্চনার বিয়ের পর থেকেই দাদার ব্যবসা যেন ফেঁপে উঠতে লাগলো! ধুলো-মুঠি ধরলে সোনা হওয়ার সামিল। ছোটো বোন বরুণার জন্য এখন পাত্র দেখা হচ্ছে এমন জায়গায়, যেখানে টাকার ওজনে মনের মতো ছেলে কেনা যায়। কাজেই মায়ের উদ্দেশে এখন দাদার উদার অনুযোগও কানে আসে অর্চনার, 'সাত-তাড়াতাড়ি কেন যে তোমরা মেয়েটার এমন একটা বিয়ে দিতে গেলে—দু'দিন সবুর করলে চলতো না!'

রুদ্ধ আক্রোশে মাসের বেশির-ভাগ দিনই বাপের বাড়ি থাকেন অর্চনা। সত্য কথা বলতে কি, টাকার অভাবটা তাঁর কাছে খুব বড়ো নয়।

রাগ যতো ওই মানুষটির উপর। তাঁকে বশে আনতে পারছেন না বলে।

এ অবস্থায় খুব তুচ্ছ এক কারণ নিয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটে গেল একদিন। ঘটা করে দাদার জন্মদিন হচ্ছে। বৌদি নিজে এসে নিমন্ত্রণ করে গেছেন। সুখেন্দু মিত্র যাবেন না, এমন আভাস একবারও দেননি। বরং যাবেন বলেই মনে হয়েছিলো অর্চনার।

রাত্রিতে উৎসব-বাড়ি থেকে এসে তাঁর হাতের থেকে বই টেনে ফেলে দিয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন অর্চনা, 'জানতে চাই, এর অর্থ কী?'

উঠে আগে বই কুড়িয়ে আনলেন সুখেন্দুবাবু। বসলেন আবার। চোখে চোখ রাখলেন। বললেন, 'কিসের অর্থ?'

'আমাকে এভাবে অপমান করার অর্থ কী?'

একটু থেমে সুখেন্দুবাবু জবাব দিলেন, 'তোমাদের বাড়ি গেলে তোমার মা এমন ভাব দেখান আর এমন উপদেশ দেন, যাতে আমিও খানিকটা অপমান বোধ করি।'

রাগে জ্বলছেন অর্চনা। অনেক টিকা-টিপ্পনী সহ্য করতে হয়েছে আজ তাঁকে। বললেন, 'আমার মা উপদেশ দেবে না তো উপদেশ দেবে বাইরের লোক এসে?'

'উপদেশ হলে কিছু বলতাম না, তিনি অপমান করেন। তাছাড়া, তোমার ক্লাব থিয়েটার, দাদার জন্মদিন—এ-সবে আমি ঠিক খাপ খাইনে।'

অর্চনা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'খাপ খাও না সে সবাই জানে, কিন্তু মানিয়ে চলতে চেষ্টা করেছো কখনো? নিজের নেই বলে যাদের আছে হিংসায় তাঁদের কাছেও ঘেঁষতে চাও না, কেমন?'

স্থির নেত্রে খানিক চেয়ে থেকে সুখেন্দবাবু বললেন, 'হিংসা করার মত তোমাদের কিছু নেই, সেটা বুঝলে এ-কথা বলতে না। আমার মানিয়ে চলার থেকেও তুমি আমার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবে কি না, সে কথাটাই তোমার আর তোমার বাবা-মায়ের আগে ভাবা উচিত ছিলো।'

এর পরে, অনেকদিন পরে, আর একবার একটি দিন মাত্র অর্চনা শেষ বোঝাপড়া করার জন্য তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন। সোজাসুজি বলেছিলেন, 'বই নামাও, কথা আছে।'

সুখেন্দুবাবু বই নামিয়েছেন।

অর্চনা বললেন, 'বিয়ের পর থেকে আমাদের বনিবনা হলো না, সেটা বোধহয় আর বলে দিতে হবে না?'

সুখেন্দুবাবু বললেন, 'সে তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'তাহলে চিরকাল এভাবে চলতে পারে না নিশ্চয়ই?'

সুখেন্দুবাবু জবাব দিলেন না।

'আমাদের তাহলে ছাড়াছাড়ি হওয়াই ভালো, কেমন?'

'কি করে?'

অর্চনা শান্ত মুখে বললেন, 'আইনে যেমন করে হয়।'

হাতের বই টেবিলে রাখলেন সুখেন্দুবাবু। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ঘরে পায়চারি করলেন কয়েকবার। আবাব বসলেন। ভাবলেন অনেকক্ষণ। অর্চনা জবাবের প্রতীক্ষা করছেন।

সুখেন্দুবাবু বললেন, 'যদি তাই চাও, আমার দিক থেকে কোনো বাধা আসবে না।'

দু'পক্ষের অনুমোদনের ফলে যা ঘটবার সহজেই ঘটে গেল তারপর। বিচ্ছেদের পরোয়ানা বেরুলো।

বাপের বাড়ির আবহাওয়া রীতিমতো গরম সেদিন। দাদা ঘোষণা করলেন, শীগগিরই এবার এমন বিয়ে দেবেন অর্চনার যাতে গায়ে আর আঁচটি না লাগে সারা জীবন। মা থেকে-থেকে জ্বলে উঠতে লাগলেন সেই অমানুষ লোকটির বিরুদ্ধে, যে এক দিনও শান্তিতে থাকতে দেয়নি তাঁর মেয়েকে—এবারে হাড় জুড়োবে। অর্চনার ছোটো বোন বরুণার উত্তেজনা সব থেকে বেশি। তার দিদিকে হেনস্থা করেছে যে লোকটা, তার কতবড়ো শিক্ষা হলো, সেটা ভেবে ডগমগিয়ে উঠছে থেকে-থেকে। মাস-ছয়েক আগে বরুণার বিয়ে হয়েছে, অদূরে বসে তার স্বামী বেচারি যে ওর আনন্দমিশ্রিত উত্তেজনাটুকু করুণ নেত্রে লক্ষ্য করছে, সেদিকে খেয়াল নেই।

আর, ঘরের এক কোণে বসে ফর্সা মুখ রুমালে ঘষে প্রায় লাল করে তুলেছেন ননিমাধব।

দিন কাটতে লাগলো। অর্চনা এম. এ. পড়তে শুরু করলেন

আবার। একটা বছর মাত্র বাকি ছিলো। পাস করলেন। পাস করেই আবার নতুন কোনো বিষয় নিয়ে পড়াশোনার তোড়জোড় করতে লাগলেন। কারণ, কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে। জীবন থেকে একজনকে ধুয়ে-মুছে ফেলেছেন বটে, কিন্তু এ বিচ্ছেদে ভিতরের ক্ষোভ এতটুকু কমেনি। মর্মান্তিক কিছু একটা ঘটলে যেন খুশি হন। কিন্তু কিছুই ঘটলো না। দিন যেমন চলছিলো, চলতে লাগলো। অর্চনার মনে হতো, কি করছে সেই মানুষটা, মনে-মনে কেমন জ্বলেছে, জানতে পারলে হতো। জানার উপায় নেই বলেই নিজে জ্বলতেন। তারপর ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসতে লাগলেন কেমন। পার্টি ভালো লাগে না, ক্লাব না, থিয়েটার না। বই পড়েন। কিন্তু বইও ভালো লাগে না সব সময়। তাঁর এই পরিবর্তনটা চোখে পড়লো সকলেরই। বিশেষ করে মায়ের। নতুন বৈচিত্র্যের সন্ধানে মাঝে-মাঝে কিছু একটা প্রোগ্রাম করে মেয়ের মত নিতে আসেন তিনি। অর্চনা কখনো অকারণে ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, কখনো বা নিস্পৃহভাবে চুপ করে থাকেন।

ওদিকে দাদার পার্টনার ননিমাধবের কদর বেড়েছে বাড়িতে। দিন-দিন ফুলে-ফেঁপে উঠছে ব্যবসা। সেই সঙ্গে ননিমাধবেরও গুণগান বাড়ছে। যে মা কোনদিন আমল দেন্‌নি তাঁকে, সেই মা আজকাল রীতিমতো খাতির করছেন তাঁকে। এলেই চা করে দেন, ভালো-মন্দ খবর দেন, কারণে-অকারণে অর্চনাকে ঘরে ডাকেন। যে বরুণা ভদ্রলোককে দেখলেই মুখ ভেঙচাতো ননির পুতুল বলে, আর দিদির কাছে ঠাট্টা করতো সীতার লক্ষ্মীমন্ত হনুমান বলে, সেও আজকাল ঠাট্টা তো করেই না, বরং কিছু একটা প্রত্যাশা নিয়ে ভদ্রলোককে লক্ষ্য করে। পারলে একটু যেন তোয়াজ করেও চলে। আর দাদা-বৌদির তো কথাই নেই। ননিমাধবের মতো এমন লোক তাঁরা একজনের বেশি দু'জন দেখেছেন বলে মনে হয় না!

দাদা বা মায়ের একটি বিশেষ ধরনের ডাক শুনলেই অর্চনা বুঝতে পারেন, ঘরে আর কেউ আছেন। এবং তিনি ননিমাধব ছাড়া আর কেউ নন। অর্চনার মনে যাই থাক, বাইরে কিছু প্রকাশ পায় না। ডাকলে সাড়া দেন, ঘরে আসেন, কথা বলেন। আর রুমালে বার-বার মুখ মুছতে-মুছতে একখানা ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠেছে, তাও লক্ষ্য করেন।

অর্চনা আর বিয়ে করবেন না এমন কথা কখনো বলেননি, বা এমন মনোভাবও কখনো প্রকাশ করেননি। সেই বিবাহ-বিচ্ছেদের দিন থেকেই তাঁর আবার বিয়ের কথা উঠেছিলো। বরং সেই ক্ষোভের মাথায় কাউকে এনে ধরে দিলে হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো হয়তো বা বিয়ে করেই ফেলতেন অর্চনা। কিন্তু সামাজিক চক্ষুলজ্জার খাতিরেই সম্ভবত প্রথম বছরাবধি সরাসরি এ প্রস্তাব তোলেননি কেউ আর। তারপর তাঁর ভাবগতিক দেখে সামনাসামনি কথাটা তুলতে কেউ ভরসা পেয়ে ওঠেননি; যেটুকু বলেন, আভাসে-ইঙ্গিতে। অর্চনা তার জবাবও দেন না।

কিন্তু যতো দিন যায়, তাঁর বিয়ের কথা ভেবে ততো অস্থির হয়ে পড়তে লাগলেন সবাই। ওদিকে ননিমাধবের হাজিরা দেওয়াটা প্রায় নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়ালো। মায়েরই গরজ বালাই। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিবাহ-প্রসঙ্গটা তিনিই প্রথম উত্থাপন করলেন মেয়ের কাছে। করে ধমক খেলেন। তারপর মায়ের তাড়নায় ভয়ে-ভয়ে হাল ধরতে এলো বরুণা। এসে সেও ধমক খেলো। সব শেষে বৌদি। রঙ্গরস করে তিনি অগ্রসর হলেন, 'বলি ব্যাপারখানা কি? রোজ-রোজ ভদ্রলোক এসে মুখ শুকিয়ে বসে থাকেন, দেখে মায়াও হয় না একটু!'

অর্চনা খানিক চেয়ে থাকেন তাঁর দিকে।—'কি করতে বলো?'

'কি আবার বলবো, বিয়েটা করলেই তো চুকে যায়।'

অর্চনা তেতে ওঠেন ভিতরে-ভিতরে। কিন্তু তবু শান্তমুখে জবাব দেন, 'বিয়ে করবো, কোনদিন তোমাদের বলেছি? তাছাড়া, করলেও একজন পুরুষমানুষকেই তো বিয়ে করবো, না কি?'

তাজ্জব বনে হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন ভ্রাতৃবধূ। তারপর সরে পড়েন।

আরো একটা বছর ঘুরে এলো। মুখে কেউ কিছু না বললেও অর্চনা কেমন করে যেন বুঝতে পারেন, ননিমাধবের সঙ্গে তাঁর বিয়েটা সম্পন্ন করার পিছনে আগ্রহ তাঁর দাদারই সব থেকে বেশি। শুধু বন্ধু নয়, এতবড়ো এক উঠতি ব্যবসায়ের অর্ধেক অংশীদার। তাঁকে আত্মীয়তার মধ্যে এনে ফেলতে পারলে ষোলোআনা নিশ্চিন্ত।

দাদা-বৌদি এবং বরুণার মধ্যে গোপনে-গোপনে কি পরামর্শ হলো ক'টা দিন। অর্চনা হঠাৎ শুনলেন, বেশ কিছুদিনের জন্য বেড়াতে বেরুবেন সকলে। দাদা জানালেন, বিশেষ করে অর্চনার জন্যই কিছুদিন চেঞ্জে ঘুরে আসা দরকার, দিনকে-দিন শরীর খারাপ হয়ে পড়ছে অর্চনার। আর, একঘেয়ে ব্যবসায়ের ঝামেলায় ক্লান্ত নাকি নিজেরাও। নিজেরা বলতে আর কে, না বললেও অর্চনা বুঝে নিলেন। দাদার মুখের উপর আপত্তি করতে পারলেন না। এমনিতেও বাদ-প্রতিবাদ আজকাল কারো সঙ্গেই করেন না বড়ো।

সদলবলে বেরিয়ে পড়া হলো একদিন।

দাদা-বৌদি অর্চনা বরুণা আর ননিমাধব। দিল্লীতে দিন-কতক থেকে যাওয়া হবে আগ্রায়। আগ্রায় আবার দিন-কতক থাকা, তারপর প্রত্যাবর্তন।

কাছাকাছি থাকার দরুণ এবারে কিছুটা যেন সহজ হলেন ননিমাধব। তাঁর রুমালে করে মুখ মোছা কমতে লাগলো। এর মধ্যে তিনজনই তাঁর দলে, সেটা অনেকদিনই জানেন। সুযোগ-সুবিধা মতো অর্চনার সঙ্গে কথাবার্তা বলার অবকাশ তাঁরাই করে দেন। অর্চনাও সদয় ব্যবহারই করেন তাঁর সঙ্গে। হেসে কথা বলেন।

অর্চনা ইতিহাসের ছাত্রী।

ইতিহাস-স্মৃতি বা ইতিহাস-নিদর্শনের প্রতি ননিমাধবের সশ্রদ্ধ জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে হেসেই জবাব দেন, যা জানেন অর্চনা। অন্য তিনজনের শোনার থেকেও দেখার দিকেই ঝোঁক বেশি। কাজেই দেখতে-দেখতে এদিকে-সেদিকে ছড়িয়ে পড়বেন তাঁরা, সে আর বিচিত্র কি।

দিল্লী-পর্ব সেরে আগ্রায় আসার মধ্যেই ননিমাধব অনেকটা ভরসা পেয়েছেন মনে-মনে। তাঁর থেকেও বেশি ভরসা পেয়েছেন দাদা-বৌদি বরুণা। আগ্রায় এসে ইতিহাসের আশ্রয় ছাড়াও অন্য দু'চারটি কথা বলতে শুরু করেছেন ননিমাধব। যেমন বেড়াতে কেমন লাগছে, আজকাল কথা এতো কম বলেন কেন অর্চনা, ইত্যাদি।

এততেও বিরূপ হতে দেখা যায়নি অর্চনাকে। চতুর্থবার তাজমহল

সেলিম চিশ্‌তির কবর

দেখতে-দেখতে ননিমাধবের কথা শুনে তো বেশ জোরেই হেসে ফেলেছিলেন। ননিমাধব একটা বড়ো নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'তাজমহল যে প্রেমের স্মৃতি-সমাধি, এখানে আসার আগে এমন করে কখনো মনে হয়নি—শাজাহানের দীর্ঘশ্বাসগুলোই যেন জমে পাথর হয়ে আছে।'

অর্চনাকে হঠাৎ এমন হেসে উঠতে দেখে অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিলেন ননিমাধব। লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিলেন। দাদা-বৌদি উৎফুল্ল মুখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসেছেন।

অর্চনা হেসেই বলেছেন, 'কেন তোমরা রোজ এই তাজমহলে আসো বলো তো? ভদ্রলোকের মন খারাপ হয়ে যায়।'

এতদিনে দাদা সত্যই বন্ধুর তারিফ করলেন মনে-মনে। খুশির কানাকানি চলতে লাগলো বরুণা আর বৌদির মধ্যে। সকলেরই একটা মনের বোঝা হাল্‌কা হয়ে আসছে ক্রমে।

পরদিনের প্রোগ্রাম ফতেপুর সিক্রি। মাইল-পঁচিশ দূর আগ্রা থেকে। মোটরে চলেছেন সকলে। দূর থেকে ইতিহাসেয় স্মৃতি সমারোহের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো সকলেরই। অর্চনার দিকে আড়-চোখে চেয়ে ননিমাধব নিঃশব্দ কৌতূহলেরই আভাস পেলেন শুধু।

মোটর থেকে নামতেই তিন-চারজন গাইড ছেঁকে ধরলো তাঁদের। এ ব্যাপারটা দিল্লীতেও দেখেছেন, আগ্রাতেও দেখেছেন তাঁরা। অদূরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো একজন অতিবৃদ্ধ গাইড। শ্বেত কেশ, শ্বেত শ্মশ্রু। যোয়ানদের সঙ্গে ঠিকমতো পাল্লা দিতে পারে না বলেই বোধহয় সবিনয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। যদি কেউ নিজে থেকেই ডেকে নেয় তাকে।

ডেকে নিলেন। কেন জানি তাকেই পছন্দ হলো ননিমাধবের। বুড়ো মানুষ, দেখাবে-শোনাবে ভালো। গাইড ঘুরতে লাগলো তাঁদের নিয়ে। গল্প করতে লাগলো। ইতিহাসের গল্প। এটা কেন, ওটা কি, ইত্যাদি। তারা চোস্ত উর্দুর অনেক কথাই বুঝলেন না কেউ। চেষ্টাও করলেন না বুঝতে। গাইড তার মনে কাজ করে যাচ্ছে, অর্থাৎ বকে যাচ্ছে। এঁরা নিজের মনে গল্পগুজব করতে-করতে দেখছেন। শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন একটু। এই বিশাল স্মৃতি-প্রাচুর্যের যেন শেষ নেই! এক সময় ননিমাধবই মন্তব্য

করলেন, 'কি উদ্ভট শখ ছিলো আকবর লোকটার, এ-রকম একটা ছন্নছাড়া জায়গায় এসে এই কাণ্ড করেছে বসে-বসে!'

গাইড তাঁর কথাগুলো সঠিক না বুঝুক, বক্তব্য বুঝলো। গল্পের ভণিতা শুরু করলো আবার। শখ নয় বাবুজি, শাহেন শা বাদশা এখানে ফকির চিশ্‌তির দোয়া মেঙে সব কিছু পেয়েছিলেন বলেই এই সমস্ত হয়েছিলো।

গাইডের বকর-বকর শুনে বরুণার কান ঝালাপালা হয়েছে। হাল্‌কা মন্তব্য করে সে আগে-আগে চললো। দাদা-বৌদিও গাইডের কথায় কান না দিয়ে নিজেরা কথা বলতে-বলতে চলেছেন। গাইডের পাশে অর্চনা, কাজেই তাঁর পাশে ননিমাধব। গাইড বলতে লাগলো, 'এই তামাম জায়গা তো জঙ্গল ছিলো, কেউ আসতো না; হাতি-গণ্ডার চরতো। শাহেন শা আকবর যুদ্ধ-ফেরত এখানে এক রাতের জন্যে আটকে পড়েছিলেন। এই ভীষণ জঙ্গলের গুহায় সাধন-ভজন করতেন এক পয়গম্বর পুরুষ—ফকির সেলিম চিশ্‌তি। এতবড়ো বাদ্‌শা তাঁকে দেখামাত্র কেমন যেন হয়ে গেলেন। তাঁর দোয়া মাঙলেন। শাহেন শার মনে ছিলো বেজায় দুঃখু। খাস বেগম মরিয়মের দু'দুটো ছেলে হয়ে মরে গেছে—আর ছেলে হয়নি। তখ্‌ত-এ-তাউসে বসবে কে? কাকে দিয়ে যাবেন মসনদ্‌?

ফকির চিশ্‌তি বললো, 'আল্লার ইচ্ছায় বাদ্‌শাহের ছেলে হবে আবার। বেগমকে এইখানে নিয়ে আসতে বললেন সেলিম চিশ্‌তি। আকবর তাই করলেন। ন'মাস ছিলেন এখানে খাস বেগমকে নিয়ে। তারপর ছেলে হলো। ছেলের মতো ছেলে বাদ্‌শা জাহাঙ্গীর। আকবর গুরুর নামে ছেলের নাম রেখেছিলেন, সেলিম। গুরুর আশ্রয়ে বসবাস করার জন্যেই সব জঙ্গল সাফ করে এখানে এতবড়ো রাজ-দরবার গড়ে তুললেন বাদ্‌শা আকবর। ফকির বই বাদ্‌শা আর কিছু জানতেন না। ফকিরই তাঁর যথা সর্বস্ব হয়ে উঠলেন।'

কখন যে নিবিড় আগ্রহে শুনতে শুরু করেছেন অর্চনা, নিজেরই খেয়াল নেই। হঠাৎ কেন এমন করে স্পর্শ করলো এই কাহিনী, তাও জানেন না। শুনতে শুনতে একটি সমাধির কাছে এসে দাঁড়ালেন তাঁরা।

সেলিম চিশ্‌তির কবর

মার্বেল পাথরের শুভ্র সমাধি, লাল কাপড়ে জড়ানো, চারদিকে নক্সাকাটা পাথরের জালি-দেয়াল।

গাইড জানালো, 'এই ফকির চিশ্‌তির সমাধি।'

অর্চনা দেখছেন চুপচাপ। আর কি যেন একটা অজ্ঞাত আলোড়ন হচ্ছে ভিতরে-ভিতরে তাঁর। বরুণা আর দাদা-বৌদি সামনেই ঘোরাঘুরি করছেন। অর্চনার চোখে পড়লো, সেই জালির-দেওয়ালে অসংখ্য সুতো আর কাপড়ের সরু টুক্‌রো বাঁধা। সুতোয় আর কাপড়ের টুকরোয় সমস্ত জালির দেওয়ালটাই ভীষণ বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে। অর্চনা গাইডকে জিগ্যেস করলেন, 'এগুলো কী?'

গাইড জানালো, 'যাদের ছেলে হয় না, তারা ছেলের জন্যে ফকিরের দোয়া মেঙে এই সুতো আর কাপড় বেঁধে রেখে যায়। কতো দূর-দূর দেশ থেকে নিঃসন্তান মেয়েরা সুতো বাঁধার জন্যে এখানে আসে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান—সবাই আসে। ছেলে কামনা করে এখানে এসে ভক্তিভরে সুতো বেঁধে দিলে ছেলে হবেই। ফকিরের আশীর্বাদ কখনো মিথ্যে হয় না। দুশো বছর হতে চললো, কিন্তু লোকের এ বিশ্বাসে ফাটল ধরেনি আজও।'

বহু বিচিত্র দৃষ্টান্ত শোনাতে লাগলো গাইড।

অর্চনার কানে তার এক বর্ণও ঢুকলো না। কি একটা সুপ্ত ব্যথা খচ্‌খচিয়ে উঠছে ভিতরে-ভিতরে। টকটকে লাল হয়ে উঠেছে সমস্ত মুখ। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। ফকিরের সব কথা ননিমাধব শোনেননি। কিন্তু অর্চনার দিকে চেয়ে থমকে গেলেন তিনি: 'কি হলো?'

জবাব না দিয়ে সুতো-বাঁধা সেই জালির দেয়ালের চারিদিকে ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগলেন অর্চনা। লক্ষ-লক্ষ সুতো বাঁধা। প্রত্যেকটি সুতো যেন এক-একটি রক্ত-মাংসের শিশু হয়ে দেখা দিতে লাগলো চোখের সামনে।

কি এক অজ্ঞাত উত্তেজনায় অর্চনা কেঁপে-কেপে উঠতে লাগলেন এক-একবার। আবার কাছে এগিয়ে এলেন ননিমাধব। জিগ্যেস করলেন, 'কি হলো, খারাপ লাগছে কিছু?'

হঠাৎ যেন সচেতন হলেন অর্চনা। তাকালেন তাঁর দিকে। বললেন, 'না—গরম লাগছে, একটু জল খুঁজে পান কিনা, দেখুন তো…।'

হন্তদন্ত হয়ে জলের সন্ধানে গেলেন ননিমাধব। বেশ ঘাবড়ে গেছেন তিনি। জলের তৃষ্ণা দু'চোখে এমনভাবে ফুটে উঠতে জীবনে আর দেখেননি কখনো।

ননিমাধব পা বাড়াবার সঙ্গে-সঙ্গে অর্চনা একটা কাণ্ড করে বসলেন। ফ্যাঁশ করে দামী শাড়ির আঁচলটা ছিঁড়ে ফেললেন। বৃদ্ধ গাইডের বিমূঢ় চোখের সামনেই সেই শাড়ির টুকরো জালির দেয়ালে বেঁধে দিয়ে দ্রুত সেখান থেকে সরে এলেন। দেহের সমস্ত রক্ত যেন মুখে উঠে এসেছে তাঁর। গাইড কয়েক নিমেষ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে-চেয়ে কি বুঝলো, সে-ই জানে। টেনে-টেনে বললো, 'ফকিরের দোয়া কখনো মিথ্যে হয় না, মাইজি। শুচি মতো থেকো, আর বিশ্বাস করো।'

জল নিয়ে এসে ননিমাধব হতভম্ব। কারণ, অর্চনা অন্যমনস্কের মতো বললেন, জলের দরকার নেই। কিন্তু তাঁর মুখের দিকে চেয়েই কিছু একটা ঘটেছে বোঝা গেল। দাদা-বৌদি আর বরুণাও অবাক। সকলেই জিগ্যেস করতে লাগলেন কি হয়েছে।

অর্চনা কথা বলতে পারছেন না, নিজেকে আড়াল করতে পারছেন না বলেই বিব্রত হয়ে পড়ছেন আরো বেশি। ছেঁড়া শাড়ির আঁচল ঢেকে ফেলেছেন, তবু অস্বস্তি যায় না। অস্ফুট স্বরে জানালেন, 'শরীরটা ভালো লাগছে না, এক্ষুনি ফেরা দরকার।'

তাড়াহুড়ো করে হোটেলে ফিরলেন সকলে। কিন্তু হঠাৎ যে কি ব্যাপার ঘটে গেল ভেবে না পেয়ে, সবাই বিভ্রান্ত হলেন। ননিমাধবকে এটা-সেটা জিগ্যেস করতে লাগলেন সকলে। কিন্তু তিনিও বিমূঢ়।

অর্চনা ঘোষণা করলেন, সেই রাতের ট্রেনেই কলকাতায় ফিরবেন। আবার আকাশ থেকে পড়লেন সকলে। কিন্তু তাঁর দিকে চেয়ে মুখে আর কথা সরে না কারো। স্থানীয় ডাক্তার ডেকে ব্লাড-প্রেসার দেখিয়ে নেওয়ার কথাও মনে হয়েছে সকলেরই। কিন্তু শোনা মাত্র অর্চনা এমন রেগে উঠলেন যে, কেউ আর একটি কথাও বলতে পারলেন না।

সারা পথ এক অধীর প্রতীক্ষায় নিঃশব্দে ছটফট করতে দেখা গেল তাঁকে। বেশি রাতে সকলে যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন, ননিমাধব কাছে এলেন। সত্যকার আকুতি নিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কি হয়েছে, বলবে না?'

অর্চনা সচকিত হয়ে তাকালেন তাঁর দিকে। কিছু একটা ভাবনায় যেন ছেদ পড়লো। ছ'চোখ ছল্‌ছল্‌ করে এলো কেমন। অস্ফুটভাবে জবাব দিলেন, 'কি বলবো…'

'এভাবে চলে এলে কেন?'

অর্চনা তেমনি অস্ফুট স্বরে বললো, 'আর কতো দেরি করবো—অনেক দেরি হয়ে গেছে যে।'

ননিমাধব ভড়কে চুপ করে গেলেন।

হঠাৎ এভাবে ফিরতে দেখে মা পাঁচ-কথা জিগ্যেস করতে লাগলেন। দাদা বিরক্ত হয়ে জবাব দিলেন, 'জিগ্যেস করে দেখো তোমার মেয়েকে, আমরা কিছু জানি না।'

ছুপুরের দিকে দাদা বেরিয়েছেন। বরুণা শ্বশুর-বাড়িতে গেছে দেখা করতে। বৌদি রাতের ক্লান্তি দূর করছেন।

অর্চনা চুপচাপ বেরিয়ে পড়লেন।

ট্রাম থেকে নেমে একটুখানি হাঁটা-পথ। তারপর বাড়ি। দরজা বন্ধ। বন্ধই থাকে…। কড়া নাড়তে লাগলেন! সাড়া নেই। আরো জোরে কড়া নাড়লেন। মনে-মনে হিসাব করছেন, যতদূর মনে পড়ে, এ দিনটা অফ-ডে। না কি রুটিন বদলেছে কলেজের! কিন্তু তাহলে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ কেন, বাইরে তালা ঝোলার কথা।

ওদিক থেকে দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। শরীরের সমস্ত রক্ত আবার মুখে এসে জমছে অর্চনার।

দরজা খুললো। অর্চনা স্তব্ধ।

ছুপুরের ঘুম-ভাঙা চোখে দরজা খুললো একটি মেয়ে। বিবাহিতা। স্রস্ত বেশবাস। কোলে একটি ফুটফুটে শিশু।

দরজা খুলে মেয়েটিও অবাক।

অর্চনা সামলে নিলেন, জিগ্যেস করলেন, 'এ বাড়িতে কে থাকেন?'

জিগ্যেস করারও দরকার ছিলো না। শিশুটির মুখের আদলে তার জবাব লেখা আছে।

ঈষৎ বিস্মিত মুখেই মেয়েটি জানালো কে থাকেন।

'—ও' অর্চনা হাসলেন একটু, 'আমি ঠিকানা ভুল করেছি তাহলে।' হাত বাড়িয়ে শিশুর গাল টিপে দিলেন : 'বেশ ছেলে তো···আপনার। আপনাকে বিরক্ত করলাম বোধহয় ? আচ্ছা, নমস্কার।'

কিছু জিজ্ঞাসাবাদের ফুসরত না দিয়ে ছেলের গালে আর একবার আঙুল স্পর্শ করে অতি আধুনিকার মতই টক্-টক্ করে বেরিয়ে এলেন অর্চনা বসু।

* * *

পাখি-ডাকা আবছা অন্ধকারে ভোরের আভাস। খরখরে হু'চোখের উপর দিয়ে আর একটি রাতের অবসান হলো। অর্চনা বসু উঠবেন। হাত-মুখ ধোবেন। তারপর চেয়ারে বসে ঝিমুবেন খানিক। বুড়ি ঝি চা নিয়ে আসবে। পর-পর হু'তিন পেয়ালা চা খেয়ে গা-ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াবেন তিনি। চান করে আসবেন। স্কুলের খাতা দেখে বা বই পড়ে কাটাবেন কিছুক্ষণ। তারপর শুচিশুভ্র বেশবাসে নিজেকে ঢেকে স্কুলে যাবার জন্য প্রস্তুত হবেন। গাইডের শুচি মতো থাকার নির্দেশ ভোলেননি তিনি।

আর তার কথামতো বিশ্বাসটাও দূর করে উঠতে পারেননি।

অনমনীয়

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

অরুণা আজ সকাল-সকাল ছুটি নিয়ে হোস্টেলে ফিরলো। কিন্তু এ-রকম ঘটনা ইতিপূর্বে আর কখনও ঘটেনি তার চাকরি-জীবনের ইতিহাসে। কারণ, যে ক'ঘণ্টা স্কুলে থাকা যায়, সেইটুকুই লাভ। মেয়েদের পড়াতে তার খুব ভালো লাগে, তাদের পড়া বোঝানো আর পড়া ধবার মধ্যে একটা গভীর স্নেহস্পর্শ, গোপনে তৃষ্ণার্ত মনকে রসসঞ্চিত করে তোলে। সবচেয়ে ওর ভালো লাগে—নিচের ক্লাসে ছোটো-ছটো মেয়েদের ঘরে যখন পড়াতে যেতে হয়, তখন। পড়া ধরলে কেউ-বা চোখ বড়ো-বড়ো করে তাকিয়ে এক নিশ্বাসে তোতা-পাখির মতো গড়গড় করে মুখস্থ বলে যায়, আবার কোনো-কোনো মেয়ে ফ্যালফ্যাল করে অশ্রু ছল-ছল চোখে দাঁড়িয়ে থাকে, পারে না কথা কইতে, মুখস্থ-পড়া ভুলে গিয়েছে—বোকার মতো এমনভাবে তাকায় সরল চাহনী মেলে যে, মায়া হয়, হাসিও পায়। অরুণার মনে এই ছাত্রীরাই এখন বাসা বেঁধেছে। এদের এক-একজনের দিকে তাকিয়ে ওর এক-একটা কথা মনে হয়। কিন্তু আজ তবু ওকে ছুটি নিয়ে ঘরে ফিরতে হলো। এমন কোনো দরকার আছে যে তা নয়, শরীরও তার খারাপ করছে না—তবু সে চলে আসে।

একখানা চিঠি এসেছে ওর কাছে আজ। এই চিঠিই ওকে ভাবিয়ে তুলেছে। যতবার যে ক্লাসে পড়াতে গিয়েছে ততবারই ওকে অন্যমনস্ক করে দিয়েছে চিঠিখানা। এক-একটা মেয়েকে দেখে ওর মনে হয়েছে, এই রকম ছিমছাম মেয়ে দেখতে মন্দ নয়, হলই বা রং একটু ময়লা, কিন্তু কি সুন্দর মুখশ্রী, টানা-টানা ভাসা-চোখে স্বপ্নময় দৃষ্টি ওর—ছেলেমানুষকে দেখলেই একটু আদর করতে ইচ্ছে করবে—এমন না-হলে সন্তান কী?

ফুটফুটে টিকোলো নাক যার তাকে দেখলে অরুণার নিজের সন্তান ভাবতে ইচ্ছে হয় না। একটু শ্যামল, কচি-কচি মেয়েই·বেশ।—কিন্তু এ-সব কথা ভাববার অর্থ কী? অরুণা নিজের দিকে অবাক হয়ে তাকায়। এ তার হলো কী? শেষকালে শান্তির জীবন ছেড়ে কী এক অবাস্তব মায়ার দিকে কেমন যেন মনটা টানছে? স্বাধীন, মুক্ত-জীবনের উদারতায় ওর মন কি শেষে হাঁপিয়ে উঠলো নাকি? সেই প্রশ্নের মীমাংসার জন্যেই সে স্কুল থেকে চলে আসে, ভালো করে ভেবে দেখা দরকার, নিভৃতে—।

পথে আসতে-আসতে একটা কথা অনবরত তাকে বিচলিত করে। পারুলের চেহারাটা তার চোখের সামনে নেচে বেড়ায়—ক্লাস থ্রির বাচ্চা মেয়ে পারুল, মাথায় টুকটুকে লাল ফিতে কায়দা করে বাঁধা, নিশ্চয়ই তার মা বেঁধে দেন। চোখের কোণে কাজলের কালো মাধুর্য, ফ্রকটার কি সুন্দর ডিজাইন—পারুলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত মায়ের স্নেহ জড়ানো, বইগুলো মলাট দেওয়া, সেলাই করা। পড়াশুনো মোটে পারে না মেয়েটা। সবটা জড়িয়ে তাকে অরুণার যে কী ভালো লাগে! পারুলের মতো মেয়ে এমন-কিছু অসাধারণ নয়, তবু পারুলকেই অরুণার ভালো লাগে। পারুলকে তার ছোটদা স্কুলে যাবার পথে পৌঁছে দিয়ে যায়, আবার ফেরবার পথে দুই ভাই-বোন একসঙ্গে বাড়ি ফেরে। পারুলের ছোটদার নাম অরুণা জানে—সে পড়ে হাই স্কুলে—ক্লাস সিক্স-এ। ওদের দুই ভাই-বোনে এতো ভালোবাসা—একমাত্র ওদের পক্ষেই বুঝি সম্ভব। না, অরুণা আর ভাবতে পারে না, যতো সব আজেবাজে কথা আর ভাবা যায় না।

ও নিজের ঘরে এসে জামা-কাপড় বদলে চৌকির ওপর শুয়ে পড়লো। সারা বাড়িটা দুপুরের স্তব্ধ নিবিড়তায় খাঁ-খাঁ করছে। সামনের মাঠে ঘাসের ওপর অনেকগুলো কাপড় শুকোচ্ছে। তেমনি কাঠ-ফাটা রোদ—বারান্দার সিমেন্ট তেতে গেছে, খালি পায়ে চলাফেরা করা যায় না, ওরই মধ্যে কাপড় আড়াল দিয়ে ছায়া তৈরি করে চাকর পৈরু তার খাটিয়ায় পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছে। পৈরু অনেকদিনের চাকর, আগে ছিলো স্কুলের সেক্রেটারির বাড়িতে, এখন বুড়ো হয়েছে, তেমন খাটাখাটুনির কাজ করতে পারে না বলে তাকে এখানে চালান দেওয়া হয়েছে।

চৌকির ওপর শুয়ে চিঠিখানা মেলে ধরলো চোখের সামনে। সাদা কাগজে সোজা-সোজা হরফে কালো কালি দিয়ে লেখা আছে কয়েকটা কথা। ভদ্রলোকের হাতের লেখা ভালো নয়, তবে ভালো করে লেখবার যত্নটা সুস্পষ্ট। কে জানে, ক'বার কাগজ নষ্ট করে তবে এই চিঠিখানার এ-রকম চেহারা দাঁড়িয়েছে।

বিয়ে? অরুণা বিয়ে করবে? বিয়ের বয়স আর তার আছে কি এখনও? আছে, নিশ্চয় আছে। না থাকলে কেউ উপযাচক হয়ে প্রস্তাব করতে যাবে কেন? কিন্তু বিয়ে করে স্বাধীনতা খুইয়ে সংসারে বধূ হয়ে প্রবেশ করবার মতো নমনীয়তা তার নেই। এতদিনের মুক্ত-জীবন হারিয়ে অপরের হুকুম-বরদারী করতে যদি মন সায় না দেয়?—এমনি কতো কথাই মনে হয় অরুণার, দুপুরের মোহময় নীরবতায় সে আবারও স্বপ্নাতুর হয়ে ওঠে। আজ যে তাকে আহ্বান করলো, তার কাছে যাওয়ার যে আনন্দ, সে-ও সামান্য নয়। তার ত্রিশ বছরের জীবনে মধুকর আনাগোনা করেছে অনেক; কিন্তু প্রজাপতি এ-পথ দিয়ে চলতে ভুলে গিয়েছিলো। আজ বুঝি অসময়ে মনে পড়েছে—

ভদ্রলোকের লেখার ধরনধারণ দেখে অরুণার খুব ভালো লাগে—মন্দ নয়, এ-রকম সরল, স্পষ্ট মানুষকে সহজে চেনা যায়। বেশ লিখেছেন ভদ্রলোক: 'আমার বয়স ছল্লিশের ওপর, অবস্থা সাধারণ, কেরানী। বর্তমানে কিছুদিন গৃহিণীবিহীন জীবন যাপন করছি—আপনি যদি আসেন তো কৃতার্থ হবো। আমি নিজেই প্রস্তাব করছি বলে মনে কিছু করবেন না। এ বয়সে দ্বিতীয়পক্ষের জন্যে ঘটকালি করতে কাকে ডাকি বলুন তো। আমার মনে হয়, আপনার নিজের মতামত সম্বন্ধেও সরাসরি আপনি নিজেই জানাবেন। আপনার সঙ্গে একটু-আধটু আলাপ আছে, তবে তা দিয়ে পরিচয় দাবি করবার মতো স্পর্ধা নেই। আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই—আপনিও যে অমত করতে পারবেন না, সেই আশা করবো। আপনাকে আমার একান্ত প্রয়োজন। যদি বলেন—আমি ভালোবাসি কি না? তার উত্তর যাই দিই, বলতে পারেন—ফাঁকা কথা। যাকগে, ভালোবাসি কি না, সে-কথা পরে হবে—যদি না-ও ভালোবাসি—তবু কি

বিয়ে হতে পারে না? এমনি, ধরুন পরস্পরকে অবলম্বন করে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া—মন্দ কি? কেউ ভালোবাসা দাবি করবো না—অতটা ছেলেমানুষীর বয়স অনেকদিন পার হয়ে আসা গেছে। তার চেয়ে শুধুই Companion হয়ে থাকা!

'যদি রাজী থাকেন তবে আগামীকাল স্কুলে যাবার সময়ে লাল পেড়ে শাড়ি পরে বেরুবেন, তারপর বিকেল চারটের পর পাঁচটা পর্যন্ত যে-কোনো সময়ে বেরুবেন, বড়ো রাস্তার কাছাকাছিই আমি অপেক্ষা করবো। বাকী কথা সাক্ষাতে হবে—পাত্র ও কনে দেখাটাও তখনই সেরে নিতে পারবে উভয়পক্ষ। ইতি—

নাম ঠিকানা দিলাম না।'

অরুণার কাছে চিঠিখানা সমস্যা হয়ে উঠেছে। যা লেখা আছে এতে, তার চেয়ে একটি অক্ষরও জানবার উপায় নেই চিঠিখানা থেকে। এর বেশি কোনো-কিছু এই সাদা-কালো-রেখা মাখানো কাগজখানা দিতে প্রস্তুত নয়। হঠাৎ অরুণার মনে হয়, কি কঠিন, নির্মম সেই লোকটা। আরও দুটো কথা যদি লিখতেন তিনি, তো, বেশ হতো। যদি লিখতেন, তিনি কোথায় দেখেছেন অরুণাকে, লিখতেন কবে দেখা হয়েছে, কি কথা হয়েছে—তাহলে সে একবার ভেবে দেখবার চেষ্টা করতো, খুঁজে বার করতে পারতো।

বিয়ে করতে গেলে অসুবিধে অনেক রয়েছে। কিন্তু এমনভাবে নিজের দায়িত্ব বহন করে বেড়ানো আর ভালো লাগে না।—অনাগত ভবিষ্যত-দিনের একটি ছবি ও মনে মনে আঁকে। অত্যন্ত সাধারণ হয়েও সেই দিনগুলো অনায়াসে আসাধারণ হতে পারবে—যেমন, একদিন অরুণার খুব জ্বর হয়েছে, সকালবেলায় সে ওষুধপত্র এনে দিলো, কিন্তু আপিস যাবার সময় বয়ে গেল, সে জামা-কাপড় বদলালো না, বসে রইলো অরুণার পাশে। একান্ত, এমনই একান্ত আপনার-জন তার জীবনে কেউ হবে। একেবারে আপনার নিজস্ব একজন কেউ আছে, এ-কথা ভাবতেও যেন ভালো লাগে। সে আপনার—একান্ত আপনার। বার-বার অরুণা চিঠিখানা নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে, কখনও মনে হয়, বুঝি এ কোনো

স্পর্শসুখ, এ কোনো মধুর অনুভূতি তার দেহ-মনে সঞ্চারিত হলো—একবার নিজের কাছে লজ্জিত হয়ে হাতের মুঠোটা আলগা করে চিঠিখানা ছেড়ে দিতে যায়। আবার সজাগ হয়ে সামনের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি মেলে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে আপনার কাছ থেকে দূরে। চিঠিখানা আলগোছে মুখের ওপর রেখে কখনও চোখ বোজে সে। এতদিনের ভেসে বেড়ানোর পালা শেষে কোন্ কূলে এসে সাঙ্গ হলো! এ কোন্ অজানা আশ্রয়। হোক অজানা, তবু তো আশ্রয়।—আরও কতো কথাই ও ভাবে।

সেই রাত্রে বিছানায় শুয়েও অরুণার ঘুম আসে না। শোবার সময় আলো নিভিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু এ-কথা সে-কথা ভাবতে-ভাবতে ওর মনে হয় যেন অন্ধকারে কে তার পাশে এসে বসেছে। অন্ধকারে ছায়ামূর্তিটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তবু মনে হচ্ছে যেন সেই লোকটি। আজ সকালে যে তাকে চিঠি দিয়েছিলো, অর্থাৎ—? অর্থাৎ অরুণার স্বামী। 'স্বামী' কথাটা মনে হতেই অরুণা চমকে উঠে বিছানা থেকে ছিটকে সোজা মেঝেতে এসে দাঁড়ায়। তারপর খুচ করে সুইচটা টিপে দিতেই ঘরময় আলো ছড়িয়ে পড়ে। আলো জ্বেলে নিশ্চিন্ত হয়ে অরুণা আবার বিছানায় শুয়ে পড়লো। সারাদিন একটা চিন্তা মনের পেছু-পেছু এ-রকম ধাওয়া করে চললে ভালো লাগে না। ভারী বিশ্রী ব্যাপার—এমন করে আর পারা যায় না—অরুণা ভাবে। বিবাহিত জীবনের প্রতি কোনো মোহ তার নেই। থাকলেও সে এ-ধরনের বিবাহিত জীবন কামনা করে না।

হঠাৎ তার সমস্ত অন্তর সেই লোকটির প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। জানা নেই শোনা নেই—এ-রকমভাবে চিঠি দেওয়া কেন? অরুণা আপন মনেই বলে ওঠে—বেহায়াপনা, হ্যাংলামো। আর একটা সংশয় তার মনে জাগে—এই ধরনের লোককে প্রশ্রয় দিলে মাথায় ওঠে এরা। না, কিছুতেই সে এই লোকটার স্পর্ধাকে বরদাস্ত করবে না। কেন? বিয়ে না করে সে কি এমন খারাপ আছে? কিসের অভাব? আর এখন এই বয়সে অচেনা একটা লোকের ঘরে গিয়ে বাঁধা পড়ে জীবনের সমস্ত আশা-ভরসাকে বিসর্জন দেওয়ার জন্যেই বা কেন তার এতো মাথা ব্যথা! আর বিয়েই যদি করতে

হয়, তবে একটু দেখে-শুনে ভালো-গোছের পাত্রকেই বরণ করা ভালো। এই ধরনের গায়ে-পড়া মানুষকে স্বামিত্বের আসনে বসাতে গেলে নিজেরই অমর্যাদা করা হবে। আর পাঁচজনেই বা কি বলবে।

হঠাৎ এক সময়ে আবার অরুণার খেয়াল হয়, সেই লোকটার কথাই ভাবছে ও। এবারে জোর করে নিজের বুড়ো আঙুলটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে নিজেকে শাস্তি দেয় ও। তারপর এক সময়ে আলো জ্বেলে রেখেই ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালবেলায় উঠেই প্রথম কথা মনে হলো ওর—সেই চিঠি। চিঠিখানা বালিশের নিচে ছিলো। না, আর নয়—চিঠিখানা ছিঁড়ে না ফেললে ওই লোকটার চিন্তা তার মন থেকে যাবে না। এই ভেবে অরুণা বিরক্ত হয়ে চিঠিখানা বার করলো। ছিঁড়ে ফেলবার আগে মনে হলো, আর একবার পড়ে দেখলে হতো।

তারপর থেকে অরুণার সারা মন বিরক্ত হয়ে ওঠে পৃথিবীর তাবৎ ব্যাপারের ওপর। ও ঠিক করে ফেললো, আজ কালাপেড়ে শাড়ি পরে বেরুবে? এ-রকম অশিষ্ট লোকের অপমানিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেন, কেনই-বা অরুণা একজন অপরিচিত লোকের কথায় নিজেকে চালাবে? জানা নেই শোনা নেই—না না, তা হতেই পারে না। সে বাক্স থেকে কালাপেড়ে শাড়ি বার করতে গিয়ে দেখলো—সেটা ধুতে গেছে। সবেগে বিমলাদির ঘরে গিয়ে নিয়ে এলো কালাপেড়ে শাড়ি। আজ যেন ইচ্ছে করেই বেশি করে স্নো-পাউডার মাখলো, রুজ—যা কোনদিন ব্যবহার করেনি এর আগে, তাও লাগালো, ঠোঁটে রঞ্জনী রং একটু দিলো। মোটের ওপর সে বেশ একটু সাজলো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দ্বিধা-ভরে ঠোঁটের উগ্র রংটা একটু হাল্‌কা করে দেবে কিনা ভাবলো—পাছে স্কুলের অন্য সবাই আর কিছু মনে করে, এই আশঙ্কা। তা করুকগে, অপমান যাকে করা হবে, তাকে রীতিমতো জ্বালিয়ে দেওয়াই ভালো। অরুণাকে আজ বেশ দেখাচ্ছে—তার নিজেরই মনে হয়।

শাড়িটার পাট ভাঙতে ভাঙতে গুন-গুন করে একটা গানের কলি ভাঁজতে থাকে ও—'রোদন ভরা এ বসন্ত কখনো আসেনি বুঝি আগে—'

হঠাৎ মাঝ-পথে থেমে গিয়ে অরুণার একটা কথা মনে হলো।—সেই লোকটি তো ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে ফিরে যাবে, তার নয় খুব দুঃখ হলো—কিন্তু অরুণা তো জানতে পারবে না, কোন্ দরদী মন তার শাড়ির আঁচল আশ্রয় করবার জন্যে ব্যগ্র-ব্যাকুল হয়ে লিপিদূত পাঠিয়েছিলো? যে তার মনকে একটি দিনের দীর্ঘ মুহূর্তগুলো অধিকার করেছিলো তাকে যে জানা হলো না।

একটা অদম্য কৌতূহলে অরুণার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। শুধু তাকে দেখবার জন্যেই ও লালপেড়ে শাড়ি পরবে। তখনই সে কালাপেড়ে শাড়িটা আলনায় গুছিয়ে তুলে রেখে লালপেড়ে শাড়িখানাই পরতে লাগলো। তাকে চিনতেই হবে—। দেখতে দোষ কি, মানুষই তো।

লালপেড়ে শাড়িখানায় যেন জগতের সমস্ত লজ্জা পুঞ্জীভূত হয়ে আশ্রয় করেছে। শাড়িখানা পরে অরুণার চলতে আজ পা যেন জড়িয়ে আসছে। তার জীবনের সঞ্চিত ব্রীড়ারাশি পথের বাতাসে-বাতাসে ছড়িয়ে রয়েছে। স্কুলে যাবার সময়ে আজ আর সে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে চলতে পারে না, আশেপাশে তাকাতে সঙ্কোচ বোধ হয়। এই পথ, যা তার নিত্যদিনের সাথী ছিলো, তা যেন কেমন দূরত্বময় হয়ে উঠেছে। এর কোথায় যেন কী হয়ে গেছে, তার পায়ে-পায়ে লজ্জার কুণ্ঠা জড়িয়ে ধরছে, পথ চলার গতিকে ব্যাহত করছে। চলতে-চলতে অরুণার মনে হয় স্কুল থেকে ফেরবার সময় কী হবে? তখন তো—।

যে মানুষটির কল্পনায়ও সে বিরক্ত হয়ে উঠেছে, আজ সকাল থেকে প্রতি মুহূর্তে সেই অজানা লোকটি তাকে এতো সঙ্কুচিত করে তুললো! অরুণার মনে হয়, বুঝি সারা রাস্তার প্রত্যেকটি পথিক তার দিকে তাকিয়ে আছে। ছি ছি, এমনভাবে প্রতিনিয়ত সঙ্কোচের ডালি ভাগ্যের ললাটে এঁকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে সে পারবে না, কিছুতেই পারবে না।

স্কুল থেকে ফেরার পথে নিশ্চয় সেই লোকটির দেখা পাওয়া যাবে। তখন তাকে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দেবে অরুণা—ভদ্রতা, শিষ্টাচার, ভব্যতা—

এগুলো যে গল্প-কথা নয়, তা সে বেশ কড়া করেই জানিয়ে দেবে লোকটাকে।

স্কুলের গেটের সামনে এসে পড়ে অরুণার মন আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, এমন সাজগোজ করে কোনদিন সে স্কুলে আসেনি। শিক্ষয়িত্রীর ষোলোআনা আদর্শ তার কাছে অক্ষুণ্ণ ছিলো, কিন্তু আজ—

আজ আর সময় যেন কাটতে চায় না। এক-এক ঘণ্টা যেন যুগ-যুগান্তর পার করে দিচ্ছে।

এমনি করে তিনটে বাজলো। এক ফাঁকে অরুণা বাথরুমে গিয়ে ঠিকঠাক হয়ে নিলো। মুখের ওপর ঘামের তৈলাক্ত ভাবটুকু যেন কিছুতেই কাটতে চায় না, কপালে কুঙ্কুমের টিপটা যেন ম্লান হয়ে গেছে। অরুণার চেহারায় অপরাহ্ণের ছায়া পড়েছে।

স্কুল থেকে বেরিয়ে যতই বড়ো-রাস্তার কাছাকাছি সে এসে পড়ে, ততই যেন নিজের ওপর বিরক্তি শ্রাবণের ঘনকালো মেঘরাশির মতো পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে থাকে। একটা কথা তাকে পীড়া দিচ্ছে—তার জীবনে কি অপরাহ্ণের ছায়া পড়েছে সত্যি? তাই যদি সত্যি হয়, তবে ওই অশিষ্ট লোকটাকে আজ অপমান করে তাড়িয়ে দিয়ে কোন্ ভরসায় অরুণা বসে থাকবে?

না, তবু, তবু সে বরদাস্ত করতে পারে না এই স্পর্ধিত লোকটার এই ধরনের আচরণ। লোকটা যেন জোর করে অরুণাকে জানিয়ে দিতে চায় যে, তাকে পাওয়া সহজ।—তবে কি সত্যিই তার মূল্য কমে গেছে? অরুণা নিজেকে বিচার করতে চেষ্টা করে। তার মনে সংশয় জাগে।

এতবড়ো আঘাত দিতে পারে যে মানুষ, তার সাহসের তারিফ করতে হয় বই কি।

না। অরুণা আর পারে না অহর্নিশ এই দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাতে সংক্ষুব্ধ হয়ে ছুটে বেড়াতে। এক-একটা কথা যে তাকে এমন পেয়ে বসছে, যেন পাগল করে দেবে। এই যে কাল থেকে নিজের বিরুদ্ধে বিবিধ অস্ত্র প্রয়োগ করছে অরুণা, তার জন্যে সত্যিই কি ওই লোকটি দায়ী? সে এমনিই বিয়ের প্রস্তাব করে চিঠি লিখছে হয়তো। হয়তো কোনো সাত-পাঁচ না ভেবেই লিখে ফেলেছে। অরুণাই তো তার নিজের মনের ঘাত-প্রতিঘাতে জিনিসটা এতো ঘোরালো

করে তুলেছে। এইসব ভেবে ওর বিরূপতা যেন একটু নরম হয়ে আসে।

সত্যিই যদি কেউ এই অপরাহ্নের অবসন্ন মুহূর্তে আহ্বান করে—দীর্ঘকালের সঙ্গীবিহীন জীবনযাত্রার পর তা কি কম লোভনীয়!

অরুণা ভাবে, হোক না সে লোকটা বোকা-বোকা, হোক না সে কেরানী, না-হয় হলই-বা একান্ত বাস্তববাদী প্রৌঢ় অত্যন্ত সাধারণ মানুষ—তবু তো অবলম্বন। যদিও অরুণা তাকে জানে না, চেনে না, সে সম্পূর্ণ অপরিচিত—তা হোক, এই একলা চলার অবসান যেখানে হবে সেই আশ্রয়টুকুই জীবনের অপরাহ্নে অরুণার কাছে পরম মূল্যবান। সে ভালোবাসা চায় না, আশা, স্বপ্ন, সব কিছুই সার্থক হবে—এ তুর্লভতার প্রতি লোভী নয় তার মন—শুধু অবসান হোক একলা চলার পালা। তাতে অশান্তি আসুক, দুর্ভাগ্য ভেঙে পড়ুক তার মাথায়, দারিদ্র্যে-দৈন্যে তার জীবন ছারখার হয়ে সার্থক হয়ে উঠুক। তবু এই একলা চলার অবসান হোক। সে আর পারে না নিজেকে বহন করতে।

ছাপ

সন্তোষকুমার ঘোষ

টেলিফোনের রিসিভারটা সশব্দে রেখে দিয়েই ডাক্তার বললেন, 'আমাকে এখনি বেরুতে হবে।'

বিস্মিত হয়ে সবাই বললাম, 'সে কি!'

বিস্মিত হবারই কথা। যুদ্ধশেষে ছোটোনাগপুরের ছোটো এই শহরটীতে জীবনযাত্রার কোনো বৈচিত্র্য ছিলো না। সৈন্যরা একে-একে ছাউনি তুলছে। কনট্রাক্ট বন্ধ। কাজের মধ্যে সন্ধ্যার পর ক্লাবে এসে জোটা, সিগারেটের ধোঁয়ায় কুণ্ডলী পাকানো! নতুন-নতুন ফরমূলার কক্‌টেল তৈরি, উঁচু ষ্টেকে ব্রিজ খেলা।

ডাক্তার ছিলেন আমার পার্টনার। বললাম, 'অন্ততঃ 'রাবার'টা ক্লোজ করি আসুন।'

'—মাথা খারাপ আপনার। এখনি যেতে হবে। মার্ডার কেস।'

'—মার্ডার!' শীতের দিনে ক্লাবের নিরাপদ আরামে বসে থেকেও উত্তেজনা বোধ করলাম, 'কোথায়?'

কক্‌টেলের অবশেষটুকু নিঃশেষ করতে-করতে ডাক্তার যে পাড়ার নাম করলেন, সেটা শহরের উপকণ্ঠে কুখ্যাত ফিরিঙ্গি মহল।

ব্যাগটা গুছিয়ে নিতে-নিতে ডাক্তার বললেন, 'চলুন না, আপনিও। বেশ ইনটারেষ্টিং হবে।'

আপত্তি ছিলো না; ক্লাবে বসে কুঁড়েমির চেয়ে এ এ্যাডভেঞ্চার অনেক ভালো। বললাম, 'চলুন।'

নির্দিষ্ট বাড়ি খুঁজতে বিশেষ অসুবিধা হলো না। ইতিমধ্যেই বাইরে ছোটোখাটো ভীড় জমে গিয়েছিলো। পুলিশও এসেছে দেখলাম।

ছাপ

ঘরের সমস্ত অসবাবপত্র তচনচ। ঘরের কোণে ডালাভাঙা একটা বাক্স। আর মাঝখানে একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে রক্তস্রোতের মধ্যে শায়িত। ছিন্ন নৈশবাস আততায়ীর সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তির সাক্ষী। প্রায় নগ্ন দেহের নানাস্থানে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন।

ডাক্তারের করবার কিছুই ছিলো না, ইতিপূর্বেই হয়ে গিয়েছিলো। তবু প্রাথমিক খানিকটা পরীক্ষা করতে হলো। দু'মিনিট নাড়াচাড়া করে ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন। পুলিশ ইন্সপেক্টরকে একান্তে ডেকে নিয়ে কি একটু আলাপ করলেন; বোধহয় মৃতদেহ মর্গে নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে। সমস্ত ঘরে বিশৃঙ্খল অবস্থা, বোঝা যায়, অর্থলোভই এই হত্যাকাণ্ডের মূল।

ডাক্তারের সঙ্গে বেরিয়ে এসে যখন গাড়িতে উঠে বসলাম, তখন প্রায় বারোটা। শীতের রাত্রি; ঝাউগাছের মাথায় কুয়াশা নেমে এসেছে। ফিরিঙ্গি পাড়ায় কলরব তখনো থামেনি। এখনো বাতায়নপথে তীব্র আলোকচ্ছটার সঙ্গে প্রমত্ত সুরলহরী ভেসে আসছে; দুমদাম্ দুপদাপ্ শব্দ, যৌথ নৃত্যের ইঙ্গিত। মাঝে-মাঝে ঘুম ভেঙে-যাওয়া কুকুরের বিরক্তিকর চিৎকার।

ডাক্তার একমনে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। একাগ্র দৃষ্টি সম্মুখের দিকে নিবদ্ধ তাঁর। পীচের পথে অস্পষ্ট আলো। ডাক্তারকে একটু অন্যমনস্ক মনে হলো।

ভেবেছিলাম, আমাকে বাসায় নামিয়ে দিয়ে ডাক্তার চলে যাবেন। কিন্তু ক্লাবের রাস্তায় ফের গাড়ি ঘুরতেই বিস্মিত হয়ে জিগ্যেস করলাম, 'আবার ক্লাবে?'

'—ক্ষতি কী?' ডাক্তার বললেন, 'চলুন না। কাজ তো নেই। আমার মনটা একটু চঞ্চল হয়েছে।'

একটু অবাক লাগলো। ডাক্তার মানুষ, এ-রকম ঘটনা তো কতই দেখছেন। ওঁদের মনও ধীরে-ধীরে অভ্যস্ত হয়ে যায়, আমার এই রকম ধারণা ছিলো। তাছাড়া এই হত্যাকাণ্ডেও বিস্ময়কর কিছু নেই। এই ধরনের স্ত্রীলোকদের জীবনের এমনতরো বীভৎস উপসংহারের অসংখ্য ঘটনা জানি।

ক্লাবে এসে ডাক্তার নিপুণহাতে আবার কয়েকটি উত্তেজক পানীয়ের উপাদেয় সংমিশ্রণ ঘটালেন। তারপর সিগারেটের কুণ্ডলীগুলিকে খোলা জানলা দিয়ে একের পর এক পাঠাতে লাগলেন বাইরে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সেগুলি হাওয়ায় বিপর্যস্ত হলো, সেদিকে নিমেষহীন চেয়ে রইলেন। হাতের সিগারেটের যদিও আধখানা বাকি ছিলো, সেটি ফেলে দিয়ে উদ্দেশ্যহীন-ভাবেই আর একটি ধরালেন। তারপর নিরাসক্তভাবে পানপাত্রে চুমুক দিয়ে বললেন, 'মার্থা জনষ্টোনকে আমি চিনতাম।'

কী করে চিনলেন, সে প্রশ্ন আর করলাম না। চিকিৎসাসূত্রে ডাক্তারদের এমন অসংখ্য মানুষকে চেনবার সুযোগ হয়।

'—মার্থা জনষ্টোন কে?'

'—আজ যে মেয়েটি খুন হলো।'

ডাক্তার বললেন, 'আজ নয়, এখানেও নয়। ওকে ছোটোবেলা থেকেই চিনি। ওর বয়েস যখন পোনেরো-ষোলো হবে, তখন আমার তেরো-চোদ্দ।'

এইটুকু বলে ডাক্তার আবার পানপাত্র তুলে নিয়ে আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন।

'—ভয় নেই। শীতের রাত্রে আপনাকে একলা পেয়ে পুরোনো একটা প্রেমের গল্প নিজের বলে চালিয়ে দেবো, আমি সে-রকম লোক নই।'

অস্বীকার করে লাভ নেই, আমার অস্বস্তি লাগছিলো। সমস্ত ক্লাবটাতে আমরা দু'জন ছাড়া কেউ নেই। দরজার পাশে ক্লাবের চাকর লছমন ঝিমোচ্ছে; আমরা উঠলেই আলো নিবিয়ে দরজা বন্ধ করে শুতে যাবে।

ডাক্তার বললেন, 'আমি ছোটোবেলা যেখানে মানুষ, তার পাশেই একটা মিশনারি কম্পাউণ্ড ছিলো। আপনাদের এ-কথা অনেকবার অনেক প্রসঙ্গে বলেছি। এখনো মনে আছে, রবিবার হলেই আমাদের দল বেঁধে সাণ্ডে স্কুলে যাওয়া। খ্রীষ্ট মাহাত্ম্য শুনতে ততটা নয়, স্কুলের শেষে লজেন্স-বিস্কুট প্রসাদ বিতরণের মাহাত্ম্যে যতটা। মেম-সাহেব নিজ-হাতে সেগুলো বিতরণ করতেন।

'একবার এক নতুন পাদ্রী সেখানে বদলি হয়ে এলেন। নাম উইলিয়ম জনষ্টোন। এক ছেলে দুই মেয়ে—পীটর, মেরি, মার্থা। আজ এই শহরের বিশ্রী একটা পাড়ায় যে গণিকার জীবনের যবনিকা পড়লো, সে যে এক ধর্মভীরু খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকের মেয়ে, এ-কথা শুনে চমকে যাবেন না। মার্থা যখন এলো, তখন ও সবে ফুটছে। নারীর রূপে আকৃষ্ট হবার বয়েস সেটা আমার নয়। তবু অবচেতন আকর্ষণ যে একটা অনুভব করতাম, সেটা অস্বীকার করে লাভ নেই। মনে আছে, সাণ্ডে স্কুলের পর যখন প্রার্থনা হতো, তখন মাঝে-মাঝে সবার অলক্ষিতে চোখ মেলে মার্থার দিকে চুরি করে চেয়েছি। নীল একটা ফিতে দিয়ে বাঁধা ওর ঢেউ-তোলা সোনালী চুল, রেশমি ফ্রকের নিচে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের আভাস, এমন কি জানু অবধি নাতিস্থূল, নাতিকৃশ পা দু'টির দিকে এক-দৃষ্টে চেয়ে আমার সারা শরীরে শিহরণ বয়ে গেছে।'

'—তখন আপনার বয়েস তো মোটে তেরো-চোদ্দ?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'—হ্যাঁ।' আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ডাক্তার বললেন, 'বয়েসের তুলনায় আমি কিছু বেশিই পাকা ছিলাম।'

বাইরে তখন দস্তুরমতো হিম পড়ছিলো। ডাক্তার উঠে গিয়ে কবাট-গুলি টেনে দিয়ে এলেন। তারপর ফের বলতে শুরু করলেন—'হ্যাঁ, মিছিমিছি ভূমিকা বাড়াবো না। ডাক্তারের মুখে কবিত্ব মানায়ও না। আমি মার্থার প্রেমে পড়লাম। কিন্তু মুস্কিল হলো এই, একে বয়েস অত্যন্ত অল্প, তাতে আবার ইংরেজী ভাষাটা মুখে ততটা সহজে জোগাতো না। মার্থার মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে আস্তে-আস্তে চলে এসেছি, এমন ব্যাপার অনেকবারই ঘটেছে।

'হয়তো মুখের ভাষা লাগতো না, চোখের ভাষাতে এ-সব ক্ষেত্রে অনেক সময় কাজ হয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই দেখি মার্থা আর একজনের প্রেমে পড়ে গেল।

'সেবার গরমের ছুটিতে আমার পিসতুতো ভাই কলকাতা থেকে এখানে বেড়াতে এলেন। তিনি তখন কলেজে কোন্ ইয়ারে পড়তেন

ঠিক মনে নেই। কেন না, একই ইয়ারে কয়েক বছর ধরে ন যথৌ ন-তস্থৌ হয়ে থাকার অভ্যেস তাঁর ছিলো। তা হলেও ভদ্রলোকের কতকগুলো গুণ ছিলো। তিনি ভালো গান গাইতে এবং বাঁশী বাজাতে পারতেন, দেখতে সুপুরুষ ছিলেন ; ইংরেজী ভাষার কথা-রূপ সম্পর্কে তাঁর বিলক্ষণ ধারণা ছিলো। এক কথায় তিনি স্মার্ট তো ছিলেনই, উপরন্তু মেয়েরা যা চায়, তাও ছিলেন।

'একদিন আমাদের সঙ্গে পাদ্রী সাহেবের বাড়ি বেড়াতে গিয় মার্থাকে দেখে এলেন। দ্বিতীয় দিন একাই গেলেন। আগেই বলেছি, জনপ্রিয় হবার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর ছিলো। তৃতীয় দিন বাসায় এসে বললেন, সদলে পিক্‌নিক্ করবার একটা আয়োজন তিনি করে এসেছেন।

'মাঝখানে রবিবার ছিলো। তিনি প্রার্থনা সভাতেও গেলেন। প্রার্থনা চলেছে, আমিও যথারীতি চোখ মেলে মার্থার দিকে মাঝে-মাঝে চেয়ে দেখছি। একবার দেখি মার্থা ঠিক আমার পাশে উপবিষ্ট শ্যামলদার দিকে তাকিয়ে আছে। আর শ্যামলদাও যে ঠিক তন্ময় হয়ে প্রার্থনা করছেন না, সেটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার হয়েছে। কেমন বিশ্রী লাগলো। একে 'জেলাসি' বলতে চান, বলুন।

'পিক্‌নিকের দিন শ্যামলদা বাঁশী বাজালেন। হয়তো খুব চমৎকারই হয়েছিলো। কিন্তু আমি তো বাঁশী শুনছিলাম না। আমি দেখছিলাম মার্থাকে, সে তখন থেকে অপলক-চোখে শ্যামলদার দিকে চেয়ে রয়েছে। মার্থার চোখে মুগ্ধ সর্পিনীর দৃষ্টি।

'এর পরের ঘটনাগুলো অত্যন্ত দ্রুত ঘটে গেল। শ্যামলদা আর মার্থাকে প্রায়ই একসঙ্গে দেখা যেতে লাগলো। দু'একজনের কাছে ধরাও পড়ে গেল ওরা। কানাকানি হতে লাগলো—পাদ্রী সাহেবের মেয়ে অমুক একটা বাঙালী ছেলের প্রেমে পড়েছে।

'পাদ্রী সাহেব প্রথমটা খেয়াল করেননি ; খেয়াল হতে শ্যামলদাকে ডেকে পাঠালেন। ডেকে রুদ্ধকক্ষে তিনি যে হিতোপদেশমূলক বক্তৃতা দিলেন তার সারমর্ম এই : যুবক, আমার কোনো বর্ণ-বিচার নেই। কেবল তুমি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হও। কেননা, যীশুকে যে ত্রাণকর্তা বলে মেনেছে,

একমাত্র তার হাতেই আমার কন্যা মার্থাকে সম্প্রদান করতে পারি।

'শ্যামলদা জনষ্টোনকে কি প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন জানি না। পরদিন সকালে উঠে তাঁকে আর আমাদের বাসায় দেখা গেল না।

'মার্থাকেও না। এর অর্থ সুস্পষ্ট। পুলিশে খবর দিলে হয়তো একটা কিনারা হতো ; কিন্তু কেলেঙ্কারির ভয় সাহেবদেরও থাকে। পাদ্রী সাহেব এ নিয়ে আর ঘাঁটিঘাঁটি করতে চাইলেন না। হয়তো নিয়ত নিয়মিত তিনি ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীষ্টের ছবির দিকে চেয়ে প্রার্থনা করেছেন, তাঁর বিপথ-গামিনী মেয়ে যদি কখনও ফিরে আসে, যীশু যেন তাঁর পাপের ভার গ্রহণ করেন।

'কিন্তু মার্থা আর ফিরে আসেনি। কিছুদিন বাদে জনষ্টোন সাহেবও বদলি হয়ে চলে গেলেন। আস্তে-আস্তে এই ঘটনার স্মৃতিও আমার মনে ক্ষীণ হতে-হতে প্রায় মুছে গেল।

'প্রায় তিন বছর পরে—আমি তখন ম্যাট্রিক পাশ করেছি—খড়্গপুর ষ্টেশনে মার্থাকে দেখলাম। মার্থাই তো। প্রথমটা সংশয় ছিলো, বিস্ময় ছিলো, অকস্মাৎ প্রিয়জনকে দেখার আনন্দ ছিলো। মার্থা ছাড়া আর কার অমন সোনালী চুল, নীল চোখে সুদূর, স্নিগ্ধ দৃষ্টি, কবিতার যতির মতো নিয়মিত চরণপাত?

'আমাকে দেখে মার্থা লজ্জিত হলো কিনা জানি না, মুখে খুব আদর দেখালো। নিভৃতে আলাপ করবার জন্যে চায়ের দোকানে গিয়ে বসলাম। ....হ্যাঁ, মার্থা শ্যামলদার সঙ্গেই আছে। এখানকার রেলওয়ে ওয়ার্কশপে কাজ করে শ্যামলদা। সুখী হয়েছে কিনা, সে-কথা মার্থাকে আর জিগ্যেস করিনি। ওর উচ্ছ্বসিত হাসি, প্রাণময় কথা থেকেই বোঝা গেল সেটা।

'ঠিকানা মার্থার কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলাম! খুঁজে-খুঁজে ওদের কোয়ার্টারে যখন হাজির হলাম, তখন সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে! মার্থাই দরজা খুলে দিলো। শুনলাম, শ্যামলদা তখনো ওয়ার্কশপ থেকে ফেরেনি। অথচ পাঁচটায় সিফট্ ছুটী। বোধহয় ওভারটাইম খাট্‌ছে, মার্থা বললো।

'চায়ের সরঞ্জাম ঠিক করতে করতে মার্থা বললো, তোমার দাদার জন্যেও জল নিই, কি বলো? উনি এর ভেতর ঠিক পৌঁছে যাবেন।

'চা ঢালছে আর উৎসুক কানে রাস্তার প্রতিটি পদশব্দ শুনছে, মার্থার

সেই চেহারা আমার স্পষ্ট মনে আছে। শ্যামলদা কিন্তু এলো না। আমাদের দু'জনকে তিন পেয়ালা করে চা খেতে হলো।

'জানলার পাশে বসে মার্থা উলের কি একটা কাজ নিয়ে বসলো; আমিও কাছাকাছি বসে গল্প চালাতে লাগলাম। না, ছেলেপুলে ওদের হয়নি, মার্থা আরক্ত হয়ে বললো—তোমার শ্যামলদা ও-সমস্ত ভালোবাসেন না।

'মিনিটের পর মিনিট বসে মার্থার কাছে ওর যৌথ জীবনযাত্রার বিবরণ শুনলাম। মার্থা কখনো উচ্ছ্বসিত, কখনো ব্রীড়াময়ী, কখনো কুণ্ঠিত। পলকে-পলকে মুখের রং বদ্‌লাচ্ছে, মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলাম। এ হচ্ছে নারীর সেই কল্যাণময়ী রূপ, যা নিমেষহীন চোখে অনন্তকাল ধরে দেখেও বলা যায়, নয়ন না তিরপিত ভেল।

'মোটের ওপর বাপ-মায়ের আশ্রয় ছেড়ে যে মোহে মার্থা একদিন অনিশ্চিত পথে পা বাড়িয়েছিলো, আজ অবধি তা একটুও ম্লান হয়নি। নতুন নীড়টুকু ঘিরে ওর অনেক স্বপ্ন, অনেক কামনা, অনেক ভরসা।

'বহুক্ষণ কেটে যেতেও শ্যামলদা যখন এলেন না, মার্থা চঞ্চল হয়ে উঠলো। হাতের উলের কাজটাকে ফেলে একবার বললো, চলো, তোমাকে খেতে দিই; একবার বললো, আর একটু না-হয় বসো, বেশ তো গল্প হচ্ছে। তোমার দাদা এখনি আসবেন।

'দাদা এলেন না। আমাদের খাওয়া শেষ হলো, আর এক প্রস্থ গল্প শুরু এবং শেষ হলো; রাস্তার শেষ পদশব্দটিও যখন মিলিয়ে গেল, নির্দিষ্ট বিছানায় শুয়ে-শুয়ে তখনো দেখলাম, মার্থা জানলার পাশে দাঁড়িয়ে পথের নিষ্প্রভ আলোগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে।

'শেষ রাতে মার্থার ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠে তাকাতেই বললো, তোমার দাদা এসেছেন।

'—কোথায়?

'মার্থা কোনো জবাব দিলো না। নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করে দরজার বাইরে এসে দেখি, শরীরের অর্ধেক নর্দমায় কর্দমাক্ত অর্ধেক চৌকাঠের ওপর, কে একজন বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে।

'মার্থা ফিস-ফিস করে বললো, তোমার দাদা। আমি একলা তুলে আনতে পারিনি। তাই তোমাকে ডেকেছি।

'দু'জনে ধরাধরি করে শ্যামলদাকে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। মার্থা কাদা-মাখা পোশাক বদলে, মাথা ধুইয়ে বাতাস করতে লাগলো। শ্যামলদা তখন বিজড়িত স্বরে প্রলাপ বকছেন।

'পরদিন কলকাতায় চলে এলাম। শুনলাম, শ্যামলদার এমন প্রায়ই হয়। মার্থা মাঝে-মাঝে খবর নিতে বলতো। বলতো, ওঁর জন্যে মাঝে-মাঝে কষ্ট হয়। আমার জন্যে কী-না করেছেন। আত্মীয়-স্বজন সব ফেলে এসে এই এখানে কারখানায় চাকরি—

'শ্যামলদার জন্যে মার্থাও যে আত্মীয়-স্বজন সবাইকে ফেলে এসেছে সেই কথাটার উল্লেখ করলাম না।

'কলকাতায় এসে মাঝে-মাঝে মার্থার চিঠি পেতাম—ওঁকে বড়ো বিষণ্ণ মনে হয়; এক-এক সময় উদাস হয়ে কী যেন ভাবেন।

'কিম্বা,—আমি বোধহয় ওকে সুখী করতে পারিনি। আমি যদি বাঙালী ঘরের শান্ত শ্যামল কোনো মেয়ে হতাম!

'শেষে একখানা চিঠি পেলাম। শ্যামলদা কী একটা ট্রেনিং স্কীমে শিক্ষানবিশ হয়ে বিলেত গেছেন! ফিরতে বছর-খানেক লাগবে।

'মার্থা আনন্দেই সম্মতি দিয়েছিলো। জানিয়েছিলো—আমি তাঁর পথে বাধা হতে চাই না। আমি জানি তিনি ফিরে আসবেনই। আমি তাঁর প্রতীক্ষায় থাকবো।'

আর-এক পাত্র পানীয় ঢেলে নিয়ে ডাক্তার তাঁর দ্বিতীয় প্যাকেটের চতুর্থ সিগারেট ধরিয়ে ইসারায় আমাকেও আমন্ত্রণ করলেন। আমি বললাম, 'খাবো না। তারপর কী হলো, বলুন?'

ডাক্তার শুরু করলেন, 'কিন্তু প্রতীক্ষায় থাকা যে কতো শক্ত, সেটা মার্থা দ্বিতীয় মাসের প্রথম সপ্তাহেই অনুভব করলো, যখন সরকারী কোয়ার্টার ছেড়ে ওকে রাস্তায় দাঁড়াতে হলো। পুঁজিও বড়ো বেশি ছিলো না। স্থানীয় খ্রীষ্টানেরা কানাঘুষোয় ওর ইতিহাস কতকটা জানতো। তারা ওকে স্থান দিলো না।

'কলকাতায় এসে মার্থা একটা ছোটো বাসা ভাড়া করলো। আমিও কলেজ-হোষ্টেলের খরচ বাঁচিয়ে ওকে সাধ্যমতো সাহায্য করতাম। কিন্তু ভদ্রভাবে বাঁচতে হলে একটি মেয়ের যা লাগে, তার তুলনায় সে আর কতটুকু! চাকরির চেষ্টা করেও সুবিধে হলো না। শেষে যখন তিন মাসের ঘড়-ভাড়া বাকি, চারধারে দেনা, তখন একদিন মার্থার ঘরের সুমুখে গিয়ে দেখি, তালা ঝুলছে।'

শেষ চুমুক খেয়ে ডাক্তার রুমালে মুখ মুছলেন, 'না, আত্মহত্যা সে করেনি। করলে একটা উৎকৃষ্ট মরালযুক্ত কাহিনী হতো, কিন্তু আজকের ঘটনা ঘটতো না; এ অবস্থায় অভিভাবকহীন মেয়েদের জীবনে নানা-রকম প্রলোভন এসে থাকে। মার্থারও এসেছিলো। প্রথমটা ভ্রূক্ষেপ করেনি। কিন্তু শেষে প্রলোভনই জয়ী হলো। মার্থা দেহের চেয়ে প্রাণকে বেশি মূল্য দিলো। অর্থাৎ দেহ দান করলো।

'এ-রকম ঘটনায় বিস্ময়ের কিছু নেই। মার্থাকে আমি ভালোবাসতাম, শ্রদ্ধা করতাম। তবু ওর এই আচরণ আমি স্বাভাবিক বলেই মেনে নিলাম। কিন্তু যেটা সেদিন বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছিলো, সেটা আজ আপনাকে বলি। অসংখ্য ফিরিঙ্গি অনুরাগী থাকতেও মার্থা যার সঙ্গে নতুন করে ঘর বাঁধলো, সে ওর বাসারই বাড়িওয়ালা, এবং সে বাঙালী।'

বইরে ঝাউগাছে শোঁ-শোঁ হাওয়া বইছে, শুনছিলাম। ক্লাবের বেয়ারাটা ক্লান্ত হয়ে কখন দরজার পাশেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ডাক্তারবাবু থেমে যেতেই সমস্ত ক্লাব-ঘরটিতে দেয়াল ঘড়িটার টিক্-টিক্ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

'—আপনার শ্যামলদা ফিরে এসেছিলেন?' জিগ্যেস করলাম।

ডাক্তার হাত ঘুরিয়ে একটা অনির্বচনীয় ভঙ্গি করলেন: 'এসেছিলেন হয়তো, হয়তো আসেননি। মূল কাহিনীতে শ্যামলদার আর কোনো ভূমিকা নেই। আমি যতদূর জানি, মার্থার সঙ্গে তাঁর আর দেখা হয়নি।

'প্রায় দু'বছর বাদে, আমি তখন ডাক্তারির নিচের ক্লাসে পড়ছি, একদিন সকালে মেস্ থেকে বেরুতে গিয়ে দেখি, মার্থাকে। আগের চেয়ে কিছুটা কৃশ হয়েছে। রূপের সে স্নিগ্ধ দ্যুতি আর নেই। মুহূর্তে ওর সমস্ত

ছাপ

অতীত ইতিহাসটা আমার কাছে অত্যন্ত ঘৃণার্হ বলে প্রতীয়মান হলো, বেশ একটু রুক্ষভাবেই বললাম, কী চাই?

'আমার স্বরের রূঢ়তা ও লক্ষ্য করলো; কিছু বললো না, কিন্তু মাথাটা ঈষৎ আনত হয়ে পড়লো। খানিকটা ইতস্তত: করে বললো—তোমার দাদার কোনো খবর জানো?

'—না। কিন্তু তোমারই বা এখন সে খোঁজে দরকার কী!

'সে-কথার জবাব না দিয়ে উৎসুককণ্ঠে মার্থা বললো—কিন্তু এই সপ্তাহেই ওঁর ফেরবার কথা ছিলো

'আঘাত করবার নেশা তখন আমাকে পেয়ে বসেছে। নীরস গলায় বললাম, হিসেব রাখতে ভোলোনি দেখছি। কিন্তু তোমার কীর্তিকাহিনী শোনবার পর দাদা আর তোমার দিকে ফিরে চাইবেন ভেবেছো?

'ওর সমস্ত মুখ নিমেষে রক্তহীন, বিবর্ণ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ কোনো কথা বললো না। বুঝলাম, মাত্রাটা কিছু বেশি হয়ে গেছে। তাই খানিকটা মমতার সুরে বললাম, খড়্গপুরে খোঁজ নিয়েছিলে?

'মার্থা অস্ফুটস্বরে একবার বললো, না, তারপর চলতে শুরু করে দিলো। আমি ওকে ডেকে ফেরাতে পারতাম। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হতো না। শ্যামলদার ঠিকানা সত্যিই আমার জানা ছিলো না।

'তাছাড়া মার্থা 'না' বললেও আমি হলপ করে বলতে পারি, ও প্রথমেই আমার এখানে আসেনি। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই খড়্গপুর গিয়ে খোঁজ করে এসেছে শ্যামলদার। সেখানে কোনো খবর না পেয়ে শেষ চেষ্টা হিসেবে এসেছে আমার কাছে।'

ঢং ঢং করে ঘড়িতে তিনটে বাজলো। ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর জড়িয়ে আসছে। আলস্যে হাই তুললাম, ডাক্তার সেটা লক্ষ্য করলেন।

বললাম, 'রাত ফুরিয়ে এসেছে।'

'—আমার গল্পও ফুরিয়ে এসেছে' ডাক্তার বললেন, 'দেখি, একটা সিগারেট দিন।'

সিগারেট ধরিয়ে ফের শুরু হলো—'মার্থার কথা হয়তো আমি ভুলেই যেতাম। গিয়েছিলামও। কিন্তু ইতিমধ্যে যুদ্ধ বাধলো, আমি পাশ করলাম

এবং সৈন্যদলে চাকরী নিলাম। রাঁচির কাছাকছি কোনো একটা জায়গায় আমাদের ছাউনি পড়েছিলো, এ-কথা আজকে প্রকাশ করলে ভারত-রক্ষা বিধান অমান্য করা হবে না।

'আমাদের দলে ইংরেজ ছিলো, শিখ ছিলো, পাঠান ছিলো, এমন কি কিছু বাঙালীও ছিলো। আমি ছিলাম দলের ডাক্তার।

'কাজ বেশি নেই ; অনেক দূরে ফ্রন্টে লড়াই হচ্ছে, তার তাপ এতদূর পৌঁছায় না। শিস দিয়ে, ড্রিল করে, তাস খেলে সময় কাটাতে হতো। সৈন্যদের অবশ্য আর একটা বিলাস ছিলো, নারী শিকার।

'সন্ধ্যে হলেই দলে-দলে ভাগ হয়ে ওরা শহরে যেতো। জীপে, ট্রাকে, বাইকে, পদব্রজে। শহরের নিষিদ্ধ পল্লীর প্রান্তে সারে-সারে গাড়ি দাঁড়-করানো আছে, এ-দৃশ্য আপনারাও অনেকবার দেখেছেন।

'একদিন একটা ইংরেজ সৈন্য মাতাল হয়ে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় ফিরে এলো। শুনলাম, গণিকা পল্লীতে বিশ্রী একটা ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলো। আমাকে ওর চিকিৎসা করতে হলো। আঘাতটা বেশি গুরুতর হয়নি, একটু পরেই জ্ঞান ফিরে এলো তার।

'ওর মুখেই ঘটনাটা শুনলাম। একটি ফিরিঙ্গি মেয়ের কাছে ও গিয়েছিলো···মেয়েটি রাজী হয়নি। অনেক টাকা, চকোলেট, বিস্কুট—কোনো কিছুতেই না, কোন প্রলভনেই সে ঘাড় পাতেনি!

'ফ্রেডারিক যতো সাধে, মেয়েটি ততো বলে, না।

'কেন?

'শরীর ভালো না।

'কুৎসিত একটা শপথ উচ্চারণ করে ফ্রেডারিক বললো—অথচ আমি নিশ্চয়ই জানি, ওর শরীর নতুন একটা ইঞ্জিনের মতই মজবুত ছিলো।

'কিন্তু এই প্রত্যাখ্যানেও কিছু আসতো-যেতো না, যদি না সেই মেয়েটি ওরই চোখের সমুখে দ্বিতীয় একজনের কথায় রাজী হয়ে তার সঙ্গে ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিতো। আর দ্বিতীয় সেই লোকটি শ্বেতাঙ্গ নয়, বাঙালী। ড্যাম, ডার্টি নেটিভ., হী ওয়াজ এ বেঙ্গলী।

'আমিও বাঙালী, কিন্তু মাতালের প্রলাপে রাগ করা চলে না।

ছাপ

'তারপর ফ্রেডারিক উন্মত্তের মতো সেই দরজার ওপর ক্রমাগত ঘুষি লাথি চালিয়ে গেছে। বিকট, প্রমত্তস্বরে অশ্লীল চিৎকার করেছে, যতক্ষণ না অন্য লোকজন জড়ো হয়েছে এবং একটা হাতহাতির পর ওকে অজ্ঞান অবস্থায় ক্যাম্পে ফিরে আসতে হয়েছে।

'এই ব্যাপারটা সামরিক আদালত অবধি গড়িয়েছিলো। কর্তৃপক্ষ সেই মেয়েটিকে ডেকে পাঠালেন, আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। মেয়েটি আসতে দেখলাম, সে মার্থা।

'ইতিমধ্যে মার্থা আরো কয়েক ধাপ নেমে এসেছে; অর্থাৎ পুরোপুরি রূপোপজীবিনী হয়েছে। কোটরগত চোখ, বিশুষ্ক কপোল, শীর্ণ, শিরা-ওঠা হাত-পা থেকে ওর এই ক'বছরের ইতিহাস যেন পড়ে নিলাম।

'আমার সঙ্গে একবার মার্থার চোখাচোখি হলো। কিন্তু আমি যে চিনতে পেরেছি, এমন কোনো আভাস দিলাম না।

'মার্থাকে যে-সব প্রশ্ন জিগ্যেস করা হলো তার নমুনা দিই :—'

—তোমার নাম?

—মার্থা জনষ্টোন।

—পেশা?

মার্থার উকিল আপত্তি জানাতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মার্থা নিঃসঙ্কোচে জবাব দিলো।

(ফ্রেডারিককে দেখিয়ে) একে চেনো?

—না।

—ঘটনার দিন সন্ধ্যেবেলা এ তোমার কাছে গিয়েছিলো?

—হতে পারে।

—তুমি রাজী হওনি?

—না।

—কেন?

উত্তর নেই। আবার প্রশ্নে হলো—এ-কথা কি সত্যি যে,তার কিছুক্ষণ পরেই তুমি অন্য একটি লোকের সঙ্গে ঘরে ঢুকেছিলে?

'মার্থা স্বীকার করলো।

'এমনি-ধারা জেরা আরো কিছুক্ষণ চলেছিলো।

'সামরিক আদালতের সিদ্ধান্ত ভালো মনে নেই, সৈন্যটির বিভাগীয় কোনো শাস্তি হয়েছিলো বোধহয়। এর কিছুদিন পরে আমরা অন্য এক ছাউনিতে বদ্‌লি হয়ে গেলাম। তারপর তিন বছর শরীরের ওপর দিয়ে কী ঝড়ই গেল; বর্মার পাহাড়ে, মালয়ের জঙ্গলে, গুয়াদালকানালের খালে-বিলে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছি, স্বস্তি নেই, বিরাম নেই। সর্বক্ষণ বিমানের গর্জন, কামানের ক্রুদ্ধকণ্ঠে কান দুটো বধির হয়ে গেছে। প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য মানুষ মারা পড়ছে; তার চেয়ে বেশি আহত হয়ে আর্তনাদে বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে। আমরা তাদের সেবা করে সারিয়ে তুলে ফের রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়েছি। মৃত্যুর ঘূর্ণীঝড়ে বেতস-পত্রের মতো কম্পমান আমরা ক'জন জীবনের সব মূল্যবোধ খুইয়েছি।'

'—আর মার্থা?'

সকাল হয়ে এসেছিলো। নিজেরটা দেখতে পাচ্ছিলাম না, ডাক্তারের চোখে মুখে রাত্রি জাগরণের সুস্পষ্ট চিহ্ন পড়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে টুপিটা তুলে নিয়ে ডাক্তার একটু হাসলেন, বললেন, 'সে জীবনে মার্থার স্থান ছিলো না, ওকে একেবারে ভুলে থাকাই স্বাভাবিক হতো। কিন্তু অস্বীকার করে লাভ নেই, মার্থার কথা আমার প্রায়ই মনে পড়তো। ভালোবেসে পাইনি সেই হতাশা নয়, ওর বিচিত্র পতনের জন্যে দীর্ঘশ্বাসও নয়। ফ্রেডারিক ঘটিত ব্যাপারের একটা ঘটনা আমাকে চকিত করেছিলো, কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না।'

'—সেটা কি!'

'—ফ্রেডারিককে প্রত্যাখ্যান করে যে লোকটাকে নিয়ে মার্থা দরজায় খিল দিয়েছিলো, সে বাঙালী।'

'—এই ব্যাপারটাকেই এতবড়ো করে দেখছেন কেন?'

'—দেখছি এই জন্যে যে, মার্থাকে আমাদের সেনাদলের অনেকেই চিনতো। ফ্রেডারিকের মতো কেলেঙ্কারী তারা কেউ করেনি, কিন্তু অনেকেই মার্থার দরজা থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে। তাদের মুখেই শুনেছি মার্থা বাঙালী ছাড়া আর কাউকে ওর ঘরে ঢুকতে দিতো না। অসম্মানের

ছাপ

নিম্নতম ধাপে দাঁড়িয়েও এই বিচিত্র আভিজাত্যটুকু সে বজায় রেখেছিলো। শ্যামলদাকে ছাড়বার পর আরো দু'জনের কাছে মার্থা রক্ষিতা হয়ে ছিলো। তারা দু'জনেই বাঙালী। এমন কি—' ডাক্তারবাবু বললেন, 'আপনি শুনে অবাক হয়ে যাবেন, কাল সন্ধ্যেয় যে লোকটি মার্থার ঘরে ঢুকেছিলো, টাকার লোভে শেষ পর্যন্ত মেয়েটাকে খুন করে পালিয়ে গিয়েছে, পুলিশ ইন্সপেক্টার তার সম্বন্ধে আশপাশের মেয়েদের জেরা করেছে। ঠিক জানা যায়নি, তবু বর্ণনা থেকে পুলিশের সন্দেহ, সেও বাঙালী।'

'—অদ্ভুত!' আমি বললাম।

আমরা দু'জন তখন রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি। সকালবেলার হিম হাওয়া রাত্রি-জাগরণের পর স্নিগ্ধ প্রলেপের কাজ করছিলো।

ডাক্তার আমার মন্তব্য শুনতে পাননি। অন্যমনস্কভাবে কতকটা আপন মনেই বললেন, 'আমার মনে হয়, জীবনে মার্থা একবারই ভালোবেসেছিলো, শ্যামলদাকে। তারপর সারা জীবন ধরে অসংখ্যের ভেতর দিয়ে সে যে অনন্য পুরুষের খোঁজ করেছে, সে শ্যামলদা। ওর বিচিত্র প্রাদেশিকতাটুকুর নইলে আর কোনো অর্থ হয় না।'

দুই বোন

বিমল কর

নিরুপমা আর অনুপমা। ছোটো করে নিরু আর অনু। দুই বোন—বড়ো নিরু, ছোটো অনু। বড়োয়-ছোটোয় তফাতটা বাইশ মাসের। তবু দুয়ের পিঠে দুয়ের মতই পিঠোপিঠি দুই বোনকে ষোলো আর আঠারোয় এসে তফাত করা যায় না। আর এই দু'য়ে মিলে যে একুন, তার ভারে মাধববাবুর ঘাড় সর্বক্ষণ টন্‌টন্ করা উচিত।

মেয়েদের মা শৈল। আইবুড়ো ধুম্‌সো দুই মেয়ে পাথর হয়ে বুকে বসে আছে মায়ের। বয়স বেশি হলে যে কাজে আসতো, নিরু-অনুর সেই ভাই ফটিক মাত্র ন'বছরের। শৈলর কাছে একটা প্রকাণ্ড পরিহাস। ফটিক যদি আঠারোয় পড়তো এই ভাদ্রতে, উনি বলে-কয়ে হাতে-পায়ে ধরে ঢুকিয়ে দিতে পারতেন মাল-খালাসের অফিসে। তাতে, কম করেও হোক, রেশন আর মাস-কাবারি কয়লা-ঘুঁটের খরচাও তো উঠে আসতো। কিন্তু এমন ভাগ্য শৈলর, ফটিকটাই পেটে এলো শেষে।

বেশি গজ্‌গজ করলে মাধববাবুও বিগড়ে যান। বলেন, 'আমি কি করবো? পাত্র তো আর আমাদের ম্যাক্‌কেনা সাহেবের মুখের বাক্যিতে গজিয়ে উঠবে না! তা যদি উঠতো, কবেই তোমার জামাই ধরে এনে দিতাম। হ্যাঁ, চাকরি-বাকরির কথা হতো বুঝতাম। হতো ফট্‌কেটা বড়ো-সড়ো দেখতে, ছোঁড়াটাকে ম্যাট্রিকটাও পাস করতে হতো না; বেটাকে জুতে দিতাম কবেই!'

নিরু-অনুর বিয়ে নিয়ে যে তাদের বাপ-মায়ের দুর্ভাবনার অন্ত নেই, পয়সাও নেই ছেলে কেনার—দুই বোনই তা স্পষ্টাপষ্টি বোঝে, জানে। এ নিয়ে হয়তো বেফাঁস একটা কথাও বলে বসে নিরু, 'অনুর তুমি বিয়ে দাও,

মা—দেখতেও ভালো আমার বাবা আর অতো বিয়ে-ফিয়ের দরকার নেই।'

অনু বলে, 'বয়ে গেছে আমার বিয়ে করতে। তুই না আমার দিদি! তোর আগে বিয়ে হোক্! আমার জন্যে তোর কপাল-ব্যাথা রাখ্।'

দুই বোনের তর্কাতর্কি আরও একটু চড়ায় উঠলে শৈল ধমক দেয়, 'থাম তো তোরা! আর ক্যাচম্যাচ করিস না, বাপু। ঝালাপালা হয়ে গেল কান। কে দিচ্ছে তোদের বিয়ে? কার গরজ পড়েছে?'

ইঙ্গিতটা মাধববাবুকে। কারণ, মাধববাবু তখনই বাজারের থলি হাতে বাড়ি ঢুকলেন এবং রান্নাঘরের সামনেই দাঁড়িয়ে। শৈল বলছে তখনও, 'সকালে একবার বাজারটা ঘুরে এলেন, এরপর অফিস, অফিস থেকে ফিরে তাসের আড্ডা, রাত্রে ঘুম।'

'—ভাদ্র মাসে আবার বিয়ের বায়না কে ধরলো?'

মাধববাবু বাজারের থলিটা হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দিতেই অনু গিয়ে ধরে ফেললো। নিরু ঢুকলো ভাঁড়ার-ঘরে আনাজের ঝুড়ি আর বঁটি বের করতে।

ডাল সাঁতলাতে-সাঁতলাতে শৈল চোখ-মুখ কুঁচকে তুলেছিলো এমনিতেই, ফোঁড়নের ছিটেতে ফুঁসে উঠলো, 'কে আবার! আমি—আমি।'

'—তুমি?' মাধববাবুর এমনিতেই রসিক মেজাজ। ফোঁড়নের ঝাঁঝে কাশতে-কাশতেও রস-নেংড়ানো মন্তব্য করলেন, 'গেরস্থর অকল্যাণ্ করে ভাদ্র মাসেই তোমার পাত্র খুঁজতে পারবো না আমি।'

শৈল শব্দ করে ডালের কড়াটা নামিয়েছে—তার আগেই মাধববাবু সরে গেলেন। ফলাফলটা তাঁর তো অজানা নয়।

'—ঢং।' শৈল পলাতক স্বামীর দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হান্‌লো।

ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে মাধববাবু হাঁকলেন; 'নিরু, একটু চা দে।'

নিরুকে বলতে হয় না। সে চায়ের—কেট্‌লিটা উনুনে বসিয়েছে আগেই। সকালের চা আবার সেদ্ধ হচ্ছে। এমনিই হয় এই বাড়িতে।

চায়ের ভাঙা কাপ হাতে শৈলই গেল। রান্নাঘরের একপাশে আনাজ কুটতে-কুটতে, একই কাঁচের গ্লাসে দুমুখ-ভাগ করে চা খেতে-খেতে দু'বোনে গা-টেপাটেপি করে, হাসে, ফিসফাস করে।

'—মা এতক্ষণে বাবাকে—' অনু বাক্যটা শেষ না করে উহ্য রাখে।

'—বাবার কোনও কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই।' নিরু কড়াটা উনুনে বসিয়ে বলে, 'আর তুইও মায়ের সামনে অমন বিয়ে-বিয়ে করিস না তো। বড়ো বদ্ অভ্যেস তোর। হাজার হোক, মা গুরুজন।'

'—গুরুজন তো তুইও।' পাল্টা জবাব অনুর, 'বিলুদার গল্পও তাহলে আমার কাছে তুই করবি না।'

নিরুর মুখে আঁচ লাগে হঠাৎ।

'—আহা, নিজে যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। অশোক ছোঁড়াটার অতো কি রোজ বই দিয়ে যাওয়া রে? লাইব্রেরিটা যেন ওর!' নিরু এবার উল্টো চাপ দেয়।

'—চুপ্, মা আসছে।'

দুই বোনই চুপ করে যায়। দু'জনেই একটু হেসে হঠাৎ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শৈল রান্নাঘরে এসে দাঁড়ায়। বড়ো মেয়েকে সরিয়ে নিজেই খুন্তি ধরে। মুখের কোথাও আর ঝাঁঝ নেই—মায়ের। দু'বোনে আড়-চোখে সেটা দেখে এবং চোখাচোখি করে হাসে।

এমনি অদ্ভুত তাদের সংসার। সব রকম দুঃখ-কষ্ট, মালিন্য আছে। তবু সব থাকার উপর আছে তাদের বাবা-মা বড়ো নরম, ভালো—আর অনেক ভালোবাসা যাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য।

দুপুরে শৈল কখন একটু ঘুমিয়ে পড়ে। ফটিক স্কুলে! চোখে-চোখে বাক্য বিনিময় হয় দুই বোনে। নিরু ওঠে। আস্তে-আস্তে একটা দেওয়াল-খোপের আড়াল থেকে এক টুকরো পেন্সিল তুলে নেয়, হাতড়ে-হাতড়ে এক-ফালি কাগজও। তারপর পা টিপে-টিপে বাইরে চলে যায়। মায়ের পাশে শুয়ে-শুয়ে অনু এক চোখ বইয়ের পাতায় আর এক চোখ মায়ের দিকে রেখে কি ভাবে যেন। আচ্ছা, অশোকদা তাকে যে বই এনে দেয়, তাতে ওই এক ভালোবাসাবাসির গল্প কেন? পড়তে-পড়তে সারা গা কেমন করে ওঠে, মনটাও ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। দু'একদিন স্বপ্নও দেখেছে অনু।

শৈল পাশ ফিরলেই ধড়াস করে ওঠে বুক। দিদিটাও যেন কি? লেখা আর হয় না ওর! ঠিক একদিন হাতে-নাতে ধরা পড়বে। দেওয়ালে টিক্‌টিকিটাও ঠিক এ সময়ে টিক্‌-টিক্‌ করে ওঠে। ইস্‌!

শেষ পর্যন্ত ধৈর্য রাখা মুস্কিল হয়ে পড়ে অনুর। উঠে পড়ে সেও।

'—কি রে, হাঁ করে কাক দেখছিস যে! হলো তোর?'

নিরু চমকে ওঠে। অনু দেখে, নিরুর হাতের কাগজ-পেন্সিল উধাও। —নিরুর বুকের দিকে তাকিয়ে অনু ফিস্‌-ফিস্‌ করে বলে, 'দিয়েছিস?'

মাথা নাড়ে নিরু, 'হ্যাঁ, দিয়েছি।'

'—ও দিয়েছে?' অনু জানতে চায়।

'—হ্যাঁ।'

'—কই, দেখি!'

'—যাঃ।' নিরু লজ্জা পায়।

'—দিবি না দেখতে? আচ্ছা।' অনু শাসায়, একটু অভিমানও আছে তার সঙ্গে।

'—তুই যেন কি!' নিরু বুকের মধ্যে থেকে ভাঁজ-করা এক টুকরো কাগজ বের করে দেয় অনুর হাতে, এখানে দাঁড়িয়ে পড়িস না। কল-ঘরে যা। মা এসে পড়বে।'

কলঘর থেকে এসে চিঠির টুকরোটা নিরুর হাতে গুঁজে দেয় অনু। বলে, 'ধোপায় কাপড় দিয়ে গেছে কাল। আমার সেই খয়েরী শাড়িটা তুই পরিস, দিদি—বিকেলে গা ধুয়ে। আমি তোর চুল বেঁধে দেবোখন।'

'—কি হবে শাড়ি পরে, চুল বেঁধে?'

'—আহা, শাড়িটা তোকে ভালো মানায় কিনা, তাই আদিখ্যেতা হচ্ছে। বেশ তো, মায়ের কাছেই চুল বাঁধিস, ঝুটি টেনে বেঁধে দেবে!'

'—শাড়ি পরে চুল বেঁধে বসে থাকবো, আমায় কি দেখতে আসছে!' নিরু আনমনা হয়।

'—আসতেও তো পারে তোর বিলুদা!' ফিক্‌ করে হেসে ফেলে অনু, 'একটু ভালো করে সেজে-গুজে থাকলিই বা। আজ তো বিকেলবেলায় ও আসবে লিখেছে, মায়ের কাছে। সেই ফাঁকে না হয়—'

'—বয়েই গেছে! ও আসবে ওর কাজে, আমার কি তাতে?'

'—বলা কি যায়?' অনু একটা চিমটি কেটে দেয় নিরুর গায়ে, 'ঘুম ভেঙেছে মায়ের!'

বই দিতে এসে অশোক সদর থেকেই চলে যায়। নিরু এই সময়টুকু মাকে আটকে রাখে বাবার ঘরে নানা ফন্দি-ফিকির করে।

অশোক চলে গেলে নিরু ফাঁক পেয়ে অনুকে বলে, 'ওই কট্‌কী ছোঁড়াটা অতো ঘটা করে সেজে এসেছিলো কেন রে, অনু?'

'—কট্‌কী ছোঁড়া মানে?'

'—তাছাড়া কি? কট্‌কী শুঁড়-তোলা চটি পায়ে, ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবি।'

'—আছে, তাই পরে।'

'—ও! আর, আছে বলেই বুঝি তোকে একা-একা মুঠোয় গুঁজে—'

'—দিদি!' অনু ভয় পেয়ে এদিক-ওদিক তাকায়।

'—দে তবে।' নিরুও এবার শাসায়।

'—শকুনির চোখ তোর।' অনু নিরুকে একটু আড়ালে টেনে আনে। বুকের মধ্যে থেকে টফি বের করে ওর হাতে দেয়।

'—কি করে জানলি তুই?' অনু শুধোয়, 'আমি কিন্তু তোকে না দিয়ে খেতাম না।'

পরমানন্দে টফিটাকে জিবের ডগা দিয়ে ঠেলতে-ঠেলতে নিরু হাসে, 'তা কি আর জানি না!'

দুই বোনেই জানে দু'জনকে, দু'জনেরই নাড়ি-নক্ষত্র। ওদের খাওয়া বসা শোওয়া একসাথে। এর ছায়ায় ওর ছায়া। এর শাড়ি ওর গায়ে, ওর ব্লাউজ এর। নিরুর চুলের কাঁটা অনুর মাথায়, অনুর ফিতে নিরুর খোঁপায়। কালে-ভদ্রে কোথাও বেড়াতে যেতে হলে দুই বোনে ঘোঁট পাকায় বসে-বসে। নিরুর একটা ঢাকাই শাড়ি আছে গোলাপী রঙের। অনুকে সেটা পরলে মন্দ মানায় না। নিরু সেটা অনুকে পরতে দেয়। আর অনুর আছে আকাশী রঙের সিল্কের এক শাড়ি, হাতে-বোনা লেসের

কাজ-করা ব্লাউজ। অনু দেয় সেটা নিরুকে পরতে। দু'জোড়া জুতো আছে দুই বোনের। তাও অদল-বদল হয়। অদল-বদল হয় তাদের যৎসামান্য গায়ের গয়নাগুলোও। অনুর কান-পাশা মানায় নিরুর কানে—অতএব বদলাবদলি করে নেয় দু'জনেই।

ষোলোয় আর আঠারোয় যে কোনও তফাত থাকতে পারে না, অন্তত নিরু-অনুর মধ্যে নেই, তা ওরা নিজেরাই ভালো করে জানে। কারুর কাছে অন্যের গোপন কিছু লুকোনো থাকে না। যেন থাকতে নেই। সেটা দোষের। কথা যাই হোক, অনুকে না বললে, তার পরামর্শ না নিলে নিরুর শান্তি নেই। অনুরও তাই। অশোক অনুর কাছে কি একটা খেতে চেয়েছিলো, অনু বোকার মতো সেটাও নিরুকে বলে দিলো।

শুনে নিরুর বুক ধুক্‌পুক্ করে উঠলো। বড়ো-বড়ো চোখ করে নিরু বললো, খেয়েছে?'

'—না।' অনু দিদির দিকে তাকিয়ে বললো, 'অমন করছিস কেন?'

'—ছি, ছি!' নিরু লজ্জায় অসাড়, 'খবরদার, অনু! ও-সব খেতে দিস না যেন।'

'—অনু মাথা নাড়লো, 'না, না।'

সেদিন বিকেলেও শরতের আশ্চর্য একটা সোনালী রোদ ছিলো আকাশে। বাতাসটাও মিহি। ঝাঁক বেঁধে চড়ুই নেমেছিলো উঠোনে।

মাধববাবু বাড়ি ঢুকেই হাঁক দিলেন, 'কই গো, শুনছো?'

শৈল এলো। মাধববাবু হাসি-খুশি হয়ে বললেন, 'এবার নাও, সানাই বায়না দাও!'

সানাই বায়না দেবার কথা জড়িয়ে আরও যতো কথা ছিলো, দুই বোনই তা শুনে ফেললো। বাবার অফিসের বড়োবাবু চাটুজ্যেমশাই তাঁর ছোটো শালার বিয়ে দিচ্ছেন। শালাকে নিয়ে চাটুজ্যেমশাই নিজেই আসবেন কাল মেয়ে দেখতে। দেনা-পাওনার কথাটা আগেই হয়ে গেছে। চাটুজ্যেমশাই বলেছেন, টাকাপত্রে আটকাবে না; মেয়ে পছন্দ হলেই

আমি তাকে ঘরে নিয়ে আসবো। তোমার তো দুই মেয়ে আছে, মাধব! দু'জনকে দেখিয়ে দিও। যাকে পছন্দ হয়!

শুনে পর্যন্ত শৈল মেয়েদের কাছে আপন মনে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে কথাটা অনেকবার বললো, 'এখন আমার কপাল! ছেলে নিজেই আসছে, চোখে ধরলে বাঁচি!'

সব কথা শোনার পর নিরুর মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। অনুর দিকে কয়েকবারই আড়চোখে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখেছে নিরু।

শৈল বলেছিলো, 'সাজগোজটা তোরা দুই বোনে মিলে সেরে নিস, বাপু! আমার মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে! একটু শুয়ে নি। দেখিস, বিকেল গড়িয়ে বসে থাকিস না যেন!'

শৈল ঘুমুতে গেল তার নিজের ঘরে। শেষ দুপুরটুকু যেন ঘড়ির কাঁটায় টাইফয়েড-জ্বরের মতো জুড়ে বসে থাকলো। যায়-যায় করেও যেন যায় না।

অনেক কালের রং-ওঠা, বেঢপ আলমারিটা খুলে বসে আছে দু'বোন। শাড়ি-ব্লাউজ ছড়ানো।

'—আর দেরি করলে কিন্তু মা উঠে বকাবকি করবে, দিদি! নে, চুলটা আগে বেঁধে নে, বাপু!'

ফিতে-কাঁটা সাজিয়ে চুল বাঁধতে বসলো নিরু আর অনু।

নিরুর চুল বাঁধা শেষ হলো।

'—তুই বড়ো ঝুলিয়ে দিস খোঁপাটাকে, অনু। ঘাড়ের কাছে বিচ্ছিরি লাগে।' নিরু ঠোঁট কুঁচকে বললো ডান হাত খোঁপায় দিয়ে।

'—আহা, ঝুলিয়ে দিই! দেখ না একবার ঘাড়ে বেঁকিয়ে আয়নায়?'

দেখলো বটে নিরু আয়নায়, তবে বিশেষ খুশি হলো না।

এবার অনুর চুল বাঁধছে নিরু।

'—কতো তেল দিয়েছিস চুলে, রে—চট্‌চট্‌ করছে হাত!' নিরু গা-বিড়োনো ভাব করলো।

'—কোথায় আর তেল দিলাম! তেলই ফুরিয়ে ছিলো শিশিতে।' বললো অনু।

চুল বাঁধা শেষ হলে অনুও বিরক্তি প্রকাশ করে, 'এটা কি করলি? ঝুঁটি-বাঁধা উড়ে নাকি আমি?'

'—বাজে বকিস না, অনু। অতো কষ্ট করে বেঁধে দিলাম, পছন্দ হয় না মেয়ের!'

'—ভালো করে না, ছাই!' অনু নিজে-নিজেই খোঁপাটা একটু এদিক-ওদিক করে মানিয়ে নিলো মনমতো।

'—অতর দরকার নেই, বাপু! তোকেই পছন্দ করবে!' নিরু ছোটো বোনের দিকে তাকিয়ে ঠাট্টা করলো; ঠোঁটের কোণে কোঁচকানো হাসি জমলো।

'—বয়েই গেছে!' অনু দিদির দিকে না চেয়েই বললো, 'দরকার নেই আমায় পছন্দ করে। তোকে করলেই বাঁচি!'

'—কালো মেয়েকে কি পছন্দ হয়?'

'—কেন হয় না! কতো লোকেই তো করছে! তুই তো কতো কাজ জানিস, গান পর্যন্ত।' অনুর গলায় যেন বেশ একটু ক্ষোভ।

দু'পাঁচ মিনিট চুপচাপ। অনু বললো হঠাৎ, 'স্নো-পাউডার মাখবি না? চল্, মুখটা সাবান দিয়ে ধুয়ে আসি।'

নাক কোঁচকালো নিরু। বললো, 'ছাই-ভস্ম মাখতে পারবো না! যা আছি, তাই আছি।'

একটু পরে নিরু বললো, 'অনু, একটা কাজ করবি, ভাই?'

'—কি?'

'—বড্ড মাথা ধরেছে। যা না, একটু চা করে নিয়ে আয়, চুপি-চুপি। উনুনে মা আঁচ রেখেছে আজ।'

অনু কি একটা ভেবে চা করতে চলে গেল। সেই ফাঁকে মুখটাও একবার সাবান দিয়ে ধুয়ে আসবে ও।

অনু চলে গেলে নিরু দরজাটা বন্ধ করে দিলো। সাবান দিয়ে মুখ ধোওয়ার পাট ও আগেই সেরে এসেছে। ছেলে নিজেই আসছে দেখতে। পছন্দ হলেই বিয়ে করে ফেলবে। এই কালো মুখ নিয়ে নিরু দাঁড়ায় কি করে ছেলের সামনে! পাশেই তো থাকবে অনু, রংটা ফর্সাই তার!

মেয়ে-দেখানর প্রথম দফায় শৈলই কয়েক শিশি হোয়াইটেক্স আনিয়েছিলো। পর-পর মাখিয়েছে মেয়েদের—কনে দেখবার সময়। তাতেও যখন মেয়ে পছন্দ হলো না, শৈল ও পাট তুলে দিলো। তারই একটা শিশিতে এখনও খানিকটা রং আছে গোলা। নিরুই রেখে দিয়েছে লুকিয়ে। কেন যে কে জানে! অনুর পাশে নিরুকে দাঁড়াতে হবে, আর পাত্র আসছে নিজেই, পছন্দ করবে তার চোখে—এতগুলো কথা ভাবলে নিরু অসাড় হয়ে আসে। কেমন করে দাঁড়াবে নিরু অনুর পাশে কালো কুট্‌কুটে মুখ নিয়ে! রঙের জন্যই হয়তো নিরুর দিকে চোখ তুলেও একবার তাকাবে না ছেলে!

হোয়াইটেক্স থেকে সবটুকু রং হাতের চেটোয় ঢেলে তাড়াতাড়ি মেখে নেয় নিরু। পাছে অনু এসে পড়ে, পাছে দেখে ফেলে।

খালি শিশিটা লুকোতে না-লুকোতে অনু এসে পড়লো চা নিয়ে। ঘরে ঢুকে দিদির দিকে তাকিয়ে অনু অবাক। অমন ধব্‌ধব্‌ করছে কেন দিদির মুখ? পরীক্ষকের চোখ নিয়ে তাকিয়ে-তাকিয়ে অনু বলে, 'এই না বললি, স্নো-পাউডার মাখবি না? এদিকে তো ধব্‌ধবে দেখছি তোর মুখটা!'

চায়ের গেলাসটা অনুর হাত থেকে নিয়ে নিরু একটা নিরুপায় ভঙ্গি করে বললো, 'বলিস না। যতো-রাজ্যের সং সাজা। ভাবলাম, কি জানি, মা আবার উঠে বকাবকি না করে।'

অনু আর কোনো কথা বললো না।

নিরু বললো, 'আমার এই তোলা-কানের ঝুম্‌কো দুটো তুই পর।'

'—না।' মাথা নাড়লো অনু, 'কানে আমার ভীষণ ব্যথা হয়েছে।'

'—বলিসনি তো আগে।' নিরু খোঁচা দিলো।

অনু খোঁচাটা হজম করে নিলো চুপ করেই। সত্যই তো আর তার কানে ব্যথা হয়নি। আসলে, ঝুম্‌কো দুটোই পুরোনো আর ম্যাড়মেড়ে। অনুর কানে একদম মানায় না। নিরুরও নয়। কান-পাশাটা অনুকে ভালোই মানায়, আর ঝুম্‌কো দিয়ে নিরু কান-পাশাটা বাগাতে চায়। কেন দেবে ও? ছেলে কি ওকেই দেখতে আসছে?

দিদিকে আজ অনুর বিশ্বাস হচ্ছে না। দিদির সেই ঢাকাই শাড়িটা

আজ কি আর দিদি পরতে দেবে তাকে ? কখনই নয়। অথচ ওই শাড়িটায় অনুকে সত্যিই খুব সুন্দর দেখায়।

স্নো-পাউডার মাখা শেষ করে অনু একটু বসলো। আর তো দেরি করা যায় না। মা এখনি উঠলো বলে। বিকেলও হয়ে গেছে।

'—ওই যাঃ। সর্বনাশ হয়েছে রে!' অনু চোখ কপালে তুললো। নিরু বিস্ময়-ভরা চোখে তাকালো অনুর দিকে।

'—দিদি, লক্ষ্মীটি—একটা কাজ কর্ না। উনুনে কয়লা দিয়ে আসতে ভুলে গেছি! আগুন পড়ে গেলে মা আস্ত রাখবে না। একটু কয়লা দিয়ে উনুনটা ঠিক করে আয়, লক্ষ্মীটি। আমি ততক্ষণে ঘরটা গুছিয়ে নি।'

নিরুরও যেন কি একটা দরকার ছিলো। চায়ের গেলাস তুলে নিয়ে নিরু চলে গেল।

খানিক পরে ফিরে এসে দেখে, দরজা বন্ধ ভিতর থেকে। অনু কি ঘর ঝাঁট দিচ্ছে? নিরু ধাক্কা দিলো, 'দরজা খোল, অনু।'

'—খুলি।' উত্তর এলো অনুর।

একটু পরে দরজা খুললো অনু। নিরু ঘরে পা দিয়েই দপ্ করে জ্বলে উঠলো। অনু সেই ঢাকাই শাড়িটা দিব্যি পরে নিয়েছে; এমন কি, শাড়ির সঙ্গে মিশ-খাওয়া ব্লাউজটা পর্যন্ত। সেজে-গুজে ফিট্‌ফাট বিবি!

নিরু হঠাৎ হিংস্র হয়ে উঠে ছোটো বোনের শাড়ির আঁচলটা খপ্ করে ধরে ফেলে, 'নিজের শাড়ি নেই তোর? আমার শাড়ি কেন পরেছিস? খোল্, খোল্ শিগ্‌গির!' নিরু টানাটানি করতে থাকে বেপরোয়া হয়ে।

'—ছিঁড়ে যাবে, দিদি টানিস্ না।'

'—যাক ছিঁড়ে। খোল্ তুই আমার শাড়ি।'

অনুও ক্ষেপে যায়। শাড়ি সে দেবে না; কিছুতেই না। ক্ষিপ্ত স্বরে অনু বলে, 'আমার-আমার করছিস কি। তোর বিলুদা তোকে কিনে দিয়েছে গাঁটের পয়সায়? আমার বাবা কিনে দিয়েছে। বেশ করবো, আমি পারবো। পেত্নীর আবার কতো সাজার সাধ!'

দুই বোনের টানাটানি, খেমচা-খেমচি, ফোঁস-ফাঁস, আর চিৎকারে শৈল এসে দাঁড়ায়। কাণ্ড দেখে তার চক্ষুস্থির। জীবনে শৈল এই প্রথম দেখলো, পিঠোপিঠি দুই বোনে প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড বাধিয়েছে। কি হয়েছে, শৈল আর তা জানতে চাইলো না। অনেক কথাই তার কানে গেছে। শুধু বললো, 'যে যার নিজের জিনিস পরো। অনু, তুমি নিরুর শাড়ি খুলে দাও!'

অনু শাড়ি-ব্লাউজ দুই-ই খুলে দিলো। আর মনে-মনে এই প্রথম বুঝলো, দিদি তার শয়তানী। আচ্ছা, সেও দেখে নেবে। এক মাঘে শীত যায় না।

নিরুও তাই ভাবলো, অনুটা সাজ্ঘাতিক মেয়ে। এমনিতে মায়ের কাছে কতো লম্বা-চওড়া কথা। ওমা, দিদির বিয়ে আগে দাও। এ-দিকে তো বাপু ঠিক সময়ে উর্বশী সেজে বসে আছে!

চাটুজ্যেমশাইয়ের শালার মেয়ে পছন্দ হয়নি। কথাটা রাস্তায় বেরিয়েই চাটুজ্যেমশাই সোজাসুজি বলে দিলেন।

বাড়ি ফিরে এসে মাধববাবুও সোজাসুজি কথাটা স্ত্রীকে জানিয়ে দিলেন। শৈল সব শুনলো। এই তো প্রথম নয়। কতবারই তো শুনেছে শৈল। শুনে-শুনে সয়ে গেছে সব। মুখ গম্ভীর করে মেয়েদের শুধু একবার দেখে নিলো শৈল। বড়ো করুণা হলো আজ মায়ের, মেয়েদের জন্য। বললো, 'পছন্দ হয়নি তো হয়নি—কি হয়েছে তাতে?'

দুই বোনে কথা বন্ধ ছিলো। রাত্রে ওদের ঘরে বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে দু'জনে দু'দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলো। দুপুর আর বিকেলের ঘটনাটাই ভাবছে দু'জনে। ছি, ছি! কি কাণ্ডটা করলো আজকে ওরা। কেন এমন করলো দু'বোনে।

এমন সময় কানে এলো মায়ের গলা, মা বলছেন বাবাকে পাশের

ঘরে শুতে এসে, 'এর পর যখন সম্বন্ধ আনবে, তোমায় বলে দিলাম—ছ'মেয়ে একসঙ্গে আমি দেখাবো না। কখখনো না।'

'—অনু!' নিরু ফিস্-ফিস্ করে ডাকলো।

কোনো সাড়া নেই। অনু কি ঘুমিয়ে পড়লো?

'—অনু!' নিরু পাশ ফিরে অনুর গায়ে হাত রাখে, 'রাগ করেছিস আমার ওপর, না?'

'—না।' অনু বললো, 'রাগ করিনি। মনটা বড়ো খারাপ লাগছে।'

নিরুরও মন খারাপ লাগছিলো।

একটু পরে নিরু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'আমার ঢাকাই শাড়িটা আমি তোকে দিলাম। বরাবরের জন্যে। তুই পরিস।'

'—আর তুই?' অনু জানতে চায়।

'—যা-হয় পরবোখন।'

'—আমার কমলালেবুটা তুই নে। বরাবরের জন্যেই নে, দিদি।'

দুই বোন পাশাপাশি গলা-জড়াজড়ি করে আবার শুয়ে পড়লো! ঘুমিয়ে পড়লো বোধহয়। কিংবা হয়তো ভাবছিলো, বিলু-অশোককে নিয়ে তো এমন রেশারেশি কই হয় না! হয়তো এও ভাবতে পারে, ষোলোয়-আঠারোয় এসে যে তফাতটুকু হয়ে গেল আজ দুই বোনে, আর কি তা ঘুচে যাবে!

নষ্ট-নারী

রমাপদ চৌধুরী

মোগলসরাই স্টেশনে এসে ট্রেনটা যখন পৌঁছালো, রাত দশটা বেজে গেছে। এরপর আর লোকালটার জন্যে অপেক্ষা করা যায় না। 'এ পথটুকু টাঙা নয়তো এক্কাতেই যাওয়া যাক'—করুণাময় বলে।

রাত দশটা বলতে কি বোঝায় স্টেশনের ঝক্‌ঝকে আলোয় এতক্ষণ ওরা কেউই ঠাওর করতে পারেনি। টের পেলো আলোর এলাকা পার হয়ে এসে। ওভারব্রিজের এদিকে নামতেই গা-ছম্‌ছম্ অন্ধকার। একটা বিড়ির দোকানে টিমটিমে হ্যারিকেনটা জ্বলছে, শুধু কোলে কুলো নিয়ে বিড়ি পাকাচ্ছে একজন। আর ঘাস চিবোতে-চিবোতে পা ছুঁড়ছে ঘোড়াটা, মশার কামড়েই হয়তো।

একটাই টাঙা। শেয়ারে ভাড়া ঠিক করে উঠে পড়লো ওরা। করুণাময় আর নীলা। কোলের ছেলেটাও।

বঁড়শির মতো বাঁক নিয়ে টাঙাটা হঠাৎ ছুটতে শুরু করলো। এমন ঝাঁকানি যে, শক্ত করে ধরে না বসলে এখনি বুঝি ছিটকে পড়বে রাস্তায়।

মিনিট-কয়েকের মধ্যেই নির্জন আর নিঃঝুম অন্ধকারে মাঠে নামলো টাঙাটা। পীচের পথটুকুর ওপরই যেন রাজ্যের অন্ধকার এসে জমেছে। চারদিক চুপচাপ। কোথাও কোনো শব্দ নেই, কোথাও কোনো আলো নেই। দু'পাশের ঢালু মাঠের মাঝ দিয়ে শুধু শিরদাঁড়ার মতো উঁচু হয়ে আছে লম্বা মেটাল রোড। দু'জোড়া খুরের টপাটপ আওয়াজ ছাড়া আর কিছু কানে আসে না।

পথের দু'পাশে গাছের সারি, ছায়া-শরীরের রহস্য মেখে নিশ্বাস চেপে আছে। স্তব্ধতা ভাঙবার জন্যে মাঝে-মাঝে দু'চারটে কথা বলে নীলা,

দু'চারটে কথার জবাব দেয় করুণাময়। তারপর আবার সেই নীরবতা। বাচ্চাটাকে এক বুক থেকে আরেক বুকে বদলে নিতেই হাতের চুড়িতে টুংটাং আওয়াজ উঠলো। ভয় হবার কথা বটে, নেই-নেই করেও হাতে গলায় কোন্ না হাজার-পাঁচেক টাকার সোনা আছে। আর এমন নির্জন রাতের রাস্তায় টাঙাওলাদের গুণ্ডামির কথাও শোনা গেছে। লোকটা অবশ্য রোগাসোগা, কিন্তু করুণাময়ই বা কি এমন পালোয়ান! তাছাড়া রাস্তার কোথাও দলের লোকও যে অপেক্ষা করছে না, তাই বা কে বলতে পারে! করুণাময়ও যেন অনেকক্ষণ চুপচাপ, কথা বলছে না কেন! ভাবতেই কেমন ভয়-ভয় করলো, পেছন ফিরে তাকালো নীলা। না, গঙ্গার পুল এখনো অনেক দূরে। আলোর সারিও গাছপালায় ঢাকা পড়েছে।

গাড়িটা খাড়াই উঠতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে। কিন্তু শব্দ ভেসে আসছে কিসের? টাঙারই ডুমডুমি যেন, ঘোড়ার খুরের টপাটপ-টপাটপ আওয়াজ আসছে। ওদের গাড়িটার অনেক আগে-আগে আর-একটা টাঙা চলছে বোধহয়। হ্যাঁ, ঘাড় ফিরিয়ে সামনের পথের দিকে তাকালো নীলা, অনেক আগে এক টুকরো সল্‌তে-পোড়া লণ্ঠন দুলছে মনে হলো।

তারপর হঠাৎ এক সময় আলো অদৃশ্য হয়েছিলো, শব্দ শোনা যায় নি। কখন আপনা থেকেই ভয় মুছে গিয়েছিলো নীলার মন থেকে। তন্দ্রায় চোখ জুড়ে আসছিলো একবার, আবার পরমুহূর্তেই চোখ টেনে ঘুম তাড়াবার চেষ্টা করছিলো। আর সেই ফাঁকে কখন সত্যি-সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিলো।

হঠাৎ একটা চিৎকারে চমকে জেগে উঠলো নীলা। আর পরক্ষণেই আতঙ্কে শিউরে উঠলো। খোকন কই? যাক, পড়ে যায়নি, করুণাময়ের কোলেই আছে। ঘুমে ঢুলতে-ঢুলতে কখন করুণাময়ের কাঁধে মাথা রেখেছিলো ও, আর সেই ফাঁকে নীলার অজান্তেই খোকনকে কোলে তুলে নিয়েছে করুণাময়।

কিন্তু চিৎকার কিসের? ভালো করে চেয়ে দেখলো নীলা।

এক পাশে একটা টাঙা, আর বিদ্‌ঘুটে চেহারার একটা লোক দু'হাত তুলে ওদের পথ আটকে দাঁড়িয়েছে। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় অস্পষ্ট হলেও

লোকটাকে দেখা গেলো। বেঁটে আর মোটা। কালোও নিশ্চয়ই। শুধু সাদা ফুটফুটে একটা ধুতি আর পাঞ্জাবি দাঁড়িয়ে আছে যেন। মুখটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে, পাঞ্জাবির হাতা দুটোর ভেতর থেকে রক্ত-মাংসের কোনো হাত বেরিয়ে এসেছে বলে মনেই হলো না। কন্ধকাটাও বোধহয় এতখানি বীভৎস নয়।

আতঙ্কের ঝিমুনি দূর হতেই চোখ পড়লো আরো একজনের ওপর। দেখলো, টাঙাটার আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি মেয়ে। কপাল অবধি ঘোমটায় ঢাকা এক টুকরো ফরসা মুখ। আড়নম্র চোখে হয়তো ওদেরই লক্ষ্য করছে।

ইতিমধ্যে কি যেন কথা হলো করুণাময় আর ঐ গুণ্ডা-মতো লোকটার সঙ্গে। কি বিশ্রী আর মোটা লোকটার গলার স্বর! আর গায়ে শক্তিও তেমনি। বাক্স-প্যাঁটরাগুলো ও-গাড়ি থেকে এ-গাড়িতে এনে রাখলো এমন অবহেলায় যেন দুটো হাল্‌কা সুটকেস আনলো।

'—শালার ঝামেলা!' বোধহয় করুণাময়কেই শোনাবার জন্যে বললো, 'মাঝ-রাস্তায় চাকা ভেঙে পড়ে রইলেন। আপনারা না থাকলে কি দশাটা হতো বলুন তো?' কথার শেষে সশব্দে হেসেও উঠলো লোকটা, আর সঙ্গে-সঙ্গে দু'পাটি সাদা-সাদা দাঁত ঝক্‌-ঝক্‌ করে উঠলো!

করুণাময় বিরক্তির গলায় বললো, 'আসুন তাড়াতাড়ি, এমনিতেই রাত অনেক হয়েছে।'

'—হ্যাঁ, তা হয়েছে বইকি।' লোকটা একটা তুড়ি বাজালো হাতে, 'শ্যামু—উঠে পড়ো চটপট্।'

মেয়েটি এগিয়ে এলো ধীরে-ধীরে, টাঙার আড়াল থেকে। ঘোমটাটা টেনে বাড়িয়ে দিলো একটু। তারপর পা-দানিতে পা দিয়ে ওঠবার আগেই ওকে টুপ্‌ করে দু'হাতে শূন্যে তুলে ধরলো লোকটা, বসিয়ে দিলো সামনের আসনে। নিজেও উঠে বসলো।

টাঙা ছেড়ে দিতেই ঝর্‌ঝর্‌ করে ঘাম ঝরে পড়লো। তবু কেমন অস্বস্তি লাগলো নীলার। পিঠোপিঠি বসেছে ওরা, মাঝখানে ইঞ্চি-খানেকের একটা কাঠের ব্যবধান থাকলেও ঝাঁকুনির চোটে পিঠে পিঠ লাগছে মাঝে-

মাঝে। আবার তাও ঐ অদ্ভুত লোকটাই বসেছে ওর পেছনে। করুণাময়ের পিঠে কি ঐ মেয়েটির পিঠ লাগছে ? নীলা ভাবলো এক মুহূর্ত, আড়চোখে একবার তাকিয়ে মনে-মনেই হাসলো।

গঙ্গার পুলে উঠতেই ওপারের আলো-ঝলমল্ শহর চোখে পড়লো। ঠাণ্ডা জোলো-বাতাসের প্রলেপ পড়লো সারা গায়ে। ফিসফিস্ করে বললো, 'ধর্মশালার খবরটা নাও না এবার।'

'—চৌখাম্বা, চৌখাম্বা বাজারের মুখে। নিজের বাড়ি আছে আমার। বিশ-পঁচিশ, হ্যাঁ, বিশ-পঁচিশ বছর হয়ে গেল এখানে। বিশ্বনাথের গলিতে একটা জরির, একটা তামা-পেতলের দোকান আছে আমার। নিবারণ মাইতির জুরি-বুটির দোকান বললেই যে-কেউ দেখিয়ে দেবে।'

বেঁটে থামের মতো চেহারা লোকটার। অথচ চোখে-মুখে কথার খই ফুটছে। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে নীলাকে হাসি চাপতে হবে বুঝি এইবার। ঘাড় ফিরিয়ে লোকটার দিকে তাকালো নীলা, দেখতে পেলো না বিশেষ কিছু। মনে হলো অন্ধকারটা হঠাৎ এক জায়গায় ঘন হয়ে আবছা মূর্তি নিয়েছে শুধু, মানুষ নয়।

করুণাময় কি বলতে চায়, সেদিকে হুঁশই নেই নিবারণের, নিজের মনেই অনর্গল আত্মকাহিনী আউড়ে যায়। ভদ্রতার খাতিরেও জিগ্যেস করে না, কোথায় যাবেন, কোথায় উঠবেন ? টাঙাটাও এদিকে গঙ্গার পুল পার হয়ে আলো-উজ্জ্বল শহরে ঢুকছে।

করুণাময় শেষে নিজেই প্রশ্ন করলো, 'ভালো ধর্মশালা বা হোটেল-টোটেলের খবর দিতে পারেন ?'

'—ধর্মশালা ? ভালো অথচ ধর্মশালা ?' আসল উত্তর এড়িয়ে গিয়ে লোকটা আবার বাক-বকুনি শুরু করলো, 'তার চেয়ে বলুন না, সোনার পাথরবাটি !' হেঁ-হেঁ করে নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলো লোকটা। বললো, 'বিশ-পঁচিশ বছর হয়ে গেল মশাই, এই কাশীতে, চোখ বেঁধে ছেড়ে দিন চৌখাম্বার বাড়ি থেকে, ঠিক দেখবেন দোকানে পৌঁছে যাবো, একটা কলার খোসাতেও পা পড়বে না। আর আপনি বলেন কিনা—'

'—না, মানে খবরটা পেলে উপকার হতো।'

'—খবর আমি না দিলে কে দেবে শুনি! ধর্মশালাই বলুন অধর্মশালাই বলুন, কাশীর সব শালাকেই আমি চিনি। ডালকামুণ্ডিতে চলে যান সিধে, বাঙালীর হোটেল চান—তাও পাবেন। তবে পাড়াটা খারাপ, বাঈজী বেবুশ্যেদের আড্ডা…'

কথা পাল্টাবার জন্যে করুণাময় তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'হোটেলের নামটা কি বলে দিন না?'

'—মুখুজ্যে, মুখুজ্যের হোটেল বললেই নিয়ে যাবে। আমার পেয়ারের লোক হচ্ছে গিয়ে—বলবেন, নিবারণ মাইতি পাঠিয়ে দিলো। আমার নাম করতে ভুলবেন না যেন। এই রোখো, রোখো….' টাঙাওয়ালার উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠলো নিবারণ।

চৌখাম্বার গলির সামনেই টাঙা দাঁড়ালো। ছোটোখাটো সুন্দর বৌটিকে টুপ্ করে আবার নামিয়ে দিয়ে বোঁচকাবুঁচকিগুলো হু'হাতে ঝুলিয়ে টাঙার পেছনে এসে দাঁড়ালো নিবারণ। নীলাকে বললো, 'আসি মা-লক্ষ্মী, রইলেন তো এখন ক'দিন। যাবেন আমার দোকানে। বিশ্বনাথের গলিতে ঢুকেই বলবেন, নিবারণ মাইতির জরি-বুটির দোকান। তা হলেই দেখিয়ে দেবে।' নমস্কারের বদলে কাঁধটা একটু ঝাঁকালো শুধু।—'আসি তাহলে।'

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো নীলা, আর সঙ্গে-সঙ্গে নিবারণের আড়ালে দাঁড়ানো বৌটির দিকে চোখ গেল ওর। ঘোমটা খুলে পড়েছে। হঠাৎ যেন মেয়েটির সারা মুখে রক্ত জমে গেছে। বিস্ময়ের দৃষ্টিতে বড়ে-বড়ো চোখ মেলে তাকিয়ে আছে করুণাময়ের দিকে। ফিরে তাকালো নীলা। হ্যাঁ, বাজারের ঝল্‌মলে আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলো নীলা, করুণাময়ের মুখেও অস্বস্তির ছায়া।

'—বৌ বুঝি?'

মেয়েটি এগিয়ে এসে কৌতুকের হাসি হাসলো। তারপর একবার করুণাময়ের দিকে একবার নীলার দিকে তাকিরে প্রশ্ন করলো, 'বৌ বুঝি?'

'—হুঁ।' বলেই করুণাময় অন্যদিকে মুখ ফেরালো।

মেয়েটি তবু নাছোড়বান্দা। করুণাময়ের কোলের শিশুটিকে দেখিয়ে আবার প্রশ্ন করলো, 'তোমার?'

'—হুঁ।' আবার সেই গম্ভীর গলার ছোটো উত্তর।

'—ছেলে না মেয়ে?'

করুণাময় উত্তর দিলো না দেখে নীলাই বললো, 'ছেলে।'

মেয়েটি ঠোঁট টিপে হাসলো। তারপর নিবারণের কানে-কানে কি যেন বললো। চমকে উঠলো নিবারণ, 'অ্যা! এতক্ষণ বলোনি? আরে মশাই, আসুন! আসুন। নেমে আসুন, হোটেলে কোথায় যাবেন?'

করুণাময় কোনো-রকমে বললো, 'না, থাক। মুখুজ্যে না কার···'

'—হ্যাঁ, মুখুজ্যের হোটেলে যাবেন! শালা এক নম্বরের জোচ্চোর। আসুন, নেমে আসুন। তাছাড়া, আপনি হলেন গিয়ে সম্বন্ধে আমার···' হে-হে করে হাসলো নিবারণ, 'সবচেয়ে বড়ো সম্বন্ধ, কি বলেন?'

অগত্যা নামতেই হলো ওদের।

নীলা সকৌতুকে বললো, 'পরিচয়টা কি এ-জন্মের, না গত জন্মের?'

করুণাময় উত্তর দিলো না। তাদের পরিচয় তো গত জন্মের নয়, গত জীবনের।

শ্যামলীর সঙ্গে আবার দেখা হবে, এতদিন বাদে হঠাৎ এমনভাবে দেখা হবে ভাবতেও পারেনি করুণাময়। কতো বদলে গেছে শ্যামলী, নতুন মানুষ হয়ে গেছে। আর, সারা রাস্তা ওর পিঠের স্পর্শ পেয়েও করুণাময় বুঝতে পারেনি, সন্দেহ হয়নি একবারের জন্যেও। অথচ, এই তো ক'টা বছর আগে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হলে বুঝতে পারতো।

কাছাকাছি বাড়িতেই থাকতো ওরা। করুণাময়ের সঙ্গে বাড়িতে এসে দেখা না করতে পারলেও দেখা দিয়ে যেতো সে প্রতিদিন বিকেলে। রোদ পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে কান পেতে বসে থাকতো করুণাময়। তারপর ওর বোনের সঙ্গে দুড়-দাড় করে কাঠের সিঁড়িতে শব্দ করে ছুটতে-ছুটতে ওপরে উঠে আসতো শ্যামলী। দু'একটা সকৌতুক ইশারা-ইঙ্গিত, দু'চারটে ছোটো-ছুটকো কথা ছাড়া আর কিছু হতো না অবশ্য। তবু নিজের ঘরে বসে-বসে ওদের উচ্চকিত হাসি আর কথা শুনতো ও। আবার যখন

সন্ধ্যে নামার সঙ্গে-সঙ্গে হাল্‌কা পায়ে নেমে যেতো শ্যামলী, তখনও ঠিক বুঝতে পারতো করুণাময়।

শুধু কি তাই! একদিন অনুপস্থিতিতে ওর ঘরে সারা দুপুর কাটিয়ে গিয়েছিলো শ্যামলী। সুধার সঙ্গে গল্প করতে-করতে ওর বিছানায় শুয়েও ছিলো হয়তো। একটিমাত্র স্প্রিংয়ের মতো কোঁকড়ানো চুল দেখে ধরতে পেরেছিলো ও, টেবিলের ওপর ছড়ানো কাঁচিতে-কাটা কাগজের টুকরোগুলো দেখেই চিনেছিলো কার কাণ্ড।

তারপরেও ওর ঘরে বহুবার এসেছে শ্যামলী। পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখা তো দূরের কথা, সব ওলটপালট করে দিয়ে যেতো সে। আলমারি ঘেঁটে এ-থাকের বই ও-থাকে, ও-থাকের বই টেবিলের ওপর এনে রাশ করে রাখতো। কোনদিন চাদরটা চেয়ারে আর মাথার বালিশ পায়ের দিকে ফেলে দিয়ে গেছে। তবে বেশ লাগতো করুণাময়ের। শ্যামলী এসেছিলো, ওর ঘরের বাতাসে তার স্পর্শ রেখে গেছে, এ-কথা ভাবতেও রোমাঞ্চ অনুভব করতো করুণাময়।

ভোর ছ'টার সময় কলেজ বসতো শ্যামলীদের। ছ'টা বাজার আগেই ট্রামে-বাসে, ফুটপাথের ধারে-ধারে, পার্কের রেলিং ঘেঁষে রঙ-বেরঙের পাখির মতো শাড়ি-জড়ানো মেয়েদের ভিড় দেখা যেতো। ঘুম-ভাঙো-ভাঙো শিশিরে-ধোয়া নরম-শরম চোখ আর হাসিতে-ভেজা ঠাণ্ডা কথার কৌতুক ভেসে উঠতো।

করুণাময়ও এসে দাঁড়াতো এই সময়েই। একটা থামের পাশে থামের মতই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতো। পূবদিকের রাস্তাটার দু'পাশে উঁচু-উঁচু বাড়ির সারি, তারই ফাঁকে সিঁথির মতো সরু এক ফালি আকাশ দেখা যেতো, রূপো চমক দিতো। ফিকে-ফিকে লোক চলাচল শুরু হতো, কাঁধে হোসপাইপ বয়ে নিয়ে জলঝুরি ছিটিয়ে যেতো দুটো লোক।

তারপরই হঠাৎ এ-গলি সে-গলি থেকে এক ঝাঁক পায়রার মতো মিষ্টি মেয়ের দল এসে হাজির হতো এই মোড়টায়। কথা আর হাসিতে বাতাস কেঁপে উঠতো। রাস্তার ধারে-ধারে, পার্কের গায়ে-গায়ে কলেজের ফটক অবধি তীর্থ-কন্যাদের ভিড় হতো শুধু।

বাতাসের মতো সোঁ-সোঁ শব্দ করে একটার পর একটা ট্রাম পিছলে পিছলে এসে থামতো মোড়ের মাথায়। তারপর আর এক দফা দম নিয়ে একেবারে কলেজের গেটে। পাখা ঝটপট্ করে বেরিয়ে আসতো ওরা সবাই, একজন ছাড়া।

শ্যামলী। কলেজ পৌঁছাবার আগেই শ্যামলী নেমে পড়তো। একটা স্টপেজ আগে, মোড়ের মাথায় ট্রাম থামতেই একরাশ মোটা-মোটা বই-খাতা বুকে চেপে টুপ করে নেমে পড়তো ও। ছোটোখাটো একহারা শরীর, চটুল চোখ, চতুর দৃষ্টি। আর মুখের হাসির মতই চঞ্চল, স্বতঃস্ফূর্ত। বাঁ-হাতে বইপত্তর, পেছনে রবারের টুকরো লাগানো একটা হলদে পেন্সিল ডান হাতে।

ট্রাম থেকে নেমেই শাড়ির আঁচলটা ঘুরিয়ে এনে পিঠ ঢাকতো, পাড়ের কোণাটা দাঁতে চেপে গালে পেন্সিল বাজাতে-বাজাতে এগিয়ে আসতো ও। দূরে দাঁড়ানো করুণাময়ের দিকে।

শ্যামলীকে নামতে দেখে ট্রামের জানলায়-বসা মেয়েরা ঠোঁট টিপে হাসতো, আলাপী দু'চারজন টীকাটিপ্পনী ছুঁড়তে কসুর করতো না। ঘাড় না ফিরিয়েও শ্যামলী বুঝতে পারতো, শুনতে পেতো, হাসতো করুণাময়ের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই।

আর ট্রামটা চলে যেতেই ধুপ করে বই-খাতাগুলো করুণাময়ের হাতের ওপর ফেলে দিতো ও।

'—বাঃ রে, তোমার বই-খাতা রোজ-রোজ আমি বইতে যাবো কেন?' অনুযোগ করতো করুণাময়।

শ্যামলী তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে উত্তর দিতো, 'ওমা, দু'দিন পরে আমাকেই বইতে হবে, বই-খাতাতে আপত্তি এখন থেকে?'

তারপর, কোনো-কোনদিন ফাঁকা মাঠের নির্জনতায় পার্কের ঘাসে, গাছের ছায়ায়-ছায়ায় কিংবা পথে-পথে ঘুরেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতো। পা ছড়িয়ে গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসতো ওরা, আর চিনেবাদামের খোসার স্তূপ জমে উঠতো ওদের পাশে।

সেদিনও এসে বসলো ওরা নির্জন পার্কের কোণে, পুরোনো বেঞ্চিটায়।

কিন্তু কিছুতেই যেন সহজ হতে পারলো না করুণাময়। ভালোবাসা যতই গভীর হয়, মনের গোপনে ভয়ের বেলুন ততই হয়তো ফেঁপে ওঠে। ভালোবাসা হারাবার ভয়। ভয় থেকে সন্দেহ। শ্যামলীকে এতো কাছে পেয়েও যেন কাছে পাচ্ছে না করুণাময়, এতো মন-জানাজানির পরেও যেন দূরে সরে যাচ্ছে শ্যামলী।

প্রলাপের মতো নিরর্থক কথা আর কথা।

শ্যামলীর পিঠের ওপর হাত রাখলো করুণাময়। আরো কাছে টেনে আনতে চাইলো ওকে। আর সঙ্গে সঙ্গে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকালো শ্যামলী। ধীরে-ধীরে করুণাময়ের হাত সরিয়ে দিলো পিঠের ওপর থেকে।

এমন ঘটনা নতুন নয়। করুণাময়ের কাছে অজানা কোনো বিস্ময় নয় শ্যামলীর এ-ব্যবহার। মনের কপাট খুলে রেখেও স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে চায় যেন শ্যামলী। কিন্তু কেন?

সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায়নি করুণাময়। শুধু অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে কখনো-সখনো, আঘাত পায়নি।

সেদিনও আহত বোধ করলো না করুণাময়, কিংবা এতো বেশি আঘাত পেলো যে, অনুভবের চেতনাও হারিয়ে ফেললো।

ঠিক অন্য-অন্য দিনের মতই শ্যামলী ওর হাতটা সরিয়ে দিতেই করুণাময় বললো, 'আমি জানতাম।'

'—কি জানতে?' ভ্রূ কপালে তুলে স্মিতহাস্যে প্রশ্ন করলো শ্যামলী।

ওর হাসি দেখে ক্রোধে ফেটে পড়লো করুণাময়, 'হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করো না। এ-চিঠি তোমারই লেখা।'

পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে ছুঁড়ে দিলো করুণাময়।—'প্রেম নয় রে বোকা মেয়ে ও আমার সময় কাটাবার সঙ্গী শুধু।' কোনো বান্ধবীকে লেখা শ্যামলীরই চিঠি। বিশ্বাস করে একান্ত গোপনে যে-চিঠি ও লিখেছিলো, তা যে করুণাময়কেই পাঠিয়ে দিয়ে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, তা কি ও ভেবেছিলো কোনদিন। শ্যামলী কি করে বোঝাবে যে, লজ্জা বাঁচাবার জন্যে, সত্যি ঢাকবার জন্যে অনেক মিথ্যেই মেয়েদের বলতে হয়।

'—তোমার কাছে এতদিন যা বলেছি, তার কোনো দাম নেই, যা লিখতে বাধ্য হয়েছি, সেইটুকুই সত্যি হলো ?' দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে চোখে জল এলো শ্যামলীর।

তারপর কিছুদিন চলেছে না-দেখার, না-দেখা দেওয়ার অভিমান। আবার ভুল ভেঙেছে, সন্দেহ দূর হয়েছে। বিরহ-শেষের উন্মাদনায় মিলনের দিনকে কাছে টেনে আনবার আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছে করুণাময়।

ভয়ে আনন্দে থর্‌থর্ করে কেঁপে উঠেছে শ্যামলী, অনুরোধের স্বরে বলেছে, 'না, না, বাবার অমতে কিছু করতে বলো না আমায়।' কখনো কৌতুকে হেসে উঠেছে শ্যামলী, 'স্কুলের মেয়ের মতো পালিয়ে যাওয়া, না—মরে গেলেও তা পারবো না আমি।'

তবু চুপি-চুপি একদিন ওর দিদির কাছে খুলে বলেছে সব কথা। মাকে অনেক ছোটবেলাতেই হারিয়েছে, তা নইলে মাকেও বলতে বাধতো না হয়তো। কিন্তু সব স্নেহ-মমতা উপেক্ষা করেছেন শিবব্রতবাবু। না, এ অনাচার তিনি হতে দেবেন না, এমন অসামাজিক ঘটনা তাঁর বংশে ঘটতে পারে না। মা-হারা মেয়েকে মানুষ করেছেন তিনি, জীবনে কোনো আঘাত দেননি মেয়েদের। কিন্তু—কিন্তু এ অবৈধ বিবাহ তিনি সমর্থন করতে পারবেন না।

মেয়ের ইচ্ছায় বাধা দেননি কখনো, কলেজে পড়তে দিয়েছেন, স্বাধীনতা দিয়েছেন প্রচুর। কিন্তু না, এ হতে দেবেন না শিবব্রতবাবু।

বলেছেন, 'শ্যামলীকে কলেজে যেতে হবে না আর, বলে দিও।'

বলেছেন, 'শ্যামলীর ওপর একটু চোখ রেখো, চামেলি।'

তাই, করুণাময়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতেও যতি পড়েছে একদিন আর অন্ধ আক্রোশে বাবার ওপর গুমরে মরেছে শ্যামলী, বিছানায় পড়ে-পড়ে কেঁদেছে, কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে শুধু।

তারপর ? তারপর হঠাৎ একদিন উঠে দাঁড়িয়েছে। হিংস্র আনন্দে নিজের মনেই হেসে উঠেছে।

ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন শিবব্রতবাবু। পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকালেন—'এসেছো!' গম্ভীর গলায় বললেন, শুধু।

ধীরে-ধীরে পাইপটা তেপায়ার ওপর নামিয়ে রেখে করুণাময়ের আপাদমস্তকে চোখ বুলিয়ে গেলেন একবার, 'স্কাউণ্ড্রেল!' চিৎকার করে উঠলেন হঠাৎ।

'—তুমি শিক্ষিত? তুমি ভদ্রসন্তান?' গর্জে উঠলেন শিবব্রতবাবু।

করুণাময় উত্তর দিলো না কোনো। কি উত্তর দেবে? ও নিজেই জানে না কেন এ ক্রোধ, এ অপমানোক্তি! শিবব্রতবাবুর কাছে এমন ব্যবহার প্রত্যাশা করে ও আসেনি।

'—ইডিয়ট্!' শিবব্রতবাবু আবার মন্তব্য করলেন।

'—বাবা!' বড়ো মেয়ে চামেলি এসে দাঁড়ালো। শিবব্রতবাবুর চুলে আঙুল বুলিয়ে ধীরে-ধীরে বললো, 'বাবা! ডাক্তার না তোমাকে জোরে কথা বলতে নিষেধ করছে?'

ডাক্তারের নিষেধ নয়। চুলে আঙুলের স্পর্শটুকুই যেন ফিসফিস্ করে বললো, 'রাগলে ক্ষতি হবে, বাবা। অপমান করো না ওঁকে।'

'—হুঁ!' দীর্ঘশ্বাস ফেলেন শিবব্রতবাবু। বললেন, 'তুমি ভেতরে যাও।'

চামেলি ঘরে যেতেই হাত-পা থর্থর্ করে কেঁপে উঠলো শিবব্রতবাবুর। স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারলেন না। চোখের কোণে জল জমে এলো আবার।

'—ফুল। দু'দিন আগে বলতে কি হয়েছিলো? অ্যাণ্ড উই টু কুড্ন্ট হ্যাভ ডিটেকটেড বাট ফর দি সিমটমস।' গলার স্বর নামিয়ে বললেন।

করুণাময় তখনও বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে আছে।

'—শ্যামলীর সঙ্গে তোমার বিয়ে আমি দিতাম না, তোমার মতো স্কাউণ্ড্রেলের হাতে মেয়ে দেবার দুর্বুদ্ধি আমার হতো না কোনদিন....সাচ্ য়্যান ইনোসেন্ট ফ্লাওয়ার...তার সর্বনাশ করতে কমসেন্সে লাগলো না তোমার, ইডিয়ট্?'

এতক্ষণে খানিকটা রহস্যের হদিস পেলো যেন করুণাময়। ভয়ে-ভয়ে অত্যন্ত ধীর স্বরে বললো, 'শ্যামলীর কোনো ক্ষতি তো আমি করিনি।'

'—ক্ষতি করোনি!' আবার গর্জে উঠলেন শিবব্রতবাবু!—'অ্যাণ্ড শি ইজ গোয়িং টু বি এ···গোয়িং টু বি এ··।' চমকে উঠলো করুণাময়। উদ্‌ভ্রান্ত অবোধ্য দৃষ্টিতে শিবব্রতবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজেরই অজান্তে বেতের চেয়ারটায় বসে পড়লো।

'—এই উইকের মধ্যেই ইউ টু মাস্ট গেট ম্যারেড। যাও, মেক্‌ ইওরসেল্‌ফ্‌ রেডি।'

চেয়ার ছেড়ে উঠলো করুণাময়, বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। 'মেক্‌ ইওর-সেল্‌ফ্‌ রেডি'। পথ চলতে-চলতে হাসলো করুণাময় নিজের মনেই। হ্যাঁ, প্রস্তুত হতে হবে, আর কোনদিন যাতে ফিরে আসতে না হয় এখানে, সেই জন্যেই প্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু! আশ্চর্য! আশ্চর্য মেয়েদের মন। সত্যি, শ্যামলীর নিরপরাধ ফুলের মতো সুন্দর মুখের আড়ালে এতখানি কলুষ কি করে লুকিয়ে ছিলো। এমন অর্থহীন খেলা খেলেছে কেন সে এতদিন, করুণাময়ের সঙ্গে? আর, আর সব দোষ সব গ্লানি আজ করুণাময়ের ব্যর্থ বুকে কেন ঢেলে দিলো? অদ্ভুত! 'প্রেম নয়, ও আমার সময় কাটাবার সঙ্গী শুধু।' চিঠির সে লাইনটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো আবার। কিন্তু, এই সর্বনাশের জন্যে দায়ী কে? আর, এ-সমস্ত অপরাধের ভার করুণাময়ের ওপরই বা দিলো কেন, শ্যামলী? যদি সত্যি সত্যিই অন্য কাউকে ও ভালোবেসে থাকে, তাহলে সমস্ত দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দিলো কেন তাকে?

চোখের সামনে ওর সমস্ত আলো অন্ধকার হয়ে গেল, পায়ের তলার মাটি বেনো-নদীর পাহাড়ের মতো হঠাৎ যেন ধ্বসে গেল। প্রশ্ন আর প্রশ্ন। হাজারো অবোধ্য প্রশ্ন ঘুরলো ওর মাথায়, অনেক কল্পনা। একবারও মনে হলো না এ-সবই শ্যামলীর অভিনয়।

দিন-কয়েক পরেই আশঙ্কার উত্তেজনায় অধীর হয়ে চামেলি এসে ডাকলো, 'শ্যামলী!'

চিঠি লেখার নীল প্যাডখানা চাপা দিয়ে সহাস্যে মুখ তুলে তাকালো শ্যামলী। পরক্ষণে চামেলীর মুখে ব্যর্থতা দেখে বিস্মিত হলো সে।

'—শ্যামলী!' ধীরে-ধীরে উদাস-চোখ মেলে চামেলি বললো, 'শ্যামলী, করুণাময় নেই।'

'—নেই?' শুধু প্রতিধ্বনি তুললো শ্যামলী।

'—চলে গেছে। খবর না দিয়ে চলে গেছে সে।'

করুণ-বিষণ্ণ দৃষ্টিতে দিদির মুখের দিকে তাকালো শ্যামলী। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টে। তারপর হঠাৎ সশব্দে হেসে উঠলো। সমস্ত ঘর কাঁপিয়ে যেন হাসি ফেটে পড়লো তার। দেয়ালে-দেয়ালে ঘা খেয়ে ঘুরে এলো সে-হাসি, সশব্দ হাসির উচ্চকিত রেশ জানলার কাচ ভেঙে দিলো যেন। বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়লো শ্যামলী। তবু যেন হাসি চাপতে পারছে না; সেই হাসি যেন বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে ক্রমাগত।

'—পালিয়েছে। পালিয়েছে সে।' শ্যামলী বললো, তারপর আবার সশব্দে হেসে উঠলো। পাগলের হাসি যেন। অর্থ নেই, শেষ নেই।

কতগুলো বছর কেটে গেল, তবু সে-হাসি আর বন্ধ হলো না। কতো ডাক্তার কতো মনস্তত্ত্ববিদ্‌কে দেখানো হলো, কিন্তু শিবব্রতবাবু মেয়েকে প্রকৃতিস্থ করতে পারলেন না।

জীবনের শেষ ক'টা দিন সমাজ সংসার থেকে দূরে সরে কিছুটা নির্বিকার আনন্দে কাটাবার জন্যে এসে উঠলেন এখানে। নিবারণ মাইতির বাড়ির একটা অংশ ভাড়া নিয়ে বাসা বাঁধলেন নতুন করে! সঙ্গে বড়ো মেয়ে চামেলিও।

নিবারণ মাইতির ডাক পড়লো সঙ্গ দেবার জন্যে, এটা-ওটা সাহায্য করবার জন্যে। নিবারণও বেঁচে গেলো অসহনীয় একাকিত্ব থেকে।

পাশাপাশি বাড়ি, একই বাড়ির পাশাপাশি ঘর বললেও চলে। উত্তরের একখানা কি দেড়খানা ঘর নিয়ে নিবারণ আর তার দোকানের কর্মচারীর যৌথ সংসার। দু'জনেই অবিবাহিত; আর পূবের দুখানা ঘর ভাড়া নিলেন শিবব্রতবাবু। বারান্দা ডিঙিয়ে এ-বাড়ি ও-বাড়ি করা চলে যখন খুশি।

তবু প্রথম-প্রথম একটু দূরে-দূরে থাকতো নিবারণ। শহুরে শিক্ষিত লোক, চলনে-বলনে বিদেশী ঢং ভদ্রলোকের। তার ওপর বেশভূষাতেও

সর্বদা কলারহীন শার্ট আর দামী কাপড়ের ট্রাউজার। মুখে পাইপ। এ-সব দেখে একটু সমীহ করে চলতো নিবারণ। খুঁটিনাটি সাহায্য করার ইচ্ছে থাকলেও ভয়ে-ভয়ে এড়িয়ে চলতো। ভয় কি শুধু শিবব্রতবাবুকে? মেয়ে ছু'টিকেও ভয় পেতো নিবারণ। বড়োটি ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা, সিঁথিতে সিঁদুর, ব্যবহারেও গৃহিণী। তাই চামেলিকে তেমন ভয় পেতো না নিবারণ, ভয় পেতো শ্যামলীকে। বারান্দায় দাঁড়ালেই কখনো-কখনো ওদের জানলার দিকে চোখ যেতো, কখনো বা হাওয়ায়-ওড়া পর্দার ফাঁকে কপাটের আড়ালে শ্যামলীর শ্বেতপাথরের মতো পা ছু'খানি চোখে পড়েছে, অনেক সময় তার ছোট্ট নিটোল মুখের উত্তাপ পেয়েছে নিবারণ।

আশ্চর্য হয়েছে মেয়েটির ব্যবহারে। যদিবা হঠাৎ কোনদিন চোখো-চোখি হয়েছে অমনি হেসে উঠেছে শ্যামলী, আর নিবারণ ভেবেছে—এ বুঝিবা বিদ্রূপের হাসি, উপহাসের উল্লাস।

তারপর ক্রমে শিবব্রতবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে নিবারণ। আরো অন্তরঙ্গ পরিচয় পেয়েছে শ্যামলীর। পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়েছে।

নিবারণের ঘর থেকে ওদের জল-ঘরটা দেখা যেতো। একদিন হঠাৎ লক্ষ্য করলো নিবারণ, শ্যামলী আঁচাতে এসেই গলায় অঙুল দিয়ে বমি করছে। ঠিক এই ব্যাপারটা পর-পর ক'দিনই লক্ষ্য করলো।

আর একদিন শিবব্রতবাবুর সঙ্গে বসে গল্প করছে নিবারণ, হঠাৎ শ্যামলী এসে হাজির।

'—তেঁতুল আছে, তেঁতুল? দিদি, একটু তেঁতুল দিবি?'

চামেলি কাছেই কোথায় যেন ছিলো, ছুটে এসে শ্যামলীর হাত ধরে বললো, 'চল্, ও-ঘরে চল্।'

কথা শুনে প্রথমটা বিস্মিত হয়নি নিবারণ, কিন্তু চোখ তুলেই স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। কেমন এক অর্থহীন উদাস দৃষ্টি শ্যামলীর চোখে, প্রকৃতিস্থ মানুষের চোখ নয় যেন। বুকের আঁচল মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, শরীরে নেই লজ্জার সঙ্কোচ। শুধু ছুটো উদ্‌ভ্রান্ত চোখ কি যেন খুঁজছে।

চামেলি ওকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু তার আগেই এক ঝট্‌কা দিয়ে সটান এসে বসলো সে শিবব্রতবাবুর চেয়ারের হাতলে।

বাপের গলা জড়িয়ে ধরে বললো, 'দোল্না দেবে না আমায়, দোল্না কিনে দেবে না ?'

শিবব্রতবাবু বললেন, 'চামেলি মা, ওকে এখান থেকে নিয়ে যাও।'

চামেলি টানতে-টানতে নিয়ে গেল ওকে, আর কিছুক্ষণ পরেই আবার ফিরে এলো, 'দেখেছো বাবা, কি করেছে দেখো !'

শিবব্রতবাবু ঘাড় ফিরিয়ে চামেলির হাতের সিল্কের শাড়িখানার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

চামেলি ক্রোধের স্বরে বললো, 'দেখো, ছিঁড়ে একেবারে কুটিকুটি করেছে, বলে কিনা খোকনের জন্যে কাঁথা করবো। কতো কাপড় ছিঁড়লো বলো তো ?'

দুঃখের হাসি হাসলেন শিবব্রতবাবু। বললেন, 'কি আর করবি মা, জেনেশুনে তো আর করছে না।'

তারপর চামেলি চলে যেতেই নিবারণকে উদ্দেশ করে বললেন, 'কিছু মনে করো না নিবারণ, তোমার কাছে ব্যাপারটা গোপন রেখেছিলাম। আমার ছোটো মেয়ে শ্যামলীর মাথায় গোলমাল আছে।'

নিবারণও রহস্যের রাস্তায় আলো দেখতে পেলো। আরো কিছু শোনবার জন্যে চোখ তুলে তাকালো সে।

শিবব্রতবাবুর গলার স্বর ভারী হয়ে এলো। বললেন, 'কতো ডাক্তার দেখালাম, কতো হাসপাতালে রাখলাম, তবু সারাতে পারলাম না ওর রোগ। ওর ঐ এক পাগলামি, সময়ে সময়েই ঐ এক কথা : 'খোকন আসবে, খোকনের জন্যে কাঁথা সেলাই করতে হবে, দোল্না কিনতে হবে তার জন্যে ! আরো কতো যে প্রলাপ বকে তার ইয়ত্তা নেই অথচ যখন ভালো থাকে, শি'জ কোয়াইট ন্যাচারেল।'

নিবারণের মনে হঠাৎ একটা প্রশ্ন এলো, এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ও ভাবলো প্রশ্নটা করা উচিত হবে কি না। তারপর বললো, 'বিয়ের পর পাগল হয়েছে বুঝি ? ছেলেপুলে হয়ে মারা গিয়েছিলো ?'

'—না।' ছোট্টো একটা উত্তর দিয়ে পাইপ ধরালেন শিবব্রতবাবু। মুখ ভর্তি ধোঁয়া ছেড়ে খবরের কাগজটা তুলে নিলেন হাতে। কয়েকটা

কলমের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলেন নিঃশব্দে। তারপর ধীরে-ধীরে বললেন, 'না, বিয়ে হয়নি ওর। তার আগেই হঠাৎ পাগল হয়ে গেল। কখন থেকে যে ও এমন হয়ে গেছে, আমি নিজেও বুঝতে পারিনি।'

নিবারণ বিস্মিত কণ্ঠে বললো, 'সে কি? বুঝতে পারেননি?'

'—না। তখনও ঠিক এমনি করতো। কেবল বলতো, গা বমি-বমি করছে, বমিও মাঝে-মাঝে করতো। আচার, তেঁতুল এই সব খেতে চাইতো, আর যখন-তখন ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়তো। হাব-ভাব লক্ষ্য করে হঠাৎ একদিন চামেলি বললো, বাবা, সর্বনাশ হয়েছে। কেউ বোধহয় সর্বনাশ করেছে শ্যামলীর। বাপের মন, রাগের মাথায় চুল ধরে এক চড় বসিয়ে দিলাম ঐ একফোঁটা মেয়ের গালে। কতো ধমক দিলাম, একটা কথারও উত্তর দিলো না। চামেলি এতো অনুনয়-বিনয় করলো, তবু সাড়া নেই মেয়ের মুখে! তারপর....'

কথা বলতে-বলতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে থেমে গেলেন শিবব্রতবাবু।

নিবারণ মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো, চোখের পাতা ভিজে গেছে শিবব্রতবাবুর। গলার স্বরও যেন আটকে গেছে। নিবারণও বুকের ভেতর অবোধ্য এক ব্যথা অনুভব করলো। মাথা নিচু করে বললো, 'থাক, ও-সব বলতে কষ্ট হচ্ছে আপনার।'

'—কষ্ট?' হাসলেন শিবব্রতবাবু, 'এখন তো সহ্য হয়ে গেছে, কষ্ট পেয়েছিলাম সেদিন, ইট ওয়াজ এ টেরিবল শক্। এখন আর পাই না। সব অদৃষ্ট বলে মেনে নিয়েছি।'

খানিক চুপ করে থেকে বললেন, 'শ্যামলী কোনদিন মুখ ফুটে বলেনি কিছু। তারপর হঠাৎ একদিন ওর টেবিলে এক ছোকরার ফটো দেখতে পেলাম, আমার পরিচিত। ডেকে এনে ধমক দিলাম তাকে, বললাম—বিয়ে করতে হবে তোমাকে। ঘাড় হেঁট করে ছোকরা চলে গেল, আর ফিরলো না। তারপর একদিন জানতে পারলাম, আমাদের সব সন্দেহ মিথ্যে, শ্যামলী সত্যিই কোন দোষ করেনি। আমরাই ভুল বুঝেছিলাম। কিন্তু তখন আর উপায় নেই, তখন থেকেই নতুন কাপড় ছিঁড়ে কাঁথা সেলাই করতে বসে গেছে শ্যামলী, দোল্না-দোল্না করে আব্দার ধরেছে। বুঝলাম

কোনো একটা আঘাত পেয়েই এমন হয়ে গেছে ও। ছেলেটিকেও মিছিমিছি গালাগাল দিয়েছিলাম। সে বেচারীরও কোনো দোষ ছিলো না। সে শুধু ভালোই বেসেছিলো, কোনো অপরাধ তার ছিলো না।'

বিস্ময়ের পর বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলো নিবারণ। এমন ঘটনা, এমন রহস্যময় কাহিনী কখনও শোনেনি সে। আশ্চর্য, সমান্য একটা আঘাত থেকে কি এমন মনোবিকার ঘটতে পারে? বললো, 'হয়তো প্রথম থেকেই পাগল হয়ে গিয়েছিলো, আপনারা বুঝতে পারেননি।'

শিবব্রতবাবু চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'তাও হতে পারে হয়তো। কে জানে! মানুষের মন বড়ো ঠুনকো জিনিস, কখন যে কি হয়! চামেলি কিন্তু বলে, আমি বিয়েতে মত দেবো না বলেই ও ধরনের অভিনয় করেছিলো শ্যামলী। ছেলেটিও নির্দোষ, তাই আমার কথা শুনে শ্যামলীকে ভুল বুঝে সরে গিয়েছিলো।'

নিবারণ বললো, 'পৃথিবীটা এক তাজ্জব মনোহারী দোকান, বুঝলেন না। খুঁজে দেখলে সব রকমই পাবেন। কিন্তু ডাক্তার দেখিয়েও সারাতে পারলেন না ওকে, এই দুঃখু।'

শিবব্রতবাবু হাসলেন, 'না, সারাতে পারলাম আর কই। একজন শুধু বলেছিলেন, বিয়ে দিলে অনেক সময় নাকি ভালো হয়, একেবারে না হোক, কিছুটা সেরে ওঠে। কিন্তু পাগল জেনেও শ্যামলী-মাকে কে বিয়ে করতে রাজী হবে, বলো?'

'—আমি হবো। আমি বিয়ে করবো ওকে।' হঠাৎ বলে উঠলো নিবারণ। পরক্ষণেই ফ্যাকাশে হয়ে গেল ওর সারা মুখ, শিবব্রতবাবুর হাত দুটো ধরে লজ্জা আর অনুনয়ের স্বরে বললো, 'মাফ করবেন আমায়। আমি, আমি ঠিক তা বলতে চাইনি। অন্যায় করে ফেলেছি আমি, মাফ করবেন আমাকে।'

শিবব্রতবাবু হেসে উঠলেন, 'আহা, এতে লজ্জা পাবার কি আছে? মানুষ কি ভেবে-চিন্তে কথা বলে সব সময়? আমার কথা শুনে ব্যথা পেয়েছো তুমি, তাই ও-কথা বলে ফেলেছো।'

নিবারণের লজ্জা গেল না তবু। বললো, 'আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, আর

এই তো চেহারা…' আত্ম-বিদ্রূপের হাসি হাসলো নিবারণ, 'আমি কিনা—আমি কিনা আপনার মতো শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোকের মেয়েকে বিয়ে করতে চাই!' আবার অস্বস্তিকর হাসি হাসলো নিবারণ, 'করি তো দোকানদারি, আমি কিনা….'

কথা শেষ করতে পারলো না নিবারণ, ওর হাসিটা যেন কান্নার মতো শোনালো।

শিবব্রতবাবু চকিতে চোখ তুলে তাকালেন, 'তুমি—তুমি সত্যি ওকে বিয়ে করতে চাও, নিবারণ? করবে, বিয়ে করবে সত্যি ওকে তুমি?' অনুরোধের অতিশয্যে নিবারণের হাত চেপে ধরলেন তিনি।

নিবারণ লজ্জায় ভয়ে কুঁকড়ে গেল যেন।

'—না, না। আমি অশিক্ষিত মানুষ, দোকানদারি করে খাই, আমি—এই তো চেহারা…না, না।'

'—সুযোগ পেলেই শিক্ষিত হওয়া যায়, নিবারণ; আর চেহারা জন্মগত ব্যাপার। কিন্তু মনুষ্যত্ব সাধনায় অর্জন করতে হয়। সারা দেশে এমন মনুষ্যত্ব কারো দেখতে পেলাম না নিবারণ। তুমি তাদের চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক বড়ো তুমি।' বলতে-বলতে থর্‌থর্ করে কেঁপে উঠলেন শিবব্রতবাবু, দু'চোখ বেয়ে দু'গাল বয়ে আনন্দের, খুশির অশ্রু গড়িয়ে পড়লো তাঁর।

তারপর সত্যিই একটু-একটু করে ভালো হয়ে উঠলো শ্যামলী। অনেকখানি স্বাভাবিক হয়ে উঠলো। সুস্থ দেখালো ওকে। পুরোনো দিনের সমস্ত ভুলে যাওয়া ছবিগুলো নতুন করে মনে পড়লো আবার, মাঝখানের কয়েকটা সুতো হারানো বছরের ইতিহাস শুধু মুছে গেল ওর মন থেকে। বিশ্বাস হলো না নিবারণের কথা।

প্রথম-প্রথম মনে পড়াবার চেষ্টা করতো নিবারণ। পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে কনুই দেখতো, বলতো, 'এই যে দাগটা, কেন জানো? কামড়ে দিয়েছিলে একদিন। আর এই কপালে এটা? কয়লা ছুঁড়ে মেরেছিলে।'

শ্যামলী শুনে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠতো। বলতো 'এতও বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারো!'

কোনদিন যে পাগল হয়ে গিয়েছিলো, এ-কথা কিছুতেই শ্যামলীর নিজের বিশ্বাস হতো না। তবু মাঝে-মাঝে অবোধ্য প্রশ্ন জাগতো মনে, সব রহস্যের বড়ো বিস্ময় নিবারণ। অনেক চেষ্টা করেও স্মরণ করতে পারে না —নিবারণ ওর জীবনে কখন এলো, কেমন করে এলো। আশ্চর্য! যার আসবার কথা, সে তো নিবারণ নয়, করুণাময়। করুণাময়কে ওর স্পষ্ট মনে পড়ে। আরো কতো কথা, মধুর স্বপ্ন। তারপর····

অনুযোগ করতো তাই নিবারণের কাছে, 'দেখো, আমার স্মরণশক্তি বড্ড কমে যাচ্ছে। কোনো কথা মনে পড়ে না।'

অথচ শ্যামলী নিজেই বিস্মিত হতো। সব ভুলে গিয়েও শৈশবের, যৌবনারম্ভের দিনগুলো কি করে মনে রইলো ওর, করুণাময়কেই বা ভুলতে পারলো না কেন? করুণাময়! আবার কোনদিন কি দেখা হবে তার সঙ্গে? কতদিন উদাস মুহূর্তে প্রশ্ন জেগেছে শ্যামলীর মনে। হঠাৎ যদি দেখা হয়ে যায়, ওকে কি চিনতে পারবে করুণাময়? কিংবা, কে জানে ও নিজেই হয়তো চিনতে পারবে না। এমন কতো কি ভেবেছে শ্যামলী, বহুদিন। কিন্তু কোনদিন ভাবতেও পারেনি, এমন আকস্মিকভাবে দেখা হবে, এমন বিচিত্র পথে।

করুণাময়ও ভুলতে পারেনি শ্যামলীকে। যতই ক্ষত ঢাকবার চেষ্টা করেছে, ততই গভীর হয়ে উঠেছে সেটা, ব্যথা দিয়েছে। বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে সুন্দর একখানা মুখ, স্পষ্ট হয়ে উঠেছে হাস্যমুখর এক-জোড়া চোখ।

তাই চৌখাম্বার গলির আলোতে চিনতে কষ্ট হয়নি।

এমন দিনের সুযোগের আশায় কতো কল্পনা, কতো স্বপ্ন গেঁথেছিলো। কতো কথা বলবার ছিলো, বলাবার ছিলো! নিস্তব্ধ রাত্রির অতিথি-শয্যায় শুয়ে অস্বস্তি বোধ করেছে, শুধু অধৈর্য হয়ে উঠেছে। তারপর এক সময় এসে দাঁড়িয়েছে বাইরের বারন্দায়। রেলিঙে ঠেস দিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থেকেছে, সুমুখের অন্ধকার দরদালান আর মেঘ-ঢাকা শুক্লাকাশের মাঝে কি যেন খুঁজেছে বার-বার। মেঘ সরে গেছে এক সময়, এক-ফালি ঠাণ্ডা আর নরম জ্যোৎস্নায় সারা শরীর আর মন ভিজে গেছে ওর। হঠাৎ কানে

এসেছে লঘু পায়ের শব্দ, চোখে পড়েছে একটি নারীদেহের ছায়া-শরীর।

শ্যামলী এসে দাঁড়িয়েছে করুণাময়ের পাশে। মৃদু শান্ত স্বরে প্রশ্ন করেছে, 'কেমন আছো?'

'—ভালো। তুমি?'

নিঃশব্দে ঘাড় নেড়েছে শ্যামলী, হাসির আভাস এনেছে চোখে-মুখে।

আর কোনো কথা নয়। চুপচাপ দু'জনে দাঁড়িয়ে থেকেছে পাশাপাশি, রেলিং ধরে। তারপর হঠাৎ শ্যামলীর হাতে হাত রাখতে গেছে করুণাময়, আর বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো দূরে সরে গেছে শ্যামলী। চকিতে একবার ফিরে তাকিয়েই অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।

পুরোনো দিনের কয়েকটা ঘটনা মনে পড়লো করুণাময়ের, মনে মনে হাসলো ও। তবু অপেক্ষা করলো। অনেকক্ষণ। কিন্তু শ্যামলী ফিরলো না।

দেখা দিলো একেবারে ভোরের স্নিগ্ধ আলোয়।

কপালে ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শে ঘুম ভেঙে গেল করুণাময়ের। চোখ চেয়ে দেখলো, নীলা দঁড়িয়ে রয়েছে ওর সামনে। আর চায়ের পেয়ালা হাতে শ্যামলী।

শ্যামলীর হাত থেকে পেয়ালাটা নিয়ে এগিয়ে দিলো নীলা। বললো, 'তুমি ভাই তোমার রান্না দেখবে যাও, ওঁর ব্যবস্থা আমি দেখছি।'

শ্যামলী তবু নিশ্চল হয়ে রইলো।

নীলা সহাস্যে বললো, 'কি আয়েশী দেখেছো। বিছানা আটটার আগে ছাড়বে না কিছুতেই।'

'—এই ক'দিন তেমন আয়েশী থাকলে বাঁচবো, আমার আবার বারোটার আগে রান্নাই হয় না।' ঠোঁটে হাসি কাঁপালো শ্যামলী।

বিদ্রূপের স্বরেই বোধহয় নীলা বললো, 'তোমাদের মধ্যে মিল দেখছি কিন্তু অনেক!'

শ্যামলী সে-কথা শুনতে পেলো না। খোকা জেগে উঠে কান্না শুরু করেছে দেখে ছুটে গেল। আর খোকাকে কোলে নেবার পর থেকেই সব ভুলে গেল সে। সব কাজ ভুল হতে শুরু করলো তার।

অদ্ভুত! শ্যামলীর অমন হাসিখুশি মুখের আড়ালে কোনো বিষণ্নতা

থাকতে পারে, ওর উজ্জ্বল চোখের কোণে কোণে বেদনার অশ্রু লুকিয়ে থাকতে পারে কে জানতো !

'—খোকনকে আমার কাছে রেখে যাবেন, ভাই ?' নীলাকে এক সময় বললো শ্যামলী ।

নীলা উত্তর দিলো, 'ভালোই তো ! হাত-পা ছেড়ে একটু ঘুরতে পাই তাহলে, বসতে পাই দু'দণ্ড ।'

'—উঃ । বেশ, দেখবো কেমন ছেড়ে থাকতে পারেন । কি বলো খোকন ?' বলে খোকনকেই যেন প্রশ্নের মীমাংসা করতে দেয় শ্যামলী, আর সঙ্গে-সঙ্গে ওকে বুকে জড়িয়ে চুমোয়-চুমোয় ব্যতিব্যস্ত করে তোলে ।

শুধু কি তাই ? খোকনকে স্নান করাতে পুরো এক ঘণ্টা সময় নেয় শ্যামলী । আর সেই সময় কতো প্রলাপ বকে যায় তার সঙ্গে, ইয়ত্তা নেই, অর্থও নেই তার । আজেবাজে কথার পর কথা । খোকন হয়তো নিজের মনেই হাসে, নিজের মনেই ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ওঠে । সঙ্গে-সঙ্গে আনন্দে নেচে ওঠে শ্যামলী । খোকন ওর কথা বুঝতে পেরেছে, খোকন ওকে ছেড়ে থাকতে চায় না, ইত্যাদি ।

করুণাময় হেসে বলে, 'শেষে নিউমোনিয়া ধরিয়ে ছাড়বে ।'

'—তা সত্যি ।' নীলাও কৌতুকে হাসে । বলে, 'ভয়ও হয়, আবার ভাবি, বেচারীর কোলে তো আসেনি কেউ, দু'দিনের জন্যে নয় একটু ভুলেই থাকলো ।'

কিন্তু ক্রমশই যেন উৎসাহে আনন্দে উদ্দাম হয়ে ওঠে শ্যামলী । আর নীলা ভয় পায় । শ্যামলীর কথায় আর ব্যবহারে কি যেন এক রহস্যের ইশারা দেখতে পায় ও, আশঙ্কায় চঞ্চল হয়ে ওঠে ।

'—আচ্ছা, মেয়েটা কি পাগল নাকি ?' করুণাময়কে প্রশ্ন করে নীলা, 'আজ দুপুরে দেখি কি, ওর ঘরে খোকাকে কোলে নিয়ে....' কথা শেষ করতে পারে না নীলা, হেসে গড়িয়ে পড়ে সে । মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলবার চেষ্টা করে আবার, আর পরমুহূর্তে কৌতুকের হাসিতে চাপা পড়ে যায় ওর কথা ।

'—এতো হাসছো কেন ?' একটু বিরক্ত হয়েই প্রশ্ন করে করুণাময় ।

মুখে আঁচল চেপে নীলা কোনো রকমে বলে, 'খোকাকে লুকিয়ে-লুকিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছিলো। খাওয়াচ্ছিলো না···' আবার হেসে ওঠে নীলা।

'—তাতে হাসাবার কি আছে ?'

'—না, না। বোতলের নয়।' আবার হেসে ওঠে নীলা।

কিন্তু হাসি মিলিয়ে গেল একদিন নীলার মুখ থেকে। বিস্মিত হলো ও, ভালো করে তাকালো শ্যামলীর দিকে। আশ্চর্য!

'—কি বলছো, ঠিক বুঝলাম না, ভাই।' অনুযোগ করলো নীলা।

শ্যামলী কাঁদো-কাঁদো গলায় বললো, 'উনিও তো তাই বলেন। সত্যি বলুন, বাড়িতে দোল্‌না না থাকলে মানায় ? বাড়ির শ্রীই থাকে না। আচ্ছা, আপনার বাসায় আছে তো ?···দোল্‌না থাকবেই তো। ওকে এতো করে বলি, তবু একটা কিনে দিলো না এ্যাদ্দিনেও। কতই বা দাম ?'

'—দোল্‌নার লোক আসুক, তারপর কিনবে'খন।' সান্ত্বনার সুরে নীলা বললো।

শ্যামলী ঠোঁট ওল্টালো, 'আপনিও ঐ কথা বললেন ? দোল্‌না থাকলে কতো সুন্দর দেখায় বলুন তো। ঠিক হয়েছে, এবার খোকনের জন্যে আনতে বলবো।'

নীলা সহাস্যে বললো, 'তাই বলো।'

কিন্তু লক্ষ্য করলো, যতই দিন যায়, ততই যেন কি এক পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে শ্যামলীর দেহ-মনে। খোকনের দিকে তাকিয়ে থাকে উদাস হয়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কি যেন ভাবে, কিংবা কিছুই যেন ভাবে না।

প্রথম-প্রথম বেশ একটা কৌতুক বোধ করতো নীলা। ক্রমশ একটা বিদ্বেষ ভাব জাগতে শুরু করলো ওর মনে। খোকনকে সত্যিই যেন ছিনিয়ে নিতে চায় শ্যামলী। এক মুহূর্তের জন্যেও নীলার কাছে আসতে দেয় না তাকে। রাত্রে নিজের কাছে নিয়ে শোবার জিদ ধরে।

এমন সময় একদিন নীলা বললো, 'কালই আমরা চললাম, ভাই।'

'—খোকন ? খোকন থাকবে তো এখানে ?' উদগ্রীব হয়ে শ্যামলী জিগ্যেস করলো।

ক্রোধ তো দূরের কথা, হেসে ফেললো নীলা। বললো, 'না, ওকেও

নিয়ে যাবো! ভয় নেই, তোমার কোল আলো করেও খোকন আসবে।'

শ্যামলী অর্থহীন উদাস দৃষ্টিতে তাকালো নীলার মুখের দিকে। নীলার কোনো কথাই যেন কানে যায়নি ওর, অর্থ বোঝেনি কোনো কথার। তারপর হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো, 'না-না, খোকন যাবে না, খোকনকে যেতে দেবো না।'

নীলা উত্তর দিলো না। সরে গেল সেখান থেকে। আর কিছুক্ষণ পরেই খোকনের কান্না শুনে করুণাময় আর নীলা দু'জনেই ছুটে এলো।

শ্যামলীর কোল থেকে খোকন পড়ে গেছে।

নীলা খোকনকে কোলে তুলে নিয়েই শ্যামলীকে কি যেন বললো, ক্রোধের স্বরে।

করুণাময় বললো, 'কোল থেকে হঠাৎ পড়ে গেছে, দোষ কি ওর?'

'—পড়ে গেছে!' রাগ বেড়ে যায় নীলার, 'ডাইনী! ডাইনী ইচ্ছে করে ফেলে দিয়েছে খোকনকে। না, আর এখানে নয়; চলো, আজই ফিরে যাবো আমরা।'

শ্যামলীর চোখে তখনও উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। আঁচল খসে পড়েছে কাঁধ থেকে। কোনো কিছুই ও যেন দেখতে পাচ্ছে না, বুঝতে পারছে না। শুধু এক-জোড়া সজল বড়ো-বড়ো চোখ মেলে সামনের আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। আর মনে-মনে বিড়-বিড় করছে, 'খোকনকে আমি যেতে দেবো না, খোকনকে আমি যেতে দেবো না।'

বিদায়ের মুহূর্তেও ঐ একই কথা লেগে রইলো ওর মুখে। সিঁড়ি আগলে দু'হাত মেলে বাধা দেবার চেষ্টা করলো নীলাকে, 'খোকনকে যেতে দেবো না, খোকনকে আমি যেতে দেবো না।'

নিবারণ ওকে সরিয়ে আনবার চেষ্টা করতেই হঠাৎ ক্ষেপে গেল যেন শ্যামলী। রাগে ক্ষোভে মাটিতে লুটিয়ে কাঁদতে শুরু করলো।

করুণাময় নিবারণকে আড়ালে ডেকে বললো, 'ওকেও ষ্টেশনে নিয়ে চলুন, তাহলে বাধা দেবে না হয়তো।'

শেষে তাই ঠিক হলো। নিবারণ বললো, 'না, খোকন যাবে না। চলো, ষ্টেশন থেকে ফিরিয়ে আনবো।'

চট্‌ করে উঠে বসলো শ্যামলী। সমস্ত মুখ খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠলো ওর, 'সত্যি? সত্যিই ফিরিয়ে আনবে?'

চৌখাম্বার গলিতে আলো ঝল্‌মল্‌ করে উঠলো, সন্ধ্যে নামলো শহরের বুকে। তারা-চিক্‌চিক্‌ গঙ্গার জল কালো হয়ে গেল ক্রমশ। তিমির পিঠের মতো পীচের রাস্তার মসৃণতায় অন্ধকার জমাট বাঁধলো। আর সেই গা-ছম্‌ছম্‌ অন্ধকার ভেদ করে টাঙা ছুটলো আবার।

সেই পুরোনো রাস্তা ধরে, তেমনি আঁকাবাঁকা মেটাল রোডের ওপর দিয়ে চৌখাম্বার উজ্জ্বল বাজার পার হয়ে টাঙা ছুটলো। গাছের ছায়ায়-ছায়ায়, মাঠের নির্জনতা মাড়িয়ে, দীর্ঘশ্বাসের মতো আশঙ্কা-চুপচুপ নিঃশব্দতায় টাঙার ডুমডুমি আর ঘোড়ার খুরের টপাটপ্‌ আওয়াজ ভাসলো শুধু। চাঁদ-জ্বলা আকাশের দু'একটা রুপোলী স্ফুলিঙ্গ হয়তো বা এখানে-ওখানে, রাস্তার ধারের শাখা-পল্লবিত গাছের ফাঁকে উঁকি দিয়ে ঠিক্‌রে পড়ছে। আর সেই চাঁদ-উঁকি-দেয়া রাস্তার অন্ধকারে ছুটে চললো ওরা।

ঠিক তেমনিভাবেই করুণাময় আর নীলা বসে আছে পাশাপাশি, আর পিঠে-পিঠ দিয়ে শ্যামলী আর নিবারণ।

গঙ্গার ব্রিজ এগিয়ে এলো। অতিকায় একটা প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতো দেখালো ব্রিজের ইস্পাত-কাঠ-কংক্রিটের আকৃতি। ওপরের পরিচ্ছন্ন আকাশ, আর নিচে গঙ্গার স্রোতে চোখের তারার মতো কালোর গভীরতা। সুমুখে নির্জন নিঃশব্দ পথ।

ঝুম্‌ঝুম্‌-ঝুম্‌ঝুম্‌ শব্দ করে পোলের ওপর উঠলো টাঙাটা। দমকে-দমকে ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগলো কানে, চুলে, শ্রান্ত মুখের ওপরে। আর সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো শ্যামলী, 'আমি খোকনকে ছেড়ে যাবো না, খোকনকে ছেড়ে যাবো না।'

নিবারণ রূঢ়স্বরে একটা ধমক দিলো। চুপ করে গেল শ্যামলী।

ব্রিজের মসৃণ পথ অতিক্রম করে ইতিমধ্যে নিচে নেমে এসেছে টাঙা, সামনেই বঁড়শির মতো একটা বাঁক ঘুরতে গিয়ে হঠাৎ একটা ঝাঁকানি

দিয়ে টাঙা থেমে গেল। চাকার দিকে তাকিয়ে টাঙাওলা বললো, 'যাবে না হুজুর, চাকা টাল খেয়েছে।'

'যাবে না?' লাফিয়ে নিচে নামলো শ্যামলী। তারপর আবার চিৎকার করে উঠলো, 'না না, আমি খোকনকে ছেড়ে যাবো না, খোকনকে ছেড়ে যাবো না।' চিৎকার করতে-করতে গঙ্গার দিকে, গঙ্গার ব্রিজের দিকে ছুটে গেল শ্যামলী। রুক্ষ চুল পিঠের ওপর ভেঙে ছড়িয়ে পড়লো, শাড়ির প্রান্ত খসে পড়লো শরীর থেকে, উন্মাদের মতো, উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে গেল শ্যামলী। আর পেছনে-পেছনে নিবারণও ছুটে গেল।

মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ওরা। শুধু নিঃশব্দ-নিঝুম রাতের অন্ধকারে একটা চিৎকার ভেসে এলো বার-বার, 'আমি খোকনকে ছেড়ে যাবো না, খোকনকে ছেড়ে যাবো না।'

আর তার পেছনে নিবারণের কর্কশ গলার ডাক, 'শ্যামু, ফিরে এসো, শ্যামু, শ্যামলী, ফিরে এসো।'

করুণাময় হঠাৎ দেখলো, দূরে, অনেক দূরে চাঁদের আলোয় সিল্যুটের ছবির মতো একটা ছায়া-শরীর ঠিক ব্রিজের থামের আড়ালে এসে থমকে থামলো, 'শ্যামলী! শ্যামলী!' চিৎকার করে উঠলো করুণাময়।

তারপর। তারপর সে ছায়া-শরীর অদৃশ্য হলো।

অনেকক্ষণ পরে ব্রিজের থামটার কাছে এসে পৌঁছালো করুণাময়, আর নীলা। তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখলো। না, শ্যামলী নেই। নিবারণ? নিবারণও নেই। শুধু টর্চের তীব্র আলোয় কি যেন চক্‌চক্ করে উঠলো! আবার সেদিকে আলো ফেললো করুণাময়।

না, শ্যামলী নয়। ব্রিজের একটা বল্টুতে এক ফালি কাপড় লেগে রয়েছে, হাওয়ায় পতাকার মতো উড়ছে পত্‌পত্‌ করে। শাড়ি-ছেঁড়া এক টুকরো কাপড় কোত্থেকে উড়ে এসে লেগেছে, কে জানো!

বড়ুয়া মাসি

গৌরকিশোর ঘোষ

যে যাই বলুক, আমার মতে কার্সিয়াং দার্জিলিং থেকে ভালো জায়গা। দার্জিলিং-এর স্নবারি, বড়োলোকিয়ানা এখানে নেই। একটা নম্র এবং মৃদুভাব সব সময় মনকে এখানে স্নিগ্ধ করে রাখে।

তাই, এমন একটা জায়গায় বড়ুয়া মাসিকে বড্ড বেমানান ঠেকছিলো আমার। বড়ুয়া মাসির একটা ছোট্ট স্যানাটোরিয়াম ছিলো, কার্সিয়াং শহর থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে। একে সেটা লোকচক্ষুর বাইরে, কোনও-রকম প্রচার নেই, বড়ুয়া মাসি প্রচার চাইতেন বলেও মনে হয় না, তায় আমি যখন গেলুম তখন সিজ্‌ন শেষ হয়ে এসেছে, কাজেই লোকসমাগম ছিলো না।

বড়ুয়া মাসির সন্ধান আমি পেয়েছিলুম কার্সিয়াং-এর বাসিন্দা, আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে। সে বড়ুয়া মাসি সম্পর্কে খুব উঁচু সার্টিফিকেট দিয়েছিলো।

কিন্তু বড়ুয়া মাসিকে দেখে আমার খুব উঁচু ধারণা হয়নি। আমি একটি কুলীর মাথায় মোট চাপিয়ে পাকদণ্ডির পথে যখন বড়ুয়া মাসির স্যানাটোরিয়ামে পৌঁছালুম, তখন বেলা চারটে। আমায় দেখে সেজেগুজে যে বর্ষীয়সী মহিলাটি বেরিয়ে এলেন, বুঝলুম, তিনিই বড়ুয়া মাসি।

বিগত-যৌবনা এক রমণী যদি চোখে কাজল, কপালে টিপ, ঠোঁটে রং আর চুলে বিনুনি ঝুলিয়ে কিশোরীর সাজ পরে ঘুরে বেড়ায় তো সে দৃশ্য কার ভালো লাগে? দূর থেকে যাও বা সহ্য করা যায়, কিন্তু তার অবিরাম সাহচর্যের কল্পনাও যে অসহ্য। ভাবলুম, আচ্ছা জায়গার সন্ধান আমাকে দিয়েছে বটে, বিশ্বাস।

ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, ময়নার ডাকে ঘুম ভাঙলো। খেতে উঠলুম। খাবার টেবিলে আমি একা। বুঝলুম, আর বোর্ডার নেই। আর কারো সাড়াশব্দও নেই! জিগ্যেস করলুম, 'মাইজি আসেননি?'

ময়না বললো, 'না, আরো পরে আসবেন।'

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙলো। বাইরে গলার আওয়াজ পেয়ে বুঝলুম, ভদ্রমহিলা কাকে কি হুকুম করছেন। গলার স্বরটি কিন্তু খারাপ লাগলো না। আমার উঠতে ইচ্ছে করছিলো। নতুন জায়গার দৃশ্য দেখবার কৌতূহলও ছিলো। কিন্তু উঠছিলুম না, পাছে ভদ্রমহিলার রঙ-করা মুখখানায় চোখ ফেলতে হয়। কিন্তু আমি না উঠলেও উনি এলেন। সঙ্গে-সঙ্গে চোখ বুজলুম। ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকে টিপয়ের উপর ঠক্ করে কি রাখলেন। বুঝলুম, চা। ময়নাকে ডেকে বললেন, পর্দা উঠিয়ে দিতে। ময়না পর্দা ওঠাতেই এক ঝলক আলো এসে চোখে বিঁধলো। আর শুয়ে থাকা যায় না। চোখ মেললুম, বিরক্তি চেপে রেখে।

ভদ্রমহিলাকে দেখে অবাক হলুম। চেনাই যায় না যেন। দিব্যি সাদাসিধে চেহারা। একটা সাদা ব্লাউজ গায়ে, চওড়া কালোপেড়ে শাড়ি পরনে। এখন মনে হলো, ওঁকে দেখতে ভালোই।

স্মিত হেসে বললেন, 'তুমিই বলছি বাবা, তোমাকে। কাল তাড়া ছিলো, তাই কথাবার্তা বলতে পারিনি। তোমার কথা সবই বিশ্বাস বলেছে। নাও, চা-টা খাও! তারপরে আলাপ হবে।'

উনি বেরিয়ে গেলেন। সমস্ত ঘরে চন্দন সাবানের মৃদু সৌরভ ছড়িয়ে পড়লো। অপূর্ব লাগলো সকালটা। বাইরে চেয়ে দেখি পাইন পাতায় রোদের রং ধরেছে।

খাবার টেবিলে আমি আর উনি। ততক্ষণে উনি আমার মাসি হয়ে বসেছেন। বড়ুয়া মাসি।

বড়ুয়া মাসি বললেন, 'আগে অবস্থা ভালো ছিলো। বাড়িটা শখ করে বানিয়েছিলেন আমার স্বামী। দিব্যি নিরিবিলি জায়গা। এখানে কি কেউ বোর্ডিং করে? আমার তো ব্যবসা নয় বাবা, লোকজনের সঙ্গ পাবার জন্যেও বটে, আর কিছু খরচপত্র তোলবার জন্যেও বটে, পরে

এটাকে স্যানাটোরিয়াম মতো করে নিয়েছি। তোমার যতদিন ইচ্ছে থাকো। ভালোই লাগবে বলে মনে হয়।'

সত্যই ভালো লেগেছিলো। যতদিন ছিলুম, ভালোই ছিলুম। সারাদিন হয় ঘুম, নয় বড়ুয়া মাসির সঙ্গে গল্প। বিকেল হলেই বড়ুয়া মাসির চেহারা অন্য। তু'ঘণ্টা ধরে ঘরে দরজা দিয়ে খুকী সাজতেন। তারপর বেড়াতে বের হতেন। আর গভীর রাত্রে ফিরতেন। একদিন দেখেছিলুম, এক নেপালী চাকর ওঁকে পৌঁছে দিয়ে গেল।

বড়ুয়া মাসি বিকালের দিকে কথাবার্তাও বড়ো বিশেষ বলতেন না। মাসির এই পরিবর্তন আমার কাছে খুব রহস্যময় বলে মনে হতো। কয়েকবার কৌতূহল প্রবল হয়েছে, ভেবেছি জিগ্যেস করি ; কিন্তু সেটা অভদ্রতা।

সকালে আমি ঘুরে বেড়াতুম। পাইন গাছের ছায়ায় কখনো বা বসে থাকতুম। বেশির ভাগ দিনই একা। কখনো-কখনো মাসিও সঙ্গ নিতেন, অনেক রকম গল্প হতো। বহু জিনিস দেখেছেন তিনি, অনেক বই পড়েছেন, সে বিষয়ে ভুল নেই। কিন্তু ওই ওঁর এক তুর্বলতা, বিকাল হলেই কুৎসিৎ সাজ-সজ্জা করে বের হওয়া চাই-ই।

বিশ্বাসের কাছে শুনেছিলুম, বড়ুয়া মাসি শান্তিনিকেতনে পড়াশুনো করেছেন। ওঁর স্বামী মস্ত পণ্ডিত। কিন্তু এই দোষেই ওঁর সব কিছু নষ্ট হয়েছে। বিশ্বাস বলেছিলো, ওঁর স্বামী নাকি ওঁকে ডাইভোর্স করেছেন।

অবিশ্বাস করার কিছুই নেই। নিয়তই দেখছি বড়ুয়া মাসিকে। বিকাল হবার সঙ্গে-সঙ্গেই বড়ুয়া মাসির সারা-দিনের ব্যবহার কেমন বদলে যায়। সাজসজ্জা করে বড়ুয়া মাসি বেরিয়ে পড়েন কার্সিয়াং-এর রাস্তায়। তখন কি যে এক শক্তি তাঁকে আকর্ষণ করে, না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

একদিন পিছু নিয়েছিলুম। বড়ুয়া মাসি ডাউ হিলের দিকে উঠে গেলেন। আমি আর গেলুম না। ষ্টেশনের সামনে এক পাহাড়ী মেয়ের চায়ের দোকান। জানতুম, বিশ্বাসকে এখানে পাবো। ঢুকে পড়লুম সেখানে। দেখি, বিশ্বাস কোণের দিকে এক চেয়ার পেতে চা খাচ্ছে। বললো, 'আজ যে বড়ো শহরে!'

আমি বাসা ছেড়ে বেরুতুম না, বিশ্বাস জানতো।

বললুম, 'লোকালয়ে একদম না এলে হাঁপিয়ে উঠতে হয় যে!'

বিশ্বাস বললো, 'তা মিসেস বড়ুয়ার লোককে দেখলে!'

আমি চমকে উঠলুম। বিশ্বাস জানলো কি করে?

বিশ্বাস চায়ের অর্ডার দিয়ে বললো, 'কোনো ভৌতিক কাণ্ড নয়। আমি এই একটু আগেই এখানে এসেছি। তোমাকে যেতে দেখলুম কিনা। মিসেস বড়ুয়া যার কাছে প্রত্যহ আসেন, সে ভদ্রলোক ডাউ হিলেই থাকেন। খুব কড়া প্রেমের ব্যাপার, ব্রাদার। কতখানি কড়া হলে রাধা রোজ-রোজ কৃষ্ণের কাছে ছুটে আসেন। এতো নিয়মিত বোধহয় ঘড়িও চলে না। ভদ্রমহিলার এই এক দোষে সব গেল। স্বামী নামকরা লোক, ছেলেপুলেও আছে শুনেছি। সে-সব ছেড়ে এক বুড়ো আর্মি ক্যাপ্টেনকে নিয়ে পড়ে আছেন। এ-সব ব্যাপার ঠিক বুঝিনে, ভাই।'

বিশ্বাস আরো অনেক কথা বললো। তার সব অবশ্য সুরুচিপূর্ণ নয়। মোদ্দা এটা বুঝে নিলুম যে, বড়ুয়া মাসির চরিত্র খুব সুবিধার নয়। সে আমি প্রথম দর্শনেই বুঝে নিয়েছিলুম। তবু রসালো করে বিশ্বাস যখন বললো, তখন মনটা আর একবার বিরূপ হয়ে উঠলো।

কোন্ অজান্তে মনের মধ্যে বড়ুয়া মাসির প্রতি একটা টান জন্মে উঠেছিলো, সেটা আবিষ্কার করে লজ্জিত হলুম। ঠিক করলুম, মাখামাখিটা আর করা হবে না। এ-সব ভাবপ্রবণতার প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। পয়সা দিয়ে থাকি যখন, সম্পর্কটা তখন কেন তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না!

পরদিন থেকে এড়িয়ে-এড়িয়ে চলতে লাগলুম। ভদ্রতার মাত্রা বজায় রেখে যতটা পারা যায় ওঁকে বুঝিয়ে দিলুম, ও-সব ফালতু আত্মীয়তায় সুবিধা হবে না। ব্যবহার দেখে বুঝলুম, বড়ুয়া মাসি বড়ো আহত হয়েছেন।

দু'জনের মধ্যে একটা ব্যবধান গড়ে উঠলো। কেন যে হঠাৎ আমার মতি পরিবর্তন হলো, সেটা বুঝতে না পেরে বড়ুয়া মাসি খুব কষ্ট পাচ্ছেন বোঝা গেল। আমার দিনগুলোও স্নেহ-রস-বঞ্চিত হয়ে কিছু বিস্বাদ হয়ে গেল। যাক, আর ক'দিনই বা। সময়ও ফুরিয়ে এসেছে আমার। এমনি আরো দিন-পাঁচেক কাটলো।

সেদিন রাত্রে ময়নার ডাকে আমার ঘুম ভেঙে গেল। বেরিয়ে দেখি,

টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ময়না হাউ-মাউ করে যা বললো, তার অর্থ হচ্ছে, বড়ুয়া মাসি পা পিছলে পড়ে অজ্ঞান হয়ে আছেন। শিগগির যেতে হবে।

তাড়াতাড়ি নিচে নামলুম। বড়ুয়া মাসির বাসাটা রাস্তা থেকে একটু উঁচুতে। খানিকটা পাকদণ্ডি বেয়ে উঠতে হয়। কিছুদূরে উঠেই বড়ুয়া মাসির পা পিছলে গেছে। প্রায় ফুট-দশেক গড়িয়ে পড়েছেন। কয়েক জায়গা থেঁতলে গেছে। হাঁটুটা জখম হয়েছে বেশি। এখানে-ওখানে রক্ত মাখা। আর ওঁর সঙ্গী নেপালী চাকরটা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

দু'জনে ধরাধরি করে তুলে আনলুম ওঁকে। শুইয়ে দিলুম বিছানায়। বাহাদুর ডাক্তার ডাকতে ছুটলো। আমি আর ময়না ওঁর বিছানার পাশে বসে থাকলুম। শুশ্রূষা যা করবার ময়নাই করতে লাগলো। আমি বসে-বসে ঘরখানা দেখতে লাগলুম। পরিষ্কার ঘর। বেশ প্রশস্ত। সবচেয়ে চোখে পড়লো ড্রেসিং টেবিলটি। আরে বাপ! আমার মনে হলো সেটা মনোহারী দোকান। মাসি যে কেমন বিলাসিনী, তার পরিচয় এক এই ড্রেসিং টেবিলটিতেই মেলে। শুধু যে নানা-রকম কসমেটিক্স—তা নয়, কতো রকম পুস্তিকা, কতো যে বিলেতি ম্যাগাজিন তার ইয়ত্তা নেই। যৌবনকে বন্দী করে রাখবার কি আপ্রাণ চেষ্টা যে এই মহিলাটি করছেন, তার পরিচয় পেয়ে ওঁর উপর করুণা হলো।

মাসি 'উঃ' করতেই আমি এগিয়ে গেলুম।

একটু ঝুঁকে পড়ে জিগ্যেস করলুম, 'মাসি, যন্ত্রণা হচ্ছে?'

দশদিন পরে বড়ুয়া মাসির সঙ্গে আবার আগের মতো কথা বললুম।

বড়ুয়া মাসি অতিকষ্টে মুখে হাসি ফোটালেন। মিন-মিন করে বললেন, 'আমার ওপর রাগ করেছো?'

বললুম, 'না না।'

বড়ুয়া মাসির চোখে জল এসে গেল।

বললেন, 'আমার ওপর রাগ করো না। আমি বড়ো দুঃখী।'

ডাক্তারবাবু যখন এলেন, ততক্ষণে বড়ুয়া মাসি খুব কাতর হয়ে পড়েছেন। যন্ত্রণার আঁচ লেগে বড়ুয়া মাসির মুখ থেকে প্রসাধনের পালিশ খসে পড়েছে যেন। সে কাতর অসহায় মুখখানি কোনদিন ভুলতে পারবো

না। একখানি হাতে আমার হাতখানি চেপে ধরেছিলেন। আর যন্ত্রণায় 'উঃ আঃ' শব্দ করছিলেন। যতো বিরাগ ওঁর প্রতি পুষে রেখেছিলুম, তা সব জল হয়ে গেল।

ডাক্তারবাবুর বেশ বয়স হয়েছে। তিনি ঘরে ঢুকেই বললেন, 'কি, খবর, মনোরমা ?'

বড়ুয়া মাসি যেন কিঞ্চিৎ অভয় পেলেন বলে মনে হলো। বললেন, 'এসো, ডাক্তার। বোধহয় পা'টা ভেঙেই গেছে।'

আমি আমার ঘরে চলে এলুম, ঘুমোতে চেষ্টা করলুম। কিন্তু ঘুম এলো না। বড়ুয়া মাসির ঘরে শব্দ হচ্ছে, ডাক্তারবাবু আপন মনে কাজ করছেন। 'উঃ' 'আঃ' যন্ত্রণার শব্দও পাচ্ছি। তারপর বড়ুয়া মাসির আওয়াজ আর পেলুম না। বুঝলুম, ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি বাইরে পায়চারি করতে লাগলুম।

ডাক্তারবাবু বেরিয়ে আসতে.মুখোমুখি দেখা।

জিগ্যেস করলুম, 'সাঙ্ঘাতিক কিছু ?'

ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন, 'না, সামান্য ফ্র্যাকচার। তবে শক্ পেয়েছে বেশি।'

দেখলুম, ডাক্তারবাবু বেশ গল্পে-লোক। বললেন, 'আজ আর ফিরছি না মশাই, রাত তো হয়ে এলো। আসুন, বসে-বসে গল্প করি।'

কথায়-কথায় বড়ুয়া মাসির কথা উঠলো, আমিই তুললুম। ওঁর এই সাজের ঘটার কথা তুলে বললুম, 'বলুন তো, কি বিসদৃশ।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'বিসদৃশ ! তা হবে।'

বলে উঠে গেলেন। ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলে ইস্তক মর্মপীড়া অনুভব করেছিলুম। দিলুম বোধহয় ভদ্রলোকের মনে চোট দিয়ে।

ডাক্তারবাবু ফিরে এলেন, হাতে ক্যাবিনেট্ সাইজ্ একটি ফটো। বললেন, 'দেখুন, চিনতে পারেন ?'

ফটোখানি ড্রেসিং টেবিলের উপর দেখেছি। বড়ুয়া মাসির কুমারী বয়সের ছবি। খুবই সুন্দরী ছিলেন। বড়ুয়া মাসির সে চেহারা বদলে গেছে কবে। কিন্তু সাজসজ্জাটি অবিকল রেখেছেন। সেই কুমারী কালের।

ডাক্তারবাবু তারপর দু'ঘন্টা ধরে বড়ুয়া মাসির গল্প শুনিয়ে গেলেন, সে এক অদ্ভুত কাহিনী।

সেই স্তব্ধ রাত্রি। সেই নির্জম পরিবেশ। ডাক্তারবাবু, ধীরে-ধীরে বড়ুয়া মাসির গল্প শুনিয়ে চলেছেন। বাইরে তখন বৃষ্টি, কাচের জানলায় তার ঝর্‌ঝর্‌ শব্দ। বাইরে তখন বাতাস, পাইনের পাতায় তার সর্‌সর্‌। ময়না একটি টিপয়ে আলো রেখে গেল। দু'কাপ গরম কফি দিয়ে গেল। আমার শীত-শীত করছিলো, একবার উঠে গিয়ে গায়ে চাদর জড়িয়ে এলুম। তারপর নির্বাক হয়ে এই প্রৌঢ় ডাক্তারের মুখে এক আশ্চর্য কাহিনী শুনে গেলুম।

ডাক্তারবাবু বললেন, 'আমরা তিনজনেই মনোরমাকে ভালোবাসতুম —আমি, ক্যাপ্টেন ঘোষ আর ডক্টর বড়ুয়া। এ আমাদের কলেজী-জীবনের কথা। কিন্তু মনোরমা ভালোবাসতো সুজিত ঘোষকেই। আমি, নরেশ আর ডক্টর এন সি বড়ুয়া তা জানতুম। বড়ো কষ্ট পেতুম। কিন্তু তবুও মনোরমাকে ভালোবাসতুম সকলেই। সুজিত বরাবরই বড়ো ডেয়ারডেভিল। যা ওর কাম্য, তাকে ছিনিয়ে নিতে জানে। আমরা ওর দুর্বল প্রতিযোগী। নিজেদের দুর্বলতার জন্যে আমরা দু'জন নিজেদেরকে কতদিন ধিক্কার দিয়েছি। পাল্লাটা যে সুজিতের দিকেই ভারী, সে-কথা জানতুম। কিন্তু তবু তাকে ঈর্ষা করিনি। আমরা যা পেলাম না, যা না পেয়ে অশেষ দুঃখ ভোগ করছি, সুজিত যদি তা পায়, পেয়ে সুখী হয়, তো হোক।'

ডাক্তারবাবু নড়েচড়ে বসলেন, সিগারেট বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন, নিজেও ধরালেন।

তারপর বললেন, 'মনে পড়ে মনোরমার সেদিনের খুশিতে উজ্জ্বল মুখখানা। সকালে এসে নেমন্তন্ন করে গেল। ওর আর সুজিতের বাগদান হবে। সেই উপলক্ষে মনোরমার বাড়িতে একটা প্রীতি সম্মেলন হবে বিকেলে। মনোরমার সেদিনের চেহারাটাও বড়ো উজ্জ্বল হয়ে আছে। আজ ওর চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু সেদিন ছিলো অপূর্ব সুন্দরী। এই ছবিটা দেখুন। সেদিনই তোলা।'

ছবিতে বড়ুয়া মাসির সেই প্রথম যৌবনের চেহারা। সত্যই খুব সুন্দরী ছিলেন। আর চেহারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে পোশাকও পরেছিলেন অপূর্ব। আশ্চর্য হলুম, বড়ুয়া মাসি সেই বাগদান দিনের পোশাকের মায়া ছাড়তে পারেননি দেখে। সেদিন তাঁকে যা মানিয়েছিলো, আজও কি তাই মানায়? বড়ুয়া মাসি সেদিনের পোশাকটি আঁকড়ে থাকলে কি হবে, সেদিনের বয়স যে চলে গেছে, তা কি তিনি বোঝেন না?

'কিন্তু মজা দেখুন', ডাক্তারবাবু বললেন, 'যে ঘটা করে এই ছবিখানা তোলালো, সেই শেষ পর্যন্ত মনোরমার প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকা করলো। সুজিতের কিছু দোষ ছিলো, জানতুম। কিন্তু সেটা যে এতবড়ো স্কাউণ্ড্রেল, তা আমরা কেউ বুঝতে পারিনি। মনোরমার বাবার কাছ থেকে কিছু টাকা বাগিয়ে নিয়ে, বিয়ের আগেই সুজিত ভেগে পড়লো এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ের সঙ্গে।

'মনোরমা আত্মহত্যা করতো, এমনভাবেই ভেঙে পড়েছিলো। কিন্তু বাঁচিয়ে দিলো বড়ুয়া। কি করে যে সে অসাধ্য সাধন করলো, সেই জানে। কিছুদিন পরে বড়ুয়া মনোরমাকে বিয়ে করলো। আর, সত্যি, দু'জনের ম্যাচও হয়েছিলো ভালো। কুড়ি বছর ঘর করলো, পরম শান্তিতে।'

ডাক্তারবাবু চুপ করলেন। কি যেন ভাবছেন গভীরভাবে।

একটু পরে বললেন, 'কিন্তু ওদের কুড়ি বছরের মিলিত জীবনে আমিই চিড় খাইয়ে দিলুম বোধহয়। বছর-দেড়েক হলো সুজিত এসে আশ্রয় নিলো আমার ক্লিনিকে। সে তখন আর্মি ক্যাপ্টেন হয়েছে। আফ্রিকার যুদ্ধে মণ্টগোমারীর বাহিনীতে ছিলো। বোমা খেয়ে মরো-মরো। একটা কিডনী নষ্ট হয়ে গিয়েছে ওর। অন্যটা দিয়ে কাজ চালাচ্ছিলো, এবার সেটাও যাবে। তদ্বির করে সুজিত মিলিটারি হাসপাতাল থেকে সোজা আমার তত্ত্বাবধানে চলে এলো। বললো, মরবো জানি, তাই তোর কাছেই মরতে এলুম।

'সেবার বড়ুয়ারাও এলো। ওদের এই বাড়িটা তো ছিলোই। প্রতি বছরে পূজোর সময় আসতো। দিনগুলো ওদের সাহচর্যে ভালোই কাটতো। এবারে সুজিতকে আমার ওখানে দেখে ওরা বিব্রত হলো। নরেশ তো

মহা বিরক্ত। যতো বলি, ও অন্তিমে পৌঁচেছে, ওর ওপর রাগ-দ্বেষ বৃথা। নরেশ শোনে না। পরদিনই কার্সিয়াং ছেড়ে দার্জিলিং চলে গেল।

'সুজিত এই ঘটনার জন্যে প্রস্তুত ছিলো না। বুঝলো সব। নিজের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্তও হলো। ওর স্বাস্থ্যেরও দ্রুত অবনতি ঘটলো। আমাকে বললো, এবার বাঁচবো না, মরবার আগে মনোরমার কাছে ক্ষমা চাইবো। মনোরমাকে লিখলুম, সুজিতের রোগের বিবরণও লিখলুম। চিঠি পেয়ে মনোরমা নিজেই এলো, নরেশ এলো না। এই ঘটনা উপলক্ষ করে, শুনলুম নরেশ আর মনোরমার মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। নরেশের ধারণা—মনোরমা সুজিতকে ভুলতে পারেনি। সে কলকাতা চলে গেল।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'যতই দিন শেষ হয়ে আসছে সুজিতের, ততই ওর আবদার বাড়ছে। বাধা দিলে কষ্ট পায়। আর এই শেষ দিন ক'টা ওকে কষ্ট দেওয়া কেন। তাই মনোরমা মুখ বুজে একটার পর একটা আবদার মিটিয়ে চলেছে। এই বয়েসে ওকে রং মেখে আবার কলেজী-মেয়েদের সাজ পরতে হচ্ছে। সুজিত ওকে যে সময় বঞ্চনা করেছিলো, সেই সময়টা আবার ফিরে চায়, প্রাণ-ভরে ক্ষমা চাইবে। মনোরমাকে তাই বাগদানের পোশাক পরতে হচ্ছে। মনোরমা জানে, সাধারণের চোখে এটা কতো দৃষ্টি-কটু। তবুও পরে। ওতো সাধারণের কাছে যায় না, যায় সুজিতের কাছে। আপনার চোখে এটা বিসদৃশ লাগবে, তাতে আর আশ্চর্য কি?'

ডাক্তারবাবু থামলেন, তারপর একটু মৃদু হেসে বললেন, 'প্রেমের ব্যাপারটাই এই রকম বিসদৃশ, মশাই।'

উত্তাপ

সমরেশ বসু

ট্রেনখানা বৃষ্টিতে নেয়ে এসে দাঁড়ালো। মেয়েটা আবার খিল্-খিল্ করে হেসে উঠলো। আবার ধ্বক্-ধ্বক্ করে উঠলো হরেনের বুকের মধ্যে। তার লিক্‌লিকে শরীরের রক্তে-রক্তে অসহ্য জ্বালা ধরে গেল। গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে তার বুকের মধ্যে আরও তোলপাড় করে উঠলো। দেখলো, মেয়েটাও ওর লোকজনের সঙ্গে সেখানেই নামছে। কোথায় যাবে এরা?

ছোটো ষ্টেশন। যাত্রীও খুব অল্প কয়েকজন। কিছু ক্ষেত-মজুর মেয়ে-পুরুষ। ভিজতে-ভিজতে এসেছে। যাবেও ভিজতে-ভিজতেই। টোকা, হুঁকো, বোঁচকা, টুকিটাকি সামান্য কিছু জিনিস-পত্র হাতে কাঁধে ঝুলছে। কেমন ছন্নছাড়া ভেজা-ভেজা একটা ভাব।

এখানেও বৃষ্টি হয়ে গেছে। হয়ে গেছে নয়, এখনও হচ্ছে। শ্রাবণের ধারা যেন। হাওয়ার ঝাপটায় ইলশেগুঁড়ি ছাঁট। কাছাকাছি কোথাও চাষ আবাদের লক্ষণ বিশেষ দেখা যায় না। যা আছে, খুব সামান্য। সবটাই লাল কাঁকর-পাথরে ভরা। মাঝে-মাঝে কাজল চোখের চকিত চাউনির মতো সবুজের ছিটে লেগেছে। কোথাও হঠাৎ এক-সার ভূতের মতো মাথা তুলেছে সোজা-বাঁকা তালগাছ। চড়াই উঠেছে ঠেলে-ঠেলে, হামাগুড়ি দিয়ে। এমন সময় আচমকা কয়েকটা শালগাছ নজরে পড়লো। অন্যদিকে চোখ ফেরাতেই হয়তো দেখা যাবে ঝাঁকড়া মহুয়া গাছটা টলছে বাতাসে। কয়েকটা বিক্ষিপ্ত পলাশগাছ জলের ফোঁটা-পড়া পাতায়-পাতায় চেয়ে আছে বিষণ্ন চোখে। তারপর কিছুই নেই, যতদূর চোখ যায়। কেবল কালো কিম্ভূত আকাশটার তলায় এই উঁচু-নিচু বিশাল প্রান্তর যেন গেরুয়া আলখাল্লা-পরা রুদ্র সন্ন্যাসী, পড়ে-পড়ে প্রতি লোমকূপ দিয়ে তৃষ্ণা মেটাচ্ছে এই বৃষ্টিতে।

ষ্টেশনটা উত্তর বীরভূমের পশ্চিম ঘেঁষে। ক্রোশ-দেড়েক পশ্চিমে গেলে সাঁওতাল পরগণার সীমানা। পশ্চিমে—দূরে, মেঘের কোলে মেঘের মতো জেগে রয়েছে রাজমহল পাহাড়ের ইশারা। ইশারাটা দূর দিয়ে বেঁকে, অনেকখানি দক্ষিণে এসে হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে পূবে।

ট্রেন চলে গেল। হরেন সব ভুলে চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগলো মেয়েটাকে। নিজের যাওয়ার কথা ভুলে, লক্ষ্য করছে ওদের গতিবিধি। যাদের সঙ্গে মেয়েটা আছে, একটা বুড়ো একটা বুড়ি, একটা মাঝ-বয়সী মেয়েমানুষ। আর ওই মেয়েটা। টোকা, হুঁকো, বোঁচকা, এমনি সামান্য কিছু জিনিস ওদের হাতে-কাঁধে ঝুলছে। চাষের কাজে মজুরি খাটতে যাচ্ছে কোথাও। প্রথমে মনে হয়েছিলো, সাঁওতাল নয়। বাউরী কিংবা বাগ্‌দী।

মরদ নেই সঙ্গে। মনে হচ্ছে, মেয়েটাই ওদের নিয়ে চলেছে। কালো রং মেয়েটার। যেন ঝুঁটিওয়ালি একটা কালো মেয়ে-পায়রা। মদ্দা এসে ঠুকরে ঠুকরে খুনসুটি করবে। সেই আশায় বুক উঁচিয়ে, মাথা হেলিয়ে দুলে-দুলে চলেছে। চোখে দীপ্তি, গলায় বকম্‌-বকম্‌। কিন্তু যাচ্ছে তো খাটতে, বোঝাই যাচ্ছে। আর সঙ্গেও কয়েকটা বুড়ো-বুড়ি। এতো ঢুলুনি-ঢলানি কিসের!

গাড়িতে কয়েকবার চোখোচোখি হয়েছে! হরেন তার জীবনে অনেক মদ খাওয়া মেয়েমানুষের চোখ দেখেছে, সঙ্গও করেছে। ওই মেয়েটার টানা-টানা চোখ দুটিও যেন মদ-খাওয়া, চোখে একদিকে যেমন শান দেওয়া, আর একদিকে তেমনি ঢুলুঢুলু! নেশা ধরিয়ে দেয়। নেশা ধরেও গেছে হরেনের। হেসে-হেসে গাড়ির অনেকের প্রাণেই নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। বোধহয় বিধবা। আসল বয়সে রং ফুটে বেরুচ্ছে হাতে-পায়ে, কথায় আর হাসিতে। রং করার ইচ্ছে আছে প্রাণে। কিন্তু যাবে কোথায় এরা?

সে দলটার পেছনে-পেছনে এসে দাঁড়ালো, ষ্টেশনের বাইরে। তার পরনে ফিন্‌ফিনে মিলের ধুতি, পপ্‌লিনের চক্‌চকে সার্ট। পায়ে কালো রঙের বুট। রংটা ফর্সা, কিন্তু যতখানি বেঁটে, ততখানি রোগা। বয়স তিরিশ না হলেও মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে, যেন চল্লিশেরও বেশি। শরীরের ক্ষয়টা জামাটার ভাঁজেও ফুটে উঠেছে। শালিকের মতো সরু বুক। তার ওপরে আবার বোতাম খুলে দিয়েছে বুকের। গায়ে এসেন্সের গন্ধ।

বাপের আছে ভালো জমিজমা ঘর পুকুর। ছেলে মাত্র হরেন। কুল কুন্নুটি বংশ, কুলিন রায়ের ছেলে। আট বছর ধরে শহর সিউড়িতে ছেলে পড়ছে কলেজের এক ক্লাশে। বাপ টাকা পাঠায় নিয়মিত। হরেন টাকাটা তুষ্টু সরস্বতীর পায়ে দেয়। বিদ্যের প্রকৃতিটা ওর একটু অন্য রসের। আজকে যে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে মেয়েটা, এই নেশা আট বছর ধরে রপ্ত করেছে সে। এখন দর্শনেই নেশা হয়, আর নেশার মতো বস্তুও বটে।

সামনে এসে মেয়েটাকে ভালো করে দেখলো সে। গায়ে জামা নেই। নিভাঁজ গ্রীবার নিচে দিয়ে রূপোর বিছে-হার বুকের টান-টান কাপড়ের ঢাকায় হারিয়ে গেছে। কানের ফুটোয় গোঁজা ছুটো পেতলের মাকড়ি। সিঁথেয় সিঁছুরের আভাস দেখা গেল এবার। জলে ধুয়ে অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

মেয়েটা তাকালো হরেনের দিকে। তাকিয়ে হঠাৎ একটু ঠোঁট টিপে হেসে সরে গেল মাঝ-বয়সী মেয়েমানুষটার কাছে। ঠোঁট বাঁকিয়ে কি যেন বললো ফিস্‌ফিস্ করে। মাঝ-বয়সী মেয়েমানুষটা একবার ফিরে তাকালো। তারপর তাকলো বুড়ো-বুড়ি। কেমন যেন ছেলেমানুষের মতো চাউনি বুড়ো-বুড়ির।

বুড়ো বললো হরেনকে, 'কুথাকে যাবেন গো, বাবু?'

যাক, মুখ খোলা গেল। এবারে জানা যাবে গতিবিধি। হরেন বললো, 'কে, আমি? যাবো তো রলাটি, কিন্তু—'

রলাটি? ওরা সবাই একসঙ্গে ফিরে তাকালো ওর দিকে। বললো, 'অলাটি যাবেন। আপুনি। আরে বাপ্! গাড়ি নাই, গরু নাই, ছুস্তর রাস্তা, ম্যাঘ-বিষ্টি, কি করে যাবেন গো?'

সেইটেই এতক্ষণে হুঁশ হলো হরেনের। চিঠি দিয়েছিলো বাড়িতে গরুরগাড়ি পাঠাবার জন্যে। কিন্তু কাকপক্ষীও তো নেই। সে ফিরে জিগ্যেস করলো, 'তোমরা কোথায় যাবে?'

'অলাটি।'

'রলাটি?'

'হুঁ। ফি বছরে যাই। মজুরি খাটতে যাই গো। ইবারে এট্টুস

আগে-আগে বেরোলম। দেখেন ক্যানে, আকাশের ভাব। সব ভাসায়ে লিবে মনে হচ্ছে।'

হরেনের প্রাণে রস নামলো আরও। রলাটি যাবে তাহলে? একটু ঘনিষ্ট হয়ে উঠতে চাইলো সে। বললো, 'কার ঘরে কাজ করতে যাচ্ছিস্?' কথা বলে এদিকে। নজর থাকে মেয়েটার দিকে।

জবাব বুড়োই দিলো, 'ইন্দির চাটুজ্যেমশায়ের ঘরে। অলাটির কুন্ ঘর আপুনকারদের?'

'গদাই রায়, মানে গদাধর—'

'হঁ হঁ, বুঝলম গো। তা, আপুনি—'

কথার মাঝেই সেই মেয়েটা কপট রোষে ফুসে লঠলো, 'আ, কী যন্তন্না গো, গপ্প করছো, ইদিকে যে দিন যায়।'

সবাই নড়েচড়ে উঠলো। বুড়ো বললো হরেনকে, 'চলি গো, বাবু। সাত কোশ রাস্তা যেতে-যেতে বাতি জ্বলবে ঘরে।'

হরেনকে এই সময়ে হঠাৎ কেমন বোকা-বোকা মনে হতে লাগলো। সে কিছু ঠিক করতে পারছে না। এতটা রাস্তা হাঁটবার সাহস নেই তার। তার ওপরে জল। টিপ্-টিপ্ করে পড়ছেই। একটা ছাতাও নেই সঙ্গে। সে অসহায়ের মতো হাঁ করে তাকিয়ে রইলো মেয়েটার দিকে।

চোখাচোখি হতে মেয়েটা আবার হেসে উঠলো খিল্-খিল্ করে। সারা শরীরের সঙ্গে রূপোর বিছে হারটাও কালো মেঘের বুকে বিহ্যুতের মতো চমকে উঠলো। হাসির মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ছুঁড়ে দিয়ে গেল পেছনে। খোঁপার ওপর দিয়ে ঘোমটা তুলে মাথায় বসিয়ে দিলো টোকা। বুকে কেটে-কেটে-বসা হাসিটা নিয়ে হৃৎপিণ্ডহীনের মতো দাঁড়িয়ে রইলো হরেন। ভাবলো, হুঁ! রং চায় মেয়েটা।

সামনের চড়াইয়ের গা বেয়ে-বেয়ে মেঘ নামছে। লাল মাটির বুকে জল যেন ঢল নামিয়ে দিয়েছে রক্তের। বিহ্যুৎ ঝিলিকে টাট্‌কা রক্ত ক্ষতের মতো ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। লাল পাঁক ক্রুদ্ধ। খ্যাপা কুকুরের মতো দূরে আকাশ গর্‌গর্ করছে থেকে-থেকে। থেকে-থেকে দূরের রাজমহলের ইশারাটুকু হারিয়ে যাচ্ছে, যেন কেউ পেন্সিল টেনে বসিয়ে দিচ্ছে।

ওদের চারজনকে ছাড়া লোক দেখা যায় না একজনও। সামনের রাস্তাটা গরু আর মানুষের পায়ের দাগে এবড়ো-খেবড়ো কর্দমাক্ত হয়ে উঠেছে। ক্রোশ-দেড়েক পশ্চিমে গেলে বীরভূমের সীমানা পার হয়ে সাঁওতাল পরগণা পড়বে। তারপর একটু দক্ষিণে এসে আবার খাড়া পশ্চিমে, সাঁওতাল পরগণার মধ্যে পাঁচ ক্রোশ রলাটি। দূরে-দূরে কিছু সাঁওতাল গ্রাম, মাঝখানে হঠাৎ আবার একটা বাঙালী গ্রাম। কয়েক ঘর ব্রাহ্মণের বাস। সেই পাঠান যুগ থেকে এমনি আছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে থমকে রইলো হরেন। আবার ফিরে তাকালো দলটার দিকে। সেই মেয়েটা সবচেয়ে পেছনে। তাকিয়েই বুকটা রন্‌রন্‌ করে উঠলো। মেয়েটার বলিষ্ঠ ঋজু পেছনটা যেন সমস্ত দলটাকে সাপটে হস্তিনীর মতো দুলে-দুলে চলেছে। দেখতে-দেখতে আবার কানে এসে পেঁছালো হাসির অস্ফূট নিক্বণ।

আর দেখতে-দেখতে, শুনতে-শুনতে মন্ত্রমুগ্ধের মতো পা বাড়ালো হরেন। সঙ্গে-সঙ্গে পূবে-পশ্চিমে আকাশটা চিড় খেয়ে গেল বিদ্যুৎকষায়। মাটি যেন রক্তাক্ত মুখ হাঁ করে হেসে উঠলো। বাজ হানলো আকাশে। হঠাৎ বাতাসে মরকুটে বাবলা ঝাড় নুয়ে-নুয়ে পড়লো। সামনের তালগাছে সভয়ে কা-কা করে উঠলো একটা কাক। হরেন চিৎকার করে ডাক দিলো, 'ওহে, ও বুড়ো—শুনো ক্যানে।'

ওরা দাঁড়ালো চারজন। মাটিতে পা দিয়েই বুঝলো হরেন, বুট জুতো কামড়ে-কামড়ে ধরছে কাদা। ওইটুকু যেতে হাঁপ ধরে গেল। কাছে গিয়েই আগে মেয়েটার দিকে তাকালো সে। মেয়েটা তার দিকেই নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রয়েছে। চোখে তার সেই মাতাল হাসি, একটু যেন ধারালো। ঠোঁটের কোণ তেমনি বেঁকে। বিদ্রূপ না মস্করা, হঠাৎ ঠিক বোঝা যায় না। কালো পাথর-চড়াই বুকের বাস কিছু শিথিল হয়েছে।

বুড়োর দিকে ফিরে বললো হরেন, 'গাড়ি আসেনি, আসবে কিনা কে জানে। চ, তোদের সঙ্গেই হাঁটা দিই।'

বুড়ো বললো, 'আরে বাপ্‌! ই হয় না। আমরা জন-মজুর মানুষ, তাতেই আলামরা হয়ে যাই। আপুনি ক্যানে পারবে।'

বুড়ি সস্নেহ গলায় বললো, 'হুঁ। না না, ই হয় না।'

মেয়েটা ধারালো ছুরির মতো চকিত হেসে বললো, 'প্রাণ চেয়েছে হাঁটতে হাঁটবে।' বলেই আবার চড়াইয়ে প্রতিধ্বনি তুলে হেসে উঠলো।

বুড়ি বললো, 'আঃ, ই কি হাসি। বড়ো বেহায়া তু, বউ।'

মাঝ-বয়সী মেয়েমানুষটা মুখে আঁচল চেপে একেবারে চুপচাপ। বুড়ো আবার বললো, 'আকাশের গতিক ভালো না। আপুনি থাকেন গো। অলাটি কি ইখানে? আমরা যেছি, গাড়ি পাঠিয়ে দিতে বুলবো।' আপুনি বরং পরে আসেন, বাবু।'

হরেন মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বললো, 'না, যাবো। এই তোরা ক'জনা রইছিস্। ছুটো সুখ-দুঃখের কথা বলতে-বলতে চলে যাবো।'

আবার চিক্‌চিক্ করে বিদ্যুৎ হানলো। মেয়েটাও হাসলো বিদ্যুতের মতো। আবার এক ঝলক্ বাসাত নামলো হুস্ কর। মেয়েটা দ্রুতগতি মেঘের মতো চকিত বাঁকে চড়াইয়ে পা বাড়ালো।

বুড়ো-বুড়ি খানিকটা অসহায়ের মতো চুপচাপ রইলো। তারপর হাঁটা ধরলো। এবার মেয়েটা সকলের আগে। চড়াইয়ের পরে মেঘ। যেন মেঘে-মেঘে হারিয়ে যাবে, সেই দিকে নিশানা।

বাতাস এলে ছাঁট বেশি আসে। নইলে মন্থর, ফিস্‌ফিসে। আর এই জলে পিছল মাটি পায়ে ধরে হ্যাঁচকা দেয়। দশ পা হাঁটলে পাঁচ পা এগোনো যায়। পা নেমে আসে হড়কে।

হরেন একদিকে ঘেঁষে চললো। যেখান থেকে মেয়েটাকে পুরো দেখা যায়। দেখতে দেখতে গান মনে পড়লো। মনে পড়তেই গুন্‌গুন্ করে গেয়ে উঠলো, 'সখি, আমা পানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও……' ওদিকে চোখাচোখি হলো মাঝ-বয়সীর সঙ্গে মেয়েটার। আবার হাসি। বুড়ো-বুড়ি নির্বিকার-ভাবে উঠছে ঠেলে-ঠেলে।

ওরা যতো ওঠে, আকাশ ততো ওঠে। ওপরে বাতাসের জোর বেশি! বড়ো চড়াই। সময় নিচ্ছে উঠতে। তারপর উৎরাই। সেখানে দশ পা নামতে, বিশ পা ঠেলে নিয়ে যায়। নিয়ে যায় মুখ গুঁজড়ে ফেলতে। উৎরাইয়ে এসে, ঘাসের ওপর দিয়ে চললো সবাই। ঘাসে পেছলায় কম।

কিন্তু ঘাসের তলে-তলে পাঁক। টেনে-টেনে ধরে। যতো না ধরে খালি পা, তার চেয়ে বেশি ধরে জুতো। উৎরাইয়ের ধাপে-ধাপে হঠাৎ মাথা তুলেছে কয়েকটা তালগাছ। কোথাও কিছু নয়, যেন হঠাৎ কতকগুলো দত্যি মাথা নেড়ে-নেড়ে কানাকানি করছে। খস্‌খস্‌ শব্দে হাসছে মানুষ দেখে! আর কিছু নেই। শুধু উঁচু নীচু উঁচু। মেঘ বসছে চেপে-চেপে। মেয়েটাকে শুনিয়ে হরেন জিগ্যেস করলো বুড়োকে, 'ওই বউ দুটো কে হয়, বটে?'

বুড়ো টোকার তলা থেকে বললো, 'বিটার বউ। দুটা বিটার বউ। বিটারা গেছে সকালবেলা, আগে আগে। ইয়াদের লিয়ে আমি চল্‌ছি।'

সাবধানে, সাবধানে নামছে হরেন। নজর আছে আগে-আগে। যেখানে জলের মতো তর্‌তর্‌ করে গড়িয়ে চলেছে মেয়েটা। ওর কালো পায়ের শক্ত গোছা দেখে মনে হয়, মাটিতে বসলে আর উঠবে না। কিন্তু অমন পা দুখানি যেন পাঁকে বসছে কি না বসছে। ছিট্‌কে যাচ্ছে রক্ত-পঙ্ক। লালে লাল হয়ে গেছে সকলের পা।

হরেন ভাবছে, বুড়োর সঙ্গে ভাব করা যাক আগে। রলাটির ছোকরা-বাবুদের মন চেনে ওরা। কথার ভাবে বোঝে, কি চায় বাবুরা। বললো, 'তবে ই বয়সে তুমার দুটা বুড়া-বুড়ির তো বড়ো কষ্ট, হে?'

বুড়ো হাসলো টোকার তলায়। বৈরাগীর আত্মভোলা হাসির মতো। বললো, 'কস্‌ট? কস্‌ট কি গো, বাবু। ই কি রোগ-ব্যামো যে, কস্‌ট হচ্চে? সম্‌সারে যাবৎ মানুষ খাটে, খাটতে হয়। সি কুনো কস্‌ট লয়। ইটা খাটুনি। যখন লারবো, তখন মনে কস্‌ট হবেক।'

হরেনের মন বিগড়ে উঠলো বুড়োর কথা শুনে। এর মধ্যেই তার বুকে হাঁফ লাগছে, গলায় উঠছে সাঁই-সাঁই শব্দ। কোমরের গাঁটে গাঁটে কন্‌কনানি। আর ওর বুড়ো-হাড়ে কোনো কষ্ট নেই! ব্যাটা বজ্জাত, বেশিদূর হরেনকে এগোতে দিতে চায় না। হরেন আবার বললো, 'তা, বউ-বেটা সব চলেছে, লাতিলাত্‌কুর্‌ নাই?'

বুড়ো খালি বললো, 'নাঃ!' কথাটা বলতে গিয়ে বুড়োর বুকে যেন একটা দীর্ঘশ্বাস আটকালো, আটকে রইলো যেন সকলের বুকেই। বুড়ো-বুড়ি, মাঝ-বয়সী আর···না, মেয়েটার ভাব দেখে কিছু বোঝা যায় না। ঝুঁটি-

পায়রার মতো বুক এগিয়ে নেমেই চলেছে সে। তবু কেমন একটা স্তব্ধতা।

কেবল পাঁকে-পাঁকে থপ্-থপ্, চপ্-চপ্। কালো-কালো কতকগুলো থ্যাবড়া পা, আর লাল কাদা। আকাশের ডাক বাড়ছে! ডাকছে ওই সামনের চড়াইটার মাথায়। চড়াইয়ের গা দিয়ে নামছে হিলিবিলি বিদ্যুৎ, চিক্‌চিক্ করছে তালবনের মাথায়। দগদগিয়ে উঠছে লাল পাঁক। তরল পাঁক গরুরগাড়ির লিক বেয়ে-বেয়ে গড়াচ্ছে আঁকাবাঁকা সাপের মতো, তরল কিন্তু আঠালো। অন্ধকার আরো নামছে। কে বলবে, এখন ভরদুপুর, যেন সাঁঝের শাঁখ বাজানর সময় হলো।

আস্তে-আস্তে ওদের চারজনের গতি কিন্তু কমছে না। বাড়ছে। বাড়তে হচ্ছে হরেনকেও।

তারপর অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ বুড়ো হুস্ করে একটা নিশ্বাস ফেললো। যেন এতক্ষণ ধরে চেপে ছিলো দমটা। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আকাশটা জলের তোড় নিয়ে গলে-গলে পড়তে লাগলো। পট্-পট্ ফুট্‌তে লাগলো ওদের তালপাতার টোকাগুলোতে। তারই মধ্যে গোঙানির সুরে বুড়ো বললো, 'হঁ, ছোটো বিটার এট্টা ছেল্যা হয়েছিলো। তা, পরে মরে গেল গো, বাবু। এই সিদিনে, ছ'মাসের ছেল্যা!....'

বুড়ির গলা দিয়ে শব্দ বেরুলো, 'হঁ-হ-হ.... ।'

'ও! ওই মেয়েটারই ছ'মাসের ছেলে মরে গেছে। কিন্তু....'

'দূর!' বিরক্ত হয়ে উঠলো হরেন। বৃষ্টিটা বেড়েছে। জুতো ভিজে ঢোল। কাপড়ের কোচা চাপা দিয়েছে মাথায়। কিন্তু সব সপ্‌সপে হয়ে উঠেছে। বুড়োও যেন বৃষ্টির মতো ঘ্যানঘ্যানানি শুরু করলো।

হরেন লাফিয়ে-লাফিয়ে আগে গেল, আগে। মাঝ-বয়সীটাকে পার হয়ে তার আসলটার কাছে। হুঁ! গালের পাশে এখনো সেই হাসিটা লেগে রয়েছে। আড়-চোখে দেখছে হরেনকে। দেখছে, আর কেঁপে-কেঁপে উঠছে ভ্রূ দুটো তার। মদ্দার খুনসুটি চায়।

পাশাপাশি দু'হাত ফারাকে এসে পড়লো হরেন। হাঁপিয়ে পড়ছে সে। বললো, 'কির‍্যা বউ, তু যে ঘোড়ায় জিন দিইছিস্!'

মেয়েটা চকিতে এক ঝলক তাকিয়ে দেখলো হরেনের আপাদমস্তক।

দেখে আরো হাসি পেলো তার। পাওয়ার মতো চেহারাই দেখাচ্ছে হরেনের। ভেজা জামা লেপটে রয়েছে গায়ে, একটুখানি শরীরটা দুমড়ে গেছে যেন। কিন্তু চোখ জ্বলছে তার দপ্‌-দপ্‌ করে।

জ্বলছে রক্তের মধ্যেও। পথচলা আর দুর্যোগটা কাবু করে দিচ্ছে। তবু নিজের রক্তে-রক্তে মেয়েটার হাসির কাঁপুনিটা অনুভব করছে সে। পশ্চিমে ছাঁট জলের। টোকার তলা দিয়ে জলের ছাঁট বুকের কাপড় ভিজিয়ে দিয়েছে মেয়েটার, ভিজে-ভিজে যেন আরো তীব্রভাবে সব খুলে দিয়েছে রেখায় রেখায়। রেখার বাঁকে-বাঁকে অস্পষ্ট বিদ্যুতের মতো রূপোর বিছে-হারটার শেষ দেখা যাছে। খেয়াল নেই, টানাগোছার সময়ও নেই। শুধু টেপা ঠোঁটের কোণে-কোণে, টানা-চোখের আঙিনায় কী যেন খেলে বেড়াচ্ছে। রং খেলছে। রং চায়। কিন্তু মেয়েটার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া শক্ত। দু'হাত ফারাকটা দেড়-হাত ফারাক করলো হরেন। ওই আকাশের মেঘের মতো মেয়েটার নিটোল পেশী দুলে-দুলে যেন নেমে আসছে হরেনের চোখের সামনে। চোখের সামনে, কেবল বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে শরীরের উঁচু-নীচু বাঁকে।

দারুণ বাতাস এলো পলাশবনের মাথা দুলিয়ে। আকাশে আচমকা বিদ্যুতের কাটাকাটি ধাঁধিয়ে দিলো চোখ। যেন অনেকগুলো খ্যাপা কুকুর তীব্র চিৎকারে মাতামাতি শুরু করলো। চোখের নজর হারিয়ে গেল হরেনের। সামনে শুধু জলের ধারা। সেই সঙ্গে অস্ফুট হাসির শব্দ।

বুড়োর গলা শোনা গেল, 'সামলে গো। সামলে চলো। আবার জোর লেমেছে। সামনে কিন্তুক লদী।'

নদী আছে, হরেন দেখলো। সে সকলের পেছনে। ছায়ার মতো। চারজনের দলটা তার আগে-আগে। সে মনে-মনে বললো, 'এঃ শালা, মরতে হবে নাকি? বৃষ্টির ঝাপটা তাকে যেন বুকে চেপে ঠেলে দিচ্ছে পেছনে।

পরনের কাপড়টা সে হাঁটুর চেয়েও এক বিঘৎ ওপরে তুলে ফেললো। তার সরু পায়ে জুতো-জোড়া যেমন বড়ো, তেমনি ভারী দেখাচ্ছে।

রাস্তা বদলে গেছে। পাথর ছাড়ানো রাস্তা। বড়ো-বড়ো চাংড়া,

খোঁচা-খোঁচা হয়ে ছড়িয়ে আছে। তারই আশপাশ দিয়ে যেতে হবে। হরেনের চেয়েও বড়ো-বড়ো পাথর। যেন হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়ে থমকে আছে। মাথা ঠুকলে রক্তপাত নিশ্চিত। আর এরই তলে-তলে পাঁক।

সামনে নদী। মাত্র হাত ছয়েক চওড়া। এখন কোমর-জল। অন্য সময় পায়ের পাতা ডোবে না। কিন্তু কোমর-জলেই যা টান! ব্যাং ছানার মতো টেনে নিয়ে যেতে চায়। তোড়ের মুখে হাসছে খল্‌খল্‌ করে।

মেয়েটাও হাসছে। জলের নিচে পাথরে হোঁচট্ খেয়ে ডুব দিয়ে উঠেছে, তাই হাসছে। সে হাসিতে নদীর হাসিও চাপা পড়ে যায়।

হরেন পার হলো। বুড়ি তখন ছোবড়া পাকাচ্ছে। বুড়ো টোকার তলায় কলকে সাজাচ্ছে।

হরেনের চোখ আধ-ঘোলা। দেখলো মেয়েটার গায়ে কাপড় নেই। রক্তের জ্বালায় না জলের ঝাপ্‌টায়, কে জানে, তার কাঁপন ধরলো। কাপড় নেই নয়, আছে। না থেকে আছে। জলে ডুবে উঠেছে। কালো শরীর ছাপিয়ে উঠে ঝিলিক্ হান্‌ছে। কাপড় উঠেছে হাঁটু অবধি, পিঠ গেছে খুলে। কাছে যাবার জন্যে ব্যাং-এর মতো লাফাতে লাগলো হরেন। মাঝ-বয়সীকে কী যেন বলছে মেয়েটা। ফিরে-ফিরে দেখছে হরেনকে আর বৃষ্টিধারার মতো মরছে হেসে।

আবার, আবার আসছে মুষলধারে। হরেন তবু কাছে গেল। মাঝ-বয়সীকে জিগ্যেস করলো, 'তোরা হাসছিস যে?'

মাঝ-বয়সী এতক্ষণে বললো, 'ক্যানে? তুমাকে দেখে। ক্ষ্যামতা নাই, আসতে ক্যানে গেলে।'

হরেন হাঁপিয়ে-হাঁপিয়ে জবাব দিলো, 'ক্যানে, এই তো চলছি।'

তার হাঁপ-ধরা দেখে ওরা দু'জনেই হেসে উঠলো। মেয়েটা আবার কাছাকাছি। চোখে বিদ্যুৎ হেনে হেসে বললো, 'সামনে যে লিদেন আসছে গো।'

নিদেন। বুকের মধ্যে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো হরেনের। মরণ আসছে তার সামনে! তার পিঠের শিরদাঁড়ার কাছে কি যেন নামছে হিল্‌হিল্ করে।

মেয়েটা আরো কাছে। ওর বৃষ্টি-ধোয়া গায়ের গন্ধ লাগছে তার নাকে। ওর নিচে-ওপরে, বিশাল শরীরের প্রতিটি পেশীর পেষণ-শব্দও যেন কানে আসছে হরেনের। যেন রং চায় ওর প্রতি অঙ্গ।

কিন্তু রংটা ঘোলা হয়ে উঠেছে হরেনের চোখে। পাঁক বাড়ছে। নিশিরাইয়ের কাছে আসা গেল। বুড়োও চেঁচিয়ে বললো, 'নিশিআই আসলো, গো। আর একটু পা চালাও।'

নিশিরাই।

হরেনের দাঁতে দাঁত লাগছে ঠক্‌ঠক্ করে। শীত ধরেছে হৃৎপিণ্ডে। বিদ্যুৎকষায় লাল তেপান্তর দগ্‌দগে ঘায়ের মতো লাগছে চোখে। তালের পাতায় চাপা তীব্র সুরে গোঙাচ্ছে বাতাস। যেন পেত্‌নী কাঁদছে।

ওরা মুখ বুজে চলেছে এবার। ওদেরও নিশ্বাস হয়েছে ঘন-ঘন। থ্যাবড়া পায়ে মাটি থ্যাঁতলাচ্ছে।

মেয়েটা কোথায় উধাও হয়ে গেল। ওই, ওই যাচ্ছে। পায়রা নয়, যেন নাগিনীর মতো লক্‌লক্ করে চলেছে। আর মনে হচ্ছে, তার হৃৎপিণ্ড উঠে আসছে গলা দিয়ে। উঠে আসছে আর নিচের থেকে অবশ হয়ে যাচ্ছে শরীর। অবশ, অবশ।

আবার বাজ হানলো কক্কড় শব্দে। একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল হরেনের চোখ। শালিকের প্রাণ খাবি খাচ্ছে এবারে। পাঁকে একেবারে মুখ থুবড়ে পড়লো সে।

'আ হা হা···' বুড়োটা সস্নেহ আর সভয়ে চিৎকার করে উঠলো। বুড়ো-বুড়ি ছুটে এলো। তারপর মাঝ-বয়সী। তার পেছনে সংশয়ান্বিত পায়ে এলো মেয়েটা।

বুড়ো বসে ডাক দিলো, 'আ-হা-হা? উঠো, উঠো গো, বাবু! বলছিলম তখন।'

ওঠে না হরেন। জলে ভিজে-ভিজে, হাড় কেঁপে অচৈতন্য হয়ে পড়েছে সে। বুড়ো বলে উঠলো, 'হে ভগবান। ইয়ার জ্ঞান নাই যে গো।'

জ্ঞান নেই। কে টেনে তোলে? বুড়ো-বুড়ি কাহিল। মাঝ-বয়সী রুগ্ন। মেয়েটাই টেনে তুললো। তুলে নিয়ে গেল একটা মহুয়ার তলায়।

বুড়ো অসহায়ের মতো তাকালো পশ্চিমে। এখনো দেড় ক্রোশ! ওই দূরে, পাহাড়টা গেছে আরো সরে। তার নিচে একটা কাল্‌চে রেখা। ওইটে অলাটি। অর্থাৎ রলাটি।

হরেন কাঁপছে থর্‌থর্ করে। কাঁপছে আর লালা গড়াচ্ছে তার।

বুড়ি বললো, 'বউ, নোকটার কাঁপন লেগেছে যে। বাঁচবে তো?'

মেয়েটার চোখেও অসহায়তা। তার টানা চোখে ভয় ও ব্যথা। বললো, 'তা—ই তো! আগে শুখ্‌না কাপড় একখান দেও এখন।'

বুড়ি তাই দিলো বোঁচকা খুলে। মেয়েটা তার কোলে টেনে নিয়ে বসেছে হরেনকে। জামা ছাড়িয়ে, মাথা মুছিয়ে শুকনো কাপড়ে জড়ালো তাকে। নিজের টোকাটা দিল হরেনের মাথায় ঢেকে। মাঝ-বয়সী তার টোকাটা দিলো হরেনের পায়ে। বৃষ্টি তো বন্ধ নেই।

তারপর কোলের ছেলেকে যেমন করে বলে তেমনি সস্নেহ গলায় বললো, 'ইয়ার বড়ো বাড়াবাড়ি। আমরা যেছি অলাটি, তো খবর দিতুমনি? তা ই নোকের বড়ো বাড়াবাড়ি।' বলতে-বলতে হেসে ফেললো মেয়েটা। স্নেহ-করুণ হয়ে উঠলো তার চোখ। সেই চোখে সে দেখলো হরেনের আপাদমস্তক। চোখাচোখি করলো মাঝ-বয়সীর সঙ্গে।

বুড়ো বলে উঠলো, 'হঁ। নোকটাকে তু বাঁচা গো, বউ। ই বুড়ো-হাড়ে তো ক্ষ্যামতা নাই।'

মেয়েটা বললো, 'অ মা! তবে কি মেরে ফেলছি নাকি গো। বাপ-মায়ের ছেল্যা তো এট্টা।'

'হঁ। বাপ-মায়ের ছেল্যা!'

হঠাৎ এই বর্ষণ মুখরিত রক্ত-তেপান্তরের খাড়াই-উৎরাই কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। তালপাতার বাতাসে গুমরে-গুমরে উঠলো কান্না। বাবলা-ঝাড় বাতাসে মাটির বুক ভরে নুয়ে-নুয়ে পড়তে লাগলো।

'ছোটো বিটার ছ'মাসের ছেল্যার শোক চারটে বুকে পাথর হয়ে জমে আছে। সে তো বাপ-মায়ের ছেল্যা ছিলো!'

মেয়েটা দু'হাত দিয়ে সাপ্‌টে ধরলো হরেনের অচৈতন্য মুখ, 'ই কি বাড়াবাড়ি বাপু তোমার, অ্যাঁ? মানুষের জীবন, সে কি ছেলেখেলার

জিনিস! ছেলেখেলা করতে এসে মানুষ এমনি করেই তার মরণকে ডাকে!'

হঠাৎ আবার কেঁপে উঠলো হরেন। হাত-পা খিঁচিয়ে থর্‌থরিয়ে উঠলো তার সর্বাঙ্গ।

'এ্যাই, এ্যাই দেখো ক্যানে, কাণ্ডো।' সভয়ে বলতে-বলতে মেয়েটা বুকের কাছে আরো আঁকড়ে নিলো হরেনকে।

বুড়োও কাঁপছে। যতো না জলে, তার চেয়ে বেশি ভয়ে। বললো, 'তোরা থাক ইখেনে। আমি যেছি। যেয়ে গাড়ি পাঠায়ে দিই।'

মেয়েটা তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'হঁ, তুমি যাও গো, বাবা। ই তো তেমুন ভালো বুঝচি না।'

বুড়ো চলে গেল। মাঝ-বয়সী বললো মেয়েটাকে, 'গরম করতে হবে। শরীরে কিছু নাই।'

মেয়েটি আরো বুকে চেপে ধরলো হরেনকে। মাঝ-বয়সী বললো, 'আ, দূর মরণ, বুকের ভিজা কাপড়টা ক্যানে চাপছিস্। কাপড় সরা। লজ্জা কিসের? বাপ-মায়ের ছেল্যাটা। বুকের ওম্ পেলে গরম হবে।'

মেয়েটা কাপড় সরিয়ে দিলো। কক্কড় করে বাজ হানলো। সাপিনীর মতো বিদ্যুৎ ঝিলিক্ দিয়ে নেমে এলো মাটিতে। কিন্তু আকাশের সব ভয় সমারোহ এখানে কেমন শান্ত ও দৃঢ় হয়ে উঠেছে। তাকে আড়াল করে মানুষ মানুষের মৃত্যু-শীতকে তপ্ত করছে। মেয়েটার বুকে ওর ছেলেটার দাগ রয়েছে এখনো। হরেনকে ওর উত্তাপের চাপে-চাপে গরম করতে লাগলো। একটু-একটু করে অনেকক্ষণ ধরে।

যেন একটুখানি ছেলে, সবটুকু কোলে ধরা যায়। এবার সত্যিকার অন্ধকার নামছে। মেঘ তাকে গাঢ় করছে। এখনো গরাইয়ের সেই মানুষ-ডোবা রক্ত-পাঁক পার হতে হবে।

হঠাৎ মেয়েটা চমকে উঠলো। বিছের মতো সুড়সুড় করে কি যেন উঠে এসেছে তার বুকে, কোমরের আশপাশে। দেখলো, চোখ চেয়েছে হরেন। যেন স্বপ্ন দেখেছে, এমনি বিস্ময়। কেঁপে উঠলো সে। বিস্ফারিত চোখে আর একবার দেখে হিংস্র চোখে হাসলো সে। মুহূর্তে সরু-সরু দুটো হাত দিয়ে মুঠো করে আঁকড়ে ধরলো মেয়েটাকে হরেন।

মেয়েটা প্রথমে হরেনের জ্ঞান দেখে হেসে উঠলো। হাত দুটো সরিয়ে দিলো গায়ের ওপর থেকে। পরমুহূর্তেই হরেনের সেই রুগ্ন ছোটো মুখটা হিংস্রতা দেখে থমকে গেল। রক্তের মধ্যে সেই আগের দর্প পেয়ে হরে প্রাণপণে হাত প্রবেশ করিয়ে দিলো মেয়েটার দু'হাতের তলা দিয়ে। মুখট তুলে আনতে চেষ্টা করলো ওপরে।

দপ্-দপ্ করে জ্বলে উঠলো মেয়েটার টানা চোখ। সে তার বলি নিটোল হাতের এক ঝট্‌কায় ছিট্‌কে ফেলে দিলো হরেনকে। বললো, 'অ মরণ! কেন্নোর মরণ গো!' বলে, সেই ক্রুদ্ধ মুখেও হেসে উঠলো মেয়েটা, ' আর বাচবেনি দেখছি, গো।'

বিদ্যুৎ চমকে, দিকে-দিকে উঁচু-নিচু তেপান্তর যেন হাসছে রক্তা মুখে। আর তালের সারি যেন অশরীরী ছায়ার মতো পায়ে-পায়ে আসছে এখানে এগিয়ে।

হরেনের গায়ে এমনিতেই কাদা মাখামাখি। আবার কাদা লাগলো পাঁক থেকে মুখ তুলে কিছু একটা বলার উদ্যোগ করলো। চোখ তার তখনে মেয়ে-বুকের উত্তাপে চক্‌চক্ করছে।

এমন সময় ওপরের চড়াই থেকে হাঁক শোনা গেল বুড়োর। বলদে ঘন্টা শোনা গেল। গাড়ি আসছে।

গাড়ি এলো, গদাই রায়ের ছেলেটাকে তুললো। তুলে চললো।

এতক্ষণে যন্ত্রণায় হরেনের চোখে একটা নোনা-ধারা চোঁয়াচ্ছে।

বৃষ্টি তখনো তেমনি। ওরা চারজন গাড়ির আগে আগে চললো মেয়েটার চোখ যেন হঠাৎ রুদ্ধ অভিমানে দুরন্ত হয়ে উঠলো। বুকের কাপড়ট কষে টেনে দিলো সে। ওদের পেছনে বৃষ্টির শব্দের মধ্যে গাড়ির চা দুটো ককাচ্ছে। ককিয়ে কাঁদছে।

●